মৃগনয়নী

৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রকাশক : অমিতা চট্টোপাধ্যায়
আশীর্বাদ প্রকাশন
৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন
কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রথম প্রকাশ : ৩০ জানুয়ারি ১৯৬০

উপদেষ্টা :
অ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইণ্ডিয়ান স্মল ইণ্ডাস্ট্রি,
বিজনেস অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট

অলংকরণ : গোপাল সান্যাল

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : বিজন কর্মকার

মুদ্রক : অসীমকুমার সাহা
দি প্যারট প্রেস
৭৬/২ বিধান সরণি (ব্লক কে-১)
কলকাতা ৭০০ ০০৬

সৃষ্টির চালচিত্র

রোমি সাহা আমার কন্যাপ্রতিম। বিভিন্ন সময় সে আমার কাছ থেকে আমারই অজান্তে সংগ্রহ করেছে এই উপন্যাসগুলির পটকথা। তার এই আন্তরিক আগ্রহের সঞ্চয়গুলি লেখককে পাঠকের আসনে বসিয়ে সৃষ্টির চালচিত্র দেখার অবকাশ করে দিল।

মোহিনী

হারিশ বলল, আজ পাঁচটায় রেডি থাকবেন, আমি এসে আপনাদের নিয়ে যাব।

এর্নাকুলমে একটা হোটেলে উঠেছি। তার খানিক দূরেই বিশাল সিনেমা হল, 'কবিথা'। ওরা কবিতাকে কবিথা বলে।

সেখানে আজ সন্ধ্যার শোতে সিনেমার বদলে পরিবেশিত হবে নৃত্যের একটি অনুষ্ঠান। এও শুনলাম, তরুণী এক প্রতিভাময়ী নৃত্যশিল্পী দশ বছর শিক্ষা সমাপ্ত করে এই প্রথম মঞ্চে অবতীর্ণ হবে। তার গুরু আজ তাকে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করবেন।

এই নৃত্যানুষ্ঠানের কথা আগেই আমাদের জানিয়ে রেখেছিল হারিশ।

অত্যন্ত সুভদ্র এক যুবক, এই হারিশ। সুদর্শন মুসলিম যুবকটি 'কবিথা' সিনেমা হলের দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে।

হলটি তার মামার। তারা ফিল্মপ্রোডিউসার। ওদের 'চেমিন' নামের ফিল্মটি প্রথম হয়ে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল।

বিচিত্র পরিস্থিতিতে হারিশের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। ওই হৃদয়বান যুবকটির সাহায্যে আমরা কেরালাকে নানাভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। যতদিন কোচিন, এর্নাকুলমে ছিলাম, হারিশের ঝকঝকে একখানা গাড়ি আমাদের হোটেলের নীচে দাঁড়িয়ে থাকত। আমরা সারাদিন, এমনকী রাত্রিতেও ওই গাড়িতে ঘুরতাম। কখনও হারিশ, কখনও বা তার নিযুক্ত গাইড আমাদের সব কিছ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিত। যে হোটেলে আমরা থাকতাম সেখানে খুব কম দিনই লাঞ্চ, ডিনার করেছি হারিশ আমাদের গ্র্যান্ড হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত। বহু চেষ্টা করেও আমরা কোনওদিন হোটেলের বিল দিতে পারিনি।

এখন হারিশ-প্রসঙ্গ থাক। ঠিক পাঁচটায় হারিশের আবির্ভাব। গাড়ি করে আমাদের নিয়ে গেল 'কবিথা' সিনেমা হলে।

সামনেব দুটি আসনে বসিয়ে দিয়ে গেল আমাদের। একটু পরেই শুরু হল অনুষ্ঠান। আজ 'মোহিনী আট্যম' পরিবেশন করবে তরুণী নর্তকী প্রেমা মেনন।

কলকে ফুলের মতো নরম হলুদ আলো ছড়িয়ে পড়ল মঞ্চের ওপর। করতালের ধ্বনি দিতে দিতে মঞ্চে এসে ঢুকলেন গুরু মাধবী আম্মা। পা দুটি তাঁর বিচিত্র আলপনা আঁকতে আঁকতে এগিয়ে চলেছে। গানের একটি পদ বেজে চলেছে গলায়। তালমের বোলে, পায়ের ছন্দে, কণ্ঠের সুরে নিখুঁত হারমোনি।

মাধবী আম্মার ঠিক পেছনে ছায়ার মতো অনুসরণ করে আসছে প্রেমা মেনন। বিকশিত প্রেমা। গুরুর চরণ বিন্যাসের নির্ভুল অনুকরণ করে চলেছে সে। শুধু চরণ নয়, কর-চরণ-বিন্যাস। একটি শ্বেতকুমুদ যেন হাওয়ার ছোঁয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে।

সমস্ত মঞ্চ প্রদক্ষিণের পর গুরু মাধবী আম্মা যন্ত্রশিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে বসলেন অর্ধবৃত্তাকারে। নর্তকী

প্রেমা নমিত দেহে দুই করে করল গুরুর চরণ-বন্দনা।

এবার মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়াল প্রেমা। বিপরীত মুখে জানু দুটি ভেঙে অর্ধমণ্ডলম্ মুদ্রায়, অর্ধ উপবেশনের ভঙ্গিতে দাঁড়াল সে। বুকের ওপর ঈষৎ ব্যবধানে দুটি বাহু নমিত। মাথায় কেশগুচ্ছ বামে চূড়াবদ্ধ। রূপার চন্দ্রাকৃতি নেট্রিচুটি ঘিরে রেখেছে সেই কেশকলাপ। তার নীচে সাদা মল্লিকা বা মল্লাপ্‌পুর দোসৃতি বেষ্টনী। কানে ঝুলছে ঝুমকোর আকারে কুড়া কাড়ুকন্। নাকে হীরের মুকুতির ওপর আলো পড়ে ঝলসে উঠছে। গলায় সোনার পুতলিমালা। মোহিনী আট্যমের মোহিনীমূর্তি।

সাদা পুডাবা পরে দাঁড়িয়ে আছে প্রেমা। সোনালি জরির পাড় চরণ, কটি আর বক্ষদেশ বেষ্টন করে হারিয়ে গেছে। মুখে মৃদু হাসির আভা। চোখের তারা স্থির। শুধু কালো ভ্রূদুটি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

শরতের আকাশে হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে এসে দাঁড়িয়েছে যেন একখণ্ড সাদা মেঘ। কিনার ঘিরে সোনার আলোর রেখা।

মাধবী আম্মার কণ্ঠে বেজে উঠল প্রার্থনার সুর। সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলিত হতে লাগল প্রেমার প্রসাধিত দেহ। রম্‌ঝম্ বেজে উঠল পাদস্বরম্। বোলের বাঁধনে প্রেমা বেঁধে নিচ্ছে দেহখানি। হস্ত, চরণ, নয়ন সব কিছু যেন বোলের তালে ধীর থেকে মধ্যলয়ে, মধ্য থেকে দ্রুত লয়ে আবর্তিত হয়ে চলেছে। হস্ত চরণ প্রক্ষেপে, নয়ন বিভঙ্গে প্রেমা আজ মোহিনী।

মনে হল, সমুদ্র মন্থন শুরু হয়েছে। লক্ষ লক্ষ শৈবাল আর মাছেরা সে দোলায় আন্দোলিত।

এবার শুরু হল স্বরযতি। সরগম সাধছেন মাধবী আম্মা, নাচছে প্রেমা। নাচতে নাচতে লয় বাড়ছে আবার কমছে। কটির উর্ধ্বে বাহু বক্ষ আন্দোলিত হচ্ছে।

কেরালার জ্যোৎস্নাধোয়া আকাশ ছুঁয়ে দাড়িয়ে আছে যে নারিকেল বৃক্ষের সারি, তারা রাতের হাওয়ায় দুলছে। দীর্ঘ কাণ্ডের ওপর পত্রপুঞ্জ হাওয়ার বেগে ঘুরে ঘুরে দোল খাচ্ছে। প্রেমার দেহ সেই দোলায় দুলছে। তার মেরুদণ্ডটি হয়ে গেছে বৃক্ষের ঋজুকাণ্ড। তার ওপর বক্ষস্তন যেন সে বৃক্ষের সুপুষ্ট ফল। আর আন্দোলিত বাহুযুগল বৃক্ষের দীর্ঘ পত্রযুক্ত শাখা।

স্বরযতি শেষ হলে শুরু হল বর্ণম্। গান চলেছে। বাসকসজ্জায় সজ্জিত রাধা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে প্রিয়তমের। চোখে মুখে প্রিয় মিলনের উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে অভিনয় করে চলেছে প্রেমা। আমার মনে হল, দর্শকের আসনে বসে প্রতিটি দর্শক ভুলে গেছে তাদের বয়স। মহাকালের নিষ্ঠুর ভাঙনকে যেন নিজের যৌবন দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে প্রেমা। প্রতিটি দর্শককে নাচের মুদ্রায় সে যেন বলছে, মহাকালের বাঁধন মুক্ত হয়ে তুমি এসো আমার অনন্ত প্রতীক্ষার পথ বেয়ে। তুমি আমার সেই প্রার্থিত পুরুষ। তোমাকে জরা স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি অনন্ত যৌবনের প্রতিমূর্তি।

পল্লবী অনুপল্লবী ছুঁয়ে ছুঁয়ে গানে বাজছে শুধু এসো এসো, কেন তুমি এখনও উদাসীন।

বর্ণম্-এর পরে স্টেজে নেমে এল ক্ষণিক অন্ধকার। অমনি এক ঝাঁক পারাবত যেন চঞ্চল পাখনায় শব্দ তুলতে তুলতে উড়ে চলল আকাশে।

করতাল-ধ্বনি যেন থামতে চায় না।

সেদিনটি আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। সেদিনই আমি প্রেমাকে মঞ্চ থেকে আমার উপন্যাসের নায়িকারূপে বরণ করে নিয়েছিলাম।

উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত কেরালা যেন এক নর্তকীর মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নৃত্য তার আকাশে-বাতাসে জলে-স্থলে।

চরণতলে নৃত্য করছে তিনটি সাগরের মিলিত জলরাশি। পশ্চিমঘাট, পর্বতমালা থেকে নেমে আসছে নদীগুলি উচ্ছল তরঙ্গভঙ্গে। পশ্চিমে সুনীল আরবসাগরের জলরাশি নৃত্যের তরঙ্গ তুলে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। সারা অঙ্গ জুড়ে হাওয়ার দোলায় নৃত্য করছে নারিকেল বীথি।

এই পরিবেশে ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃত্যগুলি জন্ম নিয়েছে এখানে। দাসী আট্যম, মোহিনী আট্যম, কথাকলি, কৈকট্টীকলি, তুল্লাল আরও কত কী।

—* আমি 'অমৃত' সাপ্তাহিকের কবি-সম্পাদক মণীন্দ্র রায়ের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁদের পত্রিকায় আমার 'নির্জনে খেলা' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের শেষ পর্বে তিনি আমাকে ডেকে

বলেছিলেন, উপন্যাসটি পাঠক-সমাদর লাভ করেছে, দ্বিতীয় উপন্যাসটি কবে দিচ্ছেন?

বললাম, এবার নিশ্চয়ই শুরু করে দেব।

উনি বললেন, এবারও পাহাড়ের পটভূমি?

আমি হেসে বললাম, কাশ্মীর, কিন্নর, কুলু, কুমায়ুনের পটভূমিতে আমি বেশ কয়েকটা উপন্যাস লিখলাম। এবার সমুদ্র সান্নিধ্যে যাবার ইচ্ছে।

বেশ বেশ, কোন সমুদ্র টানছে?

কৌতুক করে বললাম, সব কটি 'ক'-এর পটভূমিতে লিখেছি, এবারও 'ক' অক্ষরটিকে ছাড়ছি নে।

উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললাম, আরব সাগরের কূলে নাচের লীলাভূমি কেরালা।

উনি বললেন, খুব ভাল, মাস তিনেকের ভেতর কপি পাব তো?

হেসে বললাম, এককালীন না হলেও কিস্তিতে কিস্তিতে পেতে থাকবেন।

— * বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল কেরালায় উপন্যাসের রসদ সংগ্রহ করতে গিয়ে। আমার আনন্দের ঝুলি, অভিজ্ঞতার ঝুলি, পূর্ণ করে দিয়েছে কেরালার মানুষ ও প্রকৃতি। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট ঘটনার কথা স্মরণ করছি।

সেদিন আকাশে চাঁদ উঠেছিল। আমি জ্যোৎস্নাধোয়া বালুতটে ধীবরদের নাচ দেখে প্রেমার বোন সরিতার গাড়িতে কোভালমের দিকে ফিরছিলাম। গাড়ি চালাচ্ছিল সরিতা। রাত তখন অনেকটাই হয়ে গেছে। কোভালমে পৌঁছতে রাত ভোর হয়ে যাবে। আমরা চিন্তিত হলাম। রাতের জন্য একটা আশ্রয় চাই।

হঠাৎ সরিতার মনে পড়ে গেল তার এক বান্ধবীর কথা। স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েটি তার একমাত্র বালিকা কন্যাকে নিয়ে তার পিত্রালয়ে দাদুর আশ্রয়ে থাকে। পাঁচ কিলোমিটারের ভেতরে তাদের নিবাস। অতএব সরিতা আশ্রয়ের খোঁজে সেদিকেই গাড়ি চালালো।

লোকালয় ছেড়ে গাড়ি ঢুকল গ্রামের পথে। একটা নির্জন জায়গায় গাছ-গাছালির পাশে এসে গাড়িটা থামল।

সরিতা গাড়ি থেকে নেমে একটা গেটের কাছে দাঁড়াল। চাঁদের বানভাসি আলোয় দেখা যাচ্ছিল একটা বিশাল বাড়ি আর তার গাছ-গাছালি ভরা প্রাঙ্গণ। বাড়িটি প্রাচীন এবং জীর্ণ। তার প্রধান প্রবেশ দ্বারে একটি বড় লোহার গেট।

সরিতা বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। মাঝে মাঝে তাকে হাত ঘড়িটির দিকে তাকাতে দেখলাম। আমি এ রহস্য ভেদ করতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলাম তার পাশে।

হঠাৎ ঐ বড় বাড়িটি থেকে দেয়াল ঘড়ির আওয়াজ শোনা গেল। ঢং ঢং করে দশটা বাজল। অমনি এক বৃদ্ধ লোহার গেট ঠেলে বেরিয়ে এলেন।

প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তিনি তিনবার হাঁক দিলেন, 'আহারম্ করিক্যাতবর উণ্ডাঙ্গিল ওয়ারিকা।'

কে এখনও অভুক্ত আছ, চলে এসো, চলে এসো।

এই ডাক শোনামাত্রই সরিতা আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি সরিতাকে চিনতে পেরে জড়িয়ে ধরলেন। মুখে নাত্নি ললিতার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন।

সরিতা এবার আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন বৃদ্ধের। আমি নত হয়ে প্রণাম করলাম।

রাতে খাওয়াদাওয়া এবং কিছুক্ষণ আলাপনের পর আমি অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট একটি ঘরে শুতে গেলাম। বৃদ্ধের ঐ অতিথি-আহ্বানের কথাগুলো আমার কানে বারবার বাজতে লাগল। এখনও এ ধরনের মানুষ আছেন জেনে শ্রদ্ধায় আমার অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল।

কিন্তু এই আতিথ্যের ব্যাপারে আরও কিছু জানার বাকি ছিল আমার, যা পরদিন শয্যাত্যাগের পর জানতে পারলাম।

ভোরে উঠে দরজা খুলেই দেখি, আমার দরজার সামনে উঠোনে সরিতার বন্ধু ললিতা আর তার

মেয়েটি আলপনা দিচ্ছে।

রাতে গল্পগুজবে ছোট মেয়েটির সঙ্গে আমার খুব ভাব জমে গিয়েছিল। সে একটি নার্সারি স্কুলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে। ইংরেজিতে বেশ কথা চালিয়ে যেতে পারে।

আমাকে ঘর থেকে বেরোতে দেখেই সে বলল, বড্ড দেরী হয়ে গেল তোমার উঠতে। এদিকে যে আমার অতিথিরা এসে পড়ল বলে।

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে ভাবলাম, কোন বিশিষ্ট অতিথি বুঝি আসবেন এখুনি।

আমার অপ্রস্তুত ভাবটি লক্ষ্য করে ললিতা হেসে বলল, আমার দাদু তুল্লিকে শিখিয়েছেন, অতিথি বলতে শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু পশুপাখি কীটপতঙ্গ সকলেই। একটু পরে আলপনার চালের গুঁড়ো খেতে সারি দিয়ে পিঁপড়েরা আসবে। দাদুর ভাষায় ওরাও আমন্ত্রিত অতিথি। ওদেরও সযত্নে সেবা করতে হবে।

সেদিন ভারতের চিরন্তন স্বরূপটি আমার সামনে উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিল।

কিন্নরী

কিন্নরের একটি উৎসব দেখার বাসনা ছিল। হিমাচলের ওই অঞ্চলটিতে বছরে শতাধিক উৎসব হয়। আমি কিন্তু উখাং উৎসবটি দেখার জন্য আগ্রহী ছিলাম। উখাংকে ফুলেচ উৎসবও বলা হয়। উ অর্থ ফুল। খাং অর্থ ফুল দেখো। সবটুকুর অন্তর্নিহিত অর্থ, ফুলের অন্তরের সৌন্দর্য দেখো। ওই উৎসবটি দেখার জন্য আমি বহুদিন থেকে মনে মনে পিপাসিত ছিলাম।

সিমলা থেকে তাপ্রিতে গিয়ে পৌঁছলাম। ওখান থেকে একটা জিপের ব্যবস্থা করা গেল। আমি সাংলা-য় যাচ্ছি। পাহাড়ী রাস্তা। যেমন বিপজ্জনক, তেমনি সংকীর্ণ। সব জায়গাতে গাড়ি ক্রস করার সুযোগ নেই। সাংলায় প্রবেশের মুখে আমার জিপ বিগড়ে গেল। ড্রাইভার খুটখাট করছে, এমন সময় পেছনে এসে দাঁড়াল আর একটা জিপ। তার আর আমাকে ক্রস করে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। আমি মনে মনে কিছুটা বিব্রত হলাম। মিনিট খানিকও কাটেনি, পেছনের জিপ থেকে নেমে এল এক জোড়া তরুণ-তরুণী। তারাই চালক, তারাই আরোহী। আমি কিছুটা অবাক হয়ে দেখলাম, মেয়েটি অত্যন্ত সপ্রতিভ। সে তার সঙ্গীটিকে নিয়ে আমার জিপের দিকে এগিয়ে এল। ড্রাইভারটিকে কিছু জিজ্ঞেস করে তাকে একপাশে সরিয়ে দিল। এখন গাড়ি নিয়ে পড়ল ওরা দুজনে। মিনিট পাঁচেকের ভেতর গর্জন করে উঠল আমার গাড়ি। আমার ঝুলিতে কমলালেবু আর সিমলা থেকে কেনা মেঠাই ছিল। আমি ওদের দিকে এগিয়ে দিলাম। মেয়েটি আখরোট খাচ্ছিল, পকেট থেকে সেই আখরোট বের করে আমার হাতে দিয়ে দিল। জড়তা নেই, মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

বললাম, সাংলায়। ওখানে একটা উৎসব হয়, সেই উৎসব দেখার খুবই ইচ্ছে।

আপনি উখাং দেখবেন?

আমি কোনও উত্তর না দিয়ে হেসে মাথা নাড়লাম।

আসছেন কোত্থেকে?

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।

মেয়েটি সামান্য সময় কী চিন্তা করে নিয়ে বলল, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের দেশ?

আমি ভাবতেও পারিনি পাহাড়ের পর পাহাড় ঘেরা দুর্গম জায়গায় অবস্থিত একটি অঞ্চলের মেয়ে নেতাজিকে চেনে। আমি খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ওঁকে জানলে কী করে?

ও বলল, এখানকার কাউকে জিজ্ঞেস করলে ওঁর সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে পারবে না, কিন্তু আমার বাবা ছিলেন পাঞ্জাবে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, আমরা ছোটবেলা থেকে ওখানেই মানুষ। তাই নেতাজি ও তাঁর কীর্তি সম্বন্ধে খুব ভালভাবেই জানি।

মেয়েটি অসংকোচে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আমিও নেতাজির কথা স্মরণ করে তার হাত ধরলাম।

একটা ক্রসিং-এর জায়গায় এসে ওর জিপটা এগিয়ে দাঁড়াল। ওকে অনুসরণ করে আমার জিপ চলল সাংলায়।

অপরাহ্ণে আমরা এসে পৌঁছলাম সাংলার তহশিল কামরুতে। প্রথম দর্শনে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। একদিকে কিন্নর কৈলাসের সুউচ্চ শৃঙ্গ, অন্যদিকে তুষারে আবৃত ধবলগিরি। ধবলগিরির কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে বাস্‌পা নদী। স্বচ্ছ নীল জল। যেখানে বোল্ডারে ধাক্কা লাগছে সেখানে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে মুক্তোর দানা। বাস্‌পা মিলনপিয়াসী, সে শতদ্রু-র সঙ্গে মিলনের জন্য তীব্র বেগে ধেয়ে চলেছে। বাস্‌পা-র বামতীরে তুষার পর্বতের সানুদেশে সবুজ পাইনের অরণ্য। চোখ জুড়িয়ে যায়। বাস্‌পার ডানতীরে তৃণাচ্ছাদিত একটি ঢালু ভূমি। তারই ওপরে একটি ডাকবাংলো। তার সামনে এসে আমার জিপ দাঁড়াল। কেবল আমার নয়, নীলম-এর জিপও। আগে বলা হয়নি, মেয়েটির নাম নীলম নেগী। সে-ই কেয়ারটেকারকে বলে আমার থাকার বন্দোবস্ত করে দিল। কেয়ারটেকারের সঙ্গে ও-ই কথা বলছিল। আমার কাছে এসে বলল, মাত্র দুটো দিন থাকার অনুমতি পাওয়া গেছে। এই উৎসবের সময়ে ডাকবাংলোতে জায়গা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। বাস্‌পার দুই তীরে দুটো ডাকবাংলো, কিন্তু এ সময়ে কোনওটিতে জায়গা পাওয়া দুষ্কর।

আমি হতাশায় ভেঙে পড়ে বললাম, উৎসব শুরু হতে এখনও তিনদিন বাকি। দুদিনের পর আমি কোথায় থাকব? এখানে তো আর কোনও বাড়ি ঘর দেখছি না!

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণটির সঙ্গে নীলম কী যেন আলোচনা করে নিল। পরে বলল, আপনি তো দুদিন থাকুন। একটা ব্যবস্থা যেকোনও রকমে হয়ে যাবে।

ও গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, ওই যে সামনে একটা স্পার দেখছেন, ওইখানে আমার বাড়ি। এখানকার ঘরবাড়ি সবই ওই শৈলশিরাটির গায়ে।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, দুই মহাপর্বতের মাঝখানে ওই শৈলশিরা যেন এক অপূর্ব সেতুবন্ধন।

হঠাৎ ও যেন আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, এই মুহূর্তে আপনাকে আমাদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারছি না বলে আমার খুবই খারাপ লাগছে। আমাদের আত্মীয়-স্বজনে ঠাসা হয়ে গেছে তিনতলা বাড়িখানা। কামরুতে আমাদের বাড়িখানাই সবচেয়ে বড়। তবুও সব আত্মীয়কে স্থান দিতে পারছি না। তরুণটির গায়ে হাত রেখে বলল, এ আমার বন্ধু সুরমঙ্গল। ওর বাবা-মা তীর্থে গেছেন। এখনও ফেরেননি। আমরা আশা করছি ওখানে আপনার থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারব।

পরে আমি নীলমের পরিচয় জেনেছিলাম। এই কামরু অঞ্চলটি রামপুর বুশেহার-এর রাজার সম্পত্তি ছিল। এখানে ওই শৈলশিরায় কাঠের পাঁচতলা দুর্গ রয়েছে। নীলমের পূর্বপুরুষেরা দুদান অর্থাৎ রাজার প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের মেয়ে। এ অঞ্চল যেন পৃথিবীর বাইরের কোনও দেশ। পরে আমি দেখেছিলাম কিন্নরের ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত সুন্দরদর্শন, কিন্তু আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে তাদের সংযোগ বড় একটা নেই। নীলম পাঞ্জাব থেকে ফিরে এসে বাচ্চাদের জন্য একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তৈরি করেছে। কাঠের দু তিনটি ঘর। লম্বা টানা টিনের ঝকঝকে ছাউনি দেওয়া। সে তিন-চারজনকে জোগাড় করেছে। তারা অক্লান্ত চেষ্টায় গড়ে তুলছে সাংলার ছেলেমেয়েদের।

সুরমঙ্গলের ঘরে দিব্যি আরামে রয়েছি। নীলমের বাড়িতে দুবেলা পাত পড়ছে আমার আর সুরমঙ্গলের। সবচেয়ে মজা, চমরী গাইয়ের দুধে তৈরি চা। ভোরবেলায় অতি ঠাণ্ডায় বিছানা ছাড়তে আমার কষ্ট হয়। তাই ভোরের চা-টা সুরমঙ্গলই নীলমের বাড়ি থেকে কেটলিতে করে নিয়ে আসে। দুপুর আর রাতের আহার প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের বাড়ি গিয়ে। যদিও এখন আর কেউ প্রধানমন্ত্রী নেই। নীলমের মা অসাধারণ মহিলা। ভারী স্নেহপ্রবণ। বিদেশি বলে বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই। দিব্যি আনন্দে কয়েকটি দিন কাটল।

এবার মুখোমুখি হলাম আমার স্বপ্নের উৎসবের। ১৯ ভাদ্র (৪ সেপ্টেম্বর) শুরু হল উখাং উৎসব। এ উৎসব চলবে তিনদিন ধরে। কিন্নরবাসীরা প্রতি উৎসবেই অপর্যাপ্ত ফুলের ব্যবহার করে। কিন্তু একমাত্র ফুলকে নিয়ে উৎসব এই উখাং বা ফুলেচ।

৪ সেপ্টেম্বর অনেক ভোরে সুরমঙ্গলই আমাকে উঠিয়ে দিল। আমিও উৎসব দেখার জন্য তখন মনে মনে প্রস্তুত এবং উত্তেজিত।

ও বলল, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে।

কোথায়?

ফুল সংগ্রহ করতে।

বললাম, ঠিক আছে চল। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব।

আমরা বাস্‌পা নদীর ব্রিজ পেরিয়ে তুষার পাহাড়ের তলার বনে ঢুকলাম। ওই বন ক্রমশ ধাপে ধাপে তুষার পাহাড়ের চূড়ার দিকে অনেকটা উপরে উঠে গেছে। সুরমঙ্গল ফুল তোলার জন্য বড় একটা ঝাঁপি সঙ্গে নিয়েছিল। পাহাড়ী বনে যে এত অজস্র বিভিন্ন রকমের ফুল থাকে, তা আমি জানতাম না। ও ফুলগুলোর নাম বলে বলে তুলছিল, আমিও তাকে সাহায্য করছিলাম ফুলতোলার কাজে। রঙল, লোসকার্চ, খাসবল, গালচি—আরও কত নামের ফুল।

আমি বললাম, নীলমকে সঙ্গে নিলে ভাল হত।

ও বলল, এ উৎসবে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ফুল তোলার নিয়ম নেই। ওই দেখ, সব ছেলেরা লাইন দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ফুল তোলার কাজে লেগে পড়েছে।

উপচে পড়ল আমাদের ঝাঁপি। বেশ কিছু সময় পরে বনের একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে আমরা ফিরে চললাম।

সুরমঙ্গল বলল, গ্রামের প্রতি বাড়ি থেকে অন্তত একজন করে ফুল তুলতে এসেছে।

বন থেকে বেরোবার পথেই পুরোহিত শ্রেণীর একটি লোককে আমরা দেখতে পেলাম। লোকটি যেন আমাদেরই অপেক্ষায় ছিল। সুরমঙ্গল বলল, উনি মাহাসু দেবতার পুরোহিত। লোকটি এগিয়ে এসে প্রথমেই কতকগুলো মন্ত্র পড়ে পাহাড়ের আত্মার পুজো করল। তার সঙ্গে পূজা পেলেন দেবী কালিকা। এঁরা যেন পুষ্প সংগ্রহকারীদের সঙ্গে নেমে আসেন মেলা প্রাঙ্গণে—এমনি কল্পনা করা হয়।

এবার পুষ্পসংগ্রহকারীরা তাদের সংগৃহীত ফুলের ঝাঁপি মেলাপ্রাঙ্গণের ঠিক ওপরের একটি গুহায় রেখে দিল। ওই গুহাটিকে বলে উদাব্রো।

পরে আমি ছাড়া সকলে উখাং উৎসবের বিশেষ গান গাইতে লাগল। অবশ্য গান না গাইলেও আমি ওদের সঙ্গে গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে লাগলাম। পরের দিন সকালে সমস্ত গ্রামবাসী পাহাড়ের ওপর বনের ভেতরে তাদের ডোগ্‌রিতে উঠে গেল। এই ডোগ্‌রি হল কামরুবাসীদের গ্রীষ্মাবাস। উৎসবের দ্বিতীয় দিন দুপুরে সবাই রান্নাখাবার নিয়ে ওখানে যায় এবং ওখানেই আনন্দে খাওয়া দাওয়া করে। খাওয়ার শেষে মধ্যাহ্নে সবাই মিলিত হল একটি বিশেষ জায়গায়। সেখান থেকে বদরিনাথ ও মাহাসুকে মেলাপ্রাঙ্গণে শোভাযাত্রা করে নানারকম বাদ্যিবাজনা বাজাতে বাজাতে নিয়ে আসা হল। বদরিনাথের গ্রোকচের ওপরে ভর হয়। সে ওই মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় পুষ্পসংগ্রহকারীদের ভেতর থেকে দুজনকে নির্বাচন করে। তারা দুজনে গিয়ে উদাব্রো থেকে তাদের ফুলে ভরা দুটি ঝাঁপি নামিয়ে আনে। সেই ফুল দেবতার পুরোহিত মেলা প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট বুশেহারের রাজাকে উপহার দেয়। গ্রোকচ আগামী ফসলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার কথা শোনায়। এরপর ফুলসংগ্রহকারীরা তাদের নিজের নিজের ঝাঁপি নিয়ে প্রিয়জনদের উপহার দেবার জন্য ঘরের দিকে চলে যায়। সন্ধ্যা থেকে শুরু হল নাচ আর গান। নাচ, গান নইলে কিন্নরের কোনও উৎসবই সম্পূর্ণ নয়। গ্রাম দেবতাকে দোলনায় বসিয়ে দোল দেওয়া হয়। পরস্পরকে রাঙিয়ে দেওয়া হয় আবিরে। সাংলার দেবতা নাগেশ।

কথায় আছে, কিন্নরকণ্ঠ। ওখানে কিন্তু আমি কিন্নরের গলায় গান শুনিনি, কিন্নরীদের উচ্চগ্রামী কণ্ঠের সুরেলা গান কানের ভেতর দিয়ে সত্যি মর্মকে আলোড়িত করে। অবশ্য, নাচে পুরুষ ও মেয়ে উভয় সম্প্রদায়ই।

নীলম কিন্তু আজ বিলিতি পোশাক ছেড়ে স্বদেশি পোশাক অঙ্গে তুলে নিয়েছে। আজ সে সবার রঙে রং মিশিয়েছে। একে সুন্দরী, তার ওপর পরেছে তাপ্রু-সে-দোরি, চমৎকার এমব্রয়ডারি করা পোশাক। গায়ে জড়িয়েছে সুন্দর ফুলহাতা ব্লাউজের মতো ছোলি। সবার ওপরে জড়িয়েছে দারুণ কাজ

করা একটি শাল, তাপ্রু-সে-ছানলি। পায়ে ভাঁজ করা জুতো—তাপ্রু-সে-বাল-জানু-পোনো। আর সুরমঙ্গল পরেছে উলেন ট্রাউজার মানে ছামু-সুতান। গায়ে জড়িয়েছে উলের শার্ট, ছামু-কুর্তি। তার ওপর ছুবা—লম্বাকোট। আর এই কোটের ওপরে পরেছে জহর কোটের মতো ছামু-বাস্কট। দুজনেই পরেছে টুপি—থেপাং। একজন নীল আর একজন বাদামী রঙের থেপাং।

পরের দিন মন্দিরপ্রাঙ্গণ 'সম্থং'-এ শুরু হল নাচ আর গান। ছেলেমেয়েদের ঘুরে ঘুরে অপূর্ব নাচ।

সন্ধ্যায় নাচের শেষে সুরমঙ্গল আমার কানে ফিসফিস করে বলল, আজ একটু রাত জাগতে পারবে?

কেন নয়? তুমি বললেই পারব।

আমি, তুমি আর আমাদের বান্ধবী নীলম, তিনজনে মিলে এ রাতটুকুর মতো উধাও হয়ে যাব।

কোথায়?

প্রশ্ন কোরো না ভাই, সব দেখতে পাবে। কেবল আমাদের দুজনকে অনুসরণ করবে তুমি।

রাতে পাহাড়ে উঠলাম। বনের পথে আমার হাত ধরে নিয়ে চলল সুরমঙ্গণ। একটি ত্রস্ত হরিণীর মতো আমাদের আগে-আগেই উঠে চলেছে নীলম। ফুলসংগ্রহ করতে এসেছিলাম এই পথেই। পরের দিন ভোজ খেতে যে ডোগ্‌রি বা গ্রীষ্মাবাসে এসেছিলাম আজ সেখানে এসে উঠলাম তিনজনে। আশ্চর্য! সারাদিনের ভেতর কখন এত ফুল এখানে রেখে গেছে সুরমঙ্গণ। সে ফুলের মালা কঙ্কণে সাজিয়ে দিল নীলমকে। অপূর্ব করে ফুলের একটি মালা জড়িয়ে দিল তার লম্বা বিনুনিতে। সেদিনই আমি ওদের মুখে শুনলাম, নীলম ওর বাগদত্তা।

আমি ক্ষোভের সঙ্গে জানালাম, আজ তোমাদের এই আনন্দমুহূর্তে আমাকে এখানে নিয়ে আসা ঠিক হয়নি। অন্তত আমি আগে জানলে আজ রাতে এখানে আসতাম না।

সঙ্গে সঙ্গে দুজনে আমার হাত ধরে বলল, সে কী, তুমি তো আমাদের বন্ধু। তোমার কাছে তো গোপন কিছু থাকার কথা নয়।

তবুও তোমাদের একান্ত নিভৃত মিলনের জায়গায় আমার উপস্থিতি....।

কথা আর শেষ হল না। সুরমঙ্গল বলল, তুমি এখানে থাকবে। আমরা থাকব না। একটি ঘণ্টার মতো আমাদের দুজনকে ছুটি দিতে হবে।

আমি দুহাত তুলে বললাম. শুধু একটি ঘণ্টা কেন, যতক্ষণ খুশি তোমরা বনের ভেতর ঘুরে বেড়াও।

ওরা হাসতে হাসতে, হাত নাড়তে নাড়তে, বনের আঁকাবাঁকা পথ ধরে বাস্‌পা নদীর দিকে নেমে চলে গেল।

দিনমানে এখানে সুচিত্রিত প্রেমের প্রজাপতি গাছের ফাঁক দিয়ে উড়তে উড়তে ফুলের মধু খেতে খেতে কলস্বনা বাস্‌পা-র দিকে উড়ে চলে যায়। রাতে নীলাভ সাদা ডানা জোনাকি অপূর্ব নাচ নাচতে নাচতে ওই দুটি প্রেমিক-প্রেমিকার মতো গাছের ফাঁক দিয়ে নেমে যায় পাহাড়ের সানুদেশে, অরণ্য যেখানে থমকে থেমে গেছে বাস্‌পা-র কূলে এসে। যেখানে নুড়ির নূপুর বাজিয়ে, নীল শাড়ি গায়ে জড়িয়ে ছুটে চলেছে বাস্‌পা তার প্রেমিক শতদ্রুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে।

আমি শুনছি ওদের গান, দূর থেকে ভেসে আসা গানের কলি। না, অর্থবহ গানের কোনও কলি নয়, সঙ্গীত শুরুর প্রাথমিক আলাপ—

গুলি গোহনা
হায়া বিহনা
দশংস বিনা।

এরপর শুরু হল অর্থবহ গানের কলি। ওরা তাই শুরুও করে দিয়েছে, কিন্তু সে কথার অর্থ আর আমার বোধগম্য হচ্ছে না। সে প্রেমের সঙ্গীত মিশে যাচ্ছে রূপের জগৎ থেকে অন্তরীক্ষলোকে।

আমার কিন্নরী উপন্যাসের নায়িকা ঐ সুরের পথ বেয়ে একসময় আবার নেমে এলো আমার অন্তরে।

ফরেস্ট বাংলো

ভারতের অন্যতম বিশাল অরণ্য, সিংভূম জেলার সারাণ্ডা। সাতশো (আটশো) পাহাড়ে ঘেরা গহন গভীর অরণ্যালোক। উপত্যকার কোলে পাহাড়তলিতে আদিবাসী কোল, মুণ্ডা, হো, ওরাওঁ নারীপুরুষের সংসার। তারা চাষ করে ধান মকাই ফলায়। সরকারী ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে ঠিকাদারের অধীনে গাছকাটার কাজ করে।

আর একটি বড় কাজের সঙ্গে তারা যুক্ত হয়ে আছে। পাহাড় ফাটিয়ে আয়রন ওর সংগ্রহের কাজ। এই কাজের জন্য ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানী গুয়াতে একটি শৈলশহর তৈরী করেছিল। চারদিকে শাল মহুয়া হেসেল বীজা শিমূলের ঘন বসতি। তারই মাঝখানে চমৎকার ছবির মত একটি শহর। ছোট বড় অগুনতি বাড়ি, হাসপাতাল, লাইব্রেরী, খেলার মাঠ, দোকান পাট ইত্যাদি। অফিসার থেকে জমাদার পর্যন্ত সকলের জন্যেই সারি সারি বাংলো, অফিস ঘর, বাগান, পার্ক, কুলি-ধাওড়া। কুলি কামিনের থাকবার জন্য ধাওড়াগুলো সব পাহাড়ের মাথায়। একদিকে সুসভ্য নরনারীর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কলের জল, বিদ্যুত ইত্যাদির আধুনিক আয়োজন, ঠিক তার বিপরীত দিকে আদিম অরণ্যের সুবিস্তীর্ণ সংসার। সেখানে চন্দ্র সূর্য দীপ জ্বালে, নদী ঝরনা জল ঢালে। ব্যাঘ্র, হস্তি, সম্বর, বাইসনদের অবাধ লীলাক্ষেত্র। তারই মাঝে আদিবাসীদের সহজসুন্দর জীবন-যাত্রা। উৎসবে প্রমত্ত হয় ওরা। মাদল বাজে ধিতাং তাং। বাঁশুরিতে সুর ওঠে। কোমর ধরে নাচে। মহুয়া-মদে মাতাল হয়। ছল চাতুরী নেই। ব্যভিচারের গন্ধ পেলেই ওরা ক্ষেপে যায়। ওদের হাতের অস্ত্র তখন উদ্যত, ক্ষমাহীন। একদিকে নতুন শহর অন্যদিকে নিবিড় বন। কর্মের সেতু বেঁধেছে মানুষ কিন্তু এতে অন্তরের সায় নেই বনবাসী জীবজন্তু, মানুষ জনের।

ডিনামাইট চার্জ করে পাথর ফাটানো হচ্ছে। ব্লাস্টিংয়ের আওয়াজে শাল মহুয়ার ডালে বসে থাকা ঝাঁক ঝাঁক শালিক, টিয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। পাখা ঝাপ্‌টে উড়ে যাচ্ছে সারজম গাছের ওপর থেকে বন মোরগ আর সারোময়নার দল।

সভ্য মানুষ ছিনিয়ে নিচ্ছে জীবজন্তু, পাখপাখালি, গাছগাছালি আর আদিম অধিবাসীদের যুগ যুগান্তের অধিকার। নির্বিচারে বৃক্ষ সংহার করে অরণ্যকে বে-আব্রু করছে বনবিভাগ। গজদন্ত, মৃগ আর ব্যাঘ্রচর্মের লোভে চোরাশিকারীরা পশুবধ করছে গুপ্তভাবে।

এই হনন-যজ্ঞে বিপর্যস্ত বনভূমি তবুও ফুল ফোটায় ঋতুচক্রের আবর্তনে। বসন্তে শিমুল পলাশের রক্তিম উচ্ছ্বাস। আম আর শালের মাখন বর্ণ মঞ্জরীর আকর্ষণে ঝাঁক ঝাঁক মধুপের মত্ত গুঞ্জরণ।

নিদাঘে ঝাঁটির ডালে ডালে অজস্র ফুল ফোটে। ফুল তুলে নাকের পাতায় ধরলেই নাকছাবি হয়ে যায়।

বর্ষায় বনপথ গন্ধমধুর হয়ে ওঠে কদম্ব সুবাসে। শরতে নদীর কূলে কূলে শুভ্রকাশের সারিবদ্ধ নৃত্য-দোল। আকাশ গঙ্গায় কাশ-শুভ্র বকের পাঁতির সঞ্চরণ।

পাহাড়ের কোলে কাঞ্চনফুল ফোটে মাইলের পর মাইল জুড়ে। সাদা, বেগুনি, গোলাপী ফুলের কি দৃষ্টিনন্দন, মনোহরণ শোভা।

এ অঞ্চলে ওমরি গাছে বেগুনি ফুল ফোটে। তাকালেই চোখের তারা তির্ তির্ করে কাঁপে আনন্দে, আবেগে। গাছটার নাম 'ওমরি' না হয়ে 'আমরি' হওয়াই উচিত ছিল।

শীতের হাওয়ায় পাতাঝরারও কি মহিমা। ছোট বড় রাশি রাশি পাতা ঘুরে ঘুরে ভূমি স্পর্শ করছে। পত্রাঞ্জলিতে ভূমাতাকে যেন নমস্কার নিবেদন করছে সারি সারি বনস্পতি।

শীতের নৈশ আকাশে হীরের দ্যুতি ছড়িয়ে তাকিয়ে থাকে নক্ষত্রগুলি। মনে হয় করুণাময় দেবতাদের চোখ অরণ্যভূমির প্রসুপ্ত জীবকুলকে অবলোকন করছে।

ভোরবেলা আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দূরের পাহাড়গুলি কুয়াশার নীলাভ সাদা আলোয়ানে বুক অবধি ঢেকে রাখে। সূর্যের তাপ লাগলে গায়ের আলোয়ান খসে পড়ে।

আদিম পাহাড়ের বুক থেকে নেমে আসা তিনটি নদী সারাণ্ডা বনভূমিকে যুগ যুগ ধরে শীতল

শ্যামল সঞ্জীবিত করে রেখেছে। নদীগুলির কি মধুর শ্রুতি-সুভগ নাম। যেন তিনটি বোনের নাম রাখা হয়েছে মিল দিয়ে। নামের প্রথম অক্ষরটি ব্যঞ্জনবর্ণের আদ্যক্ষর। কোয়েল, কোয়না, কারো। কখনো শ্বেতবসনা সুন্দরী, কখনো বা গৈরিক বসনা সন্ন্যাসিনী।

এই বনভূমিতে, নদীকূলে, শৈল সান্নিধ্যে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত আর জ্যোৎস্না নিশীথে নতজানু হয়ে বসলে জন্মজন্মান্তরের স্পন্দন অনুভব করা যায়। জলে স্থলে অরণ্যে শৈলে, সূর্যের আবর্তন লীলায় উদ্ভূত ও বিবর্তিত হয়েছিল যে প্রাণকণিকা তারই উপস্থিতি অনুভব করা যায় এই দেহ-সত্তায়। অন্তরবাসী চৈতন্যের ওপর সৃষ্টিকর্তার বিমল জ্যোতি এসে পড়ে।

— * সারাণ্ডা বনভূমিতে একবার ডাক্তার শ্রীরঞ্জন ষড়ংগীর আতিথ্য গ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার অনুজ প্রতিম অধ্যাপক ডক্টর পীযূষকান্তি মহাপাত্রের মাতুল ছিলেন ডাক্তার ষড়ংগী। সেই সুবাদে আমরাও তাঁকে মামা বলে ডাকতাম। সুখাদ্যের সঙ্গে অরণ্য-ভ্রমণের সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তিনি।

কয়েকটি দিনরাত্রি আমরা ফরেস্ট রেঞ্জার মশায়ের সৌজন্যে তাঁর জিপটি নিয়ে ঘোরার সুযোগ পেয়েছিলাম। শার্দূল বিক্রীড়িত ছন্দে একটিমাত্র শার্দূলকে দূর থেকে আমরা চলে যেতে দেখেছি। গজবাহিনীকে দেখেছি গজেন্দ্রগমনে বুড়ো বাচ্চা যুবক যুবতী মিলে কারো নদীর কূলবরাবর শুঁড় নেড়ে নেড়ে চলে যেতে।

এক রাতে, তখনও চাঁদ ওঠেনি, নিবিড় ঘন অন্ধকার, জিপ তার হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে পথের ওপর দাঁড়িয়ে গেল। অপ্রশস্ত পথের দুপাশে বড় বড় ঘাস মাথা তুলে আছে। বাঁয়ে বৃক্ষসমাকীর্ণ পাহাড়, ডাইনে গভীর খাদ।

রেঞ্জার সাহেবের নির্দেশে ড্রাইভার সেই খাদের গভীরে স্পট লাইট ফেলল। অমনি লেগে গেল হুড়দাঙ্গা।

খাদের ভেতর জঙ্গলে যেসব প্রাণী রাতের বিশ্রাম নিচ্ছিল, তারা চোখে আলোর ঝলক লাগামাত্রই গা নেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

আমরা কিন্তু ঐ স্পট লাইটের আলোয় অদৃষ্টপূর্ব একটি দৃশ্য দেখতে পেলাম। জ্বলছে, নানা রঙের মণিমাণিক্য জ্বলছে। কে যেন সহসা খুলে দিয়েছে প্রকৃতিদেবীর রত্নভাণ্ডারের দ্বার। হীরে, হলুদ পোখরাজ, রক্ত চুনি আলো পড়েই ঝলসে উঠেছে। জন্তুদের চোখের তারায় হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে আমাদের স্তম্ভিত আর ওদের হতচকিত করে দিয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্তুর চোখের তারায় বিভিন্ন বর্ণের আলোর দ্যুতি। এখনও অনুভব করি, একপাল হরিণের চোখে আলো পড়ামাত্র একমুঠো দ্যুতিময় হীরে কে যেন নীচ থেকে আমাদের চোখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। আমি এমন আকস্মিক অভাবনীয় দৃশ্য জীবনে খুব কম দেখেছি।

— * রহস্যময় সারাণ্ডা বনের পটভূমিতে আমি তিনখানা উপন্যাস লিখেছি। 'ডাক্তার জনসনের ডায়েরি' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৬৮ সালে। পরবর্তীকালে এটি 'বীর্যবতী বীরভোগ্যা' উপন্যাস সংকলনের মধ্যে 'শনিচারি' নামে স্থানলাভ করে। এই উপন্যাস, আদিবাসী এক হো রমণীর ইংরাজ সরকারের বনবিভাগের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের কল্পিত কাহিনী। প্রখ্যাত অভিনেতা জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটারে এটিকে মঞ্চস্থ করেন।

সারাণ্ডার পটভূমিতে দ্বিতীয় উপন্যাস 'ফরেস্ট বাংলো' (১৩৮১) যা বর্তমান সংকলনে স্থান পেয়েছে।

আর তৃতীয় উপন্যাস, এই একই পটভূমিতে রচিত 'অরণ্যলোক', যা যুগল উপন্যাস 'মন অরণ্য'-এর (১৩৯৫) অন্তর্ভুক্ত।

আলোর প্রজাপতি

মোহিনী উপন্যাসের নায়িকা প্রেমা মেননের চরিত্রে দ্বৈত সত্তার উপস্থিতি। ভোগ আর যোগ। পিতা বিজনেস ম্যাগনেট করুণাকরণের আকস্মিক মৃত্যুর পর প্রেমা বিপুল বিত্তের অধিকারিণী হয়। রূপে এবং নৃত্য-কুশলতায় সে বহুজনের হৃদয় হরণ করেছিল। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের একাধিক ধনী মানী জ্ঞানিগুণী তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। তাদের সঙ্গে দিনরাত্রি যাপনে তার কোন কুণ্ঠা ছিল না।

এই ভোগের জীবন থেকে মুহূর্তে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারত প্রেমা মেনন। তখন ধীরে ধীরে তার অন্তর জুড়ে বিকশিত হত আলোর কমল।

গুরু মাধবী আম্মা বলতেন, দেহ আর আত্মাকে যোগযুক্ত করবে, তবেই তোমার দেহের শাখায় শাখায় ফুটে উঠবে আনন্দের ফুল।

আলোর প্রজাপতি উপন্যাসের নায়িকা-চরিত্র লিডিয়ার অবস্থান প্রেমার ঠিক বিপরীতে।

লিডিয়ার ক্ষেত্রে ভোগ থেকে যোগ নয়, সে সাধিকা থেকে সংসারে নীড় রচনার স্বপ্ন দেখেছে।

যে ফুল দেবতার চরণে নিবেদিত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের বাগানে ফুটেছিল, তাকে দোলা দিয়ে গেল মর্তের ধূলিমাখা বসন্ত পবন। পঞ্চশরের বেদনা মাধুরীতে বিদ্ধ হল এক আশ্রম-হরিণী। তার ক্ষতবিক্ষত জীবনের অশ্রুসিক্ত পাঁচালি, এই আখ্যায়িকা।

কাহিনীটি লেখকের কল্পনাপ্রসূত বলে কেউ যেন ভুল না করেন। এর প্রতিটি পর্বই সত্যের ছোঁয়ায় সঞ্জীবিত।

আমার অগ্রজ এক অধ্যাপক এর নায়ক। তিনি তাঁর প্রথম যৌবনে ইংরেজি একটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেন এবং অধ্যাপনার চাকরিটি পান। তাঁর ওপর দেওয়া হয় মিশনারী নানেদের বাংলা শেখানোর ভার।

এইসূত্রে লিডিয়া এবং ফ্লসির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগাযোগ ঘটে।

আমার অগ্রজ অধ্যাপকটি লেখার জগতেও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বইগুলি আমরা কিশোর বয়সেও পড়েছি। তাঁর জীবনের শেষপর্বে তাঁকে উৎসাহ দিয়ে আমি কিশোরদের জন্য একটি বড় কাজ করিয়ে নিয়েছিলাম। কাজটি ছিল সাতটি বৃহৎ ভলিউমে আরব্য রজনীর অনুবাদ। আমি এক প্রখ্যাত প্রকাশন সংস্থা থেকে ঐ গ্রন্থরাজি প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিই।

তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। আমৃত্যু তিনি তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতা ও ভালবাসায় আমাকে পূর্ণ করে দিয়ে গেছেন।

মৃত্যুর বছরখানেক আগে এক সন্ধ্যায় তিনি আমার বাড়িতে এলেন। মুখে ফুটে আছে গভীর তৃপ্তির ছবি।

আমার বাড়িতে এলে ওঁকে ফলাহারে আপ্যায়িত করা হত। আক্ষরিক অর্থে ফলাহার। ফলের প্লেটে বড়জোর একটি সন্দেশ থাকত।

সেদিন এসেই বললেন, আজ আর আমার ফলাহারের ব্যবস্থা কর না। তোমার এখানে আসার আগে আর একজন আমাকে প্লেটভরে ফল খাইয়ে ছেড়েছে।

কে সে ভাগ্যবান দাদা?

ভাগ্যবান নয়, বলতে পার, ভাগ্যবতী।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম দেখে দাদা বললেন, যে আমাকে পাশে বসে নিজের হাতে ফল কেটে খাওয়ালো তার সঙ্গে আমার দেখা পঞ্চান্ন বছর পরে।

আমি আরও বিস্মিত হয়ে সাগ্রহে জানতে চাইলাম, কে দাদা! কোথায় তার সঙ্গে দেখা হল?

পথে, বলতে পারো একটি চার্চের পথে। সে গেটের ধারে দাঁড়িয়েছিল। এবার তুমি অনুমান কর।

আমি ভেবে না পেয়ে অন্য একটি প্রশ্নের অবতারণা করলাম। পঞ্চান্ন বছর পরে তিনি আপনাকে চিনতে পারলেন! তা-ও একটি পথ চলা মানুষকে!

আমি চিনতে পারিনি কিন্তু সে ঠিকই আমাকে চিনে নিল। আমার বাঁ-দিকের কপালে যে চাঁদের

মতো আধখানা কাটা দাগ আছে তাই দেখে ও আমাকে চিনেছে।

একটু থেমে আবার বললেন, তোমাকে আর অন্ধকারে রাখব না, ও আমার ছাত্রী, অনুরাগিণী যাই বল, ফ্লসি।

দাদার কাছে ফ্লসি আর লিডিয়ার কাহিনী আমার আগেই শোনা। লিডিয়ার বেদনাময় মৃত্যুর কথা আমি শুনেছিলাম এবং ফ্লসির সঙ্গে জেনেছিলাম দাদার আর কোনও যোগাযোগ নেই। বইয়ের সেলফ থেকে বহুদিন পরে প্রিয় পুরনো একখানা বইকে টেনে বের করে পাতা খুললে যেমন অনুভূতি হয় তেমনি এক মধুর অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হলাম আমি।

বললাম, সত্যি অভাবনীয় এক সাক্ষাৎকার।

জানো, আমাকে ও প্রথম এসেই হাত ধরল। প্রফেসর, আমি আপনাকে চিনেছি, দার্জিলিঙের ফ্লসিকে কি আপনার মনে পড়বে?

আমি ওর দু-টো হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, ফ্লসি তুমি আমাকে চিনতে পারলে!

হয়ত পারতাম না, কিন্তু ব্যাডমিন্টনের কোর্টে পড়ে গিয়ে আপনি যে মাথা ফাটিয়েছিলেন, তার চিহ্ন এখনও আপনার কপালে রয়ে গেছে।

আমি বললাম, শুধু ওই চিহ্নটুকুই থেকে গেছে? তোমার দু-বন্ধুর অক্লান্ত সেবার কোনও চিহ্নই কি চোখে পড়েনি?

ফ্লসি বলল, পথে দাঁড়িয়ে এসব কথা হয় না, চলুন আমার বাড়িতে।

কে আছেন তোমার বাড়িতে?

আমি এখন একা। স্বামীর অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছে। একটিমাত্র কন্যা, ইউ. কে.-তে স্বামী, পুত্র নিয়ে সংসার করছে।

চার্চের পাশেই ফ্লসির কোয়ার্টার। আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। অতীতের অনেক স্মৃতিচারণ হল। ফলের ঝুড়ি থেকে ফল এনে গল্প করতে করতে প্লেটে ফল সাজিয়ে আমাকে খেতে দিল।

মুখে বলল, আপনি ফল খেতে খুব ভালবাসতেন।

আর তোমরা দু-বান্ধবী ক্লাস শেষ হলে আমার কোয়ার্টারে এসে ফল কেটে আমাকে খাওয়াতে।

একসময় কথা শেষ হল। আমি ওঠার আগে ফ্লসির কাছে জানতে চাইলাম, লিডিয়ার সঙ্গে তোমার শেষ দেখার সময়ে আমার কথা কি কিছু বলেছিল?

আমার কোনও চিঠিতে কি সেকথা আপনাকে জানাইনি?

লিডিয়ার মৃত্যুসংবাদই জানিয়েছিলে, আর কোনও কথা জানতে পারিনি।

ফ্লসি বলল, শেষবার যখন দেখা হল তখন সত্যি ও মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

না না কথাটা ঠিক হল না বরং ও তার বিক্ষত মনটাকে শান্ত করার একটা পথ খুঁজে পেয়েছিল।

কি রকম?

ও বলেছিল, আমি রোজ রাত্রে নতজানু হয়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলি, হে প্রভু, তুমি আমার মনের অন্ধকারকে ঘুচিয়ে দাও, তুমি আমার সব গ্লানি মুছে দাও।

একদিন প্রার্থনা করতে করতে মনে হল, আমার অন্তরে কোন গ্লানি নেই, মনে কোনও অন্ধকার নেই।

অমার বুকের ভেতর থেকে নতুন একটা প্রার্থনা উঠে এল, তুমি আলো, তুমি অন্ধকার। তুমি আনন্দ, তুমি বেদনা। এতদিনে তোমার ভেতরেই প্রভু আমি আমার পরম শান্তি খুঁজে পেয়েছি।

নসীম

আমার মা ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, স্বাধীনচেতা ও সংস্কারমুক্ত। আমার দাদামশায় ছিলেন বিজ্ঞানসচেতন নামকরা এক কবিরাজ। মায়ের মুখে শুনেছি, এক মুসলমান জমিদারবাড়িতে দাদামশায় যখন পাল্‌কিতে চেপে রোগী দেখতে যেতেন তখন আমার বালিকা মাও থাকতেন তাঁর বাবার সঙ্গে পাল্‌কিতে। মুসলমান জমিদারের বাড়িটিকে লোকে বলত দেওয়ান বাড়ি।

মা ঐ বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলো করেছেন তাঁর বালিকা বয়সে। নানা পরবে মায়ের নিমন্ত্রণ আসত ঐ বাড়ি থেকে। উদারচেতা দাদামশায় নির্দ্বিধায় তাঁর বালিকা কন্যাটিকে পাল্‌কিতে করে পাঠিয়ে দিতেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

পরবর্তীকালে মা বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চারটে উপন্যাস লেখেন। তার একটি প্রকাশ করেন বিখ্যাত প্রকাশক রূপা অ্যান্ড কোম্পানি। অন্য তিনটি পাণ্ডুলিপি অবস্থায় থেকে যায়। ঐ পাণ্ডুলিপির একটিতে ছিল মায়ের বালিকা বয়সে দেখা ঐ দেওয়ান বাড়ির নিখুঁত কয়েকটি ছবি। মুসলমান বাড়ির আচার আচরণ, আদব কায়দা, বান্ধবীদের ভালবাসা, বয়স্কা মহিলাদের অকৃত্রিম স্নেহ ও আজানের সুরেলা ডাকের উল্লেখ ছিল তাতে। সাজসজ্জা, অলংকারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাও বাদ যায়নি।

মায়ের শ্বশুরবাড়িটি ছিল প্রাচীন বনেদী রক্ষণশীল পরিবার। কাজের লোকজনের ত্রস্ত পায়ে যাতায়াত, বৈঠকখানায় বাবুদের গানবাজনা ও শিল্পকর্ম, চৌহদ্দির ভেতর পঞ্চরত্ন মন্দিরে নিত্যপূজা, বারোমাস জুড়ে নানা পার্বণ লেগেই থাকত। ছোঁয়াছুঁয়ি জাতপাতের বিচার ছিল এ বাড়িতে। আমার কিশোরী বধূমাতার এসবে অন্তরের সায় ছিল না।

একসময় আমাদের পরিবারে ভয়ঙ্কর আর্থিক বিপর্যয় ঘটে যায়। তার ভেতর কয়েকটি মৃত্যুও সংসারকে তছনছ করে দেয়। অতি অল্প বয়সে স্বামীকে হারিয়ে তিনটি শিশুপুত্র নিয়ে মা অসহায় হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে কাজের লোকদের সরিয়ে দেওয়া হয়। মা নিজের হাতে রান্না শুরু করেন।

সন্ধেবেলা পড়ার শেষে আমরা তিনভাই ছুটতাম রান্নাঘরে। খাবার তাগিদ থাকলেও গল্প শোনার তাগিদ ছিল তার চেয়ে বেশি। মায়ের মুখে একবার যারা গল্প শুনেছে তারা বার বার মায়ের গল্পের আসরে ফিরে ফিরে এসেছে।

মায়ের মুখ থেকে আমরা সেই ছোটবেলা শুনেছি 'কাননকাহিনী', 'নন্দকুমারের ফাঁসি' আর 'বিষাদসিন্ধুর' মন কেমন করা কাহিনীগুলি।

মা এমন আবেগ দিয়ে বিষাদসিন্ধুর সকরুণ কাহিনী বলতেন, যা শুনে চোখের জলে আমার দুটো গাল ভিজে যেত।

মনে হয়, শৈশবের সেই অনুভূতি নানাভাবে সঞ্চারিত হয়েছে আমার সৃষ্টির মধ্যে। সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে থেকে আমি আমার একাধিক উপন্যাসে হিন্দু, মুসলমান আর খৃস্টান প্রেমিক প্রেমিকার মিলন-বিরহের কাহিনী রচনা করেছি।

আমার রিসেপশনিস্ট, আলোর প্রজাপতি, নির্জন নির্ঝর, নসীম প্রভৃতি উপন্যাস এই সাক্ষ্য বহন করছে।

'নসীম' উপন্যাসে মিউজিয়ামের যে পটভূমিটি রচিত হয়েছে তার জন্যে আমি কলিকাতা যাদুঘরের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্যামল চক্রবর্তী মশায়ের কাছে ঋণী। কয়েক বছর আগে তিনি আমাকে মিউজিয়ামের নানা মূল্যবান তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

কাজরী

পথে স্নান সারা হল কোয়েলের শীতল জলে। ছোট-বড় বোল্ডারগুলোকে কখনো ডুবিয়ে, কখনো বা পাশ কাটিয়ে ঘূর্ণি তুলে ছুটে চলেছে কোয়েল। ওর সঙ্গে কয়েকবছর আগেই আমার দেখা হয়েছে সিংভূম জেলার পাহাড়ঘেরা অরণ্যভূমি সারান্দায়। তখন ওর জলে অবগাহনের সুযোগ হয়নি, এবার

প্রাণভরে স্নান করে নিলাম।

দুঃসাহসী ময়ূখ ঘূর্ণির তোড়ে কিছুটা ভেসে গিয়ে একটা বোল্ডার ধরে উঠে দাঁড়াল। ভেজা পোশাকে আকাশের দিকে দুহাত তুলে সে কী নৃত্য! সেই পরিবেশ, সেই দৃশ্য ভোলার নয়।

এখন ময়ূখ মহারাজের হাতে স্টিয়ারিং। উড়ে চলেছে ফিয়েট।

দূরে দেখা যাচ্ছে নেতারহাটের একটা কালোরঙের পাহাড়। কাছাকাছি হতেই ঐ কালোর ভেতর থেকে চোখে ছিট্‌কে এসে লাগল যেন একদলা রক্ত। আসলে ওটা পাহাড়ের এক চিলতে খুব্‌লে নেওয়া অংশ। লাল দগদগ করছে। কবির ভাষায়, 'মহিষাসুরের মুণ্ড যেন'।

হিমালয়ের অতুলনীয় শোভা বারে বারে ঘুরে ঘুরে দেখার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছি। সে যেন স্বর্গলোকের বিশাল মহান চিত্র। কিন্তু বিহারের অরণ্য প্রান্তর আর পাহাড়ের শোভা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে ধ্যানলোকের মহিমা নেই, অফুরন্ত আনন্দলোকের স্পর্শ আছে। মহামূল্য গরদের গরিমা নেই, আছে নক্‌শি কাঁথার চোখ জুড়ানো শোভা।

নেতারহাট ফরেস্ট হাউসের লনে বসে আছি। পাশেই সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে তরুণ শালগাছ। লন থেকে একটা পাহাড়ি ঢাল নেমে গেছে নিচে একখণ্ড মলমলে ঘাসে ছাওয়া সবুজ প্রান্তরে। ঐ এক চিল্‌তে নয়নলোভন প্রান্তরের প্রান্ত দিয়ে বয়ে চলেছে একটা জলধারা। সামান্য কয়েক পা গিয়েই সে লাফিয়ে পড়েছে অনেকখানি নিচে, যেখানে কোকিল-চক্ষু কোয়েল হলুদ, সবুজ চৌকো শস্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে দূরের নীলাভ শৈলশ্রেণীর স্বপ্ন দেখতে দেখতে।

পশ্চিম শালবনের আড়ালে অস্তসূর্য ঢাকা পড়ল। আমি পায়ে পায়ে উদাসী হাওয়ার ভেতর দিয়ে জঙ্গলের দিকে গেলাম।

দুটি যুবক আর একটি যুবতী বেরিয়ে এলো জঙ্গলের ভেতর থেকে। ওখানে বসার আরামদায়ক একটি জায়গা আছে। সম্ভবতঃ সূর্যাস্ত হয়ে যাওয়ায় সেখান থেকে ওরা উঠে এলো। মনে হল, ওরা আমাদের ওপরের বাংলোটার দিকে যাবে।

তিনজনের মুখেই শিক্ষার ছাপ। মেয়েটি কেবল সুদর্শনা নয়, অত্যন্ত লাবণ্যময়ী। শেষ সূর্যের আলো এসে পড়েছিল ওর মুখে। একটা করুণভাবে কিন্তু ফুটে উঠেছিল ওর চোখে। দুই যুবক মেয়েটিকে দু'দিক থেকে ধরে নিয়ে ওপরের কোন বাংলোর দিকে উঠছিল।

আমরা তিনদিন ছিলাম। তিনটি সূর্যাস্তের মুহূর্তে এ ছবি আমার চোখে পড়েছে।

শেষদিন সূর্যাস্ত দেখতে যাবার সময় আমার সঙ্গী ছিলেন বাংলার কেয়ারটেকার মশায়। তাঁর মুখে শুনলাম, ওরা তিনজনই নাকি ডাক্তার। অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মেয়েটি বড় রকমের সঙ্কটজনক কোন অসুখে ভুগছে। তার ইচ্ছানুযায়ী বন্ধুরা তাকে নিয়ে এসেছে এখানে। পনেরো দিন হল তারা এসেছে। কোন কোন রাত নাকি বন্ধুরা পালা করে জাগছে মেয়েটির পাশে।

গাড়িতে যেতে যেতে 'কাজরী'র প্লটটি তৈরি হয়ে গেল! ঈশ্বর করুন, আমার প্লটের পরিণতি যেন কাজরীব জীবনেব সঙ্গে না মেলে।

রিসেপশনিস্ট

সেবার কাশ্মীর যাত্রায় বানিহালের টানেল পেরোবার পর একটি আশ্চর্য সূর্যাস্ত দেখেছিলাম। এমনটি আমি আর কখনো দেখিনি।

একখণ্ড কালো মেঘের আড়াল থেকে মাথা তুলে জেগে উঠছিল একটি সুবর্ণ নির্মিত রথের চূড়া। তারপরেই ফুটে উঠল, এক জ্যোতির্ময় অশ্বারোহীর রূপরেখা।

সেদিন বাঁদিকের জানালা ঘেঁষে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই এই অপার্থিব দৃশ্যটি দেখেছিলেন। তাঁদের ভেতর কোন কোন যাত্রীর মুখ থেকে উল্লাসের ধ্বনিও শোনা গিয়েছিল। কিন্তু জ্যোতির ঝলক দেখলেও সবার দৃষ্টিতে হয়তো অশ্বারোহী সূর্যের মূর্তিটি ধরা পড়েনি।

শ্রীমতী আমার ডানদিকে বসেছিল। তাকে দৃশ্যটা দেখিয়ে সূর্যের রূপকল্পনার ইঙ্গিত দিতেই মুহূর্তে ধরে ফেলে দারুণরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগল। আমি জানলার ধারের সিটটা ছেড়ে দিয়ে ওকে ভাল করে দেখার সুযোগ করে দিলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার সামনের সিটে বসে থাকা বোরখা পরা একটি মেয়ে মুখের বোরখাখানা তুলে একটুখানি ঘাড় কাৎ করে আমার শ্রীমতীর দিকে তাকাল। দেখলাম, মুখখানা সদ্য ফোটা পদ্মের মত, তাতে এক ঝলক হাসি। মেয়েটিকে দেখে আঠারো বছরের বেশী হবে বলে মনে হল না।

শ্রীমতীও তাকে দেখে মুখে খুশির রেখা ফোটাল। মনে হল, দুজনে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে চায়।

মেয়েটির পাশে বসেছিলেন কাঁচাপাকা দাড়িওলা এক মুসলিম ভদ্রলোক। মনে হল, ষাটের কাছাকাছি বয়েস।

কিছুদূরে সন্ধ্যার মুখে একটা স্টপেজে বাস দাঁড়াতেই আমি ওই মুসলিম ভদ্রলোকটিকে আমার কাছে বসার জন্য অনুরোধ জানালাম। বললাম, আপনি আমার সিটে এলে ওই দুই ভদ্রমহিলা পাশাপাশি বসে গল্প করে যেতে পারবেন।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। কথা বলে জানলাম, পরমাসুন্দরী মেয়েটি ওঁরই কন্যা।

বাস চলতে শুরু করল। কিছু সময়ের ভেতরেই দেখলাম দুজনে বেশ গল্পে মশগুল হয়ে গেছে।

কথা বলে জানলাম, ভদ্রলোকের নাম নুর মহম্মদ। মাতৃহারা কন্যাটিকে নিয়ে উনি বাটোটে এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন। বৃত্তিতে শালকর। দো-রোখা শালের অপূর্ব সব কাজ করে উনি সরকারি পুরস্কারও পেয়েছেন।

আমার শিল্পী মানুষটির সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল।

আমি ওঁর কাছ থেকে একসময় জানতে চাইলাম, আপনার স্ত্রী কতদিন গত হয়েছেন?

ঠিক দশ বছর।

আপনি আর সাদি করেননি?

ভদ্রলোক উদাস গলায় বললেন, না। আমি আমার স্ত্রী-কে বড় ভালবাসতাম, তাই নতুন করে আর সাদির কথা ভাবতে পারি না। জানেন, আমার এই শাল তৈরির কাজে উনি আমাকে প্রচুর সাহায্য করতেন। উনি নিজেও একজন দক্ষ শালকর হয়ে উঠেছিলেন।

আপনার মেয়ে বাবা মায়ের মতো শালের কাজ করে না?

এই বয়সে দারুণ সব কাজের হাত হয়েছে ওর। রঙের সঙ্গে রঙের মিল দেওয়ার ব্যাপারে ও ওস্তাদ। সত্যি কথা বলতে কি, ওর চোখ আমাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে।

ওঁর সঙ্গে দীর্ঘ বাসযাত্রায় কথা বলে আমি একটি বিচিত্র তথ্য জানতে পেরেছিলাম। ভদ্রলোকের ঠাকুরদাও ছিলেন নামকরা শালকর। তিনি তীর্থযাত্রী এক বিধবা মহিলাকে প্রবল বিপর্যয়কর ঝড়ের মুখে লিডারের জলে ভেসে যেতে দেখেছিলেন। অচেতন তরুণী মহিলাটিকে তিনি উদ্ধার করে ঘরে নিয়ে আসেন। জ্ঞান ফিরলে তিনি সসম্মানে মহিলাকে তাঁর বাড়িতে রেখে আসবার কথা বলেন।

সে যুগে প্রবল জাতিভেদ ছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণ কন্যা মুসলমানের ঘরে কাটিয়ে এসেছে এটা সমাজ সহজ মনে মেনে নেবে না। তাই ভদ্রমহিলা নিজেই আর ফিরে যেতে চাইলেন না। আমার ঠাকুরদা সেই বিধবা হিন্দু কন্যাকে সাদি করেছিলেন। তাঁর রক্ত আমাদের দেহেও বইছে।

প্রায় রাত ন-টায় প্রবল বৃষ্টির ভেতর আমাদের গাড়ি শ্রীনগরে গভর্নমেন্ট গেস্টহাউসের বিরাট প্রাঙ্গণের ভেতর ঢুকল।

গেস্ট-হাইসের বাইরে প্রায় অন্ধকার। অধিকাংশ জায়গায় ঝড়ে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

গাড়ি থেকে নামামাত্রই আমার মনে হল, একরাশ বরফ শীতল জলের মধ্যে আমি পড়ে গেছি। মালপত্র পোর্টারের মাথায় তুলে দিয়ে আমি দাঁতে দাঁত চেপে শ্রীমতীর হাত ধরে কোনওরকমে গেস্ট-হাউসের দাওয়ায় পৌঁছলাম। আগে পিছে যাত্রীদের নিয়ে প্রচুর গাড়ি এসেছে। আমার মনে হল, আমি

এক জনসমুদ্রের মাঝে এসে পড়লাম।

জায়গার জন্য তখন সবাই হাহাকার করছিল কিন্তু সমস্ত গেস্ট-হাউস বুকড্ হয়ে গেছে।

একে শরীরের এই অবস্থা তার ওপর আর একটি সংবাদ আমাকে পথে বসিয়ে দিয়ে গেল। শ্রীনগরের হোটেল আর হাউসবোটগুলো নাকি একেবারে ফুল হয়ে গেছে। তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

বিশাল করিডোরে বহু মানুষ তখন বেডিংগুলো ছড়িয়ে ফেলে তার ওপর বসে গেছে। কতকগুলি যুবক কেবল ইতস্তত ছোটাছুটি করছে, তাদের চোখেমুখেও উদ্বেগের ছায়া।

আমি তখন কিছু ভাবতে পারছিলাম না। একটু চা কিংবা নিদেনপক্ষে গরম জল হলে আমার ভেতরের কাঁপুনিটা হয়ত থেমে যেত। কিন্তু চারদিকে তাকিয়েও তার কোনও সম্ভাবনাই আমি দেখতে পেলাম না।

আমি কাঁপছি আর শ্রীমতী আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে আছেন। এমন অসহায় অবস্থায় আমি আর কখনও পড়িনি।

বাসে যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তাঁরা আগেই বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। হঠাৎ আল্লার প্রেরিত দূতের মতো নুর মহম্মদ আমাদের সামনে এসে হাজির হলেন। সঙ্গে কন্যা সাকিনা।

আমি যেন ভাসতে ভাসতে একটা তীরের সন্ধান পেলাম।

নুর মহম্মদ বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় লোকমুখে জেনেছিলেন, গেস্ট-হাউসে জায়গা নেই। এমনকি কোনও হোটেলেও। তাই তিনি আমাদের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে ছুটে এসেছেন।

একটা টাঙ্গাতে করে নুর মহম্মদ আমাদের আলো-আঁধারি রাস্তার ওপর দিয়ে কোথায় নিয়ে চললেন।

হঠাৎ একটা সরাইখানার পাশে এক চিনার গাছের তলায় টাঙ্গা দাঁড়িয়ে পড়ল। নুর মহম্মদ নেমে গেলেন। কিছুক্ষণের ভেতরেই এক মগ গরম চা নিয়ে এলেন। একটা গ্লাসে খানিকটা চা ঢেলে আমার শ্রীমতীর হাতে ধরিয়ে দিলেন। বাকি মগটা আমাকে দিয়ে বললেন, খুব গরম আছে, খেয়ে ফেলুন।

আমি প্রায় সবটুকু চা গিলে ফেললাম। ভেতরের কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেল।

উনি আবার উঠে এলেন টাঙ্গায়। অনেক পথ ঘুরে ঝিলমের কূলে টাঙ্গা এসে দাঁড়াল। দেখলাম, পার-ঘাটটা মোটামুটি আলোকিত। দু-তিনটে শিকারা ঝিলমের কূলে ভেসে আছে। তার একটাতে চেপে সাকিনা কোথায় যেন চলে গেল। ভদ্রলোক টাঙ্গার ভাড়া চুকিয়ে দিলেন, কিছুতেই আমাকে একটি পয়সাও দিতে দিলেন না।

কিছুক্ষণের ভেতরেই ফিরে এল সাকিনা। সে তার মামার হাউসবোট 'মে-ফ্লাওয়ার'-এ আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে এসেছে।

সে রাতে আমরা সবাই ঝিলমের ওই হাউসবোটে রইলাম। নুর মহম্মদ, সাকিনাও সেই রাতে আর বাড়ি গেল না।

আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তিনদিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আমি আর কোথাও যেতে পারিনি। সাকিনাদের সেবার কথা আমি ভুলতে পারব না।

আমি সুস্থ হওয়ার পর সাকিনা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি গিয়েছিল। নুর মহম্মদ আগেই নিজের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন।

আমার অসুস্থতার কয়েকদিন শ্রীমতীর সঙ্গে মিলে সাকিনা যেভাবে আমার সেবা করেছে তা ভোলার নয়।

শ্রীমতীর কাছে শুনেছিলাম, সাকিনার মতো মেয়েও ভাগ্যবিড়ম্বিতা। তার স্বামী কার্পেটের ব্যবসা করত। সেই সূত্রে সে জার্মানিতে যায়। কিন্তু সেখান থেকে সে আর ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজ করে ওরা শুধু এই খবরটুকু পেয়েছিল, সেখানে এক জার্মান রমণীকে বিয়ে করে সে থেকে গেছে।

নতুন বিয়ে করা এমন সুন্দর একটি মেয়েকে কেউ পরিত্যাগ করতে পারে এ আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

সাকিনা কিন্তু আর নতুন করে সাদির ভেতর নিজেকে জড়ায়নি। কাজের ভেতরেই সে এখন মগ্ন

হয়ে থাকে।

পাঁচ বছর পরে দ্বিতীয়বার কাশ্মীর গিয়ে আমি গেস্ট-হাউসে জায়গা পেলেও থাকিনি। ঝিলমের সেই মে-ফ্লাওয়ার হাউস বোটে থাকব বলে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম, হাউসবোট বিক্রি করে দিয়ে আগের মালিক চলে গেছে। তবুও আমি ওই হাউসবোটেই থেকে গেলাম।

পাঁচ বছর আগেকার সেই ঘরগুলি আমার স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সহোদরা বোনের মতো সাকিনা যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছিল সেসব স্মৃতি বারবার মনে পড়তে লাগল।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার নতুন মালিকদের কাছ থেকে আমি নুর মহম্মদ কিংবা সাকিনার কোনও সংবাদ সংগ্রহ করতে পারলাম না। তবে ওরা আমাকে আগের মালিকের একটা হদিশ দিল।

আমি একদিন খোঁজ করে সাকিনার মামার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। তারা আমার পরিচয় পেয়ে দারুণ খাতির করল। ওদের কাছ থেকেই পেলাম সাকিনার খবর। নুর মহম্মদ গত হয়েছেন। সাকিনা পহেলগাঁও-র একটি হোটেলে রিসেপশনিস্ট-এর কাজ করছে। ঠিক রিসেপশনিস্টের কাজ বললে ভুল হবে, ওই হোটেলে একটি শাল বিক্রির কাউন্টার আছে, তারই পরিচালনার ভার নিয়ে রয়েছে।

আর একটি খবর শুনে সাকিনার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। সে আর সাদি করেনি। একটি কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েকে প্রতিপালন করছে।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে!

ওরা যা বললেন, তার থেকে বুঝলাম, কয়েকজন হিপি স্ত্রী পুরুষ লিডার নদীর কূলে তাঁবু টাঙিয়ে কিছুকাল বসবাস করছিল। তারা যেদিন চলে যায় সেদিনই সন্ধ্যায় সাকিনা লিডারের জল ছুঁয়ে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ সে একটি শিশুকে কুড়িয়ে পায়। বোঝা গেল, ওই হিপিদের কেউ পরিত্যাগ করে গেছে।

সাকিনা সেই যে তাকে বুকে তুলে নিল, আর বুক থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি।

সাকিনা বলে, ও আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে।

আমি সাকিনাকে দূর থেকে নমস্কার করলাম। আমার রিসেপশনিস্ট উপন্যাসের পটভূমি ও নায়িকা-চরিত্র তৈরি হয়ে গেল।

মোহিনী

কক্ষে ফুলের মত নরম হলুদ আলো ছড়িয়ে পড়ল মঞ্চের ওপর। করতালের ধ্বনি দিতে দিতে মঞ্চে এসে ঢুকলেন গুরু মাধবী আম্মা। পা দুটি তাঁর বিচিত্র আলপনা আঁকতে আঁকতে বৃত্তাকারে এগিয়ে চলেছে। গানের একটি পদ বেজে চলেছে গলায়। তালমের বোলে পায়ের ছন্দে কণ্ঠের সুরে নিখুঁত হারমোনি।

মাধবী আম্মার ঠিক পেছনে ছায়ার মত অনুসরণ করে আসছে মৃগনয়নী প্রেমা মেনন। গুরুর চরণ বিন্যাসের নির্ভুল অনুকরণ করে চলেছে সে। শুধু চরণ নয়, কর-চরণ-বিন্যাস। একটি শ্বেত কুমুদ যেন হাওয়ার ছোঁয়ায় হিন্দোলিত হচ্ছে। আজ মঞ্চে প্রেমার প্রথম প্রবেশ রজনী। পদ্মনাভপুরম প্যালেসের দর্শক আসন পূর্ণ হয়ে গেছে বহু আগে। সহস্র চোখ আন্দোলিত ঢেউ-এর দেহে ভেঙে পড়া সূর্যরশ্মির মত প্রেমার ওপর আছড়ে পড়ছে। কেরালার নৃত্যের আকাশে নতুন নক্ষত্র ফুটে উঠল। গুরু মাধবী আম্মা দর্শকদের সামনে আজ দিয়ে যাবেন সেই নবোদিত নক্ষত্রের পরিচয়।

মোহিনী-নর্তকী প্রেমার পেছনে নাচের অভিনয় করে এগিয়ে আসছে যন্ত্র সঙ্গীতের পুরো দলটি। কেউ বাজিয়ে চলেছে তিথি, কারো মুখের ছোঁয়ায় বেজে উঠেছে মুখবীনা, কেউ বাজাচ্ছে এডাক্কী, কেউ বা বোল তুলছে টপ্‌পু মাদ্দলমে।

মঞ্চ পরিক্রমা শেষ করে দলটি নেমে এল নীচে। প্রদক্ষিণ করল সারা পেক্ষাগৃহ। তারপর একসময় মঞ্চের ওপর ফিরে এল ওরা। মাধবী আম্মা যন্ত্রশিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে বসলেন অর্ধবৃত্তাকারে। থেমে গেছে গান, থেমে গেছে বাদ্য, স্তব্ধ নাটমণ্ডপম্। প্রেমা এগিয়ে এল ধীর পদক্ষেপে। নমিত দেহে দুই করে করল গুরুর চরণবন্দনা। আবার ফিরে গিয়ে দাঁড়াল মঞ্চের মাঝখানে।

বিপরীত মুখে জানু দুটি ভেঙে অর্ধমণ্ডলম্ মুদ্রায়, অর্ধ উপবেশনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে প্রেমা। বুকের ওপর ঈষৎ ব্যবধানে দুটি বাহু নমিত। মাথায় কেশগুচ্ছ বামে চূড়াবদ্ধ। রুপোর চন্দ্রাকৃতি নেট্রিচুটি ঘিরে রেখেছে সেই কেশকলাপ। তার নীচে সাদা মল্লিকা বা মল্লাপ্‌পুর দোসৃতি বেষ্টনী। কানে ঝুলছে ঝুমকোর আকারে কুড়া কাডুকন। মাট্টলের টানে চুলের সঙ্গে বাঁধা। নাকে হীরের মুকুতির ওপর আলো পড়ে ঝলসে উঠছে। নীচে দুলছে মুক্তোর বিল্লাক। গলায় সোনার পুতলিমালা। হাতে হস্তকটকম্। মোহিনী আট্যমের মোহিনীমূর্তি।

সাদা পুডাবা পরে দাঁড়িয়ে আছে প্রেমা। সোনালী জরির পাড় চরণ, কটি আর বক্ষদেশ বেষ্টন করে হারিয়ে গেছে। মুখে মৃদু হাসির আভা। চোখের তারা স্থির। শুধু কালো ভ্রূ দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

শরতের আকাশে হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে এসে দাঁড়িয়েছে একখণ্ড সাদা মেঘ। কিনার ঘিরে সোনার আলোর রেখা। গুরু মাধবী আম্মার কথা মনে পড়ছে প্রেমার। দেহ আর আত্মাকে যোগ যুক্ত করবে, তবেই তোমার দেহের শাখায় শাখায় ফুটে উঠবে আনন্দের ফুল।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাই এতক্ষণ নিজের মধ্যে যোগযুক্ত হচ্ছিল প্রেমা।

এবার চোখের কোণে তাকিয়ে সুর-শিল্পীদের জানিয়ে দিল, সে প্রস্তুত। মুহূর্তে বেজে উঠল সোলকুট্টুর বোল। মাধবী আম্মার কণ্ঠে প্রার্থনার সুর। সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলিত হলে লাগল প্রেমার প্রসাধিত দেহ। রম্‌ঝম্ বেজে উঠল পাদস্বরম্। বোলের বাঁধনে প্রেমা বেঁধে নিচ্ছে দেহখানি। হস্ত, চরণ, নয়ন সব কিছু যেন বোলের তালে ধীর থেকে মধ্যলয়ে, মধ্য থেকে দ্রুত লয়ে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

হস্ত চরণ প্রক্ষেপে নয়ন বিভঙ্গে প্রেমা আজ মোহিনী।

দর্শকের আসনে বসে ইন্দ্র দেখছে প্রেমাকে। তার মনে হচ্ছে সমুদ্র মন্থন শুরু হয়েছে। লক্ষ লক্ষ শৈবাল আর মাছেরা সে দোলায় হিল্লোলিত।

এবার শুরু হয়েছে স্বরযতি। সরগম সাধছেন মাধবী আম্মা. নাচছে প্রেমা। নাচতে নাচতে লয় বাড়ছে আবার কমছে! কটির উর্ধ্বে বাহু বক্ষ আন্দোলিত হচ্ছে।

ইন্দ্র দেখছে কেরালার জ্যোৎস্না ধোয়া আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে নারকেল বৃক্ষের সারি, তারা রাতের হাওয়ায় দুলছে। দীর্ঘ কাণ্ডের ওপর পত্রপুঞ্জ হাওয়ার বেগে ঘুরে ঘুরে দোল খাচ্ছে। প্রেমার দেহ সেই দোলায় দুলছে। তার মেরুদণ্ডটি হয়ে গেছে বৃক্ষের ঋজুকাণ্ড। তার ওপর স্থাপিত বক্ষস্তন যেন সে বৃক্ষের সুপুষ্ট ফল। আর আন্দোলিত বাহুযুগল বৃক্ষের দীর্ঘ পত্রযুক্ত শাখা।

স্বরযতি শেষ হলে শুরু হল বর্ণম্। গান চলেছে। বাসকসজ্জায় সজ্জিত রাধা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে প্রিয়তমের। চোখেমুখে প্রিয় মিলনের উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে অভিনয় করে চলেছে প্রেমা। দর্শকের আসনে বসে প্রতিটি দর্শক ভুলে গেছে তাদের বয়স। মহাকালের নিষ্ঠুর ভাঙনকে যেন নিজের যৌবন দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে প্রেমা। প্রতিটি দর্শককে সে যেন বলছে, মহাকালের বাঁধন মুক্ত হয়ে তুমি এস আমার অনন্ত প্রতীক্ষার পথ বেয়ে। আমার সমস্ত যৌবনের দান আমি তোমার হাতে তুলে দেব বলে অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে বসে আছি। তুমি আমার সেই প্রার্থিত পুরুষ। তোমাকে জরা স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি অনন্ত যৌবনের প্রতিমূর্তি। আমি আমার যৌবন দিয়ে তোমাকে ছুঁয়ে দেব। গানের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে বোল। পল্লবী অনুপল্লবী ছুঁয়ে ছুঁয়ে গানে বাজছে শুধু, এসো এসো এসো, কেন তুমি এখনও উদাসীন!

বর্ণম্-এর পরে স্টেজে নেমে এল ক্ষণিক অন্ধকার। অমনি এক ঝাঁক পারাবত যেন চঞ্চল পাখনায় শব্দ তুলতে তুলতে উঠে চলল আকাশে।

করতালি ধ্বনি যেন থামতেই চায় না।

আবার আলো লুটিয়ে পড়ল মঞ্চে। এবার পদম্। সরগম নেই, বোল নেই। শুধু গানে গানে মনের আকৃতি জানিয়ে চলা। সমস্ত দেহে ফুটিয়ে তোলা সেই আকৃতির আক্ষেপ।

আলেই পায়ুদে কন্না
এন মনম্ আলেই পায়ুদে
উন্ আনন্দ মোহন বেণু গান মদিল....।

তোমার আনন্দ মোহন বেণু-গানে আমার মনে ঢেউ উঠেছে কৃষ্ণ। আমি সেই তরঙ্গে ভেসে চলেছি।

হে বিনোদ মুরলীধর আমি এত করে ডাকছি, তবু কেন তুমি নিশ্চল শিলার মত দাঁড়িয়ে আছ। সময় পার হয়ে যায়, কেন বুঝছ না প্রিয়তম। আমার অসহ্য যন্ত্রণার উপশম, আমার মৃত্যু আজ তোমার সামান্য ইচ্ছার দোলায় দুলছে।

নীলাম্বরীরাগের করুণ মূর্চ্ছনা প্যালেসের মসৃণ দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়ছে শ্রোতাদের বুকের ওপর।

আবার অন্ধকার আবার করতালি আবার আলোর ফুটে ওঠা। এবার প্রেমা যেন পেয়েছে তার আকাঙিক্ষত প্রেমাস্পদকে। তাই আনন্দকে সে আর ধরে রাখতে পারছে না। তিলানার সপ্ততালে সে নিজের খুশীকে নাচের মুদ্রায় প্রকাশ করে চলেছে। অর্থহীন গানের একটা সুর শুধু ভেসে আসছে। সমস্ত দেহ কি যেন প্রকাশের বেদনায় শিউরে মঞ্জরিত হয়ে উঠছে।

বেদনা আশ্চর্যভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে আনন্দে। সমস্ত দেহের কম্পনে, মুখ বিভঙ্গে, কর-চরণ বিন্যাসে ক্ষণে ক্ষণে ফুটে উঠছে দেহের শাখা ভরা বসন্তের পর্যাপ্ত পুষ্প।

কখনো উপবেশন মুদ্রায়, কখনো বা দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে সারা মঞ্চে প্রদক্ষিণ করে চলেছে প্রেমা।

ইন্দ্রের চোখে ফুটে উঠেছে একখানা কদম্বু ভাল্লম। কেরালার ব্যাকওয়াটার বা কায়েলের ঢেউতে ওঠা-নামার খেলা খেলতে খেলতে ভেসে চলেছে সেই সজ্জিত তরণী।

ধীরে ধীরে নেমে আসতে লাগল অন্ধকার আর সেই পাল তোলা তরণী তরঙ্গের দোলায় দুলতে দুলতে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারের আলোড়িত সমুদ্রে।

আলোড়নে তখন পদ্মনাভপুরম্ প্যালেসও উদ্বেলিত। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উঠে পড়েছেন দর্শক আসন ছেড়ে। তাঁরা চঞ্চল পায়ে চলেছেন গ্রীনরুমের দিকে। প্রেমাকে অভিনন্দন জানাতে হবে। শিল্পীকে দিতে হবে তার সৃষ্টির জন্য সাধুবাদ। হয়তবা তন্বী প্রেমার জন্যে আরও বেশি কিছু।

ইন্দ্র কিন্তু দাঁড়াল না, কিংবা গ্রীনরুমের দিকে পা বাড়াল না। মঞ্চকে পেছনে রেখে উৎসাহী জনতার জটলার ভেতর দিয়ে পথ করে বেরিয়ে এল বাইরে।

প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টখানায় ঈষৎ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল সে। হাল্কা ধোঁয়া ছড়িয়ে দিতে লাগল বাতাসে। এতক্ষণ প্যালেস হলে যে ঘোরের ভেতর কাটছিল, সিগারেটের ধোঁয়ায় তার অনেকখানি কেটে গেল।

ক্যালেন্ডারের গণনায় শীতের মাস, কিন্তু নামগন্ধ নেই শীতের। এ প্রদেশের নাকি এই দস্তুর। না শীত না গরম। অর্থাৎ চরম কিছু নেই এর আবহাওয়ায়, শুধু আবহাওয়া কেন মানুষের মনেও। ইন্দ্র কেরালায় আসার আগেই শুনেছিল এসব। নীল নীল আকাশ আর সমুদ্রের মত উদার আর উদ্বেল এ দেশের নারী পুরুষের মন। দিগন্তজোড়া নারকেলের বন যেন চিরসবুজ আর সতেজ করে রেখেছে মালয়ালী এই মানুষগুলিকে। এদের এই অবাক পৃথিবীর ভেতর জেগে উঠেছে লোকসঙ্গীতের আশ্চর্য সব সুর, গড়ে উঠেছে কথাকলি, মোহিনী আট্যম, কৈকট্টিকলি, তুল্লাল ইত্যাদি নাচ।

ইন্দ্র প্যালেসের সামনের রাস্তার উল্টোদিকে রেখেছে গাড়িটা। তাই নৃত্যগৃহের বাইরের আলোর চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতা নেই এখানে। কয়েকটা নারকেল গাছের ছায়া পথের ওপর ভেসে আসা আলোটাকে অনেকখানি শুষে নিয়েছে। ছায়ার ধূসর চাদরটায় নিজেকে আড়াল করে রাখতে বেশ ভাল লাগছে ইন্দ্রের। আজ পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আকাশটা কেমন যেন বিহ্বল।

দুটো সিগারেট পুড়িয়ে তৃতীয়টির প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে ইন্দ্র দেখল প্রেমা, সরিতা, মাধবী আম্মা নাটমণ্ডপের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। সঙ্গে উদ্যোক্তাদের কয়েকজন। দর্শকেরা কিছু আগে উচ্চগ্রামে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেছে। ইন্দ্র অনুভব করেছে তাদের উত্তাপ। অনুষ্ঠান তাদের নাড়া দিয়েছে, তারই সোচ্ছ্বাস প্রকাশ তাদের উষ্ণ আলোচনায়। ছোট্ট দলটি এসে দাঁড়াল ইন্দ্রের সামনে। ইন্দ্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

প্রেমাই কথা বলল, আপনাকে একটু কষ্টে ফেলব মিঃ রায়। মাধবী আম্মাকে ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আপনি স্ট্রেট চলে যাবেন হোটেলে। মিঃ পিল্লাই আমাকে লিফ্‌ট দেবেন। গাড়ি আজ আর দরকার নেই, সকালে পেলেই চলবে।

সরিতা প্রেমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আমি কিন্তু আমাদের কারেই ফিরছি দিদি। অল দ্য বেস্ট।

মিঃ পিল্লাই হেসে বললেন, ঘণ্টা খানেকের ভেতর প্রেস-ইন্টারভিউ শেষ হয়ে যাবে। তারপরই তোমার দিদিকে আমার কারেই তোমার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসব। কাল জন্মভূমির পাতায় রিপোর্টটা বের করতে চাই।

ইন্দ্র শুধু শ্রোতা। সে নির্দেশটুকু জেনে নিয়েই গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বসল। মাধবী আম্মা আগে ঢুকলেন। সরিতা তাঁর পাশে বসার আগে বলল, মিঃ রায় আমি কিন্তু পেছনে বসছি।

ও সিয়োর।

মিঃ পিল্লাই-এর গাড়ি প্রেমাকে নিয়ে দমকা হাওয়ায় পাতার মত উড়ে চলে যেতেই ইন্দ্র তার গাড়িতে স্টার্ট দিল। কিছুপথ দুখানা গাড়ি সামনে পেছনে চলল। হেডলাইটের আলোগুলো হোসপাইপের জলের মত পথটাকে যেন ধুয়ে চলেছিল। মিঃ পিল্লাই-এর গাড়ি এখন অন্য রাস্তা ধরেছে, ইন্দ্র যাবে ঠিক তার উল্টো পথে। ইন্দ্রের হেডলাইটের আলো বাঁকের মুখে মুহূর্তে ছুঁয়ে গেল পিল্লাই-এর অ্যামবাসেডরখানা। ফুলের বিনুনী গাথা প্রেমার মাথাটা কি মিঃ পিল্লাই-এর স্টিয়ারিং-এর কাছে অনেকখানি সরে এসেছে!

এক পলকের আলোর ঝলক, কোন একটা সত্যে কি এত তাড়াতাড়ি পৌঁছান যায়। ইন্দ্র ভাবনায়

ছেদ ফেলে দিয়ে গাড়িখানাকে ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য পথ ধরেছে। খানিক দূর যাবার পরেই পড়ল একটা গ্রাম। চাঁদের আলোয় নারকেল গাছের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে পথের ওপর। গাড়ির জোরাল আলোয় মুছে মুছে যাচ্ছে। একটা ছোট সাঁকোর ওপর দিয়ে গাড়িটা পার হয়ে এল। চাঁদনি রাতে একখানা উদাসী নৌকো ভেসে যাচ্ছে। ডানদিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সাদা বালির প্রান্তর। তার পরেই আলোছায়ার অন্ধকার ঢাকা গ্রাম।

হঠাৎ চোখে পড়ল সমুদ্র। নারকেলগাছের ফাঁকে ল্যান্ডস্কেপের মত আঁকা হয়ে আছে। এখন সমুদ্রের আরও কাছ দিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। তিন চারটে জেলে-নৌকো বালির ওপর কাৎ হয়ে আছে। এবার মাধবী আম্মার গ্রামে ঢুকল গাড়ি। একটা টালির ছাওয়া বাড়ির সামনে গাড়িটাকে এনে দাঁড় করাল ইন্দ্র। এখান থেকেই পদ্মনাভপুরম্ প্যালেসে যাবার সময় মাধবী আম্মাকে গাড়িতে তুলে নিয়েছিল প্রেমা। তখন প্রেমাই চালাচ্ছিল গাড়ি। পাশে বসেছিল সরিতা। পেছনে মাধবী আম্মার সঙ্গে বসেছিল ইন্দ্র।

মাধবী আম্মার মুখে ইন্দ্র এই আধঘন্টার ভেতর একটিও কথা শোনেনি। নেমে যাবার সময় মাধবী আম্মা সরিতাকে বললেন, প্রেমাকে বোলো সে যেন প্রতিদিন রুটিন মাফিক নাচ অভ্যেস করে যায়। আজ যে সোনার লছমীমালা ও রাজাবাহাদুরের হাত থেকে পেল, তার মর্যাদা যেন ও রাখতে পারে। এতদিন ও শুধু ছিল আমারই চোখের সামনে এখন ও সবার চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এবার হবে ওর আসল পরীক্ষা। অনেকের সামনে এসব কথা আমি ওকে বলতে পারিনি, আমার হয়ে তুমি ওকে বোলো।

সরিতা গাড়ি থেকে নেমেই দাঁড়িয়েছিল। সে মাধবী আম্মার হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করল। মাধবী আম্মা যেন তদ্গত হয়েই বলে চললেন, ও যে কত বড় গুণী তা ও নিজেই জানে না, শুধু মনের দুরন্ত চপলতাকে যদি ও জয় করতে পারে তাহলে সবাইকে ছাড়িয়ে ও অনেক উঁচুতে উঠে যাবে। একটু থেমে আবার বললেন, অনেক দূরের পথ যেতে হবে আর তোমাদের আটকে রাখব না। সময় পেলেই চলে এসো দু'বোনে।

মাধবী আম্মার কুডিলের সামনে এখন জ্বলছে একটি ভিলাক্কু। স্নিগ্ধ হলুদ একটুখানি আলো প্রবেশ পথের অন্ধকারটুকু মুছে নিয়েছে।

মাধবী আম্মা চলে গেলেন। ঘরের ভেতর ঢুকে ওয়াদিল বন্ধ না করা অব্দি তাঁর দিকে চেয়ে রইল সরিতা।

গাড়ি এখন ফিরে চলেছে। যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ ধরে। সেই যে রাস্তার মোড়ে দুখানা গাড়ি আলাদা হয়ে গিয়েছিল, সেদিকেই চলেছে ইন্দ্রের গাড়ি। খানিক এগিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে সোজা কোভালমের পথ।

মোড়ে এসে পৌঁছল গাড়ি। ইন্দ্র কোভালমের দিকেই বাঁক নিচ্ছিল, কিন্তু সরিতার কথায় ব্রেক করল।

সরিতা বলে উঠল, আচ্ছা খানিক দূরেই তো জন্মভূমির অফিস, প্রেমা আছে কি না দেখে গেলে হয় না? থাকলে এই গাড়িতেই ফিরতে পারত।

ইন্দ্র কথা বলল, যাওয়া যেতে পারে কিন্তু মিস মেনন গাড়ি নিয়ে আপনাকে বাড়িতে রেখে সোজা হোটেলে চলে যেতে বললেন।

সরিতা বলল, তাহলে থাক, সোজা বাড়ির দিকেই চলুন।

কোভালমের পথ ধরল গাড়ি। রাত এগারোটা বেজে গেছে। একটু আগে পথের ধারে চার্চের একটা ঘড়ি সময়টা ঘোষণা করেছিল। গ্রামের ভেতর দিয়ে পথ চলেছে। গাঁয়ের মানুষ বড় একটা জেগে নেই। রাস্তার মোড়গুলিতে দোকানপাটে দু-একটা আলোর টুকরো বন্ধ ঝাঁপের ফোকর দিয়ে ঘর পালানো ছেলের মত ছিটকে বেরিয়ে আসছে। এখন পথের ওপর ছুটে চলা গাড়ির আওয়াজটা কানে এসে বাজছে। গাঁ ছাড়িয়ে ফাঁকা প্রান্তরে এলেও বহুদূর জুড়ে সেই নারকেল গাছের সমারোহ। উঁচু থেকে নীচু হয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। ফিন্‌কি দিয়ে জ্যোৎস্না ঝরছে। চাঁদের পাতলা দুধের মত আলোয়

স্নান করছে গাছগুলো। একটা অলৌকিক জগত বলে মনে হয়। গাড়ি চালাতে চালাতে নারকেলের সবুজ সমুদ্রে আলোর খেলা দেখছিল ইন্দ্র।

হঠাৎ গাড়িটা একটা আওয়াজ তুলে থেমে গেল।

ইন্দ্র সীটে বসেই পরীক্ষা চালাল। ইঞ্জিন চালু আছে কিন্তু গাড়ি নড়ছে না। ফার্স্ট গীয়ার, সেকেন্ড গীয়ারে দিয়েও যখন গাড়িকে নড়ান গেল না তখন ইন্দ্রের মনে হল, ডিফারেন্সিয়াল বক্সের রিয়ার অ্যাকসেল কেটে গেছে। কিচ্ছু করার নেই।

এখন উপায়,—হতাশার একটা দীর্ঘশ্বাসের মত কথাটা বেরিয়ে এল ইন্দ্রের মুখ থেকে।

সরিতা বলল, কাছে পিঠে কোন গ্রাম তো চোখে পড়ছে না। তাছাড়া এত রাতে গ্রামের ভেতর মিলবেই বা কি। মানুষজনকে ঘুম থেকে তুলে যে বলব, চল গাড়িখানাকে ঠেলে নিয়ে, তাও তো সম্ভব নয়।

ইন্দ্র বলল, অতএব।

সরিতা ভাবনার ভেতরেও হেসে ফেলে বলল, আসুন,রাতটা গাড়ির ভেতর বসেই কাটিয়ে দেওয়া যাক।

ইন্দ্র আর সরিতা দুজনে গাড়িটাকে ঠেলে নিয়ে পথের ধারে একটা নিঃসঙ্গ নারকেল গাছের তলায় এল।

সরিতা গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে বলল, বড্ড ঘুম পাচ্ছে, আমি কিন্তু ঘুমব।

ইন্দ্র একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, ঘুম আসবে আপনার?

সরিতা শব্দ করে নড়েচড়ে বসে বলল, কেন আসবে না বলুন?

ইন্দ্র বলল, এ সব তো অঙ্ক কষে বলা যায় না, অনুমান করা যায় মাত্র।

সরিতা সীটের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে বলল, আপনার অনুমান ভুলও তো হতে পারে।

ইন্দ্র বলল, তা পারে।

সরিতা জলতরঙ্গের মত হেসে উঠে বলল, আমাকে কি সত্যিই কুম্ভকর্ণ ঠাওরালেন নাকি? এ অবস্থায় কেউ ঘুমোতে পারে?

ইন্দ্রও হেসে উঠল। বলল, তাহলে আসুন দুজনেই জাগি।

সরিতা সামনের সীটের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, আপনি নিশ্চয় খুব ভাল গল্প বলতে পারেন।

ইন্দ্র সীটে বসে সিগারেট টানতে টানতে বলল, কি করে জানলেন?

সরিতা বলল, বলুন না, আমার অনুমান ঠিক কি না?

ইন্দ্র বলল, গল্প হয়ত দু-একটা বলতে পারি কিন্তু ভাল বলতে পারি কি না তাতে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

সরিতাকে ছেলেমানুষীতে পেয়ে বসল, বলুন না, বলুন না একটা।

ইন্দ্র বলল, এই পরিবেশে আপনার গল্প শুনতে ভাল লাগবে?

খু—উ—ব, সরিতার স্বরে উৎসাহের জোয়ার।

ইন্দ্র বলল, তাহলে আমার পছন্দ মত গল্প আপনাকে শুনতে হবে।

সরিতার মাথার বিনুনী সুদ্দো দুলে উঠল, রাজি। যা শোনাবেন তাতেই রাজি।

ইন্দ্র অমনি বলল, ভূতের গল্প।

সরিতা বেশ খানিকটা দমে গেল। নিভু নিভু গলায় বলল, ভূতের গল্প।

ইন্দ্র বলল, কেন ভূতটুতে বিশ্বাস নেই নাকি?

সরিতা কাতর গলায় বলল, ভয় দেখাবেন না, দোহাই আপনার।

বলতে বলতে দরজাটা খুলে ঝুপ করে নেমে সামনের দরজাটা খুলে ঢুকে পড়ল। দরজা টেনে ভাল করে লক্ করে ইন্দ্রের কাছে সরে বসল।

ইন্দ্র ওর কাণ্ড দেখে বলল, পেছনের সীটে দুদিক কিন্তু লক্ করা হয়নি, সুযোগ পেলে ঢুকে পড়তে

কতক্ষণ।

সরিতা ইন্দ্রের রসিকতাকে তলিয়ে দেখার দরকার মনে করল না। সীটের ওপর দিয়ে শরীরটাকে বেঁকিয়ে পেছনের একটা দরজা লক্ করে গ্লাসটা উঠিয়ে দিলে। পরে ইন্দ্রের কাঁধের পাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ডান দিকের দরজা লক্ করে কাঁচটা তুলতে লাগল।

মেয়েটার যেন কোনদিকে খেয়ালই নেই। একটা চব্বিশ বছরের যুবকের গায়ে আঠারো বছরের মেয়ের ছোঁয়া লাগলে কি হতে পারে সে ব্যাপারে সরিতা মেনন যেন একেবারেই বেহুঁশ।

ইন্দ্রের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে ফুলে গাঁথা বিনুনী। মুখের বাঁ দিকটা ছুঁয়ে আছে ইন্দ্রের চুলে ভরা মাথা।

একটা উত্তেজক পানীয় এইমাত্র যেন ইন্দ্রের গলায় কেউ ঢেলে দিয়েছে। পানীয়টা ধীরে ধীরে সারা শরীরে অদ্ভুত এক ধরনের জ্বালা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সরিতা কিন্তু কাজ শেষ করে চুপটি করে বসে পড়ল সীটে। ইন্দ্রকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বলল, কি হল, বলুন।

ইন্দ্র নিজেকে সহজ করে নিল। ডানদিকে জ্যোৎস্না ঝরা সহস্র সহস্র নারকেল গাছের সারি। হাওয়ায় মাথাগুলো দুলছে। ঝিক্‌মিক করছে চাঁদের ভাঙা ভাঙা আলোগুলো। ঠিক যেন মনে হচ্ছে জ্যোৎস্নার কিরণঝরা সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে শত শত স্নানার্থী স্নানলীলায় মেতেছে।

ইন্দ্র বলতে লাগল, অনেক অনেকদিন আগে কেরালা ছিল পালের জাহাজে ভেসে আসা বিদেশীদের ব্যবসার বড়রকমের একটা ঘাঁটি। এখানকার গোলমরিচ, হাতির দাঁত, চন্দন কাঠ আরও বহু রকমের জিনিস বিদেশে বহু দামে বিক্রি হত। এসব কথা ইতিহাস থেকে ভূরি ভূরি মিলবে, কিন্তু একবার একখানা বোম্বেটে জাহাজ কিছু ভিন্ন রকমের জিনিস নিয়ে আরবের দিকে যাচ্ছিল।

সরিতা কৌতূহলী হয়ে উঠল, কি জিনিস?

ইন্দ্র বলল, জাহাজের ওপরে ছিল বিদেশী কয়েকজন নাবিক, কিন্তু জাহাজের পাটাতনের তলায় ছিল ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে আনা কিছু সুন্দরী মেয়ে আর শ্রমিক পুরুষ। তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আরবদেশে বিক্রির জন্যে। মেয়েগুলি বাদশাহী হারেমের জন্যে পছন্দ করে আনা, আর হতভাগ্য পুরুষগুলো বিক্রি হবে দাস হিসাবে আরবের বাজারে।

সেই মুহূর্তে সরিতা কষ্ট পেয়ে বলল, দারুণ দুঃখের ব্যাপার।

ইন্দ্র বলে চলল, আরবসাগরের বুকের ওপর দিয়ে দশ-বিশখানা পাল উড়িয়ে জাহাজটা এগিয়ে যাচ্ছিল। হিসেব মত বাতাস লেগেছিল পালে। গরম কাল। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী হাওয়া জাহাজটাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলছিল ওমান উপসাগরের দিকে। কিন্তু কর্কটক্রান্তি রেখায় ঢুকেই জাহাজটা কেমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কোনদিকেই আর নড়ে না। হাওয়ার ঠেলায় পাল ফুলে আছে, কিন্তু এক ইঞ্চিও নড়ছে না এত বড় জাহাজটা। দাঁড়িরা দাঁড়ের ঘা মেরে মেরে সমুদ্রে ফেনা তুলে ফেলল, তবু নড়ল না জাহাজ।

সরিতার গলায় বিস্ময়, এ কি করে সম্ভব!

ইন্দ্র বলল, এইখানেই ভূতের ওপর বিশ্বাস করতে হয়। পুরোটাই ভৌতিক ব্যাপার।

সরিতা ইন্দ্রের গায়ের আরও কাছে ঘেঁষে এল। ভয়ে ভয়ে বলল, সত্যি বলছেন ভূত?

ইন্দ্র বলল, যদ্দূর শুনেছি, একটা দুষ্টু ইফ্রিদ ভূতের কাণ্ড এটা। সে অক্ষরেখা বরাবর সমুদ্রের তলায় ডুব দিয়ে লুপ্ত কোন একটা নগরীর গুপ্তধনের সন্ধান নিয়ে উঠে আসছিল, হঠাৎ তার মাথায় জাহাজের তলার ঠোকর লাগতেই সে বিগড়ে গেল। আর যায় কোথা, দুহাত দিয়ে জাহাজের দুটো প্রান্ত ধরে স্থির হয়ে রইল। তাকে নড়ায় কার সাধ্যি।

সরিতা বলল, তারপর?

ইন্দ্র বলল, তারপর আর কি, যেখানে মুশকিল সেখানেই আসান। ভূতের ওঝা ছিল ঐ জাহাজে। সে কেরালার কয়েক মন গোলমরিচ তিনদিন ধরে পুড়িয়ে ইফ্রিদটাকে বশ কবল। তবু কি ভূতটা ছাড়তে চায় জাহাজ।

সরিতা দারুণ উত্তেজনায় ফেটে পড়ে বলল, তারপর ছাড়ল তো?

ইন্দ্র বলল, ছাড়ল, তবে একটা শর্তে।

কি রকম?

ভূত ওঝাকে বলল, তোমরা আমাদের বাদশার কাছে অনেক দামী জিনিস নিয়ে যাচ্ছ, তাই তোমাদের আর আটকে রাখব না। কিন্তু এই জাহাজে দুটো সুখী জীব আছে, তাদের জাহাজ থেকে ফেলে দিলেই আমি জাহাজ ছেড়ে দেব।

ওঝা এবার অনেক গুনেও বের করতে পারল না বন্দী মানুষগুলোর ভেতর সুখী কারা রয়েছে। ওরা সবাই ঘরবাড়ি প্রিয়জন ছেড়ে এসেছে, তাই ওদের কারো তো সুখী থাকার কথা নয়। বরং ওদের বুকের ভেতরে সারা আরব সাগরের কান্না উথলে উঠেছে।

ইফ্রিদ ভূতটা শেষে বলল, আমি একটা আলো জ্বেলে দেব, তাতে সবার দেহের ভেতর যে মনটা আছে, তা দেখা যাবে।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্র তোলপাড় করে একটা জলস্তম্ভ উঠল। জলস্তম্ভটা রাতের অন্ধকারেও স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে আশ্চর্য এক ধরনের আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগল তার দেহ থেকে। সে আলো একসময় অতি তীব্র হয়ে উঠল, কিন্তু উত্তাপ ছিল না সে আলোতে তাই রক্ষে।

সরিতা যেন কথা বলতে পারছিল না, তবু চাপা গলায় বলল, আশ্চর্য তো!

ইন্দ্র বলল, আশ্চর্য ঐ আলোতে নয়, আলোটা যেখানে জাহাজে গিয়ে পড়েছিল সেখানেই ছিল সত্যিকারের আশ্চর্য।

সরিতা বলল, কি ছিল ওখানে?

ইন্দ্র বলল, জাহাজের খোল থেকে মানুষগুলো তখন ডেকে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর মানুষগুলোর একটিকেও রক্তমাংসের বলে চেনা যাচ্ছিল না। সবাই স্বচ্ছ কাচের মানুষ হয়ে গিয়েছিল।

সরিতা সীমাহীন বিস্ময়ে বলল, কাচের মানুষ!

ইন্দ্র বলল, পুরোপুরি কাচের মানুষ, শুধু হৃৎপিণ্ডের কাছে প্রত্যেকের ঘন কালো একটা ছায়া পড়েছিল।

সরিতা বলল, কালো ছায়া কেন?

ইন্দ্র বলল, শোক দুঃখের চিহ্ন ওটা। সকলেই ফেলে আসা সংসারের কথা ভেবে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল, তাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের ভেতর দুটি সুখীকে ধরা গেল।

সরিতা কৌতূহলী হল, কি রকম?

ইন্দ্র বলল, ওদের ভেতর দুটি হৃৎপিণ্ড ছিল রক্ত পদ্মের মত লাল। তাই দেখে ওদের চেনা গেল।

সরিতা বলল, ওরা সুখী ছিল কেন?

ওরা ভালবাসার ছোঁয়া পেয়েছিল। বাদশার মুলুকে গিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে জেনেও ওরা দুজনে ভালবেসেছিল দুজনকে।

তারপর ওদের খুঁজে বের করার সঙ্গে সঙ্গেই আলোটা নিভে গেল। জলস্তম্ভ মিলিয়ে গেল জলে। পূর্ণিমার চাঁদের আলো ঢেউ-এর মাথায় ঝিলমিল করতে লাগল। সবাই তখন স্বাভাবিক চেহারা ফিরে পেয়েছে। জাহাজের ক্যাপটেন আর একটুও দেরী করলে না। ওদের দুজনকে সমুদ্রের জলে ঠেলে ফেলে দিল। ওরা কিন্তু জাহাজ থেকে পড়ে যাবার সময় কোন রকম আর্তনাদ করল না বরং বিচ্ছেদের হাত এড়াতে পারল বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল।

ইন্দ্র হঠাৎ সরিতার দিকে ফিরে বলল, বলুন তো মেয়েটি কোথাকার?

সরিতা বলল, কি জানি কিন্তু তার জন্যে দুঃখ না হয়ে বরং গর্ব হয়।

ইন্দ্র বলল, মেয়েটি কিন্তু কেরালাবাসী।

আবার প্রশ্ন করল ইন্দ্র, এখন বলুন তো দেখি ছেলেটি কোথাকার?

সরিতা হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠেছে। সে মুখে বলল, জানি না। কিন্তু সে যে জানে তার প্রমাণ দিল ইন্দ্রের একখানা হাত ওর দুটো হাতের পাতায় চেপে ধরে।

· দুজনে কেউ আর কোন কথা বলতে পারল না। জ্যোৎস্নার অলৌকিক স্রোত তখন আরও তীব্র হয়েছে। ওরা দুজনে জাহাজ থেকে সমুদ্রের জলে নিক্ষিপ্ত প্রেমিকের মত ভেসে চলল।

শান্ত নিস্তব্ধ রাতটা কিসের শব্দে যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। একটা গাড়ি আসছে দূর থেকে। পেছন দিক থেকেই আসছিল। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল আলোটা।

সরিতা হঠাৎ ইন্দ্রের বুকের ওপর থেকে মাথাটা সরিয়ে নিল। কোন কথা না বলে গাড়ির দরজাটা খুলে বেরিয়ে দাঁড়াল পথের ওপর। চূর্ণ চুল আর মথিত ফুলগুলোকে যতদূর সম্ভব ঠিক করে নিল। তারপর পেছনের দরজা খুলে সীটের ওপর বসে গাড়ির গ্লাসগুলো নামিয়ে দিলে।

ততক্ষণে ইন্দ্র গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েছে।

পেছনের গাড়িটা তীব্র স্পীডে এসে হঠাৎ দারুণ একটা ব্রেক কষে দাঁড়াল। ভেতর থেকে মেয়েলি গলার একটা ভয়ার্ত আওয়াজ উঠেই থেমে গেল।

গাড়ি থেকে মিঃ পিল্লাই নেমে এসেছেন।

কী ব্যাপার?

ইন্দ্র বলল, বিচ্ছিরি ব্যাপার, ডিফারেন্সিয়াল বক্সের রিয়ার অ্যাকসিল কেটে গেছে মনে হয়।

ততক্ষণে সামনের সীট থেকে নেমে এসেছে প্রেমা।

গাড়ি থেকে সরিতাও নেমে দাঁড়াল।

মিঃ পিল্লাই দু বোনের মাঝে এসে পড়লেন, ভাগ্যিস মিস মেননকে কিছু বেশি সময় আটকে রাখতে পেরেছিলাম, নইলে সারা রাত আপনাদের এই পথের ওপরেই কাটাতে হত!

ইন্দ্র মনে মনে বলল, উদ্ধার করেছ। তুমি না এলে সারা কেরালা দেশটাই সমুদ্রের তলায় চলে যেত।

মুখে বলল, মিস মেনন মনে হয় বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, ভাগ্যিস আপনি এসে পড়লেন।

সরিতা বলল, মোটেও না, ভয় পেতে যাব কেন, দারুণ ঘুম পাচ্ছিল।

প্রেমা বলল, পথে দাঁড়িয়ে রাত কাবার করে লাভ নেই, এখন সবাই মিলে ঘরে পৌঁছোনোর ব্যবস্থা করা যাক।

মিঃ পিল্লাই বললেন, সবাই আমার গাড়িতে চলে আসতে পারেন, কিন্তু আপনার গাড়ির কী হবে?

তখন একটা চেন অথবা মোটা দড়ি জাতীয় কিছুর খোঁজ চলল দুটো গাড়িতে। অ্যামবাসেডর প্রেসিডেন্টকে টেনে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তাও মিলল না।

ইন্দ্র বলল, ভাবনা নেই, আমি গাড়িতে আছি, দিব্যি রাতটা কেটে যাবে। ভোরের বাসে একজন মেকানিককে পাঠিয়ে দিলেই চলবে।

মিঃ পিল্লাই প্রেমার দিকে চেয়ে বললেন, মিস মেনন আমি না হয় আজ রাতে আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফিরেই যাই। তাহলে মিঃ রায় উদ্ধার পাবেন। কোভালম বাজারের মোড় থেকে একজন মেকানিক নিয়ে চলে আসব।

প্রেমা বলল, তা হয় না, আপনার বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত কাবার হয়ে যাবে।

অগত্যা ইন্দ্রের পরিকল্পনাই বহাল রইল। মিঃ পিল্লাই তাঁর প্রায় অক্ষত সিগারেটের দামী প্যাকেটটাই ইন্দ্রকে প্রেজেন্ট করে বসলেন। রাত জাগতে ইন্দ্রের সঙ্গী রইল সিগারেট।

ওরা মিঃ পিল্লাই-এর গাড়িতে উঠে বসল।

ইন্দ্র দাঁড়িয়ে রইল প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টে হেলান দিয়ে।

মিঃ পিল্লাই-এর গাড়ি স্টার্ট নিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল।

সরিতা ইন্দ্রের গাড়িতে ব্যাগ ফেলে গেছে। তাই সে আবার ছুটতে ছুটতে এল প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে।

ইন্দ্র সিগারেট টানতে টানতে বলল, কি হল, ফিরে এলেন যে?

আপনাকে না বলে গিয়েছিলাম, তাই একটু দুষ্টুমি করতে হল। ব্যাগটা ফেলেই গিয়েছিলাম। সত্যি, ভীষণ খারাপ লাগছে আমার। একটুও ঘুমুতে পারব না রাতে।

ইন্দ্র বলল, আমার কিন্তু কোন অসুবিধেই হবে না। একটা ফুলে ভরা মাথার গন্ধে বুক ভরে আছে। রাত ভোর সারা সাগরের হাওয়াতেও সে গন্ধটুকু উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

সরিতা জ্যোৎস্নার আলোয় চোখে করুণ মিনতি ফুটিয়ে দ্রুত পায়ে মিঃ পিল্লাই-এর গাড়ির দিকে চলে গেল।

ইন্দ্র কাচ তুলে গাড়ি লক করে বসেছিল। বাঁ দিকের গ্লাসটা সামান্য খোলা ছিল। সে স্বপ্ন দেখছিল একটি মেয়ের। এক একবার কেমন যেন মনে হচ্ছিল সবটাই স্বপ্ন। কে জানত বাংলাদেশ থেকে একেবারে আরব সাগরের তীরে তাকে একটা হোটেল চালাবার দায়িত্ব নিয়ে চলে আসতে হবে।

ইউনিভারসিটির পড়া শেষ করে তার আর বেকারের দলে ভীড় বাড়াবার ইচ্ছে ছিল না। তাই সে সোজা চলে গিয়েছিল হোটেল ম্যানেজমেন্ট আর ক্যাটারিং নিয়ে পড়াশোনা করতে।

বছর তিনেক পরে কানপুর থেকে দিল্লী হয়ে ফেরার পথে নিউজ পেপারে চোখে পড়েছিল বিজ্ঞাপনটা। সমুদ্রের ধারে আধুনিক হোটেল। অভিজ্ঞ ম্যানেজার দরকার। পোস্ট বক্স না দিয়ে সরাসরি একটা ঠিকানা দেওয়া ছিল। তাই রেজেস্ট্রি ডাকে দরখাস্ত পাঠিয়ে কালক্ষয় না করে সে সোজা চলে এসেছিল কেরালায়।

কোভালম বীচের পাশেই কোভালম গ্রাম। ঐ গ্রামেই নাম্বুদ্রী করুণাকরনের আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্মত কেটেডম। সেখানেই সে প্রথম দেখল প্রেমা মেননকে। বয়সে তার চেয়ে কিছু ছোটই হবে, কিন্তু আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। প্রেমা মেননই তাকে কাজে যোগ দিতে বলল। তাদের পরিবারের ছোট্ট একটু ইতিহাসও কদিন পরে প্রেমার মুখ থেকেই সে শুনেছিল। এতটুকু সংকোচ কিংবা গোপন করার কোন চেষ্টাই ছিল না তার কথায়।

নাম্বুদ্রী করুণাকরন যৌবনে নৃত্যশিল্পী মেনন পরিবারের একটি মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। ফলে সমাজ ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল তাঁকে। নিজের চেষ্টায় বুদ্ধিমান আর পরিশ্রমী করুণাকরন অনেক কিছুই করেছিলেন। ফিসারিজ, কয়ার ইন্ডাস্ট্রিস, কাজু এক্সপোর্ট। শেষে কোভালম বীচ থেকে কিছুদূরে একটা হোটেল তৈরি করেন। কোভালম গ্রামে নারকেল কুঞ্জে ঘেরা 'রিট্রিট' নামে বাড়িতে তিনি থাকতেন, আর গাড়ি করে হোটেলে যেতেন। হোটেলটাকে বাড়ির কাছেই করতে পারতেন কিন্তু তা তিনি করেন নি। কর্ম আর বিশ্রামের দুটি জায়গাকে তিনি একটু তফাতেই রাখতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু বাড়ির নাম 'রিট্রিট' রাখলেও শান্তিতে বিশ্রাম করার ভাগ্য ছিল না তাঁর। নৃত্যপটীয়সী স্ত্রী তাঁকে দুটি কন্যা সন্তান উপহার দিয়েই মারা গিয়েছিলেন। সেই সন্তানই প্রেমা আর সরিতা। প্রেমা মায়ের কাছে নাচ শিখত, আর সরিতা তখন সবে পাঁচ। মা মারা গেলে বাবা করুণাকরন স্ত্রীর বান্ধবী মাধবী আম্মার তত্ত্বাবধানে প্রেমাকে রেখে দেন। মাধবী আম্মা কলা কেন্দ্রমের নৃত্যগুরু ছিলেন। মোহিনী আট্যমের পুরানো রীতি তিনি যদ্দূর সম্ভব নির্ভেজাল শেখানোর চেষ্টা করতেন।

তাঁর কঠোর তদারকী আর শিক্ষায় প্রেমা এখন নিপুণ নর্তকী। প্রেমা নাচের সঙ্গে সঙ্গে কনভেন্টে পড়াশোনা করেছে। কিন্তু ছোট বোন সরিতা একটু ভিন্ন চরিত্রের। নাচ ভালবাসলেও তার ভেতর সে নিজেকে জড়াতে চায়নি। পড়ে ত্রিবান্দ্রম কলেজে। ঘুরে বেড়ায় বান্ধবীদের নিয়ে। আজ পিকনিক, কাল সিনেমা, পরশু ব্যাকওয়াটারে ভ্রমণ। এই নিয়ে তার জগৎ। তবে প্রেমার উক্তি অনুসারে সরিতা তার চেয়েও হিসেবী। এই বয়সেই সে নাকি ব্যবসা বোঝে অনেক বেশী।

করুণাকরন সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছিলেন ব্যবসায়িক প্রয়োজনে। কিন্তু দেশের মাটিতে পা দিয়ে শেষ নিশ্বাসটুকু ফেলতে পারলেন না। তার আগেই প্লেনের ভেতরে হৃদরোগের শিকার হলেন।

বাবা চলে যাবার পর প্রেমাকে সাহায্য করার জন্য পিতৃকুলের অনেক আত্মীয় এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু প্রেমা তাদের বিদায় দিয়েছিল বিনীত নমস্কারে। বাবার জীবদ্দশায় যারা আসেনি বাবার অবর্তমানে তাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্যকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল প্রেমা।

একটি একটি করে সবকটা ব্যবসাকেই সে উপযুক্ত দামে বিক্রি করে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়িয়েছিল। কিন্তু পারেনি হোটেলটাকে হাতছাড়া করতে। করুণাকরন এক সময় মেয়েদের নাকি বলেছিলেন,

ব্যবসায়ের খাতিরে ঘন ঘন বিদেশ যাওয়া তাঁর আর পোষাচ্ছে না। তিনি হঠাৎ একদিন সব ছেড়েছুড়ে ঘরে এসে বসবেন, আর শুধু থাকবে তাঁর নিজের পছন্দমত গড়ে তোলা সান অ্যান্ড সী হোটেলটা।

বাবার শেষ ইচ্ছা প্রেমা সযত্নে রক্ষা করতে চায়। তাই উপযুক্ত ম্যানেজার চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল সে।

ইন্দ্র বসে বসে ভাবছিল কথাগুলো। একটি বছরও পূর্ণ হয়নি তার চাকুরীর কিন্তু ইতিমধ্যেই সে বেশ কয়েকটা ব্যাপারে তার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। আর এজন্য সপ্রশংস অভিনন্দন পেয়েছে প্রেমার কাছ থেকে। তার হোটেল সাজানোর পরিকল্পনা কিংবা ফরেন ট্যুরিস্ট আকর্ষণের জন্য পাবলিসিটির ধরন নাকি অভিনব। প্রেমার অ্যাপ্রিসিয়েশান তাকে হোটেলটাকে নিয়ে নানাভাবে ভাবতে উৎসাহিত করেছে।

তার কাজ প্রোপ্রাইটারদের পছন্দ হলেও ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ বা মেলামেশার কোন সুযোগ ছিল না তার। কিম্বা সে রকম কোন সুযোগ তৈরিও করে নেয় নি সে। তাই অ্যাপ্রিসিয়েশান যতখানি হয়েছিল অ্যাকোয়েন্টেন্স ততখানি হয়নি। কিন্তু আজকের ঘটনার কথা ভেবে সে নিজের মনেই অবাক হয়ে যাচ্ছে। কি করে এটা সম্ভব হলো। সরিতা যে এতখানি এগিয়ে এসেছে তার কোন আভাসই তো সে পায়নি আগে। সরিতা তার কলেজ বন্ধুদের নিয়ে হয়ত এক ঝাঁক চড়ুই পাখির মত কখনো চড়াও হয়েছে হোটেলে। সমুদ্রে স্নান সেরে বালিতে হুটোপাটি করে, নারকেল বাগানের ছায়ায় বসে গান গেয়ে, ব্যাকওয়াটারে চিরুনাল ভাল্লম বা হোটেলের সাজানো নৌকোটা হৈ হৈ করে ভাসিয়ে আবার ফিরে গেছে রিজার্ভ করা গাড়িতে। যাবার সময় শান্ত হয়ে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে নিজের ব্যাগ খুলে টাকা গুনে দিয়েছে। একটু দূরে তার কাজের জায়গায় বসে ইন্দ্র সরিতার এই আচরণটুকু উপভোগ করেছে।

যখনই সে সরিতার মুখোমুখি হয়েছে তখনই দেখেছে অশান্ত চঞ্চল মেয়েটি কত শান্ত আর শোভন হয়ে গেছে।

কদিন আগে প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টখানা চালিয়ে হোটেলে এসেছিল সরিতা। প্রেমা পদ্মনাভপুরম্ প্যালেসে নাচবে তার জন্য একটা ইনভিটেশান কার্ড তৈরি করে দিতে হবে। একদিকে থাকবে আমন্ত্রণ, অন্যদিকে থাকবে গুরু মাধবী আম্মা আর শিষ্যা প্রেমা মেননের পরিচিতি।

অনেক দৌড়ঝাঁপ করে প্রেমা মেননের মোহিনী আট্যমের একখানা ফটোর রেখাচিত্র এঁকে ব্লক করিয়ে গোল্ড কালারে ছেপে দিয়েছে ইন্দ্র। ব্লু কালারে ছাপিয়েছে নিমন্ত্রণ চিঠিখানা। একেবারে আরব সাগরের নীলের ওপর কেরালার সোনালী সূর্য নৃত্যের লীলায় মেতেছে।

কার্ড তৈরি করে প্রেমার কাছে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল সে। প্রেমা শুধু একটা শব্দই উচ্চারণ করেছিল, দারুণ। আর তাতেই ইন্দ্রের ক'দিনের পরিশ্রম পুরস্কৃত হয়েছিল। চলে আসার সময় ইন্দ্রকে কিন্তু নাচ দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানায় নি প্রেমা। ইন্দ্র পথে আসতে আসতে ভেবেছিল, প্রেমার আরও একটু সৌজন্য দেখান উচিত ছিল। স্বাভাবিক ভদ্রতায় নাচ দেখতে যাওয়ার মৌখিক একটা আমন্ত্রণ মাত্র। হোটেলে পৌঁছে তার মনে হয়েছিল, এই তার যথার্থ জায়গা, এর বাইরে পা বাড়াতে গেলেই অকারণে আহত হতে হবে।

সে ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই বসেছিল, কিন্তু গতকাল একটি জার্মান কাপ্‌লকে ব্যাকওয়াটারে নৌকো বিহার করিয়ে শেষ বেলায় হোটেলে ফিরে এসে দেখল, তার ডেস্কে একখানা কার্ড পড়ে আছে। সঙ্গে একটুকরো চিঠি জেমস্ ক্লীপ দিয়ে সাঁটা।

নাচ দেখার জন্যে প্রেমার প্রতিনিধি হয়ে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলাম। কার্ড রেখে গেলাম। আপনার পরিকল্পিত কার্ডের মর্যাদা প্রেমা কতখানি রাখতে পেরেছে তা স্বচক্ষে দেখলে আমরা সকলেই খুশী হব।

আসা চাই কিন্তু—সরিতা।

কার্ড পেয়ে ওদের ওপর মনটা অনেক বেশি প্রসন্ন হয়ে উঠল ইন্দ্রের। ওরা তাহলে ইন্দ্রের কথা ভোলে নি। সেদিন প্রেমার মুখোমুখি নিমন্ত্রণ না করার কারণ এখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এ ব্যাপারটা অনেক বেশি শোভন আর সুন্দর হয়েছে।

কিন্তু সরিতা! কি করে কয়েক মুহূর্তের ভেতর সে এত কাছে সরে এল। বেশি কোন কথাই সে বলে নি, শুধু ফুলের কারুকাজ করা মাথাটাকে তার বুকের মাঝখানে সমর্পণ করে দিয়ে বসেছিল।

ইন্দ্রর মনে হতে লাগল, নির্জন জ্যোৎস্না ঝরা রাতগুলো শুধু মাত্র দুজন প্রেমিকের।·তারা যেন প্রকৃতির এই বিহ্বল করা সুধাপানের জন্য বিশেষ নিমন্ত্রিত অতিথি। এই রাতে হৃদয়ের গভীরে কোন কথা গোপন করে রাখা যায় না, সব কথা রুপোলী আবরণ ভেদ করে প্রজাপতির মত বাইরে বেরিয়ে এসে এলোমেলো অথচ আশ্চর্য ছন্দময় নাচের খেলা দেখিয়ে উড়ে বেড়ায়।

পর পর এগিয়ে আসা হালকা ঢেউগুলো যেমন করে বেলাভূমির সোনালী বালিকে ভিজিয়ে দিয়ে যায় ঠিক তেমনি একটা সুখকর তন্দ্রাচ্ছন্নতার প্রবাহে ভিজে যাচ্ছিল ইন্দ্রের সোনালী স্বপ্নগুলো।

কে যেন ডাকছে : অনেক দূর থেকে একটা শব্দ অ্যাকিউরিয়মে রাখা চিকন দেহ ছোট ছোট কিসিং গোরামী মাছের মত জল কেটে কেটে তির্‌তির্‌ করে এগিয়ে আসছে।

শব্দটা এখন অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র সজাগ হয়ে বাইরে তাকাল।

কাচের ওপর হাত রেখে কেউ তাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে।

ইন্দ্র চোখ রগড়ে নিল দু-হাতের আঙুল ঘষে। এখন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে চাঁদের আলোয় সরিতা নয়, প্রেমা দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য, তার সামনে আর একখানা গাড়ি।

খুট্‌ করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল ইন্দ্র! গলায় বিস্ময়, আপনি!

প্রেমা বলল, চেন একটা নিয়ে এলাম, বাঁধুন গাড়ি।

ইন্দ্রের মুখে একরাশ প্রশ্ন, এত রাতে একা এলেন! কি ব্যাপার বলুন তো? মিঃ পিল্লাই কিংবা আর কাউকে তো সঙ্গে আনতে পারতেন।

প্রেমা মুখে হালকা হাসি ফুটিয়ে বলল, দোষটা করলাম আমি আর শাস্তি পাবে অন্যে!

ইন্দ্র বলল, দিব্যি গাড়ির ভেতর বসে বসে কেটে যেত রাতটা। আপনি এলেন, আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।

প্রেমা মিষ্টি আওয়াজ তুলে হেসে উঠল। বলল, দেখুন তো এত কষ্ট করে এলাম আর আপনি বলছেন আমি আসতেই আপনার খারাপ লাগছে।

ইন্দ্র চেন দিয়ে দুটো গাড়ি বাঁধতে বাঁধতে করুণ গলায় বলল, আমাকে এমন করে ভুল বুঝবেন না। আমি শুধু আপনার কষ্টের কথাই ভাবছি। সারা সন্ধে নাচের অনুষ্ঠান হল, তারপর রাত জেগে গাড়ি চালিয়ে এলেন। কি করে আপনার পক্ষে সম্ভব হল এতগুলো কাজ, তা ভেবে উঠতে পারছি না।

প্রেমা হঠাৎ বলল, কেমন লাগল আমার নাচ, বলেন নি তো।

আবার কথাটা চাপা দিয়ে বলল, আচ্ছা গাড়িতে বসে শুনব। আপনি ড্রাইভ করুন।

ইন্দ্র তার বাঁ দিকের লক খুলে দিল। প্রেমা ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে নিল দরজাটা।

ইন্দ্র ভাবল, প্রেমার ভেতরে সংস্কারের লেশমাত্র নেই, যা আছে তা সহজ স্বচ্ছন্দতা। লজ্জা কিংবা সংকোচের আবরণে অনেক সময় মেয়েদের সুন্দর দেখায় ঠিক, কিন্তু সহজ আচরণের ভেতর স্বাভাবিক একটা শ্রী আছে। অবশ্য পুরুষালির উৎকট অনুকরণটাই চোখে লাগে বেশি।

কি ভাবছেন? প্রেমার গলা বেজে উঠল।

না কিছু না—বলেই ইন্দ্র গাড়িতে স্টার্ট দিল। প্রেমা বলল, নাচ কেমন লাগল কই বললেন না তো?

ইন্দ্র বলল, আমার বলার কিছু অপেক্ষা আছে কি? সারা ত্রিবান্দ্রমের এলিট সম্মেলন হয়েছিল আপনার নাচের আসরে। আর তাঁদের মন্তব্যও আপনার নিশ্চয়ই অজানা নয়।

প্রেমা হেসে বলল, নিজেকে আর ঢেকে রাখবেন না মিঃ রায়। ইনভিটেশান কার্ডের নমুনা দেখেই বুঝেছিলাম. আপনি কি ধরনের সমঝদার।

ইন্দ্র বলল, ওটা অশিক্ষিত পটুত্ব। কস্মিনকালেও ছবি আঁকতে পারি না, কিন্তু ছবি দেখতে ভালবাসি।

প্রেমা বলল, প্রকৃতির কবিতা ডজন ডজন মুখস্থ করলেই কি আর প্রকৃতিকে চেনা যায়, না রঙ তুলির শ্রাদ্ধ করলেই শিল্পী হওয়া যায়।

ইন্দ্র একটা বাঁক ঘুরে আবার সোজা পথ ধরল।

দেখুন সত্যি কথা বলতে কি আপনার নাচের টেকনিক্যাল দিকটা আমি তেমন বুঝি নি, কিন্তু সামগ্রিক আবেদন যে কোন হৃদয়কে নাড়া দেবেই।

প্রেমা হেসে বলল, অন্ততঃ একজন সমঝদার পাওয়া গেল, আমার নাচ সোজাসুজি যাঁর হৃদয়ে ঘা দিয়েছে।

ইন্দ্র বলল, কথাটা নির্ভেজাল সত্যি।

কিছুক্ষণের ভেতরই গাড়ি এসে পৌছল কোভালমে। মেন রাস্তা থেকে একটা লাল সুরকী বিছান পথ কয়েক একর নারকেল বাগানের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রেমাদের বাড়ির দোরে এসে শেষ হয়েছে।

প্রেমা বলল, অচল গাড়িটা এখানেই থাক। আপনি আর একটু কষ্ট করে সরিতার ঐ গাড়িটা নিয়ে হোটেলে চলে যান, কাল দুপুরে যে কেউ গিয়ে নিয়ে আসবে। আমিও যেতে পারি। ভোর হতেও আর বড় একটা বাকি নেই। সারা রাত আপনারই হল হয়রানি।

ইন্দ্র হেসে বলল, হয়রানি নয়, বলুন উপভোগ্য অভিজ্ঞতা।

হোটেলে ফিরে ইন্দ্র দেখল, সুগদন বসে আছে! সামনের সমুদ্রের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে। সামান্য হলেও গাড়ির শব্দ হয়েছে, তবু নির্বিকার সুগদন। হোটেলের মালি কাম দারোয়ানের কাজ করে এই লোকটি। ব্যাকওয়াটার অব্দি বিস্তৃত পিছনের বিরাট নারকেল বাগানটির মালিক মেনন বোনেরা। সুগদন বৌ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সংসার পেতেছে ঐ তেঙ্গা তপ্পমের ভেতর। নারকেল বাগানের সে-ই রক্ষক, সে-ই পরিচালক, সে-ই দড়ি উৎপাদক, ব্যবসায়ের কর্ম পরিদর্শক।

সারাদিন হোটেলের ফাইফরমাস খেটে রাতে হোটেলের বারান্দায় শুয়ে থাকে। দারুণ নাক ডাকে। ঘুমন্ত পাহারাদার।

ইন্দ্র একটু অবাক হল বৈকি। সুগদন শেষ রাত অব্দি জেগে বসে সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য। চাঁদ আকাশে এখনও জেগে। সমুদ্র বালির স্তূপ নারকেল কুঞ্জ মায়াময়। এই পরিবেশে সুগদনের কবিত্ব লাভ হল নাকি। অথবা লোকটাকে নিশিতে পেয়েছে!

ইন্দ্র কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সুগদনের ধ্যান ভাঙল। ইন্দ্রকে দেখে সে যেন ভূত কিংবা পুলিশ দেখছে বলে মনে হল।

ইন্দ্র একটু গলা চড়িয়ে বলল, কি হল, জেগে বসে আছ যে?

সুগদন এতক্ষণ কোনরকমে নিজেকে সামলে রেখেছিল। ইন্দ্রের কথার ছোঁয়ায় একেবারে ভেঙে পড়ল।

সমুদ্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, সারারাত ওদের পাহারা দিয়ে বসে আছি সাহেব।

ইন্দ্র এতক্ষণ ভাল করে ওদিকে চেয়েই দেখে নি। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে, সমুদ্রের তীরে নারকেল পাতার ছাউনি দেওয়া গোল ছাতার তলায় নগ্নপ্রায় দুটি মূর্তি। একজন দাঁড়িয়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে হাত পা ছুঁড়ে চলেছে, আর অন্যজন বালির ওপর শুয়ে কখনো বা বসে সেই অভিনয় দেখছে।

প্রথম ঘোরটা কেটে যেতেই ইন্দ্র ওদের চিনতে পারল! তিন-চারদিন হল হোটেলে এসেছে এই দুটি ট্যুরিস্ট। দুজনেই পশ্চিমের মানুষ, দুজনেই ফটোগ্রাফার। মেয়েটি আমেরিকান আর ছেলেটি জার্মান। একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে, সে বিধাতাপুরুষ আর ওরা দুজনেই জানে। বিবাহিত দম্পতি নয়, বন্ধু। সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে দুজনেই। ফটো তুলে যাচ্ছে এনতার। একটা দেশ বা অঞ্চল থেকে ফটো নেওয়ার কাজ শেষ হয়ে গেলে ফিরে যাচ্ছে ইউরোপ, আমেরিকার বাজারে। সেখানে অনেক দামে বিক্রি করে আসছে ছবির সিরিজ।

আবার ঢুকে পড়ছে নতুন মুলুকে নতুন উদ্যমে। রথ দেখা কলা বেচা দুটোই চলছে। চোখভরে দেশ দেখছে, পাথেয় আর রসদটাও যোগাড় করে নিচ্ছে।

ইন্দ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওরা মিষ্টি হেসে ওদের পরিচয় দিয়েছিল। সস্তায় একখানা সিঙ্গল সিটেড রুম চেয়েছিল। বেশি খরচের সঙ্গতি যে নেই তা স্পষ্ট করে না বললেও আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে

দিয়েছিল।

ইন্দ্রের ব্যাপারটা বেশ ভালই লেগেছিল। পথে পরিচয়, জীবনের কতকগুলো দিন একসঙ্গে কাটান, তারপর একদিন যে যার ঘরে ফিরে যাওয়া। কোন দায় নেই, কোন দায়িত্ব বহনের ঝঞ্ঝাটও নেই। হয়ত ওরা সংসারী হবে। যে যার দেশের ছেলে মেয়েদের বিয়ে করে ঘর বাঁধবে। তারপর কোন বিষণ্ণ দিনে মনে পড়বে দুজনের কথা। সারা বিশ্ব জুড়ে ছড়ানো আকুল করা স্মৃতি। ঐ স্মৃতিগুলোই হবে তখন তাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

মোটামুটি সস্তায় একখানা ভাল ঘরই ওদের দিয়েছিল ইন্দ্র। ঘরে বসে সমুদ্র দেখা যায়। দক্ষিণ দিক থেকে একটা ছোট্ট পাহাড় যেন সপরিবারে নেমেছে সমুদ্রে স্নান করতে। উঁচু নীচু কতকগুলো শিলাখণ্ডে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ। শিলাগুলো ঢেউ-এর তলায় একবার ডুবছে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। সূর্যের সোনালী রোদ গায়ে মেখে তেরামালা পাখিরা ওদের স্নানলীলা দেখছে। নুলিয়াদের বড় আকারের কটা ভাল্লম ভোর থেকে সমুদ্র চষে বেড়ায়, তারপর শ্রান্ত হয়ে দুপুরে তীরে উঠেই সেই যে বালুর বিছানায় এলিয়ে পড়ে, দিন রাতে আর নড়নচড়ন নেই। নুলিয়ারা ঐ নৌকোর ছায়ায় ফেঁসে যাওয়া জাল সারাতে বসে।

ঘর পেয়ে ওরা বলেছিল, রেস্ত থাকলে এখানেই মাসখানেক দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যায়।

হঠাৎ আজ রাতে ওদের এমন অভিনয়ের ইচ্ছেটা চাড়া দিয়ে উঠল কেন, তার কারণ সন্ধান করতে গিয়ে ইন্দ্র যা জানল, তার মর্মার্থ এই :

সুগদনের সঙ্গে ঐ দুটি ফটোগ্রাফারের কি করে যেন ভাব জমে যায়। ওরা নারকেল বাগানে ওদের কুড়িল অব্দি ধাওয়া করে। ওখানে সুগদনের সুন্দরী বউ আর ছেলেমেয়েদের ফটো তোলে। ম্যানেজার সাহেব নেই, তাই সুগদন খুশী হয়ে ওদের সাধ্যমত ভোজে আপ্যায়ন করে। ভোজ শেষে কিছু পানীয়ের ব্যবস্থাও ছিল। নারকেল গাছের রস পচিয়ে তৈরী দিশি কোল্লম অতিথিদের সেবার জন্য পরিবেশন করেছে সুগদন। ভিনদেশী সুরা একটু মাত্রাতিরিক্ত পেটে পড়তেই ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। হোটেল থেকে রাত দশটায় ওরা স্নানের পোশাক পরে বেরিয়েছে সমুদ্রে। ভাগ্যিস সুগদন সঙ্গে ছিল তাই রক্ষে। ছেলেটি নাকি সমুদ্রে এ-জীবনের জ্বালা জুড়োবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল, আর মেয়েটি সুগদনের সাহায্যে কাতর অনুনয়ে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল বার বার। এই ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্কল্প আর তা থেকে প্রত্যাবর্তনের পালা পুরো তিন চার ঘণ্টা ধরে অভিনীত হয়। সেই দীর্ঘ তিন চার ঘণ্টা বেচারা সুগদনকে ওখানে দাঁড়িয়ে অতিথি সেবার মাশুল জোগাতে হচ্ছিল।

এখন নাকি ছেলেটির ইচ্ছার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। সে আর আপাততঃ যাচ্ছে না জলের দিকে। মাঝে মাঝে চাঁদ আর নারকেল গাছের দিকে চেয়ে চেয়ে হাত পা নেড়ে বক্তৃতা শুরু করেছে। মেয়েটি কিছুটা নিশ্চিন্ত আর ক্লান্তও বটে, এখন শুয়ে বসে ওর বক্তৃতার তারিফ করছে।

ইন্দ্র জানতে চাইলে, মেয়েটি কি সুস্থ আছে?

সুগদন বলল, না সাহেব, ও আরও বেশি বেহুঁশ হয়েছে।

কি করে বুঝলে?

সুগদন মাথা চুলকে বলল, বলতে পারব না সাহেব।

ইন্দ্র কষে ধমক লাগাতেই সুগদন বলল, শেষবার ছেলেটা যখন জলে ঝাঁপ দিতে যায় তখন মেয়েটা চেঁচিয়ে বলল, এবার যদি জলে নাব তাহলে আমি সুগদনকে সঙ্গে নিয়ে কলম্বো চলে যাব।

সাহেব, ঐ কথা শুনেই আমি পালিয়ে এসেছি। ছেলে বউ ফেলে আমি কি করে ওর সঙ্গে যাই সাহেব। বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠল সুগদন। কাতর গলায় বলল, আমাকে বাঁচান সাহেব, আমি ঐ মেয়েটার সঙ্গে গেলে আর বেঁচে ফিরতে পারব না।

ইন্দ্র দেখল, কেরালার কোল্লম আজ কাউকে ছাড়েনি, তিনটি প্রাণীকেই ঘায়েল করেছে।

সুগদনকে ধমক দিয়ে এক সময় ঘরে পাঠাল ইন্দ্র। তারপর তিনতলায় নিজের ছোট্ট ঘরটিতে উঠে গেল।

এখন আর শোবার কোন মানেই হয় না। চারটে বেজে গেছে। জানালা দিয়ে ইন্দ্র চেয়ে রইল

বাইরের দিকে। তার মনে হল নীল আকাশটা যেন চন্দ্রাতপ। জেগে থাকা চাঁদটা তার গায়ে সংলগ্ন একটা আলো। তার থেকে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে রঙ্গমঞ্চের ওপর। পশ্চাদপটে দিগন্তজোড়া সমুদ্র। সাদা বালির গালচের ওপর শুরু হয়েছে অভিনয়। একটি যুবক আর যুবতী খণ্ডকালের মঞ্চে অনাদি অনন্তকালের অভিনয় করে চলেছে।

দুপুরে ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো।

ওপার থেকে কথা ভেসে এল, কে বলছেন?

ইন্দ্র বলল, আমি সান অ্যান্ড সীর ম্যানেজার বলছি।

গলাটা ইন্দ্রের কাছে একেবারে অচেনা মনে হল।

ওপার থেকে অপরিচিতার গলা বাজল, মিঃ রায় বলছেন?

হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন জানতে পারি কি?

ওপার থেকে ঈষৎ সানুনাসিক গলায় এবার কথা ভেসে এল, আমি ভূত। আরব সাগরের জলে ফেলে দেবার পর আমি উঠে এসেছি।

ইন্দ্র খুব একচোট হেসে নিয়ে বলল, কাছে পিঠে দিদি নেই বুঝি?

সরিতা ওপ্রান্ত থেকে বলল, কয়েক মাইলের ভেতর নেই। প্রেমাকে খুব ভয়, তাই না?

ইন্দ্র বলল, গরীব মানুষ, এসেছি অভাবে পড়ে চাকরি করতে, মালিকের ভয় তো একটু থাকবেই। কিন্তু আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন?

সরিতা বলল, কলেজের কাছে বন্ধুর বাড়ি থেকে।

বান্ধবী কাছে নেই?

ওপ্রান্তে সরিতাকে চাপা গলায় বলতে শোনা গেল, তুই আমার পাশে আছিস কি না জিজ্ঞেস করছে।

তারপর ইন্দ্রের কথার জবাবে বলল, মেয়েরা কখনও কোন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের বান্ধবীদের খোঁজখবর দিয়ে কথা বলতে ভালবাসে না।

ইন্দ্র বলল, এটা উদারতার অভাব।

সরিতা বলল, আজ্ঞে না মশায়, পুরুষ চরিত্র সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতার ফলে মেয়েদের সাবধানতা।

ওপ্রান্তে সরিতার বান্ধবীর হাসি শোনা যাচ্ছে।

ইন্দ্র বলল, অনেকদিনের বান্ধবী মনে হচ্ছে?

কি করে বুঝলেন?

ইন্দ্র বলল, আপনার অনুদার উক্তিকেও হাসি দিয়ে অভিনন্দিত করছে।

হঠাৎ ছন্দপতন হল। ওপারে কিছু একটা অঘটন ঘটেছে।

সরিতার গলার সুর পালটে গেছে। সংকোচ আর বিনয় মিশিয়ে সরিতা বলল, হ্যাঁ স্যার, আপনার নোটগুলো মীনাক্ষী আর আমি কপি করছি। কদিন পরেই আপনাকে ফিরিয়ে দেব। কিন্তু স্যার, রোমিও জুলিয়েটের কি হবে? ও ব্যাপারে একটু সাহায্য না করলে একেবারে যে ডুবে যাব।

দারুণ হাসি পেল ইন্দ্রের। চাপা গলায় বলল, গুরুজন জাতীয় কেউ ঘরে ঢুকে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

সরিতা বলল, হ্যাঁ স্যার। কবে আপনার কাছে যাব বলুন?

একটু থেমে যেন এপারের কথা শুনে নিয়ে বলল, শনিবার? না আমার কোন অসুবিধে নেই। দুপুরে আমি কলেজ থেকে আপনার ওখানে সোজা চলে যাব। আপনারও তো ওদিন কলেজ নেই।

একটু পরেই আবার বলল, আচ্ছা রাখছি স্যার।

ফোনটা রেখে দিল সরিতা।

ইন্দ্র আপন মনে খুব একচোট হাসলে। বুদ্ধিতে ঝক্‌ঝক্ করছে মেয়েটা। পরিস্থিতিকে কেমন

ম্যানেজ করে নিলে।

ইন্দ্রের কানে কেবল বাজতে লাগল দুষ্টু মেয়েটার মিষ্টি গলা, রোমিও জুলিয়েটের কি হবে স্যার।

সূর্য তখন আরব সাগরের জল ছুঁয়ে মস্ত বড় একটা সিঁদুরের টিপের মত স্থির হয়েছিল। ইন্দ্র ওদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে তাই দেখছিল। পেছন থেকে হঠাৎ প্রেমার গলা বেজে উঠল, এই যে মিঃ রায় এখানে, আমি আপনাকে হোটেল আর ব্যাকওয়াটারের দিকে খুঁজে ফিরছিলাম।

ইন্দ্র প্রেমার মুখোমুখি হল। বলল, সাধারণতঃ আমি ব্যাকওয়াটারের দিকেই বেড়াতে যাই, কিন্তু আজ হোটেলের কাউকে না জানিয়ে এদিকে চলে এসেছি।

প্রেমা বলল, গাড়িটা নিয়ে যেতে হবে। কাল একখানা যা কাণ্ড হল, সত্যি!

ইন্দ্র হেসে বলল, বেশ মজা হল বলুন।

মজাই বটে। আমার একটা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আপনার রাতের ঘুমটাই মাটি হল।

বিশ্বাস করুন অনেক বেলা অব্দি ঘুমিয়েছি।

প্রেমা বলল, চলুন একটু হাঁটা যাক। সকাল থেকে ফোনের জ্বালায় কান ঝালাপালা। একটুও ঘুমুতে পারি নি। সন্ধ্যেটা সমুদ্রের ধারে বেড়ালে মাথাটা হালকা হতে পারে।

ইন্দ্র আর প্রেমা বালির ওপর দিয়ে পায়ের পাতা ডুবিয়ে হাঁটতে লাগল।

ইন্দ্র প্রেমার কথার খেই ধরে বলল, ছোট থাকলে দুঃখ, বড় হলে বিপদ, কোন কিছুতেই শান্তি নেই। আপনি এখন নাচের জগতের লাইম লাইটে এসে গেছেন, ঝক্‌কি বাড়বে বৈ কমবে না।

প্রেমা বলল, দর্শকদের অতি উৎসাহে যেমন একটা ঝামেলা আছে তেমনি উত্তেজনা নেই বললে মিথ্যা বলা হবে।

সূর্য ডুবে গেছে অথৈ সমুদ্রের বুকের ঠিক মধ্যিখানে। আরব সাগরের জল এখন সন্ধ্যার নেমে আসা ছায়ার ছোঁয়ায় ঘন আর উত্তাল।

ইন্দ্র বলল, এখানে আসা অব্দি বেশ ক'টি নাচের আসরে যাবার সুযোগ হয়েছে আমার। অধিকাংশ শিল্পীর মুদ্রায় নাচের নির্ভুল ব্যাকরণই শুধু দেখেছি, মন ছুঁতে পারে নি। আপনি কাল কিন্তু প্রতিটি দর্শকের মনের সীমানায় আপনার নাচকে পৌঁছে দিয়েছেন। আপনার 'বাসকসজ্জার' ভাবটি আশ্চর্য মধুর হয়ে ফুটে উঠেছিল।

প্রেমা নিজের ভেতর থেকে কথা বলে উঠল, জানেন, দেবন বলত, তুমি ভুলে যাও তুমি প্রেমা, শুধু ভাব তুমি সেই চিরদিনের প্রেমিকা যার হৃদয় প্রেমিকের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছে। সমস্ত তরুণী হৃদয়ের কামনায় তোমার বুক ভরে উঠুক, তবেই তো তোমার সারা দেহে প্রিয়তমের জন্য প্রতীক্ষার আকুল ছবিটি ফুটে উঠবে।

ইন্দ্র বলল, ভারী সুন্দর কথা তো। কাতরতার ভাবটি কোন ব্যক্তির যেন না হয়, সমস্ত নারীর ভাবনাকে বুকে নিয়ে পথ চাওয়ার ভাবটি ফোটাতে হবে। দেবন কে, মিস মেনন?

প্রেমা বলল, তাঁকে বড় একটা কেউ চেনে না। কিন্তু আমাদের কলাকেন্দ্রমে এতবড় শিল্পী আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না। ও শিখত কথাকলি আর আমি ছিলাম মোহিনী আট্যমের ছাত্রী।

জানেন, সুযোগ পেলেই আমি ওর ক্লাসে গিয়ে বসতাম। শুধু ওর দিকে চেয়ে দেখতাম। গুরু পিল্লাই বলতেন, দেবনের মত শিল্পী কালেভদ্রে জন্ম নেয়। ও জন্মেছে নাচের বিদ্যা আয়ত্ত করে।

ইন্দ্র বলল, আমি ওঁর নাচ দেখি নি। আপনার মুখে ওঁর কথা শুনে দেখতে ইচ্ছে করছে।

প্রেমা ম্লান হেসে বলল, ওকে পাবেন কোথা, ও ঐ এক ধরনের মানুষ। সাজান মণ্ডপে সমঝদারের সামনে ও বড় একটা নাচতে চায় না। ও বলে, কথাকলি আমার কেরালার নাচ। যাদের নাচ, তাদের ঘরে ঘরে একে পৌঁছে দেব আগে, তারপর এ জীবনে সময় যদি পাই বিশ্বজয়ে বেরোব।

ইন্দ্র বলল, আমি নাচের বিশেষ ভক্ত জানবেন, তাই দেবনের মত শিল্পীর নাচ দেখতে পেলাম না বলে বড় আফসোস থেকে গেল।

প্রেমা বলল, ও এখন ঘুরছে গাঁয়ে গাঁয়ে পথে-প্রান্তরে। সাধারণ মানুষকে ও ওর নাচের সমঝদার

করে তুলতে চায়।

ইন্দ্র বলল, আপনারা একই সঙ্গে কলাকেন্দ্রমের শিক্ষার্থী ছিলেন তাহলে?

প্রেমা বলল, একই সঙ্গে না বলে একই সময়ে বলতে পারেন। কথাকলিটা ঠিক মেয়েদের নাচ নয়, যদিও ওতে মেয়েদের ভূমিকা আছে। ওখানে পুরুষেরাই মেয়েদেব ভূমিকায় অংশ নেয়। আর মোহিনী আট্যম পুরোপুরি মেয়েদের নাচ।

ইন্দ্র বলল, কথাকলির নাচে মেয়েদের ভূমিকাটা তো মেয়েরাই নিতে পারেন।

প্রেমা বলল, আমারও সেই মত। আমি একদিন কলাকেন্দ্রমে দেবনকে এই কথা বলেছিলাম। শুনে ও তো ক্ষেপে উঠল। বলল, নাচের বিশুদ্ধতাকে সব সময়ই তোমরা নষ্ট করতে চাও। তোমাদের মোহিনী আট্যমে ভারত নাট্যম আর কথাকলির মিশ্রণ ঘটেছে ঘটুক, কিন্তু দয়া করে আর কথাকলিকে নতুন পোশাকে সাজিও না।

ইন্দ্র বলল, একটু উদারতা থাকলে ক্ষতি কি?

প্রেমা বলল, শিল্পের ক্ষেত্রে দেবন উদারতায় আগ্রহী নয়, বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসী।

হোটেলের বয়টি ছুটতে ছুটতে এল। ইন্দ্রের পাশে এসে বলল, ছোট মেমসাহেবের ফোন এসেছে।

কথাটা শুনেই ইন্দ্রের মনে হল, সে যেন চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছে। এর থেকে উদ্ধারের আর কোন আশাই নেই। সন্ধ্যার আবছায়াতেও সে বুঝতে পারল, প্রেমা তার দিকে চেয়ে আছে চোখে বিস্ময় নিয়ে।

কে যেন কথা জুগিয়ে দিল ইন্দ্রের মুখে। প্রেমার দিকে চেয়ে সে বলল, আপনার খোঁজেই বাড়ি থেকে ফোন এসেছে নিশ্চয়। আপনি কি এখানে আসার কথা বলে আসেন নি?

প্রেমার চোখের দৃষ্টি সহজ হল। সে বলল, হয়ত তাই। কোন দরকারে আমার খোঁজ করছে সরিতা।

দুজনেই হোটেলের দিকে পা বাড়াল।

হোটেলে পৌঁছে ফোনটা তুলে নিল ইন্দ্র।

হ্যালো।

ও প্রান্ত থেকে সরিতা বলল, ম্যানেজার সাহেব হোটেলে নেই, এ তো বড় অন্যায়। আমি প্রেমা মেননের কাছে প্রতিবাদ জানাব।

ইন্দ্র অপরাধীর গলায় বলল, আমি এই একটুখানি বাইরে বেরিয়েছিলাম। হ্যাঁ আপনার দিদি এখানেই এসেছেন, কথা বলুন।

প্রেমা ফোন ধরল। ইন্দ্রের তখন কিছুটা ঘাম দিয়ে জ্বর নেমেছে। প্রথম ধাক্কাটা সামলানো গেছে।

প্রেমা বলল, গাড়িটা নিতে এসেছি।

ওপারের প্রশ্নের জবাবে আবার বলল, হ্যাঁ সাইকেলে করেই এলাম। তুই অপেক্ষা কর, সাতটার ভেতর আমি এসে পৌঁছব।

প্রেমা ফোন ছেড়ে দিয়ে ইন্দ্রের দিকে এক মুখ হাসি ছড়িয়ে বলল, একেবারে পাগল। একটুখানি চোখের আড়াল হলেই খুঁজে খুঁজে সারা দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলবে। জানেন মিঃ রায়, উঠতে বসতে ওর গার্জেনীর ঠেলায় গেলাম। ওর রকম-সকম দেখে সবাই ভাবে, ও-ই বুঝি আমার দিদি।

ইন্দ্র এখন প্রাণ খুলে প্রেমার হাসিতে যোগ দিল।

প্রেমা বলল, চলুন, আপনার রুমে বসে একটু কফি খাওয়া যাক।

একটু থেমে আবার বলল, আপনি তো নিজের থেকে বললেন না, তাই চেয়ে নিতে হল।

ইন্দ্র বলল, এ যেন আপনি নিজের ঘরে পরবাসী হয়ে থাকার কথা বললেন। আমি আপনাকে আতিথ্য দেবার কে! আপনার হোটেলে কাজ করছি বই তো নয়।

ওপরে উঠতে উঠতে প্রেমা বলল, আমি হোটেলের প্রোপ্রাইট্রেস ঠিক, কিন্তু আপনি এ হোটেলের কর্মপরিচালক। সুতরাং হোটেলের ভেতর আপনার কর্তৃত্ব আমার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

ওরা এসে ঢুকল ইন্দ্রের ঘরে।

সুন্দর সাজানো ঘর। ব্যাচিলারের ডেরা বলে মনেই হয় না। প্রায় মাস দশেক ইন্দ্র চাকরিতে বহাল হয়েছে, কিন্তু প্রেমা ইন্দ্রের রুমে ঢোকে নি কোনদিন। হোটেলে এসে চলে গেছে কাজ সেরে। অফিস রুমে বসেছে, দরকারি কথা বলেছে, ওপরে ওঠার কথাই ওঠে নি।

প্রেমাকে একখানা চেয়ারে বসতে বলে নীচে নেমে গেল ইন্দ্র। কফি আর কিছু জলখাবারের অর্ডার দিতে গেল সে। হোটেলের একটা বয়কে ওপরে ডেকে অর্ডার দিতে পারত, কিন্তু তাতে দুটো অসুবিধে দেখা দিত। প্রেমা যেহেতু মালিক, তার সামনে অর্ডার জানানো শোভন নয়।

আর কিছু স্ন্যাক্স ইত্যাদির অর্ডার দিতে গেলে প্রেমা হয়ত বারণ করেই বসবে। তাই ইন্দ্র নিজেই অর্ডার দিতে গেল। আজ প্রেমা তার রুমে এসেছে সান্ধ্য কফির আসরে। ধরা যেতে পারে তার আতিথ্য নিয়েছে।

প্রেমা ঘরখানার দিকে তাকিয়ে দেখছে। লম্বা সাদা একখানা বুক শেলফ ইংরাজি, বাংলা বইতে ঠাসা। বইগুলো সাজানোর ভঙ্গিটা অদ্ভুত। মনে হবে কোন বিশিষ্ট বুক শপের শো কেসে বই সাজানো রয়েছে। শেলফ-এর ওপরে মার্বেল পাথরের একসার হাতি চলেছে। পর পর বড় থেকে ছোট অনেক ছোট হয়ে গেছে হাতিগুলো। এগুলো যে কেরালার জিনিস নয় তা ভাল করেই জানে প্রেমা। ঘরের কোণে পেতলের একটা ঝকঝকে মাজা টব সাদা লম্বা গ্রীলের কাজ করা কাচের টপের ওপর বসানো। তার পাশে একটা লম্বা সাদা রড সিলিং ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টবের থেকে মানিপ্ল্যান্টের একটা লতা প্রায় আদ্দেক উঠে গেছে ঐ রডখানাকে পাক দিতে দিতে। পাতাগুলো সবুজ-হলদে মেশা। বিছানার ওপর যে বেড কভার পাতা তার রঙও হলদে। দুই প্রান্তের বর্ডারে কালো লাল আর সবুজ সুতো দিয়ে ডিজাইন তোলা। সব জায়গাতেই ছিমছাম একটা রুচির পরিচয়।

ইন্দ্র ঘরে ঢুকে বলল, আপনাকে একা বসিয়ে রেখে গেলাম, অপরাধ নেবেন না।

প্রেমা বলল, আপনার ঘরে বসে থাকলে কারো একা বলে মনে হয় না। একটা কিউরিও শপে বসে আছি বলে মনে হবে।

ইন্দ্র বলল, সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে না রাখতে জানলে হোটেল সাজাব কি করে। এটা তো আমাদের কাজেরই অঙ্গ।

খাটের পাশে টিপয়ের ওপর রাখা ফ্লাওয়ার ভাসে ফুল সাজানো। সাজাবার ভঙ্গিটা মুহূর্তে চোখ টেনে নেয়।

প্রেমা বলল, আপনার ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর।

ইন্দ্র বলল, ও কথা বলবেন না। দক্ষিণীদের কাছে ভারতের আর সবাইকে ফুলের ব্যবহার শিখতে হবে। আপনার সারা দেহ ভরে ফুলেরই উৎসব।

প্রেমা বলল, আপনি কবি তাই বলছেন অমন করে। তবে ফুল আমরা ভালবাসি। আমাদের সব উৎসবেই ফুলের ঘটা। কিন্তু আপনার ফুলদানি সাজানোর কায়দাটাই আলাদা।

ইন্দ্র বলল, ও বিদ্যেটা বিদেশ থেকে আমদানি করা মিস মেনন। ওটা ইকাবানা। জাপানি ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টের কায়দাতেই সাজানো।

প্রেমা মুগ্ধ গলায় বলল, আমার খুব ভাল লেগেছে।

ইন্দ্র হেসে বলল, সমজদার তো পাই না, ভাগ্যিস আপনি দয়া করে আজ এলেন।

প্রেমা বলল, সত্যি আমি আপনার রুমে কখনো আসি নি। বাবা বেঁচে থাকতে সবই দেখতেন তিনি, আমি আমার পড়া আর নাচ নিয়েই থাকতাম। ওঁর অবর্তমানে একজন এ দেশীয় ম্যানেজারের ওপর ভার দিয়েছিলাম। তিনি কিছুকাল পরে আলেপ্পিতে নিজের হোটেল করে চলে গেলেন, তারপর এলেন আপনি।

ইন্দ্র হেসে বলল, কথা দিচ্ছি আমি অন্ততঃ হোটেল করে কোথাও উঠে যাব না।

প্রেমাও ইন্দ্রের হাসিতে যোগ দিল।

কিছুক্ষণের ভেতরই আবার নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল প্রেমা। বলল, কাউকে কি চিরদিনের করে ধরে রাখা যায় মিঃ রায়।

কথাটা শুনে চমকে উঠল ইন্দ্র। একটি পূর্ণবিকশিত তরুণী বসে আছে তার সামনে। কৃতী নর্তকী প্রেমা মেননের কথায় কি অন্য কোন সুর বাজছে!

ইন্দ্র বলল, আমার দিক থেকে অন্ততঃ চলে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য আপনাদের যদি কোনদিন প্রয়োজন ফুরোয়, তাহলে সে আলাদা কথা।

আপনি কথাটা অন্যভাবে নেবেন না মিঃ রায়। আজ ঘুরে ফিরে কেবল দেবনের কথাই মনে পড়ছে। একে একদিন মনের ভেতর ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওকে চিরদিনের করে তো ধরে রাখা গেল না। তাই বলছিলাম, আমাদের ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়ে ওঠে না।

ইন্দ্র বুঝতে পারল, আজ সে প্রেমার উপলক্ষ হলেও আসল লক্ষ্য দেবন। প্রেমার জীবনে দেবন হয়ত কোনদিন এসে দাঁড়িয়েছিল, তার প্রতিভার পরিচয়লিপি উৎকীর্ণ করে গিয়েছিল। তাই প্রেমা মাঝে মাঝে অতীত স্মৃতির দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

কফি আর কিছু খাবার নিয়ে বয় ঢুকল ঘরের ভেতর। খাবার সাজিয়ে রেখে চলে গেল। প্রেমা অন্যমনস্কভাবে কাপে কফি ঢালতে লাগল। ইন্দ্র প্রেমাকে লক্ষ্য করল। কেরালার অধিকাংশ মেয়ে যেভাবে চুলের রাশ পিঠের ওপর ফেলে শুধু প্রান্তে একটুখানি বেঁধে রাখে, প্রেমা তেমনি করেই চুল বেঁধেছে। ঘাড় কাৎ করে কফি ঢালবার সময় সে এমন দর্শনীয় ভঙ্গিতে মুখখানাকে ফুটিয়ে তুলছে, যেখান থেকে সহজে চোখ সরিয়ে নেওয়া যায় না।

প্রথম কফির কাপ প্রেমা তুলে দিল ইন্দ্রের হাতে। বলল, কফিতে দু'চামচ চিনি দিলাম আপনাকে না জিজ্ঞেস করেই।

ইন্দ্র বলল, আপনার আন্দাজ বোঝা গেল অব্যর্থ। আমি দু'চামচ চিনিই নিয়ে থাকি।

নিজের কাপ ঠোঁটে ঠেকিয়ে কি যেন শোনার চেষ্টা করল প্রেমা। এক সময় বলল, আচ্ছা ঘণ্টার টুং টাং একটা আওয়াজ কোত্থেকে আসছে বলুন তো। খুব মৃদু অথচ ভারী মিষ্টি একটা আওয়াজ। শুনতে পাচ্ছেন না?

ইন্দ্র মুখে হাসির রেখা টেনে ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকাল। প্রেমার চোখ পড়েছে এবার। সে গলায় বিস্ময়ের সুর তুলে বলল, আমি এতক্ষণ মাথা ঘামিয়ে মরছি শব্দটার উৎস নিয়ে, কিন্তু এখন দেখছি আপনার ঘর থেকেই উঠছে।

একটা পেতলের চেন সিলিং থেকেই ঝোলান। তার থেকে ঝুলছে ছোট বড় মাঝারি প্রায় ডজনখানেক ঘণ্টা। সামান্য হাওয়ায় দুলে দুলে মৃদু মিষ্টি একটা আওয়াজ ছড়াচ্ছে।

প্রেমা চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, আপনি একজন শ্রেষ্ঠ সমঝদার মিঃ রায়, কিন্তু শিল্পী নন।

ইন্দ্র কথাটা এভাবে শুনবে আশা করে নি, তাই চমকে উঠল। উত্তরে শুধু বলল, আপনার অনুমান নির্ভুল। নিজে শিল্পী না হলেও শিল্পবস্তুর ওপর আমার একটা মোহ আছে। কিন্তু আপনার এই নির্ভুল অনুমানের কারণটা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

প্রেমা বলল, কারণ খুব সোজা। আমি নাচ কম্পোজ করি, সারাদিন ওরই ভাবনায় আমার কেটে যায়, কিন্তু নাচের অলংকার পোশাক পরিচ্ছদ ফুল পাতার খবরই আমি রাখি না। আমার সব কিছুই এলোমেলো হয়ে থাকে। সরিতা না থাকলে আমি অন্ধ। ও-ই আমাকে সাজিয়ে স্টেজে পাঠায়। আমার যদি সামান্য কিছু কৃতিত্ব থাকে তাহলে তার আদ্দেকের বেশি ওরই প্রাপ্য।

ইন্দ্র মনে মনে খুশী হয়ে বলল, সেদিন স্টেজে কিন্তু আপনাকে অসামান্য মনে হয়েছিল। আপনার সাজে আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু বেশ-বাস অলংকরণে এমন নিখুঁত একটা হারমনি ছিল যা চোখকে সারাক্ষণ বেঁধে রেখেছিল।

প্রেমা তদগত হয়েছে মনে হল। সে বলল, মোহিনী আট্যমের পোশাকে, ফুলের কাজে শুধু সাদারই মেলা। আমার মনে হয় যিনি প্রথম নাচের পোশাক পরিকল্পনা করেছিলেন, তিনি ছিলেন যথার্থ একজন ভাবুক। পোশাকের চমকে শিল্পী দর্শকদের ভোলাবে এটা তিনি চান নি। সাদা পোশাকে শিল্পীর সারা দেহের প্রতিটি রেখা শ্বেত পাথরের তৈরি মূর্তির মত ফুটে উঠবে, সেখানেই তো সবকিছু চার্ম। তার

ওপর যখন সেই শ্বেত ভাস্কর্য নাচের লীলায় মেতে ওঠে তখনই সে হয় মোহিনী।

ইন্দ্র বলল, আপনার ব্যাখ্যার তারিফ না করে পারছি না। অ্যাপোলো অথবা ডেভিডের মূর্তি কিম্বা ভেনাসের ছবি হঠাৎ যদি প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে তাহলে সে বিস্ময়, সে রোমাঞ্চ ধরে রাখা যায় না। তাদের নগ্নতা তখন চোখের পীড়া না হয়ে প্রাণের উৎসব হয়ে ওঠে।

প্রেমা হঠাৎ অন্যমনস্ক হল। আশ্চর্য সুন্দর মুদ্রায় গালে আঙুল ঠেকিয়ে অন্য মনে চেয়ে রইল।

এক সময় বলল, কথাকলি কিন্তু তুলনাহীন। যদিও শিল্পী সারা পোশাকের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে, তবু তার অভিব্যক্তি অসাধারণ। দেবন বলে, দেহ দেখিয়ে তোমরা আদ্দেক জয় কর, বাকীটুকু মুদ্রায়। কিন্তু আমরা আড়ালে থেকে আমাদের সম্পদকে বিলিয়ে দিই।

ইন্দ্র বলল, কথাটার আংশিক সত্যতা হয়ত আছে, কিন্তু দেবনের উক্তিটা শোনাচ্ছে অহংকারের মত।

প্রেমার গলার স্বরে উত্তেজনা, আপনি ঠিকই বলেছেন। দেবন অহংকারী কিন্তু অহংকার দেবনেরই শোভা পায়। সে যাদুকর, তার প্রতিটি মুদ্রায় চুম্বকের আকর্ষণ।

ইন্দ্র হেসে বলল, কিছু মনে করবেন না মিস মেনন, আপনি মনে হয় দেবনের সবচেয়ে বড় গুণগ্রাহী।

প্রেমা কোন কথা বলল না। সে ইন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। ইন্দ্র বুঝল, প্রেমার চোখ রয়েছে তার দিকে কিন্তু আসল দৃষ্টিটা হারিয়ে গেছে নিজের মধ্যে।

এক সময় প্রেমা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। ব্যস্ত হয়ে বলল, মিঃ রায়, আপনার সান্ধ্য কফির জন্য ধন্যবাদ। সরিতা আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে।

দরজা পেরিয়ে করিডোর দিয়ে প্রেমা দ্রুত সিঁড়ির দিকে চলল। এক সময় পেছন ফিরে ইন্দ্রকে বলল, আপনার রুচি আর আলোচনার জন্য আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত লয়ে নেমে গেল প্রেমা। ইন্দ্র তার পেছনে পেছনে নীচে নামল। প্রেমা কিন্তু আর কোনদিকে না তাকিয়ে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ইন্দ্র এগিয়ে গিয়ে বলল, আপনার চাবি।

প্রেমা মিষ্টি একটা হাসি হেসে চাবিটা ইন্দ্রের হাত থেকে নিয়ে গাড়ি খুলে ঢুকে বসল।

ভোরের রোদের মত লাবণ্যে মাখা হাতখানা গাড়ির বাইরে বের করে নাড়ল, তারপর গাড়ি চালিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হোটেলে উঠে এসেই ইন্দ্র ফোনের লাইনটা নিজের রুমে নিয়ে নিল। তারপর তিনতলায় উঠে বিছানার ওপর বসে ডায়েল করল।

ও প্রান্তে ফোন ধরল সরিতা, হ্যালো।

ইন্দ্র বলল, কে বলছেন?

ওপার থেকে উত্তর এল, কাকে চাই আপনার?

সরিতাকে।

আপনি কে বলছেন?

ইন্দ্র সরিতার গলা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, আমি ছাড়া আপনার আর কটি পুরুষ বন্ধু আছে মিস মেনন?

অমনি সরিতা ফোঁস করে উঠল, আপনার মত আমার বন্ধুর সংখ্যা অত বেশি নয় মানি, তা বলে একটিমাত্র মানুষের কথার জন্যে কান পেতে আছি ভাবলেন কি করে?

ইন্দ্র বলল, তর্ক থাক, কি বিপদেই না ফেলেছিলেন আজ। দিদির সঙ্গে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছি, হোটেলের বেয়ারা গিয়ে বলল, ছোট মেমসাব আপনাকে ফোনে ডাকছেন।

তাই বুঝি?

ইন্দ্র বলল, এমন বিপদে কস্মিনকালেও পড়িনি। প্রেমার মুখ তো বিস্ময় চিহ্ন এঁকে আমার দিকে

চেয়ে আছে। যা হোক অদৃশ্য দেবতাই শেষটায় হাল ধরে রক্ষা করলেন।

সরিতা বলল, প্রেমা এখন কোথায়?

ইন্দ্র দুষ্টুমি করে বলল, আমার ঘরে বসে আছেন।

সরিতার গলায় বিস্ময়, সে কি! কি করছে?

তাঁর বোনের জন্য ঘটকালী করছেন।

সরিতা বলে উঠল, নিজের জন্যে নয় তো?

মেয়েরা দারুণ অবিশ্বাসী। পুরুষদের চেয়েও মেয়েরা মেয়েদের সন্দেহ্ করে বেশি।

সরিতা বলল, আর সেই সুযোগে ভালমানুষ ছেলেগুলো মেয়েদের ঠকিয়ে আনন্দ পায়।

ইন্দ্র বলল, আপনার এ অপবাদ থেকে একজন পুরুষ এখনও নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে।

সরিতা অমনি বলল, তাহলে জিতেন্দ্রিয় পুরুষটির মুখখানা তো আর একবার ভাল করে দেখতে হয়।

ইন্দ্র অমনি বলল, বন্ধুর বাড়ি থেকে যে ফোনে বললেন শনিবার পড়তে আসছেন প্রফেসারের বাড়ি, তাহলে আসছেন তো?

আপনি কি আমার প্রফেসার? তিনি আমার অনেক শ্রদ্ধেয়।

ইন্দ্র বলল, আশা করি আমি এখনও কারো চোখে দারুণ রকম একটা অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠিনি।

সরিতা বলল, শনিবার তৈরি থাকবেন।

আদেশ মানাই আমার কাজ।

সরিতা ফোন রেখে দেবার আগে বলল, মনে থাকে যেন।

ইন্দ্র ফোনটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

শনিবার ভোর হল। প্রথম হেমন্তের হাওয়ার মত শিরশিরে একটু অনুভূতি ছুঁয়ে গেল ইন্দ্রের সারা দেহমন। সে বিছানায় শুয়ে জানালার ফাঁকে তাকিয়ে দেখল কাট্টুমারমে চেপে হোটেলের সেই ভুবন ভ্রাম্যমাণ ফটোগ্রাফার যুগল সমুদ্র চষতে বেরিয়েছে। নুলিয়া পাল সামলাচ্ছে আর ওরা দুটিতে বৈঠা পিটছে জলে।

ইন্দ্রের মনে হল, কত সুখী ওরা। হাওয়ার সমুদ্রে ডানা ভাসিয়ে পাখির মত সারা দুনিয়ায় উড়ে চলেছে।

ইন্দ্র বিছানার ওপর উঠে বসতেই পেছনের জানালায় চোখ পড়ল। নারকেল গাছের মাথা ছুঁয়ে সকালের একফালি সোনালী আলো লম্বা উত্তরীয়ের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। সুগদনের বছর ষোল বয়েসের মেয়ে কেনাগাম্মা সেই উত্তরীয়ের খানিকটা বুকে জড়িয়ে নিজের দিকে চেয়ে দেখছে। কি যেন একটা পাখি শিস্ দিয়ে ওর চোখের তন্ময় চাউনিটা কেড়ে নিল।

আজ এই মুহূর্তে দারুণ একবকমের ভাল লাগায় পেয়ে বসল ইন্দ্রকে। তার নিজেকে মনে হল কবি হাফিজ—যিনি বোখারা সমরখন্দের মত দুটি নগরীকেও একটি তুর্কী মেয়ের কালো তিলের বিনিময়ে বিলিয়ে দিতে রাজি ছিলেন।

বেলটা অনেকক্ষণ ধরে বাজাল ইন্দ্র। হোটেলের বেয়ারাটির পড়ি কি মরি করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসার শব্দ শুনতে পেল সে। ঘরে এলে তাকে অর্ডার দিল কফির।

নীচ থেকে কানেকশান নিয়ে ইন্দ্র ফোন তুলল। প্রেমার বাড়িতে ডায়াল করতে গিয়ে তার মনে হল, যদি সরিতা না ধরে প্রেমা ফোন ধরে তাহলে কি কথা বানিয়ে বলবে সে। আবার ফোনটাকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে সে ভাবতে বসল।

সেকেন্ড থটে তার মনে হল, সে ফোন করবে না। প্রতীক্ষা করবে প্রতিটি মুহূর্ত সরিতার জন্যে। এক সময় রাগ হল সরিতার ওপর। তিন তিনটে দিন পার করে শনিবার এল, সরিতা কি এর ভেতর তাকে একবারও ফোন করার সুযোগ পেল না। ইন্দ্র ভাবল, এত উতলা হবার কি আছে। সরিতা তার খবর না নিয়ে যদি তিন দিন কাটিয়ে দিতে পারে তবে সে-ই বা পারবে না কেন।

আশ্চর্য, ইন্দ্রের এলোমেলো ভাবনার ভেতরেই ফোন বেজে উঠল। সরিতার ফোন।

হ্যালো, বলতেই ওপ্রান্ত থেকে সরিতা বলল, মশায়ের আশাকরি সুনিদ্রা হয়েছে?

ইন্দ্র বলল, মালিক নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেলে তবেই কর্মচারিদের সুনিদ্রা হয়।

সরিতা বলল, আপনি দেখছি কর্মচারি হিসেবে একদম কাঁচা। মালিক পক্ষ যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোয় তখনই তো কর্মচারিদের জেগে থাকার পালা। ঐ সুযোগে কিছু হাতিয়ে নেওয়া যায়।

ইন্দ্র বলল, কাঁচা থেকেই যদি এমন পাওনা জোটে তাহলে পাকা হওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই আমার।

সরিতা বলল, জানি না আপনি কি পেয়েছেন তবে আমি একজন বন্ধু পেয়েছি।

মালিক বোধ হয় কাছেপিঠে নেই?

সরিতা বলল, মালিক এখন নতুন উত্তেজনায় মেতেছে। সরকার থেকে এসেছে আমন্ত্রণ। বিদেশ থেকে আসছেন কোন এক বিশিষ্ট সরকারি অতিথি, তাকে নাচ দেখাতে হবে। তার প্রস্তুতি চলেছে পুরোদমে।

ঘরেই তাহলে অনুশীলন চলেছে বলুন।

সরিতা বলল, আজই সরকারি গাড়িতে রওনা হয়ে গেছে। কদিন খাতিরে থাকবে সরকারি অতিথিশালায়। ওখানে কথাকলি মোহিনী আট্যম, আরও অনেক লোকনৃত্যের দলও জমায়েতা হবে। রিহার্সেল চলবে পুরোদমে। এ দু'তিনটে দিন আমারও হিপ হিপ হুররে।

ইন্দ্র বলল, আহা দিদির ওপর কি ভক্তি, কি টান।

সরিতা বলল, আমার টান না থাক কিন্তু আর কারো টান থাকলেই মুশকিল।

ইন্দ্র কথা পাল্টাল, আসছেন কখন।

সরিতা ওপার থেকে বলল, যাব কি না ভেবে দেখছি।

তিন দিন ধরে ভেবে ভেবেও স্থির করতে পারলেন না?

সরিতা বলল, কলেজে গানের কম্পিটিশান আছে, তাই এ ক'দিন গলা নিয়ে পড়েছি।

আপনি যে গান জানেন তা তো জানতাম না।

সরিতা বলল, জানবার মত গান নয় তাই জানতে পারেননি। নইলে রেডিও খুললে অথবা রেকর্ড চালালে জানতে পারতেন।

একটু থেমে আবার বলল, তিনটেয় তৈরি থাকবেন। তিন দিনের মত হোটেল থেকে ছুটি করে নিতে হবে।

ইন্দ্র বলল, তিন দিন!

সরিতা বলল, থাক তাহলে, আপনি আপনার হোটেল নিয়েই থাকুন।

রাগ করছেন কেন হোটেলটা তো আপনাদেরই। ভালভাবে তার দেখাশোনা করলে লাভ হবে মালিকের।

সরিতা বলল, এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন মশাই। আহা দুনিয়ার সব কটা হোটেল যদি আপনার মত একজন করে ম্যানেজার পেত তাহলে তাদের পয়সা রাখার জায়গা থাকত না।

ইন্দ্র বলল, কর্তার ইচ্ছেতে কর্ম। আমি এখন থেকেই তৈরি।

সরিতা বলল, কাজের মানুষেরা কাজের ভেতর থেকেই ছুটি বের করে নিতে জানে, যারা কাজ করতে জানে না তারা ছুটি ম্যানেজ করতেও জানে না।

ইন্দ্র বলল, জন্মে জন্মে যেন মেনন বোনদের মত মালিক পাই।

সরিতা বলল, তা বলে ভাববেন না আপনার মত কাজ পাগল ম্যানেজার আমি জন্মে জন্মে চাইব।

ইন্দ্র বলল, আমি ঠিক তিনটেতে তৈরি থাকব।

আমি কিন্তু একটি মিনিটও দাঁড়াব না।

ইন্দ্র হেসে বলল, দাঁড়াবেন কেন, হোটেলে বসার ভাল ব্যবস্থা আছে।

সরিতা বলল, ফোন রাখছি, কথাটা মনে থাকে যেন। বসাটসার ভেতর আমি নেই।

তথাস্তু।

ফোন ছেড়ে দিল সরিতা।

কাঁটায় কাঁটায় তিনটে, সুগদনের মেয়ে কেনাগাম্মা এসে দরজার বাইরে দাঁড়াল।

ইন্দ্র চোখ তুলে তাকাতেই কেনাগাম্মা বলল, ছোট মেমসাহেব আপনাকে ডাকছেন।

ইন্দ্র তৈরি হয়েই ছিল, বেরিয়ে পড়ল কেনাগাম্মাকে সঙ্গে নিয়ে। নারকেল বাগান পেরিয়ে রাস্তার কাছাকাছি এসে কেনাগাম্মা থেমে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল ইন্দ্র।

গাড়ির স্টিয়ারিং-এ গাল ঠেকিয়ে ইন্দ্রের দিকে চেয়েছিল সরিতা। ইন্দ্র কাছাকাছি যেতেই সোজা হয়ে বসল।

ইন্দ্র কাছে গিয়ে বলল, আপনি দারুণ পাংচুয়েল।

অপরাহ্ণের রোদে সরিতার মুখে একরাশ জুঁই ফুল ফুটে উঠল।

সরিতা কিন্তু কোন কথা বলল না। ইন্দ্র বাঁ-দিকের দরজা খুলে ঢুকে বসল সরিতার পাশে। সরিতা সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে পূর্ব-উত্তর মুখের একটা পথ ধরল।

দুজনেই নীরব। সরিতা পথের দিকে সিধে চোখ রেখে গাড়ি চালাচ্ছে, আর ইন্দ্র আড়চোখে দেখছে সরিতাকে।

একেবারে টিপিক্যাল মালয়ালী তরুণী। মসৃণ মাজা রং। ঘন চুলের রাশ, শেষ অংশটুকুতে সুন্দর একটুখানি সাদা ফুলের কাজ। সরিতা মুণ্ডি পরেছে। সাদা কোচান লুঙ্গী। হাল্কা নীল রংয়ের জম্বরে বুক ঢাকা। তার ওপর দিকে ব্রোচে আঁটা সোনালি পাড় একখানা সিল্কের সাদা নেরিয়দ প্রপাতের মত বুকের ওপর ঢেউ তুলে কোমর অব্দি নেমে এসে পাক খেয়ে দেহের গভীরে হারিয়ে গেছে।

ভারী মিষ্টি একটা গন্ধ ইন্দ্রের নাকে এসে লাগছে। ওটা সরিতার বিনুনীতে বাঁধা ফুলের গন্ধ কি উর্ধ্ববাস জম্বরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা ঘামের সঙ্গে মিশ্রিত কোন সৌগন্ধ তা ইন্দ্র অনুমান করতে পারল না।

সেই মুহূর্তে ইন্দ্রের কেন জানি না মনে হল, সরিতা দ্রুত ধাবমান এক কস্তুরী মৃগ। আপন যৌবনের সুবাসে আপনি বিভোর।

ইন্দ্র বলল, আমরা এখন কোথায় চলেছি?

একটা গাড়িকে ওভারটেক করে বেরিয়ে গিয়ে সরিতা বলল, জানি না।

সে কি, নির্দিষ্ট কোন জায়গা নেই যাবার?

সরিতা গাড়ির স্পীড কমিয়ে নিয়ে বলল, ইচ্ছে হলে এখনও আপনি ফিরে যেতে পারেন।

তাই বুঝি আমি বলেছি!

সরিতার গাড়ির পাশ দিয়ে পেছনের গাড়িটা সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

সরিতা আবার স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে। সামনের গাড়িটার সঙ্গে ব্যবধান কমিয়ে আনতে আনতে বলল, হাতে স্টিয়ারিং, যেখানে খুশি যাব।

ইন্দ্র আর কোন কথা বলল না। সে দেখল সরিতা দুটো ঠোঁট এক সঙ্গে চেপে ধরে একাগ্র দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে ঝুঁকে পড়ে গাড়ি চালাচ্ছে।

আবার সরিতার গাড়ি প্রতিযোগিতায় জিতে গেল। এখন আরও স্পীডে বেশ কিছু দূর চলে এসে সরিতা অনেকটা স্বাভাবিক হল।

ইন্দ্র বলল, আপনার ভেতর একটা উত্তেজনা সব সময় কাজ করছে।

কি রকম?

এই যেমন লরীটাকে ওভারটেক করা, হুট করে সামান্য পরিচিত একটি যুবকের সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়া।

কি বললেন? আর একবার বলুন।

ইন্দ্র বলল, এইটুকু পরিচয়ে কাউকে কি সত্যিকারের চেনা যায়?

সরিতা বলল, চেনা গেলে ওতেই যায়, নইলে সারা জীবন চোখে চোখ পেতে বসে থাকলেও চেনা

যায় না।

গাড়ি চলছে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে। মাখন রংয়ের মাম্‌পুতে আমের গাছ ভরে আছে। যেন কোন দক্ষ কারিগর ছোট ছোট মুক্তোর দানায় মুকুট তৈরি করে সাজিয়ে রেখেছে গাছের শাখায় শাখায়। পড়ন্ত বেলায় মেয়েরা জল নিতে এসেছে। কিনারের চারপাশে বাঁধান বেদীতে কেউ বা ছড়িয়ে বসেছে, কেউ বা কুডমে ইতিমধ্যেই জল ভরে মাথায় তুলেছে। চলে যাবার আগে আলাপিনীদের সঙ্গে হয়ত দু-চারটে রসিকতার কথা বলছে। চেম্বু কুডম্‌, পিত্তলকুডম্‌, আর মান কুডমের ছড়াছড়ি দেখে মনে হচ্ছে তামা পেতল আর মাটির কলসীর যেন হাট বসেছে।

গাড়িটা একটু থামাবেন, বড্ড জল তেষ্টা পেয়েছে—শুকনো গলায় বলে উঠল ইন্দ্র।

সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল সরিতা।

গাড়ি থেকে নেমে বলল, চলুন কিনারের ধারে। আঁজলা ভরে খেতে হবে কিন্তু।

ইন্দ্র আর সরিতা এগিয়ে গেল কুয়োর দিকে। আট-দশটি মেয়ে তখন নির্বাক হয়ে ওদের দেখছে। যে মেয়েটি কিনার থেকে জল টেনে তুলছিল তার হাতের দড়ি হাতেই ধরা রইল। কুয়োর মাঝপথে ভরা বালতি দোল খেতে লাগল।

ইন্দ্র তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমার হাতে একটু জল ঢেলে দেবেন, তেষ্টা পেয়েছে।

সব ক'টি চোখ একঝাঁক ভোমরার মত ইন্দ্রের দিকে ধেয়ে গেল।

যে মেয়েটির বালতি কুয়োর ভেতর দুলতে দুলতে থেমে গিয়েছিল সেই তরুণী মেয়েটি সিঁড়ির ওপর বাঁ পাখানা রেখে দু'হাতে দড়ি ধরে দ্রুতলয়ে টানতে টানতে বালতিটাকে তুলে আনল ওপরে।

নিজের পিত্তলকুডমে জলটুকু ভরে নিয়ে সেই কলসী ওপরে তুলে অনেক যত্ন করে ইন্দ্রের অঞ্জলি করা হাতের ভেতর ঢালতে লাগল।

ইন্দ্র স্যুটখানা বাঁচিয়ে ঠোঁট দুটো সরু করে জল খাচ্ছিল। কিছু পরে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল, তৃষ্ণা তার মিটেছে। অমনি সরু জলধারাটা ইন্দ্রের হাত থেকে ম্যাজিকস্টিকের মত অদৃশ্য হয়ে গেল পিত্তল কুডমের ভেতর।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে সরিতা দেখছিল। ইন্দ্র তার কাছে ফিরে এল। দুজনে মিষ্টি করে হাসল মেয়েদের দিকে চেয়ে। ওরা কেউ কেউ হাসি দিয়ে প্রত্যুত্তর দিল ওদের।

একটি তরুণী মেয়ে সরস গলায় বলল, কোথায় চলেছেন?

সরিতা যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল, থেমে দাঁড়িয়ে মুখখানাকে কাত করে ফেরাল। চোখে মুখে খুশীর ঢেউ তুলে বলল, যে দেশের আকাশে চাঁদ ডোবে না আর ফুলের থেকে মধু গড়িয়ে পড়ে তো পড়েই।

মেয়েটি বুদ্ধিমতী। অমনি বলে উঠল, হানিমুনে যাচ্ছেন?

সরিতা পেছনে হাত নাড়তে নাড়তে গাড়ির দিকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল। আর মেয়েরা কলহাস্যে যেন তাদের ভরা কলসীর জল উজাড় করতে লাগল কুয়োর ভেতর।

ইন্দ্র কথাটা শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু সে আগেই পা চালিয়ে চলে এসেছিল গাড়ির কাছে। সরিতা এলে সে তার জায়গায় গিয়ে বসল। সরিতা গাড়িতে স্টার্ট দিলে ইন্দ্র একবার মুখ বের করে হাত নাড়ল। অমনি একরাশ পাতা যেন চঞ্চল হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ওদের অভিনন্দন জানাতে লাগল। যতক্ষণ ওদের দেখা গেল ততক্ষণ ওরা অক্লান্ত উৎসাহে হাত নেড়ে চলল।

এক সময় গাড়ি চালাতে চালাতে সরিতা বলল, আপনি তো দেখছি দারুণ গুণী লোক মশাই।

কি রকম?

ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে পারেন।

ইন্দ্র মাথা চুলকে বলল, আর একটু সহজ করে বলুন।

এই যেমন ঠিক জায়গাটি বুঝে তেষ্টা পেয়ে গেল।

ইন্দ্র হেসে উঠে বলল, আমার জলতেষ্টার ব্যাপারটা বিশ্বাস করলেন না।

সরিতা অমনি বলল, আমার কথাটা কি অবিশ্বাসের মত শোনাচ্ছে?

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব যেন আপনারও তেষ্টা পায়, আর সে সময় যেন একরাশ ছেলে রাস্তার ধারে কোকাকোলা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সরিতা বলল, তেষ্টায় বুক ফেটে গেলেও আমি খাব না।

এ আপনার জেদের কথা।

সরিতা বলল, তা বলতে পারেন। একধরনের একগুঁয়েমি আছে আমার চরিত্রে।

গাড়ি এসে থামল একটা বাজারের কাছে। বাজারের মাঝবরাবর ক্যানেল চলে গেছে। ক্যানেলে অনেক নৌকো জড়ো হয়েছে। নারকেলের দড়ি বোঝাই কোনটাতে, কোনটায় বা আস্ত নারকেল, তেলের ড্রাম মশলাপাতির বস্তা নামান ওঠান চলছে।

ইন্দ্র বলল, গঞ্জের মাঝখানে গাড়ি থামালেন কেন?

সরিতা হেসে বলল, আপনি নারকেল কুঞ্জের মাঝে যদি গাড়ি থামিয়ে মেয়েদের কাছ থেকে জল চেয়ে খেতে পারেন তাহলে আমিও গঞ্জের মাঝখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে একটু বীরত্ব দেখাই না কেন।

সরিতা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বলল, আসুন কোকাকোলা খাওয়া যাক।

ইন্দ্র চারদিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলল, কই কোন মহিলা বিক্রেতাকে তো চোখে পড়ছে না।

সরিতা বলল, আপনি এত সিরিয়াস কেন? কখন একটা কথা বলেছি আর তাই মনে করে রেখে দিয়েছেন। বলেছি না, নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়েছি সুতরাং আমাদের ভাবনারও কোন নিয়ম কানুন থাকবে না।

ওরা দুজনে সামনের দোকানে গিয়ে দুটো কোকাকোলা নিয়ে খেতে লাগল।

সরিতা স্ট্রতে ঠোঁট ছুঁইয়ে একটু একটু করে টানছিল আর চোখের তারা ভুরুর দিকে তুলে দেখছিল ইন্দ্রকে।

হঠাৎ খেয়াল চাপল মাথায়। অমনি বলে উঠল, একটু কাজু খেলে হয় না? প্লিজ ঐ দোকান থেকে যদি এক প্যাকেট ....।

কথা শেষ হবার আগেই ইন্দ্র বলল, ও সিয়োর।

বলেই তাকাল দোকানটার দিকে। ওর আধ-খাওয়া বোতলটা ডান হাতে ধরে নিল সরিতা।

বলল, আমার জিম্মায় রেখে যান, ফিরে এসে অক্ষতই পাবেন।

ইন্দ্র চলল কাজু কিনতে আর সেই মুহূর্তে সরিতার বুকের অনেক গভীর থেকে একটা ইচ্ছা শীতের সকালের শিরশিরে হাওয়ার মত প্রতিটি রোমকূপ কাঁপিয়ে উঠে এল।

ইন্দ্রের কোকাকোলার স্ট্রতে ঠোঁট ছুঁইয়ে খানিকটা টেনে নিল গলায়।

মুহূর্তে সমস্ত শরীরটা অদ্ভুত এক উত্তেজনায় বিবশ হয়ে গেল।

পরমুহূর্তেই একটা অপরাধবোধ জাগল মনে। খেয়ালের খেলায় এমন একটা অন্যায় সে করে বসল কি করে! সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের দুঃখ তার এত দিনের মার্জিত মনটাকে পীড়িত করতে লাগল।

ইন্দ্র ফিরে এসে বলল, নিন আপনার কাজুর প্যাকেট। দিন আমার কোকাকোলার বোতল।

সরিতা ইতস্তত করতে লাগল বোতল দুটো নিয়ে। বলল, সরি মিঃ রায় দুটো মিশে গেছে।

ইন্দ্র অর্থপূর্ণ চোখে সরিতার কাতর মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে নিয়ে বলল, ও কিছু হবে না, দিন চোখ বন্ধ করে যে কোন একটা হাত বাড়িয়ে। ওটাই ঠিক আমার বোতল হয়ে যাবে।

সরিতা বলল, ভুল যখন আমি করেছি প্রায়শ্চিত্ত আমার। আমিই দুটো শেষ করব। আপনি বরং দোকান থেকে আর একটা নিয়ে নিন।

ইন্দ্র বলল, ভুল করেছেন ঠিক কিন্তু ভুলটা দারুণ রকম মিষ্টি, আর আপনার যখন দুটো খেতে আপত্তি নেই তখন আমারও যে কোন একটা খেতে আপত্তি থাকার কথা নয়।

সরিতা সংকোচ করছে দেখে ইন্দ্র একটা দশ পয়সা বের করে বলল, হেড না টেল?

সরিতা থমকে থেমে আছে দেখে ইন্দ্র বলল, বলুন বাঁ-হাতেরটা টেল আর ডান হাতেরটা হেড।

সরিতা সহজ হল, হেড।

পড়ল হেড।

ইন্দ্র বলল, দেখলেন তো আপনার ইচ্ছার সঙ্গে ভাগ্যটাও কেমন মিলে গেল। ডান হাতেরটা আপনার না হয়েই যায় না। দিন আপনার বাঁ হাতের পানীয়টা আমাকে দিন।

হাসতে হাসতে সরিতা নিজের কোকাকোলাটা ইন্দ্রের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, এখন থেকে কিন্তু এমনি লটারি করে আমাদের খুঁটিনাটি সব ডিসপিউটের সমাধান হবে।

ইন্দ্র বলল, আমি একশো একবার রাজি।

যে খেলাটা একটা গোপন উত্তেজনার ভেতর দিয়ে শুরু হয়েছিল সেটার এমন একটা মজার পরিণতিতে সরিতার মনটা খুশীতে ভরে উঠল।

ওরা দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে হেসে কোকাকোলা খেতে লাগল। পানীয়টুকু এখন আর শুধু নিরীহ পানীয়ই রইল না, দারুণ একটা উত্তেজক ক্রিয়া শুরু করে দিল দেহের ভেতর গিয়ে।

গাড়ি ছুটে চলেছে। সরিতার মুখে কথা নেই। ইন্দ্র ভাবছে সরিতার কথা, প্রেমা আর সরিতার ভেতর স্বভাবে আর আদলে কত ফারাক। প্রেমার রঙে কাঁচা হলুদের জৌলুস আর সরিতার রঙে শ্যামল ছায়া মাখান। প্রেমার রঙে কাঁচা হলুদের জৌলুস আর সরিতার রঙে শ্যামল ছায়া মাখান। প্রেমার ফিগার নাচের জন্য পরিকল্পিত আর সরিতা সরল সবুজ একটা বৃক্ষের মত। নিপুণ ছন্দের লীলায় প্রেমা সাগরের মত উত্তাল আর সরিতা হাওয়ার বুকে দোল খাওয়া লতার মত ধরা-অধরার খেলায় মাতোয়ারা। প্রেমা শিল্পী তার চলায় বলায় ভাবনায়। সরিতা খেয়ালি, তার স্বভাবের রোদ-বৃষ্টির লীলায়। একজন ঘূর্ণির মত তার আবর্তন বিন্দুর দিকে দুর্বার বেগে আকর্ষণ করে গুণমুগ্ধদের, অন্যজন ঝিরঝিরে এক পশলা বৃষ্টির মত পথচারীকে ভিজিয়ে দিয়েই খুশী।

এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে হৈ চৈ করতে করতে বেরিয়ে এলো একটা পাঠশালা থেকে। ছুটির খুশীতে তারা দিকহারা। পথের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া এক মুঠো সাদা মার্বেলের মত ছড়িয়ে পড়েছে ইতস্তত।

হর্ন বাজিয়ে চলেছে সরিতা, আর ওরাও হর্নের অনুকরণ করে চলেছে মুখে মুখে।

একটু একটু করে গাড়ি এগোচ্ছে আর ছেলেগুলো ড্রাম বাজাচ্ছে গাড়ির গায়ে।

হুট করে সরিতা গাড়ির বক্সটা খুলে বের করল একটা ছোট বল। লাল রঙের বলটা ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল। তারপর ছুঁড়ে দিলে পথের ধারে নারকেল বাগানটা লক্ষ্য করে। আর যায় কোথা, বলটা ছুটে চলল লাফাতে লাফাতে আর তার পেছনে ছেলের পাল ছুটল সমান পাল্লা দিয়ে। পথ একদম পরিষ্কার। অমনি হুস করে বেরিয়ে গেল সরিতার গাড়ি।

ভাবনার ভেতর ডুবে আছে সরিতা। চিন্তার সুতোটা হঠাৎ কেটে গিয়েছিল, তাকে আবার জোড়া দিয়ে নিয়েছে সে।

ইন্দ্র বলল, কি ভাবছেন?

সরিতা একটুখানি চমকে উঠে বলল, ব্যক্তিগত ভাবনার কথা প্রকাশ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

অমনি ইন্দ্র পকেট থেকে পয়সা বের করতে যাচ্ছে দেখে সরিতা গাড়ি থামিয়ে দুটো হাত জোড় করে বলল, দোহাই আপনার, মনের কথা টেনে বার করতে আর টস করবেন না।

ইন্দ্র বলল, আমরা টসের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি হারলে, আপনাকে আর মনের কথা বলতে হবে না। বেকসুর খালাস।

সরিতা বলল, কিন্তু আপনি যদি জেতেন, তাহলে তো গেছি। মরে গেলেও বলতে পারব না।

ইন্দ্র বলল, বেশ, তাহলে ভেঙে যাক্ আমাদের প্রতিশ্রুতি।

সরিতা গাড়ি থামিয়ে ফেলেছে। শেষ সূর্যের আলোটুকুর মত করুণ করুণ মুখ করে বলল, আচ্ছা করুন তাহলে লটারি।

পয়সাটা ইন্দ্রের আঙুলের টুসকীতে সার্কাসের ঝকঝকে কিশোরী মেয়ের মত ভল্ট খেতে খেতে ওপরে উঠে গিয়ে আবার নেমে এল ওর হাতের পাতায়।

মুহূর্তে অন্য হাতে পয়সাটা চেপে ধরে ইন্দ্র বলল, হেড না টেল।

ভীতু ভীতু গলায় সরিতা বলল, টেল।

ইন্দ্র হাত সামনে এনে বলল, হেরেছেন। সব বারে কি আর জেতা যায়।

গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে ধীরে ধীরে চালাতে লাগল সরিতা। ইন্দ্র তাকে কোন প্রশ্নই আর করল না।

বেশ কিছু পথ গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে এক সময় সরিতা বলল, কই জিজ্ঞেস করলেন না তো কি ভাবছিলাম আমি? জিতেছেন যখন, তখন বলতে আমি বাধ্য।

ইন্দ্র বলল, আমার জানা হয়ে গেছে।

সরিতা অবাক হয়ে বলল, আপনার জানা হয়ে গেছে কি রকম?

ইন্দ্র বলল, আপনার ভাবনাগুলো যে পথের ইঁট পাটকেল কিংবা হোটেলের সুগদনকে নিয়ে নয় তা হলপ করে বলতে পারি।

সরিতা স্পষ্ট করে বলল, আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম।

আমি জানি।

সরিতার গাড়ির স্পিড কমল। চোখ দুটো একবার ইন্দ্রের মুখের ওপর ফেলে বলল, এত অহংকার।

ইন্দ্র বলল, একটি যুবকের কাছে বসে যদি একটি মেয়ে বলে, আমি আমার পোষা বেড়ালটার কথা ভাবছিলাম, তাহলে ছেলেটির সেখান থেকে উঠে চলে যাওয়াই উচিত নয় কি? হয় ইন্দ্র রায়ের কথা আপনি ভাবছিলেন, নয় ইন্দ্র রায় আপনার পাশে এই মুহূর্ত থেকে তার বসার অধিকার হারাল।

সরিতা বলল, বাব্বা, আপনার বিশ্লেষণকে বলিহারি। হার মানলাম আপনার কাছে।

ইন্দ্র বলল, উঁহু শুধু শুধু হার মানলেই পার পাওয়া যাবে না, বলতে হবে কি ভাবছিলেন?

সরিতা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে ইন্দ্রের দিকে এক ঝলক চেয়ে নিয়ে বলল, ভাবছিলাম, আপনি একটা বিচ্ছিরি ছেলে।

বলেই সিকসটি মাইল স্পীডে গাড়ির কাঁটা তুলে সিধে রাস্তায় ঝড়ো হাওয়ার মত উড়ে চলল।

ওরা পাশাপাশি বসেছিল থঙ্গচেরি লাইট হাউসের কাছে। একশো চুয়াল্লিশ ফিট উঁচু লাইট হাউসের মাথায় পাঁচ হাজার ওয়াটের বাল্ব থেকে আলো ছুটে চলেছে। আরব সাগরের বুকের জলযানগুলো আঠারো মাইল দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে ঐ একচক্ষু পলিফেমাসকে। অবশ্য ওডেসীর দৈত্যাকৃতি পলিফেমাস ছিল ক্রূর সংহারক, আর থঙ্গচেরির বাতিঘর ইউলিসিসদের অভয়দাতা।

সমুদ্রের ঢেউ সন্ধ্যার অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছিল।

সরিতা বলল, আপনি গাড়ি খারাপ হয়ে যাবার দিন রাতে যে ভূতের গল্পটা বলেছিলেন, তার শেষটুকু আর বলেন নি।

ইন্দ্র বলল, কি রকম! আমার গল্পের তো ঐখানেই শেষ।

সরিতা বলল, আপনি তো দেখছি ভীষণ নিষ্ঠুর। দুটি ছেলেমেয়েকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে রইলেন।

ইন্দ্র হেসে বলল, ওরা এখনও আরব সাগরের জলে সাঁতার কাটছে, কূলে উঠতে পারেনি।

সরিতা সন্দেহের চোখে তাকাল ইন্দ্রের দিকে। ইন্দ্রের মুখে দুষ্টুমির হাসি।

সরিতা ইন্দ্রের থাইয়ের ওপর একটা চাপড় মেরে বলল, আপনি ভীষণ বানিয়ে গল্প বলতে পারেন, আপনাকে একটুও বিশ্বাস নেই।

ইন্দ্র বলল, আস্থা রাখতে হয়, তাতে কর্মীদের কাছ থেকে কাজ পাওয়া যায় বেশি। মালিকপক্ষ সন্দেহবাতিক হলেই মুশকিল।

সরিতা বলল, গল্পের শেষটা না বললেও আমার জানা।

ইন্দ্রের গলায় কৌতূহল, কি রকম বলুন তো? আমার সঙ্গে মেলে কিনা দেখি।

আমি যদ্দুর জানি ওরা ঢেউয়ের ওপর ভাসতে ভাসতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। দুজনের কারোরই আর ক্ষমতা ছিল না সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার।

হঠাৎ ওরা দেখতে পেল একটা জেলে নৌকো ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ওরা প্রাণপণে নিজেদের ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করল জলের ওপর।

সরিতা একটু থেমে ইন্দ্রের দিকে চেয়ে বলল, মিলেছে আপনার গল্পের সঙ্গে?

ইন্দ্র হেসে বলল, মিল আছে বলেই তো মনে হচ্ছে।

সরিতা বলল, এবার তাহলে আপনি বলুন, আমি মিলিয়ে দেখি।

ইন্দ্র বলল, পালতোলা জেলে নৌকোটা এগিয়ে এল। তারা ওদের নৌকোয় তুলতে গিয়ে দেখল, একজনের বেশি হলে নৌকোটা ডুবে যাবে নির্ঘাৎ। তাই জেলেরা চেঁচিয়ে বলল, তোমাদের ভেতর শুধু একজনই আসতে পার। বল কে আসতে চাও?

ইন্দ্র সরিতার দিকে ফিরে বলল, বলুন তো এবার, দুজনের ভেতর কে নৌকোয় উঠেছিল?

সরিতা বলল, আমি যদ্দূর জানি মেয়েটি ছেলেটিকে অনেক করে বোঝাল। বেঁচে থেকে তার কোন লাভ নেই। কারণ সমাজের সীমানা পেরিয়ে একবার চলে এলে মেয়েদের সমাজ কোনদিনই আর ফিরিয়ে নেবে না। কিন্তু সেদিক থেকে ছেলেদের কোন অসুবিধা নেই। তাদের সানন্দে সমাজ ঘরে তুলে নেবে। তারা সুখী সংসার রচনা করতে পারবে। তাই মিথ্যে ভাবালুতার ভেতর দুজনে সমুদ্রের তলায় তলিয়ে না গিয়ে একজনেরও অন্তত বাঁচতে হবে। আর তাছাড়া ছেলেটি বেঁচে থেকে চিরদিনই তাকে মনে করে রাখুক, এ ইচ্ছাটুকু জানাল মেয়েটি। তখন মেয়েটির অনুরোধে ক্লান্ত ছেলেটিকে ঢেউ-এর ওপর থেকে তুলে নিল জেলেরা। এখানে আমার জানা গল্পের শেষ।

ইন্দ্র বলল, না আমার গল্পের শেষ এখানে নয়।

সরিতা বলল, কি রকম?

ইন্দ্র বলল, আমার জানা গল্পের শেষ হয়েছে একটা ঝড়ের ভেতর।

সরিতা বলল, ঝড়!

ইন্দ্র বলল, সারা আরব সাগর জুড়ে উঠল প্রচণ্ড ঝড়। মনে হল ঘূর্ণিপাকে সপ্ত সাগরই ঘুরছে। নৌকোটা কলার মোচার মত চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে ক্রমাগত ঘূর্ণির কেন্দ্রের দিকে নেমে চলল।

এদিকে মেয়েটি কিন্তু ঘূর্ণির বাইরে থেকে গেল, আর একটা প্রচণ্ড হাওয়া তীরমুখী স্রোতের ওপর দিয়ে ওকে ঠেলতে ঠেলতে এনে ফেলল একেবারে কেরালার কূলে। থঙ্গচেরি লাইট হাউসের পাশে সমুদ্রের বেলাভূমিতে ও যেন বালির বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ল।

সরিতা উৎসুক গলায় বলল, আর ছেলেটির কি হল?

ইন্দ্র বলল, সে স্বার্থপর ছেলেটা মেয়েটিকে একা জলে ফেলে নৌকোতে উঠে এসেছিল, তাই শাস্তিটাও তাকে পেতে হল চরম। তার নৌকো ঘূর্ণির পাকে ঘুরতে ঘুরতে একেবারে সমুদ্রের তলায় গিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল।

একটু থেমে ধীর গলায় ইন্দ্র বলল, এখন কেউ যদি সেই জলের তলায় গিয়ে নামে তাহলে দেখতে পাবে ছেলেটি ভাঙা নৌকোখানার ওপরে দুটো হাত দুদিকে ছড়িয়ে শুয়ে আছে। সমুদ্র শৈবালের দল মরদেহের পুষ্পসজ্জার মত জেগে রয়েছে তার চারদিকে। আর একটি রুপোলী মাছ হাল্কা তরঙ্গের দোলায় দুলতে দুলতে ছেলেটির ভাসমান চুল ছুঁয়ে তার ঘুমন্ত মুখখানাতে চুমু দিয়ে যাচ্ছে।

সরিতা বলল, আপনি কিচ্ছু জানেন না। সে মেয়েটি কূলে আছড়ে পড়ামাত্রই তার দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই সে একটি রুপোলী মাছ হয়ে খুঁজতে গিয়েছিল সেই ছেলেটিকে সমুদ্রের তলায়।

ইন্দ্র বলল, তাহলে বলতে হয় মেয়েটি সত্যই ছেলেটিকে ভালবেসেছিল।

সরিতা জোরের সঙ্গে বলল, বেসেছিলই তো।

সময়ের হিসেব ছিল না ওদের। সমুদ্র সারাক্ষণ শব্দ করছিল। বাতিঘরের ছড়িয়ে পড়া অতি উজ্জ্বল হলুদ আলোটাকে অলৌকিক একটা কিছু বলে মনে হচ্ছিল। আরব্য রজনীর কোন কাহিনী শোনাবার জন্যে শাহরাজাদী যেন প্রস্তুত হচ্ছিল। বাদশা শাহরিয়ার গল্পের যাদুকরী শাহরাজাদীর দিকে চেয়েছিল গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে।

সরিতা বলল, আমি একেবারে বানিয়ে কিছু বলতে পারিনে আপনার মত।

ইন্দ্র বলল, আমি বুঝি খুব বানিয়ে কথা বলি?

বলেনই তো।

আর বলব না।

অমনি রাগ হয়ে গেল মশাই-এর। প্রশংসা করলেও বিপদ! গল্প যিনি বলতে পারেন তাঁকে সকলেই তোয়াজ করে জানি।

ইন্দ্র বলল, আমার গল্প শুনতে সত্যি আপনার ভাল লাগে?

প্রশংসা কবার শুনতে চান?

ইন্দ্র বলল, বিশেষ বিশেষ মুখে বারবার।

সরিতা বলল, আপনি তো দারুণ লোভী দেখছি। বিশেষ একটি মুখের প্রশংসাতে সন্তুষ্ট নন। বিশেষ বিশেষ মুখের প্রশংসা চাই!

ইন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল দেখে সরিতা বলল, কি হল চুপচাপ যে?

ইন্দ্র চোখ তুলে বলল, বোবার শত্রু নেই তা মৌনী অভ্যেস করছিলাম।

আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ঝটপট উঠে দাঁড়াল সরিতা। ইন্দ্রের হাত ধরে টেনে তুলতে তুলতে বলল, ওঠ ওঠ অনেক রাত হয়ে গেল।

তারপর হঠাৎ হাতটা ছেড়ে দিয়ে দুহাতে নিজের দুটো গাল চেপে ধরে বলল, ইস ভারী একটা অন্যায় হয়ে গেল।

কি হল?

আপনাকে 'ওঠ ওঠ' বলে ফেললাম।

ইন্দ্র বলল, বেশ করেছেন, আরও একশোবার বলবেন।

সরিতা বলল, বিশ্বাস করুন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

মন থেকে বেরোয়নি তাহলে?

সরিতা চুপ করে রইল।

ইন্দ্র আবার বলল, আপনি কি কথাটা বলে ফেলে নিজেকে খুব অপরাধী ভাবছেন?

সরিতা ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, আমি কি বলতে চাই, কি করতে চাই তা নিজেও অনেক সময় বুঝতে পারি না। আমার এইসব টুকরো টুকরো ভুলভ্রান্তি হয়ত আরও কত ঘটবে তাই আগে থেকে মাফ চেয়ে নিচ্ছি।

ইন্দ্র বলল, তুমি এমন সিরিয়াস হয়ে উঠলে কেন সরিতা? এই তো আমি তোমার ভাষাতেই কথা বলছি।

সরিতা এখন নিজের স্বভাব ফিরে পেয়েছে। সে কলকল করে বলে উঠল, আমরা 'তুমি' বলব কি 'আপনি' বলব সেটা টস্ করে ফয়সালা করে নিলে হয় না?

ইন্দ্র বলল, পছন্দটা তোমার কোনটাতে বল তো সত্যি করে?

সরিতা সে কথার উত্তর সোজাসুজি না দিয়ে বলল, থাক টসে যদি আবার আপনি টাপনি উঠে যায় তাহলে তো গেছি।

ইন্দ্র বলল, টসের কথা যখন উঠেছে তখন টস্ হবেই। তাতে কপালে যা ওঠে উঠুক।

সরিতা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ও মনে হল রেজাল্টের কথা ভেবে ভয় পেয়ে গেছে।

ইন্দ্র পয়সাটা বের করে বলল, হেড উই গেইন টেল উই লুজ, কি বল?

বলেই ও পয়সাটা ওপরে ছুঁড়ল। বালিতে পড়তে না পড়তেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সরিতা। হাত দিয়ে পয়সাটা চেপে রেখে ইন্দ্রের দিকে মুখ তুলে করুণ গলায় বলল, ভীষণ ভয় করছে, যদি টেল পড়ে যায়।

ইন্দ্র হেসে ওর হাতের ওপর হাত রেখে বলল, এসো তাহলে দুজনে মিলে একটু ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা যাক।

সরিতা তবুও করুণভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে ওর দিকে চেয়ে বলল, বিশ্বাস কর, একটুও সাহস

পাচ্ছি না।

ইন্দ্র বলল, যা থাকে ভাগ্যে, তা বলে কথার খেলাপ তো আমরা করতে পারব না।

সরিতার হাত শিথিল হয়ে ধীরে ধীরে সরে গেল। ও বলল, আমি দেখব না, আপনি দেখুন।

ইন্দ্র দেখে নিয়ে পকেটে পয়সাটা ফেলল।

সরিতা ইন্দ্রকে নির্বাক দেখে চমকে উঠে বলল, কি হল?

ইন্দ্র নিরাসক্ত গলায় বলল, আমাদের সম্মানীয় সম্বোধনে ফিরে যেতে হবে।

সরিতা গালের পাশ দিয়ে চুলের ভেতর আঙুল চালিয়ে মুখখানা বিপুল বেগে নাড়তে নাড়তে বলল, সব দোষ আমার। এটা ঘটল আমারই দোষে।

ইন্দ্র বলল, অত ভাবনার কি আছে, আপনি আমাদেব বাইরের পোশাক হয়েই থাক না।

সরিতা কিছুক্ষণ পরেই শান্ত হয়ে গেল। ওর ভেতর মেঘ-রোদ্দুরের খেলাটা খুব দ্রুত চলতে থাকে। তাই কোনটাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

ও বলল, ভালই হল। কখন আবার প্রেমার কাছে আপনাকে তুমি বলে ডেকে বসতাম।

ইন্দ্র অমনি বলল, দেখলেন তো ভগবান যা করেন মঙ্গলেরই জন্যে।

ইন্দ্র গাড়ি চালাবার কথা পাড়তেই সরিতা বলল, আপত্তি কিছু নেই, তবে রাতে অচেনা পথে ড্রাইভ করতে গেলেই অসুবিধেয় পড়তে হবে। তার চেয়ে আমি যেমন হাল ধরেছিলাম তেমনি ধরে থাকি আজ রাত্তিরটা। ফেরার পথে আপনিই না হয় কাণ্ডারী হবেন।

ইন্দ্র বলল, তথাস্তু। কিন্তু সারারাত ধরেই কি গাড়ি চালাবেন নাকি?

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে সরিতা বলল, ক্ষতি কি। আপনার বুঝি খুব ঘুম পেয়ে যাবে?

ইন্দ্র বলল, আঁকাবাঁকা উঁচু নীচু পথে চালাতে গিয়ে আপনারই স্ট্রেইন হবে বেশি। ঘুম পেলে আপনারই পাবে, আমি তো আরামে পাশে বসে অন্ধকারের রূপ দেখতে দেখতে চলব।

সরিতা বাঁকের মুখে গাড়িখানাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, চুপচাপ বসে থেকে ঝিরঝিরে হাওয়ায় গা জুড়োবেন, তারপর রাতের আকাশে তারা দেখবেন, এরপর স্বপ্নের পরীরা আপনাকে ছেড়ে দেবে ভাবছেন?

ইন্দ্র বলল, তাহলে গাড়ি চালাতে চালাতে আর একটি কাজ করতে হবে আপনাকে।

কি কাজ?

গান। গান গেয়ে পাশের মানুষটিকে জাগিয়ে রাখতে হবে।

সরিতা বলল, আপনার বাদশার নাতি হয়ে জন্মান উচিত ছিল। পাশে সারাক্ষণ থাকত ইয়ার দোস্তের দল। সরাব খেয়ে ঝিমুনি এলেই ঝমঝম বেজে উঠত ঝুমুর। হারেমের নর্তকীরা নাচ দেখিয়ে কেড়ে নিত চোখের ঘুম। আঁখির ইসারায় ঝড় তুলত বুকে।

হঠাৎ একটুখানি থেমে একেবারে ভিন্ন একটি প্রসঙ্গে চলে গেল সরিতা, আচ্ছা, কেমন লাগল সেদিন প্রেমার নাচ?

বুকে ঝড় তোলার মত।

সরিতা অমনি বলল, তার মানে আপনি বলতে চান প্রেমা হারেমের নটী।

ইন্দ্র বলল, আমি কি দশানন যে ঘাড়ের ওপর বসানো দশ-দশটা মাথার নটা খসালেও একটা অন্তত আস্ত থাকবে।

সরিতা আবার টেনে টেনে বলতে লাগল, বলুন না সত্যি করে, সেদিন কেমন লাগল প্রেমাকে?

ইন্দ্র বলল, প্রেমাকে না তার নাচকে?

সরিতা গম্ভীর হয়ে গেল। গাড়ি চালাতে চালাতে আর কথা বলল না।

ইন্দ্র সরিতার দিকে চেয়ে চেয়ে দারুণ মজা পাচ্ছিল।

সে আবার রাগিয়ে দেবার চেষ্টা করল, সত্যি সরিতা, সেদিন প্রেমার নাচ দেখে সারা পদ্মনাভপুরম্ প্যালেসের এমন দর্শক ছিল না, যে না প্রেমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল।

সরিতা চেঁচিয়ে উঠল, তুমিও!

পরক্ষণেই বলল, সরি, একসট্রিমলি সরি, আপনিও?

ইন্দ্র বলল, ক্ষেপেছেন, মালিকের সঙ্গে প্রেম! তাহলে প্রেম আর চাকরি দুটোই খোয়াতে হবে।

সরিতা সামনের আলো ঝলমল পথের দিকে চেয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, আপনি তো চাকরির ভারী পরোয়া করেন।

ইন্দ্র করুণ গলা করে বলল, বিশ্বাস করুন, চাকরি হারালে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে। ঐ দুর্বল জায়গাটায় দয়া করে আঘাত করবেন না।

কিছু পথ ড্রাইভ করে এসে সরিতা গাড়ি থামাল এক আলো ঝলমল বাড়ির সামনে।

ইন্দ্র বলল, এ কোথায় এলাম?

সরিতা বলল, এ. বি. সি. তে।

ইন্দ্র অবাক হয়ে বলল, হেঁয়ালিটা তো বুঝতে পারছি না।

সরিতা বলল, জলের মত সরল। অষ্টমুদী বোট ক্লাব। সংক্ষেপে সবাই একে এ. বি. সি. বলে থাকে।

ওরা নামল গাড়ি থেকে। ভেতরে গিয়ে সরিতা একটা স্পেশাল ব্যবস্থা করে নিল। বোট ক্লাব থেকে ভাড়া করল একখানা বোট। সন্ধ্যায় কিছু সময় ওরা ঘুরে বেড়াবে অষ্টমুদী লেকের জলে।

ক্লাব সেক্রেটারি বললেন, কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠে গেছে। তবে এখনও নারকেল গাছের জটলার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। তারপর চাঁদের আলোয় বোটে বেড়াতে ভালই লাগবে।

সেক্রেটারির পরামর্শমত ওরা এই সামান্য সময়টুকু ক্লাবের ভেতর টেবিল টেনিস বোর্ডেই কাটিয়ে দিতে মনস্থ করল।

ইন্দ্র বলল, কবে কলেজের বোর্ডে খেলেছি, তারপর এই ব্যাট ধরছি। আপনার হাতে হার আমার নিশ্চিত।

সরিতা বলল, আপনার মত বিনয় আমি করব না। রোজ কলেজের বোর্ডে একবার করে আমি আর মীনাক্ষী প্র্যাকটিস করি। তবে প্রতিপক্ষের হাতের মার না দেখলে জয়-পরাজয় সম্বন্ধে কিছু আঁচ করা যাবে না।

খেলা শুরু হয়ে গেল। সরিতা সার্ভিস পেল। তিন তিনটে সার্ভিসে ইন্দ্র প্রায় ব্যাট ছোঁয়াতেই পারল না। দারুণ স্পিন সরিতার সার্ভিসে। চতুর্থ সার্ভিসের পর থেকেই খেলার মোড় ফিরল। স্ম্যাশ আর স্পেসিং-এর কৌশলে ইন্দ্র পয়েন্ট ছিনিয়ে নিতে লাগল।

জমে উঠল খেলা। ইন্দ্র ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে। সরিতার হাতে স্পিন আছে, স্ম্যাশও আছে। সবচেয়ে দরকারি যা আছে, তা হল ওর বিদ্যুৎগতিতে সঞ্চরণের ক্ষমতা।

অনেকগুলো দর্শনীয় র‍্যালি করল ওরা। কয়েকজন ক্লাব মেম্বার ওদের খেলা দেখতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারা স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকে পড়ল সরিতার দিকে। ও পয়েন্ট পেলে উল্লাসে ফেটে পড়তে লাগল তারা, আবার পয়েন্ট হারালে ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক করে জিভ দিয়ে হাওয়া বের করে একটা দুঃখের শব্দ তুলতে লাগল। কিন্তু গেম দুই আর একে ছিনিয়ে নিল ইন্দ্র।

সরিতা খেলার শেষে প্রতিপক্ষের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে এসে ইন্দ্রর দিকে চেয়ে কেমন এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করতে লাগল। ইন্দ্রকে তার এই মুহূর্তে কেন জানি না অনেক বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হল।

ইন্দ্র উজ্জ্বল আলোয় দেখল, সরিতার সারা মুখ ঘামের জলে নেয়ে আশ্চর্য মসৃণ আর লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে। মুখে পরাজয়ের চিহ্নমাত্র নেই, ববং একটা পরিতৃপ্তি সারা চোখেমুখে খেলা করছে।

ক্লাব সেক্রেটারি মনে করিয়ে দিলেন, চাঁদ এখন নারকেল গাছের মাথা ছাড়িয়ে বেশ খানিক ওপরে উঠে গেছে।

ইন্দ্র আর সরিতা জেটি থেকে একটা বোটে উঠে বসল। চালক বোট চালিয়ে নিয়ে অষ্টমুদী লেকের তীর ঘেঁষে। চাঁদের আলো জলের বুকে ছোট ছোট ঢেউগুলোর গায়ে রুপোলী পালিশ লাগাচ্ছিল। নৌকোর তলায় জলের ধাক্কায় একটা সুখকর শব্দ উঠছিল। গান গাইছিল সরিতা। ইন্দ্র ওর উচ্চগ্রামী গলার কাজ দেখে মনে মনে তারিফ করছিল। সম্ভবতঃ লোক-সঙ্গীত, হয়ত বা কোন সিনেমার গান। যা হোক, এই পরিবেশে গানের সুরে একটা যাদুর খেলা চলছিল।

গান থামলে ইন্দ্র বলল, হোটেলের কোন ঘরে বসে গানটা গাইলে আপনি দারুণ প্রশংসা পেতেন।

সরিতা অবাক হয়ে বলল, তার মানে? এই পরিবেশে গানটা আপনার ভাল লাগেনি?

ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বলল, ঠিক তার উল্টো। বরং এই পরিবেশে এত ভাল লেগেছে যে প্রশংসার ভাষা এখানে অচল। শুধু কান পেতে শোনা আর হৃদয় ভরে অনুভব করা।

সরিতা বলল, সুরটা কার দেওয়া বলুন তো?

ইন্দ্র বলল, মাললায়ম কোন লোকসংগীত বলে মনে হয়। আমি তো মালয়ালী সুরকারদের চিনি না!

সরিতা বলল, এইখানেই জিতে গেলেন সুরকার। আসলে এ গানের সুর যিনি দিয়েছেন, তিনি কেরালার লোকই নন।

ইন্দ্র বলল, কি রকম?

সরিতা বলল, অনুমান করুন।

তাহলে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়তে হবে, বলল ইন্দ্র।

সরিতা বলল, অনুমান করুন। আপনার দেশের মানুষ।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ইন্দ্রের, সলিল চৌধুরী?

সরিতা বলল, তবু শেষরক্ষাটা করলেন। সলিল চৌধুরীর সুর কেরালার মানুষদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ইন্দ্র বলল, ওঁর সুর কানের ভেতর দিয়ে একেবারে বুকে এসে বাজে। জল, মাটি, আকাশ আর আলোর সঙ্গে ওঁর সুরের আশ্চর্য মিতালী।

আর দুখানা গান গাইল সরিতা। দক্ষিণী সুরের অদ্ভুত গলার কাজ। মনে হচ্ছিল লেকের জলে বৃষ্টির ছোট বড় ফোঁটা দ্রুত জলতরংগ বাজিয়ে চলেছে।

জ্যোৎস্নার ঝরে পড়া রুপোলী পরাগে লেকের জল রহস্যময়। নারকেলের পাতায় আলো পড়ে ঝকঝকে তলোয়ারের মত মনে হচ্ছিল। যেখানে বন নিবিড়, সেখানে অন্ধকার জমে আছে।

হঠাৎ ইন্দ্রের চোখে পড়ল, অন্ধকার বনের ঘন পল্লবের ভেতর থেকে আলোর ফুলকি উড়িয়ে বেরিয়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে পুত্রী। এমন সহস্র সহস্র জোনাকীর নাচ এর আগে কখন দেখেনি ইন্দ্র। জ্যোৎস্নার আলোয় বেরিয়ে এসেই ওরা কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

আটটি বাঁক নিয়েছে তাই নাম তার অষ্টমুদী। কুইলন জেলার বিখ্যাত কায়েল এটি। নদীরা জন্ম নিচ্ছে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায়। ভুজঙ্গ ভঙ্গিমায় নেমে আসছে পাহাড়ী পথে সমভূমির ওপর। পশ্চিমঘাট থেকে আরব সাগরের দূরত্ব বা কতটুকু। তারই ভেতর নদীরা সৃষ্টি করেছে জলাধার। নীলে রুপোয় মেশান জল ঝলমল করছে। নদী, ক্যানেল, লেগুন, ব্যাকওয়াটারে দেশটা যেন রুপোলী জালে ঢাকা! ত্রিবান্দ্রম থেকে তিরুর অব্দি প্রায় সারা দুশো মাইল পথ এই ব্যাকওয়াটারে যাওয়া যায়। সবুজ খেত, ছায়াঘন নারিকেল বীথি, লাল টালির ছাওয়া কোণ উঁচু ঘর, হঠাৎ জেগে ওঠা গীর্জার মাথা দেখতে দেখতে সূর্য আর চন্দ্রের উদয় অস্তকাল যে কোথা দিয়ে কেটে যায় তার ঠিক নেই। ব্যাকওয়াটার আর নীল আরব সাগরের মাঝে ছোট পরিসরের যে জমিটুকু বরাবর উত্তর দক্ষিণে চলে গেছে, তার বুকে জেগে আছে অসংখ্য নারকেল বৃক্ষ। চোখ জুড়িয়ে যাবে, যদি কেউ এই সবুজ সমারোহের ভেতর দিয়ে দিনের পর দিন একটি চুরুলন ভাল্লমে চেপে ব্যাকওয়াটারের জল কেটে বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। এখানকার জ্যোৎস্নায় আরব্য রজনীর রহস্য—পরাগ ওড়ে। এখানকার বাতাসে দারুচিনি বনের গন্ধ ভেসে আসে। এখানকার তেমালা পাখির উড়ে চলায় সারা আরব সাগরের উচ্ছ্বাস।

কথাগুলো বলেছিল সরিতা। ইন্দ্র শুনছিল ভাল্লমে বসে। অষ্টমুদী লেকের জল, তীরের আলো আঁধারি বনভূমি, পুতরীদের উড়ে চলা, রুপোলী জলপ্রবাহের মত জ্যোৎস্নার ঝরে পড়া, ভাল্লমের তলায় নিরন্তর ছলছলানি গান, তরুণ-তরুণীর মুখোমুখি বসে থাকা, সব মিলিয়ে এই মুহূর্তগুলোকে অনন্ত কোন কাল প্রবাহের অবিচ্ছিন্ন ধারা বলে মনে হয়। খণ্ডকালের পাত্র উপচে যেন গড়িয়ে পড়ছে নিত্যকালের সুধা।

ইন্দ্র বলল, আমরা কোন একদিন বেরিয়ে পড়ব একখানা ভালাপ্পরায় চেপে এই আশ্চর্য দেশটাকে আবিষ্কার করতে। রোদ্দুরে পুড়ব, জ্যোৎস্নায় ভিজব, কায়েলের জলে পানকৌড়ির মত ডুব দিয়ে উঠব। নিভৃত নারকেল বনের আলোছায়ার তলায় পা ছড়িয়ে বসে অনেক অনেক পুরোনো বিস্মৃত দিনের গল্প বলে যাব।

সরিতা বলল, আপনার এ চাকরি নেওয়া ঠিক হয়নি, আপনি দারুণ রকম রোমান্টিক। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালেই আপনাকে মানাত ভাল।

ইন্দ্র হাত পেতে বলল, রসদ দিন ম্যাডাম, আমি এখনি চাকরি ছেড়ে বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি।

সরিতা হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। দুটো হাত পেছনের চুলের ভেতরে চালিয়ে গলায় বাঁধা স্বর্ণসূত্রটা খুলে ফেলল। তারপর বুকের জম্বরের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল লকেট সমেত হারটা। চাঁদের আলোতে দামী হীরেগুলো ঝলমল করছিল।

বলল, আপনার হাতখানা দিন তো দেখি।

ইন্দ্র বলল, কেন?

সরিতা বলল, এত প্রশ্ন করছেন কেন, দিন না। ভয় নেই, চিরদিন ধরে রাখব না।

ইন্দ্র বলল, আমি তাই বলেছি বুঝি!

ইন্দ্র হাতখানা সরিতার দিকে বাড়িয়ে দিতেই সরিতা ইন্দ্রের মণিবন্ধে তার হারখানা জড়িয়ে বেঁধে দিতে দিতে বলল, আমি যে দিতে পারি, এই সামান্য হারটুকুতেই তার সূচনা হোক।

ইন্দ্র হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হারটা হাত থেকে খুলে ফেলে বলল, কি পাগলামো করছেন। এই দামী হার দিয়ে আমি করব কি?

সরিতা বলল, নিশ্চয়ই পরার জন্যে দিইনি। বিক্রি করে যা টাকা পাবেন তাতে কাছে পিঠে কোন জায়গায় যাবার টিকিটের দামটা হয়ত মিলে যেতে পারে।

ইন্দ্র বলল, পায়ে চষে বেড়াব, চাই কি রবিনসন ক্রুশোর মত কাঠ জুড়ে ভেলা বানিয়ে ভাসব, তবু আপনার ঐ সুন্দর গলা থেকে হারখানাকে ছিনিয়ে নেব না।

সরিতা হাত বাড়িয়ে বলল, দিন, ফিরিয়ে দিন আমার হার। ভুল করেই আপনাকে দিয়েছিলাম।

ইন্দ্র বলল, আপনি নিশ্চয় ফিরিয়ে নেবার জন্যে দেননি। একেবারে দান করেই দিয়েছেন।

সরিতা চুপচাপ বসে রইল ইন্দ্রের দিকে চেয়ে। যে পাক্কায়াম ভাল্লমটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সে বলল, এখানে বসার একটা জায়গা আছে। আপনারা ইচ্ছে করলে ডাঙায় উঠে বসতে পারেন।

ইন্দ্রের মনে হল লোকটি রসিক। একটুখানি নিভৃতে কথা বলার সুযোগ করে দিতে চায়।

ইন্দ্র অমনি বলল, সিগারেট পাওয়া যাবে কাছেপিঠে কোথাও?

লোকটা একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, মিনিট পনের বসুন ওখানে। আমি ভাল্লম নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। কিছু দূরেই দোকান আছে, এনে দিচ্ছি।

ওরা উঠে বসল নারকেল গাছের তলায় একটা সুন্দর বাঁধান সিমেন্টের বেদির ওপর। লোকটি তিরতির করে ভাল্লমটা বেয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

পাশাপাশি বসেছিল ওরা। ভাল্লমের জল কেটে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ধবধবে জ্যোৎস্না ইতস্তত ছড়ান অভ্রের কুচির মত ঝিলমিল করে উঠল।

ইন্দ্র বলল, এই মুহূর্তে কাউকে কিছু একটা দিতে ইচ্ছে করছে।

সরিতা ইন্দ্রের দিকে চেয়ে হাসল।

ইন্দ্র বলল, আপনাকে প্রিয়জন বলে ভাবতে পারি, এ স্পর্ধাটুকু কি আপনি সহ্য করবেন?

সরিতা মিষ্টি হেসে বলল, এতদিন তাহলে আপনি কি আমাকে অপ্রিয় বলে ভেবে এসেছেন?

ইন্দ্র বলল, পদ্মনাভপুরম্ প্যালেস থেকে নাচ দেখে ফেরার দিন বিকল গাড়ির ভেতর বসে অন্ধকারের বোরখা ঢাকা একখানা মুখকে আমার বুকের ভেতর ধরে রেখেছিলাম—এ ঘটনাকে আমার আজও দারুণ রকম অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

সরিতা ইন্দ্রের একখানা হাত তুলে নিয়ে তার সারা মুখে ছুঁইয়ে আবার কোলের ওপর রেখে দিয়ে বলল, আমাকে স্পর্শ করেও কি আপনার বিশ্বাসটুকু ফিরে আসছে না?

ইন্দ্র বলল, সরিতা, লোভ দেখাবেন না, আমি তো মানুষ, হয়তো আপনার সম্মান রাখতে পারব না। চপলতা ঘটে যেতে কতক্ষণ? তখন বিবেকটাকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অবাধ্য আবেগের স্রোত।

সরিতা বলল, চারিদিকে লক্ষ্য নজর রেখে ভেবে চিন্তে কেউ কোনদিন কাউকে ভালবেসেছে, এমন নজির একটা দেখাতে পারেন?

ইন্দ্র বলল, এতদিনে আশ্বস্ত হলাম। আমার পাশে বসে যে মেয়েটি তার কোলের ওপর আমার হাতখানা তুলে নিয়েছে, সে একেবারে চন্দ্র সূর্যের মতই সত্যি। আর সে আমার মত একটি অতি সাধারণ ছেলেকে ভালবাসে।

সরিতা তার কোলের ওপর রাখা ইন্দ্রের হাতটা নিজের দু'হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বলল, বাসেই তো। অসাধারণ কিছু সে নিজেও নয়, তাই অসাধারণ কাউকে ভালবাসার ইচ্ছেও তার নেই।

ইন্দ্র বলল, আমার হাতে তোমার গলার মালা। এ মালায় তোমার অযাচিত দানের স্পর্শ মাখান। দরিদ্র আমি, তাই সেই মালাটাই তোমাকে পরিয়ে দিয়ে আজ প্রিয়জনকে কিছু দেবার আনন্দটুকু পেতে চাই।

ইন্দ্র মালার দু'প্রান্ত ধরে যত্ন করে পরিয়ে দিল সরিতার গলায়।

চুপচাপ জলের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল সরিতা। পরে ইন্দ্রের হাতের পাতায় নিজেব মুখখানাকে ঢেকে ফেলল।

ইন্দ্র বলল, আমি বুঝতে পারছি না সরিতা, এই আশ্চর্য মুহূর্তটা আমাদের ভাগ্যে কি লেখা লিখে দিয়ে গেল। সে বিধাতা পুরুষকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। দুঃখ সুখ দুটোই তাঁর হাতে। নিঃশব্দে এসে কখন কি তিনি দিয়ে যাবেন তা আমাদের অজানা। শুধু হাত পেতে নিতে হবে।

সরিতা ইন্দ্রের হাতখানা কোলের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, তাই মেনে নেব। সুখ আমরা নিশ্চয় চ'ইব, কিন্তু দুঃখকে দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাব না।

ইন্দ্র বলল, তোমাকে একটু আদর করতে ইচ্ছে করছে সরিতা।

সরিতা বলল, উঁহু, আগে ভুলটা শুধরে নিন, তারপর প্রশ্রয় দেবার কথা ভাবা যাবে।

ইন্দ্র পকেট থেকে লটারির সেই দশ পয়সাটা বের করে কায়েলের জলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, আমাদের সেই লটারির ভূতটা এতক্ষণে অগাধ জলের তলায় ডুবে মরেছে। আর আমরা তাকে কোন মতেই বাঁচিয়ে তুলব না।

কথা শেষ করেই বুকের কাছে সরিতার মাথাটাকে টেনে এনে ইন্দ্র বলল, কখনো কি কোন প্রেমিক প্রেমিকাকে কেউ বলতে শুনেছে, আপনাকে একটু আদর করতে ইচ্ছে করছে আমার।

বলেই ইন্দ্র নিজের মুখখানাকে সরিতার মুখের কাছে নামিয়ে আনল।

সরিতা বাঁ হাতের তিনটে আঙুলে ইন্দ্রের নেমে আসা মুখের সামনে একটা দুর্বল প্রতিরোধের বেড়া গড়ে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু ভেঙে গেল সব প্রতিরোধ। ইন্দ্রের বলিষ্ঠ ঠোঁটের পেষণে সরিতার কাঁঠালী চাঁপার মত দুটি ঠোঁটে যন্ত্রণার একটা ঢেউ উঠল।

সরিতা নিজেকে যখন মুক্ত করে নিল ইন্দ্রের বুকের বাঁধন থেকে, তখন দুজনেই লজ্জা পেল কায়েলের দিকে তাকিয়ে।

এলোমেলো পাথর ফেলা সিঁড়ির তলায় কখন নিঃশব্দে এসে ভিড়েছে ভাল্লমখানা। নৌকোর ওপর

সিল্যুয়েট ছবির মত দাঁড়িয়ে পাল্কায়াম। ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে চাঁদ দেখছে।

সরিতা উঠে দাঁড়িয়ে দুটো হাত ঘুরিয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিল। ইন্দ্র চুপি চুপি বলল, লোকটার কথা বেমালুম ভুলে বসেছিলাম।

সরিতার গলায় মৃদু তিরস্কার বেজে উঠল, ভুলে যাওয়াই তো তোমাদের স্বভাব।

ওদের গাড়ি যখন এসে পৌঁছল কারুনাগপল্লীতে, তখন ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘর ছুঁই ছুঁই। একটা পড়ো জমির আগাছা ভরা অস্পষ্ট পথের ওপর দিয়ে সরিতার গাড়ি এগিয়ে দাঁড়াল কটা লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছের তলায়।

ইন্দ্র দেখল, সামনে একখানা পুরানো দিনের ভগ্নপ্রায় পেল্লাই বাড়ি। পেছনে নারকেল বাগান। টগরফুলের মত জ্যোৎস্না ফুটে আছে চরাচরে।

গাড়ি থেকে নেমে পুরানো পরিত্যক্ত প্রায় কেটেডমের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সরিতা। পাশে এসে দাঁড়াল ইন্দ্র। সে শুধু সরিতার সঙ্গী। এই রহস্যপুরী সম্বন্ধে সে একেবারে অনভিজ্ঞ।

সরিতা কোন কথা বলছে না, কোন রহস্যের আবরণ সরাচ্ছে না, কেবল এক একবার বাঁ হাতের ঘড়িখানা চোখের সামনে তুলে ধরে চাঁদের আলোয় সময় দেখছে।

একটা দরজা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। পরক্ষণেই এক বৃদ্ধের গলা বেজে উঠল।

'আহারম্ করিক্যাতবর উণ্ডাঙ্গিল ওয়ারিকা।'

তিনবার এমনি করে হাঁক দিল বৃদ্ধ।

'এমন কে আছে, যার আহার হয়নি এখনও, চলে এসো।'

বৃদ্ধের গলা থেমে গেলে সরিতা দ্রুত পা চালিয়ে ঐদিকে যেতে যেতে বলল, এসো।

ইন্দ্রও তাকে অনুসরণ করল।

বৃদ্ধ জীর্ণ বিরাট দরজাটা ভেজিয়ে দেবার জন্যে ভেতরে থেকে উদ্যোগ করেছিলেন, সরিতা তাঁর সামনে গিয়ে জানু ছুঁয়ে নমস্কার করল।

কে!

আমি তোমার ডাক শুনে এলাম আম্মাওয়ন।

কে? কে তুই, সরিতা!—বৃদ্ধের গলা আবেগে বন্ধ হয়ে গেল। তিনি দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন সরিতাকে।

ইতিমধ্যে হাতে নিলা ভিলাক্কু নিয়ে একটি মেয়ে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্রদীপের আলোয় মেয়েটিকে মনে হচ্ছিল একটি গন্ধরাজ ফুল। ধবধবে সাদা কাপড়ে আশ্চর্য লাবণ্যে ভরা একটি মূর্তি। বয়সে প্রেমাকেই মনে করিয়ে দেয়।

সরিতা!—মেয়েটির গলায় বিস্ময় বেজে উঠল।

ইন্দ্র বুঝল সরিতার সঙ্গে এই পরিবারটির নিবিড় ঘনিষ্ঠতা।

মেয়েটি ইন্দ্রের দিকে চেয়ে মুখ নীচু করতেই সরিতা বৃদ্ধকে বলল, আমাদের পরিবারের একটি বন্ধু সঙ্গে রয়েছেন।

বৃদ্ধ হাত তুললেন।

ইন্দ্র এতক্ষণে বুঝতে পারল, বৃদ্ধ ভদ্রলোক অন্ধ। ইন্দ্র এগিয়ে গিয়ে নত হয়ে নমস্কার করে বলল, আমার নাম ইন্দ্র, ইন্দ্র রায়।

বৃদ্ধ বললেন, মনে হচ্ছে বাঙালী।

সরিতা উত্তর দিল, হ্যাঁ আম্মাওয়ন. উনি বাঙালী।

বৃদ্ধ হঠাৎ বললেন. আসুন আপনি আজ আমার বিশেষ অতিথি। বাঙালীদের আমি ভালবাসি। দেহ আর মনের দিক থেকে আমরা অনেক কাছাকাছি।

ইন্দ্র বলল, আমারও তাই মনে হয়। বিশেষ করে এই দুটি জাতির মানুষেরা একটু বেশি রকমের ইমোশনাল। জানি না এটা খারাপ কি ভাল।

বৃদ্ধের মুখ ঐ নিলা ভিলাকুর স্বল্প আলোয় উজ্জ্বল দেখাল। বললেন—

'Emotion is not something shameful, subordinate secondrate; It is a supremely valid phase of humanity at its noblest and most mature.'

কথা কটি বলেই কিন্তু বৃদ্ধ আন্দাজে ইন্দ্রের দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরলেন।

ধরেই বললেন, রাত হয়ে গেছে, কথা বাড়াব না। চলুন যা আছে ভাগ করে খাওয়া যাক।

সরিতার হাত ধরে মেয়েটি প্রদীপ নিয়ে এগিয়ে চলল। বৃদ্ধ লাঠি একখানা ঠুকতে ঠুকতে অভ্যস্ত পথে তাদের অনুসরণ করে চললেন। ইন্দ্র চলল সবার পেছনে।

খাবার আসনে বসেই ইন্দ্র কথায় কথায় অনেক খবর জানতে পারল। গোবিন্দন পিল্লাই একসময় গৃহশিক্ষক ছিলেন সরিতাদের। তখন করুণাকরন ব্যবসায়ের ব্যাপারে এত ব্যস্ত ছিলেন যে মেয়েদের দিকে ঠিকমত নজর দেবার অবকাশ ছিল না তাঁর। সে সময় গোবিন্দন পিল্লাই চাকরি করতেন ঐ অঞ্চলে। পরিচয় হয় করুণাকরনের সঙ্গে। ধীরে ধীরে যাওয়া আসা হতে লাগল দুই পরিবারের ভেতর। করুণাকরন যখন বাইরে যেতেন, তখন গোবিন্দন দেখাশোনা করতেন করুণাকরনের মেয়েদের। গোবিন্দনের স্ত্রী তখন বেঁচে। তিনি মাতৃহীন দুটি মেয়েকে প্রায়ই নিজের কাছে ডেকে আনতেন। নিজের একটি মাত্র মেয়ে ললিতার সঙ্গে মিলেমিশে থাকত ওরা। শেষে ওদের লেখাপড়ার ভার পুরোপুরি করুণাকরণ দিয়ে দিলেন গোবিন্দন পিল্লাই-এর হাতে।

স্ত্রী মারা যাবার পর গোবিন্দন মেয়ে ললিতাকে নিয়ে বদলী হয়ে আসেন কারুনাগ পল্লীতে। তখনও সময় সুযোগ পেলে উৎসবে অনুষ্ঠানে দুটি পরিবারের ভেতর আসা যাওয়া চলত। আকস্মিকভাবে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে বড় বেশি স্থবির আর গৃহাশ্রয়ী হয়ে পড়েছেন গোবিন্দন। পাঁচ ছ'বছরে যোগাযোগটা অনেকখানি ছিন্ন হয়ে গেছে তাই।

গোবিন্দন একসময় বললেন, জানেন মিঃ রায়, মাধবী আম্মার কাছে প্রেমা যখন নাচ শিখতে যেত তখন সরিতা চুপচাপ একটা গল্পের বই নিয়ে বসে থাকত আমার পাশের চেয়ারে। অফিসের সবাই ভেবে নিয়েছিল, ও আমারই মেয়ে। অফিস থেকে ফেরার সময় ও নিজের ঘরে না গিয়ে ললিতার মায়ের কাছেই চলে আসত।

সরিতা বলল, ললিতার কিন্তু আমার সঙ্গেই ভাব ছিল বেশি। যদিও দিদির বয়সী ও।

ললিতা বলল, আমরা যত প্ল্যান করতাম, তার সবটাই প্রায় গোপন করে রাখতাম প্রেমার কাছ থেকে।

গোবিন্দন হঠাৎ বলে উঠলেন, প্রেমা এল না কেন সরিতা?

কেন, আমি একা আসাতে মন ভাল না আম্মাওয়ন?

তুই চিরকাল ঝগড়াটে রয়ে গেছিস কুট্টি।

সরিতা বলল, প্রেমা নাচে বেশ নাম করেছে আম্মাওয়ন। ও গভর্নমেন্টের ডাকে কদিন ওদের গেস্ট হয়ে আছে। নাচ দেখাতে হবে সরকারি ভি আই পি—মিডল ইস্টের কোন এক সফররত বাদশাকে।

গোবিন্দন বললেন, আমি জানি প্রেমা দারুণ রকম ট্যালেন্টেড।

সরিতা অমনি ফোঁস করে উঠল, আর আমি বুঝি একেবারেই ফ্যালনা?

অন্ধ গোবিন্দন আন্দাজে বাঁ-হাতটা তুললেন চাঁটি মারার ভঙ্গিতে, কিন্তু সরিতা ততক্ষণে ছেলেমানুষের মত মাথাটা নীচু করে নিয়েছে।

ইন্দ্রের মনে হল এ খেলাটা অনেকদিনের পুরোনো। সেই পড়ানোর সময় হয়ত গোবিন্দন সরিতাকে শাসনের অভিনয় করতেন এমনি করে আর দুষ্টু সরিতাও ঠিক এমনিভাবে মাথাটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করত।

এখনও সরিতার ভেতর সেই কিশোরীটি রয়ে গেছে দেখে ইন্দ্রের ভীষণ ভাল লাগল।

খাওয়ার শেষে বৃদ্ধ গিয়ে বসলেন জ্যোৎস্না ধোয়া উঠোনের মাঝখানে একখানা বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে। পাশের একখানা চেয়ারে বসল ইন্দ্র। দুটি বান্ধবী অনেকদিন পরে একসঙ্গে হয়েছে তাই উঠে গেল ছাদের ওপর। সম্ভবত ঘুমের আগে কিছুক্ষণ মনের কথা বলবে দুজনে।

গোবিন্দন বললেন, দুটো গপ্পি একসঙ্গে মিলেছে, কখন নামে দেখুন। আপনি বরং ওদের কথা না ভেবে বিছানায় চলে যেতে পারেন।

ইন্দ্র বলল, ওরা আমাকে শোবার জায়গাটা দেখিয়েই দিয়ে গেছে। কিন্তু কেন জানি না রাত হলেও ঘুম আসছে না চোখে।

ঘুম আমারও নেই, মিঃ রায়। আজ চার-পাঁচ বছর রাতগুলো আমার কাছে বিভীষিকা।

গোবিন্দন পিল্লাই-এর কথাগুলো দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাল।

একটু থেমে আবার বললেন, একটা নাতনি আছে আমার, সে পাশটিতে শুয়ে থাকে গলা জড়িয়ে। তাকে গল্প বলে ঘুম পাড়াতে হয়। ও ঘুমোলে প্রায় সারাটা রাত আমি জেগে কাটাই। ঘুম আসে না।

ইন্দ্র বলেন, ডাক্তার কি বলেন?

এ ডাক্তারের কেস নয় মিঃ রায়। আমার ভাগ্য আমাকে নিয়ে খেলা করছে।

ইন্দ্র বৃদ্ধের কথার রহস্য ভেদ করতে পারল না। কিছু জিজ্ঞেস করা সমীচীন নয় ভেবে চুপচাপ বসে রইল।

গোবিন্দন নিজেই আবার কথা শুরু করলেন, বেশ কেটে যাচ্ছে। বিধাতা চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে নতুন একটা জগতের দরজা খুলে দিয়েছেন। সেখানে দিনে রাতে অনেকটা সময়ই নিজের সঙ্গে কথা বলি। অন্ধকার জগতটার আনাচে-কানাচে পায়চারি করে ঘুরে বেড়াই।

ইন্দ্র অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল, আজ আমরা যখন এখানে এলাম তখন আপনি অভুক্ত মানুষদের খাবার জন্যে ডাক দিচ্ছিলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ নতুন বলে মনে হয়েছে।

বৃদ্ধ গোবিন্দন বললেন, এ আমার নতুন কিছু সৃষ্টি নয়, কেরালার প্রাচীনপন্থী পরিবারে এই রীতি আজও চলে আসছে। আমার বাপ-ঠাকুর্দা এমনি করে রাতে খাবার আগে অভুক্তদের ডাক দিতেন, আমিও তাই করি, অতিথি আসুক আর না আসুক। ঠিক দশটা বাজলেই অতিথিদের ডাক দিই আমি।

ইন্দ্র বলল, অতিথি সেবার চলন ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই ছিল, কিন্তু এমন করে আজ আর বোধহয় ভারতের কোন অঞ্চলের মানুষ অতিথিদের ডাক দিয়ে ঘরে আনে না।

গোবিন্দন বললেন, সমাজ বদলাচ্ছে, অনেক উন্নত প্রথা পদ্ধতির চলনও হচ্ছে কিন্তু লোপ পাচ্ছে এমন সব আচার-আচরণ, যা ছিল আমাদের দেশের একেবারে হৃদয়ের জিনিস।

আমি একেবারে এ যুগের ছেলে হয়েও কিন্তু পুরোনো ঐতিহ্যের সবকিছুকে ভুলতে পারি না।

বৃদ্ধ গোবিন্দন পিল্লাই হেসে বললেন, তাহলে তো আপনি ব্যাকডেটেড হয়ে গেলেন এ যুগের চোখে।

ইন্দ্র বলল, আমাকে আপনি বলে ডাকলে দুঃখ পাব, যদি তুমি বলে ডাকেন তাহলে খুশী হব অনেক বেশি।

গোবিন্দন তাঁর হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন ইন্দ্রের দিকে। ইন্দ্র অন্ধ গোবিন্দনের হাত নিজের দুটো হাতের ভেতর ধরে রাখল।

গোবিন্দন বললেন, তুমি আমাকে বড় বেশি বিচলিত করে তুললে বাবা। আজ তোমার হাতে হাত রেখে একটা শোকের ঢেউ বুকের ভেতর থেকে উঠে আসতে চাইছে।

ইন্দ্র বুঝল, বৃদ্ধ গোবিন্দনের কোন কোমল জায়গার আবরণ সে অন্তরঙ্গতার হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে।

ইন্দ্র বলল, আপনাকে দেখে আমার বাবার মুখখানা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। বাবাও অপরিচিতকে খুব তাড়াতাড়ি আপনার করে নিতে পারেন। আপনার মতই উনি একটু বেশি রকমের সেন্টিমেন্টাল।

গোবিন্দন কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। একসময় নিজের ভেতরের আবেগটুকু সামলে নিয়ে বললেন, বিরাট একটা পাথরের স্তূপ আমার বুকের ওপর চেপে বসে আছে। এমন কাউকে কাছে পাই না, যাকে বুকের জমে থাকা কথাগুলো বলে একটু হালকা হতে পারি।

এবার ইন্দ্রের চুপ করে বসে থাকা ছাড়া করণীয় কিছু ছিল না।

বৃদ্ধ গোবিন্দন পিল্লাই কান পেতে কোন কিছু শোনার চেষ্টা করলেন।

ওরা দুবান্ধবীতে গান গাইছিল ছাদের ওপর বসে। বোধহয় ছাদের অন্য প্রান্তে বসে গাইছিল, তাই গানের কথা বা সুর স্পষ্ট হয়ে বাজছিল না।

গোবিন্দন বললেন, কোন কিছুর তোয়াক্কা করতাম না ইন্দ্র, ভেবেছিলাম লোহা পিটিয়ে যেমন অস্ত্র বানায় তেমনি করে ভাগ্যকে গড়েপিটে আমি নিজের খুশী মত পথ তৈরি করে নেব। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, দেখলাম ভাগ্যই আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। মনের সবটুকু শক্তি জড়ো করে ভাগ্যকে অস্বীকার করতে চাইলাম, কিন্তু একটা লোহার ফ্রেমে 'আটকে দিয়ে ভাগ্য আমার সকল শক্তি কেড়ে নিল।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। অন্ধ গোবিন্দনের নিজস্ব জগতে একটা কিছু আলোড়ন চলছে। ওদিকে দুটি কণ্ঠ এক হয়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে সুর। দমকা হাওয়ায় এলোমেলো বৃষ্টিধারার মত সুরগুলো ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে।

গোবিন্দন বললেন, তোমার মত একটি ছেলের সঙ্গে ললিতার বিয়ে দিয়েছিলাম। ছেলেটি বেশ প্রমিসিং বলে আমার মনে হয়েছিল। সবে ডাক্তারী পাশ করেছে। সার্জারীতে হাত ভাল দেখে ওকে ফরেনে পাঠানোই স্থির করলাম। একটিমাত্র মেয়ে আমার। কার জন্যে আর সঞ্চয় করব। ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিলাম বিলেতে।

কিছুকাল নিয়মিত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলেছিল, তারপর ওদিক থেকে খবর আসা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

ললিতার মানসিক অবস্থা যে কী, তা তুমি অনুমান করতে পার। সে তখন মা হতে চলেছে। যেদিন আমার নাতনী তুল্পি ভূমিষ্ঠ হল তার ঠিক সাতদিন পরে এল এক টেলিগ্রাম, আকস্মিক দুর্ঘটনায় ললিতার স্বামী মারা গেছে! টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল তার কোন এক বন্ধু।

ইন্দ্র একটা দুঃখের শব্দ তুলে বলল, মারা গেলেন!

বৃদ্ধ গোবিন্দন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এক সময় বললেন, ললিতা অন্তত তাই জানে। তাছাড়া আমার পরিচিত জনেরাও একথা বিশ্বাস করে নিয়েছে।

ইন্দ্র বলল, মারা গেছেন এতে আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন কি! আমি ভাবতে পারছি না, এত অল্প বয়সে ললিতা তাঁর স্বামীকে হারালেন।

গোবিন্দন বললেন, স্বামীকে হারিয়েছে ঠিক। কিন্তু সে ছেলেটি মারা যায়নি, বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। একটি জার্মান মেয়েকে বিয়ে করে জার্মানিতেই সেটল করেছে। লন্ডনেই ওদের পরিচয় হয়েছিল, তার পরিণতি ঘটল জার্মানিতে গিয়ে।

আপনার সংগ্রহ করা খবরটা কি সঠিক?

গোবিন্দন বললেন, আমার পরিচিত এক বন্ধু জার্মানিতে দীর্ঘদিন রয়েছে, সে ঠিকানা পর্যন্ত আমাকে জানিয়েছে।

আপনি চিঠি দেননি?

গোবিন্দন হাসলেন। জ্যোৎস্নার রহস্যময় আলোয় সে হাসির অর্থ ভেদ করতে পারল না ইন্দ্র।

একসময় গোবিন্দন কথা বললেন, কি হবে চিঠি দিয়ে বল? যে নিজেকে চোরা পথে চোরের মত লুকিয়ে নিয়ে বেড়ায়, তাকে আমার মেয়ের স্বামী বলে ভাবব! তার চেয়ে সে মারা গেছে একথা ভাবা অনেক বেশি শান্তি আর সম্মানের নয় কি?

ললিতাকে এই আসল খবরটা জানাননি কেন?

সে সইতে পারবে না বলে। ওর মনটা ওর মায়ের মতই নরম। আমার মানসিক শক্তি ও পায়নি।

ইন্দ্র চুপ করে রইল। গোবিন্দন বললেন, সবচেয়ে ট্রাজেডি হল, ললিতা তার ঘরে ঐ প্রতারক ছেলেটার একখানা বড় ফটো টাঙিয়ে রেখেছে। রোজ ফুলের মালা পরায়। ধূপ আর প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়, মৃত্যুর দিনটিতে অভুক্ত থেকে পুজো আচ্চা করে। মা আর মেয়েতে প্রার্থনা গীত গায়।

ইন্দ্র বলল, আশ্চর্য!

সব কিছু জেনেশুনেও আমাকে দাঁড়াতে হয় ওর পাশে। গম্ভীর মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকি ঐ প্রতারকটার মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে। ললিতার কান্নাভরা মুখখানা বুকের ভেতর চেপে ধরে সান্ত্বনা দিই।

ইন্দ্র বলল, একটা চরম মিথ্যেকে সত্যের মুখোশ পরিয়ে বিশ্বাসযোগ্যভাবে হাজির করতে হচ্ছে, এর চেয়ে ট্রাজেডি আর কি হতে পারে!

ইন্দ্র, আমি অন্ধ হয়ে বেঁচেছি। যদি স্বাভাবিক চোখ নিয়ে ওর সামনে দাঁড়াতাম তাহলে ও আমার মুখের দিকে চেয়ে কাঁদতে পারত না। তাতে ওর বুকের যন্ত্রণাই বেড়ে যেত। এখন ও ইচ্ছে মত কেঁদে বাঁচে, আর ওর কান্নাভরা মুখ দেখতে হয় না বলে আমিও বাঁচি।

ইন্দ্র খোঁজ নেয়, ললিতার মেয়েটির বয়স এখন কত ?

গোবিন্দন বললেন, তা বছর পাঁচেক হল। ওই এখন ললিতার সান্ত্বনা, তার ভরসা, যাই বল।

ভোরবেলা দেখা হল ললিতার মেয়ে তুল্লির সঙ্গে। এমন নাম এখানে আসা অবধি ইন্দ্র কানে শোনে নি। সরিতাকে কথাটা বলতেই ও তুল্লিকে বেশ খানিকটা আদর করে নিল। তারপর ইন্দ্রের দিকে চেয়ে বলল, এ ধরনের নাম কেউ কখনো রাখে না এখানে। তুল্লি হল ফোঁটা। ও ললিতার চোখে বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে এসেছে। তাই ললিতাই ওর অমনি একটা নাম রেখেছে।

ইন্দ্র চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ দেখল তুল্লিকে। সুন্দর দেখতে মেয়েটি, অবিকল মায়ের মুখখানা কে যেন ছাঁচে তুলে বসিয়ে দিয়েছে। বড় বড় উদাসী দুটো চোখ।

অপরিচিত ইন্দ্রের দিকে চেয়ে রইল কতক্ষণ।

সরিতা ইন্দ্রকে দেখিয়ে বলল, ও কে বলতো?

তুল্লি লজ্জা পেয়ে সরিতার মুণ্ডির একটা প্রান্ত ধরে নিজের মুখখানাকে আড়াল করে নিল।

সরিতা লুঙ্গিখানাকে টেনে নিয়ে ইন্দ্রের দিকে আঙুল তুলে মোলায়েম গলায় বলল, বল কে ?

অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে সরিতার গলা জড়িয়ে কানের কাছে মুখ রেখে তুল্লি বলল, আপ্‌পা।

ইন্দ্র কথাটা শুনতে পেল না, কিন্তু সরিতার বড় বড় চোখ দেখে বুঝল, মেয়েটি বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছে।

ললিতাকে ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল। সরিতা তুল্লিকে বলল, চেরি-আচ্চন। তোমার কাকামণি।

ইন্দ্র বুঝল, তুল্লির দারুণ রকম একটা ভুলকে তাড়াতাড়ি শুধরে দিল সরিতা। এখন ইন্দ্রের সঙ্গে তুল্লির হল কাকা-ভাইঝির সম্পর্ক।

ললিতা একটা প্লেটে খানিকটা হালুয়া এনেছিল। ইন্দ্রের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, খান।

ইন্দ্র অমনি বলে উঠল, একটু আগে চা জলখাবার খেলাম। আধ ঘণ্টাও পেরোয় নি। এ রকম খাওয়ালে এ জায়গা থেকে আর কিন্তু নড়াতে পারবেন না।

ললিতা হাসল। ওর চোখ দুটো কেমন করুণ করুণ। হাসলেও মেঘ ভাঙা রোদের মত মনে হয়।

বলল, বেশ ত থাকুন না। কে আপনাকে চলে যেতে বলছে। তবে সরিতা চলে গেলে আপনি কি আর থাকতে পারবেন।

কথাটা বলেই চোখের কোণে তাকাল সরিতার মুখের দিকে। দুষ্টুমির হাসি ঠোঁটে লেগে আছে ললিতার।

ইন্দ্র বুঝল, গত রাত্রে দুই বান্ধবীতে মনের কথা উজাড় করে বলা হয়ে গেছে। ললিতার চোখে ইন্দ্র এখন আর কোন অপরিচিত মানুষই নয়।

ইন্দ্র বলল, আপনার বান্ধবী আমার মালিক। তার মর্জির ওপর আমার থাকা না থাকা নির্ভর করছে। সরিতা সম্মতি দিলেই আমি থেকে যাই।

সরিতা বলল, খুউব, খুব যে। থাকই না। এক্ষুণি সই করে দিচ্ছি ছুটির দরখাস্তে। যদ্দিন খুশী থেকে যাও ছুটি নিয়ে।

ইন্দ্র ললিতার দিকে চেয়ে বলল, দেখছেন তো আপনার বান্ধবী কি রকম দয়ালু। ছুটি চাইতে না চাইতেই মঞ্জুর।

ললিতা বলল, সরিতার বন্ধুটি মালিকের প্রতি অনুগত বলেই তাকে এতটা ফেভার দেখান হচ্ছে।

তিনটি হলুদ প্রজাপতি নেচে বেড়াচ্ছিল হাওয়ায় তিনটে আধফোটা ঝিঙে ফুলের মত। তুল্লি তাদের পেছন পেছন ছুটছিল। সে প্রজাপতিগুলোকে ধরার কোন চেষ্টাই করছিল না। শুধু সারা বাগান ওদের সঙ্গে ছুটে ছুটে ওদের নাচ দেখছিল অবাক চোখে। দুটো কচি কচি হাত পেছন দিকে বেঁধে চোখ দুটো ওপরে তুলে যখন দাঁড়িয়েছিল তুল্লি, তখন তাকে শ্রেষ্ঠ কোন চিত্রকরের পুরস্কার পাওয়া ছবি বলে ভ্রম হচ্ছিল।

এই মুহূর্তে কি মনে করে ইন্দ্রের কাছে দৌড়ে এল তুল্লি। কচি গলায় কলকলিয়ে বলে উঠল, আপ্পা, প্রজাপতিরা কোথায় থাকে ?

ইন্দ্র ততক্ষণে সংকোচে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। ললিতা আর সরিতা স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

ললিতা এগিয়ে এসে বলল, উনি তোমার আম্মাওয়ন, তুল্লি। ইন্দ্রের দিকে চোখ তুলে পরিষ্কার বাংলায় বলল, মামাবাবু।

তুল্লি তার কচি আঙ্গুল তুলে মাকে শাসনের ভঙ্গিতে বলল, বোকামী করে না, উনি আমার চেরি-আচ্চন।

কথাটা বলেই সে একটা বিজ্ঞের হাসি হেসে সরিতার দিকে তাকাল।

অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটা হঠাৎ লঘু হয়ে গেল। সরিতা অমনি হেঁকে বলল, ভেরি গুড, ভেরি গুড।

ললিতা আবার পায়ে পায়ে পেছনে সরে গিয়ে দাঁড়াল সরিতার পাশে।

ইন্দ্র তুল্লির দুটো হাত ধরে বলল, তোমার প্রজাপতিরা সবুজ বনে সোনা আর রুপোর তৈরি ঘরে রাত দিন ঘুমিয়ে থাকে। হঠাৎ কোনদিন ওরা স্বপ্ন দেখে, নীল নীল জলের ওপর চাঁদের আলো ঝিলমিল নাচ নাচছে। হাওয়ার ঘায়ে দোল খাচ্ছে ফুলের ডাল।

অমনি ঘুম ভেঙে যায় ওদের। তখনি হুড়মুড়িয়ে ঘরের দরজা ভেঙে বেরিয়ে আসে। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দেয় ওদের স্বপ্নে দেখা সেই নাচ।

বড় বড় চোখ মেলে অবাক হয়ে তুল্লি শুনল প্রজাপতিদের গল্প।

অমনি বায়না ধরল, আরও গল্প বল।

কিসের গল্প শুনতে চাও ?

তুল্লি ভেবে ভেবে বলল, পুতরিদের গল্প জান তুমি ?

ইন্দ্র বলল, জোনাকীদের মায়ের রঙ বেজায় কালো। তাই দিনের বেলা আলোর সামনে বেরোয় না। দিন ফুরোলে সে ঘুরে বেড়ায় সব জায়গায়। যেখানে যায় সেখানকার গাছপালা ঘর-বাড়ি, নদী-নালা সব কিছু তার রঙের ছোঁয়ায় অন্ধকার ঘুরঘুট্টি হয়ে যায়। যেদিন রাতে চাঁদ ওঠে, সেদিন সে লুকিয়ে থাকে ঝোপে-ঝাড়ে, বনের গভীরে আর পাহাড়ের গুহার ভেতর।

সে যখন পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়, তখন লোকজন বড় একটা কেউ বেরোয় না। তার কালো রঙের ছায়ায় পথ দেখা যায় না, তাই।

লোকে জোনাকীদের মাকে বড় একটা পছন্দ করে না, কিন্তু তাতে কি এসে যায়। তার ছেলেমেয়েগুলো একেবারে সোনার টুকরো। পথ দিয়ে গেলে সবাই তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে। আলোর ফুলকির মত, তুল্লির মাসির নাকের ঐ হীরেটার মত ঝলমল করে ওঠে তারা।

আর কি নাচের ঘটা তাদের। বনে বনে পথে পথে, ঝিলে বিলে ঘুরে ঘুরে নেচে বেড়ায় মনের খুশীতে। ভাই-বোনদের কি ভাব! যেখানে যাবে এক সঙ্গে যাওয়া চাই।

লোকে পুত্রীদের মা নিশিবালাকে পছন্দ না করলেও তার হীরের টুকরো ছেলেমেয়েগুলোকে খুব ভালবাসে। আর তাই নিয়ে মায়ের গর্ব যেন ধরে না। কচি-কচি ছেলেমেয়েরা তুল্লির মত ফুটফুটে সুন্দর আর লক্ষ্মী হলে কোন মায়ের না ভাল লাগে বল ?

এমনি করে সুন্দর ছেলেমেয়েদের পেয়ে নিজের সুখ দুঃখ ভুলে গেছে পুত্রীদের মা।

শুধু যখন দিনের আলো জ্বলে ওঠে তখন মা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঢুকে পড়ে গাছের ফাঁক

ফোকরে অথবা কোন গুহা গর্তে। পুত্রীরা কিন্তু দিনের আলোয় বাইরে বেরোবে বলে কোন রকম বায়নাই ধরে না। ওরা মাকে খুব বেশি ভালবাসে। তুল্পির চেয়েও খুব বেশি, তাই না তুল্পি?

তুল্পি এবার জোরে জোরে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাল। তারপর ইন্দ্রর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ললিতা বলল, আপনি কিন্তু মহা মুশকিলে পড়বেন। গল্পের নেশা যেভাবে ধরিয়ে দিলেন তাতে তুল্পি আপনাকে সহজে নিষ্কৃতি দেবে বলে মনে হয় না।

ইন্দ্র বলল, আমি কচিকাঁচাদের দারুণ পছন্দ করি।

ললিতা অমনি সরিতার দিকে আড় চোখে চেয়ে বলল, আর কাঁচাদের ডাঁশা মাসিগুলোকে পছন্দ করেন না?

ইন্দ্র বলল, অনেক মাসিকে এক সঙ্গে পছন্দ করতে হলে আমাকে মিশরের ফারাও বা আরবের বাদশা হতে হয়।

সরিতা ললিতাব দিকে চেয়ে মন্তব্য করল, যেমন বলতে গিয়েছিলি।

তুল্পি কখন বাইরে চলে গেছে। এখন ঘরের পেছন দিক থেকে তার পরিত্রাহি চীৎকার শোনা গেল।

সবাই হুড়োহুড়ি করে সেখানে পৌঁছে দেখা গেল, গাইগরু একটা বাঁধা রয়েছে নারকেল গাছের সঙ্গে। সে গাছের কাণ্ডে জড়ান গাদা থেকে খড় টেনে টেনে চিবুচ্ছে। ধবধবে সাদা বাচ্চাটা পুষ্ট পটলের মত দুধের বাঁট ধরে প্রাণপণ শক্তিতে টেনে টেনে চুষছে। বাছুরটার পাশে মাটিতে আধশোয়া অবস্থায় পড়ে হাপুস চোখে কাঁদছে তুল্পি। চীৎকারটা উঠেছিল পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে।

সরিতা দৌড়ে গিয়ে তুলে নিল তুল্পিকে।

ললিতা বলল, এ আবার নতুন খেলা শুরু হয়েছে তুল্পির। পাশুকুটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ও বাঁট চুষে দুধ খাবে। যত না দুধ খায় তার চেয়ে চাঁট খায় বেশি।

সরিতা শঙ্কিত গলায় বলল, কোনদিন দেখ আবার দারুণ রকম চোট পেয়ে না বসে।

ললিতা বলল, পাশুটি কিন্তু খুব শান্ত। শুয়ে থাকলে ওর গলায় হাত বুলিয়ে দেয় তুল্পি। পাশুটিও তুল্পির মাথার ওপর মুখ তুলে দেয় আদরের ভঙ্গিতে। সে এক দৃশ্য। কিন্তু ও যদি পাশুটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সবকিছু করতে চায় তাহলে চোট ওকে পেতেই হবে।

মধ্যাহ্নভোজে বসেছে ওরা। এতটুকু আড়ষ্টতা নেই ললিতার ভেতর। সে যেন অনেক দিন পরে জেলখানার দমবন্ধ করা একটা সেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার করুণ দুটো চোখ কখন ভোরের রোদের মত আলোর জোয়ারে ভরে উঠেছে। সপ্রতিভ ললিতা বার বার ইন্দ্রকে বলল, আপনার খেতে খুব অসুবিধে হচ্ছে। আমাদের তৈরি খাবার বাঙালীদের মুখে রোচে না আমি জানি। আর একটুখানি সম্বর দেব? কালন অয়েল আবিয়েল? কিছু চাই না? বুঝেছি, খেয়ে পেট ভরে নি। হোটেলে নিজের খুশী মত বানিয়ে খান তো:

ইন্দ্র বলল, যা চাইব দেবেন?

বলুন—আড়ুকালার ওয়াদিল ধরে দাঁড়িয়ে মুখে হাসির ঝিলিক তুলে বলল ললিতা।

ইন্দ্র বলল, পর্দামন। সত্যি আপনার পায়েসের তুলনা হয় না।

সরিতা বলল, পেতে পার, তবে পায়সম তৈরির আদ্দেক উপাদান অন্তত বলতে হবে তোমায়!

ইন্দ্র ভেবে ভেবে বলল, আধসেদ্ধ ডালের সঙ্গে কাজুর গুঁড়ো কিসমিস নারকেলের দুধ দিয়ে ঘন করে ফোটান হয়েছে বলে মনে হয়।

অন্ধ গোবিন্দন হা হা করে হেসে উঠে বললেন, প্রায় ফুল মার্কস পেয়ে পাস করে গেলে ইন্দ্র। ললিতা হেরে গেছ তুমি। বাকী সবটুকু পায়সম্ কিন্তু ইন্দ্রেরই প্রাপ্য।

ইন্দ্র বলল, তা হলেই হয়েছে। সবটুকু এখন খেতে হলে তৃপ্তিটা হয়ে উঠবে শাস্তি।

সরিতা বলল, এখন দেখছি প্রেমা যোগ্য লোকের হাতেই হোটেল চালাবার ভার দিয়েছে।

ললিতা বলল, তুই কি এতকাল ওঁকে অযোগ্য ভেবেছিলি নাকি?

সরিতা চারটে আঙুলের ডগা ঠোঁটের মাঝখানে ছুঁইয়ে মাথাটা বুড়োবুড়ি পুতুলের মত ওপর নীচে দোলাতে লাগল।

দুপুরে বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় একটা বইয়ের ভেতর ডুবে গিয়েছিল ইন্দ্র। জ্যামাইকা ইন। ন্যাড়া পাহাড় আর জলাভূমি চলে গেছে খাঁড়ি অবধি। জনপদ থেকে অনেকখানি দূরে পাহাড়ি পথের ওপর অদ্ভুত একটা সরাইখানা। প্রবল বর্ষার রাতে সেখানে এসে পৌঁছল তরুণী একটি মেয়ে। সরাইখানার মালিক মেয়েটির মেসো, ভয়াবহ চরিত্রের লোক। মাসি সদাই ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। খুনজখম চোরাকারবারের পীঠস্থান সেই রহস্যময় সরাইখানাটি। কিন্তু সবচেয়ে যা ইন্দ্রের ভাল লাগছে তা হল নায়িকার চরিত্র। এমন বিপদের মাঝখানেও কি আশ্চর্য নির্ভীকতা। এক জলাভূমির মারাত্মক রাস্তার ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করে চলেছে। কখনও বা ন্যাড়া পাহাড় বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে চেয়ে চেয়ে দেখছে প্রকৃতির ভীষণ শূন্যতা।

সরিতা ঘরে ঢুকতেই চমকে তাকাল ইন্দ্র। মগ্নতা ভেঙে গেলে এমনি একটা চমক লাগে শরীরে। সরিতার দিকে চেয়ে ইন্দ্রের মনে হল, সে জ্যামাইকা ইনের দুরন্ত সাহসী যদৃচ্ছ বিহারিণী সেই মেয়েটিকে তার সামনে দেখছে।

সরিতা এসে বলল, আমি যাচ্ছি আম্মাওয়নকে নিয়ে আরণমূলায় পার্থসারথির মন্দিরে।

ইন্দ্র বলল, আরণমূলাটা কোথায়?

আলেপ্পি জেলার চেঙ্গানুর তালুকের একটা গ্রাম।

তুমি এতদূরে যাবে?

সরিতা বলল, অন্ধ মানুষ, একটা ইচ্ছে হয়েছে, তাঁকে কি না বলা যায়!

চল আমিও তোমার সঙ্গী হই।

সরিতা বলল, তাহলে তো ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু ইয়ংম্যান, তোমাকে আজকের রাতটা থাকতে হবে বাড়ি পাহারায়।

ইন্দ্র বলল, ভয়ডর আমার নেই কিন্তু তোমরা রাত কাটাবে ওখানে?

আম্মাওয়নের ইচ্ছেটা তাই। মন্দিরে সন্ধ্যা আর প্রভাত আরতির সময়টুকু কাটিয়ে ফিরতে চান।

ইন্দ্র বলল, আমার কোন অসুবিধে হবে না তোমরা নিশ্চিন্তে যেতে পার। খাবার ব্যাপারে চিন্তা কর না, একটা রাত শুকনো যা হোক কিছু খাবার খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারব।

সরিতা বলল, তা কেন, ললিতা আর তুল্লি তো থাকছেই।

ইন্দ্রের গলায় বিস্ময়ের সুর বাজল, ওরা যাচ্ছে না?

সরিতা বলল, পাশু, পাশুকুটি রয়েছে না, তাদের ফেলে ও যাবে কি করে। তোমাকে শুকনো খাবার অব্দি দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তা বলে পাশুদের পরিচর্যার ভার তো আর দেওয়া যায় না।

ইন্দ্র বলল, বেশ থাকতে পারব তবে একটা রাত একজন কাছে পিঠে থাকবে না ভাবলেই বুকখানা কেমন খালি খালি লাগবে।

সরিতা বলল, ফিরে এসে না হয় খালি বুকখানা ভরে দেওয়া যাবে।

ওরা চলে গেল। দূরের পথ, বেলা থাকতে থাকতেই চলে গেল ওরা। গাড়িটা পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে একবার থামল। সরিতার সুগঠিত শ্যামলা হাতখানা বেরিয়ে এল গাড়ির বাইরে। পাঁচটা আঙুল একটি শাখার মাথায় পাঁচটি পাতার মত কেঁপে কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই হাতটা অদৃশ্য হল। গাড়ি বেরিয়ে গেল চোখের বাইরে।

ললিতা ইন্দ্রের পাশেই দাঁড়িয়েছিল তুল্লিকে ধরে। হঠাৎ ইন্দ্রের দিকে ফিরে বলল, মন খারাপ হয়ে গেল তো?

ইন্দ্র হেসে তাকাল ললিতার দিকে। বলল, বান্ধবীর বান্ধবী তো রইলেন। তাই বা কম কি।

কার সঙ্গে কার তুলনা করলেন! সরিতা, সরিতা।

ইন্দ্র বলল, আর ললিতাও ললিতা।

ললিতা এক মুখ হাসি ছড়িয়ে বলল, তা সত্যি কারু সঙ্গে কোন দিক থেকেই আর কারু মিল নেই। এক একজনের আকারে স্বভাবে সবদিক থেকেই আলাদা।

তুল্পি খেলতে খেলতে কোথায় চলে গেল।

ললিতা বলল, আসুন ভেতরে বসে গল্প করা যাক।

ললিতার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র এসে ঢুকল ললিতার ঘরে।

বসুন।

ইন্দ্র ঘরের ভেতর পড়ে থাকা টুলটি টেনে নিয়ে বসতে যাচ্ছিল, ললিতা বলল, বিছানার ওপরেই বসুন। কোন সংস্কার নেই আমার।

ইন্দ্র বিছানায় বসতেই সামনের দেয়ালে চোখ গিয়ে পড়ল। বৃদ্ধের ভাষায় সেই প্রতারক ডাক্তার ছেলেটির ফ্রেমে বাঁধান ছবিটা তার দিকে জ্বলজ্বলে চোখ মেলে চেয়ে আছে।

ইন্দ্রের প্রথম ইম্প্রেশানটা ভাল হল না। হয়ত আগে থেকে বিরূপ একটা ধারণা থাকার জন্য লোকটা দেখতে শুনতে পাঁচটি যুবকের মত হলেও কেমন যেন চতুর চতুর বলে মনে হল।

ললিতা বলল, আমার স্বামীর ছবি।

ইন্দ্র বলল, ফটো দেখে মনে হয় আপনার স্বামীর ভেতর দারুণ একটা শার্পনেস আছে। ঠাণ্ডা মাথায় খুব কঠিন কঠিন কাজ করে ফেলতে পারেন বলে মনে হয়।

ললিতা বলল, হ্যাঁ, বেশ ধীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন উনি। বেশি কথাবার্তা বলতে ভালবাসতেন না। কাজের মানুষ কাজ নিয়েই থাকতেন। বলতে পারেন স্বভাবে আমার ঠিক উল্টোটি ছিলেন। অবশ্য কতটুকুই বা আমার জানাশোনা ওঁর সঙ্গে।

ইন্দ্র বলল, আপনার ট্র্যাজিক কনজুগাল লাইফের জন্য সত্যই দুঃখিত।

ললিতার বুক থেকে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। বলল, জীবনটা শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে গেল।

জীবন কখনো শেষ হয়ে যায় না মিসেস নায়ার। মৃত্যু যদি আসে তাহলে তো সব চুকেবুকেই গেল। কিন্তু যতক্ষণ তা না আসে ততক্ষণ লাইফ একটা দুর্দান্ত পাহাড়ী নদীর মত এগিয়ে চলবেই। সে ভেঙেচুরে যেমন তছনছ করবে তেমনি তার বুকের ভেতর জমে থাকা সবটুকু এনার্জি বিলিয়ে দেবে সবাইকে।

ললিতা অন্যমনস্ক হয়ে পালঙ্কের বাজুতে হাত রেখে বাইরের দিকে চেয়ে রইল! এক সময় স্বগতোক্তির মত উচ্চারণ করল, আমি হেরে গেছি মিঃ রায়। জীবনটা চলতে চলতে হঠাৎ বড় বেশি পিছিয়ে পড়েছে। ওকে টেনে নিয়ে যাবার কোন উৎসাহই আর পাই না।

ইন্দ্র বলল, এ ধরনের মেন্টাল ডিপ্রেশান অন্তত আপনার মত মেয়ের কাছ থেকে আশা করি না। আপনি যদি এডুকেটেড না হতেন, কোন দূর গ্রাম্য এলাকার অন্ধকার অঞ্চলের একটি মেয়ে হতেন তাহলে এসব কথা তোলার কোন মানেই হত না। সে ক্ষেত্রে চেষ্টা করলেও আপনার ডিপরুটেড সংস্কারগুলোকে কেউ ভাঙতে পারত না। কিন্তু আপনার রুচি আপনার প্রাণশক্তি সব কিছুই যে আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। সেখানে থেমে থাকলে চলবে কেন।

ললিতা হঠাৎ ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে ইন্দ্রর মনে হল এইটুকু সময়ের ভেতর তার এতখানি কথা বলে ফেলা হয়তো ঠিক হয়নি।

অনেক সময় নিঃসঙ্গ থেকে যখন ইন্দ্র নিজেকে অপরাধী ভাবতে শুরু করেছে ঠিক তখনই হাতে কফির কাপ নিয়ে ঢুকল ললিতা।

ইন্দ্রের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, ভয় নেই. খাবার দিচ্ছি না, কফি সব সময়েই চলতে পারে।

ইন্দ্র বলল, আপনার?

আনছি, বলেই বাইরে বেরিয়ে গিয়ে নিজের কাপটা নিয়ে এল ললিতা।

ললিতাকে এখন বেশ সহজ স্বাভাবিক বলে মনে হল। ইন্দ্র কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে

তাকাচ্ছিল ললিতার দিকে।

ললিতা বলল, কফির নিন্দা কিংবা প্রশংসা করলেন না তো?

বা রে সবটুকু খেতে দেবেন তো।

ললিতা কাপের কানায় ঠোট ছুঁইয়ে বলল, প্রথম চুমুকেই বোঝা যায়। সবটুকু শেষ করে যে প্রশংসা তা হোস্টেসের মনরক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইন্দ্র বলল, আপনি কিন্তু দারুণ রকম ইনটেলিজেন্ট। আমার অনুমানের মাত্রাকেই ছাড়িয়ে গেছেন।

ললিতা বলল, আর বেশি প্রশংসা করবেন না। মাথা বিগড়ে যাবে।

ইন্দ্র এক সময় কফি খেতে খেতে বলল, সত্যি আপনার কফির হাত খুব সুন্দর।

ললিতা অমনি বলল, শুধু আমার কফির হাত সুন্দর? আর কিছু ভাল নয় বুঝি?

ইন্দ্র কাপ থেকে মুখ তুলে বলল, তাহলে তো হাত দেখতে হয়। ভালমন্দ সবই ঐ হাতে লেখা আছে।

ললিতা কফিটুকু চুমুক দিয়ে কাপটা টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে দিল ইন্দ্রের দিকে। বলল, সত্যি আপনি হাত দেখতে জানেন? দেখুন না আমার হাতটা।

ইন্দ্র তার পাশে সাদা বিছানার ওপর পেতে দেওয়া স্থলপদ্মের মত রক্তাভ হাত-খানার দিকে চেয়ে দেখল। কফির কাপটা নীচে নামিয়ে রাখতে গেলে ক্ষিপ্র হাতে সেটা ধরে নিল ললিতা। কাপটা টিপয়ের ওপর রেখে আবার ফিরে এল সে।

এবার বিছানার এক কোনায় উঠে বসে হাত পাতল ইন্দ্রের সামনে।

ইন্দ্র ললিতার হাতের রেখাগুলোতে মাঝে মাঝে নিজের আঙুল বুলিয়ে মনে মনে কি যেন ভেবে নিচ্ছিল। এক সময় ললিতার হাতটা নিজের বাঁ হাতের পাতায় তুলে নিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

ললিতা তন্ময় হয়ে চেয়েছিল তার নিজের হাতের দিকে। অজস্র ভাঙাচোরা আঁকাবাঁকা রেখা প্রাচীন কোন নগরীর অপরিচিত পথচিত্রের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। তার চোখ সেই গোলকধাঁধার আবর্তে অবাধ কৌতূহল নিয়ে ঘুরে ফিরছিল।

ইন্দ্র কথা বলল, আপনার হাত বিস্ময়কর।

মুহূর্তে ললিতার দুটো বাদামী চোখের তারা অনুসন্ধানী মৌমাছির মত উড়ে গিয়ে বসল ইন্দ্রের মুখের ওপর।

ইন্দ্র আবার বলল, সত্যি আপনার হাতের রেখায় রেখায় ভাগ্য দেবতার আশ্চর্য খেলার ছকটি পাতা হয়ে আছে।

ললিতা বলল, সে খেলার ছকে খেলতে খেলতে বার বার আমাকে হার মানতে হয়েছে।

হার আপনার হয় নি। কপট পাশায় ছল করে আপনাকে হারান হয়েছে।

ললিতার গলায় কৌতূহলের সুর বাজল, কি রকম?

ইন্দ্র অনেকক্ষণ হাতের রেখার দিকে চেয়ে বলল, সত্যি ললিতা আপনি প্রতারিত হয়েছেন। আচ্ছা আপনার কি ভালবেসে বিয়ে হয়েছিল? অবশ্য যদি আপনি কিছু মনে না করেন তাহলে অসংকোচে উত্তর দেবেন।

হ্যাঁ।

আপনার ভালবাসা কি শুধু মিঃ নায়ারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল না তার আগেও আপনি কাউকে ভালবাসতেন?

একটু থেমে আবার বলে উঠল ইন্দ্র, অবশ্য উত্তর দেওয়া না দেওয়া আপনার মর্জি।

ডাক্তারের কাছে গেলে যেমন রোগ গোপন করতে নেই ঠিক তেমনি পামিস্টের কাছে গেলে তার প্রশ্নকে এড়িয়ে যেতে নেই।

ললিতা একটু চাপা গলাতেই বলল, আপনি তো আগেই আমার হাতের লেখা পড়ে নিয়েছেন, এখন সিক্রেট বলে কিছু নেই। হ্যাঁ আমি কলেজে পড়ার সময় একটি ছেলেকে ভালবাসতাম। তাকে

আমি বিয়ে করব বলে কথাও দিয়েছিলাম।

ইন্দ্র বলল, তারপর কথা যে রাখতে পারেননি তা তো আপনার হাতের রেখাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ললিতা মাথাটা নীচু করে কি যেন ভাবল। হয়ত সে তার অতীতের অপরাধটাকেই স্মরণ করছিল। এক সময় বলল, ঐ অন্যায়ের জন্যেই হয়ত আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি!

ইন্দ্র বলল, আমি জানতে চাই না আপনি কেন কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেন নি। তবে আপনার স্বামীর সঙ্গে বিয়ের কতদিন আগে থেকে আপনার পরিচয় ছিল সে কথাটা জানা আমার দরকার।

সামান্য কয়েকটা দিন মাত্র।

ইন্দ্র বলল, ব্যস তাতেই ভালবাসা আর বিয়ে!

ললিতা বলল, আমি ছোটখাটো একটা অপারেশনের জন্যে মেডিক্যাল কলেজের সার্জিকাল ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলাম। মিঃ নায়ার অপারেশনের আগে দু' একবার আমাকে দেখে গিয়েছিলেন। ইয়ং ডাক্তার, নার্সদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন বেশ ডিগনিফায়েড ওয়েতে। আমার প্রথম দেখাতেই বেশ ভাল লেগে গিয়েছিল।

অপারেশনের দিন আমার কাছে এসে একটু হেসে বললেন, অ্যানাসথেসিয়া দিলে আপনি গভীর ঘুমে ডুবে যাবেন জানতেও পারবেন না কখন আপনার অপারেশন হয়ে গেল।

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, লোকাল অ্যানাসথেসিয়া দিয়ে অপারেশন করা যায় না?

ডাক্তার নায়ার বললেন, যায় কিন্তু আপনি কষ্ট পাবেন।

আমি তখন খানিকটা জেদের সঙ্গেই বললাম, তা হোক আপনি লোকাল অ্যানাসথেসিয়া দিয়ে যদি সম্ভব হয় তাহলে অপারেশনটা করুন!

আমার কথা উনি রেখেছিলেন আর আমিও ওঁর দিকে চেয়ে চেয়ে আমার কষ্ট ভুলেছিলাম।

অপারেশনের শেষে উনি এক মুখ হাসি উপহার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

বিকেলে যখন উনি রাউন্ডে এলেন তখন আমি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলাম। উনি আমার মাথায় হাত রাখলেন। কপালে সে হাতটা সরে এল। আমার শরীরে তখন দারুণ এক ধরনের রোমাঞ্চ। আমি ভুলে গেলাম যন্ত্রণা।

বাড়িতে ফিরে আসার পরেও উনি আসতে লাগলেন আমাদের এখানে! আমাকে বলতেন, ব্রেভ ইয়াং লেডি। বুঝতেই পারছেন এর পর আমাদের কাছাকাছি এগিয়ে আসতে আর বেশি সময় লাগে নি। বাবাও এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু তুল্পি জন্ম নেবার আগেই উনি এফ আর সি এস করতে চলে গেলেন লন্ডনে আর ফিরতে পারলেন না।

শেষ কথাটি বলার পরে ললিতাকে বিষণ্ণ আর অন্যমনস্ক দেখাল।

ইন্দ্র ললিতার হাতটা ধরে নাড়াচাড়া করল। এক সময় সোজা ললিতার মুখের ওপর চোখ ফেলে বলল, আমি এখন আপনার হাতের রেখা বিচার করে যা বলব তা কি আপনি বিশ্বাস করবেন?

ললিতা বলল, বিশ্বাসই যদি না করব তাহলে হাতটা বাড়িয়ে দেব কেন?

ইন্দ্র বলল, সত্যটা বড় কঠিন, আঘাত পেতে পারেন।

ললিতার মুখে শেষ বেলাকার আলোর মত একটা বিষণ্ণ হাসি খেলা করে গেল। আস্তে বলল, কত আঘাত আর পাব। আঘাত সইবার ক্ষমতা আমি ধীরে ধীরে অর্জন করেছি মিঃ রায়।

ইন্দ্র সোজাসুজি বলল, আপনার হাতে বৈধব্যযোগ দেখতে পাচ্ছি না মিসেস নায়ার।

হঠাৎ ঘরখানাতে কোন নর্তকী যেন তার নূপুর দ্রুত লয়ে বাজিয়ে গেল। ভেঙে ভেঙে সুরেলা একটা হাসি সারা ঘরে ছড়িয়ে দিল ললিতা।

কথাটা শুনতে খু-উ-ব ভাল, কিন্তু মিঃ রায় কথাটা শোনার পর আমার কি মনে হচ্ছে জানেন?

ইন্দ্র জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইল ললিতার মুখের দিকে।

ললিতা বলল, কর্পূরের গন্ধ পাচ্ছিলাম এতক্ষণ, খুব মিষ্টি লাগছিল কিন্তু স্থায়ী হল না উবে গেল।

ইন্দ্র আস্তে ললিতার হাতখানা নামিয়ে রাখল বিছানার ওপর। ম্লান একটুখানি হাসল ললিতার দিকে

চেয়ে।

ললিতা একটু হেসে বলল, অমনি জ্যোতিষীমশায়ের রাগ হয়ে গেল।

হাতখানা ইন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে বলল, দেখুন তো এ দুনিয়া থেকে সরে যাবার যোগটা কখন আসবে?

ইন্দ্র ললিতার হাতটা ধরল না। শুধু বলল, আমি হেরে গেছি। যে মুখোশটা এতক্ষণ পরেছিলাম সেটা মিথ্যে। আমি পামিস্ট নই।

ললিতা ইন্দ্রের হাতের ওপর হাতটা রেখে দিয়ে বলল, দেখুন না বাবা একটুতেই এত রাগ।

ইন্দ্র ললিতার হাতটা নিজের দুটো হাতের ভিতর চেপে ধরে বলল, বিশ্বাস করুন আমি জ্যোতিষী নই। এতক্ষণ মিথ্যে জ্যোতিষীর অভিনয় করছিলাম। তবে আপনার স্বামী যে মারা যাননি এটা ধ্রুব নক্ষত্রের মত সত্য।

ইন্দ্রের হাতের মুঠোয় ধরা ললিতার হাতখানা থর থর করে কেঁপে উঠল।

ইন্দ্র দেখল ললিতার মুখের রং মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল।

এক সময় ললিতা যেন তার শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে বলল, আপনি জানলেন কি করে মিঃ রায়?

কথা দিন আমার কাছে থেকে যে শুনেছেন তা কাউকে বলবেন না।

ললিতা শব্দ করল না কিন্তু মাথা নেড়ে জানাল সে কাউকে কথাটা বলবে না।

ইন্দ্র বলল, যে বিশ্বাস নিয়ে আপনি ডাক্তার নায়ারকে ভালবেসেছিলেন তার মর্যাদা রাখার মত মানুষ ছিলেন না তিনি। আপনাকে তাঁর শুধু কাছে পাবার দরকার ছিল মনের ভেতর ধরে রাখার মত প্রেরণা ছিল না।

ইন্দ্র দেখল ললিতার চোখ বিছানার ওপর স্থির হয়ে গেল।

ইন্দ্র একটু থেমে বলল, আপনার কষ্ট হয় কোন কিছুতে এটা আমি চাই না। যতটুকু শুনেছেন তার বেশি শোনার দরকার নেই আপনার।

মুহূর্তে ললিতা চোখ তুলে চাইল ইন্দ্রের দিকে। বলল, না না আমার কিছু হবে না। দয়া করে আমাকে অন্ধকারে রাখবেন না। সবটুকু ঘটনা খুলে বলুন!

ইন্দ্র দেখল ললিতার দুটো চোখে অস্বাভাবিক এক ধরনের দৃষ্টি।

ইন্দ্র বলল, বিচলিত হবেন না মিসেস নায়ার, সারাজীবন একটা মিথ্যের বোঝা বইবার চেয়ে সত্য যত কঠিন হোক তার মুখোমুখি দাঁড়ান ভাল।

ললিতা বলল, আমি সব শুনতে চাই। সইবার শক্তি ঈশ্বরই আমাকে দেবেন।

ইন্দ্র বলল, ডাক্তার নায়ার এখন জার্মানিতে প্র্যাকটিস করছেন। ওখানকার সিটিজেন উনি। ওখানেই নতুন সংসার পেতেছেন। মৃত্যুর খবর একটা ভাঁওতা।

ললিতা বলল, আপনি কোথা থেকে খবর পেয়েছেন তা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব না তবে আপনার কথা যে সত্যি একথা বুঝতে আমার এতটুকু অসুবিধে হয়নি।

আপনার বাবা এ খবর জানেন, তিনিই আমাকে জানিয়েছেন।

আমি কিছু দিন থেকে সে রকম একটা সন্দেহ করেছিলাম, বলল, ললিতা। তুল্লি তার দাদুর কাছে যখন তার বাবার কথা জানতে চাইত তখন একটু রূঢ়ভাবেই আমার বাবা সে প্রসঙ্গ চেপে যেতেন। কিছু বিরূপ মন্তব্যও করতে শুনেছি তাঁকে। উনি অন্ধ তাই বুঝতে পারতেন না যে আমি তাঁর আশপাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ্য করছি।

ইন্দ্র বলল, জার্মানি থেকে ওঁর এক বন্ধু ওঁকে সবকিছু জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন।

ললিতা বলল, বাবা অন্ধ হয়ে যাবার আগে সে চিঠি এসেছিল। আমি ছেঁড়া চিঠির সামান্য একটুখানি টুকরো কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন সেইটুকু থেকে কোন সত্যে পৌঁছতে পারিনি। কেবল ঐ মানুষটার নামের একটা উল্লেখ দেখেছিলাম।

ইন্দ্র বলল, আমি জানি না আপনাকে আজ একথা বলে আমি ভুল করলাম কিনা। আপনি আপনার স্বামীর স্মৃতি দিয়ে যে পবিত্র একটা শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন তা ভেঙে দিতে গিয়ে আমি

হয়ত আপনার জীবনে অনেকখানি অশান্তি ডেকে আনলাম।

ললিতা বলল, আজ সত্যিকার যদি কোন বন্ধু আমার থেকে থাকে তাহলে সে আপনি। সারাজীবন যে ভুলটা বয়ে বেড়াতাম তাকে আপনি সত্যিকার বন্ধুর মত শুধরে দিলেন।

ইন্দ্র বলল, ললিতা আপনার ভাগ্যের কথা ভেবে সত্যিই আমি দুঃখিত।

কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না ললিতা। নীচের ঠোঁটে বুড়ো আঙ্গুলটা ঠেকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

হঠাৎ এক সময় ইন্দ্রের চোখে চোখ রেখে বলল, কিছুদিন আগে আমি এর্নকুলম গিয়েছিলাম সেখানে একটা ছবি দেখেছিলাম। ছবিটা এসেছিল 'কবিতা' সিনেমায়। ছবির নাম 'সান-ফ্লাওয়ার'। ছবি দেখে আসার পর রাতের বিছানা আমার চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল। আজ ভাবছি সে ছবির সঙ্গে আমার জীবনের যেন কোথায় একটা মিল আছে। অবশ্য সে ছবির নায়কের ভেতর কোন প্রতারণা ছিল না।

ইন্দ্র বলল, বেশ কিছুদিন আগে আমিও সে ছবি দেখেছি। পরিস্থিতিই নায়ককে বাধ্য করেছিল বিদেশে নতুন সংসার রচনা করতে।

ললিতা বলল, জানেন আমি পাগলের মত তুল্লির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম। ডাক্তার নায়ারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য খুঁজতাম ওর ভেতর। একটুখানি মিল খুঁজে পেলেই আনন্দে অধীর হতাম। এখন ওর ভেতর ঐসব মিল দেখলে হয়ত আমার ভয় করবে। আমি ওকে আর তেমন করে আদর... বলতে বলতে বন্ধ হয়ে এল ললিতার গলা। সে নিজের উচ্ছ্বসিত আবেগকে বুকে চেপে আবার বাইরে বেরিয়ে গেল।

ইন্দ্র বসে বসে ভাবতে লাগল, একটা নিরপরাধ শিশুকে কি করে অস্বীকার করতে পারল লোকটা। আর নারী হিসেবে ললিতা যে কোন পুরুষেরই চোখে পড়ার মত। এমন একটি কাম্য তরুণীকে বেমালুম ভুলে যাবার ভেতর আর যা থাক ডাক্তার নায়ারের রুচির পরিচয় ছিল না।

অনেকখানি সময় ঘরের ভেতর একা একা কাটিয়ে যখন বাইরে যাবার জন্যে ইন্দ্র উঠবে কিনা ভাবছে ঠিক সেই সময় ললিতাকে ঘরের দরজার সামনে দেখা গেল।

ললিতার মুখে শোকের কোন চিহ্ন ছিল না। সে হাতের ইশারায় ইন্দ্রকে ডাকল। ইন্দ্র ললিতার দিকে এগিয়ে যেতেই ললিতা পেছন ফিরে চলতে শুরু করল। ইন্দ্র তাকে অনুসরণ করে চলল।

প্রশস্ত কেটেডমের ভগ্নপ্রায় করিডোর পেরিয়ে ওরা এসে দাঁড়াল ঘরের পেছনে। নারকেল বাগানের সামনে।

ললিতার প্রসারিত আঙুলটিকে অনুসরণ করে ইন্দ্রের চোখ এক জায়গায় এসে স্থির হয়ে গেল।

আকর্ষণীয় ছবি। নারকেল গাছের তলায় প্রথম অপরাহ্ণের আলোছায়ার বিছানায় শুয়ে অলস মন্থর ভঙ্গিতে জাবর কাটছে ললিতাদের গাইগরুটি। আর ঠিক তার কোলের কাছটিতে নিশ্চিন্ত আরামে মাথা রেখে মুখ গুঁজে অকাতরে ঘুমুচ্ছে দুটি অবোধ শিশু। একটি পশু শিশু অন্যটি মানবশিশু। তুল্লির কাছে গিয়ে দাঁড়াল দুজন। কতক্ষণ ওরা চেয়ে রইল ওর দিকে।

ইন্দ্র বলল, শিশুর কোন জাত নেই ললিতা, শিশু তাই সবার প্রিয়। আর তুল্লির তো কোন তুলনা নেই। ও এক অসাধারণ শিশু।

ললিতা বলল, জানেন কিছুদিন আগে এক আত্মীয়ের বাড়ি নিমন্ত্রণে যাচ্ছিলাম। তুল্লি তার আদরের পুতুলটাকে সঙ্গে নেবেই। কোন বারণেই কান দিল না। বুকে চেপে ট্রেনে উঠল। আমি পথে যেতে যেতে সুন্দর সুন্দর দৃশ্যগুলো ওকে দেখাতে লাগলাম। ঐ দেখ তুল্লি কায়েলের জল কেটে কেটে ভাল্লম চলেছে সাদা পাল তুলে দিয়ে! ঐ যে পাহাড়টা কেমন ধাপে ধাপে নেমে এসেছে।

এমনি অনেক কথা বলতে বলতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ কানে কয়েকটা শব্দ এসে বাজতেই জেগে উঠলাম। আড়চোখে দেখলাম তুল্লি তার পুতুলটাকে ট্রেনের জানালার ধারে চেপে ধরেছে আর সমানে বকবক করে চলেছে। ঐ যে দেখ দেখ কত বড় পাখি ডানা মেলে উড়ছে। ঐ যে জাহাজ চলেছে জলের ওপর দিয়ে। বড় হলে তোমাকে ঐ

জাহাজে করে বেড়াতে নিয়ে যাব।

যেই লঞ্চের একটা বাঁশি তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে বেজে উঠল অমনি দারুণ ভয় পেয়ে তুল্লি পুতুলটাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরল।

জানতাম হঠাৎ কোন আওয়াজে তুল্লি ভীষণরকম চমকে ওঠে। আর আমি ওকে তখন অভয় দিয়ে বলতাম, ভয় কি তুল্লি তুমি আমার কত সাহসী মেয়ে!

পুতুলটাকে বুক থেকে কোলে নামিয়ে নিয়ে সেদিন তুল্লিকে বলতে শুনলাম, বোকা মেয়ে ভয় পেতে নেই। তুমি না কত সাহসী মেয়ে।

ইন্দ্র বলল, সত্যি আপনার তুল্লির জুড়ি নেই। ওর তুলনা ও নিজেই।

ইতিমধ্যে গরুটা গা ঝাড়া দিতেই তুল্লির মাথাটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

ভাগ্যিস আঘাত লাগেনি তাই অবাক চোখে শুধু চেয়ে রইল তুল্লি, কোনরকম চেঁচামেচি করল না।

ইন্দ্র এগিয়ে গিয়ে তার চওড়া বুকের ভেতর তুলে নিল তুল্লিকে। অনেক আদরে ভরে দিতে দিতে তাকে নিয়ে চলল বাইরের প্রাঙ্গণে। ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় কতক্ষণ তুল্লির কচি নরম আঙুলগুলো ধরে ঘুরে বেড়াল। তার অজস্র বকবকানি শুনল। তাকে শোনাল অনেক টুকরো টুকরো মজাদার গল্প। অদ্ভুত অদ্ভুত এমন সব প্রশ্নের জবাব দিতে হল যা কোন অর্থ পুস্তক প্রণেতার প্রশ্নোত্তরে পাওয়া যায় না।

সম্মানীয় অতিথির অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি রাখল না ললিতা। সন্ধে থেকেই নানারকম ভোজ্য আর পানীয়ের আমদানি হল। এক সময় ইন্দ্রকে বলতে হল, রাতের খাবারের তাহলে ইতি হোক এখানেই।

সে কি! ললিতার গলায় বিস্ময়, আমাকে তাহলে যে অতিথি আপ্যায়নের ত্রুটির দায়ে পড়তে হবে?

ইন্দ্র বলল, বিচারকদের এজলাসে অতিথি যদি কেস না তোলে তাহলে ভয় কি?

আপনি তো অভয় দিলেন কিন্তু আমি নিজের কাছে কি কৈফিয়ৎ দি।

তাই বলুন, না খাওয়াতে পারলে আপনারই শান্তি নেই।

ললিতা হেসে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, আর খেয়ে যত আপনার অশান্তি তাই না?

রাতে বড় একটা খিদে না থাকলেও খেতে বসতে হল ইন্দ্রকে। রাত দশটায় তেমনি অভুক্ত অতিথিদের ডাক দিল ললিতা। কেউ যখন এল না তখন ইন্দ্রকে আসন পেতে খেতে দিল।

ইন্দ্র বলল, তুল্লিকে কি ঘুম পাড়িয়ে এলেন?

একটু দূরে বসে ইন্দ্রের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল ললিতা।

তাহলে নিয়ে আসুন আপনার খাবার, একই সঙ্গে গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে।

ইন্দ্রের পীড়াপীড়িতে একটু দূরেই আর একটা আসন পেতে নিজের খাবার নিয়ে এসে বসল ললিতা।

ইন্দ্র অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছে ললিতা যেন বেশ হাল্কা হয়ে গেছে। তার আচার-আচরণে আগের মত সংকোচ বা দ্বিধা নেই। মনের ওপর থেকে দীর্ঘদিনের একটা গুরুভার নেমে গিয়ে সে যেন মুক্তি আর স্বস্তি দুটোই পেয়েছে। স্বামীর ধ্যানে মিথ্যা যে আনন্দটাকে পাচ্ছিল সে, স্বপ্ন ভেঙে যাওয়াতে যতটুকু আঘাত পেয়েছে তার অনেক বেশি মুক্তির সুখ পাচ্ছে সে এখন।

ললিতা যেন ফিরে পেয়েছে তার কুমারী জীবন। পিতার গৃহে সে এখন থেকে নেবে চঞ্চল একটি মেয়ের ভূমিকা। তুল্লি যেন তার খেলার পুতুল। তাকে নাওয়ানো খাওয়ানো গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো এই হবে তার সারাদিনের কাজ।

ইন্দ্র বলল, রান্না করলেন এতগুলি পদ কিন্তু নিজের পাতে নিলেন না তো কিছুই। সবই তো দেখছি উজাড় করে দিলেন অতিথির পাতে।

ললিতা বলল, জানেন নিজেকে উইডো বলে ভেবেছিলাম যখন তখন সেরকম করে পোশাক পরেছি খাবারও খেয়েছি। এখন আর আমার সে সব সংস্কার নেই তবু অনেকদিনের অনভ্যাসে আমিষ খাবার প্রবৃত্তিটা হারিয়েছি। আর সাদা পোশাক পরতে আমি সব সময়েই পছন্দ করি। তাই সাদার ওপর

গোল্ডেন একটা পাড় বসিয়ে নিলেই চলবে। ওতেই আমার বৈধব্যের বেশটা পাল্টে যাবে।

ইন্দ্র বলতে চাইল তাহলে নতুন করে এবার আর একটি সংসার গড়ে তুলুন।

কথাটা কিন্তু ইন্দ্রের মুখ দিয়ে বেরুল না। সে শুধু বলল, পাঁচ বছরের অভ্যেস কি একদিনে ঝেড়ে মুছে ফেলা যায়!

কিছুক্ষণ ওরা কোন কথা না বলে খেতে লাগল। হঠাৎ একসময় ইন্দ্রের দিকে চেয়ে ললিতা বলল, আপনি আমার বন্ধুর ঘনিষ্ঠজন তাই আপনাকে কতকগুলো হাল্কা প্রশ্ন করলে নিশ্চয় কোন কিছু মনে করবেন না।

ইন্দ্র খাওয়া থামিয়ে বলল, মেনন পরিবারের সঙ্গে আমার এমপ্লয়ার এমপ্লয়ীর সম্পর্ক। সরিতার কাছ থেকে যদি কোন ভালবাসা পেয়ে থাকি তাহলে সেটা আমার পাওনার অতিরিক্ত বলে আমি মনে করি।

ললিতা বলল, সরিতার কথা থেকে মনে হল সে আপনার দারুণ গুণগ্রাহী। ভক্তও বলতে পারেন।

ইন্দ্র বলল, অতটা বাড়িয়ে বলবেন না। ওতে আমার বিপদ ঘটতে পারে। চাকরি রক্ষা দায় হয়ে উঠবে। তবে মিথ্যে বলে লাভ নেই, আপনার বান্ধবী আমাকে সুনজরে দেখেন।

ললিতা হেসে বলল, আপনি নজর কেড়ে নিয়েছেন বলুন।

ইন্দ্র ললিতার হাসিতে যোগ দিয়ে বলল, নজর কেড়ে নেবার মত কোন যোগ্যতাই আমার নেই। আপনার বান্ধবী বিশেষ ব্যক্তির ওপর একটু কৃপার দৃষ্টি ফেলে থাকেন।

ললিতা বলল, আপনি কিন্তু বন্ধু হিসেবে বেশ নির্ভরযোগ্য।

ইন্দ্র বলল, ঐ ধরনের কমপ্লিমেন্ট দেবার কারণটা জানতে পারি কি?

মনের কথাকে কেমন চেপে রাখতে পারেন, বলল ললিতা।

ইন্দ্র হঠাৎ বলে বসল, মনের সব কথাকেই কি আর খোলাখুলি বলা যায়, আপনিই বলুন? কোন মানুষের ভেতরের মনটাকে যদি দেখা যেত তাহলে তার চেয়ে বড় বিস্ময় পৃথিবীতে আর কিছু থাকত না।

ললিতা কি ভেবে বলল, সত্যি।

ইন্দ্র বলল, আজ চাঁদ উঠবে কখন?

ললিতা ইন্দ্রের দিকে চেয়ে বলল, কাল রাতে ঘুমুতে যাবার আগে চাঁদ পেয়েছিলেন, আজ আপনার স্বপ্নের ভেতর চাঁদ উঠবে।

যদি জেগে থেকে চাঁদের প্রতীক্ষা করি তাহলে কি চাঁদ উঠবে না?

ললিতা হেসে বলল, কাল অবধি জেগে কাটিয়ে দিন, পূর্ণিমার চাঁদের উদয় আপনার ঘরেই হবে।

ইন্দ্র বলল, ওটি আমার অমাবস্যার চাঁদ।

ফোঁস করে উঠল ললিতা, কেন আমার বান্ধবী কি এতই কালো?

ইন্দ্র বলল, আপনার কিংবা প্রেমার কাছে না দাঁড়ালে শ্যামলী বলা যায়।

ললিতা বলল, মনে হচ্ছে কিছু উদ্দেশ্য আছে।

ইন্দ্র বলল, এ কথা কেন?

এই যে আমার রঙের তারিফ করে বসলেন।

আপনার প্রশংসা শুরু করলে তো আর শেষ করা যাবে না। পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল অবধি একটি একটি শ্লোক লিখে বর্ণনা করতে হবে।

ললিতা বলল, কপাল আমার, এমন একজন কবিকে কাছে পেয়েও চিরদিনের করে ধরে রাখতে পারলাম না।

কথাটা শেষ করেই ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠল।

ইন্দ্রের কিন্তু ললিতার শেষ কথাটায় কেমন এক ধরনের ঘোর লাগল। কি বলতে চায় ললিতা? কবিকে ধরে রাখতে পারল না বলে সত্যি কি তার আক্ষেপ না এটা উড়ো হাওয়ার মত একটা কথার কথা।

ললিতাও থেমে গিয়েছিল। সে হয়ত তলিয়ে দেখছিল হঠাৎ বলা কথাটার গুরুত্ব।

এরপর খাওয়ার পর্ব চুকল। একটা কম পাওয়ারের বাল্ব সন্ধে থেকে জ্বলছিল ভেতরের বারান্দায়। তার খানিকটা অনুজ্জ্বল ছটা ভেতরের উঠোনটাকে কোন রকমে অন্ধকারের গ্রাস থেকে বাঁচাচ্ছিল। ধারে কাছে ওঁৎ পেতে ছিল অন্ধকার। সুইচটা অফ হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে উঠোনের ওপর।

ললিতা রান্নাঘরের ভেতর কি কাজে যেন ঢুকতে গিয়ে বলল, আপনি উঠোনে বসুন গিয়ে, আমি এই আসছি।

ইন্দ্র উঠোনে নেমে দেখল পাশাপাশি দুটো বেতের চেয়ার পাতা। গত রাতে মিঃ পিল্লাই আর সে ঐ দুটো চেয়ারে বসেছিল। পিল্লাই বলছিলেন তাঁর মেয়ে জামাইয়ের কাহিনী। প্রায় অপরিচিত একটি যুবকের কাছে হৃদয় উজাড় করে কথাগুলো বলে যেতে কোন দ্বিধা আসেনি তাঁর। কি পরিমাণ ভার তিনি বুকের ভেতর অনুভব করেছিলেন, যে কারণে পারিবারিক জীবনের গোপন কথাগুলো আর একটি হৃদয়ের কাছে বলে বেশ খানিকটা লঘু হতে চেয়েছিলেন।

ইন্দ্র লক্ষ্য করে দেখেছে, এ দেশের নারীপুরুষের ভেতর মেলামেশার ব্যাপারে যেমন দ্বিধা নেই তেমনি মনের কথাকে উজাড় করে দিতে কার্পণ্যও নেই।

ইন্দ্র একটা চেয়ারে বসল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখল নক্ষত্ররা অন্ধকার পৃথিবীর দিকে তারই মত নির্ণিমেষে চেয়ে আছে। পৃথিবীর যখন সৃষ্টি হয়নি তখনও এরা অনাগত কোন কিছুর আবির্ভাবকে দেখবে বলে চেয়েছিল। রহস্যের কুহেলি ঢাকা তরুণী পৃথিবী ধীরে ধীরে যখন ঘোমটা খুলল তখন অপার বিস্ময় নিয়ে দেখল তাকে। তারপর একে একে ধরিত্রীর গর্ভ থেকে জন্ম নিল জল, স্থল, প্রকৃতির নানা বৈভব বৈচিত্র্য। সেই সমান ঔৎসুক্য নিয়ে নক্ষত্ররা চেয়ে দেখল সৃষ্টির এক একটি পরিণতি, বিবর্তন। এখনও তারা চেয়ে আছে পৃথিবীর নতুন নতুন রহস্যকে দেখবে বলে।

ইন্দ্রের হঠাৎ মনে হল, এক তরুণী যাদুকরী যেন একটি করে বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখিয়ে চলেছে, আর সারা নক্ষত্রলোক অবাক চোখে তাই চেয়ে চেয়ে দেখছে। আশ্চর্য এই তরুণীর খেলা যার কোন রহস্যই তারা ভেদ করতে পারছে না।

ললিতা পাশে এসে দাঁড়াতেই চমক ভাঙল ইন্দ্রের। ললিতা তার দিকে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছে। মুখে কোন কথা নেই। ঠিক যেন রহস্যময়ী তরুণী যাদুকরী।

ইন্দ্র অস্পষ্ট আলোয় দেখল, ললিতা মুঠি ভরে কিছু যেন এনেছে তার জন্যে। সে মুঠি সমেত ললিতার হাতখানা তার চওড়া ডান হাতের মুঠোয় চেপে ধরল।

ললিতা বলল, বাব্বাঃ, হীরে মণিমাণিক্য নেই ওতে, ছাড়ুন, ছাড়ুন দেখাচ্ছি।

ইন্দ্র হাত ছেড়ে দিয়ে চেয়ে রইল ললিতার দিকে। ললিতা কপট ক্ষোভে বলল, না দেখাব না।

ইন্দ্র বলল, হাত ছাড়িয়ে নেবার সময় কথা দিয়েছিলেন দেখাবেন।

ললিতা বলল, জানেন তো, গল্পের শেয়াল কুমীরের কামড় থেকে পাখানাকে বাঁচাবে বলে নিজের পাকে লাঠি বলেছিল। আমিও বাঘের থাবা থেকে হাতখানাকে ছাড়িয়ে নিলাম কৌশলে।

কিন্তু আপনি মিথ্যের দায়ে পড়লেন।

ললিতা মুখখানা দোলাতে দোলাতে বলল, না মশায়, প্রাণে বাঁচতে মিথ্যের আশ্রয় নেওয়াটা কোন অন্যায় নয়।

ইন্দ্র মুখ নিচু করে বসে রইল।

ললিতা ইন্দ্রের মুখের অনেক কাছে সরে এসে বলল, আহা বান্ধবীর বন্ধু আপনি, আপনার সঙ্গে এমন ছলনাটা করা ঠিক হয়নি। বান্ধবী শুনলেই বা কি বলবে। এখন হাঁ করুন তো দেখি।

ইন্দ্র ইজি-চেয়ারে ঘাড় কাত করে একটুখানি হাঁ করল। ললিতা ইন্দ্রের মুখের ভেতর একখিলি পান ভরে দিল। তারপর বাঁ হাতের ভেতর থেকে ওদের দেশের রীতি অনুযায়ী একখণ্ড কাঁচা সুপুরী বের করে ইন্দ্রের মুখের ভেতর দিতে যেতেই ইন্দ্র দাঁত দিয়ে ললিতার আঙুল চেপে ধরল। ললিতা উঃ বলে একটা আওয়াজ তুলতেই ইন্দ্র ওর আঙুল ছেড়ে দিল।

ললিতা ব্যথা পাওয়া আঙুলটা সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখে পুরে চুষতে লাগল।

ইন্দ্র বলল, ক্ষমা করবেন, আপনার কুমীরের গল্পটা মনে পড়ে গিয়েছিল।

ললিতা বলল, সরিতা আসুক, আপনার কুমীরের গল্পের ডেমনোস্ট্রেশন দেওয়া বের করব।

অন্যায় যদি করে থাকি তাহলে তার শাস্তি আপনার হাতেই হোক, বান্ধবীকে আবার এর ভেতর টানা কেন।

আমি কি বলেছি, আপনি অন্যায় করেছেন? শুধু কুমীরের মত আপনি কামড়ে ধরেছিলেন আর আমি কৌশলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছি এ কথাটুকুই বলব।

ইন্দ্র বলল, কি ভীষণ নিষ্ঠুর আপনারা। মানুষকে ভয় দেখিয়েও আনন্দ পান।

ললিতা পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। ইন্দ্রের মনে হল, আবার কি নতুন খেলা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে যাদুকরী।

ললিতা বেতের চেয়ারের চওড়া হাতলে কনুই ঠুকে অঞ্জলি করা হাতের পাতায় নাক মুখ গুঁজে বসে রইল।

কিছু পরে মুখটি কাৎ করে ইন্দ্রের দিকে চেয়ে বলল, চাঁদ উঠতে এখনও প্রায় তিন কোয়ার্টার বাকী। ইচ্ছে করলে ঘুমুতে যেতে পারেন।

ইন্দ্র বলল, চাঁদকে দয়া করে জাগতে দিন আগে, তারপর ঘুমুতে যাওয়া যাবে। আপনি যান শুতে, তুমি একা শুয়ে রয়েছে। আমার জন্যে আপনি যদি বসে থাকেন তাহলে খুব খারাপ লাগবে।

ললিতা বলল, নিজের ইচ্ছায় যদি বসে থাকি, তাহলে খারাপ লাগবে না তো আপনার?

ইন্দ্র হেসে উঠল, সত্যিই আপনি সরিতার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। দুজনে একই স্কুলে বোধহয় কথা বলা শিখেছিলেন।

ললিতা বলল, ও কথা বলবেন না, আমার বান্ধবীর তুলনা সে নিজেই। কারো সঙ্গে কারো তুলনা দিতে গেলে ওর কৃতিত্বকে ছোট করা হয়।

হঠাৎ ললিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসুন, আসছি।

ললিতা চলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের আবছায়া থেকে বেরিয়ে এল কতকগুলো ভাবনার জোনাকী। ওরা চুমকীর পোশাক পরে ইন্দ্রের চারদিকে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ললিতা চার্মিং। ললিতা দারুণ সরস। একটা জীবনকে ভরে দেবার মত যথেষ্ট কোয়ালিটির সঞ্চয় আছে ওর ভেতর। রুপোলী মাছের মত ও জল কেটে কেটে খেলা করে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ একটা ঘূর্ণির পাকে পড়ে কিছু সময়ের জন্যে জলের অন্ধকার তলায় তলিয়ে গিয়েছিল। এখন আবার উঠে এসেছে অনেক ওপরে। কাচের মত স্বচ্ছ জলের ভেতর দেহের ঝিলিক তুলে তুলে খেলা করছে।

অনেকখানি সময় পার করে উঠোনে ইন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়াল ললিতা।

যাবেন এক জায়গায়?

কোথায়?

চাঁদ দেখতে।

ইন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চাঁদ উঠেছে বুঝি, চলুন দেখি।

ললিতা বারান্দার বাতিটা নেভাতে গিয়েও নেভাল না। সে করিডোরের ভেতর দিয়ে পেছনের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। হাত দিয়ে ঠেলে দিতেই দরজার পাল্লা বাইরের দিকে খুলে গেল। ইন্দ্র দেখল অন্ধকার তখনও জমে আছে। ললিতা যে আগে থেকে দরজাটা খুলে রেখে গিয়েছিল সেকথা তার মনে হল। ললিতা কি তাহলে একরকম ধরেই নিয়েছিল যে তাকে ডাকলেই সে চলে আসবে।

ললিতার সঙ্গে ও বাইরে এসে দাঁড়াল। ললিতা দরজাটা ভেজিয়ে বাইরের থেকে তালা দিয়ে দিলে। ইন্দ্রের দিকে ফিরে বলল, আপনি আমার হাত ধরুন। সামনের জংলা রাস্তাটা অন্ধকারে চিনে পেরোতে পারবেন না।

ইন্দ্র ললিতার হাত ধরে অন্ধের মত তাকে অনুসরণ করে চলল।

এক সময় ললিতার পথ চলার নির্দেশ থেমে যেতেই ইন্দ্র নিচের দিক থেকে চোখ তুলে সামনে তাকাল। বোঝা গেল একটা ক্যানেলের ধারে ওরা এসে পৌঁছেছে। এতক্ষণ গাছপালার জটিল

জটাজালের ভেতর অন্ধকার বড় বেশী প্রশ্রয় পেয়েছিল, এখন মনে হল, ধুলোমাখা একটা কাচের ভেতর দিয়ে যেমন সব কিছু আবছাভাবে দেখা যায় ঠিক তেমনি চারদিকটা দেখা যাচ্ছে। ক্যানেলের ওপারে নারকেল গাছের অজস্র সমাবেশ। তার ওপারে দিগ্‌বলয়ের একটি বিশেষ জায়গায় আকাশে হালকা একটা আলো ফুটে উঠেছে।

ললিতা বলল, আসুন এই গাছের তলাটায় বসা যাক। বালিমাটি জমে শক্ত হয়ে আছে।

ওরা পাশাপাশি বসে দিগন্তের দিকে চেয়ে রইল। লাল চাঁদটা দূরদিগন্তরেখা থেকে ওপরে উঠছে। গাছের ফাঁকে ললিতা দেখতে পেলেও ইন্দ্র শুধু বনের মাথায় দেখছে তার জেগে ওঠার দীপ্তিটুকু।

ঐ যে চাঁদ, দেখতে পাচ্ছেন?—নারকেল বাগানের দিকে আঙুল তুলে দেখাল ললিতা।

ইন্দ্র এদিক ওদিক মাথা নাড়তে লাগল।

ললিতা অসঙ্কোচে ইন্দ্রের মাথাটা টেনে আনল নিজের দিকে। বাঁ হাতে মাথাটা বেষ্টন করে ডান হাত তুলে দেখাল চাঁদের উদয়। হৃদপিণ্ডের মত রক্তাভ চাঁদ নারকেলের দীর্ঘ শাখার ফাঁকে আটকে আছে।

ইন্দ্রের মনে হল কৃষ্ণবর্ণের লৌহশলাকার মত নারকেল পাতায় কার যেন হৃদপিণ্ড বিদ্ধ হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণের ভেতরেই চাঁদের রঙ পাল্টে গেল। লাল থেকে হলুদ আবার হলুদ থেকে সাদায় রূপান্তরিত হল চাঁদ। নারকেল বাগানের মাথায় জেগে ওঠা চাঁদ ক্যানেলের বুক লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে লাগল। যত আঘাত তত জ্বলে ওঠা। কিছু সময়ের ভেতরেই পটটা একেবারে পাল্টে গেল। চারদিকে চাঁদের আলোয় পাতলা দুধের তরঙ্গ বইতে লাগল।

ইন্দ্র আর ললিতা আশঙ্কাজনক সান্নিধ্যে বসে চাঁদ দেখছে। ললিতার স্তন আবৃত করে কটি পর্যন্ত নেমে এসেছে সাদা নেরিয়দ। ইন্দ্র দেখছে নেরিয়দের সোনালী পাড় যুবতীর পূর্ণ যৌবনের মত জ্বলে আছে। রাতের খাবার আসনে ললিতার দেহে ছিল আগের বৈধব্য বেশ। এখানে আসার সময় ললিতা তার পাঁচ বছরের পরিত্যক্ত সুখীজীবনের পোশাকটি নতুন করে বুকে জড়িয়ে নিয়েছে।

ললিতা বলল, চাঁদ চাঁদ করে পাগল হয়ে উঠেছিলেন এখন দেখুন চাঁদ। বিয়ের আগে প্রায়ই এখানে পালিয়ে এসে একা আমি বসে বসে চাঁদ দেখতাম।

ইন্দ্র কোন কথা না বলে চেয়ে রইল পুবদিকে। নারকেলের তরঙ্গিত অরণ্য এখনও আদিম রহস্যে ভরা। অদূরে সমুদ্রের আছড়ে পড়া ঢেউগুলোর চাপা কান্না গুমরে গুমরে উঠছে। চাঁদ তার সব কটি রুপোলী অলঙ্কারে সাজিয়ে দিয়েছে সুন্দরী নারকেল বীথিকে। ইন্দ্র আর ললিতা বসে আছে পাশাপাশি।

এই ধরনের মুহূর্তগুলো যখন আসে তখন বর্তমান পেছন ফিরে দাঁড়ায়। তারপর যাদুর পাদুকা পরে চোখের পলক পড়তে না পড়তেই পৌঁছে যায় আদিম অতীতে। সেখানে বিশ্বের প্রথম মানব মানবী পাশাপাশি বসে বিহ্বল চোখে চাঁদের দিকে চেয়ে থাকে।

ললিতার মুখে ইন্দ্র সেই আদি মানবীর আদল দেখেই শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

বিছানার বালিসে মাথা রেখে শুতে গিয়ে ইন্দ্র একটা সুন্দর গন্ধ পেল। কোন একটা ফুলের গন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে দরজার ছিটকিনি বন্ধ করার শব্দ শুনল সে। দুটো শোবার ঘর পাশাপশি। মাঝে পুরনো দিনের গরাদ দেওয়া একটা বড় জানালা, বাইরের ঘরে বয়ে আসা হাওয়া যাতে ভেতরের ঘরেও খেলতে পারে তারই ব্যবস্থা। জানলার কোন পর্দা ছিল না। এ ঘরে গত রাতে শোয়নি ইন্দ্র। সম্ভবতঃ আজ মিঃ পিল্লাই নেই বলে তারই শোবার ঘরে আজকের রাতে তার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। একেবারে বাইরের ঘরে আজ তাকে শুতে পাঠিয়ে দিতে ললিতার বোধহয় বাধ বাধ ঠেকেছে।

ইন্দ্র আড় চোখে দেখল, পুবের জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের জ্যোৎস্নার যে ফেনাটুকু ঘরের অন্ধকারে গড়িয়ে পড়েছে তাতে ঘরের ভেতরের সবকিছু চেনা যাচ্ছে।

ললিতা শরীরটাকে শিল্পীর মত নানা ভঙ্গীতে ভেঙে ভেঙে শুয়ে পড়ল। পাতলা একখানা চাদর পায়ের ওপর থেকে টেনে নিল বুক অব্দি। ডান হাতখানা ঘুমন্ত তুল্লির ওপর একবার রাখল। কি মনে করে পাশ ফিরে তুল্লিকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে আদর করল। তুল্লির নড়ন চড়ন নেই। ঘুমে

একেবারে ন্যাতা হয়ে পড়ে আছে। আধ-বসার ভঙ্গিতে উঠে তুল্পির গায়ের চাদর ভাল করে টেনে দিয়ে ললিতা আবার শুয়ে পড়ল। কনুই ভাঙা হাতখানা পড়ে রইল কপালের ওপর।

বাইরের এক ঝলক হাওয়ায় গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে উঠল। ইন্দ্র বুঝল ভিক্টোরিয়া রোজের গন্ধ। কিন্তু ফুলটা কোথায়। মনে হল বালিশের ভেতর থেকে যেন গন্ধটা আসছে।

ইন্দ্র গন্ধের উৎসের খোঁজে উঠে বসল। খাটের পাশে হাত বাড়াতে গিয়ে হাতে ঠেকল একগুচ্ছ গোলাপ। টিপয়ের ওপর ফুলদানীতে সাজান। মুখটাকে গোলাপ গুচ্ছের কাছে নিয়ে গিয়ে শুঁকল। খাটের লেভেলের খানিক নীচে রাখা অথচ দক্ষিণ হাওয়ার দাক্ষিণ্যে গন্ধটা ভেসে আসে। ইন্দ্র পরিকল্পনাকারিণীর প্রশংসা করল মনে মনে।

শুতে গিয়ে হাতে ঠেকল আর একটি গোলাপ। বালিশে ঢাকার এক কোনায় ক্লিপ দিয়ে আটকানো। তরতাজা গোলাপটা হাতে নিয়ে ইন্দ্র আর ঘুমোতে পারলো না। সে শুয়ে শুয়ে গোলাপটার গন্ধ নিতে লাগল।

ইন্দ্রের মনে হল গোলাপটা যেন এক তরুণীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। পিঙ্ক রঙের শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে যৌবনের প্রতিটি রেখা স্পষ্ট। ঠিক যেন ফুটন্ত গোলাপের পাপড়ির সুষমা।

ইন্দ্র উঠে বসল। কি মনে করে জানালার ফাঁকে ছুঁড়ে দিল গোলাপটা। অমনি অব্যর্থ লক্ষ্যে ফুলটা এসে পড়ল ললিতার গায়ের ওপর।

ললিতা কি ঘুমোয় নি। কপালের ওপর ফেলে রাখা হাতটা সরে গেল তার। বাঁ হাতের কনুইতে ভর দিয়ে মাথা তুলে আধশোয়ার ভঙ্গিতে পাশ ফিরল ললিতা। ইন্দ্র দেখল বুকের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়া গোলাপটা তুলে নিয়ে উঠে বসল সে।

চুলগুলো খুলে গেছে ললিতার। চরাচরের অন্ধকার যেন ঘন হয়ে আশ্রয় নিয়েছে ওর কালো চুলের গভীরে।

ললিতা কোন দিকে তাকাল না। সে জানালার দিকে পাশ ফিরে আবার শুয়ে পড়ল। ইন্দ্র দেখল অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর মাঝে ফুলের বোঁটাটি ধরে অন্যমনে ললিতা দোলাচ্ছে।

কত রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত কেটে গেল। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত শরীরের রক্তস্রোত আছড়ে পড়ল বুকের বেলাভূমিতে, তবু কোন প্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল না।

কতক্ষণ এমনি কেটে যাবার পর স্থির নিশ্চল ললিতার দিকে চেয়ে ইন্দ্রের মনে হল ললিতা ঘুমিয়ে পড়েছে।

তখনও ইন্দ্রের খেলার সখ মেটে নি। সে একটি একটি করে গোলাপ ফুলদানী থেকে তুলে নিয়ে ললিতার বিছানায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলল।

ললিতা ঘুমিয়ে আছে মনে করে তার শরীরটাকে লক্ষ্য করে আর ফুল ছুঁড়ল না। ভোরে উঠে ললিতা দেখুক সে ফুলের বিছানায় শুয়ে আছে।

সব কটা ফুল ললিতাকে উপহার দিয়ে সে দারুণ খুশী হয়ে উঠল। যা ভাবে ভাবুক ললিতা। বালিশের ঢাকায় ক্লিপ দিয়ে যদি ললিতা ফুল উপহার দিতে পারে তাহলে সে কেনই বা অভিযুক্ত হবে গোলাপের খেলা খেলতে গিয়ে।

অনেক রকম এলোমেলো ভাবনা আর উত্তেজনার ভেতর কখন চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল ইন্দ্রের।

রাত কত ঠিকানা নেই। ইন্দ্রের ঘুম ভেঙে গেল সমুদ্র থেকে বয়ে আসা এক ঝলক দমকা হাওয়ায়। সে উড়ে যাওয়া চাদরখানা টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুতে গিয়ে দেখল ললিতা দাঁড়িয়ে আছে দুটো ঘরের মাঝের জানালার রেলিং ধরে। চেয়ে আছে তারই দিকে। শ্যাম্পু করা চুলগুলো প্রপাতের মত নেমে গেছে পিঠ পেরিয়ে নিতম্বের দিকে। কতকগুলো এলো চুল কাঁধের ওপর দিয়ে উছলে নেমে এসেছে বুকের দুটো নিটোল শিলাস্তূপের গা বেয়ে।

বাইরে চাঁদের আলোয় এখন যৌবন-জোয়ার। তার একফালি সাদা আঁচল জানালার ফাঁকে লুটিয়ে পড়েছে ললিতার ঘরের ভেতর। ললিতা এখন আর অস্পষ্ট নয়।

ইন্দ্রকে জাগতে দেখে ললিতা চোখের দৃষ্টি মেঝের ওপর নামিয়ে নিল।

ইন্দ্র উঠে দাঁড়াল। সে এগিয়ে গেল জানালার দিকে। একপাশে মুখখানা ফিবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ললিতা।

ইন্দ্র জানালার একেবারে কাছে মুখ এনে ডাকল, ললিতা!

তার গলার স্বর অস্পষ্ট হয়ে গেল।

ললিতা এখন তার রহস্যময় চোখের গভীর থেকে চেয়ে আছে ইন্দ্রের দিকে।

ইন্দ্র উত্তেজনায় কাঁপছিল। সে তার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ডাকল, ললিতা।

লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে ললিতা তার দুটো হাত বাড়িয়ে দিল ইন্দ্রের দিকে।

ইন্দ্র দেখল ললিতার অঞ্জলি করা দুটো হাতে তারই ছুঁড়ে দেওয়া গোলাপ।

ইন্দ্র ফুল সমেত ললিতার দুটো হাত নিজের হাতের পাতায় চেপে ধরল। অজস্র চুমুতে ভরে দিল ললিতার হাত।

ললিতা হাত সরিয়ে নিল না। কোন কথাও বলল না। শুধু পলকহীন দুটো চোখ মেলে চেয়ে রইল।

ইন্দ্র ললিতার হাত নিজের বুকের কাছে টেনে এনে তাকাল তার দিকে।

সাদা নেরিয়দখানা বুকের ওপর কৌশলে বাঁধা। নাইটির মত সে কাপড় দেহ আবৃত করে নেমে এসেছে পা অব্দি। ললিতা দাঁড়িয়ে আছে না কোন শ্রেষ্ঠ ভাস্করের তৈরি শ্বেত পাথরের একটি নারী মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তা বোঝা গেল না।

ইন্দ্র ললিতার হাত শিথিল করে দিতেই ওর হাত থেকে সব কটা ফুল ইন্দ্রের ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

ইন্দ্র ফুল কুড়োনোর খেলা খেলল না। একটা পাহাড়ের মাথায় জমে থাকা সাদা বরফের স্তূপকে নিয়ে সূর্য যেমন গলিয়ে ঝরিয়ে দেবার খেলা খেলে, ইন্দ্রের ভেতর থেকে একটা দুরন্ত উত্তাপ তেমনি সামনের শ্বেত মূর্তিটাকে ঝরিয়ে দিতে চাইল।

ইন্দ্র হাত বাড়িয়ে ধরল ললিতার মোমের মত মসৃণ মুখখানা। কিন্তু নিজের মুখ নিয়ে যেতে পারল না সেই দূরত্বে যেখানে ললিতা নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে একটা বিপন্মুক্ত ব্যবধানে। সে কিন্তু চেয়ে আছে তেমনি স্থির চোখ মেলে। ইন্দ্রের হাতের পাতায় ধরা তার মুখখানা।

এক সময় ইন্দ্রের আকুতি-ভরা চোখ যখন আছড়ে পড়ল ললিতার বন্ধ ঘরের দরজার ওপর তখন নিজের হাত দিয়ে ইন্দ্রের হাতখানা চেপে ধরে বলল ললিতা, প্লিজ ইন্দ্র, আমাকে তুমি দুর্বল করে দিও না। আমি তোমাকে ফুল দিতে এসেছিলাম।

ইন্দ্র একটা চাপা শ্বাস ফেলে বলল, শুধু গোলাপ দিতে এসেছিলে, আর কিছু নয়?

ওধার থেকে ললিতা বলল, মিথ্যে বলব না, তোমাকে ভাল লেগেছিল।

তাহলে ললিতা?

সব তাহলের জবাব নেই ইন্দ্র।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইন্দ্র বলল, যদি তোমাকে স্পর্শ করে অন্যায় করে থাকি তাহলে....।

ইন্দ্রের হাত শিথিল হল। সঙ্গে সঙ্গে সে হাত শক্ত করে বুকের কাছে তুলে ঠোঁটে চেপে ধরল ললিতা।

তুমি আমার বন্ধু ইন্দ্র। আজ থেকে দুজনের দুঃখ আমরা দুজনে বোঝার চেষ্টা করব। অনেক দূরে চলে গেলেও আমরা বন্ধু। অনেক অদেখা দিনেও আমরা ভাবব দুজনের কথা।

ইন্দ্র বলল, আমরা দুজনের অনেকটা কাছে আসতে পারি না ললিতা? যেখানে ঘ্রাণে পাওয়া যায়. দেহের আশ্চর্য এক ধরনের গন্ধ আর মনের অনেকখানি জুড়ে অদ্বিতীয় কারুর আনাগোনা।

কেন চঞ্চল করে দাও ইন্দ্র। কেন নতুন জীবনের লোভ দেখাও। আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি। আর তাছাড়া আমি তো প্রতারণা করতে পারব না।

প্রতারণার কথা কেন ললিতা?

তুমি কি কোনদিন মন থেকে ভালবাসনি সরিতাকে?

সেই মুহূর্তে কোন কথা জোগাল না ইন্দ্রের মুখে। একটু পরে নিজের দুটো হাত ললিতার হাতের

বাঁধন থেকে টেনে নিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়াল। জানালার ফাঁকে মুখখানা রেখে বলল, আজ এই মুহূর্তে একটা সত্য তোমাকে বলি, সরিতাকে তোমার চেয়ে বেশি ভালবাসি না ললিতা, আবার তোমাকেও সরিতার চেয়ে বেশি ভালবেসে ফেলেছি একথা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারব না।

ললিতা বলল, তার মানে দুজনকেই তুমি ভালবাস!

জানি না ললিতা একে ভালবাসা বলে কিনা তবে এ যে ভাল লাগা, অসহ্য ভাল লাগা তা বলতে পারি। কাল সন্ধ্যায় অষ্টমুদি লেকের জলে যার পাশে বসে ভালবাসার কথা বলেছি তার সঙ্গে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ললিতার কোন তফাত আমি দেখছি না আজ। বিশ্বাস কর ললিতা আমি কাউকেই প্রতারণা করি নি।

ললিতা বলল, তোমার ভাবনার সঙ্গে আমার সংস্কারের হয়তো অনেক গরমিল আছে তবু তোমাকে ভাল না বেসে পাবা যায় না ইন্দ্র। এই একটি দিনের ভেতর সম্পূর্ণ অপরিচিত দুজনে এত কাছে সরে আসা সম্ভব হয়েছে শুধু তোমার চার্মিং পার্সোনালিটির জন্য।

ইন্দ্র বলল, আমার ভেতর যদি কোন আকর্ষণ তুমি খুঁজে পেয়ে থাক তাহলে তোমার ভেতরেও আছে দুরন্ত এক আকর্ষণ। একবার তোমাকে দেখলে তোমার কাছে এলে কেউ সহজে ফিরে যেতে পারবে না ললিতা। আমি নিজেকে দিয়েই এ সত্যটুকু যাচাই করে নিয়েছি।

ললিতা বলল, তা নয় ইন্দ্র, সবার চোখ সমান নয়। নায়ার আমাকে যে চোখে দেখেছিল সে চোখের সঙ্গে তোমার চোখের কোন মিল নেই। তাই সে আমাকে পেয়ে হারিয়েছে আর তুমি আমাকে না পেয়েও পেলে।

ইন্দ্র হতাশ গলায় কৌতুকের সুরে বলল, এ যে দুয়ার বন্ধ করে বলছ ঘরের সব ধনরত্ন তোমার।

ললিতা বলল, সব ধনরত্নই তোমার তবে খোলার চাবিটা সরিতার হাতে। ও যখন ঘর খুলবে তখন তুমি দেখতে পাবে ললিতা সরিতা হয়ে গেছে। অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু তো।

খিল খিল করে হেসে উঠতে গিয়ে ঘুমন্ত তুল্পির দিকে চেয়ে দু'হাতে মুখখানা ঢেকে ফেলল ললিতা।

হাত বাড়িয়ে ললিতাকে ধরল ইন্দ্র। মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে দিতেই ইন্দ্রের হাত দুটো ভিজে উঠল ললিতার চোখের জলে।

ভোরবেলায় দরজায় মৃদু ধাক্কা দিচ্ছিল কেউ। ঘুম ভেঙে গেল ইন্দ্রের। দরজা খুলে দিতেই এক ঝলক হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করল ললিতা, কি মশাই ঘুম ভাঙল না এখনও।

ইন্দ্র ম্লান হেসে বলল, অতিথি আপ্যায়ন এ হারে চললে অতিথিকে গৃহস্বামীর ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে হবে।

হঠাৎ ইন্দ্রের চোখ পড়ল সামনের আঙিনায় সদ্য দেওয়া আল্পনার ওপর।

ইন্দ্র বলল, এত ভোরে আল্পনাও দেওয়া হয়ে গেছে।

এ রীতি আমাদের অনেক দিনের। আমার দিদিমাকেও রোজ সকালে এমনি করে আল্পনা দিতে দেখতাম। উনি বলতেন ভোরবেলা উঠোন থেকেই অতিথি সেবা শুরু করতে হয়। সামান্য পিঁপড়েদেরও উনি অতিথি বলে মনে করতেন। চালের গুঁড়ির আল্পনা খাবার জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানান হত।

ইন্দ্র বলল, দারুণ আইডিয়া তো। আল্পনাকে আমরা শুধু শিল্প বলেই জানি, কিন্তু তার ভেতর দিয়ে যে অতি ক্ষুদ্র অতিথিদেরও সেবা করা যায় সে ধারণা আমাদের একেবারেই নেই।

ললিতা বলল, আর কথা বাড়াব না। এখুনি ওম্না আসবে দুধ দুইতে। আপনার চায়ের জোগাড় দেখিগে। ছোট অতিথির খাবার দেওয়া হল এখন বড় অতিথির আহারের আয়োজন করতে হবে।

ভোরের ললিতা যেন রাতের ললিতাই নয়। রাতের রহস্যময়ী ভোরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে সেবিকায়।

ললিতা ত্রস্ত পায়ে চলে গেল। একেবারে সহজ স্বাভাবিক। ভাষাতেও আর রাতের সেই অন্তরঙ্গ

সম্বোধন নেই। এখন ললিতার মুখে সম্মানীয় অতিথি সম্বোধনের ভাষা।

মাজা পেতলের রঙের সূর্য ঝিলিক দিচ্ছে নারকেল গাছগুলোর পাতার ফাঁকে। লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছের আগায় আলোর সোনালী চমক। ঋতু গণনায় শীতকাল হলেও এখানকার বাতাসে থাকে না শীতের কামড়। হাল্কা একখানা আলোয়ান গায়ে দিয়ে পাঞ্জাবী আর ধুতি পরে ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় পায়চারী করছিল ইন্দ্র। মনে ভেতর রাতের ছবিটা ফুটে উঠলেই সে তাকে জোর করে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল।

চেরি আচ্চন, চেরি আচ্চন—ডাক দিতে দিতে ছুটে এল তুল্সি। এসেই অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ল ইন্দ্রের হাঁটুর ওপর।

পেছনে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল ললিতা। কাছে এসে বলল, দেখুন তো কি মুশকিল, সবটুকু দুধ বেড়ালের কাছে নিয়ে গিয়ে বসে বসে খাইয়ে এসেছে। আমি এখন কি করি।

ইন্দ্রের মুখের দিকে ভীতু ভীতু চোখ তুলে তাকাল তুল্সি। ইন্দ্রকে সে ভেবে নিয়েছে তার একমাত্র ত্রাণর্কতা।

ইন্দ্র হেসে বলল, মায়ের স্বভাব পেয়েছে মেয়ে। মা ভোরবেলা চালগুঁড়ির আল্পনা এঁকে পিঁপড়েকে খাইয়েছে, মেয়ে এখন খাওয়াল বেড়ালকে।

ললিতা বলল, চা করব এক ফোঁটা দুধ নেই। ওম্না দুধ দুয়ে সকালের কাজ সেরে চলে গেছে। ওকে যে বাইরে পাঠাব তার উপায় নেই।

যদি অনুমতি করেন তাহলে দুধ সংগ্রহের চেষ্টায় বেরোই।

ললিতা বলল, কাছেপিঠে পাওয়া যাবে না। খামোকা চেষ্টা চালাবেন।

ইন্দ্র একটা ফ্লাস্ক চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। যাবার আগে বলল, আপনি দয়া করে তুল্সিকে একা পেয়ে শাসন করবেন না যেন। যদি দুধ পাই তাহলে আসামী বেকসুর খালাস পাবে আর যদি না পাই তাহলে আপনার মর্জিমাফিক বিচার হবে।

ললিতা হেসে বলল, আপনার মত ব্যারিস্টার পেয়ে তুল্সি বর্তে গেল।

দুধ মিলল। একটি লোককে রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে দুধ দিয়ে ক্যান নিয়ে ফিরতে দেখে পাকড়াও করল ইন্দ্র। লোকটা পাশের পল্লীতে নিয়ে গেল ইন্দ্রকে। ফ্লাস্ক ভরে দুধ দিয়ে দিল।

ইন্দ্র যখন দুধ নিয়ে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াল তখন সত্যি চমকে উঠেছিল ললিতা।

আপনি দুধ আনলেন!

নয়তো কি আপনি ভাবছেন পিটুলিগোলা জল।

আপনার হিম্মত আছে।

ইন্দ্র হঠাৎ বলল, হিম্মত যে নেই তার প্রমাণ কাল রাতেই তো পেয়েছেন।

ললিতা কোন কথা না বলে জলখাবারের জন্যে উপ্মা নেড়ে চলল।

সরিতারা এল দুপুরে। তখন সবে খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে ইন্দ্র।

ওরা সকালে আসবে এমনি একটা অনুমান সকলে করেছিল, কিন্তু পার্থসারথি মন্দিরের পুরোহিত আটকে রেখেছিলেন মিঃ পিল্লাই আর সরিতাকে। পরিচয় সূত্রে জানা গিয়েছিল সরিতার বাবার স্কুলের বন্ধু ছিলেন ঐ পুরোহিত মশাই। তাই দুপুরের খাওয়া সকাল সকাল খাইয়ে দিয়ে তবে ছেড়েছেন।

সরিতা এসে পৌঁছেই ইন্দ্রকে বলল, রেডি হয়ে নাও, এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে।

ইন্দ্র বলল, আমার রেডি হতে দেরী কি।

ললিতা রাতটা অনেক করে কাটিয়ে যেতে বলল সরিতাকে, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হল না।

সরিতা পোশাক বদলাতে ললিতার ঘরে ঢুকেছিল সেই ফাঁকে বাইরের ঘরে ইন্দ্রের সামনে এসে দাঁড়াল ললিতা।

বলল, বিয়ের যেন খবরটা পাই।

ইন্দ্র বলল, তাহলে অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

কেন একথা বলছেন? সরিতা কি চিরকাল আনম্যারেড থাকবে?

তা কেন থাকবে।

আপনি বিয়ে না করলে তাকে তো কুমারী থেকে যেতেই হবে।

একথা নিশ্চিত করে কি বলা যায় ললিতা।

ললিতা বলল, নিশ্চিত করে বলা না গেলেও আশা করব তাই। যেখানে নিজে হেরেছি সেখানে অন্যকে জিততে দেখলে বিশ্বাস করুন আমি সবচেয়ে বেশি খুশী হব।

ইন্দ্র বলল, আমি জানি না ললিতা এমনদিন আমার জীবনে আসবে কিনা; তবে কারুনাগপল্লীর একটি স্মৃতি আমি কোনদিনও ভুলব না।

ললিতা আনমনা হল। একসময় বলল, বেঁচে থাকতে কার না ইচ্ছে করে বলুন, একটি মনের ভেতর বেঁচে আছি এর চেয়ে জীবনে বড় বাঁচা আর কি আছে।

ইন্দ্র ললিতার হাত ধরে ঠোঁটে ছুঁইয়ে বলল, আমি ভুলব না, কোনদিনও ভুলতে পারব না।

ললিতা কিন্তু আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। উদ্‌গত চোখের জল ইন্দ্রের কাছ থেকে গোপন করে দৌড়ে পালাল।

গাড়িতে যেতে যেতে সরিতা বলল, বড় গম্ভীর হয়ে আছ যে। কথা বলছ না।

ইন্দ্র বাঁকের মুখে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, ফিরে যেতে কার ভাল লাগে বল? এই কটা অসাধারণ মুহূর্ত এমনি করেই ফুরিয়ে যাবে এ যেন ভাবাই যায় না।

সরিতা হঠাৎ বলল, ললিতা চিরকালই জানতাম বড় শক্ত মেয়ে কিন্তু এবার আসার সময় ও এমন করে ফুলে ফুলে কাঁদল যে আমার সঙ্গে কথাই বলতে পারল না ভাল করে।

ইন্দ্রের বুকের ওপর একটা যন্ত্রণার ঢেউ দারুণ বেগে ধাক্কা দিয়ে সারা চেতনায় ছড়িয়ে পড়ল।

সরিতা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ইন্দ্রের গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে বলল, তোমার কি হয়েছে বলতো? আম্মাওয়নের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অব্দি মুখে কথা নেই।

ইন্দ্র বলল, এখানে না আসাই বোধ হয় ভাল ছিল সরিতা। ফিরে গিয়ে একটুও কাজে মন বসবে না। তুমি থাকবে প্রেমার চোখের সামনে আর আমি এই দু'একটা দিনের স্মৃতি নিয়ে যন্ত্রণায় কাটাব।

সরিতা ইন্দ্রের থাই-এর ওপর হাত রেখে বলল, তুমি দারুণ সেন্টিমেন্টাল ইন্দ্র। সবকিছুকে বেশ স্পোর্টিংলি নাও না কেন? আমরা তো আর হারিয়ে যাচ্ছি না।

একটু থেমে ইন্দ্রের হাঁটুতে চাপ দিয়ে বলল, আমরা অনেক কাছে সরে এসেছি, তাই না ইন্দ্র?

ইন্দ্র তাকাল সরিতার দিকে। মুখে একটুখানি হাসি ফুটিয়ে বলল, খুব কাছে সরে এসেছি কি? একেবারে দুজনে মিলে যাকে বলে এক হয়ে যাওয়া!

ইন্দ্রের থাই-এর ওপর তিন চারটে কীল মেরে সরিতা বলল, তুমি ভীষণ অসভ্য হয়ে গেছ ইন্দ্র। মনে হচ্ছে এরপর মালিককে আর তেমন মান্য করে চলবে না।

ইন্দ্র গাড়িতে স্পীড দিয়ে বলল, যে ডালে বসে আছি সে ডালটাই কাটব, অন্তত এমন বোকা আমাকে ভেব না সরিতা।

ইন্দ্রের বাঁ হাতে নিজের গালটা চেপে ধরে সরিতা বলল, বড় কষ্ট হচ্ছে ললিতার জন্যে, তাই না?

এমন আকস্মিকভাবে প্রশ্নটা করে ফেলল সরিতা যে হঠাৎ কোন কথা জোগাল না ইন্দ্রের মুখে। মনে হয় যেন চারিদিকে আগুন, পালাবার কোন পথ নেই।

ইন্দ্রকে চুপচাপ থাকতে দেখে সরিতা বলল, আমি কিচ্ছু মনে করিনি।

গাড়িটা থামিয়ে ইন্দ্র সরিতার একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর ভরে নিয়ে বলল, তোমার কাছে অপরাধ করেছি, ক্ষমা চাইবার মুখ নেই আমার।

সরিতা খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, তুমি এমন আপসেট হয়ে পড়ছ কেন, নির্জনে ললিতার মত একটা মেয়ের কাছাকাছি এলে সহজে কারু পক্ষে ফেরা কি সম্ভব! এটুকু সাধারণ জ্ঞান আমার আছে ইন্দ্র!

ইন্দ্র কাতর গলায় বলল, তুমি যদি জানতে তাহলে এমন করে একা তার কাছে আমাকে ফেলে দিয়ে গেলে কেন?

হাসল সরিতা। বলল, একটা পরীক্ষা তো হল। পরীক্ষায় বসলে অভিজ্ঞতা হয়, ভয় ভাঙে। পাস ফেলের প্রশ্নটা এখানে নাই বা তুললাম।

ইন্দ্র বলল, আমি চঞ্চল হয়েছিলাম সরিতা, কিন্তু এমন কিছু করিনি যাতে ফেরা যায় না।

সরিতা বলল, তুমি কতদূর এগিয়েছ আমি তো তা জিজ্ঞেস করিনি। ভালবাসার দু'একটা কথা বলতে পার আবার দেহসম্পর্কের একস্ট্রিমেও যেতে পার, ও দুটোর গুরুত্বই কিন্তু সমান। উপেক্ষা করলে দুটোকেই করতে হয়, আবার দাম দিলে দুটোই কিন্তু সমান দামী।

ইন্দ্র চুপচাপ সরিতার দিকে চেয়ে আছে দেখে সরিতা বলল, ভালবাসা একটা খেলা ইন্দ্র। কখনো হার কখনো জিৎ। খেলার ভেতর কখনো মন বসে যায়, আবার কখনো বা বারে বারে ভুলের জালে জড়াতে হয়। খেলোয়াড়কে সব সময় সব পরিস্থিতির জন্যে তৈরি থাকতে হয়।

ইন্দ্র সরিতার হাতখানা জোরে চেপে ধরে বলল, প্লিজ সরিতা, আমাকে বরং শাস্তি দাও, কিন্তু এ ধরনের নিরাসক্ত মন্তব্য করো না।

সরিতা হেসে বলল, আচ্ছা ও কথা থাক, এখন বলতো দেখি, ব্যাপারটা আমি কি করে জানলাম?

ইন্দ্র সহজ হল, ললিতা কিছু বলে থাকবে।

তাহলে তুমি খুব বুঝেছ ললিতাকে। বিশ্বাস্ কর ও বিশ্বাসঘাতকতার কোন কাজই করেনি।

ইন্দ্র বলল, আর ও তোমার সঙ্গেও কোন রকম প্রতারণা করেনি। যদি ও ঠকাতে চাইত, তাহলে ও গতরাতে অনেকখানি এগিয়ে আসতে পারত। ও তোমার বন্ধুত্বের মর্যাদা রেখেছে সরিতা।

সরিতা দারুণ একচোট হেসে নিয়ে বলল, ললিতা কি তোমাকে উকিল নিযুক্ত করেছে নাকি? এতক্ষণ তার পক্ষ নিয়েই সওয়াল করে যাচ্ছ।

ইন্দ্র চুপ করে রইল দেখে সরিতা বলল, আচ্ছা তোমরা দুজনে এত বোকা কেন বলতে পার! শোন, আমি ওর ঘরে ঢুকে প্রথমেই দেখলাম, ওর স্বামীর ফটোটা যেখানে থাকত, সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারপর চোখ পড়ল পাশের ঘরের দিকে। বালিশের নীচে থেকে আধখানা সিগারেটের প্যাকেট উঁকি দিচ্ছে। বুঝলাম তুমি কাল রাতে আম্মাওয়নের ঘরেই শুয়েছিলে।

তখনই মনে হল, কিন্তু কেন, বাইরের ঘর থেকে ইন্দ্র এখানে শুতে এল কেন!

তার পরেই চোখ পড়ল, জানালার এপার ওপারে ছড়িয়ে পড়ে থাকা নানা রঙের কতকগুলো গোলাপের ওপর। এ যে তুল্পির সংগ্রহ করে আনা গোলাপের খেলা নয় তা বুঝতে একটুও কষ্ট হল না। তাহলে একটিও পাপড়ি আস্ত থাকত না আর বহু রঙের গোলাপের আমদানী হত না।

চলে আসার আগে আমার অনুমান সত্য প্রমাণিত হল, বাইরের ঘরে ললিতাকে সন্তর্পণে দৌড়ে যেতে দেখলাম। মিনিট দশেক পরে ও যখন ফিরে এল তখন ওর চোখ দুটো টকটকে লাল। বুঝলাম, অনেক শোক বুকে নিয়ে ও তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ঐ অবস্থায় ও আমাকে থেকে যাবার জন্যে অনুরোধ করল আর সঙ্গে সঙ্গে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। এর পর নিতান্ত তুল্পি ছাড়া আর কারো পক্ষে ব্যাপারটা বুঝে নিতে কি খুব অসুবিধে হয় ইন্দ্র।

ইন্দ্র বলল, একটুও মিথ্যে নেই তোমার অনুমানে, তবু বলব ললিতা অসাধারণ সংযমী মেয়ে। তার স্বামীর যে মৃত্যু হয়নি, সে যে একটি প্রতারক, এ খবরটুকু পাবার পরেই সে ঘর থেকে নায়ারের ফটোটা সরিয়ে ফেলেছে।

সরিতা বলল, তাও আমি জানি। আম্মাওয়ন কাল রাতে আমাকে সে কথা বলেছেন। তুমিও যে ব্যাপারটা জান, সেটা তাঁরই মুখ থেকে শুনেছি। কিন্তু ললিতাকে তিনি এ বিষয়ে কোন কথাই বলেন নি। তাই ফটোটা ওর ঘরে নেই দেখেই বুঝেছিলাম, তুমি কোন এক অবসরে ওকে ওর স্বামীর কথা বলেছ। মিঃ নায়ার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মন স্বাধীন হয়ে গেছে। তখন যে কোন সূত্র ধরেই হোক তোমাদের মিলতে অসুবিধে হয়নি।

ইন্দ্র বলল, আমার ইচ্ছার আগুনে ওকে টানতে চেয়েছিলাম সরিতা, কিন্তু ও তোমার বন্ধুত্বের মর্যাদা নষ্ট করে রাতে ওর ঘরের দরজা আমার জন্যে খুলে দেয়নি।

সরিতা বলল, আবার বলছি ইন্দ্র আমি তোমাদের এই অ্যাফেয়ারটাকে খুব স্পোর্টিংলি নিয়েছি।

আমার মনে এখন একটুও যন্ত্রণা নেই। আর আমি তোমার চেয়ে অনেক ভাল করে জানি ললিতাকে। মনের দিক থেকে ও অনেক বড়। সাময়িক উইকনেস আসতে পারে, কিন্তু তাকে জয় করতে ওর বেশি সময় লাগে না।

ইন্দ্র বলল, এখন থেকে একটি মানুষ তোমার কাছে সন্দেহের পাত্র হয়ে রইল।

সরিতা এবার ইন্দ্রের হাতখানাকে বুকে জড়িয়ে ঠোঁটে ছুঁইয়ে আদর করতে করতে বলল, আমি ঈশ্বরপুত্র ক্রাইস্টকেও চাই না আর গার্ডেন অব ইডেনের স্যাটানকেও চাই না। আমি চাই তোমার মত একটি মানুষ। যার দুরন্ত প্যাশান আছে, যে ভুল করে, আবার ভুল স্বীকার করে নেয়। তুমি যদি নিজের ইচ্ছেয় না চলে যাও, আমি তোমাকে কোনদিনও ছাড়তে পারব না ইন্দ্র।

সরিতাকে একটা ছোট পাখির মত বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে অজস্র আদরে ভরে দিতে দিতে ইন্দ্র বলল, তোমাকে যদি আমি কোনদিন ডিসিভ করি তাহলে জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ থেকে আমি বঞ্চিত হব সরিতা।

দুই

প্রেমা, তুমি তো জান চিরদিনই আমি পুরস্কার আর প্রশংসাপত্রের আওতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছি। তাই জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার বিতরণী সভাতেও আমি যোগ দিতে পারলাম না। নাচ সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহকে আমি শ্রদ্ধা করি কিন্তু পুরস্কার ব্যাপারটাকে কোন দিনই নয়। ঐ যে গেঁয়ো মানুষটি তুল্লাল নেচে গেল, দেখেছ তার চোখ আর হাত পায়ের কাজ? আর পাশে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের সারাক্ষণ আমি ওকে নিয়ে চাপা গলায় কৌতুক করতে দেখেছি। আমি জানি এই সমস্ত শিল্পী সমাবেশের ভেতর ঐ লোকটিই শ্রেষ্ঠতম শিল্পীর সম্মানের অধিকারী। কিন্তু এও আমার অজানা নয় অজস্র নামী ফুলের মেলায় ও পাতার আড়ালেই থেকে যাবে।

গুরু পানিক্করকে প্রণাম, তিনি এমন এক প্রতিভাকে খুঁজে বের করে এনেছেন দারুচিনি বনের ভেতর থেকে। হাঁ দারুচিনি বনই তো। ইডিক্কির মুনারে দারুচিনি আর এলাচ বনে লোকটি কাজ করে। বৃত্তিতে একেবারে বনশ্রমিক। লোকটির সংসারে পোষ্য অনেকগুলি, তাই সংসার চলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। বুড়ো লোকটি সদানন্দময়। দুঃখকে ভুলতে জানে। ও যে অনেক বড় সম্পদ পেয়েছে। নাচের আনন্দে ওর সব দুঃখ ভেসে যায়।

এসব খবর আমি লোকটির কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছি।

পুরস্কার বিতরণী সভায় ও হয়ত বসার একখানা আসন পাবে। পুরস্কার প্রাপককে সকলের দেখাদেখি ও হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবে। তারপর ওর পাহাড়ী পল্লীতে ফিরে গিয়ে চাষী বন্ধুদের কাছে অনুষ্ঠানের গল্প করবে। যারা পুরস্কার পেয়েছে তাদের প্রশংসা করবে শতমুখে। তার চেয়ে যে সবাই বেশি গুণী একথা ভেবে মনে মনে লজ্জা পাবে। কিন্তু পুরস্কার না পাবার কোন ক্ষোভ থাকবে না তার মনে। কারণ সে জানে না কত বড় সম্পদ সে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে নিজের মধ্যে!

গুরু পানিক্করের সঙ্গে বোধ হয় তোমার দেখা হয় নি। তিনি তোমার নাচের আন্তরিক তারিফ করছিলেন। আমাকে বলছিলেন যে তুমি নাচের ভাষা বোঝ, নাচের সঙ্গে লীন হয়ে যেতে জান। সবাই জানেন, তুমি মাধবী আম্মার ছাত্রী। তাহলেও গুরু পানিক্করই এই সরকারি আয়োজনের উদ্যোক্তা। যদি পার ওঁর সঙ্গে দেখা কর। তাছাড়া যথার্থ গুণী আর সমঝদার যে কজন মানুষ এখনও দেশে রয়েছেন, তাঁদের শীর্ষে আছেন এই নিরভিমান বৃদ্ধ গুরু পানিক্কর।

অনেক কথা লিখে ফেললাম। কলাকেন্দ্রমে যে কটা বছর একসঙ্গে কাটিয়েছিলাম, সে দিনগুলো হঠাৎ পুরনো পাতার মত আমার চোখের সামনে একটা দমকা হাওয়ায় নাচের খেলা দেখাতে দেখাতে উড়ে এল। তাই সতীর্থকে এতবড় একটা চিঠি লিখে বসলাম। তুমি জান, আমি ভবঘুরে, তাই ঠিকানা দিতে পারি না কাউকে। শুধু গুরু পানিক্করকে মাসের ভেতর একবার এসে প্রণাম করে যাই।

।।দেবন।।

প্রেমা চিঠিখানা দুবার করে পড়ল। বিশেষ বিশেষ জায়গায় কয়েকবার করে পড়ে পড়ে আবৃত্তি করল, তার হোটেলের সুইটে বেয়ারা এসে চিঠিখানা দিয়ে যাবার পর থেকেই প্রেমা বিভোর হয়ে আছে। দেবন তাকে চিঠি লিখেছে, এ যেন ভাবাই যায় না। দেবন চিরদিনই কম কথা বলে, তদ্‌গত শিল্পী। অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দু-একবার দেখা হয়েছে মাত্র। অনুষ্ঠানের দু দিন পরে জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের যে টি-পার্টি আর পুরস্কার বিতরণী সভা বসবে তাতে সে দেবনকে ধরবে, আর নিয়ে আসবে তার হোটেলে এই ছিল তার পরিকল্পনা। কদিন নাচের ব্যাপারে ঘোরের ভেতর কেটেছে। তাই দু-একবার দেখা হলেও নিভৃতে আলাপের সুযোগ হয়নি। কিন্তু সব প্ল্যান ভেস্তে গেল দেখে প্রেমার কেমন যেন কান্না পেল। কেন সে অনুষ্ঠানের ফাঁকে বলে রাখল না দেবনকে যে চলে যাবার আগে একটিবার তার সঙ্গে যেন দেখা করে যায়।

প্রেমা চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে রইল। খোলা চুলে চিরুণী চালাচ্ছিল সে। চিরুণীটা আটকে রইল চুলের ভেতর। হারিয়ে যাবার দুঃখকে আকুল হয়ে অনুভব করতে লাগল!

কলাকেন্দ্রমের মঞ্চে ও প্রথম যেদিন দেবনকে দেখেছিল সেদিনের কথা মনে পড়ল। মহাভারতের পাতা থেকে যেন মহাবীর কর্ণ নেমে এসেছে।

সারা শরীরে সূর্যের শক্তি আর সৌন্দর্যের দীপ্তি। গুরু বালকৃষ্ণণ একটি একটি করে নাচের মুদ্রা শেখাচ্ছিলেন তরুণ ছাত্রদের। প্রেমা তার বান্ধবীদের নিয়ে বসেছিল দর্শন আসনে। নিজের ক্লাস না থাকলে যে কোন ক্লাসে এসে বসার অধিকার ছিল ছাত্রছাত্রীদের।

গুরু বালকৃষ্ণণ একটি মুদ্রা ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই দেবন তার অবিকল অনুকরণ করে গুরুকে অবাক করে দিচ্ছিল।

নদী বইছে। বালকৃষ্ণণ দেখাচ্ছেন। দেবন সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহে তরঙ্গ তুলে হাতের মুদ্রায় বয়ে চলা নদীর ভাবটি অবিকল ফুটিয়ে তুলল।

হাতি চলেছে। গুরুর সঙ্গে সঙ্গে দেবন অভিজাত পদক্ষেপে পরিক্রমা করতে লাগল সারা মঞ্চ। মাথার দুলুনিতে, প্রসারিত হাতের সঞ্চালনে শুঁড় উঁচিয়ে যেন চলেছে দুই হস্তী আগে পিছে।

ফুল ফুটছে, কুঁড়ি পাপড়ি মেলে জাগছে। দুটো হাত দেবনের পদ্মের মুদ্রায় বাঁধা। চোখ মুখ স্থির হয়ে আছে সেই করপদ্মের ওপর। হঠাৎ কেঁপে উঠল হাত থরথর করে। একটি একটি করে পাপড়ি মেলেছে পদ্মকলি। চোখে মুখে সেই ফুটে ওঠার আনন্দ ভোরের রোদের মত ছড়িয়ে পড়েছে। ফুল কুঁড়ির বাঁধন খুলে যখন পূর্ণ বিকশিত হল, তখন দেবনের সারা শরীর আনন্দে, রোমাঞ্চে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

ভ্রমর উড়ে আসছে ফুলের সন্ধান পেয়ে। দেবন হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে হাত। তারপর আঙুলের মুদ্রায় ভ্রমরকে উড়িয়ে আনছে ফুলের ওপর।

এত স্বাভাবিক আর এমন চার্মিং দেবনের কাজ যে দেখতে দেখতে প্রেমার মনে হত, সে ফোটা ফুলের গন্ধ পাচ্ছে। চোখে দেখছে ভ্রমরের উড়ে আসা, কানে শুনছে তার গুঞ্জনগান।

পাঠ শেষ হলে গুরু বালকৃষ্ণণ ছাত্রদের বলতেন, তোমরা দেবনকে অনুকরণ করবে।

দেবন কিন্তু মুখ নীচু করে একেবারে মঞ্চপীঠের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। সংকোচের মূর্তিখানাও তার কত সুন্দর। প্রেমা উঠে আসত, কিন্তু তার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে যেত দক্ষ শিল্পী দেবনের সসংকোচ ছবিখানা।

দেবনের যখন ক্লাশ থাকত না তখন ওরাও আসত প্রেমাদের অনুশীলন দেখতে। প্রেমার মনে হত, সে যার প্রতীক্ষার নিজেকে সাজিয়ে তুলেছে সেই প্রেমিক পুরুষ আজ এসেছে তার কাছে। প্রেমার নাচের মুদ্রায় তখন দুঃখ সুখের ঢেউ উঠত। তিলানার দ্রুতলয়ে সে যেন হার থেকে খসে পড়া মুক্তোর দানার মত সারা স্টেজে ছড়িয়ে পড়ত। তার হাস্যে লাস্যে, আমন্ত্রণ-মুদ্রায় দর্শকদের সে বিহ্বল করে দিত।

প্রেমার নাচ শেষ হলে কখনো বা দেবন দিত হাততালি। মাধবী আম্মা মঞ্চের ওপর থেকে দর্শক আসনের দিকে কঠিন শাসনের চোখে তাকাতেন। তিনি চাইতেন না শিক্ষা চলাকালে তাঁর কোন ছাত্রী

দারুণ রকম প্রশংসা পাক। তাঁর মতে এতে দুটো অসুবিধের মুখোমুখি হতে হয়। তরুণ শিক্ষার্থীর মনে অহংকারের বিষ ঢুকে যেতে পারে, আবার সতীর্থরা নিজেদের হীন মনে করতে পারে। তাতে নাচের উন্মাদনায় ভাটা পড়ারই সম্ভাবনা।

গুরু বালকৃষ্ণণ ও গুরু মাধবী আম্মার ভাবনার ভেতর ওরা লক্ষ্য করত এমনি· ছোটখাট কত পার্থক্য।

গুরু বালকৃষ্ণণ যে ছাত্রকে অনুশীলন চলার সময়ে সকলের সামনে শাসন করতেন তাকেই আবার নাওয়া খাওয়া ভুলে শেখাতেন নাচের কঠিন মুদ্রাগুলো।

রাত চারটের সময় ছাত্রাবাসে এসে ঐসব পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের হাঁকডাক দিয়ে তুলতেন। সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যেতেন, সমুদ্রের ধারে। বলতেন, দেখ নারকেল গাছটা কেমন দুলছে। পাতাগুলো কেমন থরথর করে কাঁপছে। দেহটাকে এমনি করে দোলাবি, দরকার হলে পাতার মত শিউরে উঠবি থরথর করে।

ঐ দেখ, সমুদ্রে ঢেউগুলো কেমন প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে একের পর এক আছড়ে পড়ছে তীরে। ফুঁসছে ফেনিয়ে উঠছে। কথাকলিতে দুজনে যখন যুদ্ধ করবি, তখন এমনি ফুঁসবি, এমনি প্রতিপক্ষের ওপর আছড়ে পড়ার ভঙ্গি করবি।

অন্যদিকে মাধবী আম্মাকে ছাত্রীরা দারুণ সমীহ করত। কেউ নিষ্ঠা হারালে তিনি চেঁচিয়ে বকুনি দিতেন না। কিন্তু এমন কঠিন চোখে চেয়ে থাকতেন যা কারো পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব হত না।

তিনি বলতেন, মোহিনী আট্যম লাস্য নৃত্য। সারা অঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে হবে চটুল চঞ্চল ভাব, কিন্তু নিজের মনকে কোন দিন চঞ্চল করতে নেই। নিজে স্থির থেকে সমস্ত দর্শক চিত্ত চঞ্চল করে টানতে হবে নিজের দিকে। তবেই শিল্পীর সিদ্ধিলাভ।

প্রেমা তাঁর কাছেই থাকত। মাধবী আম্মা যে প্রেমার মায়ের বান্ধবী ছিলেন একথা কেউ কোন দিন শোনেনি গুরু মাধবী আম্মার মুখ থেকে। কোন ছাত্রী কোনদিন দেখেনি মাধবী আম্মা প্রেমার ওপর অতিরিক্ত নজর দিচ্ছেন। সকলে জানত প্রেমার থেকে তারা অনেক পেছনে পড়ে, প্রেমার সঙ্গে তাদের তুলনাই চলে না। কিন্তু মাধবী আম্মার আচরণে মনে হত, যে কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে নাচ শিখলে প্রেমা হতে পারে। চাই কি তাকে অতিক্রম করেও যেতে পারে। মাধবী আম্মা কঠিন শিক্ষাগুরু, কিন্তু সকলে জানত শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি সমদর্শিনী।

এক ছুটির সন্ধ্যায় কলাকেন্দ্রম থেকে গাড়িতে করে কোভালমে নিজের বাড়িতে ফিরছিল প্রেমা। পনেরটি দিনের অবকাশ যাপনের জন্যে মন উৎসুক। ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে নিজেই চালাচ্ছিল গাড়ি। হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীরা প্রায় সকলেই চলে গিয়েছিল। মাধবী আম্মাও কদিন আগেই চলে গেছেন ত্রিচুরে কোন এক আত্মীয়ার বাড়ি।

সন্ধ্যায় সমুদ্রের ঢেউয়ের মত পথঘাট প্লাবিত করে জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। প্রেমা তার গাড়িখানা উড়িয়ে নিয়ে চলেছে কোভালমের পথে। হঠাৎ রাস্তার এক জায়গায় এসে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল ব্রেক কষে। একটি লোক রাস্তার প্রায় মাঝখান দিয়ে হেলতে দুলতে চলছিল। মাথায় একটা বাক্স।

গাড়িটাকে হর্ন বাজিয়ে ব্রেক কষতে দেখেই লোকটি পায়ে পায়ে সরে গেল রাস্তার ধারে।

গাড়ি থেকে মুখ বের করে প্রেমা ঝাঁঝিয়ে উঠল, মাতাল নাকি, পথ চলতে জান না?

লোকটি যেন গালাগাল গায়েই মাখে না, এমনি নির্বিকারে সে রাস্তার ধার ঘেঁষে চলতে লাগল।

দারুণ রাগ হল প্রেমার। লোকটা অন্যায়ের জন্যে কোথায় অনুতপ্ত হবে তা না উল্টে উপেক্ষা করে যেন চলতে লাগল।

প্রেমা গাড়িখানা একেবারে তার পাশে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে গেল, কালা নাকি? কিন্তু গলার স্বর গলাতেই থেমে গেল। সে তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল লোকটির মুখোমুখি।

দেবন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার গাড়ির তলাতেই তাহলে পড়তে যাচ্ছিলাম বল?

প্রেমা বলল, আরে ওঠ ওঠ, কথা হবে পরে।

দেবন বলল, দূর, তোমার গাড়িতে এখন কে চড়তে যাচ্ছে। হুস্ করে গাড়ি বেরিয়ে যাবে। আমি চাঁদের এমন সুন্দর আলোটাকে গায়ে মেখে নিয়ে পথ চলতে পারব না।

প্রেমা বিমর্ষ হয়ে গেল। বলল, এমনি পায়ে হেঁটে যদি চল তাহলে তো তোমার বাড়ি পৌঁছতে কম সে কম দিন তিনেক লাগবে।

তিনদিন কেন, পাঁচদিন লাগলেও ক্ষতি কি ? ছুটি তো পনের দিনের। কি করব সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি ঢুকে। তার চেয়ে হাটে বাজারে, পথেঘাটে সংসার পেতে পেতে চলব।

একটু থেমে বলল, পায়ে চলে চারদিকটাকে দেখে দেখে যাবার মত আনন্দ কোথায় পাওয়া যাবে প্রেমা। চোখ কান খোলা রেখে যত হাঁটবে, ততই রোমাঞ্চ। পথে পথে হাজারো অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবে।

দেবনের কথাগুলো খুব ভাল লাগল প্রেমার। তার মনে হল, সারারাত সে দেবনের সঙ্গে এমনি করে হেঁটে হেঁটে মাঠ-ঘাট, বন-পাহাড় পেরিয়ে চলে যাবে। নীল সমুদ্রের বুকে চাঁদের অজস্র অভ্রকুচি ছড়িয়ে দেবার খেলা দেখতে দেখতে, নারকেল গাছের পাতার কাঁপন বুকের ভেতর ভরে নিতে নিতে, কায়েলের পাশ দিয়ে কখনো বা নরম বালিতে পা ডুবিয়ে সে চলবে দেবনের সঙ্গে। দেবনের বাক্সটাকে সে মাথায় তুলে নিয়ে পথ চলবে কিছুক্ষণ। কি আশ্চর্য রোমাঞ্চ আছে এ ধরনের পথ চলায়। একেবারে জিপ্সী মেয়ে-পুরুষের মত। ঘর বাঁধার ঝক্কি নেই। শুধু পথ চলার আনন্দ।

কি ভাবছ, বলল দেবন।

চমক ভাঙল প্রেমার। সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে যেন থেমে গেল।

প্রেমা বলল, তেমন কিছু নয়, এই তোমার পথ চলার কথাই ভাবছিলাম।

আর ভেবে কাজ নেই, চটপট উঠে পড় গাড়িতে। এমনি রাত হয়ে গেছে, অনেক দেরী হয়ে যাবে কোভালম্ পৌঁছতে।

প্রেমা অনুযোগের সুর তুলে বলল, এমন করে তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন বাবা?

দেবন হেসে ফেলে বলল, পথটা কি আমার একার যে আমি একাই ভোগ করব। তবে কেউ পথের ওপর জোর কদমে চলে আনন্দ পায়, কেউবা ধীর কদমে। আমি ধীরে চলতেই ভালবাসি প্রেমা।

প্রেমা কথান্তরে গেল, তোমার কি নিজের বাড়ির ওপর কোন টানই নেই?

থাকবে না কেন, বলল দেবন, তবে বাবাও চিরকাল ভবঘুরে, ছেলেও তাই। মায়ের একা ঘরে থেকে থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে, এখন আমরা রুটিন ধরে কাজ করতে গেলেই মায়ের কেমন অস্বস্তি লাগে।

প্রেমা বলল, তোমরা ক'ভাই বোন?

দেবন বলল, তুমি আবার বংশপঞ্জী নিয়ে বসলে যে। আমি একমেবাদ্বিতীয়ম্।

প্রেমা বলল, বাবা এখন কি করছেন?

ঘরে বসে বই লিখছেন।

প্রেমা বিস্ময়ের সুরে বলল, বই! কিসের বই?

বাবা আরথ্রাইটিসে প্রায় পঙ্গু হয়ে বসে আছেন। দীর্ঘ জীবনে নাচের সন্ধানে সারা দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাই নিয়ে বই লিখছেন।

প্রেমা বলল, তোমার বাবা কি নাচতেন?

না।

প্রেমা বলল, তাহলে যে শুনেছিলাম, তুমি নৃত্যশিল্পীদের বাড়ির ছেলে।

দেবন বলল, বাবা কেরালার সবরকম নাচের উৎপত্তি আর অগ্রগতি নিয়ে সারা জীবন চর্চা করেছেন, কিন্তু নিজে নাচেননি কখনও। আমার ঠাকুর্দা, তাঁর বাবা, সবাই ছিলেন নাচিয়ে। সেদিক থেকে বলতে পার আমি নাচিয়েদের বাড়ির ছেলে।

প্রেমা অন্যমনস্কভাবে বলল, তাই তোমার রক্তে নাচ, তোমার অণু-পরমাণুগুলো নাচের ছন্দে বাঁধা।

তা আমি জানি না প্রেমা, তবে স্টেজে যখন নাচতে নামি তখন মনে হয় কেউ যেন আমার ওপর ভর করেছে।

• একটু থেমে দেবন বলল, এই যে আটপেটিখানা আমি মাথায় বয়ে নিয়ে চলেছি, এতে কি আছে জান?

প্রেমার গলায় ঔৎসুক্য, কি ?

দেবন সেই জ্যোৎস্নার আলোয় পথের ধারে রেখে দেওয়া আটপেটিখানা খুলে ফেলল। প্রেমা দেখল, বাক্সখানার ওপরে দেবনের কয়েকটা জামাকাপড়। দেবন কাপড়-জামাগুলো সরিয়ে নিয়ে তলা থেকে বের করতে লাগল একটি একটি করে কথাকলির পোশাক। একদিকে অতি সাবধানে রাখা একটি খোপের ভেতর থেকে বের করল কিরীটম। প্রেমার হাতে দিয়ে বলল, দেখ তো কেমন?

প্রেমা জ্যোৎস্নার আলোয় দেখল, মুকুটখানা অনেক কালের পুরনো, কিন্তু গঠনের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত।

প্রেমা বলল, এ ধরনের কিরীটম তুমি জোগাড় করলে কোথা থেকে ?

দেবন তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে একে একে বের করতে লাগল, কানের তোড়া, বাহুর পারস্তিকা মণি, বুকের কোল্লারমের ওপর কারুত্তারম।

কোমরবন্ধনী—পাডিআরঞ্জানম, হাতের বালা আর মণিবন্ধের হস্তকটকম। নিম্ন-দেহের বাস পাটওয়ালের ওপর গাঢ় হলুদ রঙের মন্দি। সাদা উত্তরীয়মের শেষপ্রান্তে অনেক বড় কল্কেফুলের আকারের সোনালী জরির কাজ।

প্রেমা দেখল সবকটি জিনিসই পুরোন। নতুন পোশাকের ঔজ্জ্বল্য নেই, কিন্তু পোশাকটির কোন কোন অংশে বেশ অভিনবত্ব আছে।

প্রেমা একটি একটি করে পোশাক যত্নে হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করছিল। মাঝে মাঝে মন্তব্য করছিল বিস্ময়ের ভাষায়।

সব দেখানো শেষ হলে অতি যত্নে দেবন সেগুলিকে আবার গুছিয়ে রাখল তার আটপেটিতে। বাক্সের মুখ বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এ পোশাক আমার ঠাকুরদার বাবা পরতেন প্রেমা। একশো পাঁচ বছর আগেকার এই পোশাকের উত্তরাধিকার আমি লাভ করেছি। এটি পরে স্টেজে দাঁড়ালেই আমি অন্য মানুষ হয়ে যাই। এক অদৃশ্য শক্তি আমার ভেতর তখন কাজ করতে থাকে।

প্রেমা বলল, আশ্চর্য!

দেবন বলল, তুমি জান আমি কলাকেন্দ্রমে নাচ শিখেছি স্কলারশিপ নিয়ে, আমাদের সংসারের অবস্থা কোন কালেই ভাল ছিল না আজও নয়। তবু জান, প্রেমা, আমি যদি আমার পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে অনেক অর্থ পেতাম তাহলেও এত খুশি হতাম না, যত হয়েছি এই পোশাক আর আটপেটিখানার মালিকানা পেয়ে।

প্রেমা গভীর গলায় বলল, সত্যি, তোমার এ ঐশ্বর্য ঈর্ষা করার মত।

দেবন বলল, আমি যদি ভুল না শুনে থাকি তাহলে বলব, প্রেমা মেনন অনেক বড় বাড়ির মেয়ে। টাকা খরচ করে তাকে নামী গুরুর কাছে নাচ শেখানো হয়েছে। অনেক দামী আর নামী সমঝদারের চোখে এখনই সে পড়েছে। তার নাচের তারিফ বিশিষ্ট লোকেদের মুখে মুখে।

প্রেমা অধীর গলায় বলল, এ কথা কেন দেবন? বড়লোকের ঘরে জন্মে আমি কি খুব বড় একটা অপরাধ করেছি?

দেবন বলল, আমি ঠিক সেকথা বলতে চাইনি প্রেমা। হয়তো আমি আমার মনের কথাগুলো বলতে গিয়ে তোমাকে আঘাত করে বসতে পারি কিন্তু বিশ্বাস কর তোমার মনে কোনরকম আঘাত দেবার উদ্দেশ্য আমার আদপেই ছিল না। আমি আমার নিজের জীবনের কথাগুলোই তোমাকে বলতে চাই ছিলাম।

প্রেমা বলল, থাক সেসব কথা, এখন তুমি যা বলতে চাইছিলে বল।

দেবন অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবল। এক সময় বলল, অনেক আগে আমাদের নাচিয়ে সম্প্রদায়ের

মানুষদের বড় একটা সম্মান ছিল না। কিন্তু যারা নাচ শিখেছে এত কষ্ট করে তারা সবাইকে তো তা দেখাতে চায়। মানুষের মুখের একটুখানি বাহবা পেলেই তারা কৃতার্থ হয়ে যায়।

প্রেমা বলল, আমার বাবা কিন্তু এসব ব্যাপারে খুবই প্রোগ্রেসিভ ছিলেন। আমাদের কনভেন্টে পড়াশোনার ব্যবস্থা যেমন করেছিলেন তেমনি নাচ শেখানোর ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন দারুণ। তিনি বলতেন, গাছের শাখায় যেমন পাতা জাগে আর ফুল ফোটে ঠিক তেমনি দেহের শাখায় শাখায় নাচের মুদ্রাগুলো আশ্চর্য সব অনুভূতির ফুল ফোটায়। তিনি নাচ শুধু ভালবাসতেন না, নাচিয়েদের দারুণ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

দেবন বলল, এখন দর্শক অনেক শিক্ষিত হয়েছে, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলেছে কিন্তু আমার দাদুর মুখে গল্পে শুনেছি, তাঁরা ছেলেবেলা নাচের জন্যে কত অপমান সহ্য করেছেন।

কি রকম?

দেবন বলল, পাঠশালায় বানান ভুল করলেই পণ্ডিতমশায় বলতেন, পড়তে এসেছিস কেন? কস্মিনকালেও তো শিখতে পারবি না। তোর বাপ নাচিয়ে, ধেই ধেই করে নেচে বেড়াগে যা।

যাদের কোন কালচার নেই তারাই এ ধরনের কথা বলে।

শোনই না, দেবন বলে চলল, আমার ঠাকুর্দা তাঁর বাবার সঙ্গে আটপেটি মাথায় বয়ে নিয়ে কোন উৎসব বাড়িতে গিয়ে হাজির হতেন। শুধু নাচ দেখাবেন, এই ইচ্ছে। জমিদারের মর্জি হলে অনুমতি পাওয়া যেত। আশ্রয় মিলত কেটেডমের একেবারে বাইরে গাছের তলায়। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না প্রেমা, জমিদার বাড়ির হাতি আর ঘোড়াগুলোকে দালানের ওপর খেতে দেওয়া হত, অথচ দাদুদের খাবার জন্যে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার ওপর কলাপাতা পাততে হত। তারই ওপর চুড়ো করে ভাত ঢেলে দিত জমিদারবাড়ির চাকরগুলো। সামান্য একপদ তরকারী পেলেই যথেষ্ট।

প্রেমা বলল, এ ধরনের অবস্থা ভাবাই যায় না।

এত অপমান সয়েও কিন্তু শিল্পীরা বসে থাকত। শুধু যে বিদ্যা তারা এত সাধনায় শিখেছে তাকে সকলের সামনে তুলে ধরবে বলে। জান প্রেমা, আমি শুনেছি পাঁচ বছরে পড়লেন দাদু আর সেই থেকে শুরু হয়ে গেল তাঁর শিক্ষা। দশ বছরের পর দিনে কমপক্ষে দশ ঘণ্টা প্র্যাকটিস করতে হত। সামনে জ্বলত নারকেল তেলের ভিলাক্কু। তার সামনে সাধনার আসন পেতে মুখ আর চোখের কাজ করতে হত। মাংসপেশীর সেসব কাজ দেখলে আজকের শিল্পীরা থ বনে যাবে। আমার দাদু বলতেন একই মুখের একদিকে কান্না আর একদিকে হাসি ফোটানোর খেলা দেখাতে যদি না পারলি তাহলে শিখলি কি?

প্রেমা বলল, সত্যি এইসব সাধকই আমাদের প্রেরণা।

হঠাৎ দেবন বলল, দেখ প্রেমা কথা শুরু হলে কথা আর শেষ হবে না। দয়া করে আমাকে যেতে দাও। রাত দশটার ভেতরে একটা বাজারে পৌঁছতে না পারলে রাতের খাবারটা জুটবে না।

অন্তত ঐটুকু পথ তোমাকে পৌঁছে দিতে দাও।

আটপেটিটা মাথায় তুলে নিয়ে দেবন বলল, কিছু মনে কোরো না প্রেমা, অভ্যেস আমি খারাপ করব না। একদিনের সুখের কথা মনে করে দুঃখ পেতে হবে চিরদিন। ওতে আমি নেই। যেমন চলছি, এমনি আমাকে নিজের মত করে চলতে দাও।

প্রেমা মনে মনে বলল, কি নিষ্ঠুর আর কি অহংকারী তুমি দেবন। মুখে বলল, আচ্ছা এসো, পনেরটা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আবার দেখা হবে কলাকেন্দ্রমে। তখন তোমার এই পথচলার অভিজ্ঞতার কথা শুনব।

প্রেমা গাড়িতে স্টার্ট দিল। দেবন তেমনি আটপেটি মাথায় পথের ধার ঘেঁষে চলতে লাগল, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একটু আগে যে প্রেমা নামে এক সতীর্থার সঙ্গে তার আলাপ চলেছিল তার কোন চিহ্ন নেই দেবনের আচরণে। প্রেমা গাড়ি চালিয়ে পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় উৎসুক চোখে একবার তাকাল কিন্তু দেবনের দৃষ্টিকে সে কোনরকমে নিজের দিকে টানতে পারল না।

কলাকেন্দ্রমে পাঁচটি বছরের নানা উৎসব অনুষ্ঠানে দেবনের মুখোমুখি হয়েছে প্রেমা কতবার। অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করেছে ওরা একই সঙ্গে। দেবনের প্রাধান্যকে ও মেনে নিতে দ্বিধা করেনি। দেবন যখন নিরাসক্ত চোখে ওর দিকে চেয়ে আসন্ন উৎসব পরিকল্পনার কথা বলে গেছে, তখন প্রেমা শুধু দেখেছে দেবনকে। তার কানে হয়ত দেবনের একটিও কথা বাজেনি। সে তার সামনে দেখেছে সেই শক্তিমান কর্ণকে, যার সমস্ত শক্তি অদৃশ্য ভাগ্যদেবতা নির্মম কৌশলে হরণ করে নিয়ে চলেছে।

শিক্ষকেরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন দেবন কলাকেন্দ্রমের অদ্বিতীয় শক্তিমান শিল্পী। কিন্তু যখনই কোন উৎসবের আয়োজন হয়েছে, বিশিষ্ট দর্শকেরা এসেছেন কলাকেন্দ্রমে তখনই তাঁরা দেবনকে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করলেও পুরস্কার কিংবা উপহারের বস্তুগুলি একে একে তুলে দিয়েছেন প্রেমার হাতে।

প্রেমা মাথায় ঠেকিয়ে তুলে নিয়েছে সে দান কিন্তু তার মন সেগুলিকে গ্রহণ করতে পারেনি। সে জানে সে মোহিনী, আর সেই মোহিনীমায়ায় সে সবার চোখে মোহের অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া সকলেই জানে সে অন্যতম বিজনেস ম্যাগনেট করুণাকরনের মেয়ে। বাড়তি একটা সুযোগ স্বাভাবিক-ভাবেই সে তার অজ্ঞাতে সবার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। এসবে প্রেমার নিজের কোন ইচ্ছার প্রশ্নই ওঠে না। সমস্ত অনুকূল পরিস্থিতি ঘুরেছে তাকে কেন্দ্র করে।

অন্যদিকে অধিরথ সূতপুত্র দেবন। কর্ণের কবচকুণ্ডল সে স্মিত হাসিতে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। শক্তি তার থেকে ঝরে পড়া তুষার নদীধারার মত চির প্রবহমান। কিন্তু ভাগ্যের আশ্চর্য খেলায় বারে বারে তার গতি শুষ্ক মরুতে লুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রেমা ছবি দেখে—তার কর্ণের রথচক্র গ্রাস করেছে মেদিনী। মহা শক্তিধর সেই প্রোথিত চক্রকে শেষ শক্তিতে তুলে ধরবার চেষ্টা করছে, আর ভাগ্যের দেবতা নিষ্ঠুর শরাঘাতে অসহায় সংগ্রামীকে বিদ্ধ করতে উদ্যত।

ছবি দেখতে দেখতে হাহাকার করে কেঁদে উঠেছে প্রেমা। কিন্তু সেই অনুচ্চারিত হৃদয়ের শব্দ কারো কানে গিয়ে পৌঁছোয়নি। এমনকি প্রেমা যখন অশান্ত কাতর হৃদয়ের ভার বয়ে নিয়ে তার কর্ণের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কোন সমুদ্রবেলায়, দেবন স্মিত হাসিতে তাকে অভ্যর্থনা করেছে। তার পুরস্কার প্রাপ্তিতে জানিয়েছে অন্তরের গভীর অভিনন্দন।

কিন্তু প্রেমা তার সামনেই বালির জমিনে তার প্রাপ্ত পুরস্কার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছে, এ আমার নয়, দেবন, এ আমার নয়। এ পুরস্কার তোমার। কিন্তু এ উচ্ছিষ্ট বস্তুটি আমি তোমার হাতে তুলে দিতে পারব না, আর এও জানি এ পুরস্কার তুমি স্পর্শ করবে না।

প্রেমার হাত ধরে দেবন বলেছে, বড় বেশি সেন্টিমেন্টাল তুমি প্রেমা। আমার নাচ তোমার ভাল লাগতে পারে, মাষ্টার মশায়দের ভাল লাগতে পারে তা বলে সবার লাগবে এ কথা কি করে বলা যায় বল। তাঁরাও তো গুণী। তাঁদের বিচারের দাম দিতে হবে বৈকি।

উদগত অভিমানটুকু বুকের মধ্যে চেপে রেখে ভারী গলায় বলে উঠেছে প্রেমা, থামো তোমার আর বিচারকদের সাফাই গাইতে হবে না।

দেবন হেসে উঠে বালির ওপর ফেলে দেওয়া প্রেমার পুরস্কারটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে বলেছে, এই অবোলা জড় পদার্থটির অপরাধ কি প্রেমা। ওকে অমন করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কি লাভ হচ্ছে তোমার। একদিন এই উপহারকে তুচ্ছ বলে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে হয়ত তোমাকে দুঃখ পেতে হবে।

প্রেমা দেবনের হাত থেকে সে পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে গেছে সমুদ্রের দিকে। জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠেছে, এ আমারও নয়, তোমারও নয়, একে মহাসমুদ্র গ্রাস করুক।

দেবন অশান্ত প্রেমার দুটো হাত আবার নিজের হাতের ভেতর ধরে নিয়ে বলেছে, ঐ সমুদ্রের সঙ্গে তোমার কোন তফাত নেই প্রেমা। ও অনন্তকাল ধরে নাচের লীলায় মেতে আছে, তুমিও তাই। তোমার দেহেই শুধু নয়, মনেও চঞ্চল নাচের একটা লীলা চলেছে সারাক্ষণ।

প্রেমা দেবনের হাত থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বালির জমিনে পায়ের চিহ্ন আঁকতে আঁকতে ত্রস্ত পায়ে চলে গেছে কলাকেন্দ্রমের দিকে।

দেবন চেয়ে চেয়ে দেখেছে খেয়ালী প্রেমাকে। তার ভাল লেগেছে প্রেমার সবকিছু। চঞ্চল পায়ে ঢেউয়ের মত এগিয়ে এসে আক্ষেপে আছড়ে পড়া আবার দূরে সরে চলে যাওয়া। সবকিছুর ভেতর ওর একটা সুন্দর অশান্ত ছন্দ আছে, যে কোন শিল্পীর মনকে তা নাড়া দিয়ে যাবেই। দেবন অভিভূত হয়, সে ভাবে প্রেমার অন্তর ঐ দিগন্ত ছুঁয়ে থাকা সমুদ্রের মতই প্রসারিত।

দেবনের চিঠিখানা হাতে নিয়ে প্রেমা ভাবছিল ফেলে আসা কলাকেন্দ্রমের দিনগুলোর কথা।

হঠাৎ তার মনে হল, দেবন কি যে কোন নারী সম্বন্ধেই নিস্পৃহ! প্রেমা যেমন করে তার অবসর মুহূর্তগুলো ভরে তোলে দেবনের ভাবনায়, দেবনও কি তেমনি করে ভাবে না তার কথা। হয়ত ভাবে হয়ত ভাবে না। শিল্পী কি তার চারদিকের চলমান চঞ্চল জীবন সম্বন্ধে একেবারে নিরাসক্ত থাকতে পারে! সে দ্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে জীবনকে দেখে দেখে যায়, আর স্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে তাকে রূপ দিয়ে চলে। দেবনকে তার মনে হয় বিরল উপাদানে গড়া বিশ্বকর্মার সৃষ্টির একটি বিস্ময়কর ব্যতিক্রম।

প্রেমা ভাবল, দেবন কখনো কাছে আসে না সে দূরে থেকেই আকর্ষণ করে। চন্দ্রের মত সে দূর আকাশে থেকে সমুদ্রকে টানতে থাকে। তাই সমুদ্র উচ্ছ্বাসে উত্তাল হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই নিষ্ঠুর আকর্ষণকারীকে না পেয়ে আক্ষেপ ভেঙে পড়ে বেলাভূমিতে।

ঘরের ভেতর জলতরঙ্গের শব্দ তুলে বেলটা বেজে উঠতেই প্রেমার ধ্যান ভাঙল। সে মাথা থেকে চিরুণীটা টেনে নিয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিল।

প্রেমা দরজা খুলতেই ঝড়ো হাওয়ার মত একটা উচ্ছ্বাস ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। মিঃ পিল্লাই দুখানা হাতই প্রেমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, হ্যাললো কনগ্র্যাটস, প্রেমা তুমি অসাধ্য সাধন করেছ। জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কারটা সবার চোখের সামনে থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ। ওঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি কম হয়েছিল, একবার দেবনের দিকে পাল্লা ঝোলে তো আবার প্রেমা মেননের দিকে। সুধা আয়েঙ্গারের ভারতনাটাম পারফরমেন্সের প্রশংসায়ও কেউ কেউ পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষ অব্দি কেরালার বিউটি কুইন, ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট প্রেমা মেননের মাথাতেই জয়ের মুকুটটা উঠল।

প্রেমা শান্ত গাম্ভীর্যে বলল, বসুন আসছি।

আড়ালে বেসিনের চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। চোখ থেকে ক্রমাগত গড়িয়ে আসছে জলের ধারা। বেসিনের হাতভরা জলেও ঐ ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলকে ধুয়ে মুছে ফেলা যাচ্ছে না। এ জল উত্তাপে শুকোয় না, জলেও ধুয়ে যায় না। আশ্চর্য এর প্রবাহ।

আলতো করে তোয়ালেতে মুখখানা মুছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল প্রেমা। জয়ী হলে মানুষ সুখী হয় কিন্তু এমন সুখও আছে যা পরাজয়ের ভেতর দিয়ে আসে। সেই সুখই প্রেমা পেতে চেয়েছিল। দেবনের কাছে হার হলে সে মনে মনে তার সমস্ত কৃতজ্ঞতা উজাড় করে দিত বিচারকদের উদ্দেশে। শাস্ত্রে বলে, পুত্র আর শিষ্যের কাছ থেকে পরাজয় গৌরবের। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা জানেন না ভালবাসার জনের কাছে হেরে গেলেও কি অসীম তৃপ্তি আর গর্বে মনটা ভরে ওঠে।

প্রেমা এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে। মুখে একটুখানি হাসির রেখা টেনে বলল, পুরস্কারটা কিন্তু আমার প্রাপ্য নয়।

মিঃ পিল্লাই শক্ খেয়ে যেন সোফায় উঠে বসলেন। বললেন, এ কথা কেন প্রেমা! সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে তুমি জয়ী হয়েছে। এ ব্যাপারে কারো কিছু বলার নেই।

প্রেমার ঠোঁটের সূক্ষ্ম হাসিটা রহস্যময় হয়ে উঠল। সে বলল, পুরস্কার পাবার ব্যাপারে সত্যি করে বলুন তো আপনার হাত ছিল কতখানি?

লোকটি যেন হকচকিয়ে গেল। কি বললে প্রেমা খুশি হবে, আর কি বললেই বা প্রেমার একটুখানি করুণা সে পেতে পারবে তাই ভাবতে গিয়ে অনেকখানি সময় চলে যায় পিল্লাই-এর।

আমতা আমতা করে বললেন, জন্মভূমি পত্রিকাই তোমার প্রথম নাচের পাবলিসিটি দিয়েছিল। তাই তোমাকে আমরা আমাদের আপনজন বলেই ভাবি। এক্ষেত্রে নিজের মানুষের জন্যে যতটুকু করা দরকার, তাই করা হয়েছে। আর দেখ, তুমি যদি পঙ্গু হতে তাহলে নিশ্চয় বিধাতাপুরুষ ছাড়া কেউ তোমাকে গিরি লঙঘনের কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসত না।

প্রেমা ছোট করে বলল, বুঝলাম, এখন বলুন কি আনাব, হার্ড না সফ্‌ট?

পিল্লাই চেঁচিয়ে উঠলেন, এতবড় একটা খবর বয়ে আনার পুরস্কার তুমি শীতল অভ্যর্থনায় দিতে চাও প্রেমা!

প্রেমা বেল বাজাল। বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই প্রেমা মিঃ পিল্লাইকে বলল, আপনার জন্যে রাম, জিন, হুইস্কির কোনটা আনাব বলুন?

তুমি?

প্রেমা বলল, আমার বিয়ার।

মিঃ পিল্লাই বললেন, আজ আর আলাদা করে দূরে সরিয়ে দিও না প্রেমা। একই পানীয়ে আমাদের কণ্ঠ নীল হোক।

বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

ড্রিঙ্কের ভেতরে কথা হচ্ছিল। মিঃ পিল্লাই বললেন, জন্মভূমি পত্রিকায় তোমার বাবার যে শেয়ার ছিল তা আমি বেচে দেবার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলাম, তাই না?

সে জন্যে আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ মিঃ পিল্লাই।

কৃতজ্ঞতার কথা নয় প্রেমা। আমি বলতে চাইছি সেই থেকে তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয়।

প্রেমা বলল, জন্মভূমি আমাকে অনেক দিয়েছে। টাকা যেমন পেয়েছি, পাবলিসিটিও পেয়েছি তেমনি। পুরো পাতা জুড়ে এমন করে আমার নাচের ছবিগুলো আর কোন পত্রিকায় ছাপে নি।

মিঃ পিল্লাই-এর গলায় আবেগ, যে সামান্য একজন রিপোর্টার সবকিছুর আড়ালে থেকে নীরবে কাজ করে গেল তাকে কি কোন দিন একটুখানি কৃপার চোখে দেখতে ইচ্ছে হয় না তোমার?

একথা বলে আমাকে ছোট করে দিচ্ছেন মিঃ পিল্লাই। আপনি আমাদের পরিবারের শ্রদ্ধেয় বন্ধু।

আবেগে মিঃ পিল্লাই প্রেমার একখানা হাত চেপে ধরলেন। বললেন, শ্রদ্ধেয় কথাটা উইথড্র করতে হবে। আমার সঙ্গে কি তোমার শ্রদ্ধার সম্পর্ক প্রেমা? আমি কি তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুগোষ্ঠীর একজন হতে পারি না?

খিলখিল করে হেসে উঠল প্রেমা। বলল, অন্তরঙ্গ বন্ধু আমার মতে একজনই হতে পারে, বাকী সব বন্ধু।

মিঃ পিল্লাই বললেন, একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর পদ আমি পাব, এমন দুরাশা আমার নেই, তবে আলোতে ঝাঁপিয়ে পড়ার অধিকার বুঝি সব পতঙ্গেরই আছে।

আবার হাসল প্রেমা। বলল, আপনি বেশ নাটক করে কথা বলতে পারেন। যারা নাটক দেখতে ভালবাসে তারা আপনাকে দারুণ রকম পছন্দ করে ফেলবে।

চুপ করে গেলেন পিল্লাই। মানুষটা আহত হয়েছে ভেবে প্রেমা তাকে খুশি করার জন্যে তার গ্লাসে বেশ খানিকটা বিয়ার ঢেলে দিল।

পিল্লাই বললেন, বিশ্বাস কর প্রেমা, জীবনে কারো কোন ক্ষতি করেছি বলে আমার মনে পড়ে না। আমার সামর্থ্য মত সাহায্যের চেষ্টা করেছি মানুষের। কিন্তু আঘাত ছাড়া কোন দিন কোন পুরস্কার পাইনি।

প্রেমার মনটা হঠাৎ তার দ্বিগুণ বয়েসী মানুষটার ওপর নরম হয়ে উঠল। সে বলল, আমার কথায় যদি কোন রকম আঘাত আপনি পেয়ে থাকেন তাহলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি মিঃ পিল্লাই।

আবার পিল্লাই গ্লাসটা নামিয়ে রেখে হাত ধরলেন প্রেমার। বললেন, তোমাকে ভালবাসতে খুব ইচ্ছে করে প্রেমা, কিন্তু ভালবাসা কারু হৃদয় থেকে জোর করে তো আদায় করে নেওয়া যায় না।

প্রেমা বলল, বিশ্বাস করুন আপনাকে এই মুহূর্তে আমার খুব ভাল লাগছে। কেন জানেন, ইনিয়ে বিনিয়ে ঢেকেঢুকে আপনি কথা বলতে জানেন না। মনের কথা খুব সোজা করে বলতে পারেন।

মিঃ পিল্লাই বললেন, প্রেমা, আমি এও জানি আমার এমন কোন যোগ্যতা নেই যে আমি প্রেমা মেননের মত তরুণীর সান্নিধ্য পেতে পারি। তবু ভয়ানক একটা দুরাশার হাত থেকে তো নিষ্কৃতি পাই না। তাই নিশ্চিত পাব না জেনেও তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারছি কই।

প্রেমা বলল, আপনার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে?

মিঃ পিল্লাই কিছু সময় চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর গেলাসের সবটুকু পানীয় গলায় ঢেলে দিয়ে গ্লাসটা দূরে সরিয়ে রেখে বললেন, বড় দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়ে ফেললে প্রেমা। আমি আমার জীবনের ঐ অংশটার ওপর কালো পর্দা ফেলে রেখেছিলাম।

প্রেমা সঙ্গে সঙ্গে বলল, ক্ষমা করবেন, কৌতূহলটা আমার খুব সামান্যই ছিল, তাতে আপনার আহত কোন একটা জায়গায় ঘা লাগবে ভাবতে পারি নি। আপনার পারিবারিক প্রসঙ্গ ছেড়ে এখন আমরা অন্য প্রসঙ্গে আসতে পারি।

না, তা পার না—গলায় ভারী একটা আওয়াজ তুললেন মিঃ পিল্লাই। বললেন, প্রশ্নের হাওয়ায় যখন কালো পর্দাটা একবার উড়েছে তখন সবটুকু দেখে নাও প্রেমা।

প্রেমা বলল, বিশ্বাস করুন, আমি বিশেষ কোনকিছু না ভেবেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, এখন আমার খুব খারাপ লাগছে। মানে, আমি অস্বস্তি বোধ করছি।

থাক তাহলে, তবে আমি কথাটা বলতে পারলে কিছুটা হাল্কা হতে পারতাম।

প্রেমা বলল, আপনি যদি আমার কাছে বলে শান্তি পান তাহলে শুনতে আমার একটুও আপত্তি নেই।

পিল্লাই বললেন, কথাটা কিছু বিচিত্র নয়। ঘটনা চরিত্র সবই সাধারণ।

একটু থেমে হাসলেন পিল্লাই। রোজ আমার চারদিকের চরিত্র আর ঘটনাগুলোকে নিয়ে খবর তৈরি করেছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি একদিন আমি নিজেই খবর হতে চলেছি।

প্রেমা টেবিলের ওপর কনুই ঠুকে গালে হাত দিয়ে চেয়ে রইল মিঃ পিল্লাই-এর মুখের দিকে।

পিল্লাই বললেন, আমার স্ত্রী সুন্দরী বলে কোন দিনই আমি তাকে বন্দী করে রাখার ফিকির খুঁজিনি। আমি সব মানুষের মনের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলাম। আমাকে অফিসের কাজ নিয়ে এখানে ওখানে রোজ ঘুরে বেড়াতে হত, তাই স্ত্রীর মুখোমুখি বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকার সময় হত না আমার।

প্রেমা কথার মাঝেই বলল, আপনার স্ত্রী এ নিয়ে অনুযোগ করতেন না?

বিয়ের প্রথম দু-তিনটে বছর জোর অনুযোগ আর কান্নাকাটি করত। আমি তাকে আর এমনটি হবে না বলে কথা দিতাম কিন্তু আমার সেসব কথার কানাকড়ি দাম ছিল না। কথা দেওয়াটা ছিল যেন কথা ভাঙার জন্যেই।

প্রেমা বলল, কেন এমনটা করতেন?

কাজটা আমার এমনিতেই অফিস ঘরের বাইরে, তার উপর উন্নতি করার নিদারুণ একটা আগ্রহে অফিস দূর দুর্গমের যেখানে পাঠাতে চাইত সেখানেই বিনা প্রতিবাদে চলে যেতাম। চাকরীতে উন্নতি হবে, ভাল করে সংসার গড়ে তুলব এই ভাবনায় প্রথম জীবনে খুব খেটে গেছি।

আবার একটু থেমে বললেন, মিস মেনন একটু বিরক্ত করব?

—বলুন বলুন।

হুইস্কি একটা আনালে হয় না?

ও সিয়োর—বলেই প্রেমা উঠে দাঁড়িয়ে বেল বাজাল।

বেয়ারা এল, অর্ডার নিয়ে সার্ভ করে গেল। পিল্লাই-এর অনুরোধে মেননকেও ভাগ বসাতে হল।

পিল্লাই বলতে লাগলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে একটা পরিবর্তন দেখলাম আমার স্ত্রীর ভেতর। সে আর কান্নাকাটি তো করছেই না, বরং আমার কাজকর্মের খোঁজ-খবর নিচ্ছে। উন্নতির জন্যে আমি কোন রাস্তায় দৌড়-ঝাঁপ করছি সে সম্বন্ধে শলাপরামর্শ করছে।

ওর মন শান্ত হয়েছে, ও কঠিন সংসারটাকে বুঝতে শিখছে দেখে আমি অনেকখানি আশ্বস্ত হলাম। আরও বাড়তি উৎসাহ পেয়ে কাজকর্মে জোর মন দিলাম। বল প্রেমা স্ত্রী সহযোগিতা করলে কোন স্বামী না কাজে প্রেরণা পায়।

প্রেমা হাতের তেলোতে রাখা মুখখানা একবার সমর্থনের ভঙ্গিতে নাচাল।

পিল্লাই বললেন, বিয়ের পঞ্চম বার্ষিকীর দিনটিতে আমি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরব মনে

করেছিলাম কিন্তু কাজের চাপে পারলাম না। ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল মিড-নাইট। একগুচ্ছ গোলাপ আগে-ভাগে আনিয়ে রেখেছিলাম, তাই নিয়ে ঘরে গেলাম। বাইরে থেকে কয়েকবার কলিং বেল টিপেও সাড়া পাওয়া গেল না। আমার কোয়ার্টারে পার্ট টাইম কাজের একটা মেয়ে আসত। সে চলে গেলে সারা সময় আমার স্ত্রী একাই থাকত। ভাবলাম অনেক রাত, বেচারা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ভুল ভাঙল হঠাৎ দরজার গায়ে হাত ঠেকতে। দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ ছিল না, কেউ নিঃশব্দে ভেজিয়ে রেখে বেরিয়ে গেছে।

বুঝতেই পারছ প্রেমা তখন আমার মানসিক অবস্থা কি রকম। কোন খুনী নিঃশব্দে এসে হয়ত ভয়ঙ্কর কিছু অঘটন ঘটিয়ে গেছে। আমার সারা শরীর কাঁপছিল। হাতের ফুল পড়ে গেল মেঝেতে। আমি দৌড়ে ঢুকে গেলাম আমার শোবার ঘরে।

আলো জ্বলছিল। বেড লাইট। চারদিকে ছায়া-ছায়া একটা ভাব, শুধু বিছানার ওপর এক টুকরো হলুদ আলো একটা পেতলের থালার মত পড়ে আছে। তার তলায় এক চিলতে কাগজ। তার ওপর আমার স্ত্রীর হাতের ঘড়িটা চাপা দেওয়া আছে। আমি প্রথম বিবাহ বার্ষিকীতে ঐ ঘড়িটা আমার স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিলাম।

তাড়াতাড়ি কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলাম। না, কোন খুনী আমার স্ত্রীকে হত্যা করে ফেলে রেখে যায় নি, আমার স্ত্রীই এক বিস্ময়কর খুনীর ভূমিকায় অভিনয় করে গেছে।

প্রেমা সোজা হয়ে উঠে বসে বলল, কি রকম?

পিল্লাই করুণ হেসে বললেন, আমার স্ত্রী লিখেছে : এই দিনটিতে তোমার বাড়িতে ঢুকেছিলাম, আবার ঠিক এই বিশেষ দিনটিতেই তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যার সঙ্গে যাচ্ছি, তাকে তুমি চিনবে না। পুরো একটি বছর ম্যাটিনি শোতে মানুষটা তার কাজকর্ম ফেলে আমাকে সঙ্গ দিয়েছে। তার নিষ্ঠার কাছে আমাকে হার মানতে হল। তোমার দেওয়া ঘড়িটার কোন পয় ছিল না, কারণ ওটা তোমাকে একটি দিনও ঠিক সময়ে ঘরে টেনে আনতে পারে নি। তাই ঐ অপয়া বস্তুটাকে আর সঙ্গে নিলাম না।

থামলেন মিঃ পিল্লাই। মদের ঝোঁকে হা-হা করে ফাটিয়ে একবার হেসে উঠেই থেমে গেলেন। গভীর নিস্তব্ধতায় ঘরটা থম থম করতে লাগল।

প্রেমা বলল, কিছু মনে করবেন না মিঃ পিল্লাই, দোষটা পুরোপুরি আপনার স্ত্রীর নয়।

পিল্লাই বললেন, সদ্য সদ্য আঘাতটা বুকে বড় বেজেছিল, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম এ আঘাত আমার স্ত্রী ইচ্ছে করে দেয় নি। আমার ঠিক ঠিক প্রাপ্যটুকু সে আমাকে দিয়ে গেছে।

প্রেমা কৌতূহলী হল, তাঁর খোঁজ আপনি আর করেননি?

পিল্লাই হেসে বললেন, কত সন্ধান করে করে আমি জন্মভূমির পাতায় খবর পরিবেশন করি কিন্তু নিজেকে নিয়ে আর খবর তৈরি করতে ইচ্ছে হল না। তবে গোপনে সন্ধান নিয়েছিলাম। লোকটার অবস্থা আদপেই সচ্ছল নয়। চিঠি দিয়ে আমার পলাতকা স্ত্রীকে জানিয়েছিলাম, সে নিশ্চিন্তে ঘর করতে পারে, আমি তাকে কোন দিক থেকেই জ্বালাব না। আর এও লিখেছিলাম, দরকার হলে সে যেন আমার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিতে দ্বিধা না করে।

প্রেমা বলল, আমি নিশ্চিত বলতে পারি আপনার স্ত্রী আপনার কাছ থেকে আর কোন দিন সাহায্য চাননি।

একেবারে নির্ভুল অনুমান। দেখছি মেয়েরাই মেয়েদের মনের কথা জানতে পারে।

প্রেমা বলল, সেটাই তো স্বাভাবিক।

পিল্লাই বললেন, জান প্রেমা মেয়েটিকে কষ্ট দিয়েছিলাম বলে আজও ভুলতে পারি নি।

প্রেমা হঠাৎ বলল, এখনও কি তাঁর খোঁজ রাখেন?

মিঃ পিল্লাই কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনা হয়ে গেলেন। এক সময় বললেন, মেয়েটি স্বামীকে বড় বেশি কাছে পেতে চাইত, তাই ভদ্রলোক মারা যাবার আগে তাঁর স্ত্রীকে চার-চারটে বছর ধরে উদয়াস্ত সঙ্গ দিয়েছিলেন।

প্রেমার গলায় ঔৎসুক্য, কি রকম?

পিল্লাই বললেন, ভদ্রলোক চার বছর প্যারালিসিসে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। আর স্ত্রী সেবা করেছে রাত্রিদিন।

ওঁদের কোন ইসু নেই?

পিল্লাই বললেন, একটি মেয়ে। কারো জন্যেই কিছু রেখে যেতে পারেননি ভদ্রলোক। রাখার মত রেস্ত ছিল না তাঁর। শেষেরদিকে স্ত্রীই সংসার চালিয়েছে বাদাম ছাড়ানোর সামান্য কাজ করে। কখনো বা দড়ি পাকিয়ে মার্কেটে বিক্রি করে এসেছে।

প্রেমা বলল, উনি কিন্তু মহিলা হিসেবে ভাল বলেই মনে হচ্ছে!

পিল্লাই যেন প্রেমাকে চমকে দিয়ে বলে উঠলেন, দস্তুর মত ভাল।

প্রেমা পাল্টা প্রশ্ন করে বসল, আপনি কি করে জানলেন?

স্বামী মারা যাওয়ার বছর খানেক পরে একদিন ওর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ওর অবস্থা দেখে দুঃখ জানিয়ে বলেছিলাম, সব ভুলে তুমি মেয়েকে নিয়ে এসো আমার কাছে। ও ঘরে আজও নতুন কেউ আসেনি।

ও কথাটা শুনে অবাক হয়ে বলেছিল, সে কি কথা, এতখানি অবস্থা ফেরালে আর এতদিনে বউ একটা জোটাতে পারলে না।

আমি হেসে বলেছিলাম, বোধহয় ভাগ্যে নেই। সকলের তো সবকিছু সয় না।

ও অমনি বলে উঠেছিল, তাহলে আবার আমাকে ডাক দেওয়া কেন, তার চেয়ে আমাকে আমার মত করে থাকতে দাও।

আমি ওর মেয়েটাকে মাসে মাসে কিছু দিতে চেয়েছিলাম, ও তাও নেয় নি। বলেছিল, শরীরে এখনও শক্তি আছে, কাজটাজ করে চালিয়ে নিতে পারব। আর আমার মেয়েকে লেখাপড়া শেখাব না, তাহলে তোমাদের মত বর পেতে চাইবে। তার পরিণতিটা তো তোমার জানা। তার চেয়ে মেয়ে মূর্খ থেকে দিন-মজুরের কাজ শিখুক—বিয়ে করুক একটা খেটে-খাওয়া মানুষকে—সুখী হবে।

আমি আর কোন কথা বলতে পারি নি প্রেমা। সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। আসার সময় মা মেয়ের অগোচরে আমার স্ত্রীকে দেওয়া ঘড়িটা ওদের বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। প্রতিদিন ভাবতাম ঘড়িটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে ও হয়ত একবার আসবে, কিন্তু ও আর আসে নি।

অনেকক্ষণ দুজনে বসে রইল চুপচাপ। হুইস্কির বোতলটা এক সময় নিঃশেষে ঢেলে নিয়ে কয়েক চুমুকে শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ পিল্লাই। প্রেমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, আজ তোমার ঘরে আমার প্রবেশ ও প্রস্থানের নাটকটুকুকে বেমালুম ভুলে গেলে খুশী হব প্রেমা।

প্রেমা উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মিঃ পিল্লাই-এর দুটো হাত ধরে বলল, আপনি আমার বন্ধু মিঃ পিল্লাই। যে বন্ধুত্বে সময়ের সীমা অথবা বয়সের বেড়া নেই। শুধু প্রয়োজনের দিনে নয় অপ্রয়োজনে অসময়েও আমার দরজা খোলা থাকবে আপনার জন্যে।

মিঃ পিল্লাই প্রেমা মেননের মোমের মত নরম দুটো হাত নিজের মুঠোয় ভরে নিয়ে একটু চাপ দিলেন। পরে মুঠোটা হাল্কা করে দিয়ে বললেন, প্রেমা আবেগপ্রবণতা মানুষের একটা ধর্ম কিন্তু ঐ ইমোশানকে সংযত করার ভেতরই রয়েছে শ্রী। বিশটা বছর আগে আজকের প্রেমা মেনন যদি আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াত তাহলে দেহ আর মনের যে বিপ্লব ঘটে যেতে পারত তা আজ আর সম্ভব নয়। আমি জানি তেমন কিছু যদি এই মুহূর্তে ঘটেও যায় তাহলেও তা স্থায়ী হবে না। কারণ সেটা ঘটবে তোমার অস্থায়ী একটা ভাবপ্রবণতার ওপর।

হাতটা ধীরে ধীরে ছেড়ে দিয়ে মিঃ পিল্লাই হেসে বললেন, কারণে-অকারণে আসব তোমার কাছে, বন্ধু হয়েই আসব কিন্তু সঙ্গী হতে নয়, সাহায্যকারী বন্ধু হিসেবে আর তাতেই আমার সুখ প্রেমা। এর বেশি কিছু ভাবনা আজ আর আমার দিক থেকে নেই।

মিঃ পিল্লাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দিন শেষের যে আলোটুকু জানালা দিয়ে এসে পড়ে সমস্ত পটভূমিকে দৃশ্যমান করে রেখেছিল তা ধীরে ধীরে সরে গিয়ে ঘরখানিকে আবছায়ায় ভরে দিয়ে গেল। প্রেমা আলো জ্বালবার কোন চেষ্টাই করল না। কোচের ওপর সমস্ত শরীরটাকে ভেঙে হাতের পাতায়

গাল রেখে চুপচাপ পড়ে রইল। চুলগুলো এলোমেলো ভাবনার মত পিঠ বেয়ে, বুক উপচে লুটোতে লাগল। সংসার জীবনে ব্যর্থ একটি প্রৌঢ় মানুষের জন্য এক পুষ্পিত তরুণীর মনে কোথা থেকে বর্ষার মেঘ ঘনিয়ে উঠল।

জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাজানো মঞ্চে আলোর প্লাবনের ভেতর যখন সাদা নেরিয়দখানা পরে এসে দাঁড়াল প্রেমা তখন করতালি ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহের বাতাস আলোড়িত!

প্রেমা নত হয়ে দর্শকদেব নমস্কার জানাতে আবার উঠল করতালি ধ্বনি।

প্রেমা ছন্দিত চরণ ফেলে এগিয়ে গেল সভা পরিচালকের হাত থেকে পুরস্কার নিতে। আশ্চর্য সদৃশ একটি ছবি ফুটে উঠেছিল রসজ্ঞ দর্শকদের মনের ওপর। যেন সোয়ান লেকে বিচরণ করছে রাজহংসী আনা পাভলোভা।

ঘনঘন উত্তপ্ত করতালিতে অভিনন্দিত হতে লাগল নর্তকী প্রেমা মেনন।

কিছু বলার জন্য অনুরুদ্ধ হল প্রেমা। জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আহ্বান জানালেন। সলজ্জ একটি বিহ্বলতা খেলা করে গেল প্রেমার চোখে-মুখে। মুহূর্তমাত্র। রাজহংসী এবার তার সুন্দর গ্রীবাটি তুলে মাইকের সামনে মুখ নামিয়ে দাঁড়াল।

নাচের একটা ছন্দ আছে, সে ছন্দের সঙ্গে আমার আজন্মের পরিচয়। কিন্তু কথার যে ছন্দ আছে, তার সঙ্গে পরিচয় তো আমার নিবিড় নয়! তাই সাজিয়ে সুন্দর করে কথা বলার শক্তি যদি আমি না পাই তাহলে আপনারা আমাকে এ ব্যাপারে অপটু ভেবে ক্ষমা করবেন।

সমুদ্র মন্থনের কাহিনীটি আপনাদের কারু অজানা নয়। দেবতা আর অসুরে মিলে মহাসমুদ্র মন্থন করেছিল অমৃতের আশায়। অমৃত হল সেই বস্তু যাকে লাভ করলে জীবের পার্থিব আর কিছু প্রার্থনা থাকে না। সমস্ত জীবনকে পূর্ণ আর তৃপ্ত করে দেয় একবিন্দু অমৃত।

এখন বাসুকীনাগের রজ্জু ধরে ছন্দের লীলায় মন্দার দণ্ডকে ঘোরাতে ঘোরাতে সবশেষে দেবতা আর অসুরে মিলে তুলল অমৃত। যে অমৃত নিয়ে তারা এত শ্রম করল, তাই নিয়ে লাগল বিবাদ। শেষে মহাবিষ্ণু এলেন মোহিনীমূর্তি ধরে। সমস্ত বিবদমান দর্শকদের তাঁর নৃত্যছন্দে মোহাবিষ্ট করে হরণ করে নিয়ে গেলেন অমৃতকুম্ভ। যারা অমৃতের যথার্থ দাবীদার তারা কিন্তু পেল না অমৃতের স্বাদ।

আমার পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারটিকে আমি ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে অনুরোধ করি। আপনাদেব সামনে যারা নৃত্য পরিবেশন করে গেলেন, তাঁরা কিন্তু তাঁদের সাধনার ফলস্বরূপ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কারটি পেলেন না। আমি বিনা সাধনা আর শ্রমে নাচের যাদুতে ভুলিয়ে পুরস্কারটি হরণ করে নিয়ে গেলাম।

তাই আজ সবিনয়ে আমার অগ্রজ শিল্পীদের জানাই, এ মহামূল্য রত্নের অধিকারী তাঁরা সকলেই, আমি শুধু ভাণ্ডারী হয়েই রইলাম।

করতালি আর অভিনন্দন কুড়োতে কুড়োতে প্রেমা মঞ্চের আড়ালে চলে গেল।

অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আর একটি সংবাদ ঘোষণা করলেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ এক-একজন শিল্পী আমন্ত্রিত হবেন দিল্লীর দরবারে। সেখানে তাঁরা সরকারি মহামান্য অতিথির সামনে পরিবেশন করবেন নৃত্য। সর্বভারতীয় বার্তাজীবী সঙঘ আবার এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পীকে নির্বাচন ও পুরস্কৃত করবেন। বলা বাহুল্য আমাদের কেরালার উদীয়মান তারকা মিস মেননও দিল্লীর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তাঁর শক্তির স্বাক্ষর রাখবেন।

দিল্লীর অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। একটি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে যে শিল্পী সে কথকগুরু অনন্ত মহারাজের শিষ্যা কনক পাণ্ডে।

মাধবী আম্মা উপস্থিত ছিলেন আসরে। গুরু পাণিক্কর, অনন্ত মহারাজ, গোপীকান্ত দাস, গুরু শ্রীনিবাসন, সকলেই ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি।

বিচারের সময় বার্তাজীবীরা ভোট দিলেন, কিন্তু সভার কাজ চালাবার দায়িত্ব দেওয়া হল মাধবী

আম্মার ওপর।

আশ্চর্যভাবে অ্যাসোসিয়েশান-মেম্বারদের ভোট দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। গণনায় সমান সমান ভোট পেল প্রেমা মেনন আর কনক পাণ্ডে ! এখন সমস্যার সমাধান করবেন সভা পরিচালিকা। কাস্টিং ভোট তাঁর হাতে। মাধবী আম্মা নির্দ্বিধায় কনক পাণ্ডের অনুকূলে তাঁর ভোটটি দিয়ে দিলেন।

কনক পাণ্ডে উঠে এল আলোকিত মঞ্চে। মাধবী আম্মা নিজের হাতে তার মাথায় পরিয়ে দিলেন বিজয়ীর রৌপ্য মুকুট।

করতালি ধ্বনি উঠল প্রেক্ষাগৃহে।

বার্তাজীবী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবার মঞ্চে আহ্বান কবলেন প্রেমা মেননকে।

প্রেমা সামনে বসেই কনক পাণ্ডের পুরস্কার নেবার সময় করতালি দিচ্ছিল। সভাপতির ডাকে একটু অবাক হল সে। আসন ছেড়ে লাল কার্পেট মোড়া সিঁড়ির ওপর পা ফেলে উঠে এসে দাঁড়াল মঞ্চে।

আশ্চর্য! প্রেমার মঞ্চে উপস্থিতিই একটা চাঞ্চল্য এনে দিল সারা প্রেক্ষাগৃহে। সেই গ্রীক ভাস্কর্যের একটি অবিস্মরণীয় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে প্রেমা। দর্শকেরা স্বতঃস্ফূর্ত করতালিতে অভিনন্দিত করছে সেই মূর্তিকে।

সভাপতি বললেন, বার্তাজীবী সঙঘ মনে করেন কত্থক নৃত্যশিল্পী মিস কনক পাণ্ডে আর মোহিনী আট্যম শিল্পী মিস প্রেমা মেনন এই অনুষ্ঠানের যুগ্ম বিজয়ী। কারণ তাঁরা সমান সংখ্যক ভোট পেয়েছেন নির্বাচন অনুষ্ঠানে। অবশ্য সভাপরিচালিকার কাস্টিং ভোটটি গিয়েছে মিস পাণ্ডের অনুকূলে। তাই বিজয়ীর মুকুট তিনিই লাভ করেছেন।

আমরা এই সর্বকনিষ্ঠা অথচ অসাধারণ প্রতিশ্রুতিময়ী শিল্পীকে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে চাই। আমরা শিল্পীকে আমাদের স্মারক চিহ্নরূপে রূপার নূপুর জোড়া উপহার দেবার অঙ্গীকার করছি।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার করল প্রেমা। উচ্ছ্বাসে করতালিধ্বনিতে প্রেক্ষামঞ্চ যেন ফেটে পড়ল।

অঝোরে কাঁদছিল প্রেমা। বুকের সবটুকু ব্যথা নিঃশেষে উজাড় করে দিচ্ছিল সে। নিঃসঙ্গ ঘরে একা বিছানায় লুটিয়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাসে ভরে তুলছিল বাতাস।

ঈর্ষা নয়, ক্ষোভ নয়, জীবনে প্রথম পরাভবের একটা ব্যথা। তিলে তিলে সন্তানের ভাবনায় তদ্‌গত জননী প্রথম প্রসবে প্রাণহীন শিশুর মুখ দেখলে যেমন ভেঙে পড়ে শোকে ঠিক তেমনি এক প্রতিকারহীন শোকের ঢেউ উঠে আসছিল প্রেমার বুক ঠেলে।

বাইরে কেউ প্রেমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ঘরের ভেতরে দু-দুবার মিষ্টি আওয়াজ তুলে বেলটা বেজে উঠছে।

প্রেমা উঠে দাঁড়িয়ে ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে নিজেকে একটু স্বাভাকি করে নেবার চেষ্টা করল।

দরজা খুলতেই ঢুকলেন মাধবী আম্মা। ঢুকেই প্রেমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। প্রেমা মাথাটা নীচু করল, তারপর চিরদিনের অভ্যেস মত এগিয়ে গিয়ে মাধবী আম্মার জানু স্পর্শ করল। মাধবী আম্মা প্রেমার মাথায় হাত রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রেমার রুদ্ধ চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। প্রেমা নতজানু হয়ে বসে মাধবী আম্মার দুই জানুর ভেতর মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

মাধবী আম্মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, জীবনে হেরে যাবারও দরকার আছে প্রেমা। পরাজয়ের দুঃখকে না জানলে জয়ের আনন্দকে ঠিকমত বোঝা যায় না। সবে তো জীবনের শুরু হল। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হতে হবে। ঐ আঘাত সইবার শক্তি যখন আসবে তখনই শুরু হবে সত্যিকার জয়যাত্রা। উঠে দাঁড়াও, তুমি তো জান, আমি হতাশাকে কখনও প্রশ্রয় দিই না।

প্রেমা উঠে দাঁড়াল। মাধবী আম্মা বললেন, কি বিচ্ছিরি মুখের চেহারা হয়েছে কেঁদে কেঁদে। চুলগুলো খড়কুটোর মত ঝড়ো হাওয়ায় উড়ছে। যাও, মুখে জল দিয়ে এসো। চিরুনীটা দাও আমার হাতে।

চিরগম্ভীর প্রশান্ত মুখ মাধবী আম্মার। সুখে দুঃখে অচঞ্চল মূর্তি। প্রেমা বাধ্য শিশুর মত হাত-মুখ

ধুয়ে এসে বসল মাধবী আম্মার সামনে। মাধবী আম্মা চুল বাঁধতে লাগলেন। ঠিক যেমনটি করতেন প্রেমার কৈশোর আর তারুণ্যের দিনগুলিতে।

চুল বাঁধা শেষ হলে বললেন, ঘুরে বস আমার দিকে।

প্রেমা একেবারে বাধ্য মেয়েটি। মাধবী আম্মার দিকে ফিরে বসল সে। নিটোল সুন্দর মুখখানা বৃষ্টি শেষের প্রকৃতির মত শান্ত নিশ্চুপ। মাধবী আম্মা প্রেমার চাপা থুতনীতে হাত দিয়ে নীচু মুখখানা তুলে ধরতেই মেঘভাঙা এক টুকরো আলো সে মুখে ঝিলিক দিয়ে উঠল।

মাধবী আম্মা বললেন, তোমার মুখে মেঘরৌদ্রের খেলা প্রেমা। তুমি জীবনে অবিমিশ্র সুখ পাবে না, অফুরন্ত ভালবাসা পাবে মানুষের।

প্রেমা বলল, আশীর্বাদ করুন যেন তাই পাই। সুখী না হতে পারলে আমার ভাগ্য বলে মেনে নেব, কিন্তু ভালবাসাটুকু আমার চাই।

মাধবী আম্মা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ অনুষ্ঠানের শেষে কত্থকগুরু অনন্ত মহারাজ স্টেজের ওপর এসেছিলেন। এসেই বললেন, আপনি আপনার ছাত্রীর ওপর সুবিচার করেন নি। ও অনেক বড় শিল্পী। কনকের অনুশীলন প্রশংসার দাবী রাখে ঠিক কিন্তু প্রেমার আত্মপ্রকাশ বড় মনোহর। এমন তদ্‌গত শিল্পী আমার এতখানি বয়সে আমি খুব কম দেখেছি।

পাশে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা একবাক্যে ওঁকে সমর্থন করলেন।

আমি বললাম, গুরু মহারাজ, আপনি কি আশা করেছিলেন আমি আমার ছাত্রীকে ভোটটা দিয়ে দেব! না আপনি যদি আমার আসনে বসতেন তাহলে কনককে ভোটটা দিয়ে দিতেন?

আমি প্রেমার ছোটখাট ত্রুটিগুলো জানি, তাই ভোট দেবার সময় সেগুলোই আমার চিন্তায় এসেছে। ওর যা গুণ সে তো ওর অধিকারে রইলই আর ওর ত্রুটির জন্যে এই হারটুকু ওকে মেনে নিতে হল। আপনার আন্তরিক আশীর্বাদের কথা প্রেমাকে আমি বলব।

একটু থেমে বললেন, ভারতের শ্রেষ্ঠ গুরুরা একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন প্রেমা। তোমার উচিত ছিল তাঁদের চরণবন্দনা করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করে নেওয়া।

প্রেমা বলল, আমি তা করেছি আম্মা। একমাত্র গুরু অনন্ত মহারাজ উঠে চলে গিয়েছিলেন বলে তাঁকে আমি পাইনি।

মাধবী আম্মা বললেন, আমি আবার আশীর্বাদ করে যাচ্ছি প্রেমা, তুমি হয়ত জীবনে দুঃখ পাবে, কিন্তু তোমার মত কোন শিল্পী এত ভালবাসা পাবে কিনা সন্দেহ।

মাধবী আম্মা চলে গেলেন। একটা বিষণ্ণ বেদনার গুরুভার প্রেমার বুক থেকে নেমে গেল। প্রেমার মনে হল তার সারা শরীরটা যেন লঘু হয়ে গেছে। সে প্যাড টেনে নিয়ে খুব সরস হাল্কা ভঙ্গিতে অনুষ্ঠানের ফিরিস্তি দিয়ে সরিতাকে একখানা চিঠি লিখতে বসল।

লেখা কিন্তু কয়েক ছত্র এগিয়েই থেমে গেল। বাইরে কেউ প্রতীক্ষা করছেন। ঘরের ঘণ্টা বেজে উঠে প্রেমাকে তা জানিয়ে দিল।

প্রেমা আবার উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল।

হোটেলের বেয়ারা হাতে একখানা কার্ড ধরিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রেমা কার্ডে চোখ বুলিয়ে দেখল, দেরাদুনের লালসিয়া স্টেটের এক কুমার বাহাদুর তার দর্শন প্রার্থী। নাম জয়কিষণ গর্গ।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে চকিতে সময়টা দেখে নিল প্রেমা। নটা বেজে সাঁইত্রিশ। এখনও অপরিচিতের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সময় পেরিয়ে যায়নি।

বেয়ারাকে পৌঁছে দিয়ে যেতে বলে প্রেমা সরে গেল ড্রেসিং টেবিলের কাছে। নিজের সারা শরীরটার ওপর দিয়ে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। টিপয়ের কাছে এসে ফুলদানির ফুলগুলো ঠিকঠাক করল। বুক সেলফ থেকে টেনে নিল একটি পত্রিকার স্পেশাল ইসু, 'মোহিনী আট্যম'। সোফায় বিশেষ ভঙ্গিতে বসে ধীরে ধীরে পাতা ওল্টাতে লাগল।

দরজা খোলা, শুধু গ্লাস-ডোরটা ভেজান। বই-এর ওপর দিয়ে প্রেমার চোখ মাঝে মাঝে নাচের

উল্লোকিত মুদ্রায় দরজার ওপর গিয়ে পড়ছিল আবার ফিরে আসছিল। ভোমরা একবার ফুলের ওপর বসছিল আবার উড়ে গিয়ে চারদিকে চক্কর দিয়ে যথাস্থানে ফিরে আসছিল।

জুতোর শব্দ দূর থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কয়েকটি পায়ের সম্মেলক আওয়াজ বলে মনে হল। দরজার কাছে এসে থেমে গেল শব্দ। কয়েক মুহূর্ত। বইটি একহাতে ধরে উঠে দাঁড়াল প্রেমা। কি আশ্চর্য! তার সামনে কে যেন একটা গ্লাস পেইন্টিং করে রেখে গেছে।

একটি বছর দশেকের মেয়ে বুকে একটা ফুলের বাঞ্চ ধরে রেখেছে। দুধের মত সাদা একটা কন্টেনার। তার থেকে উঁকি দিচ্ছে ভারমেলিয়ান রেড আর ইয়োলো কয়েকটা গ্ল্যাডিওলাস। তাকে সাজান হয়েছে তারার মত কটি জিপসি আর লেডি লেস দিয়ে। ইতস্ততঃ ফারের সবুজ পাতা ছড়ান।

মেয়েটি পিঙ্ক একটা ফ্রক পরে শোকেসের ভারী আকর্ষণীয় পুতুলের মত স্থির হয়ে আছে। আর ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে সুপুরুষ এক ভদ্রলোক। ধবধবে সাদা চুড়িদারের ওপর গলাবন্ধ একটা মুগা রঙের আচকান। সকলের চোখ প্রেমার ওপর।

প্রেমা হাতের বইটা রেখে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ওকে এগিয়ে যেতে দেখে বেয়ারা গ্লাস ডোরটা ওপন করে ধরে রইল।

প্রেমাকে নড করে ওরা ঢুকে এল ওর ঘরে। মৃদু হাসিতে প্রত্যাভিবাদন জানাল প্রেমা।

বেয়ারা দুটো দরজাই ভেজিয়ে রেখে চলে গেল।

মেয়েটি সুন্দর কন্টেনারসহ ফুলের বাঞ্চ এগিয়ে দিল প্রেমার দিকে। প্রেমা একমুখ হেসে ধন্যবাদ জানিয়ে ধরে নিল উপহার। বেড সংলগ্ন বুক সেলফের ওপর রাখল যত্ন করে। হাত দেখিয়ে বসতে বলতেই ওরা সোফায় বসল।

প্রেমা কুমারবাহাদুরের দিকে চেয়ে বলল, জাস্ট আ মিনিট প্লীজ।

বলেই প্রেমা ঘরের কোণে গিয়ে নীলাভ একটা জলভরা জাগ নিয়ে এসে ফুলের কন্টেনারের ভেতর খানিকটা জল ঢেলে দিল। মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল, তোমার যাবার সময় ভাসটা আমি প্যাক করে দেব।

কিশোরী মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে সুন্দর ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, ও নো নো আনটি, ওটা তোমার জন্যেই এনেছি।

কুমার বাহাদুর ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। প্রেমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, ঐ ভাসটি আমার বাবা ইন্দ্রনারায়ণ জাপান থেকে এনেছিলেন। দেখুন ওর গায়ে জাপানি পেইন্টিং।

প্রেমা কাঁধটা বেঁকিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল। একটা ডালে চেরিফুল আর তার পাশেই ছোট্ট একটা ভাঙা ডালে সোনালী রঙের লেজঝোলা একটা পাখি।

প্রেমা এক ঝলকে মুখটাকে আগন্তুকদের দিকে ফিরিয়ে বলল, ওয়ান্ডারফুল।

এগিয়ে এসে আবার ওদের বসতে অনুরোধ করল। ওরা বসলে প্রেমা বসতে গিয়েও বসল না। উঠে দাঁড়িয়ে বেলটা বাজাল।

বলল, কফিতে আশাকরি আপত্তি থাকবে না?

কুমারবাহাদুর ঈষৎ মাথা নীচু করে হাসলেন।

আর তুমি কি খাবে বল? আচ্ছা আইসক্রিম আনাই।

কুমার জয়কিষণ বললেন, ওটা ওর খুবই প্রিয়।

বেয়ারা এল। অর্ডার নিয়ে সার্ভ করে চলে গেল। ওরা কথা বলতে লাগল।

প্রথমেই প্রেমা বলল, কি নাম তোমার?

মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। বলল, শ্রাবন্তী গর্গ।

বলেই বাবার দিকে চেয়ে হাসল।

প্রেমা বলল, হাসলে যে, নিশ্চয়ই আর একটা কিছু নাম আছে তোমার?

কুমারবাহাদুর বললেন, দোলন। ওর মায়ের দেওয়া নাম। উনি বাঙালী ছিলেন।

প্রেমার একটু চমক লাগল। ও কথাটা ঠিকমত অনুধাবন করতে পারেনি এমনি একটা ভাব দেখিয়ে

বলল, ওঁকে সঙ্গে আনলে খুশী হতাম।

জয়কিষণের কমনীয় ব্যক্তিত্বে ভরা মুখখানার ওপর হঠাৎ ছায়া ঘনিয়ে উঠল। নিজেকে মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললেন, উনি আজ চার বছর মারা গেছেন।

প্রেমা বলল, ওহ্, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, ক্ষমা করবেন।

কুমার জয়কিষণ বললেন, আমার মেয়ে আপনার কাছে আজ একটি অনুরোধ জানাতে এসেছে। জানি না আপনার সম্মতি পাব কিনা।

বলুন।

দোলনই কথা বলল, আপনাকে এ বছর আমাদের উৎসবে আসতে হবে আনটি। আপনার নাচ আমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছে।

প্রেমা কিশোরী দোলনের মুখে তার নাচের প্রশংসা শুনে খুশী হল। সে বুঝল নাচটা কেবল এই ছোট মেয়েটিরই ভাল লাগেনি, কুমারবাহাদুরেরও ভাল লেগেছে।

প্রেমা বলল, কিসের উৎসব তোমাদের? আমি তো দেরাদুনের দিকে কখনো যাইনি।

এবার কথা বললেন কুমার জয়কিষণ, ওর মা বাংলা দেশের মেয়ে ছিলেন। বিশেষ খানদানি পরিবারের মেয়ে। ক্ল্যাসিক্যাল গান আর নাচের শিক্ষা পেয়েছিলেন নামকরা গুরুদের কাছ থেকে। আমাদের পরিবারের একটি শাখা বহুপূর্বে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা বিরাট জমিদারী পত্তন করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে এই পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। একসময় আমি আর আমার বাবা বাংলাদেশে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে পরিচিত হই। সেই যোগসূত্রেই একটা বৈবাহিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। কিন্তু আমার বিয়ের দু বছর পরে বাবা মারা যান আর ঠিক সাত বছর যেতে না যেতেই দোলন তার মাকে হারায়।

কুমার জয়কিষণ একটু থামলেন। সম্ভবত কুমারবাহাদুর নিজেকে একটুখানি স্বাভাবিক করে নেবার চেষ্টা করলেন। তাছাড়া অপরিচিতার সামনে অতিরিক্ত কিছু বলে ফেলে হয়ত অস্বস্তি বোধ করলেন তিনি।

প্রেমা বলল, আমি আমার গুরু মাধবী আম্মার মুখে বাংলার বিখ্যাত নর্তকী মেনকা দেবীর কথা শুনেছি। তাঁর সোলো, ডুয়েট, গ্রুপ ডান্স আর ব্যালে ছিল দারুণ আকর্ষণীয়। কৃষ্ণলীলা, দেববিজয় নৃত্য, মেনকা লাস্যম, মালবিকাগ্নিমিত্র প্রভৃতি নাচের ভেতর দিয়ে তিনি সারা ভারত এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আলোড়ন তুলেছিলেন। শুনেছি বার্লিনে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ব্যালে অলিম্পিয়াতে সতেরটি বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তিনিও তাঁর নিজের গ্রুপটি নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। তিন তিনটে প্রাইজ ছিনিয়ে এনেছিলেন তিনি।

মাধবী আম্মা বলতেন, যদিও মেনকাদেবী লক্ষ্ণৌ ঘরানার কত্থকে স্পেশালাইজ করেছিলেন তবু তিনি ভারতনাট্যম কথাকলি আর মণিপুরী শিখেছিলেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তাঁর ব্যালেতে নাকি সবরকম নাচের আশ্চর্য সংমিশ্রণ থাকত।

একটু থেমে প্রেমা বলল, আপনার বাঙালী স্ত্রীর কথা বললেন তাই গুণী একজন বাঙালী নর্তকীর কথা মনে পড়ে গেল।

জয়কিষণ বললেন, না না আমার স্ত্রী এত বড় কিছু ছিলেন না তবে নাচ গান তিনি খুবই ভালবাসতেন। আমার লালসিয়া স্টেটের অরণ্য-নিবাসে একটি নাটমণ্ডপ তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে। তিনি সেখানে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর তাঁর পরিচিত শিল্পীদের রাস অথবা অন্য কোন সময়ে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন। কদিন নাচে-গানে মেতে থাকত আমার নির্জন অরণ্য-নিবাস।

সেই থেকে প্রতিবছর তাঁর স্মৃতিটুকু মনে রেখে আমি আর দোলন সামান্য উৎসবের আয়োজন করি। ভারতের এক একজন শ্রেষ্ঠ গুণীকে সম্মান জানাই সেই উৎসবে। তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর নৃত্য পরিবেশন করেন।

একটু থেমে বললেন কুমার জয়কিষণ, এবার দোলন আপনার নাচ দেখে বড় খুশী হয়েছে। সে

আপনাকে তার মায়ের স্মৃতি-মঞ্চে নিয়ে যাবার জন্যে আমার কাছে বায়না ধরেছে। আমি বলেছি তুমি নিজে গিয়ে তাঁর সম্মতি পেলে বসন্তের মধুরাসে তাঁকে আনাবার ব্যবস্থা করব।

প্রেমা চোখ দুটো ওদের ওপর থেকে সরিয়ে নিল নিজের দিকে। একটুখানি কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, বসন্ত রাসের আর বাকী কতদিন?

এখনও প্রায় দেড় মাস সময় রয়েছে।

প্রেমা চেয়ে দেখল, দোলন বড় বড় দুটো উৎসুক চোখের দৃষ্টি তার মুখের ওপর পেতে রেখেছে।

প্রেমা আর কিছু ভাবল না। সামান্য পরিচয়ের দ্বিধা ঐ সুন্দর মুখখানার দিকে চেয়ে দূর হয়ে গেল।

এবার হাত বাড়িয়ে দোলনকে কাছে টেনে এনে বলল, তুমি তোমার মায়ের স্মৃতিমঞ্চে নাচার জন্যে ডাকতে এসেছ, কেউ কি তোমার এ ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে!

প্রেমার সম্মতি পাবার সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে ভরে উঠল দোলনের মুখ। সে হঠাৎ প্রেমার হাতখানা তুলে চুমু খেয়ে বলল, আনটি তুমি দারুণ ভাল।

প্রেমা তাকে তার কোচের হাতলের ওপর টেনে বসিয়ে বলল, তুমি নাচ শেখনি?

জয়কিষণ বললেন, পাঁচ ছ'বছর যখন ওর বয়স তখন ওর মা-ই ওকে গান গেয়ে গেয়ে হাতে তালি দিয়ে নাচ শেখাতেন। সে নাচ বলতে পারেন ডলপুতুলের হাত-পা নাড়ার মত।

প্রেমা বলল, আমি আপনার ওখানে যাবার ব্যাপারে কারো সঙ্গে পরামর্শ না করে রাজি হয়ে গেলাম কেন জানেন? দোলনের মায়ের মত আমার মাও ছিলেন নর্তকী আর প্রায় দোলনের বয়সেই আমি আমার মাকে হারিয়েছিলাম।

কুমার জয়কিষণ বললেন, দোলনের ভাগ্যে শুভ যোগাযোগ বলতে হবে। না হলে আপনার মত শিল্পীকে এক কথায় কি করে পাওয়া গেল ভাবতেই পারছি না।

প্রেমা হেসে বলল, আমি আদপেই বড় শিল্পী নই। আমি এখনও শিক্ষার্থী। কথক আর মণিপুরী এখনও ভালমত রপ্ত করতে পারিনি। আমার মতে যে কোন বিষয়ের শ্রেষ্ঠ একজন শিল্পীর সব কটি ক্ল্যাসিক্যাল নাচের তালিম নেওয়া দরকার।

আমার স্ত্রীও কিন্তু আপনার মত একই কথা বলতেন। তিনি আরও একটি কথা বলতেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু লোকনৃত্যের দল আছে। তাদের নাচও লক্ষ্য করতে হবে। দেহের অনেক স্বাভাবিক মুভমেন্ট সেখান থেকে শেখা যায়।

প্রেমা বলল, আপনার স্ত্রী সত্যিকারের গুণী ছিলেন।

কুমারবাহাদুর অন্যমনস্ক হলেন। এক সময় ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, সাড়ে দশটা বাজে, আপনার বিশ্রামের অনেকখানি সময় নিয়ে নিলাম।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। পেনটা বের করে পকেট ডায়েরীর পাতায় লিখে নিলেন প্রেমার ঠিকানা। বললেন, আপনার সহযোগীদের নিয়ে আপনি আসুন। ত্রিবান্দ্রম থেকে প্লেনে আসতে পারবেন। দিল্লীতে আমার লোকেরা আপনাদের নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করবে। চিঠিতে আমি আপনাকে সবকিছু জানিয়ে দেব।

এবার নমস্কার করলেন কুমার বাহাদুর। প্রেমা প্রতিনমস্কার করল। দোলনের হাত ধরে দরজা অব্দি এগিয়ে গেল। ওরা বিদায় জানিয়ে চলে গেলে প্রেমা চিঠি লিখতে বসল সরিতাকে।

দুষ্টু সরিতা, কি করছিস এখন তুই? আমার কথা ভাবছিস নির্ঘাৎ। ভাবছিস লরেলটা আমার কপালেই জুটেছে। তাহলে ঐ ভেবেই বসে থাক। নারে ভাই একটুর জন্যে ফস্কে গেল। মাথার মুকুট মিলল না, বদলে পায়ের নূপুর পেলাম। বাড়ি গিয়ে বলার জন্যে সব তোলা রইল। আগামী কালের ফ্লাইটে মাদ্রাজ যাব। ওখানে যামিনী কৃষ্ণমূর্তি আর সুধা শেখরের কুচিপুদি নাচের প্রোগ্রাম আছে। চার পাঁচদিন ওখানে কাটিয়ে ফিরব।

হ্যাঁ আর একটা গ্রেট নিউজ আছে। একটু আগে দেরাদুনের লালসিয়া স্টেটের বিপত্নীক কুমারবাহাদুর তাঁর দশ বছরের মেয়েকে নিয়ে আমার সুইটে এসেছিলেন। তিনি আমাকে তার স্টেটের নাটমণ্ডপে নাচার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে গেলেন। নাচের কাল—বসন্ত। আহ্বায়ক—বিপত্নীক

রাজকুমার। স্থান—নির্জন অরণ্যনিবাসের মনোরম মঞ্চ।

এখন বল, মত না দিয়ে কি পারি? ভাবছি, শেষে আবার একটা না সাউন্ড অব মিউজিক হয়ে যায়।

এগারোটার ঘরে কাঁটা ছুঁই ছুঁই, কলম রাখছি। অনেক আদর রইল।

প্রেমা।

প্রেমা বলল, বল তুই কেন যাবি না?

সরিতা বলল, তোর সাউন্ড অব মিউজিকের নায়িকা কি তার ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়েছিল?

প্রেমা অনুনয়ের সুর গলায় তুলে বলল, প্লিজ সরিতা তুই ছাড়া সোম্মুকট্টু স্বরযতি বর্ণম্ পদম্ ইত্যাদি কে গাইবে বল? মাধবী আম্মাকে তো আর বলা যাবে না।

সরিতা বলল, তুই ক্ষেপেছিস, আমার পরীক্ষা না? অ্যানুয়াল পরীক্ষায় অ্যাবসেন্ট থাকলে প্রমোশান দেবে ভেবেছিস? প্রিন্সিপাল বড় কঠিন ঠাঁই।

প্রেমা এবার সত্যি চিন্তায় পড়ল। হঠাৎ এক সময় একটা বুদ্ধির জোনাকী ঝিলিক দিতেই সে বিছানার ওপর উঠে বসল।

আচ্ছা দেখ সরিতা তুই যদি একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিস অসুস্থ বলে।

সরিতা বিজ্ঞের মত বলল, অত সহজ নয় মশাই। বড় রোগের সার্টিফিকেট বড় কোন ডাক্তার দিতে চাইবেন না। দু-চার দিনের পেট কামড়ানো অথবা দাঁতে ব্যাথার সার্টিফিকেট মিললেও মিলতে পারে। কিন্তু তোমার যাওয়া আসা থাকা সব মিলিয়ে আমার তো মনে হয় খুব কম হলেও পনেরো দিনের এদিকে নয়। তারপর যদি কোন নাটক দৈবাৎ শুরু হয়ে যায় তাহলে তো সময়ের সীমা থাকবে না।

প্রেমা শুয়ে পড়ল। একটা চাদর গায়ের ওপর টেনে নিতে নিতে বলল, তুই একটা ওয়ার্থলেস সরিতা। ঘটে যদি এক ফোঁটা বুদ্ধি থাকে। একটা সামান্য উপায় বের করতে পারলি না।

সরিতা প্রেমার কথার ধারকাছ দিয়েও গেল না। সে হঠাৎ বলল, হাঁরে দিদি, কুমারবাহাদুরের স্ত্রী বাঙালী ছিলেন বললি না?

হ্যাঁ দারুণ গুণী মহিলা ছিলেন। নাচে-গানে ওস্তাদ।

সরিতা বলল, বাঙালীরা বড় গুণী হয় তাই নারে দিদি?

প্রেমা বলল, টেগোর নেতাজী স্বামীজী উদয়শঙ্কর রবিশঙ্কর এঁরা তো সব বাঙালী।

সরিতা বলল, বাস্তবিক একটা গুণীর জায়গা বটে। যদি কোনদিন বিয়ে করি তাহলে বুঝলি দিদি একটা বাঙালী দেখেই করব, কি বল?

প্রেমা বলল, তেমন তেমন পেলে করিস।

সরিতা অমনি বলল, তুই খুব ভাল দিদি।

প্রেমা এবার বিছানার ওপর উঠে বসে বলল, কি ব্যাপার বলত ? নতুন একটা জায়গায় ভি আই পি ট্যুর দেবার জন্যে ডাকলাম তোকে, রুচি হল না। পড়াশোনা ছেড়ে দেবার জন্যে রোজ যার বায়নাক্কা সে হঠাৎ অ্যানুয়াল পরীক্ষার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। তারপর বাঙালী বিয়ের জন্য আর্জি পেশ। সব ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে ঠেকছে। হাঁরে সরিতা সত্যি করে বল, প্রেমে পড়েছিস?কোন দারুণ ট্যালেন্টেড বাঙালী কি আমাদের কেরালায় এসেছেন? তোর সঙ্গে আলাপটালাপ হয়েছে নাকি রে?

মুষড়ে পড়ল সরিতা। তার ইন্দ্র এমন কিছু ট্যালেন্টেড নয়। সে তবু গলায় জোর এনে বলল, দেখ দিদি, সঙ্গী নির্বাচনে আমি ট্যালেন্টের চেয়ে সিনসিয়ারিটিতে বিশ্বাসী। প্রতিভা খুব বড় জিনিস, কিন্তু প্রতিভাবানের বউ হওয়া দারুণ একটা সুখের ব্যাপার নয়। লোকটাকে কোনদিনই একান্তে নিজের মত করে পাওয়া যাবে না। সেদিক থেকে বউয়ের ওপর টান আর কর্তব্যবোধ আছে এমন মানুষ আমার অনেক বেশি পছন্দ।

প্রেমা বলল, আমার নয়।
কেন?
চিরদিন প্রতিভার পুজো করে এসেছি বলে।
তোর কথাই আলাদা। হাজারটা মেয়ে তো আর প্রেমা মেনন নয়।
প্রেমা বলল, তা না, কথাটা হল, আমি কি নিয়ে থাকব। আমার নাচের শেষে যদি আমার স্বামী উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে আমার প্রাপ্য টাকা পয়সা বুঝে নিতে ব্যস্ত থাকে কিংবা আমার সাজপোশাক গোছগাছের কাজে লেগে যায় তাহলে কি রকম লাগবে বল তো? সাহায্যকারী হিসেবে হয়ত তাকে তারিফ করা যায় কিন্তু স্বামী হিসেবে পুরোপুরি তাকে মেনে নেওয়া যায় কি?
সরিতা বলল, আমি অতি সাধারণ তাই আমার সাদামাঠা একটা স্বামী হলেই চলবে। দুজনের মন বুঝে চলতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু অনেক উঁচু কিছু হলে তার দিকে তাকাতে গিয়ে পায়ে পায়ে হোঁচট খাবার সম্ভাবনা।
প্রেমা বলল, রাত অনেক হয়েছে, এদিকে আমাদের আজই বিয়ের কোন সম্ভাবনা নেই, অতএব স্বামী চিন্তা ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়।
তথাস্তু।
মুখে কথাটা বললেও মনে মনে বলল, নামেই শুধু প্রেমা, প্রেমে তো পড়নি বাছা, পড়লে বুঝতে এ ভাবনার জ্বালা কত! যদি ঘুম এসেও যায় তাহলে স্বপ্নেও সারারাত জাগিয়ে রাখবে।
পরের দিন প্রেমা গাড়ি করে বেরুতে যাচ্ছে, সরিতা বলল, যাচ্ছিস কোথায়?
এই একটুখানি ঘুরে আসছি হোটেলের দিক থেকে।
সরিতা বলল, এত সকালে হোটেলে গিয়ে করবি কি? জলখাবার তৈরি করছি, খেতে হবে না?
প্রেমা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, ম্যানেজারটিকে তো সৎ আর এফিসিয়েন্ট বলে মনে হয় তবু সব দিকে নজর না রাখলে ব্যবসা চলে না, সকালে একটা সারপ্রাইজ ভিজিট দেবার ইচ্ছে ছিল।
সরিতা মনে মনে বলল, তোমার মুণ্ডু। ইন্দ্র কাজপাগলা। সারপ্রাইজ ভিজিট দিয়ে তুমি তার ঘেঁচু করবে।
মুখে বলল, ঠিক বলেছিস, ম্যানেজারদের সব সময় নজরে রাখা ভাল।
প্রেমা বলল, ইন্দ্রকে আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগে। ও বেশ সমঝদার বলে মনে হয়।
সরিতা বলল, ভদ্রলোককে আমার তেমন কিছু একটা কেউকেটা বলে মনে হয় না। কেমন যেন ফিলজফার গোছের মুখের ভাবখানা।
মনে মনে সরিতা বলল, ওদিকে দয়া করে আর নজর দিও না। ও আমার একেবারে বশংবদ গোবেচারা। তুমি দিদি প্রতিভাবানদের নিয়ে থাক।
প্রেমা বলল, তোর বড় নাক উঁচু দেখছি সরিতা। মনের মত মানুষ না পেলে তখন দুঃখ পাবি।
দুঃখ কপালে লেখা থাকলে খণ্ডায় কে বল? এই যে দেখ না, কাল রাতে তোকে যাব না বলে দিলাম আজ সকালে উঠে দেখি, মনটা ভার হয়ে আছে। তাই মনের দুঃখ দূর করতে ঠিক করলাম, তোর সঙ্গেই যাব।
প্রেমা বলল, পাগলামি রাখ, তোর না পরীক্ষা সামনে। পরীক্ষা ফাঁকি দিয়ে সঙ্গে যাবি ভেবেছিস।
তুইও কি ভেবেছিস ঐ বিপত্নীক লোকটার খপ্পরে তোকে একা ফেলে দিয়ে আমি শান্তি পাব।
প্রেমা খুব একচোট হেসে নিয়ে বলল, খেতে দিবি তো চল, মুরুব্বিয়ানা রাখ।
খেতে বসে প্রেমা বলল, গানের লোকের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।
কি রকম?
লীলাবতী অনেক দিন থেকে আমার সঙ্গে যেতে চাইছিল। বেচারাকে সব সময়েই অ্যাভয়েড করেছি। এখন নিজের গরজেই ওকে ডাক দিয়েছি।
সরিতা বলল, ইতিমধ্যেই ডাক-হাঁক হয়ে গেছে। রাজী আছে লীলাবতী?
এক পায়ে খাড়া।

সরিতা বলল, দুর্ভাবনা একটা গেল। ওর কব্জিতে জোর আছে, বুদ্ধিতেও লীলা আছে।

প্রেমা বলল, প্রফেসাররা তোর কথা শুনে নম্বর দেয় না?

সরিতা অমনি বলল, যেমন তোর সুন্দর মুখ দেখে প্রফেসাররা নম্বর দিত।

প্রেমা হেসে ফেলে বলল, তোর মুখখানা কিন্তু অনেক সুন্দব সরিতা। আমার চেয়েও সুন্দর।

সরিতা গম্ভীর হয়ে বলল, বিশ্বকর্মা তোকে গোল্ড প্লেটিং করে ছেড়েছে আর আমি ছটপটে বলে এক পোঁচ কালো রঙ মাখিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। নইলে মুখখানা এমন কিছু একটা খারাপ ছিল না।

নীচের থেকে কাজের মেয়েটি ওপরে উঠে এসে বলল, হোটেল থেকে ম্যানেজার সাহেব এসেছেন! বড় মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান।

প্রেমা অমনি বলল, ওপরে নিয়ে এসো।

মেয়েটি চলে যেতেই সরিতা ফোঁস করে উঠল, তোর আর কাজ নেই, ওকে অমনি ওপরে এনে ফেললি। প্রাইভেসি বলতে কিছু রাখলি না।

প্রেমা বলল, সারা রাত বাঙালী বন্দনা করলি এখন আবার হল কি রে?

উত্তর দেবার আর সুযোগ পেল না সরিতা। ইন্দ্রের জুতোর আওয়াজ এগিয়ে আসছে।

ইন্দ্র ঘরে ঢুকতেই সরিতা সরে গেল।

প্রেমা বলল, আসুন, আমিই হোটেলে যাব ভেবেছিলাম।

ইন্দ্র একখানা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, আপনি পরশু এসেছেন তাই না?

পরশু দুপুরের ফ্লাইটে।

ইন্দ্র বলল, আপনার সঙ্গে যে আইরিশ নভেলিস্ট এসেছিলেন তিনি এখন আমাদেরই হোটেলের সুইট নাম্বার নাইনে আছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

প্রেমা বলল, একই প্লেনে আসার সময় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে আমার হোটেলের কথাও জেনেছিলেন। কিন্তু তাঁর তো প্যালেস হোটেলে ওঠার কথা ছিল।

ইন্দ্র বলল, প্রথমে তিনি প্যালেস হোটেলে গিয়েছিলেন, কারণ ওখানে ওঁর রুম বুক করা ছিল। তারপর একরাত কাটিয়ে কাল এসে উঠেছেন আমাদের হোটেলে।

প্রেমা বলল, লেখক মানুষ, একটু নজর রাখবেন ওঁর সুখ-সুবিধের ওপর। আমাদের কেরালার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা নভেল লিখতে চান।

ইন্দ্র বলল, অবশ্যই। শিল্পী. লেখকদের এসব প্রাপ্য। বিশেষ করে বিদেশীদের সুখ-সুবিধের ওপর হোটেলের সকলেরই সজাগ দৃষ্টি থাকে।

প্রেমা বলল, আমি খানিক পরেই যাচ্ছি হোটেলে, ওঁকে বলে দেবেন।

ইন্দ্র উঠে দাঁড়াতেই প্রেমা বলল, আরে বসুন, উঠছেন কেন! আপনার কাছে গেলে কত ভাল কফি খাওয়ান, আমাদের এখান থেকে না হয় একটু চলনসই কফিই খেয়ে গেলেন।

ইন্দ্র আবার বসল। হেসে বলল, দুটো ঘরই আপনার। এক জায়গায় অনেক দিন থাকলে মুখেরও স্বাদ থাকে না, তখন ঘর বদলালে স্বাদও বদলে যায়।

সরিতা ঘরে ঢুকল ট্রেতে কফি আর কেক নিয়ে।

টিপয়ের উপর ট্রে রেখে কফির কাপ ইন্দ্রের হাতে তুলে দিয়ে বলল, নিন, আমরা এখুনি ব্রেকফাস্ট করেছি।

সরিতা একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

প্রেমা বলল, জানেন মিঃ রায় সরিতা আপনাদের খুব প্রশংসা করছিল।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে ইন্দ্র বলল, আমাদের মানে?

বাঙালীদের প্রতিভার।

ইন্দ্র দরাজ হাসি হেসে বলল, তাই বলুন। আমি ভাবলাম বুঝি আমার মত অভাজনের প্রশংসা করেছেন।

প্রেমা বলল, নিজেকে এমন লুকিয়ে রাখছেনই বা কেন? কে বলতে পারে আপনার ভেতর সে

প্রতিভা নেই।

ইন্দ্র বলল, আমি কি আপনাদের কাজে কোন গাফিলতি করেছি মিস মেনন?

প্রেমা চমকে উঠল, এ কথা কেন?

ইন্দ্র বলল, এই যে আপনি সকাল বেলা আমাকে নিয়ে মজা শুরু করলেন।

বিশ্বাস করুন, আমি কৌতুক করার জন্যে বলিনি। একেবারে সহজ সরলভাবে বলেছি।

ইন্দ্র খালি খালি কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে দেখে সরিতা বলল, কেকটা টেস্ট করে দেখুন, একধারে সরিয়ে রাখলেন যে।

প্রেমা বলল, ও আপনাকে এমন করে সাধছে কেন বলুন তো?

ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বলল, নিজের হাতের তৈরি বলে।

প্রেমা সরিতার দিকে চেয়ে বলল, দেখলি তো জিনিয়াস কাকে বলে।

ইন্দ্র কেকটা হাতে তুলে বলল, এমন করে প্রশংসা শুরু করলেন, যাতে কেকটাকে ভাল বলতেই হয়।

সরিতা ফোঁস করে উঠল, তা কেন, ভাল না লাগলে মুখের ওপর বলবেন।

ইন্দ্র হাসতে হাসতে বলল, জিনিয়াসের কুলুপ যে আগেই এঁটে দিয়েছেন মুখে। খারাপ সমালোচনার পথই বন্ধ।

প্রেমা বলল, কথাটা আমি উইথড্র করছি। আপনার কোন রকম প্রতিভাই নেই। এখন আশা করি খুশী হয়ে আমার বোনের তৈরি কেকটা খেয়ে যথাযথ মন্তব্যই করবেন।

ইন্দ্র কেকে কামড় দিয়ে টেস্ট করল। সঙ্গে সঙ্গে বলল, সত্যি সুন্দর হয়েছে। বিশ্বাস করুন একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

প্রেমা সরিতার দিকে চেয়ে বলল, তাহলে মিঃ রায়কে একদিন ইনভাইট করে তোর পাকা হাতের রান্নার পরিচয় দিয়ে দে।

সরিতা বলল, থাম বাপু, পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপর যত খুশি রান্না করে তোমাদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালাব।

ইন্দ্র আর প্রেমা সরিতার কথায় এক সঙ্গে হেসে উঠল।

নীল শাড়ির ওপর হীরে সেট করা একটা কণ্ঠহার। ঝিকমিক ঝলমল করে উঠেছে। আরব সাগরের নীল জলে তেমনি সূর্যের হীরে ঝলকাচ্ছে। যদ্দূর দেখা যায় তীর জুড়ে সবুজ নারকেল গাছের সারি। খানিকটা হাঁসুলী-বাঁক নিয়েছে বেলাভূমি। ঢেউয়ের পরিত্যক্ত ফেনাগুলো ধবধবে রুপোর মত মনে হচ্ছে। একটু আগে পাল তোলা কটা ভাল্লম সমুদ্র চষে কূলে এসে ভিড়েছিল। জেলেরা সেগুলো ডাঙায় তুলে বালির জমীনে কাৎ করে রেখে গেছে। কালো কালো জাল ঝেড়ে অনেক রুপোলী মাছ কুড়িয়েছিল ওরা, এখন কোথাও কোন চাঞ্চল্য নেই। কয়েকটা নারকেল গাছের জটলার ছায়ায় বড় বড় পাথরের স্তূপ। নির্জন। বেশ খানিকটা উঁচুতে জায়গাটার অবস্থান। তাই নীচ থেকে নারকেল কুঞ্জে ঘেরা জায়গাটা কারো চোখে না পড়লেও ওপর থেকে নীচের সব কিছুই দেখা যায়।

ওরা সেই সকাল থেকে সমুদ্রের জীবনপ্রবাহ দেখছিল। ডেভিড প্রেমার কোলের ওপর ম্যাসনাইটের একটা টুকরো ফেলে লেখার টেবিল বানিয়ে ছোট ছোট কথার স্কেচ বানাচ্ছিল। ধারে ধারে খেয়ালখুশির পেন-স্কেচও চলছিল। কতকটা সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যের মত। ঘটনার কথাচিত্রের পাশে গতিশীল ভাবোদ্যোতক সব রেখাচিত্র। বড় উপন্যাসের জন্য উপাদান সঞ্চয়। লেখকের রেখাচিত্রের হাতটিও বেশ সচ্ছন্দ।

আজ চারদিন প্রেমার গাড়ি ঔপন্যাসিক ডেভিড জোনসের তথ্য সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত। আশ্চর্য একটা খেলার নেশায় মেতে উঠেছে প্রেমা। ডেভিড নিমন্ত্রিত হয়ে গেছে প্রেমার কেটেডমে। সেখানে হল ঘরে সন্ধ্যায় সরিতার গানের সঙ্গে নেচেছে প্রেমা। অবাক হয়ে ডেভিড দেখেছে প্রেমার নাচ। কি আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা আর মাধুর্য। দেহ সঞ্চালনে দুর্বার এক আমন্ত্রণ ডেভিডকে নিষিদ্ধ রাজ্যে প্রবেশের

জন্য বারবার প্রলুব্ধ করেছে।

ডেভিড বলেছে, প্রেমা, তুমি আমার নায়িকা। ঐ ঢেউয়ের ওপর ট্রপিক্যাল কান্ট্রির সূর্যের তীব্র তীক্ষ্ণ খেলার মত তোমার নাচের ছন্দ। এখানে প্রকৃতি সমুদ্র, নদী, নারিকেল অরণ্য, মানুষ সবার ভেতর আশ্চর্য নাচের লীলা। তুমি এই অবাক পৃথিবীর মধ্যমণি হয়ে থাকবে আমার নভেলে।

প্রেমা কোন কথা বলেনি। সে মোহিনী মুদ্রায় ঘন পল্লবিত চোখের দৃষ্টি হেনে সুন্দর হাসি উপহার দিয়েছে ডেভিডকে।

চারটি দিনের নিবিড় সান্নিধ্যে সময়ের সীমা হারিয়েছে ওরা।

এখন একটা। প্রেমার কোলে ফেলে রাখা ম্যাসনাইটের ওপর সাদা খাতার পাতায় ডেভিডের লেখা চলেছে। হাতের কনুই ছুঁয়ে আছে প্রেমার নিটোল জানুদেশ। একটি বলিষ্ঠ তদ্‌গত পুরুষের স্পর্শ প্রেমাকে কখনো চঞ্চল করে তুলছে কখনো বা এলোমেলো স্বপ্ন রচনার প্রেরণা এনে দিচ্ছে। মগ্ন লেখকের মুখের প্রতিটি ভাবান্তর মুগ্ধ আগ্রহে লক্ষ্য করছে প্রেমা।

ডেভিডের লেখা এক সময় থেমে গেল। খাতাখানা তুলে নিয়ে ডেভিড তার ব্যাগে যত্ন করে ভরে নিল। প্রেমার কোল থেকে ম্যাসনাইটের ছোট্ট বোর্ডটা তুলে নিয়ে ডেভিড বলল, এ এক আশ্চর্য আবিষ্কার প্রেমা।

প্রেমা বলল, কিসের আবিষ্কার ডেভিড ?

মানুষের আর তার চারদিকের প্রকৃতির। কত যুগ ধরে কত মানুষ নতুন জনপদ আবিষ্কার করছে, কত লুপ্ত নগরীর রহস্যময় অস্তিত্বের সন্ধান লাভ করছে, কিন্তু আমার মনে হয় এই সরল সবুজ নারিকেল গাছের নির্জনে এই যে প্রেমা নামের তরুণীটি বসে আছে, তাকে আবিষ্কার করার মত বিস্ময় আর কিছুতে নেই।

প্রেমা ঝর্নার মত হাসি ঝরিয়ে বলল, আমি এতক্ষণ আমার কোলের ওপর তোমার লেখার সরঞ্জাম রেখেছিলাম, তাই এ পুরস্কার?

ডেভিড বলল, লেখক যদি মালটিমিলিওনীয়ার হত তাহলে তার তৈরি প্রতিটি চরিত্রকে সোনার মুকুট পরিয়ে পুরস্কৃত করত।

প্রেমা বলল, কেন তা হবে, তারা তো লেখকেরই সৃষ্টি। পুরস্কার যদি কারু প্রাপ্য হয় তাহলে তা একমাত্র লেখকের।

তুমি ভুল করছ প্রেমা, ডেভিড বলে উঠল। মা বাবার সম্ভোগ থেকে জন্ম নিল যারা, তারা কিন্তু একসময় পৃথক হয়ে পড়ে। লেখকের অনুভূতিও ঠিক তাই। তার চিন্তার থেকে যে চরিত্রেরা ভূমিষ্ঠ হল তারা একসময় লেখকের ভাবনার রাজ্য থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। তাই লেখক যখন একান্তে বসে তাঁর নিজের লেখা পড়তে থাকেন, তখন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে আবিষ্ট করে তোলে। মা বাবার অন্তরে আনন্দ দেবার জন্যে সন্তান যেমন পুরস্কৃত হয়, ঠিক তেমনি লেখকের চরিত্রাবলী লেখকের অন্তরের পুরস্কার বার বার পেয়ে থাকে।

প্রেমা বলল, তোমার এ নতুন উপন্যাসে আমাকে নায়িকার চরিত্রে চিত্রিত করে যদি তুমি সফল হও ডেভিড তাহলে তোমার সৃষ্টি হিসেবে নিশ্চিত আমারও একটা পুরস্কার জুটবে।

ডেভিড বলল, নিশ্চিত, কিন্তু কি পুরস্কার তুমি চাও প্রেমা?

প্রেমা বলল, তোমার নিভৃত অবসরে যখন তুমি সম্পূর্ণ উপন্যাসটি পাঠকের মন নিয়ে পড়বে তখন যদি এই মালাবার উপকূলের মেয়েটিকে তোমার ভাল লাগে, তাহলে তাই হবে আমার বড় পুরস্কার।

শুধু এই প্রেমা, আর কিছু চাইবার নেই তোমার লেখকের কাছে, তোমার সামনেই লেখক। আগাম পুরস্কার তার হিরোইনের হাতে তুলে দেবার জন্যে সে তৈরি।

প্রেমা দুষ্টুমির চোখে ডেভিডের দিকে চেয়ে বলল, পুরস্কার তো চাইতে নেই ডেভিড। ওটা হল দাতার খুশীর দান। আর তাছাড়া বইয়ের চরিত্রেরা রক্তমাংসের জীব নয় যে তারা ইচ্ছে মত চেয়ে নেবে।

ডেভিড বলল, এখানেই তোমার ভুল প্রেমা। শক্তিমান স্রষ্টার হাতে যে চরিত্র জন্ম নেয় তারা

রক্তমাংসে গড়া মানুষের চেয়েও জীবন্ত আর উজ্জ্বল। সাধারণ মুখের লাবণ্য যেমন বাড়িয়ে দেয় পরিমিত প্রসাধন, তেমনি সাধারণ চরিত্রকে আরও সুন্দর করে তোলে লেখকের সজীব ভাবনার ছোঁয়া।

প্রেমা বলল, তুমি লেখক ডেভিড, আমি কেমন করে তোমার সঙ্গে কথায় এঁটে উঠতে পারব।

ডেভিড অমনি বলল, এসো তাহলে চুপচাপ বসে থাকি দুজনে। নারিকেল পাতার ঝালরের ঝিলমিল আর সমুদ্রের নীলে রোদের সোনার ঝিকমিক খেলা দেখি।

ডেভিড প্রেমার একখানা হাত নিজের দুহাতের পাতায় চেপে ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল।

প্রেমা বাধা দিল না। এক সময় সমুদ্রে হাওয়া দিল। হাওয়ার বেগ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। বেলাভূমির রুপোলী বালি উড়তে লাগল। ঢেউগুলো আছড়াতে লাগল গদাম গদাম আওয়াজ তুলে। নারকেল গাছের পাতায় তবলার বোলের মত চড়বড়িয়ে উঠল শব্দ তরঙ্গ। প্রেমার চূর্ণ চুল বার বার উড়ে এসে পড়তে লাগল মুখের ওপর। প্রেমা বাঁ হাতখানা দিয়ে সে চুল সরিয়ে দিল কিন্তু ডেভিডের হাতের মুঠোয় ধরে থাকা ডান হাতটা টেনে নিল না।

প্রেমা হঠাৎ বলল, আচ্ছা ডেভিড সাহিত্যে তুমি নগ্নতাকে স্বীকার কর?

নিশ্চয় করি, বলল ডেভিড।

প্রেমা অবাক হয়ে বলল, নগ্নতা অশ্লীলতা নয়?

ডেভিড জোরের সঙ্গে বলল, একটুও না। এই মুহূর্তে এই নির্জন পরিবেশে একটি তরুণী ধীবর কন্যা যদি সমুদ্র স্নান সেরে নগ্ন দেহে বেলাভূমিতে উঠে এসে দাঁড়ায় আর তার যুগল বাহু তুলে ভেজা চুলের রাশ সংস্কার করতে থাকে, তাহলে তার সেই নগ্ন রূপকে তুমি কি অশ্লীল বলবে প্রেমা? তার প্রসারিত বাহুতে রোদের সোনা মেখে সে যদি আশ্চর্য সুন্দর ভঙ্গিতে দেহটাকে দোলাতে থাকে তাহলে কি তোমার মালাবার উপকূলের সবুজ ঋজু ফলবান নারকেল বৃক্ষের দোলায়িত ছন্দের চেয়ে তাকে অসুন্দর মনে হবে? এর পরেও কথা আছে প্রেমা। নগ্নতা পরিস্থিতি আর পরিবেশ মেনে চলে। সুসজ্জিত মানুষের অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে আবার এ নগ্নতা মানায় না।

প্রেমা বলল, তোমার যুক্তিকে মেনে নিয়েও বলব ডেভিড, বহু আধুনিক উপন্যাসকার মন্ত্রের মত জপ করে চলেছেন এই নগ্নতাকে। নগ্নতার যথার্থ সৌন্দর্য কিভাবে ফোটানো যায় সে সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণা আছে বলে আমার মনে হয় না।

ডেভিড বলল, উদ্দেশ্য নিয়ে নগ্নতাকে ছড়ানোর ভেতর সুস্থ পাঠকের সমর্থন কোনদিনই থাকে না। সাধারণ পাঠক উত্তেজনার খোরাক হিসেবে ওগুলোকে গিলতে থাকে। কিছুদিন ওসব বই বেস্ট সেলার হয়ে লেখক আর প্রকাশকদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ফাঁপিয়ে তোলে, তারপর একদিন ফানুসের মত ওড়ার খেলা দেখাতে দেখাতে কোথায় উড়ে যায়।

প্রেমা বলল, দেহধর্মের ব্যাপারে আমার কোন গোঁড়ামী নেই ডেভিড। কিন্তু তাকে হাজার চোখের সামনে বিসদৃশ করে তুলতেই আমার আপত্তি। আমরা নাচের মুদ্রায় আমন্ত্রণ জানাই দর্শকদের কিন্তু তা আভাসে, ইঙ্গিতে, ইসারায়। ক্যাবারে নাচের নগ্নতার চেয়ে সে আমন্ত্রণ কম প্রলুব্ধ করে না। তবু বলব, তার ভেতর শিল্পের একটা শ্রী আছে।

ডেভিড বলল, ঠিক তোমাদের ইন্ডিয়ার মন্দিরে খোদাইমূর্তির মত। আমি খাজুরাহো আর কোণারকের মন্দির দেখে এসেছি। সেখানে দেহভঙ্গিমায় চূড়ান্ত নগ্নতা চোখে পড়েছে, কিন্তু মনের ওপর বিকারের কোন খেলা চলে নি, ভাস্করের সৃষ্টিকে বার বার সাধুবাদ জানিয়েছি।

প্রেমা তার দুহাত দিয়ে ডেভিডের দুটো হাত ধরে বলল, কি আশ্চর্য মিল হয়ে গেল তোমার আর আমার ভেতর।

ডেভিড প্রেমার হাত থেকে নিজের হাত মুক্ত করে নিয়ে প্রেমার কটি বেষ্টন করে বলল, আইরিশ সাগরের সঙ্গে মিলল আরব সাগরের ঢেউ, কি বল?

প্রেমা অর্থভরা চোখে তাকাল ডেভিডের মুখের দিকে। সে মুখের পাঠ পড়তে ডেভিডের একটুও দেরী হল না। সে গভীর আলিঙ্গনে প্রেমাকে জড়িয়ে ধরে আদরে আশ্লেষে ভরে দিতে লাগল।

যেখানে ডেভিড সেখানে প্রেমা। প্রেমার প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টের চালক কখনো ডেভিড কখনো বা প্রেমা নিজে।

গাড়ি এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল কোন এক নারকেল বাগানের সামনে। মেয়েরা ছোবড়া পিটিয়ে চলেছে। কাঠের কট্টুপিড়ি তালে তালে পড়ছে ছোবড়ার ওপর। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল ডেভিড। সবকিছুর ওপর তার ঔৎসুক্য। ডেভিডের প্রশ্ন ক্ষণে ক্ষণে, প্রেমার জবাবও সঙ্গে সঙ্গে।

কি করছে ওরা প্রেমা?

নারকেলের ছোবড়া পিটিয়ে ফাইবার সংগ্রহ করছে।

মেয়েদের পেছনে নারকেল গাছের বেষ্টনীর ভেতর একটা পুকুর। জলটা ঘন কালো হয়ে আছে। ডেভিড আঙুল দেখিয়ে বলল, ওখানে কি?

প্রেমা বলল, ওটা সমুদ্রের ব্যাকওয়াটার। ওকে আমাদের ভাষায় বলে কায়েল। ওর খানিক অংশ ঘিরে একটা নেট জলের ভেতর নামান হয়।

ডেভিড অমনি বলে, ঐ নেটকে তোমরা কি বল?

কায়ার ভাল্লম।

হ্যাঁ তারপর? প্রশ্ন করে ডেভিড।

প্রেমা বলে, ঐ কায়ার ভাল্লমের ওপর নারকেল পাতার ওলা বুনে তাতে নারকেলের ছোবড়া ফেলে দেওয়া হয়।

আবার প্রশ্ন, ঐ নারকেলের ছোবড়াকে তোমরা কি বল?

তোণ্ডু।

তোমাদের ঐ তোণ্ডু কতদিন জলের ভেতর থাকে?

প্রায় তিন মাস।

তিন মাস! জলের রং এজন্যেই বোধকরি পচে কাল হয়ে গেছে প্রেমা।

ঠিক তাই।

ডেভিড বলে, জল থেকে তুলে পেটাই-এর পর এর ফাইবারগুলো কোথায় যাবে?

তাট্টু মেশিনে। ওখানে ফাইবারগুলোকে রিফাইন করে নেওয়া হবে। ঐ রিফাইন নারকেল ছোবড়াকে বলে চাকিরি তুম্বু।

ছোট্ট ডায়েরীর পাতায় ডট পেন্সিলে ডেভিড নোট করতে থাকে। শব্দগুলো নোট করা শেষ হলে বলে, তারপর?

প্রেমা বলে, ঐ রিফাইন ফাইবারগুলো মেয়েরা পাট করে পেটের কাছে চেপে ধরে। তাবপর খানিক অংশ একটা মেশিনে ধরিয়ে দেয়। মেশিন ঘুরতে থাকে। ঐ মেশিনের চাকাকে বলে রাট। যদি দুটো সরু দড়িকে পাক দিয়ে মোটা করতে হয় তাহলে একটা কাঠের ছোট যন্ত্রের ভেতর ঐ দুটো দড়ি ভরে দিতে হয়। কখনো বা তিনটে দড়ি ভরে আরও মোটা করা হয়। ঐ যন্ত্রটাকে বলে চোং। মেয়েরা ঐ চোং হাতে ধরে পেছন দিকে পিছিয়ে যেতে থাকে। এবকম করেই দড়ি তৈরি হয়।

নোট নেওয়া হলে গাড়িতে ফিরে যায় ওরা।

ডেভিড গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করে, এই মেয়েদের দেখে ওদের আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল বলে তো মন হল না প্রেমা।

প্রেমা বলল, একটা নারকেলের ছোবড়াকে চার ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে বলে পলা। এমনি পঁচিশটা নারকেলে হয় একশো পলা। ঐ একশো পলা পিটিয়ে ফাইবার বের করলে মজুরী পায় এক টাকা। সারাদিনে আড়াই থেকে তিন টাকার বেশী রোজগার হয় না ওদের।

ডেভিড বলল, এত ইল পেইড এরা।

প্রেমা বলল, আমাদের দেশে আর্থিক সমৃদ্ধি কম, তাই সংগ্রাম বেশি। আমরা কঠিন পরিশ্রমের ভেতর দিয়ে দেশটাকে গড়তে চাইছি।

ডেভিড বলল, বিচিত্র দেশ তোমাদের প্রেমা। এক হাতে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছ, অন্য হাতে উৎসবের রোশনাই জ্বালছ।

প্রেমা বলল, আমি আশা করব তোমাদের শ্বেতকায় বহু লেখকের মত আমাদের দেশকে তুমি ভুল বুঝবে না। আর তোমার লেখার ভেতরেও সে ভুলের ছাপ থাকবে না।

ডেভিড বলল, সাহিত্যিকের কাজ সত্যকে রূপ দেওয়া। সত্য যেমন দারিদ্র্যের ছবি দেখায় তেমনি ভেতরের ঐশ্বর্যকেও প্রকাশ করে প্রেমা। তোমার দেশের বৈচিত্র্য আমাকে মুগ্ধ করেছে।

পনের দিনের অবস্থান ডেভিডের ভারতের এই দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের ছোট্ট দেশটিতে। উল্কার মত সে ঘুরে বেড়িয়েছে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। সঙ্গ দিয়েছে তাকে তার আগামী উপন্যাসের প্রধান চরিত্র প্রেমা মেনন। আয়োজন করেছে নাচের। দেখিয়েছে কথাকলি, মোহিনী আট্যম, কালিআট্যম, পুল্লয়ারকলি, ওটাম তুল্লাল, কোইকোট্টিকলি, সারি আরও কত বিচিত্র নাচ। ঠেকাডির অরণ্যভূমি থেকে লেকের জলে নেমে আসা হাতির দলের শুঁড় উঁচিয়ে মুক্তোর মত জল ছড়ানোর দৃশ্য ওরা দেখেছে মোটর বোটের ডেকে পাশাপাশি বসে। দেখে এসেছে শবরীমালাই পাহাড়। যেতে পারেনি আয় আপ্পানের মন্দিরে, সেখানে যুবতী নারীর নিষিদ্ধ যাত্রা। তাই পম্বার তীরে বসে ডেভিড শুনেছে প্রেমার মুখে মোহিনী আর শঙ্করের মিলন জাত সন্তান আয়আপ্পান বা সাস্তার কাহিনী।

সেই সাস্তার মন্দিরে দলে দলে ভক্ত চলে 'মকর ভিলাক্কুর' দিনটিতে পূজো দিতে। তিনটি নদী এসে মিলেছে পম্বায়। তার পরেই দুর্গম শবরীমালাই। পম্বায় স্নান সেরে কালো মুণ্ডি পরে ভক্তেরা নারকেলের মালায় ঘি রেখে মাথায় বয়ে নিয়ে যায়। সাস্তার যজ্ঞ বেদীতে দিতে হবে এই ইরুমুদির আহুতি।

পৌষের শেষ সন্ধ্যায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে শত শত ভক্ত। আয় আপ্পানের কথা তো মিথ্যে হবার নয়। তিনি যে কথা দিয়েছেন এই মকর ভিলাক্কু তিথিতে ভক্তদের দেখা দিতে আসবেন।

গোধূলির সঙ্গে সঙ্গে আকাশের উত্তর-পূর্ব কোণে আশ্চর্য এক জ্যোতির আবির্ভাব ঘটে। ভক্তেরা আকুল হয়ে প্রণাম জানায় সেই জ্যোতির্ময় আয়আপ্পানের উদ্দেশে।

ডেভিড বলে, বড় বিশ্বাসপ্রবণ তোমাদের ভারতীয়েরা।

প্রেমা বলে, সবেতেই বিশ্বাস আমাদের, দেবতায় যেমন মানুষেও তেমনি।

একটু থেমে ডেভিডের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলে. দূর দেশের মানুষের ওপরেও আমাদের বিশ্বাস কম নয়।

ডেভিডের কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল প্রেমা। ডেভিড প্রেমার মুখে আঙুলের আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বলল, বিশ্বাস রেখ প্রেমা, তোমার কাছ থেকে যা পেলাম তা আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল। তোমার চরিত্রের যা আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে তা হল তোমার অকৃত্রিমতা। আর তোমার স্বভাবের একমাত্র তুলনা ঐ নদী পম্বা। তুমি শিল্পীর হৃদয় নিয়ে জন্মেছ। তোমাকে চিরদিন বুকে ধরে রাখার মত মানুষ জন্মায় নি। সম্ভোগের সময় তুমি যেমন একান্ত করে নিজেকে বিলিয়ে দাও তেমনি কোন কিছু সৃষ্টির ভেতরে মত্ত হলে সব ভুলে তারই গভীরে ডুব দাও। তুমি এই নদীর মত গভীর আর বেগবতী। নদীর ওপর যেমন বাইরের আঘাতে আলোড়ন উঠলেও চিরস্থায়ী দাগ পড়ে না, তোমার স্বভাবের ধর্মও ঠিক তেমনি!

প্রেমা বলল, সুন্দরকে আমি ভালবাসি ডেভিড। তুমি বলিষ্ঠ সুন্দর পুরুষ, তোমার সাহিত্য চিন্তায় কোন সংস্কার নেই তাই প্রেমা তোমাকে তার সবকিছু উজাড় করে দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু আজ যে মেয়েটি তোমার কোলে অসংকোচে তার মাথা রেখে শুয়ে আছে সে জানে এমনি করে চিরদিন কাউকে ধরে রাখা যায় না। তুমি ঠিকই বলেছ, জীবন বয়ে চলা নদী। তার গতিতে বাধা পড়লেই বিপত্তি। এ তোমার আমার সবার মনের কথা। আমি তোমাকে যতই ধরে রাখতে চাইব ততই তোমার মনের থেকে দূরে সরে যেতে হবে আমাকে। তাই অনেক দূরে দুজনে সরে গিয়ে মনের অনেক কাছে দুজনকে পেতে চাই।

ডেভিড বলল, তুমি বয়সে অনেক ছোট প্রেমা কিন্তু জীবন সম্বন্ধে তোমার এসব ধারণা আমাকে সত্যি বিস্মিত করেছে।

জ্যোৎস্না রাত। ঢেউ ভাঙার শব্দ। সবুজে ছায়ায় মিশে যাওয়া নারিকেল বীথি। বালির ফরাসে পাশাপাশি বসে প্রেমা আর ডেভিড। ওরা আজ সারারাত জেগে কাটাবে। কথা বলবে, যে কথার কোনদিন শেষ হয় না। গল্প বলবে, জীবনের অভিজ্ঞতার গল্প। তারপর একসময় ভোর হবে। হোটেলে ফিরে যাবে ওরা। প্রেমা গোছগাছ করে দেবে ডেভিডের জিনিসপত্র। ওকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসবে ত্রিবান্দ্রম এয়ারপোর্টে। ওরা দুজনের কাছ থেকে বিদায় নেবে। মনটা ভারী হয়ে উঠবে। কিন্তু পুনর্মিলনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি কেউ কাউকে দেবে না।

প্রেমা সামনে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের দিকে চেয়ে বলল, মনটা কেন জানি না আজ ঐ ঢেউগুলোর মত কেবলই ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

ডেভিড বলল, আজ সন্ধ্যায় তোমায় এমন অশান্ত ভাবনায় পেয়ে বসল কেন প্রেমা! সারাদিন তুমিই তো আমার পাশে পাশে থেকে বিচ্ছেদ সইবার শক্তি যুগিয়েছ।

অন্যমনস্ক প্রেমা বলল, দিনে রাতে কত তফাত। রাতগুলো যেন মনের ওপর অদ্ভুত এক চাপ সৃষ্টি করে ডেভিড।

ডেভিড প্রেমাকে আরও নিবিড় করে কাছে টেনে নিয়ে বলল, আমাদের মনের এ উত্তাপ অনেক দূরে গেলেও নিভে যাবে না প্রেমা।

প্রেমা কোন কথা বলল না। ডেভিডের উষ্ণ নিশ্বাসের ছোঁয়ায় সে আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

কতক্ষণ পরে ডেভিড বলল, তোমার কথা যখনই মনে পড়বে তোমার নাচের আশ্চর্য মূর্তি ফুটে উঠবে আমার চোখের ওপর। অবিস্মরণীয় সে ছবি প্রেমা! আমি আমার লেখায় তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করব। আমার মনে সেই নর্তকী যে উত্তাপের সৃষ্টি করেছে আমার লেখার ভেতরেও সেই উত্তাপ আমি ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করব।

প্রেমা বলল, তোমাকে আমি কি দিয়েছি জানি না তবে তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি তা কোনদিন কারু কাছ থেকে পাইনি।

ডেভিড প্রেমার একরাশ ছড়ান চুলে ভরা মাথা বুকের কাছে টেনে এনে বলল, এমন কি আমি তোমাকে দিতে পেরেছি প্রেমা?

প্রেমা ডেভিডের বুকে মাথা রেখে বলল, এক বুক কান্না।

প্রেমাকে বুকে চেপে চুপচাপ বসে রইল ডেভিড।

প্রেমা বলল, আচ্ছা ডেভিড তোমার মালাবার উপকূলের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসের শুরু কিভাবে করবে কিছু ভেবেছ?

ডেভিড সঙ্গে সঙ্গে বলল, কিছু ভাবিনি এখনও। তবে তোমার ঐ এক বুক কান্না দিয়েই শুরু করা যেতে পারে।

ডেভিডের বুকের ভেতর প্রেমা মাথার ঝাঁকুনি তুলে বলল, না না ডেভিড কান্না দিয়ে নয়। রোদ্দুরে ভরে আছে আমাদের দেশ, এখানে খুশী দিয়ে শুরু হোক তোমার লেখা।

ডেভিড বলল, দুজনের কথা থাক। শোন, যদি এমন করে শুরু হয় উপন্যাস :

কোভালম বীচে পাহাড়টা যেখানে সমুদ্রে এসে নেমেছে সেখানো কালো জলের ধাক্কায় সাদা সাদা ফেনাগুলো ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। পাহাড়ের ওপরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আকাশমুখী কটা নারকেল গাছ। দক্ষিণের আকাশে উষ্ণ দেশের থম থম কালো দুটো মেঘ। তারা ক্রমশ তাদের আয়তন বৃদ্ধি করে চলেছে।

ওরা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে। পাহাড়ের ওপর প্যালেস হোটেল থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এল ওরা। ডেভিডের হাতে লাল সুটকেশ, প্রেমার পিঠে ডেভিডের হলুদ স্লিপিং ব্যাগ। ধবধবে সাদা পোশাকে প্রেমাকে শিল্পীর হাতে গড়া মার্বেল ফিগারের মত মনে হচ্ছে।

ওরা নীচে নেমে এল। সারকুলার কিয়স্ক দুটোর পাশ কাটিয়ে ওরা এসে গেল মেন রোডের ওপর। বাঁ দিকে স্বাস্থ্যে ভরপুর কোকোনাট গ্রোভ। হাল্কা গ্রে আর সাদায় মেশা ঋজু কাণ্ডের মাথায় ঘন সবুজ পাতার ঝালর। গাছের ফাঁকে ফাঁকে বীচ-কটেজগুলো উঁকি দিচ্ছে।

ওরা কালো পীচের রাস্তাটা ধরে হেঁটে চলল। খানিক পরেই ওরা পেরিয়ে এল কোভালম গ্রোভ। ছোট্ট এক টিলতে ফাঁকা জমি। তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে প্রেমার প্রেসিডেন্টখানা। কালো হয়ে আসছে চরাচর। তার মাঝখানে সাদা গাড়িখানা আরও ধবধবে মনে হচ্ছে।

গাড়িতে ঢোকার আগেই তেড়ে এল হাওয়া। বালি উড়ল। সমুদ্রের ওপর থেকে হাওয়া তীব্র স্রোতের মত টেনে ভাসিয়ে নিয়ে গেল এক ঝাঁক সী-গালকে।

ওরা তাড়াতাড়ি গাড়িতে ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল।

এই অব্দি বলেই ডেভিড থামল দেখে প্রেমা বলল, তারপর?

ডেভিড প্রেমাকে একটা মিষ্টি ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আমি কি আমার লেখা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ছি বলে মনে করলে নাকি ? না কোন জানা গল্প বলছি।

প্রেমা বলল, তুমি এমন করে বলতে শুরু করলে যে মনে হল একটা ছবি দেখছি।

তারপর শোন, ডেভিড আবার শুরু করল :

প্রেমা গাড়িতে স্টার্ট দিল। ওয়াইপার দুটো জলের কুয়াশাকে ঘন ঘন অর্ধবৃত্ত এঁকে সরিয়ে দিচ্ছিল। প্রেমা সামনের আঁকা বাঁকা উঁচু রাস্তার দিকে স্থির চোখ রেখে গাড়ি চালাচ্ছিল। ডেভিড চোখের কোণে চেয়ে দেখছিল প্রেমাকে। কত গভীর এই মালাবার উপকূলের মেয়েটি। প্রেমার চোখে মুখে, স্টিয়ারিং ধরে থাকা হাতে, বসার ভঙ্গিতে একটা সজাগ কর্তব্য সম্পাদনের ছবি ফুটে উঠছিল। সে যে একজন বিদেশী ভ্রাম্যমাণকে পুরো দুটি সপ্তাহের প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত অন্তরঙ্গ উত্তাপে ভরে রেখে আজ এয়ারপোর্টে বিদায় দিতে চলেছে তার কোন প্রকাশ ছিল না তার এই মুহূর্তের আচরণে।

যে কোন কাজের গভীরে, অনেক গভীরে পারিপার্শ্বিক ভুলে ডুবে যেতে জানে মেয়েটি।

অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। সামনের পথ দেখা কঠিন হয়ে উঠছে। দুপাশের পাহাড়ী টিলার ওপর সারি সারি নারকেল গাছ দিগন্তে মিশে গেছে। এখন আর ওদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। গাছের সবুজ, মেঘের ছায়া, বৃষ্টির ঝালর একাকার হয়ে গেছে। জল গড়িয়ে আসছে। সহস্র সহস্র গাছের গা বেয়ে লম্বা পাতার প্রান্ত দিয়ে জল নামছে। উঁচু টিলার নিম্নগামী পথ ধরে সে জলস্রোত দুদিক থেকে বেগে নেমে আসছে পথের ওপর। সে স্রোত উজিয়ে জল ছিটিয়ে চলেছে প্রেমার গাড়ি। ষোলটি মাইল পথ এমনি করে পার হয়ে যেতে হবে। ত্রিবান্দ্রম এয়ারপোর্টে সময়মত পৌঁছে দেবার পুরো দায়িত্ব নিয়েছে প্রেমা। মেয়েটি তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। তার মুখে ডেভিড দেখতে পাচ্ছে কয়েকটা রেখা ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। এই বৃষ্টির অস্বচ্ছ পর্দাকে ভেদ করে প্লেন টেক অফের বেশ কিছু সময় আগে সে ডেভিডকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে পারবে তো।

প্রেমার দিকে চেয়ে ডেভিডের কি জানি কি মনে হল। তখন দুসারি নিবিড় নারকেল গাছের ভেতর দিয়ে পথ চিরে গাড়ি ছুটছিল। ধারেকাছে বসতির চিহ্ন নেই। ডেভিড প্রেমার স্টিয়ারিং ধরে থাকা বাঁ হাতখানা ওর ডান হাতের আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে বলল, গাড়িটা একটু থামাবে প্রেমা?

যেন একটা ঘোরের ভেতর ডুবেছিল মেয়েটি। আস্তে গাড়িখানা ব্রেক কষে দাঁড় করাল পথের ধার ঘেঁষে। দুটো নাতিদীর্ঘ নারকেল গাছ পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে আলুথালু।

ডেভিড গায়ের জামা খুলে ফেলল। অবাক প্রেমা তার দিকে চেয়ে। খালি গায়ে দরজা খুলে যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল বাইরে। আকাশের দিকে মুখ তুলে ঝরে পড়া বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পাগলের মত গায়ে মাথায় মাখতে লাগল।

কি করছ ডেভিড ! চেঁচিয়ে উঠল প্রেমা। অসুখ করবে যে। উঠে এস, একটুও আর সময় নেই।

আশ্চর্য। ডেভিডের কানে পৌঁছেও পৌঁছল না সে চীৎকার। সে দু'হাত বাড়িয়ে প্রেমাকে কাছে ডাকতে লাগল।

কি করে প্রেমা। এক দুরন্ত খেয়ালীর খেলার পুতুল হয়েছে সে। গাড়ি থেকে বৃষ্টিতে ভিজে বেরিয়ে আসতে হল তাকে।

মুহূর্তে অঝোরে বর্ষায় ভিজে গেল তার সারা শরীর। সে ছুটে এসে দাঁড়াল ডেভিডের কাছে। ডেভিড দেখল, শ্বেতপাথরের একটি মূর্তি তার সামনে দাঁড়িয়ে। বর্ষার ধারায় একেবারে সিক্ত প্লাবিত।

সে দেখল বর্ষাধোয়া একটি মূর্তির নিতম্ব জঙঘা স্তনযুগল নিখুঁত খোদাই-এর পর মসৃণ পালিশ দিয়ে এই নির্জন বনভূমির মাঝখানে রেখে গেছে শিল্পী।

ডেভিড জড়িয়ে ধরল সে মূর্তিকে। দূর দিগন্তের দিকে একেবারে নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ডেভিড প্রেমাকে বুকের কাছে টেনে এনে গভীর আবেগে বেঁধে ফেলল। প্রেমা ডেভিডের খোলা বুকের বাসায় একটা ভীরু পাখি হয়ে গেল।

এক বুক কান্না উজাড় করে দিয়ে এক সময় থামল বৃষ্টি। প্রেমা কান্নাভেজা চোখ দুটো ডেভিডের নত মুখের ওপর ফেলে বলল, টিকিটটা বাতিল হয়ে গেল তোমার ডেভিড।

ডেভিড বলল, ফ্লাইটটা হয়ত আজকে বাতিল হয়ে গেছে। আর যদি প্লেন আজকের মত ছেড়ে চলে যায় তাহলে কাল পরশুর প্লেন পাব কিন্তু এই বৃষ্টির ভেতর শ্রেষ্ঠ এক ভাস্করের তৈরি মূর্তিকে জীবনে আর কোনদিনও এমন করে পাব না।

আকাশ নীল হয়ে গেছে। সূর্যের শেষ সোনা ভেজা আলো নারকেল গাছের পাতায় কাঁপতে কাঁপতে গড়িয়ে পড়া বর্ষার ফোঁটাকে সোনালী করে এসে পড়ল প্রেমার মুখের ওপর। সোনালী রোদে ঝিকমিক করে উঠল প্রেমার মুখ।

গল্প বন্ধ করে ডেভিড বলল, তোমার বুকভরা কান্না আর মুখভরা আলো দিয়ে যে গল্প শুরু করলাম তাতে তোমার সম্মতি পাব কি প্রেমা?

প্রেমা কোন কথা না বলে ডেভিডের বুকের ভেতর থেকে ওর মসৃণ দাড়িতে তর্জনীর আলতো টোকা দিতে লাগল। সে যে ডেভিডের রচনার প্রারম্ভ পর্বটিতে দারুণ খুশী হয়েছে তারই নীরব সমর্থন।

হাওয়া দিচ্ছে সমুদ্রে। প্রকৃতি বিজ্ঞানের নিয়মে চলেছে এই বায়ুপ্রবাহ। সমুদ্র সরে গিয়েছিল দূরে। এখন আকাশের বুকে জেগে থাকা চাঁদের টানে সে আস্তে আস্তে ফুলে ফুলে উঠছে। ক্রমেই ঢেউগুলো সরে সরে আসছে প্রেমা আর ডেভিডের দিকে। এক সময় ওরা উঠে দাঁড়াল। ওদের ভাবনার ওপর দিয়েও একটা হাওয়ার প্রবাহ চলেছে। টুকরো টুকরো চিন্তাগুলো এলোমেলো হাওয়ায় মনের আনাচে কানাচে উড়ে ফিরছে।

পেছনে ফেলে আসা দু'দুটো সপ্তাহের টুকরো কথা—অবাক করে দেওয়া বন পাহাড় নদী কায়েলের ছবি—নাচের আসর, মন্দির মানুষজন—সব কিছু মিলে সে যেন এক আকুল করা উৎসবের সমারোহ। মন আর চোখকে টেনে রাখা কোন এক আকর্ষণীয় উপভোগ্য চলচ্চিত্রের পর্দার ওপর দিয়ে সরে সরে যাওয়া।

ওরা হাতে হাত বেঁধে হাঁটতে লাগল। ঢেউ এসে ওদের পায়ের পাতা ডুবিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। ওরা কোন কথা না বলে ধনুকের বাঁকের মত কোভালম বীচটা হেঁটে হেঁটে পার হচ্ছিল।

একসময় হোটেল ছেড়ে ওরা অনেক দূরে এসে পড়ল। ডান দিকে নারকেল গাছের সারির মাঝখানে একটা বালির খাদ দেখা গেল। ডেভিডকে ওদিকে চেয়ে থাকতে দেখে প্রেমা বলল, নারকেল গাছগুলোর ওপারে একটা কায়েল রয়েছে। এককালে এই বালির খাদ দিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। এখন শুধু শুকনো বালির রেখায় অতীতের স্মৃতিচিহ্নটুকু জেগে আছে।

ডেভিড শুধু প্রেমার হাতে চাপ দিয়ে বলল, কাল তোমাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতে হবে প্রেমা।

প্রেমা বলল, তারপর অনেক অনেক দিন চলে যাবে। আমরা দুজনে থাকব পৃথিবীর দু' প্রান্তে। কোন একদিন যে আমরা একই সঙ্গে ছিলাম, এমনি করে হাত ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি, দু'জনের দেহের উত্তাপ দুজনে নিবিড় আলিঙ্গনে অনুভব করেছি তার কোন পরিচয় আর এই চলমান পৃথিবী ধরে রাখবে না। সত্যি কি অসীম দুঃখে মনটা ভরে ওঠে যখন ভাবি আমাদের সব ভাবনা সব কাজ একদিন কোথায় হারিয়ে যাবে।

ডেভিড বলল. দুঃখ করো না প্রেমা, কিছুই হারায় না, পাত্র-পাত্রী বদলে যায় শুধু। আমরা যখন থাকব না, তখন অন্য কোন নেলসন কি সুরবেক তোমারই মত কোন সুদর্শনা সুপ্রিয়াকে নিয়ে এমনি

কোন সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াবে। আবার কখনো তাদের কানে এসে হয়ত আজকের মত বাজবে হাওয়ার হাহাকার। আসন্ন বিচ্ছেদের মুহূর্তে তাদের মনও এমনি ভারি হয়ে উঠবে।

প্রেমা বলল, সান্ত্বনা কোথায় ডেভিড ?

ডেভিড বলল, সান্ত্বনার জন্ম নিজের ভাবনার ভেতর প্রেমা। তুমি শিল্পী তাই তোমার সান্ত্বনা শিল্পের মধ্যে। আবার শিল্পের ভেতর থেকে আমিটাকে সরিয়ে না রাখলেই দুঃখ পেতে হবে। পরিণত নায়ক সময় হলে তরুণ নায়কের হাতে তাঁর কাজ তুলে দিয়ে সরে যাবেন। গায়ক সাহিত্যিক সকলকেই এই অলিখিত নিয়মের পথ ধরে হাঁটতে হবে। প্রসন্ন মনে একে মেনে নিতে না পারলেই অশান্তি, দুঃখের ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে প্রতিদিন। সেখানে হার ছাড়া জিৎ নেই প্রেমা। আমার কলম একদিন থামাতে হবে। নতুন লেখক নতুনভাবে জীবনকে দেখবে। তার রচনার ফর্ম যাবে পাল্টে। জীবনের ধর্ম পরিবর্তনশীল। প্রকৃতির নিয়ম বলে তাকে মেনে নিতে হবে, তবেই শান্তি। আমি আমার লেখায় প্রেমা নামের যে মেয়েটিকে আমরা সমস্ত অনুভূতি উজাড় করে আঁকলাম, আমি জানি আমার এ চেষ্টা বিফল হবে না। আমার পাঠকদের কারু কারু মনে সে দোলা দেবে। তাদের ভেতর থেকে যদি কোন তরুণ লেখকের আবির্ভাব ঘটে আর সে যদি নতুন দিনের উপযোগী করে তার নায়িকাকে রচনা করে তাহলে আমি নিশ্চিত জানি আমার চরিত্র তার ভেতর থেকে নতুনভাবে জন্ম নেবে।

একটু থেমে আবার বলতে লাগল ডেভিড, সেদিন প্যালেস হোটেলের অডিটোরিয়ামে তোমার নাচ দেখেছিলাম। তুমি নাচের আগে তোমার গুরু মাধবী আম্মার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে। তোমার নাচের সময় মাধবী আম্মা আমার পাশের আসনেই বসেছিলেন। আমি বারে বারে তাঁর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তন্ময় হয়ে দেখছিলেন তোমার নাচ। আর ঠিক তোমার মুখের কতকগুলো একস্‌প্রেশান তাঁর প্রবীণ মুখের ওপর মুহূর্তে মুহূর্তে খেলা করে যাচ্ছিল।

আমার ওঁকে দেখে মনে হচ্ছিল উনি নতুন করে তোমার ভেতর জন্ম নিচ্ছেন। জরা মাধবী আম্মার ভেতরের শিল্পীকে স্পর্শ করতে পারছে না। মাধবী আম্মা আশ্চর্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছেন প্রেমা মেননে।

থামল ডেভিড। প্রেমা ওর হাতটা শক্ত করে ধরে রইল। ওর কথা যে প্রেমার অন্তর ছুঁয়েছে তার স্বীকৃতি।

ডেভিডের চোখ গিয়ে পড়েছিল দৃশ্যটার ওপর। চলতে চলতে সে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল। ওকে থামতে দেখে প্রেমা দাঁড়িয়ে গেল। এখন প্রেমার চোখেও এসে পড়েছে দৃশ্যটা।

কয়েকটা নৌকো কাৎ হয়ে পড়ে আছে। চাঁদের আলোয় তাদের ছায়াগুলো আঁকা হয়ে আছে বালির জমিনে। একটা নৌকোর ছায়ায় চাদরে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে দুটি নারী পুরুষ। তারা অচেতন এখন। অর্ধনগ্ন যুবক-যুবতী। কোন ধীবর পল্লী থেকে ওরা হয়ত বেরিয়ে এসেছে এখানে। নির্জন সাগর কূলে ঘুমন্ত নৌকোগুলোর আড়ালে একান্ত নিশ্চিন্ত নিভৃতি খুঁজে নিয়েছে ওরা।

চাঁদের চেয়ে থাকার মত ওরা উজ্জ্বল মাদক চাউনি মেলে চেয়ে থেকেছে কতক্ষণ পরস্পরের দিকে। পাশের নারকেল বনের পাতার অস্ফুট-প্রায় ধ্বনির মত ওরা টুকরো টুকরো ভালবাসার কথা বলেছে। তারপর রক্তে উঠেছে তুফান। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উত্তাল ওঠা-নামার খেলা খেলতে খেলতে ওরা এক সময় বেলাভূমিতে ছড়িয়ে পড়া ফেনপুঞ্জের মত উচ্ছ্বাসে আবেগে আবেশে ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে। এক সময় যৌবনের দেবতার লীলা-মৃগয়া যখন শেষ হয়েছে তখনও ওরা পরস্পরকে ছেড়ে দেয়নি। এক হয়ে অসীম তৃপ্তি বুকে নিয়ে রাতের ঐ শান্ত আকাশের মত স্থির হয়ে শুয়ে আছে।

প্রেমা বলল, এই বিরাট প্রকৃতির স্টেজের ওপর ওরা ওদের অভিনয় শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ডেভিড বলল, আমরা কৌতূহলী ট্রেসপাসার্সের মত গ্রীন রুমে ঢুকে পড়ে ওদের অসম্বৃত অবস্থায় দেখে ফেলেছি।

রাত শেষের বড় একটা দেরী নেই। ঝলকে ঝলকে ভোরের বাতাস বয়ে আসছে। দু'একটা অতি ভোরে জেগে ওঠা পাখি মাঝে মাঝে ডাক দিয়ে উঠছে।

ওরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইল। কেউ কাউকে কোন কথা বলল না। ওরা জেনেছে ওদের

এখন ফিরে যেতে হবে। সকালের ফ্লাইটে ডেভিডের যাত্রা।

ওরা হোটেলের কাছাকাছি এসে সামনে তাকাল। পাহাড়ের পাশে নারকেল গাছের ফাঁকে ভোরের আয়োজন চলেছে।

ডেভিড চলে যাবার পর কয়েকটা দিন অশান্ত হয়ে উঠেছিল প্রেমা। গাড়ি চালাতে চালাতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল পাশে যেন কেউ বসে আছে। নারকেল বাগানের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে সে থমকে দাঁড়াচ্ছিল বারবার। মনে হচ্ছিল, পাশ থেকে কেউ তাকে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসবে, আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে হবে তার প্রশ্নের।

পুরো দু-তিনটে সপ্তাহ এমনি করে পার হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঘোর কাটল প্রেমার। এখন সে দেরাদুনের লালসিয়া স্টেটের আমন্ত্রণ রক্ষায় সাড়া দেবার জন্যে নাচের অনুশীলনে মেতে উঠল।

কুমার জয়কিষণ আমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছেন। শোভন কিন্তু প্রতিটি ছত্র উত্তাপে ভরা। শেষে দোলনও পাদপূরণ করে লিখেছে, আন্টি আসা চাই। এলে তোমাকে আবার দেখব।

চিঠির সঙ্গে এসেছে একটি চেক। বড় রকমের একটা অঙ্কের। দলবল নিয়ে যাবার প্রাথমিক খরচ।

প্রেমা মাধবী আম্মার বাড়ি অনুশীলনের জন্যে বেরিয়ে গেলে সরিতা বিছানার বালিশে কনুই গুঁজে ইন্দ্রকে ফোন করতে বসল।

মিঃ রায়?

ওপার থেকে ইন্দ্র বলল, বলছি।

সরিতা বলল, শোন, তোমার শেখান গানটা গেয়ে শোনাই। ভুল হলে শুধরে দিও।

'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরেরি বাঁধনে।
তুমি জান নাই আমি পেয়েছি তোমারে অজানা সাধনে।'

ইন্দ্র বলল, চমৎকার।

চমৎকার কি? গানের ভাব না আমার গলা?

ইন্দ্র বলল, দুটোই। যে হৃদয় থেকে একথা উচ্চারিত হচ্ছে আর যে কণ্ঠ থেকে এ সুর ঝরছে।

সরিতা বলল, আমি টেগোরের গান শিখব। তুমি আমাকে অনেক অনেক গান শিখিয়ে দেবে।

চমৎকার।

তার মানে?

মানে খুব সোজা। আপন মনে যখন গেয়ে উঠবে বাংলা গান তখন তারিফ করার আগে দিদি বলবে, শিখলে কোথায়? তখন কি উত্তর দেবে?

ওর সামনে গাইবই না।

ইন্দ্র বলল, নিশ্বাস আর টেগোরের গান দুটোকে চেপে রাখা যায় না। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসবেই।

সরিতা বলল, কলেজে একটি বাঙালী মেয়ে এসেছে, সেই আমাকে শিখিয়েছে বলব।

মিথ্যে কথার ফুলঝুরি ছড়াতে তুমি অদ্বিতীয়া।

সরিতা বলল, প্রেমের ব্যাপারে মিথ্যেটা হল আত্মরক্ষার কবচ।

দিদি কোথায়?

সরিতা বলল, লালসিয়ার কুমারবাহাদুরের মাথাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে মোহিনী লীলায় মেতেছে।

আর একটু সহজ করে বল।

মাধবী আম্মার কাছে রোজ যাচ্ছে নাচের তালিম নিতে। লালসিয়া থেকে আমন্ত্রণ আর অর্থ দুটোই এসে গেছে।

অসাধারণ ক্ষমতা তোমার দিদির!

লোভ হচ্ছে?

লোভ হলেও লাভ নেই।

কেন?

অতি সাধারণ আমি।

আক্ষেপ হচ্ছে?

আক্ষেপ হবে কেন? অসাধারণ বোনকে পেয়েছি, তাই বা কম কি। আমার কাছে দু'জনেই সমান দুষ্প্রাপ্য।

সরিতা বলল, বাজে কথা ছেড়ে এখন বলতো দেখি, প্রেমার লালসিয়া প্রস্থানের পর আমাদের প্রোগ্রাম কি ভেবেছ?

কিছুই ভাবিনি।

তোমার খুব উন্নতি হয়েছে দেখছি।

কি রকম?

এরই ভেতর এতখানি নিরাসক্ত হয়ে পড়লে!

ইন্দ্র বলল, অপবাদ দিলে তাকে হজম করা ছাড়া উপায় কি বল। কিন্তু কোন প্রোগ্রাম যে দুজন ছাড়া হবে না, তাও কি মনে করিয়ে দিতে হবে।

সরিতা বলল, কোথাও গিয়ে কাজ নেই। রোজ সন্ধ্যায় সমুদ্রের ধারে নির্জনে নারকেল গাছের তলায় তোমার কোলে মাথা রেখে একটু শুতে দিও, ব্যস। আমি আর কিছু চাই না।

ইন্দ্র বলল, এইটুকুতেই তুষ্ট?

সরিতা বলল, তোমার একটুখানি ছোঁয়াতেই যে আর একজনের বসন্ত। তখন জমে থাকা বরফ কোথায় যে গলে ঝরে যায় তার ঠিক ঠিকানা নেই। তুমি সত্যি যাদু জান।

আশ্চর্য মিল তোমার কথার সঙ্গে পারসিয়ান পোয়েট ওমর খৈয়ামের।

সরিতা বলল, কি রকম?

ইন্দ্র বলল, আসল ওমর খৈয়ামের রুবায়েৎ বলতে পারব না, ফিটজেরাল্ডের অনুবাদটুকু শোনাতে পারি।

Come, fill the cup,
and in the fire of spring
The winter garment of
repentance fling

সরিতা বলল, চমৎকার। একজন আঙ্কিক আর জ্যোতির্বিজ্ঞানীর জীবন সম্বন্ধে কি অপূর্ব ভাবনা।

ইন্দ্র বলল, তোমার বসন্ত-ভাবনার রূপটি টেগোরের একটি গানে ভারী সুন্দর ফুটে উঠেছে।

ওপার থেকে সরিতার গলায় ঔৎসুক্য, বল বল।

ইন্দ্র আগে মালায়ালমে ব্যাখ্যা করল। তারপর বাংলা গানটি গেয়ে শোনাল।

একটুকু ছোঁয়া লাগে
একটুকু কথা শুনি
তাই দিয়ে মনে মনে
রচি মম ফাল্গুনী।

সরিতা বলল, তুমি গাইতে থাক আমি সুরটা তুলেনি।

তাহলেই হয়েছে। আমার খদ্দের ফোন করে করে কানেকশান না পেয়ে অন্য হোটেল বুক করবে।

প্লীজ গানটা শিখিয়ে দাও ইন্দ্র। দু-চারটে খদ্দের চলে গেলে আবার আসবে, কিন্তু এই মুহূর্তের মুডটা চলে গেলে আর মাথা খুঁড়লেও সে লগ্ন ফিরে আসবে না।

অগত্যা ফোনের মাধ্যমে চলল গানের তালিম।

আপাতত শেখা আর শেখানর পালা চুকলে ইন্দ্র মনে মনে বলল, অপরাধ নিও না গুরুদেব। গাইতে সাধ কিন্তু কি গাইছি সে তো আমি জানি। তবু আমার এই গলা কারু মনে যদি পুলক জাগায় তাহলে ক্ষমা করে নিও তুমি নিজ গুণে। সুরের বিশুদ্ধি নিয়ে বিবাদ করুন গুণিজনে। আমরা যারা শুদ্ধ করে গাইতে জানি না, অথচ না গেয়ে পারি না, তাদের তুমি অবুঝ ভক্ত বলে একটুখানি প্রশ্রয় দিও। তুমিই তো বলেছ ঠাকুর, 'পণ্ডিতেরা বিবাদ করুক লয়ে তারিখ সাল'। তোমার ঐ কথার সাহসেই বলি,

'পণ্ডিতেরা বিবাদ করুন লয়ে সুর আর তাল।' আমরা প্রাণের তাগিদে গেয়ে যাই।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। বেলা তখন প্রায় এগারোটার কাছাকাছি। হোটেলের টুরিস্টরা সমুদ্র স্নানে গেছে। ইন্দ্র তার রুমে বসে তাকিয়ে আছে স্নানার্থীদের দিকে। জার্মান এক পরিবার উঠেছে ওদের হোটেলে। মা-বাবা স্নান করছে। দুটি শিশু লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলা করছে ঢেউয়ের ওপর। স্বামী-স্ত্রী স্নানের ফাঁকে ফাঁকে ছেলেমেয়েদের সামলাচ্ছে। কি দুরন্ত আর প্রাণবন্ত এই বিদেশী বাচ্চাগুলো। ভয়ডর বলে যে কোন একটা ব্যাপার আছে তা ওরা জন্ম অবধি জানে না। কি সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী দুটি ছেলেমেয়ে। মহিলাটি ঢেউয়ের ঘায়ে বেসামাল হয়ে পড়তেই পুরুষটি তাকে জড়িয়ে ধরল। দুজনে হাত ধরাধরি করে উঠল এসে ভেজা বালির ওপর। প্রায় নগ্ন দুটি মূর্তি পাশাপাশি শুয়ে আছে। রোদ এসে পিছলে পড়ছে ওদের ধবধবে সাদা গায়ের ওপর থেকে। ছেলেমেয়ে দুটো মা বাবার দেখাদেখি শুয়ে পড়ল পাশাপাশি। একটি উজ্জ্বল সুখী পরিবারের ছবি। প্রলুব্ধ করে।

পেছন থেকে কে যেন চোখ দুটো চেপে ধরল ইন্দ্রের। ইন্দ্র অন্ধ হয়ে গেছে। সে হাত দুটো পেছন দিকে তুলে অনুভব করতে লাগল আক্রমণকারীকে। হাতে লাগল কাঁচের কয়েকখানা চুড়ি। মনে মনে বলল ইন্দ্র, চিনতে না পেরে উপায় আছে। তুমি তোমার সমস্ত উপস্থিতি দিয়ে চেনাবেই চেনাবে। তোমার চুলের গন্ধ, তোমার লম্বা লম্বা আঙুলের ছোঁয়া, তোমার নিঃশ্বাস, সব জেনো আমার চেনা।

মুখে বলল ইন্দ্র, এই অবেলায় দুষ্টুমি শুরু করে দিলে তো?

কথা বলে না কেউ।

ইন্দ্র বলল, চোখ থেকে হাত সরাও। বিশ্বাস কর, আমি চোখ চাইব না। বস আমার মুখোমুখি। আমি নির্ঘাৎ তোমার ঠিকানা বলে দেব।

চোখ থেকে হাত সরে গেল। একটা মিষ্টি পোশাকের খসখস আওয়াজ আর গন্ধ পেছনের থেকে সামনে এল। অদেখা মেয়েটির মৃদু নিঃশ্বাস এসে পড়ছে ইন্দ্রের মুখের ওপর।

ইন্দ্র বলল, তোমাকে চিনতে পারলে কিন্তু ইন্দ্র রায়ের হাত থেকে আজ রেহাই নেই।

কোন কথা বলল না পার্শ্ববর্তিনী। আর কথা বললেই তো অচেনার অন্ধকার থেকে চেনার আলোতে বেরিয়ে আসতে হবে।

ইন্দ্র চোখ বন্ধ করে দুটো হাত বাড়িয়ে মুখখানা টেনে এনে বুকে চেপে ধরে বলল, সরিতা, আমার সরিতা।

ইন্দ্রের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটি।

ইন্দ্র চোখ মেলে বিস্ময়ে অবাক। ইন্দ্রের বুকে একরাশ চুল ছড়িয়ে মুখ লুকিয়ে যে কাঁদছে সে সরিতা নয়।

মুখখানা নিজের হাতের পাতায় জোর করে তুলে ধরল ইন্দ্র। চোখ উপচে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। কটি চূর্ণ চুল গালে ভিজে লেপ্টে আছে।

ললিতা!

ললিতা কথা বলতে পারছে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কি হয়েছে ললিতা, লক্ষ্মীটি বল আমাকে।

কিছুক্ষণের ভেতর ললিতা স্থির হল। সে এখন লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হল। নিজের চুল, বেশবাস ঠিক করে নিল।

ইন্দ্রের দিকে চেয়ে বলল, চলে যাচ্ছি।

সে কি।

ললিতা বলল, তোমাকে দেখতে এসেছিলাম, দেখা হল, চলে যাচ্ছি। তুমি তো আমাকে চিনতে পারনি।

ইন্দ্র বলল, কোন কথা বলবে না?

মাথা ঝাঁকাল ললিতা। তার কিছু বলার নেই।

ইন্দ্র বলল, তুমি আমাকে অবাক করে দিয়ে এমনি করে চলে যাবে?

একদিকে ঘাড় কাৎ করে মাথা নেড়ে ললিতা জানাল, সে চলে যাবে।

ইন্দ্র দরজার কাছে গিয়ে দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে বলল, তোমার বাবা অন্ধ হয়েও রাতে খাবার আগে অভুক্ত মানুষদের ডাক দিয়ে তবে খেতে যান, আর তাঁর মেয়েকে আমি দুপুরে স্নান আহার না করিয়ে ছেড়ে দেব ভেবেছ।

ললিতা এবার চোখ নামাল মেঝের ওপর। টপ টপ করে চোখের জলের কয়েকটা বকুল ঝরে পড়ল মেঝেতে। ইন্দ্র ললিতার কাছে এসে তার হাতখানা ধরে বলল, এমন করে যদি কাঁদবে ললিতা তাহলে আমার ঘরে না আসাই বুঝি তোমার ভাল ছিল।

ললিতা মুখ তুলে তাকাল ইন্দ্রের দিকে। বলল, মাসখানেক আগে বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

বিস্মিত ইন্দ্র বলল, সেকি ! তিনি তো সুস্থই ছিলেন।

ললিতা বলল, অসুখ-বিসুখ কিছুই ছিল না। রাতে খাবার আগে নিয়মিত অভুক্ত মানুষদের ডেকেছেন। একটি দুঃখী মানুষ এসেছিল, তাকে খাইয়েছেন পাশে বসে। লোকটি তৃপ্ত হয়ে চলে গেলে নিজে খেয়ে নিয়ে তুল্লিকে আদর করেছেন। আমাকে ডেকে নানা রকম গল্প করেছেন। শুতে যাবার আগে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছেন, জীবনে যা সত্য বুঝবে তাই করবে। কারু কথায় হটে আসবে না।

আমি কিছুই বুঝিনি তখন। ভোরবেলা উঠে দেখি বাবা চিল হয়ে শুয়ে আছেন। পাশের টেবিলে রাখা মহাদেবের ছবিখানা বুকের ওপর চেপে ধরে রয়েছেন।

ঘুম ভাঙাতে গিয়ে দেখি বাবা চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ইন্দ্র ললিতাকে ধরে এনে নিজের বিছানার ওপর বসাল। ললিতা এবার আর চলে যাবার জন্য বায়না ধরল না।

ইন্দ্র ললিতার পাশে বসে বলল, এখন তুমি কোথা থেকে এলে ললিতা?

ললিতা বলল, বাবা মারা যাবার পর বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছিল। একটুও ভাল লাগছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল কোথাও পালাই পালাই। কিন্তু সাংসারিক কতকগুলো ঝামেলা মেটাবার জন্যে কয়েকটা দিন থেকে যেতে হল। অবশ্য বিশেষ কিছু ঝামেলা ছিল না। ব্যাঙ্ক কিংবা বাড়ির ব্যাপারে অনেক আগেই বাবা ফয়সালা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। সামান্য যা কিছু কাজকর্ম ছিল তা মিটিয়ে নিয়ে একটা টুরিস্ট বাসে বেরিয়ে পড়েছি। কন্যাকুমারী অব্দি যাব। এখন বাস এসে রয়েছে কোভালম প্যালেস হোটেলের সামনে। নাওয়া খাওয়ার পর তিনটের সময় আবার বাস ছাড়বে। সেই সময়টুকুর জন্যে তোমার কাছে চলে এসেছি।

কিন্তু তুল্লি কোথায়?

তুল্লি অন্য যাত্রীদের সঙ্গে এমন ভাব জমিয়েছে যে তারাই ওকে ছাড়ছে না।

ইন্দ্র বলল, বেলা হয়েছে, এখন ঢুকে পড় আমার স্নানের ঘরে। সব কিছুই ভেতরে আছে। কাচান ধুতি তোয়ালে আলনায় রয়েছে নিয়ে নাও।

ললিতা বলল, তুমি তাহলে আমাকে না খাইয়ে ছাড়বে না?

ইন্দ্র বলল, চলে যেতে পার, তবে জানবে আজ আর একটা মানুষ সারা দিনরাত অভুক্ত থাকবে।

ললিতা বলল, ভীষণ জেদ তোমার। সরিতা সহ্য করে কি করে?

ইন্দ্র বলল, জানি না। বোধহয় এখনও ওর কাছে ততটা অসহ্য হয়ে উঠিনি।

ললিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি স্নানের ঘরে যাচ্ছি, নইলে তোমার আবার খাওয়াই হবে না।

কিছু সময়ের ভেতর বেরিয়ে এল ললিতা। ইন্দ্রের ধুতি পরেই স্নান সেরেছে। তারপর নিজের পোশাক পরে নিয়েছে। মাথা ভিজিয়েছে, তাই তোয়ালেতে মাথার চুল ঘষে ঘষে মুছে নিচ্ছে।

ইন্দ্র বলল, ড্রেসিং টেবিল নেই। ঐ দেয়ালে ঝুলছে বড় একখানা আয়না, চিরুনীও রয়েছে। কোন রকমে কাজ সেরে নিতে হবে।

ললিতা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনী চালাতে চালাতে বলল, এতে আমার তো কোন অসুবিধে নেই, কিন্তু তোমার সরিতা এতে কাজ চালায় কি করে?

ইন্দ্র বলল, আমার এ আস্তানায় সরিতার আবির্ভাব এখনও হয়নি। মালিক প্রেমা মেনন একবার কিছু সময়ের জন্যে এসেছিলেন মাত্র।

ললিতা আয়না থেকে মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, সত্যি! সরিতা কোনদিন আসে নি তোমার এখানে?

না।

সে তোমার এ ঘরে ঢুকলে আর বেরুতে চাইত না। এত সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছ তোমার ঘর।

ইন্দ্র বলল, সত্যি বলছ?

বিশ্বাস কর, এত সুন্দর সাজান ঘর আমি দেখিনি। এ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া বড় কষ্টকর।

তোমার পক্ষেও?

ললিতা আবার ইন্দ্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখতে লাগল। হাতের চিরুনী চলতে লাগল মাথার চুল চিরে চিরে।

ইন্দ্র বলল, তুমি তৈরি হয়ে নিলেই আমি খাবারের অর্ডার দেব।

আমি তৈরি। তুমি খাবার আনিয়ে নিতে পার।

ইন্দ্র ফোন তুলে নিয়ে দুটো খাবার দিয়ে যেতে বলল।

খেতে খেতে ইন্দ্র বলল, এত অল্প সময়ের জন্যে আসার কোন মানে হয়?

ললিতা বলল, তবু তো তোমাকে দেখতে পেলাম।

আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগছে না। তুমি চলে গেলে মনে হবে, সত্যিই কি ললিতা এসেছিল আমার ঘরে!

ললিতা বলল, বিধাতা তোমার কাছে আমাকে ক্ষণিকের অতিথি করেই পাঠিয়েছেন। চিরদিনের সঙ্গী করে পাঠান নি।

ইন্দ্র একথার কোন জবাব দিতে পারল না। সে অন্যমনস্কভাবে খেয়ে যেতে লাগল।

ললিতা এবার খাওয়া থামিয়ে বলল, কথা বলছ না যে? তুমি সেই চলে এসেছ, আর তো কোন খোঁজই নাও নি। আমি না এলে আর কি দেখা হত কোনদিন। এই তো চলে যাব, আর কি কোনদিন তোমার মুখের কথা শুনতে পাব।

ইন্দ্র বলল, এমন করে বললে তোমার মুখের দিকে শুধু চেয়েই থাকতে হবে আমাকে, কোন কথা আর মুখ দিয়ে বেরুবে না।

খাওয়া শেষ হলে ওরা বিছানার ওপর পাশাপাশি বসল।

ললিতা বলল, সরিতাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু উপায় নেই, এখুনি চলে যেতে হবে। আচ্ছা, সরিতাকে দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে, তাই না?

ইন্দ্র বলল, তুমি যেমন দেখেছ তেমনি।

ললিতা আধশোয়ার ভঙ্গিতে বসে আছে। বিছানার ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে হাতের তেলোয় থুতনী রেখে চেয়ে আছে ইন্দ্রের মুখের দিকে।

ললিতা বলল, এড়িয়ে যাচ্ছ কেন বাবা। তোমার সুন্দরী বউটির ওপর তো আমি আর ভাগ বসাতে যাচ্ছি না।

ললিতা জানতে চাইছে সরিতার ব্যাপারে ইন্দ্রের আগ্রহ কতখানি। কোন ঈর্ষা নয়, শুধু কৌতূহল। যেখানে সে বঞ্চিত সেখানে অন্যের লাভ কতখানি তাই খতিয়ে দেখার লোভ। সরিতার সুখে নিজের গোপন মনের গভীরে একটুখানি দীর্ঘশ্বাস, রাতের নিঃসঙ্গ শয্যায় দু ফোঁটা চোখের জল। এতে নিজের মনের ভেতর দুঃখটুকুকে জিইয়ে রেখে এক ধরনের তৃপ্তি পাওয়া। কারু কোন সুখ কেড়ে নেওয়া নয়, শুধু একটুখানি দুঃখবোধ আর তাই নিয়ে বেঁচে থাকা।

ইন্দ্র হঠাৎ বলে বসল, ললিতা আর ইন্দ্র প্রসঙ্গ সরিতার অজানা নয়।

ললিতা চমকে উঠে বলল, সত্যি, তুমি সরিতার কাছে সব বলে দিয়েছ, কি লজ্জা!

ইন্দ্র বলল, বিশ্বাস কর, এক বর্ণ আমার মুখ দিয়ে বেরোয় নি।

তবে সে জানল কি করে?

তীক্ষ্ণ অনুমান শক্তি তার। সে তোমার স্বামীর ফটো সরিয়ে নেবার ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। ছড়ান গোলাপ দেখেছে ঘরের মেঝেতে। বাইরের ঘরে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় তোমার চোখে দেখেছে লালের আভা। এর পর তার ঘটনাটুকু বুঝে নিতে বেগ পেতে হয় নি। আমাকে জিজ্ঞেস করতে আমি সবই স্বীকার করে গেছি। বলেছি দোষ ললিতার নয়, আমার। ও কিন্তু সব ঘটনাকেই খুব সহজ আর স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে।

ললিতা মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, আমি আর কোনদিন সরিতাকে মুখ দেখাতে পারব না ইন্দ্র। আমি তার কাছে অনেক ছোট হয়ে গেছি।

ইন্দ্র বলল, একটুও না। ও যদি তোমার সম্বন্ধে বিরূপ কিছু মন্তব্য করত তাহলে আমি কথাটা আদপেই তোমার কাছে তুলতাম না।

ললিতা সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল কতক্ষণ। এক সময় বলল, জান ইন্দ্র, আমি আর গাছ থেকে গোলাপ তুলি না।

ইন্দ্র প্রশ্নের ভঙ্গিতে চোখ তুলে তাকাল।

ললিতা বলল, গোলাপের শ্রেষ্ঠ উপহার আমার দেওয়া হয়ে গেছে তাই এ জীবনে গোলাপ তোলার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। গাছের ফুল গাছে ফোটে, গাছের তলাতেই ঝরে পড়ে।

ইন্দ্র বলল, আমি তোমাকে যদি কিছু দিয়ে থাকি তাহলে শুধু দুঃখই দিয়েছি, সামান্যতম তৃপ্তি দিতে পারি নি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ললিতা বলল, যাবার সময় আর স্মৃতি নয়, দুঃখ নয়। শুধু তুমি আমার একান্ত প্রিয়জন, এইটুকু ভেবে যাব। আমাদের আর কোনদিনও দেখা হবে না, এই সত্য মেনে নিতে হবে। তারপর যদি দেখা হয়ে যায় তা হবে একান্ত আকস্মিক। আর শোন, সরিতাকে আমি ভালবাসব। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত তাকে ভালবাসতে বাসতে, তাকে বুকের ভেতর অনুভব করতে করতে আমি সরিতা হয়ে যাব। তখন যত দূরেই থাকি না কেন সরিতার ভেতর দিয়ে তোমাকে নিবিড় করে পাব।

ইন্দ্র চেয়ে আছে ললিতার মুখের দিকে। কোন কথা বলছে না। এ যেন অন্য ললিতা। যে ভালবাসার তপস্যায় হার মানতে জানে না। চোখের দেখায় হারলেও মনের অলক্ষ্য লোকে জিতে যায়।

ইন্দ্রের মনে হল, ললিতা জয়ের ফোঁটাটি কপালে নিয়েই জন্মেছে। সে হার মানবে না, কোনদিনও না। দুঃখ পেতে পারে কিন্তু দুঃখ জয়ের মন্ত্রও তার জানা।

আশ্চর্য, ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরল ইন্দ্র। সরিতা ওপারে কথা বলছে।

কি করছ তুমি?

ইন্দ্র বলল, মিথ্যে বলব না সত্যি বলব?

তার মানে?

মানে খুব সোজা। মিথ্যে বললে বলব, শুয়ে শুয়ে তোমার কথা ভাবছি। আর সত্যি বললে বলতে হবে একটি মেয়ে আমার কাছে বসে আছে, তার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলছি।

ললিতা তাড়াতাড়ি ফোনের মুখে হাত চেপে রেখে বলল, তুমি এমন করলে আমি কিন্তু এখুনি পালাব।

ইন্দ্র মাথা নেড়ে জানাল, তার কোন ভয় নেই।

সরিতা ওপার থেকে বলল, মেয়েটি দেখতে কেমন?

ঠিক তোমার মত।

নাম কি?

ললিতা।

পেছন থেকে আবার ধাক্কা দিল ললিতা।

ইন্দ্র ফোনের মুখে হাত চেপে রেখে বলল, কোন ভয় নেই তোমার, সবটুকুই সরিতা রসিকতা বলে ধরে নিচ্ছে।

সরিতা বলল, এখনও মনে হচ্ছে ভুলতে পারনি মেয়েটিকে ?

ললিতাকে কি ভোলা যায়, তুমিই বল না?

খুব যে।

ইন্দ্র বলল, তোমারই তো বান্ধবী। বলতে পার তুমি আর ললিতা অভিন্ন হৃদয়। সেখানে একজনকে মনে রেখে আর একজনকে ভুলে যাই কি করে?

মনে হচ্ছে মুডে রয়েছ?

দুটো বাজতে চলল, দিদি কি এখনও ফেরে নি?

ফোন করেছে, ফিরতে রাত হবে। মাধবী আম্মাকে কে যেন জানিয়েছে জন্মভূমির রিপোর্টার মিঃ পিল্লাই অ্যাকসিডেন্টে বুকে আঘাত পেয়েছেন। তাই শুনে প্রেমা ত্রিবান্দ্রমের হাসপাতালে ছুটেছে।

খুব খারাপ লাগছে। ভদ্রলোক সত্যিকারের একজন গুণগ্রাহী। যেভাবে তোমার দিদির পাবলিসিটি দিয়েছেন তা মনে রাখার মত।

আমি আসছি তোমার ওখানে।

ইন্দ্র বলল, ললিতার সঙ্গে দেখা করতে চাও তো চলে এসো।

আবার পেছন থেকে ধাক্কা দিল ললিতা। ইন্দ্র সমানে মাথা নেড়ে নেড়ে তাকে আশ্বাস দিল।

সরিতা বলল, তাহলে আর যাব না।

সে কি, বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করবে না?

অ্যাই শোন, লক্ষ্মীটি তুমি একটু কষ্ট করে চলে এস। দুজনে সমুদ্রতীরে পালাব।

আসছি।

রাখছি তাহলে।

সরিতা আর ইন্দ্র ফোন ছেড়ে দিল।

ললিতা বলল, তুমি কি বেরুবে?

ইন্দ্র বলল, দুটো বাজল। তোমারও যাবার সময় হয়ে এল। চল তোমাকে এগিয়ে দিই। ঐ পথে বাস ধরে সরিতার কাছে একবার যেতে হবে।

ললিতা হেসে বলল, আমাকে এগিয়ে দেবার বদান্যতা না সরিতাকে চোখের সামনে পাবার তাড়া?

ইন্দ্র বলল, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাই চল। তুল্লিকে নিয়ে নেব ওখান থেকে।

সরিতা দারুণ খুশী হবে।

ললিতা বলল, থাক আমি কাউকে খুশী করতে আসি নি এ দুনিয়ায়। একা এসেছি একাই যাব। তুমি দয়া করে যদি কোভালম প্যালেস হোটেল অব্দি যাও সেই আমার লাভ।

ইন্দ্র বলল, দাঁড়ালে কেন ললিতা, বস খানিক সময়। দশ মিনিটে প্যালেস হোটেলের সামনে পৌঁছে যাব। এখন ঠিক ঠিক একটা বেজে সাতান্ন।

ললিতা উঠে দাঁড়িয়েছিল, আর বসল না। ঘরের ভেতর টুকিটাকি জিনিসগুলো দেখে পায়চারি করতে লাগল।

একটা অ্যালবাম টিপয়ের ওপর রাখা ছিল। সেটা তুলে নিয়ে ছবি দেখতে লাগল। একটা ছবির ওপর চোখ আটকে গেল ললিতার।

আড় চোখে তাকিয়ে ওর কাণ্ডগুলো লক্ষ্য করছিল ইন্দ্র।

ললিতা বলল, এ ছবিখানা কার? বলেই ইন্দ্রের দিকে তুলে ধরল ছবিটা।

ইন্দ্র বলল, ক্রিকেট খেলছে যে ছেলেটি ?

ললিতা মাথা নাড়ল।

ইন্দ্র বলল, আজ থেকে ছ-সাত বছর আগে এই তরুণটির সঙ্গে ইন্দ্র রায় অভিন্ন দেহ, অভিন্ন হৃদয় ছিল।

দেবে অমাকে ছবিখানা?

এ ছবি নিয়ে তুমি কি করবে?

আচ্ছা থাক।

ইন্দ্র উঠে গেল ললিতার পাশে। বলল, তুমি এত নিষ্ঠুর কেন ললিতা। নিজেকে বারে বারে সরিয়ে নিচ্ছ। এতটুকুতেই অভিমান উপচে উঠছে তোমার দুটি ঠোঁটে।

ললিতা বলল, নিঃসঙ্গতার দুঃখ তুমি বুঝবে না ইন্দ্র। না, কথাটা ঠিক বলা হল না। আমার মত নিঃসঙ্গ যেন কোথাও কেউ না থাকে, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে যাব মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত।

ললিতার বড় বড় দুটি চোখে জলভরা ঝিনুকের ছায়া।

ইন্দ্র ললিতাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, বাইরে সঙ্গ দিতে পারলাম না বলে কি তুমি আমাকে এমন করে দুঃখ দেবে ললিতা। আমার বুক জুড়ে যে মেয়েটি গোলাপ ছড়িয়ে দিল তার গন্ধ যে মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গেও মিলিয়ে যাবে না, সে কথা তোমাকে কেমন করে বোঝাই।

ললিতা বলল, মানুষের দেহ আর মন একযোগে যদি চলত তাহলে কত সমস্যারই না সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু তা হয় না কেন ইন্দ্র? এই মুহূর্তে সরিতার কথা ভেবে আমার যে মন তোমার কাছ থেকে সরে যেতে চাইছে, সেই মনই আবার অসহায় হয়ে পড়ছে রাতের অন্ধকারে। তখন দেহ চাইছে তোমার উত্তপ্ত আলিঙ্গনে নিজেকে নিবিড় করে বাঁধতে। এ বোধহয় মানুষের চিরদিনের সমস্যা ইন্দ্র, যার কোন সমাধান নেই।

ইন্দ্র বলল, এমনি অন্তহীন, সান্ত্বনাহীন সমস্যার দোলায় মানুষকে দুলতে হবে। তবু মনে রেখ, ঈশ্বর আমাদের মন বলে একটি আশ্চর্য বস্তু দিয়েছেন। যাকে বাইরে থেকে দেখা যায় না। আর তাই জগতের অনেক দুঃখ অনেক বিপর্যয়ের হাত থেকে মানুষ বেঁচেছে।

আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি, তাই বলে আমার মন অতীতের স্মৃতির পাতা উল্টে কোন প্রেমিকার জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে না, এ তো হতে পারে না। অনুরূপভাবে আমার স্ত্রী যদি তার কুমারী জীবনের কোন আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের কথা ভেবে গোপনে চোখের জল ফেলে তাহলেও আমার কিছু বলার নেই। আশ্চর্য এই দেহ, আশ্চর্য এই মন। আমার মনে হয়, যার মন বলে কোন বস্তু আছে তার এমনি এমনি ব্যভিচারের হাত এড়াবার কোন উপায় নেই। এটাই সত্য ললিতা। বাকী যাঁরা নীতি শাস্ত্র রচনা করেন তাঁরা সত্যকেই এড়িয়ে যান। তাই বলছি, সরিতাকে বুকে নিয়ে ললিতার কথা যদি মনে পড়ে যায় তাহলে ইন্দ্র রায়কে আমি ব্যভিচারের দোষে অভিযুক্ত করব না। সেদিন ললিতা সরিতা একাকার হয়ে যাবে। সমান মর্যাদায় তারা থাকবে আমার বুক জুড়ে।

ললিতা ধীরে ধীরে ইন্দ্রের বাহুর বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। চোখের জলের শুকনো দাগগুলো রুমালে মুছে নিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, অভয় পেলাম তোমার কাছ থেকে। তোমার কথা ভাবতে গিয়ে বার বার মনে হত, আমি এ কি অন্যায় করছি। কিন্তু আজ খোদ মালিকের কাছ থেকেই অভয় পেয়ে গেলাম।

বেরিয়ে এল ওরা দুজনে হোটেল থেকে। ললিতার মনে হল, তার আর কোন খেদ নেই, না পাওয়ার কোন দুঃখ নেই।

ওরা হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। নারকেল গাছের আলোছায়ার ভেতর দিয়ে ওরা চলতে লাগল প্যালেস হোটেলের দিকে। ইন্দ্র দেখল, ললিতার সাদা মুণ্ডি আর নেরিয়দের ওপর দিয়ে সোনালী আলো আর ছায়ার কালো ঘন ঘন আসা যাওয়া করছে। এ যেন ললিতা নামের মেয়েটির আশ্চর্য মনের ছবি।

ওরা প্যালেস হোটেলের একটু দূরে থমকে দাঁড়াল। দুজন দুজনকে আলিঙ্গন আর চুম্বনে বেঁধে রাখল। কিছু পরে যে যার পথে চলে গেল।

ওয়ার্ড মাস্টারের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে দোতলার সাত নম্বর রুমে ঢুকল প্রেমা। অনেকগুলি পেয়িং বেড পাশাপাশি রয়েছে। বাইশ নম্বর বেড ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তের এক কোনায়। বাইরে পুরোপুরি সন্ধ্যা না নামলেও রুমের ভেতর কোন কোন বেডের পাশে টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। ভিজিটাররা ভীড় করে আছে তখনও।

প্রেমা প্রশস্ত ঘরখানা পেরিয়ে দক্ষিণ প্রান্তে বাইশ নম্বর বেডের কাছে পৌঁছল। চিত হয়ে শুয়ে আছেন মিঃ পিল্লাই। বুক আর ডান হাত প্ল্যাস্টারে মোড়া। এ বেডে আলো জ্বলেনি। দক্ষিণের জানালা খোলা। গোধূলির ম্লান খানিকটা আলো তখনও ঘরের ভেতর থেকে সরে যায়নি। প্রেমা মাথার পাশে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল মিঃ পিল্লাইয়ের দিকে। সমস্ত মুখে একটি অসহায় নিঃসঙ্গতার ছায়া। সিলিংয়ের দিকে চোখ মেলে স্থির হয়ে কিছু যেন ভাবছেন মিঃ পিল্লাই। ঐ সামান্য কয়েক ইঞ্চি পুরু সিলিং আবৃত করে রেখেছে সারা নক্ষত্রখচিত আকাশটা। সামান্য একটুখানি আবরণ তবু কি অসামান্য তার বাধা দেবার ক্ষমতা। মিঃ পিল্লাই কি ভাবছেন তাঁর জীবনের কথা? এক টুকরো আকাশ আর কটি তারা নিয়ে সুখী একটি সংসার তিনি পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঐ একটুখানি ভাগ্যের বাধা কিছুতেই অতিক্রম করতে পারলেন না। সুখের জন্যে ব্যাকুল হলেন, কিন্তু ঐ তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের কাছে একবিন্দু অমৃত নিয়ে একটি কোমল বাহু এগিয়ে এল না। শুধু পথ চাইতে চাইতে, আশাভঙ্গের দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে দিনগুলো কোথা দিয়ে পার হয়ে যেতে লাগল। শুধু পার হয়ে যাওয়া নয়, দেহের সর্বত্র রেখাচিত্র এঁকে এঁকে চলে যাওয়া। এবারের মত বসন্ত গত জীবনে—একটা সুতীব্র হাহাকার দূরাগত ধ্বনির মত বাজতে বাজতে কাছে এগিয়ে আসতে লাগল।

প্রেমা যন্ত্রচালিতের মত কখন হাত রাখল মিঃ পিল্লাইয়ের মাথার একরাশ চুলের ওপর। পিল্লাই ঘাড় কাত করে দেখার চেষ্টা করতেই প্রেমা পাশে এগিয়ে এল।

মিঃ পিল্লাই যেন ভাবতেই পারছেন না ব্যাপারটা। সন্ধ্যার আবছায়া ঘনিয়ে উঠেছে ঘরের এই কোণে। তিনি ভুল দেখছেন না তো! কোন মমতাময়ী নার্সকে কি তিনি তাঁর এক বিশেষ পরিচিত মেয়ে বলে ভুল করলেন।

প্রেমা আস্তে বলল, সুইচটা অন করে দেব?

বাঁ হাত বাড়িয়ে ধরলেন মেয়েটিকে মিঃ পিল্লাই। গলা দিয়ে ক্ষীণ একটা আওয়াজ বেরুল, তুমি প্রেমা! আমি ভুল কিছু বলছি না তো সিস্টার?

প্রেমা সুইচটা অন করে দিল। মৃদু একটুকরো আলো ছড়িয়ে পড়ল বিছানায়। প্রেমা একপাশে বসে বলল, কেমন মনে হচ্ছে এখন?

মিঃ পিল্লাই অভিভূত হয়েছেন বলে মনে হল। ভাঙা গলায় বললেন, আমি ভাবতেও পারিনি প্রেমা, এখানে তোমাকে দেখব।

প্রেমা বলল, মাধবী আম্মার কাছে খবরটা পেয়েই চলে এসেছি সিধে।

আবেগে গলাটা বন্ধ হয়ে গেল মিঃ পিল্লাইয়ের। তিনি শুধু প্রেমার হাতটা চেপে ধরে রইলেন। তার দিকে তাকালেন না। অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে উদ্গত আবেগকে চাপতে লাগলেন।

প্রেমা মিঃ পিল্লাইয়ের অবস্থাটা বুঝতে পারছিল। সে বলল, আপনি যে শিগগির ভাল হয়ে উঠবেন সে খবর আমি এনকোয়ারি থেকে জেনে এসেছি।

এবার কথা বললেন মিঃ পিল্লাই প্রেমার দিকে মুখ ফিরিয়ে, এখন মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে এই বিছানায় পড়ে থাকলেও কোন দুঃখ নেই।

প্রেমা বলল, কোন কষ্ট হচ্ছে না আপনার?

ম্লান হাসলেন মিঃ পিল্লাই। বললেন, শরীরের কষ্ট তো খানিকটা আছেই। তবে তা একরকম করে সইতে পারছি, কিন্তু নিঃসঙ্গতার ভার তো বওয়া যায় না।

প্রেমা কিছু না বলে মিঃ পিল্লাইয়ের অনাবৃত হাতখানার ওপর তার নরম আঙুলগুলো বোলাতে লাগল। এই মুহূর্তে কোথা থেকে একটা মমতার ঢেউ বয়ে গেল তার বুক ভাসিয়ে দিয়ে। সে মিঃ পিল্লাইয়ের চুলের ভেতর দিয়ে তার আঙুলগুলো এবার চালাতে লাগল।

কেউ কোন কথা বলতে পারল না সেই মুহূর্তগুলোতে। এ যেন শুধু কর্তব্য নয়, কর্তব্যের অতিরিক্ত কিছু। একজন পেয়ে চলেছে, অন্যজন দিয়ে যাচ্ছে।

ভিজিটারদের হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবার ঘণ্টা বেজে গেছে। এখন সারা ওয়ার্ড শূন্য। ওরা সময়ের সীমা পেরিয়ে কোথায় চলে গেছে, যেখানে নির্দিষ্ট ঘণ্টার ধ্বনি পৌঁছয় না।

একটি নার্স এসে পাশে দাঁড়াতেই উঠে দাঁড়াল প্রেমা। বলল, সরি, ভেরী সরি।

নার্সের ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা। এরকম ছবি সে বহু দেখেছে। প্রিয়জনকে ছেড়ে যেতে চায় না কেউ সহজে।

প্রেমা বলল, আমি আবার আসব। একটু সময় পেলেই চলে আসব।

মিঃ পিল্লাই মাথা নাড়লেন। প্রেমা চলে এল সাত নম্বর রুম থেকে। করিডোর পেরিয়ে সিঁড়িতে পা দিতে যাচ্ছে, পেছন থেকে মেয়েলি গলায় ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল।

মুখ ফিরিয়ে দেখে রুম নাম্বার সেভেনের সেই নার্সটি।

খুশিভরা মুখখানা তুলে নার্সটি বলল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

নিশ্চয়ই বলুন।

আপনি কি সেই বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী মিস মেনন?

প্রেমা হেসে বলল, আদপেই বিখ্যাত নই, তবে আমি প্রেমা মেনন, মোহিনী আট্যমের শিল্পী।

নার্সটি বলল, আমি আপনার নাচ দেখেছি, পেপারে ছবিও দেখেছি। আপনাকে দেখেই আমি অনুমান করেছিলাম। আপনি চলে আসার পর পেসেন্টকে জিজ্ঞেস করে আমার অনুমান যে সত্যি তা বুঝতে পারলাম।

প্রেমা বলল, উনি জন্মভূমি পত্রিকার রিপোর্টার মিঃ পিল্লাই।

নার্সটি বলল, আমি তা জানি। আর ভদ্রলোক ভীষণ ভাল। চুপচাপ থাকেন। চেঁচামেচি করে নার্সদের ডাকহাঁক করেন না। প্রকৃতিতে বড় শান্ত। দু' একটা কথা বললে উনি বেশ খুশী হয়ে ওঠেন। কাগজের দু'একজন লোক ছাড়া ওঁর ফ্যামিলির কাউকে আসতে দেখিনি আমরা। আচ্ছা, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে আর একটা প্রশ্ন করব।

বলুন।

আপনি কি ওঁর ফ্যামিলির সঙ্গে যুক্ত?

বলতে পারেন, আবার নাও বলতে পারেন।

ফিক্ করে হেসে ফেলল মেয়েটি। বলল, কি রকম?

রক্তের সম্পর্ক নেই তবে ওঁকে আত্মীয় বলেই ভাবি।

একটু থেমে প্রেমা বলল, উনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

নার্সটি তরুণী। মুখের ভেতর এখনও নিছক কর্তব্যের কঠিন রেখাগুলো আঁকা হয়নি। হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে এসে গেল।

আপনার নাচ হলে একটু খবর যেন পাই। বড় ভাল লাগে আপনার নাচ।

প্রেমা বলল, আপনাকে ফোনে কোথায় পাব বলুন?

নার্সটি বলল, কখন ডিউটি, কখন নেই। আপনি হসপিট্যালের ফোনে পাবেন না। আর আমার নিজের কোন ফোনও নেই।

প্রেমা বল, আমার ফোন নাম্বারটা নিয়ে রাখতে পারেন।

মেয়েটি প্যাড নিয়ে এসে বলল, লিখে দিন আপনার নাম ঠিকানা আর ফোন নাম্বার। আপনার অটোগ্রাফটাও পেয়ে যাব।

প্রেমা একটুখানি হেসে প্যাডের পাতায় নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার লিখে দিয়ে বলল, এখন আমার যে একটু উপকার করতে হবে ভাই।

কি বলুন?

একটা কেবিনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

নার্সটি কিছুক্ষণ চিন্তা করে মাথা নাড়ল। বলল, একটিও খালি নেই।

প্রেমা বলল, সে তো আমি নীচ থেকে উঠে আসার সময় জেনে এসেছি।

তরুণী নার্সটি বলল, ওগুলো খুব তাড়াতাড়ি খালি হবার সম্ভাবনাও কম।

প্রেমা পরিস্থিতিকে সহজ করে দেবার জন্য বলল, না থাকলে আর পাওয়া যাবে কি করে। আপনি

বরং পেসেন্টের দিকে একটুখানি নজর রাখবেন ভাই, তাহলেই হবে।

নার্সটি হঠাৎ কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, ভি আই পিদের জন্যে একটি এয়ারকন্ডিশন্ড কেবিন রয়েছে। ওটি দেবার অধিকার প্রিন্সিপাল ছাড়া কারু নেই। আসুন, আমি কথা বলে দেখছি। মুড ভাল থাকলে পেয়ে যাবেন।

প্রেমা নার্সটির সঙ্গে নীচে নেমে প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারের দিকে চলল।

প্রিন্সিপাল তাঁর বসার ঘরে ছিলেন। মৃদু আলোতে ড্রিঙ্ক করছিলেন সম্ভবত। দারোয়ান নার্সটিকে চেনে তাই বাধা দিল না। প্রেমাকে ইঙ্গিতে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে ঢুকল মেয়েটি।

ভেতরে কিছু কথা হচ্ছিল। বাইরে স্পষ্ট কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। এক সময় হা হা করে হেসে উঠেই থেমে গেলেন প্রিন্সিপাল।

কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এল নার্সটি। বলল, চলুন, আপাতত একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কিন্তু ভি আই পি এলেই খালি করে দিতে হবে, এই কন্ডিশন। চার্জ প্রায় দেড়গুণ।

প্রেমা বলল, টাকার জন্যে ভাবছি না, পাওয়া নিয়ে কথা।

নার্সটি বলল, ক্রাইস্টের কাছে প্রার্থনা, অন্তত দিন পাঁচেক যেন রাজ্যের ভি আই পিরা সুস্থ দেহে থাকেন।

প্রেমা হেসে বলল, পাঁচদিন কেন?

তরুণী নার্সটি বলল, বুঝলেন না, পাঁচদিন পরে আর একখানা কেবিন খালি হয়ে যাচ্ছে। তখন দরকার হলে ওটাতেই সিফট করে নেব।

পরের দিন প্রেমা এল। কেবিনের অগ্রিম দেয় টাকা সে আগেই দিয়ে গিয়েছিল। বিকেলের দিকে কিছু ফল নিয়ে ঢুকল সে। মিঃ পিল্লাই যাতে সাড়া না পান সেজন্যে জুতোয় আওয়াজ না তুলে অতি ধীরে দরজা ঠেলে ঢুকল। কিন্তু ঢুকেই দেখল মিঃ পিল্লাই তার দিকেই চেয়ে আছেন।

প্রেমা মিটসেফের পাল্লা খুলে ফলগুলো একটা প্লেটে রাখল। চায়ের একটা কাপ আর প্লেট ধুয়ে নিল বেসিনে। কতকগুলো আঙুর ধুয়ে কাপে ভরে নিয়ে এল।

বাধ্য ছেলের মত শুয়ে রইলেন মিঃ পিল্লাই। আঙুরগুলো সুন্দর নরম আঙুলে তুলে তুলে খাইয়ে দিতে লাগল প্রেমা।

খাওয়া শেষ হলে প্রেমা কাপ প্লেট পরিষ্কার করে যথাস্থানে রেখে দিয়ে এল। বিছানার পাশে বসে মুখ নীচু করে বলল প্রেমা, কেমন বোধ করছেন এখন?

খুব খারাপ।

খারাপ! কেন? নীচের এনকোয়ারির রিপোর্ট তো খুবই ভাল।

মিঃ পিল্লাই বললেন, শরীর ভাল থাকলেই কি সব?

প্রেমা বলল, কেন মনের আবার কি হল?

মিঃ পিল্লাই বললেন, আমি তো ত্রিবান্দ্রমের মহারাজ নই যে এয়ারকন্ডিশন্ড কেবিনে থাকব। এমনি পেইং বেডের চার্জের জন্য বন্ধুদের কাছে ঋণী হয়ে রয়েছি। আবার তুমি আমার সবচেয়ে বড় মহাজন হয়ে বসলে। ডান হাত প্লাস্টারে বাধা। আমি যে সামান্য একখানা চেকে সই করব তারও উপায় নেই।

প্রেমা বলল, বিজনেসম্যানের মেয়ে আমি, এমন সুযোগ ছাড়া যায় কখনো। এখন দাদন দেব তারপর চক্রবৃদ্ধি সুদে উসুল করে নেব।

মিঃ পিল্লাই কি যেন বলতে চাইলেন, সত্যি প্রেমা আমি আশ্চর্য....।

কথাটা আর শেষ কবতে পারলেন না মিঃ পিল্লাই। প্রেমা বলল, কাজ নেই আর একটা নতুন আশ্চর্যে। এমনিতেই পৃথিবী জুড়ে সাত সাতটা আশ্চর্য বিরাজ করছে।

মিঃ পিল্লাই করুণ গলায় বললেন, একটা কথাও কি তুমি আমাকে বলতে দেবে না?

সুস্থ হয়ে নিন আগে, তারপর আমার বাড়ি নিয়ে গিয়ে মুখোমুখি বসে এক বান্ডিল কথা শুনব।

মিঃ পিল্লাই নিষ্পলক চেয়ে রইলেন প্রেমার মুখের দিকে। একটুখানি হাসির রেখা শুধু ফুটে রইল।

প্রেমা বলল, সুস্থ হওয়া নিয়ে কথা। টাকা কোথা থেকে আসছে সে খোঁজ রোগীর রাখার কথা

নয়।

মিঃ পিল্লাই ওদিক দিয়ে গেলেন না। বললেন, এই কেবিনের নার্সটি তোমাকে দেখবে বলে সারাদিন অস্থির হয়ে আছে।

প্রেমা ঝর্নার মত নুড়ি গড়ানো হাসি হেসে বলল, আমি কি এতই দর্শনীয়, বলুন না মিঃ পিল্লাই।

মিঃ পিল্লাই বললেন, তুমি শুধু দর্শনীয়ই নও আকর্ষণীয়।

আচ্ছা, কেবিনের নার্সটি কি ঐ পেয়িং বেডের সেই নার্স?

না। তবে তার বান্ধবী। তার মুখ থেকেই তোমার কথা শুনেছে বলে মনে হয়। সারাদিন দুজনে এখানে ওখানে কাজের ফাঁকে ফাঁকে লাট্টুর মত ঘুরছে, গল্প করছে।

প্রেমা বলল, আপনি ভাল হয়ে জন্মভূমির পাতায় আমার একটা পাবলিসিটি দিয়ে দেবেন।

কি ধরনের পাবলিসিটি চাই বল?

এই ধরুন লিখলেন,—যেখানে যেখানে আলোক শিখার মত নাচতে নাচতে চলেছে নর্তকী প্রেমা, সেখানে সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে প্রেমাকে দেখবে বলে।

মিঃ পিল্লাই বললেন, তুমি বিশ্বজয়ে বেরুবে প্রেমা?

প্রেমা বলল, আপাতত বিশ্ববিজয় থাক, আমি প্রাচীন ভারতের রাজাদের মত দিগ্বিজয়ে বেরুতে পারলেই খুশী।

মিঃ পিল্লাই বললেন, একটা ব্যালে গ্রুপ তৈরি কর প্রেমা। তাদের নিয়ে তোমার পরিকল্পনা মত নতুন নতুন নাচ কম্পোজ কব। সারা দেশের মানুষকে উপহার দাও। আশ্চর্য একটা উন্মাদনায় কাটবে তোমার দিন। তাছাড়া দেশকে মহৎ একটা কিছু তুমি দিয়েও যেতে পারবে।

প্রেমা গালে আঙুল ঠেকিয়ে চুপচাপ কি যেন ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে তলিয়ে গেল চিন্তার গভীরে। কথাটা নাড়া দিয়েছে তার সমস্ত মনটাকে। এ কাজে একটি মানুষকে চাই তার পাশে। সে হবে তার প্রেরণা, তার সাথী, তার গুরু। দেবন! দেবন কি সাড়া দেবে তার ডাকে? দেবন তার গ্রুপের সারথী হলে সে যে বিশ্বজয়েও বেরুতে পারে!

কি ভাবছ?

প্রেমার ধ্যান ভাঙল। বলল, আপনার কথাই ভাবছি। দারুণ একটা পরিকল্পনা মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন আপনি।

মিঃ পিল্লাই বললেন, তোমার প্রতিভা আছে তাই এ কথা মনে এল।

প্রেমা বলল, যদি পরিকল্পনা মত কাজে এগোই তাহলে পুরোপুরি সাহায্য আমার দরকার হয়ে পড়বে।

যদি পঙ্গু হয়ে না পড়ি প্রেমা, তাহলে সারা ভারত তোমার গ্রুপের সঙ্গে ঘুরে বেড়াব। যেখানে যেভাবে পাবলিসিটি দেওয়া দরকার তার সব দায়িত্ব আমি নিজের ওপর তুলে নেব।

প্রেমা বলল, আপনাকে পঙ্গু হতে দিচ্ছে কে? সারা ভারত আপনি একটি স্বর্ণ ঈগলের মত ডানা মেলে ঘুরে বেড়াবেন।

মিঃ পিল্লাই হেসে বললেন, অন্তত তোমার জন্যে আমাকে উঠে দাঁড়াতেই হবে।

একটি নার্স ঘরে ঢুকল। প্রেমার দিকে দারুণ রকম কৌতূহলী চোখে তাকাল। তারপর এগিয়ে এসে টেম্পারেচার নিল। চার্টে নোট করল। যাবার সময় প্রেমার দিকে চেয়ে একটু হাসল। আলাপ করতে চায় অথচ কিভাবে করবে তা বুঝে উঠতে পারছে না।

প্রেমা হেসে বলল, আপনার রোগী শান্ত হয়ে আপনার নির্দেশ মেনে চলছেন তো, না আপনাকে মাঝে মাঝে ধমক দিতে হচ্ছে?

মেয়েটি আগের নার্সটির মতই ছেলেমানুষ। সে প্রেমার কথা শুনে খিল খিল করে হেসেই ফেলল।

হাসি থামলে বলল, খুব বেশি রকমের শান্ত। ওঁর দিকে না তাকালে বোঝাই যায় না উনি ঘরে আছেন কি নেই।

প্রেমা বলল, ওঁকে কিন্তু একটুও বিশ্বাস করবেন না। উনি চুপচাপ থাকলে কি হয় মনে মনে সব

নোট করছেন। একবার বেরুতে পারলে হয় মেডিকেল কলেজ কম্পাউন্ড ছেড়ে। তারপর আপনাদের সম্বন্ধে ওঁদের বিখ্যাত পত্রিকায় রিপোর্ট করে দেবেন।

মিঃ পিল্লাই বললেন, রিপোর্টাররা খুব বদ লোক হয় বুঝি ?

প্রেমা হেসে বলল, মোটেও না, তবে আপনার কথা আলাদা।

আমি বুঝি খুব খারাপ লোক ?

যদি খারাপ বলি তাহলে আমার নামে উল্টো রিপোর্ট করে দেবেন তো?

মিঃ পিল্লাই বললেন, তোমার নামে উল্টোপাল্টা রিপোর্ট করলে তোমার ফ্যানরা আমাকে আস্ত রাখবে ভেবেছ? বুক ভেঙেছে, এরপর মাথাটাও ভাঙবে।

নার্সটি হেসে বলল, আপনি দারুণ কথা বলতে পারেন।

কি রকম?

এই যে বললেন, বুক ভেঙেছে।

হো হো করে হেসে উঠতে গিয়ে বুকে একটা ব্যথা পেয়ে থেমে গেলেন মিঃ পিল্লাই।

নার্সটির মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। মিঃ পিল্লাইয়ের খুব কাছে সরে এসে বলল, মনে হচ্ছে আপনার বুকে লাগল?

মিঃ পিল্লাই এবার আস্তে বললেন, এর চেয়ে অনেক বেশি আঘাতই পেয়েছি, সুতরাং এইটুকু সইবার শক্তি আমার আছে।

নার্সটি এবার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল। পরে মুখখানা গম্ভীর করে বলল, এমন আচমকা হেসে উঠবেন না।

প্রেমা বলল, এই তো সিস্টারের মত কথা।

নার্সটি বলল, আপনি নিশ্চয় মিস মেনন।

প্রেমা বলল, আপনার অনুমানের ক্ষমতা প্রশংসা করার মত।

আমি আপনার নাচ দেখেছি, পদ্মনাভপুরম প্যালেসে। কিন্তু অনেক দিনের পর দেখছি, তাই একবার যাচাই করে নিতে হল।

আপনার বান্ধবী আমার কথা কি বলেন?

ও। আপনি লতা আয়েঙ্গারের কথা বলছেন? সারা দিন আপনার কথাই ও আমাকে বলছিল। ওতো আপনার একজন ফ্যান হয়ে গেছে।

তাই নাকি ?

ডিউটি পড়েছে, তাই আসতে পারছে না। নইলে এখুনি এখানে চলে আসত।

প্রেমা বলল, আমার কাজ আছে, আজ আমি উঠব ভাই। লতাকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

দু দিন পরে আবার এল প্রেমা। কেবিনে ঢুকেই কিন্তু সে চমকে উঠল। একটি মহিলা বসে আছেন মিঃ পিল্লাইয়ের বিছানায়, প্রায় তাঁর গা ঘেঁষে। মহিলাটির মুখ পেছন থেকে বোঝা যাচ্ছে না। মিঃ পিল্লাইয়ের মুখখানাও আড়াল পড়েছে। ভদ্রমহিলা মিঃ পিল্লাইয়ের বাঁ হাতখানা নিজের হাতে ধরে বসে আছেন।

প্রেমা ঘরের ভেতর নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছে, কিন্তু বেরিয়ে যাবে কি বিছানার পাশে এগিয়ে যাবে তা ভেবে পাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে এগিয়ে যাওয়াই স্থির করল। সরে যাওয়া যেন গা ঢাকা দেবার ব্যাপার বলে মনে হল তার।

বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মহিলাটির নজর পড়ল। তিনি একটুখানি অপ্রস্তুত হয়েই যেন মিঃ পিল্লাইয়ের হাতখানা বিছানার ওপর রেখে দিলেন। মিঃ পিল্লাই চোখ বুজে ছিলেন। হাতখানা নামিয়ে রাখতে চোখ চাইলেন।

প্রেমা দেখল দুজনের চোখই ভেজা। ভদ্রমহিলা রুমালে চোখ মুছে নিলেন। মিঃ পিল্লাই মুখে হাসি টেনে এনে বললেন, ইনিই সেই বিখ্যাত নর্তকী প্রেমা মেনন। যার কথা কাল তোমাকে বলেছিলাম।

একটু থেমে প্রেমার দিকে চেয়ে বললেন, বল তো ইনি কে?

প্রেমা ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে একটুখানি হেসে বলল, ভুল হলে মনে কিছু করবেন না! আপনি কি মিসেস পিল্লাই?

ভদ্রমহিলা হাসলেন, কিন্তু কেমন যেন একটুখানি অপ্রস্তুত চোখে তাকালেন মিঃ পিল্লাইয়ের দিকে।

মিঃ পিল্লাই বললেন, একশো নম্বর পেয়ে গেলে প্রেমা। অসাধারণ তোমার মানুষ চেনার ক্ষমতা।

ভদ্রমহিলা একটু সরে বসে প্রেমাকে বিছানায় বসতে বললেন। প্রেমা চেয়ার টেনে এনে বিছানার পাশে বসে বলল, ও জায়গাটা আপনার। ওখানে বসার অধিকার কেবল আপনারই।

ভদ্রমহিলা বললেন, ও রকম বলছেন কেন ভাই। আপনি যে ওর কতখানি উপকার করেছেন তা কাল সারাদিন ধরেই উনি বলে গেছেন।

প্রেমা হেসে বলল, আর আপনি অমনি সব বিশ্বাস করে নিয়েছেন।

ভদ্রমহিলা বললেন, অবিশ্বাসের কিছু নেই। উপকার না পেলে কেউ কি কোনদিন এতখানি করে বলে।

প্রেমা বলল, বিশ্বাস করুন, উনি মানুষের জন্যে যা করেন তার তুলনায় আমাদের করা কিছুই না।

ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, খুব খারাপ লাগছে ভাই আপনাকে ছেড়ে এখুনি উঠে যেতে হচ্ছে বলে। আমি উঠছিলাম, আর আপনি এসে ঢুকলেন।

প্রেমাও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার সঙ্গে বসে যাকে বলে আলাপ তার একটুও কিছু হল না। তবে আপনার প্রশংসা এত শুনেছি ওঁর মুখে যে আপনি আমার একান্ত পরিচিতই হয়ে আছেন।

ভদ্রমহিলা বললেন, উনি নিজে ভাল মানুষ ভাই সকলের ভালটাই দেখে বেড়ান। আর মানুষ চিনতে পারেন না বলে ঠকেনও পদে পদে।

একটু থেমে বললেন, আমার মেয়ে জানে না যে আমি এখানে এসেছি। প্রতি শনিবার সে বাড়ি আসে।

প্রেমা বলল, উনি কি কোথাও কাজ করেন?

ভদ্রমহিলা বললেন, সম্মান করে কথা বলার বয়েস ওর নয়। সবে ষোলতে পড়েছে। মেয়েদের একটা স্কুলে টিচারদের চা জলখাবার এনে দেবার কাজ করে। ওখানেই হোস্টেলে থাকে। ফাই ফরমাস খাটে। শনিবার হলেই বাড়ি চলে আসে।

ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। প্রেমা এখন মিঃ পিল্লাইয়ের মুখোমুখি।

প্রেমা বলল, উনি আপনার অ্যাকসিডেন্টের খবর পেলেন কি করে?

জন্মভূমি পত্রিকায় খবরটা বেরিয়েছিল। উনি জন্মভূমি পড়েন না কিন্তু ওঁর এক বান্ধবী গল্পের ছলে একদিন ওঁকে খবরটা জানায়। আর সঙ্গে সঙ্গে উনি চলে আসেন মেডিকেল কলেজ হসপিটালে।

প্রেমা বলল, বড় ভাল হল মিঃ পিল্লাই। পরিস্থিতিই আপনাদের বিচ্ছেদের ফাটলে জোড়া লাগিয়ে দিলে। আমার তো ওঁকে দারুণ ভাল লাগল।

তুমি সত্যি বলছ প্রেমা?

প্রেমা বলল, যে মেয়ে তাঁর দুঃখের দিনে আপনার সাহায্য নিলেন না আর আজ আপনার দুঃখের সময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁকে ভাল লাগবে না তো কি পথের মেয়েদের ভাল লাগবে?

মিঃ পিল্লাই বললেন, জান প্রেমা তুমি আজ আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। তোমাকে তাই আজ কথাটা বলতে চাই। দুদিন তুমি আসনি কিন্তু উত্তরা এসেছে। অনেক কথা হয়েছে ওর সঙ্গে। অনেক দুঃখ মান-অভিমানের পর ও রাজি হয়েছে আমার ঘরে আসতে। বড় আত্মাভিমানী মেয়েটা।

প্রেমা টেনে টেনে বলল, আমি দা-রু-ণ খুশী হয়েছি মিঃ পিল্লাই। যত দেরীই হোক এই মিলটা দরকার ছিল। আপনাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। কিন্তু....!

কিন্তু কি প্রেমা?

কিন্তু আর কিছু নয়, ওঁর মেয়েটি সম্বন্ধে কি ভেবেছেন?

মিঃ পিল্লাই বললেন, আমি দুটো প্রস্তাব উত্তরাকে দিয়েছি। আমার বাড়িতে মেয়ের মর্যাদায় সে

থাকবে। নয়তো মেয়েদের কোন হোস্টেলে রেখে ওকে পড়াব। তারপর সময় হলে ভাল বিয়ে দিয়ে সংসারী করে দেব।

কোনটাতে ওঁর সম্মতি রয়েছে?

মিঃ পিল্লাই বললেন, উত্তরার ইচ্ছে মেয়ে হোস্টেল থেকে পড়াশোনা করুক। সে গিয়ে মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ করে আসবে। আমার বাড়িতে ওকে আর আনা নয়।

প্রেমা বলল, পড়াশোনা করাটা ভাল কিন্তু আপনার সান্নিধ্যে মেয়েকে উনি আনতে চাইছেন না কেন?

মিঃ পিল্লাই বললেন, মেয়ে উত্তরার সুতরাং মেয়ে সম্বন্ধে ফাইনাল ডিসিশান তাঁর। তবে আমার মনে হয় মেয়ে বড় হয়েছে। মৃত বাবার ওপর তার একটা শ্রদ্ধা আর দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। তার পক্ষে আমার সঙ্গে নতুন একটা সম্পর্ক গড়ে তোলার অসুবিধে হতে পারে। এইসব ভেবেই বোধকরি উত্তরা মেয়েকে দূরে রাখতে চাইছে।

প্রেমা বলল, ওঁর ডিসিশান আমার তো বেশ ভালই লাগছে। মিসেস পিল্লাই যা কিছু করবেন বেশ বিবেচনা করেই করেন।

মিঃ পিল্লাই হেসে বললেন, ওঁর এক সময়ে চলে যাওয়াটাও কি তাই?

প্রেমা বলল, নিশ্চয়ই। আপনাকে ছেড়ে চলে যাবার আগে বহুবার নিজের সঙ্গে উনি তর্কে বসেছিলেন বলেই মনে হয়। কোন একটা কাজ উনি স্থির চিন্তা করেই করেন।

মিঃ পিল্লাই বললেন, এখন ওঁর ফিরে আসাটাও কি অনেক চিন্তার ফল বলে তুমি মনে কর?

প্রেমা বলল, প্রথম দিনেই কি আপনার কাছে ফিরে আসার প্রসঙ্গটা উঠেছিল?

হ্যাঁ। অনেক কথার পরে আমার ওপর ওর দুর্বলতাটুকু লক্ষ্য করে আমি প্রস্তাবটা এনেছিলাম।

উনি কি সঙ্গে সঙ্গেই আপনার প্রস্তাবে সাড়া দিলেন?

মিঃ পিল্লাই বললেন, না। পরের দিন এসে বলল, এ সময়ে তোমার কাছে না আসি এমন শক্তি আমার কই। তোমার ঘরে আসি আর না আসি তোমার সেবার ভার তো আমাকে নিতে হবে।

প্রেমা বলল, আপনাকে দারুণ রকম ভালবাসেন মিসেস পিল্লাই তাই অভিমানটাও ওঁর তীব্র।

মিঃ পিল্লাই বললেন, আমি কি উত্তর দিয়েছিলাম জানো? আমি বলেছিলাম যদি সেবার লোভই দেখালে তাহলে তোমাকে কাছে পাবার ইচ্ছা থেকে আমাকে বঞ্চিত কর না। এবারেও না বলে বুকখানা আমার আর ভেঙে দিও না।

প্রেমা বলল, নিশ্চয় এই কথাতেই কাজ হয়েছে।

মিঃ পিল্লাই বললেন, তা বলতে পার। উত্তরা শুধু আমার হাতটা তার ঠোঁটে ছুঁইয়ে বলেছিল এত দুঃখও তুমি দিতে পার। সতেরটা বছরের একটি দিনও গেছে কিনা জানি না যেদিন তোমার কথা আমি ভাবিনি। মহাদেবের মন্দিরে তোমার সুখ কামনা করে পাগলের মত প্রার্থনা করেছি। তোমার কাছে না এসেও আমার কাছে তোমাকে চিরদিন রেখেছিলাম।

বলতে বলতে ওর চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠেছিল। আমি মুখখানা তুলে ধরতেই টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ছিল ধারা। আর তখনই আমি বুঝেছিলাম প্রেমা, সতেরো বছর ধরে যে ঘরখানা শূন্য পড়ে আছে সে ঘরে উত্তরা আসছে।

প্রেমা বলল, আপনাদের এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলনটা সারাজীবন অটুট থাক অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে এই কামনাই আমি জানাব।

প্রেমার হাতখানা ধরলেন মিঃ পিল্লাই। বললেন, অসীম বন্ধুত্ব তোমার সঙ্গে আমার প্রেমা, কিন্তু আমার প্রৌঢ় প্রেমের দর্শক একমাত্র তুমি। তোমার কাছে মনের কথা যেমন করে উজাড় করে দিলাম আর কারো কাছে সম্ভব হবে না তেমন করে বলা। তুমি সারা জীবন আমাকে শুধু একটি অনুমতি দিও প্রেমা—সুখ দুঃখের কথাগুলো যেন তোমার কাছে অসঙ্কোচে উজাড় করে দিতে পারি। আমি মনে করি বন্ধু স্ত্রীর চেয়েও অনেক বিষয়ে আরও অন্তরঙ্গ। স্ত্রীর কাছে যা বলা যায় না বন্ধুর কাছে তাও বলা চলে অসঙ্কোচে।

প্রেমা বলল, আপনার এ ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছারও আশ্চর্য মিল আছে জানবেন। দুঃখ সুখ জীবনে যা আসুক না কেন, আমিও ছুটে আসব বন্ধুর কাছে পরামর্শ অথবা সান্ত্বনার আশায়।

মিঃ পিল্লাই অভিভূত হলেন। তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না। শুধু প্রেমার হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

সরিতার ফোন এল—ললিতার চিঠি এসেছে।

বুকখানা কেঁপে উঠল ইন্দ্রের। সে স্বাভাবিক গলায় ঔৎসুক্য না দেখিয়ে বলল, কি খবর, বিয়ের চিঠি নাকি ?

সরিতা বলল, আশ্চর্য! তুমি জানলে কি করে? তোমার কাছেও খবর দিয়ে চিঠি লিখেছে নাকি ?

এবার ইন্দ্র কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। সরিতা তার কথার ওপরেই কৌতুকের জালটা বুনছে না ঘটনাটা নির্ভেজাল।

সে ভাঙা গলায় কৌতুক করার চেষ্টা করে বলল, সরিতা না হয়ে তুমি যদি সরিৎশেখর হতে তাহলে ললিতা তোমাকেই পতিত্বে বরণ করত।

ও! কথাটা বিশ্বাস হল না বুঝি ? অন গড, চিঠি এসেছে ওর বিয়ের খবর নিয়ে।

প্রাণপণ শক্তিতে রিসিভারটা মুঠো করে ধরে আত্মগোপনের চেষ্টায় জোরে কথা বলতে লাগল ইন্দ্র, যা হোক এতদিনে ঠিক ঠিক একটা পথ পেল তোমার বান্ধবী। এইটুকু বলতে পারি, ওর দিক থেকে ভালই হল।

সরিতা ওপার থেকে বলল, বুকে লাগছে না তোমার?

অস্বাভাবিক গলায় হো হো করে হেসে উঠল ইন্দ্র, দারুণ লাগছে।

বলতে বলতেই কিন্তু উত্তেজনায় চোখ দুটো লাল হয়ে উঠল। বুকে অদ্ভুত এক অনুভূতি পাকে পাকে মোচড় দিতে লাগল।

সরিতা বলল, আমাকে যেতে লিখেছে।

ইন্দ্র বলল, খালি বান্ধবীকেই নেমন্তন্ন করেছে, তার প্রেমিকটিকে নয়?

সরিতা বলল, পাছে তার পূর্ব প্রণয়ীর সঙ্গে হবু সঙ্গীটির ডুয়েল হয়ে যায় সেই ভয়ে বোধহয় তোমাকে নেমন্তন্ন করতে সাহস করেনি।

ইন্দ্র বলল, কবে যাচ্ছ?

তোমার মত কি ?

কি বিষয়ে?

আমার যাবার ব্যাপারে?

ওটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার।

সরিতা ঝাঁঝিয়ে উঠল, একেবারে নিজস্ব ব্যাপার হলে তোমার মতামত নেবার দরকার হত না। এ ব্যাপারটার সঙ্গে ক্ষীণ হলেও কিছুটা যোগ তোমারও আছে।

ইন্দ্র বলল, দেখে এসো তোমার বান্ধবীর চোখে এখনও কারো জন্যে জলের সঞ্চয় আছে কিনা।

সরিতা বলল, রসিকতা নয় মশাই, বরের হাত ধরে বাসর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মেয়েরা পূর্ব প্রণয়ীর জন্যে চোখের জল ফেলে।

ইন্দ্র বলল, সেটা খুব স্বাভাবিক।

সরিতা স্রোতের বেগে বলে উঠল, তুমিও তাই করবে নাকি মশাই? বিয়ের আসরে আমার হাত ধরে ভাববে না তো ললিতার হাত ধরে আছি?

ইন্দ্র ভাবল, সরিতার একস-রে আই আছে নাকি !

বলল, ওটা মেয়েদের রাজ্যের খবর। ভালমানুষ ছেলেদের ওর ভেতর টানা কেন।

সরিতা বলল, আহা, মুখখানা ফোনের ভেতর দিয়ে যে দেখতে পাচ্ছি না। ভালমানুষ ছেলের মুখ

দেখলেও পুণ্যি।

ইন্দ্র অন্য প্রসঙ্গে এল, দিদির খবর কি? বিদেশী লেখকটি চলে যাবার পর ব্যথার আলোড়িত সাগর কি এখন একটু শান্ত?

সরিতা বলল, প্রেমা এখন রিপোর্টার মিঃ পিল্লাইয়ের সেবায় নিবেদিত প্রাণ। রোজ বিকেলে বেরিয়ে যাচ্ছে হসপিটালে।

ইন্দ্র বলল, যে বিষয়ে মন দেবে তার শেষ দেখে ছাড়বে। আশ্চর্য চরিত্র!

আমি এমন একটি বোনের জন্যে গর্বিত ইন্দ্র।

আমিও এমন একটি মেয়ের সহোদরার সান্নিধ্য পাবার জন্যে ধন্য।

সরিতা ধমকে উঠল, বাজে কথা রাখ। সত্যি করে বল দেখি বাপু, বুকের ভেতরটা ললিতার কথা শুনে কতখানি ফাঁকা হয়ে গেল?

ইন্দ্র বলল, বিশ্বাস কর সরিতা, এই মুহূর্তে তোমার বান্ধবীর সুখী ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে প্রার্থনা করতে প্রাণ চাইছে।

সরিতা বলল, মানুষ আহত হলে অনেক সময় উদারতার আশ্রয় নিয়ে আঘাতটাকে ভোলার চেষ্টা করে।

তুমি দেখছি সর্বজ্ঞ। এ বয়েসে এতখানি অভিজ্ঞতা হলে আশি বছরে না জানি আরব সাগরের মত অতল অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে আসবে।

তুমি তো আমার খুব শুভানুধ্যায়ী দেখছি। আশি বছর অব্দি আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও।

ইন্দ্র বলল, শতায়ু হতে বলাই উচিত ছিল।

সরিতা বলল, তুমি নিজের জন্যে শতায়ু প্রার্থনা কর। আমার কোন বাসনাই নেই। ফোকলা মুখে পঞ্চাশতম পত্নীর কানে প্রেমের বাণী বলে যেও, দারুণ আনন্দ পাবে। কিন্তু জেনে রেখ, সরিতা মেনন তার যৌবনের দীপ ধীরে ধীরে নিভে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এ সংসার থেকে সরে যাবে।

ঘটনা দুঃখজনক।

কারু কাছে বা পরম শান্তির।

থেমে গেল সরিতা ওধারে। একটু পরে চাপা গলায় বলল, প্রেমা আসছে ওপরে। নর্তকীর পায়ের ধ্বনি সিঁড়িতে বেজে উঠেছে।

ইন্দ্র বলল, ছাড়ছি।

সরিতা বলল, ভীতু, ভীতু কোথাকার।

সেই বিকেলেই বেয়ারা ইন্দ্রের ঘরে খামের একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

ইন্দ্র খামখানা না খুলেই বুঝল ললিতার চিঠি। কারুনাগপল্লীর ছাপ দেওয়া।

সামনে সমুদ্র। শেষবেলায় উতরোল কান্নাটা কেমন যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে। বাতাস ক্লান্ত হয়ে এখন কোথায় যেন উধাও।

খামখানা হাতে নিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ইন্দ্র। ললিতা যেন চেয়ে আছে তার দিকে। কি বলতে চায় ললিতা! কেন সে হঠাৎ বিয়ের সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলল তার কৈফিয়ৎ?

ইন্দ্রের মুখে ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠল। কি দরকার ছিল এ চিঠির। নতুন জীবন চায় ললিতা, তাতে কার কি আপত্তি থাকতে পারে। প্রত্যেকেরই নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরির অধিকার আছে। ইন্দ্র যখন কোনরকমেই নিজের জীবনকে জড়াতে পারবে না ললিতার সঙ্গে তখন ললিতা তার জীবন নিয়ে নিজের ইচ্ছামত খেলা খেলবে এইটাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু বিবেকের বিচারে ললিতার জয় হলেও কোথায় যেন সূক্ষ্ম একটা পরাজয়ের গ্লানি মনটাকে বিষণ্ণ করে তুলল। ললিতাদের কারুনাগপল্লীর বাড়ি থেকে চলে আসার আগের রাতে ছড়ান গোলাপের করুণ কান্না আজও যেন বুকের গভীরে কান পাতলে শুনতে পায় ইন্দ্র। এই তো সেদিন ট্যুরিস্ট বাসে চলে যাবার আগের মুহূর্তে নারকেল বীথিব নিভৃতে তার ঠোঁটে উত্তপ্ত কেঁপে ওঠা ঠোঁট

দুটো মিলিয়েছিল ললিতা। দুটো পিপাসাকাতর বাহু দিয়ে জড়িয়েছিল তার কটিদেশ। কিন্তু সে যেন মুহূর্তের নেমে আসা ঝড়। প্রচণ্ড আক্ষেপে হঠাৎ ভেঙে পড়ে পরক্ষণেই স্থির নিঃশেষ হয়ে যাওয়া।

চিঠিখানা খুলল ইন্দ্র। এতক্ষণ চিঠি হাতে নিয়ে এলোমেলো ভাবনার দোলায় দুলছিল সে। কিন্তু চিঠি খোলার সঙ্গে সঙ্গে উৎসুক দুটো চোখের তারা আটকে গেল চিঠির অক্ষরগুলোর ওপর।

ইংরাজিতে লেখা। সহজ স্পষ্ট। তর্জমায় দাঁড়াল :

ইন্দ্র,

আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে এমনি একটা খবর শোনার পর থেকে আমি প্রতিটি রাত কি নিঃসঙ্গ যন্ত্রণায় কাটিয়েছি তা আমার মত একটি মেয়ে ছাড়া কেউ বুঝবে না। এ অবস্থায় আমি স্বামীর ধ্যানে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলে সকলের কাছ থেকে মৌখিক বাহবা পেতাম ঠিক কিন্তু নিজের এই দেহটাকে তিলে তিলে দগ্ধ করে নিঃশেষ হয়ে যেতে হত।

আমার ঐ নিভৃত কান্নার একটি রাত্রে তুমি হঠাৎ এসে দাঁড়লে আমার জানালার ওপারে। আমি তোমার বিছানার ধারে সেদিন গোলাপ রেখে এসেছিলাম। সে শুধু যে ঘর সাজানোর তাগিদে নয় তা বুঝতে তোমার একটুও দেরী হয়নি। একটি যুবতী মেয়ের বাইরের সপ্রতিভ আচরণের আড়ালে তার প্রচ্ছন্ন মনের দীর্ঘশ্বাস তুমি শুনতে পেয়েছিলে। তুমি এসে দাঁড়িয়েছিলে জানালার ওপারে আমার মুখোমুখি। একটি রক্ত মাংসে গড়া যুবকের কাছে যা একেবারে প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু বিশ্বাস কর ইন্দ্র, সেদিন ঐ জানালার বাধাটা কোন বাধা ছিল না। ওটাকে অতিক্রম করতে পারিনি শুধু সরিতার কথা ভেবে। সরিতাকে স্পষ্ট দেখেছিলাম সেদিন আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে।

তোমার সঙ্গে শেষ দেখা আমার প্যালেস হোটেলের খানিক দূরে। সেদিন তোমার হোটেল থেকে ফেরার সময় বুঝেছিলাম, ললিতা নামের মেয়েটি তোমার মনের ভেতর তখনও বেঁচে আছে। তারপর বিদায়ের সময় এক মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলাম একটি মুখ। সে মুখ বান্ধবী সরিতার। তাই প্রথম রাতের এমন অবিশ্বাস্য সংযমের পর দ্বিতীয় সাক্ষাতে তোমার বুকের ভেতর নিজেকে সঁপে দিতে একটুও দ্বিধা জাগে নি মনে।

কিন্তু ফেরার সময় ট্যুরিস্ট বাসে বসেই আমি সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলি। বুভুক্ষু দেহকে মিথ্যা শাসনে বেঁধে অভুক্ত রাখা পাপ। তবে আর যেখানে যাই না কেন তোমার কাছে যে ফেরা আমার চলবে না তা প্রথমেই স্থির করে নিয়েছিলাম। ইন্দ্র, তোমাকে আজও ভালবাসি একথাটা এই মুহূর্তে তোমার কাছে যত হাস্যকরই মনে হোক, আমার কাছে কিন্তু দূর নক্ষত্রের মত সত্য। আমার নতুন জীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তুমি স্মৃতি হয়ে যাবে। কিন্তু আকাশের তারকাপুঞ্জের মত তুমি অধরা থেকেও সকরুণ একটা স্মৃতির কোমল ছোঁয়ায় কাঁদাবে আমার সারা দেহমন।

আজ এই মুহূর্তে অনেক কিছু লিখে তোমাকে অসহিষ্ণু করে তুলতে চাই না। শুধু তোমাকে আমার নতুন জীবন প্রসঙ্গে একটি কথা জানাই। ভদ্রলোক অতি সাদামাঠা। চলতি হাওয়ার পন্থী আদপেই নয়। পুরোনো ভাবনা পুরোনো বিশ্বাস আজও ধরে আছে। কাজকর্ম করে সাধারণ। তুল্লির সঙ্গে ছেলেমানুষের মত খেলাধুলো করে। তুল্লি ওকে নিয়ে দারুণ রকম মেতে থাকে। আমার দিক থেকে তুল্লিকে নিয়ে অনেক বড় একটা সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যাবে বলে প্রতি মুহূর্তে ধারণা জন্মাচ্ছে।

সরিতাকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছি, কিন্তু দয়া করে ওর পীড়াপীড়িতেও তুমি ওর সঙ্গী হয়ো না এ যাত্রায়। তোমাকে চোখের সামনে দেখলে অতীত আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলবে।

তোমার বন্ধু ললিতা।

চিঠি পড়া শেষ করে ইন্দ্র উঠে দাঁড়াল। আর একবার পড়তে গিয়েও পড়ল না। ললিতা সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের শেষ হোক হয়ত এমনি একটা কিছু মনে হল ইন্দ্রের। সে ধীরে ধীরে ঘরে পায়চারি করতে করতে এসে দাঁড়াল জানালার ধারে। তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। শেষ আলো সমুদ্রের জলে খেলা

করতে করতে সরে যাচ্ছে। ঢেউগুলো যেন সেই আলোর তপ্ত ছোঁয়াটুকু ভুলতে পারছে না। তাই ঝাঁপিয়ে পড়ে বার বার ধরার চেষ্টা করছে।

কতক্ষণ চেয়ে থাকল ইন্দ্র অন্যমনে। কারা যেন অনেক দূর থেকে কোভালম বীচের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছে। স্পষ্ট দৃষ্টির বৃত্তে একসময় এল ওরা। ইন্দ্র দেখল উত্তর চল্লিশের একটি দম্পতি। হাত ধরাধরি করে হেঁটে আসছেন। ভদ্রলোকের দেহচালনায় বেশ কর্মপটুতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। মহিলাটি কিন্তু দার্শনিক গোছের। আকাশ আর সমুদ্রের দিকে প্রায় ক্ষণই চোখ রেখে চলছিলেন। হাতে কিন্তু ধরা ছিল হাত।

ওঁরা হয়ত সংসারের ঝামেলায় ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। প্রথম জীবনের ভালবাসার অলঙ্কারে ধীরে ধীরে মালিন্য জমতে জমতে সোনার আসল রংটুকু কখন বিবর্ণ হয়ে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ সংসারের বহু পরিচিত, বহু ব্যবহৃত জীবনের কাছ থেকে ওরা কয়েকটি দিনের জন্যে এখানে পালিয়ে এসেছেন। এই অপরিচিত পরিবেশের ভেতর থেকে পরস্পরকে যেন নতুন করে চিনছেন, বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করছেন পরস্পরকে। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো যেন নতুন করে জন্ম নিচ্ছে ওঁদের মনের ভেতর।

ইন্দ্র হঠাৎ সূর্যাস্তের মুহূর্তটিতে উদার হয়ে উঠল। ললিতা সুখী হোক। স্বামীর হৃদয়ের বঞ্চনামুক্ত নির্মল ভালবাসা লাভ করুক সে। সংসারের মূল্যবান মুহূর্তগুলো যেন সে স্বামীর সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করে।

ভাবতে যাচ্ছিল, ললিতা আর যেন তার স্মৃতির যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত না হয়। কিন্তু বুকের কাছে কি এক অস্ফুট যন্ত্রণার ঢেউ উঠে সে ভাবনাটাকে ঘিরে ফেলল। সন্ধ্যার প্রসারিত আকাশে তা আর মুক্তি পেল না।

বাঁচার কি দুর্বার ইচ্ছে মানুষের মনে। আর একটি হৃদয় থেকে কোনদিন যেন হারিয়ে না যাই। পরিপূর্ণ সুখী জীবনের মাঝখানে একটুখানি শূন্যতা থাক। সেখান থেকে উঠে আসুক অতীত জীবনের জন্যে সামান্য একটুখানি দীর্ঘশ্বাস।

ইন্দ্র দেখল হৃৎপিণ্ডের মত রক্তাক্ত সূর্যটা আরব সাগরের বুকে উচ্ছ্বাস তুলে ডুবে গেল।

তিন

কুমারবাহাদুর নিজেই ড্রাইভ করছিলেন। পেছনের সিটে দোলন আর প্রেমা। দোলন তার সুন্দর আঙুলগুলো প্রেমার পাঁচটি আঙুলের ভেতর চালিয়ে দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে। সে যেন আঙুল দিয়ে অনুভব করছে সত্যি প্রেমা এসেছে কিনা। মাঝে মাঝে চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। মুখে ভোরের নরম আলোর মত একটা তৃপ্তি খেলা করছে।

গাড়িটা বাঁক নিতেই কিশোরী দোলন কলকলিয়ে উঠল, ঐ যে স্টেশন ওয়াগনে তোমার বন্ধুরা আসছেন আন্টি।

নীচের পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠে আসছিল স্টেশন ওয়াগনখানা। গায়িকা আর বাদকের দল ছিল ওর ভেতর। প্রেমা দোলনের বুক ছুঁয়ে মুখখানা বাড়িয়ে দেখতে লাগল নীচের গাড়ির লোকজনদের। যদিও কুমারবাহাদুর বেশ সন্তর্পণেই চালাচ্ছিলেন গাড়িখানা তবু পাহাড়ী পথে বাঁকের মুখে টাল খাচ্ছিল প্রেমার তন্বী দেহটা। দোলনের গায়ে চাপ পড়লেই প্রেমাকে ধরে খিল খিল করে হেসে উঠছিল সে।

বেশ খানিক পাহাড়ের ওপর উঠে এসে একটা পাইন গাছের ধারে কুমার জয়কিষণ ব্রেক কষলেন।

দোলন গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, এসো আন্টি, তোমাকে আমাদের লালসিয়া স্টেটের এলাকাটা দেখাই।

প্রেমা গাড়ি থেকে নামতেই দূর হিমালয়ের একটা ঠাণ্ডা হাওয়া তার গায়ে এসে লাগল। অনেক

পথযাত্রার পর শরীরে ঐ হাওয়াটুকুর ছোঁয়ায় একটা শিহরন জাগল।

দোলন আশ্চর্য সুন্দর একটি মডেলের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতখানা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে লালসিয়ার দিক নির্দেশ করল।

প্রেমা তার পাশে এসে দাঁড়াল। কুমার জয়কিষণ গাড়ির গায়ে ঈষৎ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। পৌরুষ আর প্রশান্তির ছবি সারা অবয়বে। মধ্য যৌবনের দীপ্তি চোখের তারায় মুখের রেখায়।

সামনে একটি পাহাড় দাঁড়িয়ে। তার পাশ দিয়ে চোখ গিয়ে পড়ে নীচের একটি উপত্যকায়। ভ্যালিটি এক দৃষ্টিতে অবাক করে দেবার মত। খুব ছোট আকার। প্রায় চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। একদিকে শুধু দুটি পাহাড়ের মাঝে নিষ্ক্রমণ পথ। ভ্যালির মাঝখান দিয়ে একটি জলধারা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। শেষবেলার রোদ্দুরের ঝিলিক তার নাচের অঙ্গে। চারদিকে সবুজ সবুজ সবুজ। জলধারার দুই তীরে ক্ষেতি। ভ্যালির পশ্চিমে একটি পাহাড়ের দেহ জুড়ে খাঁজে খাঁজে বাড়ি-ঘর নেমে এসেছে। সবুজ আর লালের সমারোহ পাহাড়ী কুঠিগুলোর রঙে। পাহাড়ের ঠিক নীচে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মনে হচ্ছে পাইনের অরণ্য। তারই ফাঁকে ফাঁকে মডার্ন আরকিটেকচারের চিহ্ন বাড়ি-ঘরে।

দোলন বলল, ঐ আমাদের নাচমহল আন্টি।

দোলনের আঙুল অনুসরণ করে গোলাকার সাদা ঘরে প্রেমার চোখ আটকে গেল। ঘরের সামনে প্রসারিত পথ। দুদিকে এভিনিউ রচনা করে দাঁড়য়ে আছে গাছের সারি। সমস্ত ঘরখানার আকৃতি বৌদ্ধ স্তূপের মত। স্তূপের চূড়ায় কোন একটি ধাতব বস্তুতে শেষ সূর্যের সোনা প্রতিফলিত হচ্ছিল। সবকিছু স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিল না। তাই একটা আকর্ষণীয় রহস্য রোমাঞ্চের পটভূমি তৈরি হচ্ছিল।

প্রেমা বলল, দারুণ এনচ্যানটিং।

কুমার জয়কিষণ বললেন, এখান থেকে লালসিয়া স্টেট অনেক কাছে বলে মনে হলেও সোজাসুজি নেমে যাবার কোন রাস্তা নেই। দুটি পাহাড় বেষ্টন করে তবে ওখানে পৌঁছতে পারা যাবে। তাই এখন আমাদের থামলে চলবে না। লালসিয়া পৌঁছবার আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে উঠবে।

সবাই গাড়িতে উঠে বসল। জয়কিষণ স্টার্ট দিলেন। পেছনের গাড়িটাও আর দূরে নেই। বাঁকের মুখে হর্ন শোনা যাচ্ছিল।

দূর থেকে আলোগুলো ঝাঁক ঝাঁক তারাবাতির মত দেখাচ্ছে। দোলনের কাছ থেকে প্রেমা জেনেছে ওরা এখন লালসিয়া স্টেটের ভেতর ঢুকে পড়েছে।

আগে লালসিয়ার বাজারহাট অফিস কাছারী সবই স্টেটের পরিচালনায় চলত, কিন্তু সরকার সবকিছু গ্রহণ করার পর থেকে কুমারবাহাদুর নিজের পৈতৃক প্রাসাদ আর তার সংলগ্ন কয়েক একর জমির ভেতরই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। উত্তর ভারতের কয়েকটি শহরে প্রাইভেট শিল্প সংস্থায় খাটছে তাঁর অর্থ। আগের ঐশ্বর্য প্রতিপত্তি নেই কিন্তু উদ্বেগ উৎকণ্ঠারও শেষ হয়েছে সেই সঙ্গে। এখন বিপত্নীক সদালাপী কুমারবাহাদুরকে সকলেই প্রীতি আর শ্রদ্ধার চোখে দেখে। লালসিয়া স্টেটের যে কোন সাংস্কৃতিক সংস্থার এখনও তিনি সম্মানীয় সভাপতি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম কর্ণধার। খেলাধুলার ব্যাপারেও তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা তরুণ ক্রীড়াবিদ্‌দের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার।

গাড়ি ঢুকল রাজবাড়ির ভেতর। সামনে ফোয়ারা থেকে জল অন্ধকার আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি করছে। ফোয়ারার পাশ কাটিয়ে গাড়ি সোজা ভেতরে ঢুকে গেল। সাদা উর্দি পরা আরদালি এসে সেলাম ঠুকে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

দোলন হাত ধরে প্রায় টেনে নামাল প্রেমাকে।

ডানদিকে সিঁড়ির দুধারে শ্বেত পাথরের কাজ করা স্তম্ভ। প্রেমার মনে হল আঙুরলতা আর বুলবুল পাখির কাজ সারা স্তম্ভ জুড়ে।

কুমার জয়কিষণ প্রেমার দিকে মাথাটা ঝুঁকে ডান হাতখানা বাড়িয়ে সিঁড়িতে ওঠার অনুরোধ জানালেন।

প্রেমা শ্বেতপাথরের সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল। সঙ্গে দোলন আর কুমারবাহাদুর। ঝাড়লণ্ঠন ঝোলান দীর্ঘ বারান্দা জুড়ে।

প্রেমা দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে পা রেখে বলল, পেছনের গাড়ির ওঁরা সব এখনও কি এসে পৌঁছননি?

গাড়ি পৌঁছনর আওয়াজ পেয়েছি, বললেন, কুমারবাহাদুর।

প্রেমা ওঁদের সঙ্গে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বলল, ওরা এখুনি তাহলে এসে পড়বে এখানে।

জয়কিষণ বললেন, ওঁরা আমার গেস্ট। তাই গেস্ট রুমেই ওঁদের থাকার ব্যবস্থা করেছি। আর আপনি দোলনের গেস্ট। তাই দোলনের খাস কামরাতেই আপনার থাকার ব্যবস্থা।

পাছে প্রেমার এই ব্যবস্থা মনঃপুত না হয় তাই আগেভাগেই দোলন প্রেমার হাতখানা চেপে ধরে উঠতে লাগল।

প্রেমা দোলনের ব্যাপার-স্যাপার দেখে হেসে বলল, দেখা যাক দোলন কার গেস্ট হলে লাভ বেশি, বাবার না তোমার।

দোলন বলল, আমি তোমাকে আমার কাছেই রাখব আন্টি, বাবাকে দেব না।

কানটা গরম হয়ে উঠল প্রেমার। কিশোরী দোলন বুঝতে পারেনি কথাটার অন্য একটা অর্থও হতে পারে।

জয়কিষণ মুহূর্তে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিলেন। ততক্ষণে ওরা দোতলার বারান্দা পার হচ্ছে।

কুমারবাহাদুর বললেন, বাঁদিকের এই লম্বা হলঘরখানা লালসিয়া স্টেটের চিত্র সংগ্রহশালা। আজ সবাই ক্লান্ত রয়েছেন। বিশ্রামের পর কাল আপনাকে এর ভেতর নিয়ে আসব।

প্রেমার গলায় ঔৎসুক্য, আমি ছবি দেখতে দারুণ ভালবাসি কুমারসাহেব।

জয়কিষণ থেমে দাঁড়িয়ে বললেন, আমাকে আপনি নাম ধরে ডাকলে খুশী হব। আর যদি একান্ত না পারেন তাহলে সারনেম ধরে ডাকবেন। কিন্তু কুমারসাহেব বলে ডাকলে ব্যাপারটা খুব পোশাকী হয়ে দাঁড়াবে।

একটু থেমে আবার কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন, অবশ্য বারণ আমার কোন কিছুতেই নেই। আপনার ইচ্ছাকেই আমি খুশী মনে মেনে নেব।

প্রেমা হেসে বলল, আপনার রাজ্যে এসেছি, আপনাকে খুশী করার চেষ্টা অবশ্যই আমাকে করতে হবে।

জয়কিষণ বললেন, পুরোনো দিন হলে রাজাকে সবাই খুশী করতে চাইত, কিন্তু এখন দিন বদল হয়ে গেছে। এখন রাজাও নেই তার রাজ্যপাটও নেই। সুতরাং রাজ্যহীন রাজাকে খুশী করার প্রশ্নও নেই।

প্রেমারা বিশাল বারান্দা আর করিডোর পেরিয়ে এসে পৌঁছল একটা ড্রিম ল্যান্ডে।

জয়কিষণ বললেন, এটাকে দোলন মহল বলতে পারেন। এখন থেকে দোলনের ওপর রইল আপনার ভার। মেডরা রয়েছে এ মহলে আপনার প্রয়োজন মেটাতে। সবার ওপরে দোলন রইল আপনার সেবার জন্যে।

প্রেমা বলল, একথা কেন বলছেন। দোলন আমার ছোট্ট বন্ধু, কিশোরী সঙ্গিনী।

জয়কিষণ বললেন, আপনি লালসিয়ার পরম সম্মানীয় অতিথি, আপনাকে সেবা করার সুযোগ পেলে সে নিজেও সম্মানিত হবে।

প্রেমা হেসে বলল, এ মহল যখন দোলনের তখন ব্যাপারটা দোলনের ওপরই ছেড়ে দিন। আমরা নিজেদের ভেতর বোঝাপড়া করে নেব।

জয়কিষণ হেসে মাথা নাড়লেন। পায়ে পায়ে ফিরে চললেন যে পথ দিয়ে এসেছিলেন সেদিকে। যাবার সময় বলে গেলেন, এখন আমার অতিথিদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে হবে।

প্রেমা কুমারবাহাদুরের চলে যাবার ভঙ্গিটুকু লক্ষ্য করল। ঋজু পুরুষোচিত দেহ। চলার ছন্দেও রাজকীয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।

জয়কিষণ চলে গেলে দোলনের দিকে ফিরে তাকাল প্রেমা। আশ্চর্য, এরই ভেতর দুটি বিশ-বাইশ বছরের মেয়ে দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের হাতে ওরই দুটো ভি আই পি সুটকেশ। কখন

কোন গুপ্তপথে তারা তার প্রয়োজনের জিনিসগুলো নিয়ে এসে গেছে।

ওদের সঙ্গে প্রেমা একটা ঘরে ঢুকল। পুতুলের ঘর। সাবা ঘরে কাচের শো-কেসে হাজার রকমের পুতুল। এ যেন ডলস্ মিউজিয়াম। বিভিন্ন দেশের পুতুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন শো-কেসের ওপরে দেশের নাম লেখা। এক একটা সুদৃশ্য ওয়াল ল্যাম্পের আলো এসে পড়েছে ঐ নামগুলির ওপর। প্রতিটি ল্যাম্পেরই ভিন্ন ভিন্ন শেড। গোলাপী হলুদ সাদা নীল সবুজ ইত্যাদি। ওপরের বাল্বের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে শো-কেসের ভেতরের আলো জ্বলছে। বাল্বগুলো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ রঙের আলো ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন শো কেসের ভেতর।

কোথাও বসে দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছে একটা কনসার্ট পার্টি। আশ্চর্য, বিটোফেনের একটা সুর বাজছে। তার পাশের শো-কেসে নাচছে কাজাকী মেয়েরা মাথায় স্কার্ফ বেঁধে। কালারফুল ড্রেসে ভারী সুন্দর মানিয়েছে তাদের।

রানী এলিজাবেথের করোনেশান হচ্ছে। দীর্ঘ শুভ্র করোনেশান ড্রেস পরে রানী এগিয়ে চলেছেন। তাঁর ভূ-লুণ্ঠিত পোশাক তুলে ধরে চলেছে পাঁচটি সুবেশা তরুণী।

এমনি বিচিত্র সব বিষয় আর বিচিত্র সব পুতুল।

দোলন বলল, আন্টি এখন তোমার বিশ্রামের সময়। তুমি আমাদের সঙ্গে ভেতরে চল। কাল পুতুলগুলো তোমাকে দেখাব।

প্রেমা বলল, চমৎকার তোমার পুতুলের ঘর। চল যাই কোথায় নিয়ে যাবে।

দ্রুত পায়ে ওরা পুতুল আর অ্যাকোয়েরিয়ামের ঘর পেরিয়ে ঢুকল গিয়ে দোলনের ড্রইংরুমে।

ড্রইংরুমটি দোলনের একেবারে শৈশব থেকে বর্তমান বয়স অব্দি নানা ধরনের ছবি দিয়ে সাজান। অধিকাংশই রঙীন ছবি। বয়সের তুলনায় দোলনকে বেশ খানিকটা বড়সড় দেখায়। মুখে কিন্তু সবসময়েই লেগে থাকে ভারী সুন্দর একটা হাসি। ছবিগুলোর ভেতরেও সেই সুন্দর হাসির ছোঁয়া।

একটুখানি বিশ্রামের পর দোলন প্রেমাকে নিয়ে গেল স্নানের ঘরে। শ্বেত পাথরের প্রশস্ত বাথরুম। আধুনিক সব সরঞ্জামে সাজান।

দোলন বলল, তোমার সুটকেশ বাথরুমের লাগাও ড্রেসিংরুমে রয়েছে।

প্রেমা হেসে স্নানের ঘরে ঢুকল। কেরালার মেয়ে। স্নানের ওপর তাই বিশেষ এক ধরনের অনুরাগ। ঘর থেকে বেরিয়ে এল একেবারে ড্রেসিংরুমে বেশবাস পরিবর্তন করে প্রসাধন সেরে।

সংলগ্ন রিফ্রেশমেন্ট রুমে দোলন নিয়ে গেল প্রেমাকে। ফল মিষ্টি লস্যি ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হয়েছে টেবিলের ওপর।

দোলন বলল, তোমার কফি চা সবই তৈরি আন্টি। তবে অনেক দূর থেকে এসেছ বলে ঠাণ্ডা লস্যি হয়ত ভাল লাগবে, তাই দিয়েছি। পরে আমরা যখন বেডরুমে বসে গল্প করব তখন তুমি কফি অথবা চা যা খুশি খেতে পার।

সেই স্থির মূর্তির মত দুটি তরুণী অ্যাটেনডেন্ট পাশে দাঁড়িয়ে। অতিথির সামান্য আদেশ পালনের অপেক্ষায়।

প্রেমা লস্যির গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে স্ট্র ঠোঁটে লাগিয়ে খেতে লাগল। হাল্কা গোলাপী আভার পানীয়। গোলাপগন্ধী। বেশ লাগল খেতে।

পাশে বসে দোলনও খেতে খেতে দেখছিল। বড় বড় চোখভরা ঔৎসুক্য! আন্টির কেমন লাগছে পানীয় তাই জানার জন্যে চোখে আগ্রহের বাতি জ্বেলে বসে আছে।

পানীয় শেষ করে প্রেমা বলল, খুব রেলিস করে খেলাম। কফি খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল। এখন দেখছি তোমার কথা শুনে অনেক বেশি আরাম পেলাম।

দোলন বলল, এসব বাবার ব্যবস্থা আন্টি। তিনি সরকারমশাইকে ডেকে নিজের হাতে গেস্টদের জন্যে মেনু তৈরি করে দিয়েছেন।

সান্ধ্য জলযোগ শেষ হলে প্রেমা বলল, দোলন তোমার বাবার গেস্ট রুমে আমাকে যে একটু নিয়ে যেতে হবে। আমি ওদের সঙ্গে দেখা করব।

দোলন বলল, চল আন্টি এক্ষুনি তোমাকে নিয়ে যাই। আমরা আর সামনের গেট দিয়ে বেরুবো না। আমাদের এ মহলের দরজা খুলে নিচে নেমে যাব। একটা বাগান পেরিয়ে গেলেই গেস্ট হাউস।

সুন্দর সাজান গেস্ট হাউস। প্রেমাকে দেখে ওরা হৈ-চৈ করে উঠল। বিশুদ্ধ মালয়ালাম ভাষায় জানাল, বহাল তবিয়তে আছে ওরা। খাওয়াদাওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা। ইতিমধ্যেই দক্ষিণী জলযোগে আপ্যায়িত করে গেছে।

প্রেমা সবিস্ময়ে বলল, দক্ষিণী খাবার এখানে কোত্থেকে এল?

একজন বলল, মেঠাইয়ের সঙ্গে ইডলি দিয়েছিল।

অন্যজন বলল, রাতের খাবার দক্ষিণী হবে কিনা জেনে গেছে। মনে হয় দক্ষিণী কুকের ব্যবস্থা করেছেন কুমার বাহাদুর।

প্রেমা এবার হেসে বলল, সারা পথ যে ভাবনা করেছিলেন উত্তরের খাবার সম্বন্ধে তা এখন আর রইল না মনে হয়।

সবার মুখে হাসি ফুটে উঠল। একজন ওরই ভেতর থেকে বলল, মনে হচ্ছে অভিযান সফল হবে।

প্রেমা ঘুরে ঘুরে সঙ্গীদের ব্যবস্থাপত্র দেখল। নিখুঁত ব্যবস্থা। কলিং বেল শোনার জন্যে তিনটি অ্যাটেনডেন্ট কান পেতে আছে। সামনেই বাগান। গোলপাবাগ। গেস্ট হাউসের পেছনের বাগান ফলের গাছ দিয়ে সাজান। মাঝে চলে গেছে মোরাম বিছান পথ।

প্রেমা ব্যবস্থাদি দেখে দোলনের সঙ্গে আবার ফিরে এল দোলন মহলে।

রাতের খাবার পর দোলন প্রেমাকে নিয়ে ঢুকল শোবার ঘরে। সারা ঘর হালকা সবুজ আলোয় ভেসে যাচ্ছে। চোখে একটা মিষ্টি আমেজ।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক হতে হল প্রেমাকে বেডরুমের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে। তিনটি দেওয়ালে তিন মাতৃমূর্তি। প্রমাণসাইজ মূর্তি। প্লাস্টারে তৈরি। এক দিকে ম্যাডোনা শিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। কান্তিময়ী মাতৃমমতায় মাখা মুখখানা। দ্বিতীয় দেয়ালে বালকৃষ্ণ নৃত্যরত। কটিতে ঘুঙুর পায়ে নূপুর। মা যশোদা একটু দূরে বসে করতালি দিয়ে নাচাচ্ছেন তাঁর সাধের গোপালকে। তৃতীয় দেয়ালে উমা মেনকার চিত্র। মা মেনকা, বুকে জড়িয়ে আদর করছেন কিশোরী উমাকে। উমা বধূবেশে সজ্জিতা।

ঘরের ভেতর আশ্চর্য এক পবিত্রতার স্পর্শ।

দোলন বলল, তুমি এ ঘরে শোবে আন্টি। এটা আমার মায়ের বেডরুম ছিল।

আর তুমি?

ঐ যে ভেজান দরজা দেখছ ঐ ঘরটা আমার। এ ঘর ও ঘরে দরজা খোলা থাকে রাতে। তোমার কোন দরকার হলে ডেকো আমাকে।

প্রেমা বলল, রাতে তোমার ঘুম ভাঙাবো এমন দরকার হবে না আমার।

দোলন বলল, তোমার বিছানার সঙ্গে লাগাও কলিংবেলের সুইচ আছে। টিপলেই মেডদের কেউ না কেউ সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে।

প্রেমা হেসে বলল, কোন ভাবনা নেই তোমার। রাতে কাউকে জাগিয়ে তোলা আমার স্বভাব নয়। ঘুমের ভেতরেই কেটে যাবে রাত। চল তোমার শোবার ঘরটা দেখে আসি।

দোলনের বেডরুমে ঢুকে প্রেমা দেখল ঘরখানা ছোট কিন্তু নিখুঁত করে সাজান। একটা বড় জানালা প্রায় পুরো একখানা দেয়াল জুড়ে রয়েছে। ঐ খোলা জানালার ভেতর দিয়ে শুক্লা নবমীর চাঁদ দেখা যাচ্ছিল। একটুখানি বাঁদিকের কোণ ঘেঁষে তাকালে আর একটা ছবি দেখা যায়। মুসৌরীর পথে কোন পাহাড়ী টাউন অথবা খোদ মুসৌরীর আলো। হলুদ নীল লাল কতকগুলো রঙবাহারী পতঙ্গ যেন ঝিকমিক করছে।

প্রেমা বলল, তোমার ঘরখানা ভারী সুন্দর দোলন।

দোলন বলল, এ ঘরে ছাড়া আমার ঘুমই হয় না। আঙ্কেল সারা রাত বেহালা বাজান। আমার ঘুম ভাঙলেই আমি আঙ্কেলের বেহালা শুনতে পাই।

প্রেমা কৌতূহলী হয়ে উঠল। একটি মানুষ সারা রাত বেহালা বাজায়, এ কি সম্ভব!

প্রেমা দোলনের বিছানার পাশে সোফায় বসে বলল, সারারাত ধরে বেহালা বাজান তোমার আঙ্কেল?

দোলন মাথা নেড়ে বলল, আমার মা মারা যাবার পর থেকে আঙ্কেল এমনি করে সারা রাত জেগে বেহালা বাজান। মাকে খুব ভালবাসতেন আঙ্কেল।

প্রেমার কৌতূহল বেড়ে গেল। দোলনের দিকে ঝুঁকে বসে বলল, আঙ্কেল কি তোমার বাবার আপন ভাই?

দোলন হেসে উঠে বলল, না না, মায়ের কোন কোন নাচের সঙ্গে বেহালা বাজাতেন। উনি আমার মামাদের দেশের মানুষ। মা ওঁকে দাদা বলে ডাকতেন। ভারী ভালমানুষ আমাদের আঙ্কেল।

উনি আর সেই থেকে দেশে ফেরেননি বুঝি?

দেশে যেতে চান না। তাই এখানে ঐ বাগানের একধারে বাবা ওঁর থাকার জন্যে একখানা আলাদা ঘর তৈরি করে দিয়েছে। ঐ ঘরে বসেই উনি সারারাত বেহালা বাজান।

প্রেমা বলল, ঘুমোন কখন?

কেন, দিনের বেলায়।

প্রেমা মানুষটি সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করল না।

রাজবাড়ির কোন একটা ঘড়িতে মিষ্টি ধাতব আওয়াজ তুলে এগারোটা বাজতেই দোলন বলল, এবার তোমাকে শুতে যেতে হবে আন্টি। বাবা যদি জানতে পারে এতখানি রাতে তোমাকে জাগিয়ে রেখেছি তাহলে খুব রাগ করবে।

তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই, আমি এক্ষুনি শুতে যাচ্ছি।

হেসে প্রেমা উঠে দাঁড়াল। পরস্পর শুভরাত্রি জানিয়ে যে যার বিছানায় ঢুকে পড়ল।

রাজবাড়ির একটি দামী কম্বল গায়ে টেনে নিয়ে পাশ হয়ে শুল প্রেমা। মৃদু ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল। রাতে সামান্য আলোও চোখে সয় না প্রেমার।

বিছানায় শুয়ে কিন্তু ঘুম এল না। কান সজাগ রেখে বেহালার আওয়াজ শোনার চেষ্টা করল কিন্তু কোন শব্দ কানে এসে পৌঁছল না।

কখন ঘুমিয়ে পড়ল প্রেমা। বারোটা বাজল ঘড়িতে, টের পেল না সে। ঠিক বারোটার পর নিস্তব্ধ চরাচরের বুক চিরে যেন বেরিয়ে আসতে লাগল ভারি করুণ একটা সুরের ধারা। টের পেল না প্রেমা।

কিন্তু নতুন জায়গার জন্যেই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক হঠাৎ শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল তার। জানালার বাইরে আকাশে জ্বলজ্বল করছে শুকতারাটি, হাওয়ায় শীতের আমেজ। বেহালার ছড়ের টানে একটা চাপা কান্না গুমরে গুমরে উঠছে।

বিছানায় শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে সে সুর শুনতে লাগল প্রেমা।

এমন সুর আছে যার তাকে উত্তর অথবা দক্ষিণের শাসনে বেঁধে রাখা যায় না। চারদিকের বাধাবন্ধ উপচে সে ভেসে যেতে থাকে। সব দেশের মানুষের বুকের মাটিকে সে ভিজিয়ে দিতে পারে।

বেহালার আশ্চর্য সুরের ঢেউ প্রেমার বুকে এসে বাজতে লাগল।

কে এই মানুষটি! নিশ্চয়ই সংসারী নন। তাহলের নিজের দেশের ভিটেমাটি ছেড়ে এখানে বছরের পর বছর পড়ে থাকতে পারতেন না। দোলনের মায়ের সঙ্গে কি কোন সম্পর্ক ছিল এই মানুষটির। শুধু কি তাঁর নাচের আবহ রচনার কাজটুকু করতেন এই শিল্পী? তার চেয়ে বেশি কিছু নয়? যা শোনা যায় না অথবা দেখা যায় না তেমনি কোন সূক্ষ্ম সম্বন্ধের সূত্রে কি বাঁধা থাকতে পারে না দুটি মন?

অন্তত দোলনের কথা থেকে তেমনি একটা ধারণা করা কষ্টকল্পিত নয়। দোলনই তো বলেছে, তার মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই বেহালাবাদকের রাত জেগে এমনি সুরসাধনা।

ভোরের নীলাভ একটা আলো অন্ধকার সরিয়ে ফুটে উঠছে। প্রেমা বিছানায় উঠে বসে ফিকে গোলাপী রঙের উইন্ডো স্ক্রীন একটুখানি ফাঁক করে দেখতে লাগল।

পাহাড়ী দেশের আবহাওয়াতে ভোরের কুয়াশা। হাল্কা নীলাভ একটা ধোঁয়া যেন ছড়িয়ে আছে ভ্যালির ওপর। খানিক দূরে নদীটা পারদের প্রবাহ বলে মনে হচ্ছে। এখনও ভোর হয়নি তবে কিসের

যেন রহস্যময় একটা আয়োজনে মেতেছে চরাচর।

ধীরে ধীরে শালবনের আড়ালে সূর্যোদয় হল। ভ্যালিতে জমে থাকা কুয়াশার গায়ের রঙ পাল্টাতে লাগল। পিঙ্কের ছোঁয়া। অলস চোখে সেদিকে চেয়েছিল প্রেমা। পায়ের সাড়ায় ফিরে চাইল। দোলন ঘুমভাঙা চোখদুটো মেলে তার দিকে চেয়ে আছে।

প্রেমা বলল, ভারী সুন্দর ঘুম হয়েছে আমার। তারপর শেষ রাতে তোমার আঙ্কেলের বেহালাও শুনেছি।

কেমন লাগল তোমার আন্টি?

প্রেমা হেসে বলল, দোলনের মতই মিষ্টি!

দোলন মিষ্টি হেসে একরাশ ফুল ঝরাল।

প্রেমার চোখে পড়ল এবার নীচের বাগানে। আপেলের গাছে ডাল ভরে সাদা আর গোলাপী ফুল এসেছে। ডানদিকে গোলাপের বাগান। অজস্র গোলাপ। বাগানের মাঝে মরশুমী ফুলের বেড। গত রাতে ঐ বাগানের মোরাম বিছানো পথে সে গিয়েছিল। তখন চোখে পড়েনি বাগানের এ ধরনের প্রসাধন। আজ ভোরের আলোয় দারুণ রূপসী মনে হল বাগানটাকে।

কে ঐ ঢুকে এল বাগানে। দূর থেকে গলাবন্ধ গুরুপাঞ্জাবী আর চুড়িদার পরে এগিয়ে আসছে। ভোরের নরম সোনালী আলোটুকু তুলি দিয়ে কে যেন মাখিয়ে দিয়েছে ওর গায়ে।

একটু এগিয়ে আসতেই প্রেমা চিনতে পারল। কুমার জয়কিষণ। হাতে পেতলের ঝকঝকে একটা সাজি। জয়কিষণ বাগানের গাছ থেকে ফুল তুলতে লাগলেন। প্রেমা অবাক চোখে সেদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। কুমারবাহাদুর নিজেই ফুল তুলছেন। যে কোন কর্মচারীকে দিয়ে ফুল তোলাতে পারতেন।

প্রেমা দোলনের দিকে ফিরে বলল, তোমার বাবা রোজ এমনি ফুল তোলেন?

দোলন বলল, রোজ। বাবা যে মহাদেবের মন্দিরে রোজ ভোরবেলা পুজোয় বসেন।

প্রেমা বলল, তোমাদের রাজবাড়ির দেবতা কি মহাদেব?

হাঁ আন্টি। মহাদেব আর পার্বতীর শ্বেতপাথরের মূর্তি আছে আমাদের মন্দিরে। জয়পুর থেকে আমার বাবার দাদু আনিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

একটু থেমে বলল, দূর দূর গ্রাম থেকে কত পাহাড়ী লোকজন পুজো দিতে আসে। খুব সুন্দর দেখতে হর-পার্বতীর ঐ মূর্তি। তুমি ব্রেকফাস্ট করে নাও, আমি তোমাকে নিয়ে যাব মন্দিরে।

প্রেমা বলল, দশ পনের মিনিটের ভেতর আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। তুমিও তৈরি হয়ে নাও। ব্রেকফাস্টের আগেই আমি মন্দিরে ঘুরে আসব।

ঠিক আছে, বলে দোলন নিজের শোবার ঘরে ঢুকল।

প্রেমা রাতের পোশাক ছেড়ে নতুন পোশাক পরল। সোনালী জরি আর সাদা পরিচ্ছদে ওকে অসাধারণ মানিয়েছিল। নিটোল ফুটে ওঠা একটি ম্যাগনোলিয়ার মত। ও দোলনের হাত ধরে দোলাতে দোলাতে হরপার্বতীর মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল।

শ্বেতপাথরে বাঁধান চত্বর। মাঝারি আকারে প্রস্তরনির্মিত মন্দিরটির মাথায় জেগে আছে একটি ত্রিশূল। প্রেমা আর দোলন মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। মন্দিরের দরজা খোলা। ওরা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

অর্ধ আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে বসে হরপার্বতী সামনের দিকে চেয়ে আছেন। জয়কিষণ পুজোয় বসেছেন। এখন তাঁর পরনে গেরুয়া বাস। ঊর্ধ্ব অঙ্গে একখানি উত্তরীয়। ফুল নিয়ে চন্দনে ডুবিয়ে স্তব্ধ হয়ে কিছু সময় বসে থেকে সেই ফুল ইষ্টদেবতার পায়ে সাজিয়ে দিচ্ছেন।

ফুল দেওয়া শেষ হলে করজোড়ে কতক্ষণ বসে রইলেন।

জয়কিষণের এই নিবেদনের ভাবটি বড় ভাল লাগল প্রেমার। সে দোলনের হাত ধরে নতজানু হয়ে বসে মন্দিরের ভেতর চেয়ে রইল। আশ্চর্য সুন্দর মূর্তি। শ্বেতপাথরের মূর্তির চোখ মুখ শিল্পী হাল্কা রঙে এঁকে দিয়েছেন। যেমন সৌম্যশান্ত তেমনি আনন্দময় মুখমণ্ডল। বসার লীলায়িত ভঙ্গিটি দেখতে

দেখতে প্রেমা যেন পার্বতী হয়ে গেল। তার অজ্ঞাতেই তার রক্তের শিল্পীসত্তা ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলল। তরুণী দেহটি বার বার রোমাঞ্চিত হতে লাগল। কালিদাসের কুমারসম্ভব তার পড়া। মনে হল, দুঃখ তপস্যার শেষে প্রিয়-মিলনের হাসিটি ফুটে উঠেছে পার্বতীর মুখে। জয়কিষণ পার্বতীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন একটি স্থলপদ্ম। আনারদানার রঙের পদ্মটি যেন পার্বতীর ভালবাসার প্রতীক।

পুজো শেষে প্রণাম করে ফিরে দাঁড়ালেন জয়কিষণ। বেরিয়ে আসার জন্যে উদাত্ত দক্ষিণ চরণ সংযত করলেন। প্রেমা নতজানু হয়ে চোখ দুটি বন্ধ করে নমস্কার নিবেদন করছে। মন্দিরের বিগ্রহকে কিংবা এইমাত্র যিনি পুজোর আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন তাঁকে, তা বোঝা গেল না। তবে নমস্কার রত প্রেমার সামনে দিয়ে জয়কিষণ বেরিয়ে আসতে পারলেন না।

কিছু পরে প্রেমা চোখ মেলে তাকাল। সামনে দাঁড়িয়ে জয়কিষণ। প্রেমার মুখে লজ্জার রঙ ফুটল। সে উঠে দাঁড়াল। জয়কিষণ প্রশান্ত চোখে চেয়ে বললেন, আমাদের কুলদেবতা। এখানে থাকলে রোজ পুজোয় বসতেই হবে। এই আমাদের বংশানুক্রমিক নিয়ম। অবশ্য পূজারী রয়েছেন। আমরা কেউ না থাকলে তিনিই পুজোয় বসেন। তাছাড়া উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষ পুজো অর্চনার দায়িত্ব তাঁর। আমাদের পুজো, মহেশ্বরকে ভালবাসি তাই।

প্রেমা অমনি বলল, পার্বতীকে ভালবাসেন না?

জয়কিষণ হেসে বললে, বাসব না কেন? ওঁরা যে এক হয়ে মিশে রয়েছেন পার্বতী-পরমেশ্বরী। একজনকে স্মরণ করলে অন্যজনকেও অন্তরে গ্রহণ করা হয়।

প্রেমা বলল, অপূর্ব বিগ্রহ। চোখ ফেরান যায় না। বসার ভঙ্গি চোখের দৃষ্টি মুখের হাসি চেয়ে চেয়ে দেখার মত।

জয়কিষণ বললেন, আমার পিতামহ এই মূর্তি তৈরি করিয়ে এনেছিলেন। আমাদের পরিবারের যে শাখাটি বাংলাদেশে রয়েছে তাঁদের কাছ থেকে আমার পিতামহ একসময়ে একটি ছবি উপহার পান। সেই ছবিটি এক বাঙালী শিল্পীর আঁকা। ছবি দেখে পিতামহ এতই মুগ্ধ হন যে নিজে জয়পুর গিয়ে অবিকল ছবির অনুকরণে এই মূর্তি তৈরি করিয়ে আনেন।

প্রেমা বলল, আপনাদের সঙ্গে দেখছি বাংলাদেশের যোগাযোগ নানা দিক থেকে।

জয়কিষণের মুখ উদ্ভাসিত হল, তা বলতে পারেন।

ওরা এবার টুকরো টুকরো কথা বলতে বলতে বাঁধান চত্বর পেরিয়ে রাজবাড়ির দিকে চলল। প্রেমা দেখল, জয়কিষণ স্বল্প বেশবাশে এই মুহূর্তে রোদ্দুর মেখে এক হিরণ্ময় পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। দেহের অনাবৃত অংশ পৌরুষে দীপ্তিতে চোখের উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পড়ন্ত বেলায় দোলনের সঙ্গে ছাদে উঠে আর এক দৃশ্য দেখল প্রেমা। কাছে ধূসর নীল পাহাড়। মাঝে উপত্যকায় ছড়ানো-ছিটোনো ক্ষেতখামার। কোথাও সোনালী কোথাও সবুজ। মাঝে শালবন ভ্যালির এক একটুকরো জায়গা জুড়ে সংসার রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণে লালসিয়া স্টেটের বসতি অফিস দোকানপাট। উত্তরে টিলা। তার পেছনে আবার বিরাট মাউন্টেন রেঞ্জ। শাল আর পাহাড়ী গাছের ঘন সমাবেশে উত্তর দিকটা পাহাড়ী অরণ্যভূমির ছবি ফুটিয়ে তুলেছে।

দোলন আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ যে দেখ আন্টি ঘোড়ায় চড়ে বাবা আসছে। রোজ এই সময় বাবা বেড়িয়ে ফেরে।

প্রেমা দেখল, সেই প্রথম ভোরের মত শেষ সূর্যের উত্তাপহীন আলোয় স্নান করে এক অশ্বারোহী শালবনের ভেতর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে আসছেন রাজবাড়ির দিকে। টিলা পেরিয়ে সমতলের দিকে নামতে লাগলেন জয়কিষণ। চেয়ে দেখার মত ভঙ্গি। নীচে নামার সময় ঘোড়ার রাশ টেনে পেছনের দিকে ঝুঁকে বসেছিলেন। আবার সমতল পথে সোজা হয়ে বসে ছন্দিত লয়ে ঘোড়া চালাতে লাগলেন।

প্রেমা বলল, কতদূর তোমার বাবা ঘোড়া নিয়ে যান দোলন?

ঐ যে শালবনের ওপারে একটা বড় পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওটা এক সময় আমাদের স্টেটের

উত্তরের সীমানা ছিল। বাবা এখানে থাকলে রোজ ঘোড়ায় চড়ে ঐ পাহাড়টা ছুঁয়ে আসেন। একবার ওখানে গিয়ে ফিরে এলে বাবার গায়ের সব পোশাক ঘামে ভিজে যায়। ঘোড়ায় চড়লে দারুণ একসারসাইজ হয়।

প্রেমা বলল, তুমি ঘোড়ায় চড়তে পার দোলন?

পারি বইকি। বাবার পাশে পাশে ঘোড়া চালিয়ে আমি কতদূর গিয়ে ফিরে এসেছি। আমি ঘোড়া দৌড় করিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

প্রেমা বলল, সত্যি! দারুণ মেয়ে তো তুমি!

দোলন এবার লজ্জা পেয়ে হাসি হাসি মুখখানা নামাল।

দোলনের দিকে চেয়ে প্রেমার মনে হল বয়সের তুলনায় দোলন শুধু দেহেই বড় নয় মনেও অনেকখানি এগিয়ে আছে। তরুণী দোলন সময়ে কেবল অসাধারণ সুন্দরীই হবে না, চারিদিকের পারিবেশকে তার উপস্থিতি দিয়ে মাতিয়ে তুলবে।

প্রেমা দোলনের একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে আঙুলগুলো পরীক্ষা করতে লাগল।

কি দেখছ আন্টি? তুমি কি পামিস্ট? আঙ্কেল খুব ভাল হাত দেখতে পারেন।

প্রেমা বলল, তাই বুঝি? না, আমি পামিস্ট নই তবে তোমার আঙুল দেখে বলতে পারি, নাচ শিখলে তুমি নামকরা ড্যান্সার হতে পারবে।

তুমি আমাকে নাচ শেখাবে আন্টি?

প্রেমা হেসে ফেলল। হাসি থামলে বলল, তোমার বাবাকে বল, আমার জন্যে গেস্টহাউসটা পারমানেন্টলি ছেড়ে দিতে। মাসে দুদিনের জন্যে প্লেনে করে আসবো তোমাকে নাচ শেখাতে।

দোলন কথাটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করে নিল। সে প্রেমার হাতে চুমু খেয়ে বলল, সত্যি আন্টি তুমি কি দারুণ ভাল। বাবাকে এক্ষুনি আমি বলব।

প্রেমা দোলনকে বাধা দিয়ে বলল, বোকা মেয়ে তা কি হয়। আমি থাকি কতদূরে, আমার পক্ষে আসা কি সম্ভব।

দোলনের হঠাৎ কি হল, সে দুহাতের পাতায় তার দুটো চোখ ঢেকে ফেলল।

প্রেমা বুঝল, মেয়েটির আশাভঙ্গ হয়েছে তাই সে নিজের উদ্গত অশ্রু চেপে রাখতে পারছে না।

দুহাত বাড়িয়ে প্রেমা দোলনকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বলল, ছি ছি এমন করে কেউ কাঁদে। বাবাকে বললে কত ভাল নাচিয়ে এনে বাড়িতে রেখে নাচ শেখাবেন।

দোলন প্রেমার বুকের ভেতর রাখা মাথাটিকে দোলাতে দোলাতে বলল, আমি আর কারুর কাছে নাচ শিখব না আন্টি। তুমি না শেখালে আমি কক্ষনো নাচ শিখব না।

পরিস্থিতিকে রক্ষা করল একটি পরিচারিকা এসে। কুমারবাহাদুর দোলনকে নীচে ডাকছেন।

দোলন দেখা গেল অতি বাধ্য মেয়ে। সে প্রেমার বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। বৃষ্টিভেজা মুখখানা মুছে নিয়ে বলল, আন্টি তুমি কি ছাদে থাকবে না আমার সঙ্গে নীচে নামবে? তোমার কফির টাইম হয়ে গেছে।

প্রেমা বলল, চল নীচে নেমে যাই।

ওরা নীচে নেমে এল। প্রেমাকে ড্রইং রুমে বসিয়ে দোলন চলে গেল বাবার কাছে। প্রেমা দেখল বুক সেলফে নানা ধরনের বই সাজান। ও লাল কার্পেটের ওপর হাঁটু ভেঙে বসে বই টেনে টেনে দেখতে লাগল। ওপরের থাকে বহু নাচের বইয়ের কালেকশান। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নাচের ওপর প্রকাশিত বইয়ের সংগ্রহ। একখানা বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মোহিনী আট্যমের শিল্পী হিসেবে গুরু মাধবী আম্মার নাম দেখে প্রেমা রোমাঞ্চিত হল।

লেখক জনৈক যশোদানন্দন শ্রীবাস্তব। মাধবী আম্মার যৌবনকালের নাচ দেখেছেন তিনি। স্টেজে মাধবী আম্মাকে দেখে তাঁর কি অনুভূতি জেগেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে গেছেন লেখক। মাধবী আম্মার পারফরমেন্সের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নাকের হীরের ঝলকটুকুও যে লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি সে কথাও লেখক অকপটে লিখে গেছেন। আর একটি কথা লিখেছেন। কানের রিং হারানো

আর স্টেজে দর্শকদের মাঝে তাই খোঁজার একটা অভিনয় আছে মোহিনী আট্যমে। এক তরুণীর ইয়াররিং হারিয়ে গেছে। সে নাচের ছন্দিত পা ফেলে খুঁজে ফিরছে তার হারিয়ে যাওয়া ইয়াররিং। চরাচরের কোথাও কিছু ঝিলিক দিলেই সে সেদিকে দৌড়ে চলে যাচ্ছে তার হারিয়ে যাওয়া কানের অলঙ্কার ভেবে। এই খোঁজার ভেতর শিল্পীর পদচারণা থেকে মনের নানা ধরনের ভাব-ভাবনার দ্রুত পরিবর্তনেই দর্শকদের উল্লাস বাড়িয়ে তোলে। শেষে শিল্পী স্টেজ থেকে নেমে আসে দর্শকদের ভেতর। চোখেমুখে আকুতির ভাব ফুটিয়ে প্রশ্ন তোলে—তোমরা কি কেউ পেয়েছ আমার রিং?

কখনো বা চোখেমুখে আবেদনের ভাবটি ফুটিয়ে বলে—দয়া করে দেবে কি আমার কানের গয়নাটা ফিরিয়ে?

শেষে কোন কোন তরুণ যুবা-পুরুষের দেহে হাত রেখে খোঁজার অভিনয় করে তরুণী নর্তকী। চারিদিকে অমনি রসের প্লাবন বয়ে যায়। এ ওর দিকে নির্দেশ করে বলে, এই যে এখানে এখানে।

বিভ্রান্ত নর্তকী জনে জনে সন্ধান করে ফিরতে থাকে। মাতন লাগে সারা অডিটোরিয়ামে।

এই ইয়াররিং হারানোর অভিনয়টি আজকাল উঠে গেছে স্টেট থেকে। মোহিনী আট্যমের নাচের তালিকা থেকে নির্মমভাবে ছাঁটাই হয়ে গেছে এই কৌতুক নক্সাটি মরালিস্টদের চাপে পড়ে। এ নাকি অশ্লীল।

মাধবী আম্মাদের যৌবন দিনে নাচের একেবারে শেষে এই অভিনয়টুকু অবশ্য করণীয় ছিল। নর্তকী যেন এই নাচটুকুর ভেতর দিয়ে বলতে চাইত, হে আমার ভক্ত উপাসক দর্শককুল, দেখ, তোমাদের নাচ দেখাতে গিয়ে আমি কানের প্রিয় অলঙ্কারটিও হারিয়ে বসে আছি।

সমঝদার কোন রাজামহারাজ অথবা ধনী দর্শক হলে নর্তকীকে কানের অলঙ্কার গড়িয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিতেন। সবার সামনে স্টেজের ওপরে উঠে ঘোষণা করতেন।

লেখক লিখেছেন, মাধবী আম্মা তাঁর কাছে এসে চোখমুখের মুদ্রায় আশ্চর্য জিজ্ঞাসা চিহ্ন ফুটিয়ে তুললেন। লেখক নেতিবাচক মাথা নাড়তেই সঙ্গে সঙ্গে করুণ হয়ে উঠল মাধবী আম্মার চোখমুখ।

লেখক মন্তব্য করেছেন, মুহূর্তে মুখের এমন ভাব পরিবর্তন তিনি তাঁর দর্শক জীবনে আর কোন শিল্পীর মধ্যেই দেখেননি। এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। মাধবী আম্মাকে না দেখলে ভাষায় সে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ সম্ভব নয়।

পড়তে পড়তে জল এসে গেল অতিআধুনিকা নর্তকী প্রেমা মেননের চোখে। তার বার বার মনে হতে লাগল, সে চেষ্টা করলেও তার গুরু মাধবী আম্মার শক্তির কাছাকাছি যেতে পারবে না। কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সে বইখানা মাথায় ছোঁয়াল। যেন এই মুহূর্তে প্রেমা পরম শ্রদ্ধায় স্পর্শ করল গুরু মাধবী আম্মার চরণ।

পেছনে কখন এসে দাঁড়িয়েছে দোলন। বইখানা সেলফে রাখতে যেতেই গলা বেজে উঠল দোলনের, আন্টি এ বুকসেলফখানা মায়ের। অনেক নাচের বই আছে এর ভেতর।

প্রেমা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাই দেখছিলাম এতক্ষণ।

দোলন এবার একখানা ছোট্ট স্লিপ ধরিয়ে দিল প্রেমার হাতে।

প্রেমা দেখল, কুমার জয়কিষণ স্লিপ পাঠিয়েছেন।

মাননীয়া মিস মেনন,

আমার বাইরের মহলে আজ সান্ধ্য কফি খেতে কি আপনার খুব আপত্তি হবে? সামনের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু আলোচনাও আছে।

আপনাদের জয়কিষণ।

প্রেমা চিঠি পড়া শেষ করে দোলনকে বলল, চল তোমার বাবার ঘরে যাই। উনি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ওখানেই কফি খাব আমরা।

দোলনের সঙ্গে প্রেমা এলো বাইরের মহলে। কুমার জয়কিষণ একাই বসেছিলেন ড্রইংরুমে। উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করে প্রেমাকে বসালেন।

জয়কিষণ ইতিমধ্যে ভ্রমণের পোশাক পরিবর্তন করেছেন। এখন ধবধবে সাদা ধুতির ওপর

পরেছেন র-সিল্কের মেবজাই। কাঁচা সোনার মত রঙ এই পোশাকে যেন আরও খুলেছে।

পেতলের কাজকরা ট্রেতে এলো স্ন্যাকস আর কফি।

দোলন কফির কাপ প্রেমার হাতে তুলে দিতে যেতেই প্রেমা কাপটা ধরে নিয়ে জয়কিষণের দিকে চেয়ে বলল, দোলন যেভাবে অতিথি সেবা করছে তাতে সহজে লালসিয়া ছেড়ে যেতে পা উঠবে না। আর যদি একান্ত যেতেই হয় তাহলে দোলনকে সঙ্গে না নিয়ে গিয়ে দেখছি উপায় নেই।

দোলন রসিকতাটুকু উপভোগ করল. কিন্তু সেখানে আর দাঁড়াল না। সে একমুখ হাসি উপহার দিয়ে দৌড়ে ঘর ছেড়ে পালাল।

জয়কিষণ বললেন, ওকে যে কোন একটা কাজে নিযুক্ত করে দিলেই হল। ঐটাই হয়ে উঠবে ওর ধ্যানজ্ঞান।

প্রেমা বলল, একটি কিশোরী যে কতখানি আকর্ষণীয় হতে পারে তার উজ্জ্বল উদাহরণ আমাদের দোলন। ওর মন.আর মুখের হাসি শিশুর মত কিন্তু কর্তব্যে ও বড়দেরও হার মানায়।

জয়কিষণ বললেন, এ সবই ওর মায়ের কাছে শেখা। খুব ছেলেবেলা থেকেই প্রতিটি কাজ ওকে দিয়ে করাতেন ওর মা। এলোমেলো নয়, সবকিছু গুছিয়ে সুন্দর করে করতে শেখাতেন।

প্রেমা বলল, দোলন মায়ের অভাব নিশ্চয়ই অনুভব করে?

খুব ছেলেবেলা মা চলে গেছে তাই দুঃখবোধটা বড় বেশি নেই। তবে মায়ের সম্বন্ধে ওর প্রশ্ন অহরহ। কোন একখানা ছবি দেখলেই অমনি নানা বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

প্রেমা বলল, খুব স্বাভাবিক।

জয়কিষণ বললেন, কিছুদিন থেকে দেখছি দোলন স্নানের পর আমার ঘরে চলে এসে মায়ের ছবির সামনে চুপচাপ কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর কোন কথা না বলে প্রণাম করে চলে যায়।

প্রেমা অমনি বলল, দোলনের মায়ের ছবি কি এখানে রয়েছে?

কফি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। জয়কিষণ বুঝলেন প্রেমা তাঁর স্ত্রীর ছবি দেখতে চায়। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

প্রেমা জয়কিষণকে অনুসরণ করে ভেতরের একখানা ঘরে এসে দাঁড়াল।

বিরাট প্রশস্ত ঘর। কুমার জয়কিষণের বেডরুম বলেই মনে হল। দুখানা পালঙ্ক পাশাপাশি রয়েছে। হাতির দাঁতের কাজ করা ছত্রী। লতাপাতা পাখিতে দারুণরকম দর্শনীয়। বিছানা দুখানিই সাজান। একটি বিছানার মাথার দিকে লতাপাতার কাজের মাঝখানে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একখানা ছবি।

বড় রঙীন ছবি। গোল্ডেন ফ্রেমে বাঁধান। প্রেমা পাশে দাঁড়িয়ে ছবিখানা দেখতে লাগল। অলঙ্কারে সজ্জিত নববধূর মূর্তি। প্রেমার এক ঝলক দৃষ্টিতেই মনে হল প্রশংসনীয় মুখখানা। সম্ভবত ছবি তোলার সময় জয়কিষণের কোন বন্ধু কৌতুক করছিলেন তাই নববধূর চোখ কারুর ওপর যেন নিবদ্ধ। মুখে কৌতুক উপভোগের একটুকরো হাসি।

প্রেমা বলল. দোলন মা-বাবা দুজনেরই আদল পেয়েছে।

জয়কিষণ হেসে বললেন, কার ভাগ বেশি?

ফিফটি ফিফটি বলা যায়। তবে খুঁটিয়ে না দেখলে অ্যাকিউরেটলি বলা সম্ভব নয়।

একবার ঘরের দেয়ালে চোখ পড়ল প্রেমার। নর্তকী শ্রীমতী গর্গের নানা ধরনের নৃত্যভঙ্গিমার ছবিতে চারটি দেয়াল ভরা। অধিকাংশই রঙীন ছবি। মণিপুরী কথক ভারতনাট্যম আর পাহাড়ী কোন লোকনৃত্যের সব ছবি। দারুণরকম গতিশীল আর প্রাণবন্ত।

দেখতে যথার্থ সুন্দরী ছিলেন ভদ্রমহিলা। হাসির ভেতর কৃত্রিমতার চেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটুকু লক্ষ্য করার মত। মুখখানাকে প্রায় সিধে রেখে চোখের তারা নয়ন কোণে উড়িয়ে প্রিয়জনকে আহ্বানের কঠিন ভঙ্গিটি অনায়াসে আয়ত্ত করে নিয়েছেন মিসেস গর্গ।

প্রেমা বলল, বড় গুণী ছিলেন আপনার স্ত্রী।

জয়কিষণ হেসে বললেন, কি করে বুঝলেন?

প্রেমা বলল, সাহিত্যিক সাহিত্যিককে চেনেন আর শিল্পী শিল্পীকে। সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?

জয়কিষণ বলল, হার মানলাম। আপনি একজন গুণী নৃত্যশিল্পী হয়ে অন্য একজন শিল্পীকে চিনবেন বই কি। কিন্তু মিস মেনন একই বৃত্তির মানুষেরা পরস্পরকে সাধারণতঃ ঈর্ষার চোখেই দেখে থাকেন।

প্রেমা বলল, আমি যে গুরুর কাছ থেকে নাচ শিখেছি তাঁর প্রথম পাঠ ছিল অন্যকে শ্রদ্ধা করতে শেখ তবেই নাচ শিখতে পারবে।

তিনি বিভিন্ন গুরুর কাছে আমাদের নিয়ে যেতেন। তাঁদের শিক্ষা পদ্ধতি মন দিয়ে শিখে নিতে বলতেন। তাঁর মত ছিল, বিভিন্ন নৃত্যধারার সঙ্গে পরিচিত হও তবে তোমার নিজস্ব শৈলী একদিন গড়ে উঠবে। বলতেন, গুণীকে সব সময় মন থেকে প্রশংসা করবে আর তোমার চেয়ে যে খুব দুর্বল তাকে উৎসাহ দেবে। ঈর্ষাকাতর হয়ো না, কিন্তু জেদী হও।

একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে প্রেমা লজ্জিত হল। গুরুর প্রসঙ্গ এলেই প্রেমা প্রগলভ হয়ে ওঠে।

জয়কিষণ বললেন, আপনার গুরু কি মাধবী আম্মা?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?

জয়কিষণ বললেন, আপনাদের জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বিচার সভায় উনিই তো সেদিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পুরস্কার দেবার সময় ওঁকে আমরা দেখেছি। কিন্তু দর্শক হিসেবে ওঁর সঙ্গে আমরা একমত হতে পারিনি। প্রতিটি দর্শকই প্রায় আপনার সপক্ষে তাঁদের মত দিয়েছেন।

প্রেমা হেসে বলল, উনি যে আমার গুরু। তাই বিচারে আমাকে দ্বিতীয় স্থান দিয়ে আপনাদের চোখে আরও বড় করে তুলেছেন।

জয়কিষণ বললেন, বিশ্বাস করুন সেদিন আমরা বিচারকের ডিসিশানে দারুণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। শেষে যখন শুনলাম আপনার গুরু মাধবী আম্মাই আপনার বিপক্ষে একটি ভোট দিয়ে কত্থক শিল্পীকে জিতিয়ে দিয়েছেন তখন আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

প্রেমা বলল, আমার গুরু বলেই এ কাজ করতে পেরেছেন। আমি আমার গুরুর জন্যে গর্বিত।

জয়কিষণ এবার স্মিত হাসি হাসলেন। বললেন, এমন শিষ্যের জন্যে গুরুরও গর্বিত হওয়া উচিত।

প্রেমা প্রসঙ্গটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, আপনার স্ত্রীর অনেকগুলি মূল্যবান নাচের বই-এর কালেকশান আছে।

উনি ওঁর সাবজেক্টের বই পড়তে খুব ভালবাসতেন। আমি ওঁর বিষয়ের ভেতর নাক গলাতে যেতাম না। কারণ দু'একবার পাতা উল্টে দেখেছি ও বিষয়টা দর্শনে যত সুন্দর পঠনে ঠিক ততটা নয়।

প্রেমা বলল, ওঁর সেলফ থেকে বই একখানা দেখতে গিয়ে আমার গুরু সম্বন্ধে কিছু আলোচনা দেখে খুব ভাল লাগল।

জয়কিষণ বললেন, আমার স্ত্রী নিশ্চয়ই আপনার গুরুর নাম জানতেন। উনি আজ এখানে থাকলে ওঁর সঙ্গে নাচের বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে আপনি খুশিই হতেন।

প্রেমা বলল, দুর্ভাগ্য আমার উনি আজ নেই। আচ্ছা জয়কিষণ, আপনাদের নৃত্য মঞ্চটি কি মিসেস গর্গের পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছিল?

সম্পূর্ণ ওঁরই পরিকল্পনায়। শুরু থেকে শেষ অব্দি প্রায় প্রতিদিন উনি মঞ্চ তৈরির সময় উপস্থিত থাকতেন।

প্রেমা বলল, আপনাদের নাটমণ্ডপটি দেখা হল না। বাইরের সংস্কারের কাজ কি এখনও বাকী আছে।

জয়কিষণ বললেন, প্রায় শেষ। কদিন বাদেই আপনাকে নিয়ে যাব ওখানে।

প্রেমা বলল, মিঃ গর্গ, আপনি কি যেন আলোচনার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে?

জয়কিষণ বললেন, একটু আগে নাম ধরেই তো কথা বলছিলেন, আবার মিঃ গর্গ কেন? আমি খুব আনন্দ পেয়েছি আপনার নাম ধরে ডাকাতে।

প্রেমা বলল, আমার কোন আপত্তি নেই। কেবল কুমারবাহাদুর আপত্তি না করলেই হল।

জয়কিষণ বললেন, আমি তো আগেই নাম ধরে ডাকার আবেদনটা পেশ করে রেখেছিলাম।

প্রেমা সুন্দর করে হাসল।

জয়কিষণ বললেন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, পালঙ্কের ওপরেই বসুন।

প্রেমা বলল, অসম্ভব। মিসেস গর্গের চিহ্নিত আসন এটি। ওঁর ফটোও রাখা আছে এর ওপর।

জয়কিষণ বলে উঠলেন, কিছু হবে না, কিছু হবে না। ওসব প্রেজুডিস নেই আমার। আপনি অসংকোচে বসুন।

প্রেমা মিসেস গর্গের ছবির ফ্রেমে হাত দিয়ে নমস্কার করে পালঙ্কের এক কোনায় বসল।

জয়কিষণ খানিক দূরে নিজের বিছানার ওপর বসে বললেন, আপনাকে ডেকেছি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব বলে।

প্রেমা জিজ্ঞাসু চোখ মেলে তাকাল।

জয়কিষণ বললেন, কয়েকটা দিন পরেই পূর্ণিমা। রাস উৎসবের অনুষ্ঠান ঐদিনে। লালসিয়ায় এই বসন্ত রাসের প্রবর্তন দোলনের মা-ই করে গেছেন।

প্রেমা বলল, আপনাদের রাস উৎসব কিভাবে হয়?

জয়কিষণ বললেন, নাটমণ্ডপের সামনের বাগানটিকে আলো দিয়ে সাজান হয়। বাগানের বিভিন্ন অংশে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিচিত্র সব লীলার প্রদর্শনী হয়। মাঝে তৈরি হয় রাস মঞ্চ। একটি কৃত্রিম দণ্ড শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্পে সজ্জিত হয়ে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। তোতা, কোকিল, পাপিয়া, বুলবুল পাখিতে গাছটি ছেয়ে থাকে। অবশ্য সবই কারিগরের হাতের তৈরি। রাতে গাছে নানা ধরনের আলোয় ফুল ফোটে।

গাছের ডালে ডালে ঝোলান হয় দোলনা। কারেন্টে দোলনাগুলো দুলতে থাকে। প্রতিটি সজ্জিত দোলনায় একজন কৃষ্ণ ও একজন গোপকন্যা। এক সময় বৃক্ষটিকে বৃত্তাকারে ঘোরান হয়। তখন কোকিল পাপিয়া ডাকতে থাকে। রাসের গান করে গায়কেরা গাছের তলায় মঞ্চে বসে।

প্রেমা বলল, রাধাকে চেনা যায় কি করে?

জয়কিষণ বললেন, তিনি তো অপরূপা। দর্শকেরা সব গোপিনীর ভেতর থেকে রাসেশ্বরীকে ঠিকই চিনে নেয়। সবচেয়ে সুন্দর করে গড়া হয় রাধার মূর্তি।

প্রেমা বলল, আপনাদের উৎসব নিশ্চয়ই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

জয়কিষণ বললেন, সন্ধে ছটা থেকে রাত নটা অব্দি রাস উৎসব। জনসমাগম হয় সে সময়। তারপর সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। বিশিষ্ট অতিথিরা তখন শুধু থাকেন নাটমণ্ডপে। আর সবাই চলে যান।

প্রেমা বলল, ঐ তিন ঘণ্টাতেই কি উৎসবের শেষ? সবাই কি এই সামান্য সময়ের ভেতর সবকিছু দেখে নিতে পারেন?

উৎসবের শেষ এক রাতেই। তবে আলোকসজ্জা ইত্যাদি থাকে তিন দিন। তার ভেতর বহু মানুষ দেখে যান।

প্রেমা বলল, এরপর বিশিষ্ট অতিথিরা নাটমণ্ডপে নৃত্য শিল্পীদের অনুষ্ঠান দেখেন?

ঠিক তাই।

প্রেমা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা জয়কিষণ, আপনার স্ত্রী লালসিয়ার বাইরে নৃত্যের কোন অনুষ্ঠানে কখনো যোগ দেন নি?

বিয়ের আগে হয়ত দিয়েছেন, কিন্তু এখানে আসার পরে নয়।

এ বিষয়ে কি আপনাদের পরিবারের কোন প্রেজুডিস আছে?

জয়কিষণ বললেন, আমার না থাকলেও বাবার ছিল। আর আমার স্ত্রী বাবাকে যেমন ভক্তি করতেন, তাঁর কথা তেমনি মেনেও চলতেন।

প্রেমা বলল, আপনার বাবার মৃত্যুর পরে তাহলে এ নাটমণ্ডপ হয়েছে?

হ্যাঁ। তাঁর মৃত্যুর পরে আমি আমার স্ত্রীর কাছে এ ধরনের একটা নৃত্য মঞ্চ তৈরির পরিকল্পনা করি। তিনি বাবার কথা চিন্তা করে প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে উৎসাহের সঙ্গে কাজে লেগে যান। নাটমণ্ডপের পরিপূর্ণ রূপটা কিন্তু দেন তিনি। ইঞ্জিনীয়ার এবং মিস্ত্রীরা তাঁর চিন্তা অনুযায়ী কাজ করে

যায়।

প্রেমা বলল, তিনি আপনার অতিথিদের সামনে এই নাট মণ্ডপে তাঁর নৃত্য পরিবেশন করতেন নিশ্চয়?

হ্যাঁ। তবে বছরের কতকগুলো অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে অনেক গুণী শিল্পীকে আমন্ত্রণ করে আনতেন।

প্রেমা বলল, একটা কুঁড়ি যেমন পাপড়ি মেলে ফুটে উঠতে চায়, শিল্পীও তেমনি চায় সবার সামনে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে।

জয়কিষণ বললেন, কোন শিল্পী লালসিয়াতে এলে বড় খুশী হয়ে উঠতেন তিনি। তাঁকে কিভাবে সমাদর করবেন যেন বুঝে উঠতে পারতেন না। অনেক করেও কিছুতেই যেন আর তাঁর তৃপ্তি হত না।

প্রেমা বলল, মেয়ে কিন্তু মায়ের গুণ পেয়েছে। আর এত অল্প বয়সে ও দারুণ ডিউটিফুল হয়েছে।

জয়কিষণ বললেন, দোলন মায়ের মত মানুষকে ভালবাসতে শিখেছে আর তাঁর কাছ থেকে কিছু কিছু দোষও পেয়েছে।

প্রেমা হেসে বলল, যেমন?

এই যেমন ধরুন কোন গোলমাল দাঙ্গা-হাঙ্গামা কোথাও বাধলে নির্ভীকভাবে এগিয়ে যাওয়া। কর্মচারী আর পরিচারকদের ঝামেলা ঠাণ্ডা মাথায় মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা।

প্রেমা অমনি বলল, লালসিয়া স্টেটের সীমানা অব্দি বাবার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া।

জয়কিষণ হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, সবই জানা হয়ে গেছে দেখছি।

প্রেমা বলল, এইসব দস্যিপনার অপগুণগুলো দারুণভাবে বাবার কাছ থেকে পেয়ে গেছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য, ছেলেদের মত এসব গুণ থাকা সত্ত্বেও ওর ভেতর কিশোরী মেয়ের কোমল লাবণ্যটুকু থেকে গেছে।

জয়কিষণ বললেন, ওটুকু ওর মায়ের আশীর্বাদ।

প্রেমা বলল, ওঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি, কিন্তু সামনের ছবি দেখে ওঁর স্বভাবের অনেকখানি অনুমান করা যায়।

জয়কিষণ এবার আর কোন কথা বললেন না। স্ত্রীর আরও অনেক প্রশস্তি করার ইচ্ছে তাঁর থাকলেও তিনি চুপ করে গেলেন। এরপর কিছু বললে যে তা আর গভীর শোনাবে না সেটা তিনি অনুভব করলেন।

কিছুক্ষণ নীরবতার ভেতর কাটিয়ে এক সময় জয়কিষণ বললেন, আপনাকে ডেকেছি একটি ব্যাপারে ক্ষমা চাইবার জন্যে।

প্রেমা বলল, এমন করে বলছেন কেন? কি অপরাধ যে ক্ষমা চাইতে হবে।

জয়কিষণ বললেন, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। অনুষ্ঠানের আগের দিন ফিরব।

প্রেমা বলল, কাজ থাকলে যেতে হবে বৈকি। কিন্তু কিছু যদি মনে না করেন তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কাজটা কি খুবই জরুরী?

মনে হল কিছুটা সংকুচিত হলেন জয়কিষণ। এক সময় বললেন, যদিও ব্যাপারটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত তাহলেও আপনাকে বলতে কোন বাধা নেই।

একটু থেমে প্রেমার মুখের দিকে চেয়ে আবার বললেন, রাস উৎসবের আগে আমি আর মধুবন্তী হরিদ্বারে গিয়ে গঙ্গায় ফুল আর প্রদীপ ভাসিয়ে আসতাম। ওঁর মৃত্যুর পরেও আমি প্রতি বছর একটি দিনের জন্যেও হরিদ্বারে যাই।

প্রেমা বলল, খুব ভাল লাগল কথাটা শুনে। তিনি যেমন আপনার কাছে আকর্ষণীয়া ছিলেন, আপনিও তেমনি ওঁর কাছে স্বামী হিসেবে কম আকর্ষণীয় ছিলেন না।

জয়কিষণ একটু হেসে বললেন, কি করে বুঝলেন?

প্রেমা বলল মেয়েদের একটা হৃদয় আছে, সেই হৃদয় দিয়ে।

জয়কিষণ অন্য কথা পাড়লেন, আমার লোকজন সারাক্ষণ থাকবে অতিথিদের সেবাযত্নের কাজে। আর দোলন তো ছায়ার মত থাকবে আপনার সঙ্গে সঙ্গে।

প্রেমা বলল, অত ভাবছেন কেন। এমনও তো হতে পারে এই সুযোগে কুমারবাহাদুরের সঙ্গে নর্তকী প্রেমা মেনন গঙ্গা দর্শন করে এল।

জয়কিষণ বলল, সে তো সৌভাগ্য, কিন্তু কুমারবাহাদুর তো কাউকে নিয়ে যাবে না। গেলে জয়কিষণই নিয়ে যেতে পারে।

প্রেমার হাসিতে দ্রুত জলতরঙ্গ বেজে উঠল। হাসি থামলে সে বলল, আচ্ছা আচ্ছা, কুমারবাহাদুরের জায়গায় জয়কিষণই বহাল রইল।

জয়কিষণ বললেন, সত্যি আপনি যেতে চান?

প্রেমা বলল, আমি খুব খেয়ালী তাই না?

শিল্পী মাত্রেই। মধুবন্তীও বড় খেয়ালী ছিলেন।

প্রেমা বলল, দোলন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে তো?

জয়কিষণ বললেন, দোলন তার মা থাকতেও কোনদিন যায় নি হরিদ্বারে। আমরা দুজনেই শুধু এ-সময় যেতাম। তবে আপনি যখন যাচ্ছেন তখন দোলনও যাবে। আচ্ছা দোলনকে ডেকে পাঠাচ্ছি আমি।

দোলন এল। জয়কিষণ বললেন, তোমার আন্টি হরিদ্বারে যেতে চাইছেন।

দোলন বলল, খুব ভাল। বাবা তুমি তো যাবে, আন্টিকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

জয়কিষণ হেসে বললেন, আন্টি তোমাকে ছাড়া যেতে চাইছেন না।

দোলনের মুখে একটা বিচলিত অবস্থার ছবি ফুটে উঠল।

সে হঠাৎ বলল, তুমি যাও না আন্টি বাবার সঙ্গে। আমাকে যে রাসমঞ্চের ফুল তৈরি করতে হবে। আমি চলে গেলে একা আঙ্কেলের পক্ষে কি একরাশ ফুলপাতা তৈরি করা সম্ভব।

জয়কিষণ নীরব। দোলন প্রেমার মুখের দিকে চেয়ে। প্রেমা কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। কোন পুরুষের সঙ্গী হতে তার কোন সঙ্কোচ থাকার কথা নয়, তবু দোলন সঙ্গী থাকলেই যেন মানাতো ভাল।

জয়কিষণ নীরবতা ভাঙলেন। প্রেমার দিকে চেয়ে বললেন, আমি এ যাত্রায় একাই ফিরে আসি। রাস উৎসবের পর আপনার সব দলবলকে নিয়ে হরিদ্বারে না হয় ঘুরিয়ে আনব।

প্রেমা বলল, থাক, সবাইকে আর নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। নাচ তো ভারী, তার জন্যে খরচ আর হাঙ্গামার অন্ত নেই।

জয়কিষণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, না না, একথা কেন বলছেন মিস মেনন। আমি তো হিসেব কষে আমন্ত্রণ করিনি।

প্রেমা বলল, সে কথা যাক এখন আপনার যদি কোনরকম অসুবিধে না থাকে তাহলে এ যাত্রাতেই আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই।

দোলন বলল, বাবার আবার অসুবিধে কি। ওখানে তো হোটেলেই উঠবে। নিজের হাতে তো কিছু করতে হবে না।

জয়কিষণ হেসে বললেন, তুমি সঙ্গে রইলে না, অথচ তোমার আন্টিকে নিয়ে যাচ্ছি। ওঁর কোন অসুবিধে হলে কিন্তু আমাকে দায়ী করতে পারবে না তুমি।

প্রেমা বলল, অসুবিধে কতখানি হয় দেখা যাক। তারপর ফিরে এসে চুপি চুপি তোমার কানে বলে দেব সব।

দোলন শাসনের ভঙ্গিতে বলল, দেখো বাবা, আন্টির কোন অসুবিধে হলে কিন্তু তুমি যতই বল তোমাকে ছাড়ব না।

জয়কিষণ মেয়ের দিকে চেয়ে অনাবিল হাসি হাসতে লাগলেন।

ঝাঁক ঝাঁক সোনালী প্লোভার পাখীর মত গঙ্গার জল রোদ্দুরের ঝিলিমিলি তুলে উড়ে চলেছে। দূরে কাছে নীল সবুজ পাহাড়ের রেখা। ব্রীজ পেরিয়ে গঙ্গার এপারে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়

দাঁড়িয়ে আছে দুজন। প্রেমা এই প্রথম দেখছে গঙ্গাকে। খরস্রোতা গঙ্গার দিকে চেয়ে চেয়ে প্রেমা মন্ত্রমুগ্ধ। ঠাণ্ডা জল ছুঁয়ে বয়ে আসছে হাওয়া। মুখে চোখে আশ্চর্য একটা শীতল স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে।

বাঁধান তীরভূমি। কয়েক গজ দূরে দূরে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। ফুল ফুটে আছে। কোন কুশলী নামকরণবিদ কবে যে কৃষ্ণচূড়া নামকরণ করেছিলেন কে জানে। কিন্তু সার্থক তাঁর নামকরণ। একটা ফুল হাতের নাগালের ভেতর এসে গেছে দেখে দীর্ঘদেহী জয়কিষণ সেটি তুলে নিলেন। গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল প্রেমা। সে দেখছিল নীল জলধারার ত্বরিত প্রবাহ, ব্রীজের পিলারে ধাক্কা খেয়ে জলে মুহূর্তে ঘূর্ণির পাক। সামনের একটি শিলাখণ্ডে আঘাত লেগে জলের কলকল ছলছল শব্দে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া। সব মিলিয়ে গঙ্গা যেন দুরন্ত এক নর্তকী। প্রেমার দেহের প্রতিটি কোষ থর থর করে কাঁপতে লাগল। নীল শিরার ভেতর দিয়ে লাল রক্তের ধারা বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলল। প্রেমা মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল প্রবাহিনী গঙ্গায়।

পেছন থেকে এসে জয়কিষণ তার সামনে ছোট একটি ডাল সমেত কৃষ্ণচূড়া ফুল এগিয়ে ধরলে প্রেমা প্রথমে দারুণ চমকে উঠল। তার গভীর ধ্যান আচমকা ভেঙে গেল। সে অমনি দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এ কান্নার জন্ম কিন্তু কোন একটা বিশেষ ঘটনার থেকে নয়। মনের তদ্‌গত ভাবটি হঠাৎ ভেঙেচুরে যাওয়াতে এই আকস্মিক কান্নার উচ্ছ্বাস।

বিহ্বল জয়কিষণ। তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না প্রেমার এই কান্নার কারণ। তাঁর হাতের ফুল হাতেই ধরা রইল।

একটু পরেই প্রেমার ঘোর কাটল। সে শান্ত হয়ে রইল আর সঙ্গে সঙ্গে জয়কিষণের সামনে এ ধরনের দুর্বলতা প্রকাশের জন্যে দারুণ লজ্জা পেল। চোখ থেকে হাত নামাল কিন্তু চোখ তুলে কথা বলতে পারল না।

জয়কিষণ বললেন, তুমি কাঁদছ প্রেমা!

এই প্রথম তুমি বলে প্রেমাকে সম্বোধন করলেন জয়কিষণ। প্রেমার মনে এই ডাকটুকু দারুণ সুখকর এক অনুভূতির জন্ম দিল।

প্রেমা কোন উত্তর দিল না। সলজ্জ এক টুকরো হাসি হেসে জয়কিষণের হাত থেকে কৃষ্ণচূড়া ফুলটি নিয়ে দেখতে লাগল।

যে কৃষ্ণকে সে তার নাচের ভেতর প্রেমিক পুরুষরূপে গ্রহণ করে এসেছে, যাঁর জন্যে তার দেহ কখনো কদম্বের মত বিকশিত হয়েছে, আবার কখনো বর্ষাধারার মত ভেঙে ঝরে পড়েছে, তাঁরই মাথার মুকুট এই ফুলের কারুকর্মে। লাল হলুদে মেশা ফুলগুলো কেমন বড় থেকে ছোট হতে হতে একেবারে শেষ প্রান্তের সবুজ বৃন্তে কুঁড়ি হয়ে জেগে আছে। সবটুকু মিলে দক্ষ কারিগরের হাতে গড়া অদ্ভুত সুন্দর শিরোভূষণের আকৃতি।

ফুল দেখা শেষ হলে নর্তকী প্রেমা চোখ তুলে চাইল জয়কিষণের দিকে। একটা সুখের অনুভূতি তখন তিরতির করে কাঁপছিল তার চোখের তারায়।

জয়কিষণ চিনে ফেলেছেন মুডি মেয়েটিকে। তিনি একটুখানি হেসে বললেন, অন্যায় একটা করে ফেললাম। সম্মানীয় অতিথিকে নাম ধরে ডাকলাম।

প্রেমা বলল, মানুষের কাছে মানুষ অতিথি হয়ে আসবে কেন। হয় আসবে আপনজন হয়ে নয়তো থাকবে দূরের মানুষ হয়ে। এর মাঝামাঝি কোন রকম রফাতেই আমার আপত্তি।

জয়কিষণ বললেন, মতের দিক থেকে তোমার সঙ্গে আমার দারুণ মিল হয়ে গেল। কিন্তু আমার বেলাতে যেন আলাদা ব্যবস্থা না হয়। একই সম্ভাষণ আমিও আশা করব তোমার কাছ থেকে। চাইব আমার নাম ভূষণ ছাড়াই তোমার কণ্ঠে উচ্চারিত হোক।

প্রেমা হেসে বলল, রাজি।

ওরা গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াল টুকরো টুকরো কথা বলতে বলতে। এক সময় আকাশ রাঙিয়ে সূর্যাস্ত হল। ব্রীজের ওপরে দাঁড়িয়ে দুজনে দেখল সেই সমারোহপূর্ণ সূর্যাস্ত। সন্ধ্যার ঘণ্টা বেজে উঠল মন্দিরে। ওরা পায়ে পায়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ব্রীজ পেরিয়ে এপারে চলে এল।

সামনেই রয়েল হোটেল। তিন তলার ওপর ভাড়া নেওয়া হয়েছে পাশাপাশি দুখানা ঘর। সামনে গঙ্গামুখী প্রশস্ত বারান্দা।

জয়কিষণ বললেন, এসো আমরা ফুলের দীপ ভাসাই প্রেমা। ঐ দেখ দীপ ভাসানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে।

প্রেমা দেখল, ছোট্ট চুপড়ি ভরে ভরে দোকানীরা লাল সাদা ফুল সাজিয়ে দিচ্ছে। ঐ ফুলের চুপড়ির ওপর একটি করে ছোট্ট দীপ। ক্রেতারা দীপ জেলে ঐ চুপড়ি ভাসিয়ে দিচ্ছে জলে। চুপড়িটি জলে দেওয়া মাত্র চোখের পলকে স্রোতের টানে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দূর-দূরান্তে। অন্ধকারে শুধু দেখা যাচ্ছে একটি আলোর ফুলের গাঁথা মালা ভেসে চলেছে। মালার দুটি প্রান্তে গ্রন্থি পড়ে নি।

জয়কিষণ একটি ফুলের চুপড়ি কিনে জ্বলিয়ে দিলেন প্রদীপ। পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল প্রেমা। জয়কিষণ তার হাতে ঐ উপচারটি তুলে দিয়ে বললেন, সাবধানে ঘাটে নেমে ফুল আর দীপ ভাসিয়ে এসো। জলে পা দেবার চেষ্টা কর না। কারেন্টে পড়লে আর রক্ষে নেই।

প্রেমা ফুলের চুপড়ি হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে নামল। হাত বাড়িয়ে জলে চুপড়িটা ছুঁইয়ে দেওয়া মাত্রই কে যেন হাত থেকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালাল। জলের কী তীব্র টান। একটা বিরাট চুম্বক যেন বিপুল শক্তিতে টেনে নিল একটুকরো লোহা।

পেছন ফিরতেই চোখাচোখি জয়কিষণের সঙ্গে। এবার জয়কিষণ হাতে ফুল আর দীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভাসাবার জন্যে। প্রেমা ওপরে উঠে আসতে আসতে বলল, সাবধান জলে নামবেন না যেন।

জয়কিষণ হেসে উঠলেন।

ওপরে উঠে এসে প্রেমা মুখ নীচু করে জিজ্ঞেস করল, হাসলেন যে?

নীচ থেকে ওপরে তাকিয়ে জয়কিষণ হেসে বললেন, দুটো কারণে। এক তুমি প্রতিজ্ঞা ভেঙেছ আমাকে সম্মানীয় সম্বোধনে ডেকে। আর দ্বিতীয়, আমাকে সাবধান করছ জলে নামার ব্যাপারে।

প্রেমা বলল, প্রথম অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু প্রিয়জনকে সাবধান করা কোন অপরাধ নয়।

জয়কিষণ বললেন, গঙ্গার সঙ্গে আমার আবাল্য সখ্য। কাল গঙ্গায় নেমে স্নান করব আবার সাঁতারও কাটব। দুটোই দেখতে পাবে।

সত্যি!

বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যাবার যোগাড় প্রেমা মেননের।

জয়কিষণ প্রেমার দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নাড়লেন। তারপর গঙ্গার দিকে ফিরে ফুল আর দীপ ভাসিয়ে দিলেন।

ফুল আর দীপ ভেসে গেল। সেদিকে কতক্ষণ চেয়ে রইলেন জয়কিষণ।

ওপরে দাঁড়িয়ে প্রেমা তাকিয়ে রইল জয়কিষণের দিকে। তার মনে হল, জয়কিষণ শুধু ফুল আর দীপ ভাসিয়ে কর্তব্য শেষ করে নি, স্ত্রী মধুবন্তীর মঙ্গল কামনা করছে আপন মনে।

জয়কিষণ ওপরে উঠে আসছিলেন, হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিল প্রেমা তার দিকে। নীচে থেকে এক মুখ হাসি ছড়িয়ে প্রেমার হাত ধরে উঠে এলেন জয়কিষণ।

ওপরে উঠে হেসে বললেন, মানুষকে সাহায্য করার একটা সহজাত ইচ্ছে আছে তোমার ভেতর।

প্রেমা বলল, ভাগ্যি ভাল, আমার হাতখানা আজ সম্মানিত হল। অনেকে এর ভুল ব্যাখ্যা করতে পারেন।

আর যিনি করুন জয়কিষণ করবে না কোনদিন।

প্রেমা চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, সন্ধ্যায় হরিদ্বারের গঙ্গা অপরূপা।

জয়কিষণ বললেন, এসো আমরা ওপরের বারান্দায় বসে গঙ্গার ছবি দেখি।

ওরা দুজনে সিঁড়ি ভেঙে হোটেলের তিন তলার বারান্দায় এসে বসল। প্রায় সারা হোটেল জুড়ে বিরাট ব্যালকনি। চেয়ার সাজান রয়েছে। এখন ভ্রাম্যমাণদের মরশুম নয়, তাই এতবড় হোটেলটা প্রায় শূন্য। গঙ্গার ধারে অন্য হোটেলগুলিরও ঐ একই অবস্থা। শুধু সন্ধ্যায় কিছু জনসমাগম হয় গঙ্গাতীরে।

পুজো ও দীপ ভাসানোর আয়োজন চলে কিছু সময়। তারপর আটটা সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতেই গঙ্গা-তীর নিস্তব্ধ। তখন কান পাতলেই জলকল্লোল শোনা যায়। রাত যত বাড়তে থাকে গঙ্গার জলধ্বনি তত সোচ্চার হয়ে ওঠে। তখন আর কান পাতবার দরকার হয় না, আপনি শব্দগুলো কানে এসে বাজে। ঘরের ভেতর থাকলেও একটা ধ্বনি সারা চরাচরে মন্ত্রের মত উচ্চারিত হতে শোনা যায়। শিবভূমিতে শিবজায়া গঙ্গার কলকণ্ঠ এমনি করে নিরন্তর বাজতে থাকে।

জয়কিষণ নীরবতা ভেঙে বললেন, খুব ছেলেবেলা থেকে পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে আমি হরিদ্বারে আসতাম। সকলে যখন নানা ধরনের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে মেতে থাকত তখন আমি দস্যুবৃত্তি করে বেড়াতাম।

প্রেমা বলল, কিশোর জয়কিষণের দস্যুবৃত্তিটা কেমন ছিল জানতে ইচ্ছে করছে।

জয়কিষণ বললেন, কিছু আগে গঙ্গায় সাঁতার কাটার কথা বলছিলাম না? ঐ ভয়াবহ ব্যাপারটা আমার সেই সময়েই শেখা। সাঁতার জানার সঙ্গে হরিদ্বারের গঙ্গায় সাঁতার দেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু এক নয়।

প্রেমা বলল, সে তো স্রোতের ভয়ঙ্কর টান দেখলেই বোঝা যায়।

জয়কিষণ বললেন, তখন বয়েস আমার বারো তেরোর বেশি নয়। একদিন এ অঞ্চলের ছেলেদের সঙ্গে অভিভাবকদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নামলাম জলে। জলে নামা তো এতদিন চলছিল লোহার শেকল ধরে। স্নানার্থীরা যেমন শেকল ধরে নামে। কিন্তু এ হল একেবারে আলাদা কায়দায় নামা। দারুণ দুঃসাহসী খেলা। কে প্রথম এই ভয়াবহ সাঁতার শুরু করেছিল তা কারো জানা নেই, তবে তারপর থেকে ব্যাপারটা চলে আসছে।

প্রেমা ভীতু চোখে তাকিয়ে বলল, যে প্রবল স্রোতের টান তাতে একবার গা ভাসানো মাত্র মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে। তুমি কেমন করে এই স্রোতে গা ভাসালে তাই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি।

জয়কিষণ হেসে বললেন, ঐ বয়েসে ছেলেমেয়েরা একটু বেপরোয়াই হয়। এক প্রায় নির্জন দুপুরে মা বাবারা গাড়ি করে গেছেন সপ্তধারার মন্দিরে পুজো দিতে। আমি রয়েছি পরিচারকদের হেফাজতে। গরমের দুপুর আমাকে ঘরের ভেতর শুইয়ে দিয়ে ওরা বাইরে একটুখানি গড়িয়ে আরাম করছে। আমি পেছনের দরজা খুলে চুপি চুপি নেমে গেলাম। বাজারে দু-চারজন সাঁতারু সঙ্গীসাথী খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। মনের ইচ্ছেটা জানাতেই ওরা রাজি হয়ে গেল। সবাই মিলে চলে এলাম গঙ্গার ঘাটে।

ওরা জলে নামার আগে প্রথম পাঠ দিয়ে বলল, ভয় পাবে না কিছুতেই। বলল, প্রথমে পা ঠেকাবে জলের তলায়। তারপর পাখির মত ডানা ভাসিয়ে উড়বে। মাঝে মাঝে জলের তলায় পা ঠেকাবে আবার ভেসে যাবে। এ কাজটা মনের দারুণ একটা ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে চলতে থাকবে। তবেই এই ঝড়ের মত স্রোতে গা ভাসান সম্ভব।

ওরা দু-তিনজন নেমে পড়ল জলে। আমিও ওদের দেখাদেখি নামলাম। মনে আমার চিরদিনই দারুণ সাহস। ওদের দেখাদেখি আমিও সাঁতার শুরু করে দিলাম। মাঝে মাঝে পা ঠেকান আর স্রোতে ভেসে চলা। একটা মিনিটও কাটল না, বোধকরি মাইল দুয়েক পার হয়ে গেলাম।

প্রেমা যেন সামনেই সাঁতার দেখছে। সে বলল, গঙ্গা কি গভীর নয়? পা ঠেকালে কেমন করে?

জয়কিষণ বললেন, এখানে গঙ্গা অগভীর। জায়গায় জায়গায় পা রাখা যায়।

প্রেমা বলল, তুমি সত্যি দুঃসাহসী।

এখন অনেক শান্ত হয়ে গেছি প্রেমা। তরুণ বয়সে এক মজার কাণ্ড করেছিলাম। এক বন্ধুকে বলেছিলাম, সে যদি ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আমাকে হারাতে পারে তাহলে লালসিয়া স্টেটের মালিকানা যেদিন পাব সেদিনই ওকে দান করে দেব। বন্ধুরা জানত কথার খেলাপ আমার কোনদিন হবে না।

প্রেমা বলল, তুমি যে হারনি তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

জয়কিষণ বললেন, যে বন্ধু বাজি ধরেছিল সে কিন্তু সামান্য ঘোড়সওয়ার ছিল না।

প্রেমা বলল, ঘোড়দৌড়টা কিভাবে হল?

জয়কিষণ বললেন, দূরপাল্লার দৌড়। লালসিয়া থেকে একেবারে মুসৌরীর লালটিব্বায় আমার কোয়ার্টারে।

এত দূরে!

হ্যাঁ প্রেমা। বাঁধা রাস্তার বাইরেও আমাকে ঘোড়া চালাতে হয়েছে। অনেক বিপজ্জনক সর্টকার্ট পেরিয়ে গেছি।

প্রেমা বিস্ময়ের গলায় বলল, তুমি অসাধারণ।

জয়কিষণ বললেন, সব বিষয়েই আমি জয়ী হব এমন একটা ধারণা ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে বাসা বেঁধেছিল।

প্রেমা বলল, তাই তো বলছি তুমি অসাধারণ হয়েই জন্মেছ।

জয়কিষণ লজ্জিত হলেন। বললেন, এমন করে বল না প্রেমা। আমি একেবারে সাধারণের দলে। তবে বুকে আমার এক ধরনের দুর্জয় সাহস আছে যার জোরে কোনকিছুই আমি তোয়াক্কা করি না।

প্রেমা আগের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলল, তোমার বন্ধুটি বাজিতে হেরে গিয়ে তোমাকে কি কমপ্লিমেন্ট দিয়েছিল?

জয়কিষণ বললেন, ঘটনার পরিণতি দুঃখজনক।

কি রকম?

জয়কিষণ বললেন, লালটিব্বায় পৌঁছে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করার পরও যখন বন্ধু পৌঁছল না তখন ঘোড়া নিয়েই নামলাম ওর খোঁজে। কিছুদূর নেমেই পাহাড়ীদের মুখে খবর পেলাম একটি ঘোড়সওয়ার ঘোড়া সুদ্দু জখম হয়েছে।

ছুটে গেলাম স্পটে। ঘোড়াটা কিছুক্ষণের ভেতরেই মারা গেছে। বন্ধু ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ার সময় আশ্চর্যভাবে একটা গাছে পা আটকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে।

ওকে হাসপাতালে পৌঁছে দিলাম। তিন চার মাস পরে একটা পা খুইয়ে ও বাঁচল। ও এখনও বেঁচে আছে। আর অনেক দূর থেকে মাসে অন্ততঃ একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।

প্রেমা বলল, ও বেচারা কষ্ট করে আসে, তুমি যাও না?

জয়কিষণ বললেন, গাড়ির পথ নয়, ঘোড়ার পথ। তাই আমি ঘোড়া নিয়ে কোনদিন আর যেতে পারি না। পাছে ওর মনে পুরোনো দুঃখটা জেগে ওঠে।

এরপর আর কোন কথা হল না। দুজনে কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

দূরের কোন পাহাড়ের চূড়া ডিঙিয়ে ঝকঝকে চাঁদ উঠে এসেছে আকাশে। প্রেমা আর জয়কিষণ পাশাপাশি বসে। জয়কিষণ তাকিয়ে আছেন চাঁদের দিকে। পূর্ণ যৌবনবতী হতে এখনও চাঁদের কয়েকটি কলা বাকী। মনে পড়ছে জয় কিষণের মধুবন্তীর কথা। ঠিক এইখানে বসে চাঁদের দিকে চেয়ে থাকত মধুবন্তী।

জয়কিষণ বলতেন, কি দেখছ এমন চাঁদের দিকে চেয়ে?

মধুবন্তী বলত, কত পুরোনো চাঁদ, তবু দেখতে কত ভাল লাগে। আমার কি মনে হয় জান?

কি?

অসংখ্য মানুষের ভালবাসার দৃষ্টি পড়ে ও একেবারে ভালবাসার প্রতিমা হয়ে গেছে।

জয়কিষণ হেসে বলতেন, আমাদের ভালবাসাও ওর সঙ্গে যুক্ত হল।

প্রেমা গঙ্গায় ছুটে চলা তারা-ফুলের ওপর থেকে চোখ তুলে নিয়ে জয়কিষণের মুখের ওপর রেখে বলল, কি ভাবছ?

তেমন কিছু না।

আমি বলব।

বল।

স্ত্রীর কথা।

জয়কিষণ খানিক অবাকই হলেন। বললেন, কি করে অনুমান করলে?

প্রেমা বলল, অতি সহজ স্বাভাবিক অনুমান। এজন্যে চিন্তা করবারও দরকার হয় না। প্রতি বছর তুমি তাঁকে নিয়ে আসতে এখানে। দুজনে এই ব্যালকনিতে বসতে। গঙ্গায় আলোয় ভেসে চলা মালা দেখতে। আজ নিঃসঙ্গ এসে তাঁর কথা মনে না করে পারবে কি করে।

জয়কিষণ ম্লান হেসে বললেন, নিঃসঙ্গ এসেছি ক'বছর। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আমি সঙ্গীহারা নই প্রেমা।

প্রেমা বলল, বাইরের দিক থেকে দেখলে হয়ত তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু তোমার মনের মধ্যে যে শূন্যতা তাকে ভরানোর ক্ষমতা এই মুহূর্তে কারো আছে বলে আমার মনে হয় না।

জয়কিষণ প্রেমার এই ধারণাকে ভেঙে দেবার মত কোন যুক্তি পেলেন না। তিনি বেশ কিছুক্ষণ তাই চুপ করে রইলেন।

গঙ্গার জলের শব্দ বেজে উঠছে একদল নর্তকীর ছুটে চলার মত।

জয়কিষণ এক সময় বললেন, তোমার কথাই ঠিক প্রেমা। জীবনে কখনো একজনের শূন্যতা অন্যজনে ভরে দিতে পারে না। মনের মধ্যে প্রত্যেকের আসন আলাদা। বরণ অভ্যর্থনার পদ্ধতিও আলাদা।

প্রেমা বলল, আমার বোধহয় তোমার সঙ্গে আসাটা ঠিক হয়নি।

একথা কেন প্রেমা?

এই গঙ্গাতীরে যে স্মরণীয় মুহূর্তগুলো তোমার কেটেছে তাকে একান্তে পাওয়া আর তেমন করে হয়ে উঠল না। আমি না থাকলে তোমার পুরোনো স্মৃতিগুলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

দেয়ালগিরির হাল্কা সবুজ আলোয় হাসলেন জয়কিষণ। বললেন, এমনও তো হতে পারে, তুমি এসেছ বলে মধুবন্তীর কথা আমার আজ বেশি করে মনে পড়ছে।

প্রেমাও মিষ্টি করে হাসল। বলল, তা কি করে হয়।

জয়কিষণ তদ্‌গত হলেন। বললেন, আমি ঠিকই বলছি প্রেমা। একা যখন আসতাম তখন আনুষ্ঠানিক কাজগুলো সেরে নিয়ে পালাতে পারলেই যেন বাঁচতাম! মধুবন্তীর কথা বেশি ভাবতে চাইতাম না। একে বলতে পার নিজের কাছ থেকে পালানোর চেষ্টা। কিন্তু আজ তুমি কাছে আছ বলে হয়ত ওর কথা বেশি করে মনে পড়ছে।

প্রেমা এই মুহূর্তে জয়কিষণের মুখ থেকে চোখ নামিয়ে গঙ্গার দিকে ফিরে তাকাল। গঙ্গা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওপারের আবছায়ায় কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো স্থির হয়ে তারই মত গঙ্গার দিকে তাকিয়ে। জলে জয়কিষণের স্মৃতির মত ভাঙা ভাঙা চাঁদগুলো ডোবাভাসার খেলা খেলছে।

জয়কিষণ বললেন, কাল একবার হৃষিকেশ থেকে ঘুরে আসব প্রেমা।

আমাকে সঙ্গী করবে তো?

সে কি কথা। সঙ্গে এসেছ আর তোমাকে একা হোটেলে ফেরে রেখে যাব ভেবেছ?

না। ভাবলাম হয়ত অন্য কোন আনুষ্ঠানিক কাজে যাবে।

তেমন কোন কাজ সেখানে নেই। আর থাকলেও তোমাকে না নিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রেমা বলল, আমার খুব ভাল লাগে গঙ্গা। আমি নদীর দেশের মেয়ে হলেও গঙ্গাকে এক বুক ভালবেসে ফেলেছি।

জয়কিষণ বললেন, গঙ্গা সত্যিই অনন্যা। আমি ওর উৎসমুখ গঙ্গোত্রী থেকে সঙ্গমক্ষেত্র গঙ্গাসাগর অব্দি ঘুরে এসেছি। ওর বৈচিত্র্যের তুলনা হয় না প্রেমা।

প্রেমার মনে হল একটা স্বপ্ন যেন ধীরে ধীরে বাস্তবে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে আর সে দেখছে তাকে রোমাঞ্চিত বিস্ময়ে।

কিছুক্ষণ প্রেমাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে জয়কিষণ বললেন, কি ভাবছ প্রেমা?

চমকে উঠে প্রেমা আবার স্থির হল। বলল, আমার এক বন্ধু আমাকে একটা ব্যালে গ্রুপ তৈরি করতে বলেছিলেন। আমার মনে সেটা স্বপ্ন হয়ে ছিল এতকাল। এখন গঙ্গাকে দেখে সে স্বপ্নকে একটা বাস্তব রূপে দেখতে পাচ্ছি আমি।

জয়কিষণ বললেন, তুমি ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট প্রেমা। তোমার পক্ষে যে কোন নতুন জিনিস তীব্র মানসিক প্রেরণায় সৃষ্টি করা সম্ভব। এ বিষয়ে গঙ্গা নিঃসন্দেহে তোমাকে প্রেরণা দেবে। কারণ গঙ্গা এক দিকে হিমবন্ত আর অন্যদিকে সাগর ছুঁয়ে আছে। বহু বিচিত্র জনপদের বুক ছুঁয়ে বয়ে এসেছে গঙ্গা। তাই তোমার প্রেরণাকে গঙ্গা যে উদ্দীপ্ত করবে তাতে সন্দেহ কি।

প্রেমা বলল, যে মুহূর্তে আমি গঙ্গাকে দেখেছি সেই মুহূর্তটি থেকে আমার রক্তে গঙ্গা, আমার ছন্দে গঙ্গা এসে গেছে। সারা ভারতের একটা রূপ নাচের ছন্দে আমি গঙ্গার পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চাই।

অসাধারণ পরিকল্পনা তোমার।

সত্যি বলছ জয়কিষণ!

তোমার ক্ষমতার ওপর অগাধ আস্থা আমার প্রেমা। যে কোন সাহায্য, তা যত ক্ষুদ্রই হোক আমি করতে পারলে খুশী হব।

প্রেমা উচ্ছ্বসিত আবেগে হাত বাড়িয়ে দিল। জয়কিষণ সেই হাত দুটো তাঁর হাতের ভেতরে ধরলেন। সহসা ছেড়ে দিলেন না।

কতক্ষণ এমনি হাতে হাত রেখে বসে রইল দুজনে। তাদের ঘিরে নর্তকী গঙ্গা নূপুর বাজিয়ে চলল।

হৃষিকেশের গঙ্গা বিরাট বিরাট বোল্ডারে ধাক্কা খেতে খেতে ছুটে চলেছে। লছমনঝোলার পুলের ওপর দাঁড়িয়ে জয়কিষণ বললেন, বদ্রীনাথ যাবার হাঁটাপথ ধরে একটুখানি এগোলেই এক সাধুর গুহা। যাবে প্রেমা সেখানে?

প্রেমার গলায় আগ্রহ উছলে উঠল, যাব মানে? এক্ষুনি আমি তৈরি।

জয়কিষণ বললেন, তোমাকে কোন কথা বলাও বিপদ।

কেন কি করেছি আমি?

তোমার অন্তহীন আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই মুশকিল।

প্রেমা বলল, তাহলে থাক। তোমাকে নানা ব্যাপারে বিরক্ত করার জন্যে বিশেষ দুঃখিত।

প্রেমা আবার চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট নীচে গঙ্গার ওপর চোখ নামিয়ে দেখতে লাগল।

জয়কিষণ বললেন, একটুতেই তোমার অভিমান প্রেমা। আমি বলতে চাইছিলাম দুপুরে কিছু খেয়ে নিয়ে পায়ে হেঁটে বেরোব। ওপথে তো গাড়ি চলে না। হোটেলে গাড়ি রেখে তবে আমাদের আসতে হবে।

প্রেমা মুডি কিন্তু অবুঝ নয়। সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, তোমার কথাই ঠিক জয়কিষণ। কিছু খেয়ে নিয়েই আমরা বেরোব সাধু দর্শনে, নইলে ফিরতে ফিরতে কত বেলা হয়ে যাবে কে জানে।

দুপুর দুটো তখন। ওরা হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার এল ব্রীজের ওপর। একই দৃশ্য। একই ভঙ্গিতে গঙ্গার ধেয়ে চলা। অমসৃণ শিলা স্রোতের ধাক্কায় মসৃণ পিচ্ছল হচ্ছে। ছোট বড় নানা ভঙ্গির নানা রূপের শিলাখণ্ডগুলো বৃহৎ সংসার রচনা করে বসে আছে। কেউ কেউ স্নান করছে স্রোতধারায়। কেউবা স্নান সেরে তীরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ব্রীজটা পেরিয়ে এল। এখন ওরা ডানদিকে গীতা ভবনের পথ ছেড়ে উল্টোদিকের পথ ধরল। পাহাড় ভেঙে উঠছে ওরা। প্রেমার কেরলীয় পোশাক পাহাড়ে চড়ার উপযুক্ত নয়। তাই বারে বারে পোশাক সামলে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পা রেখে উঠতে গিয়ে পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে প্রেমাকে। জয়কিষণ কিছুটা চড়াই ভেঙে উঠে গিয়ে আবার ফিরে আসছেন প্রেমাকে সাহায্য করার জন্যে। হাত বাড়িতে নিরাপদ আশ্রয়ে টেনে তুলছেন আর অমনি নূপুর বাজান হাসি উপহার দিচ্ছে প্রেমা জয়কিষণকে।

ওরা খানিক ওপরে উঠেই পাকদণ্ডীর পথ ধরল। জয়কিষণ চলেছেন আগে আগে। প্রেমা চলেছে তাঁর পায়ের গতির দিকে চোখ রেখে।

একসময় ওরা এসে পৌঁছল একটা অতি নির্জন পাহাড়ী এলাকায়। কি যেন একটা গাছ বড় বড় ডালপাতা শূন্যে ছড়িয়ে একপদ সন্ন্যাসীর মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঋতু বসন্তের সোনালী উত্তরীয়

সারা ভ্যালি জুড়ে উড়ছে। তারই একটি প্রান্ত গাছের তলায় বিছান।

জয়কিষণ বললেন, তুমি এই গাছের ছায়ায় দাঁড়াও প্রেমা। আমি এখুনি খোঁজ নিয়ে আসছি উনি আছেন কিনা।

প্রেমা বলল, আছেন মানে? উনি কি অন্য কোথাও চলে যান নাকি?

জয়কিষণ যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন, আবার ফিরলেন। বললেন, আমাদের সাধু সম্বন্ধে যে সব ধারণা আছে ওঁকে কিন্তু সে ধরনের সাধু ভাবলে ভুল করা হবে।

তবে?

জয়কিষণ সহসা কোন ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না অথবা সেই মুহূর্তে দিতে চাইলেন না। শুধু বললেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হলে, কথাবার্তা বললে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।

একটু থেমে আবার বললেন, পায়ে হেঁটে হিমালয়ের পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে উনি ভালবাসতেন। হিমালয়ের সঙ্গে ওঁর প্রাণের যোগ।

প্রেমা বলল, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

জয়কিষণ বললেন, এই টিলার ওপরে বেশ ঢালু একটা উৎরাই। খুব সাবধানে খানিকটা নামলেই সাধুর গুহা। কষ্ট করতে বাজি থাক তো এস আমার সঙ্গে। পরে সাধু দর্শন না হলে আমার ওপর রাগ কর না যেন।

প্রেমা বলল, আমার জন্যে অন্য একজন কষ্ট করবে তার চেয়ে তার কষ্টের অংশ নেওয়া অনেক সোজা।

ওরা একটুখানি ওপরে উঠে টিলার ওপারে নামতে লাগল। বার বার উৎরাই এর পথে প্রেমাকে সাবধান করে দিতে লাগলেন জয়কিষণ।

এপারে হাওয়ার বেগ বেশি। একবার প্রেমা তাকিয়েছিল একপলক। একটা আশ্চর্য ছবি ফুটে উঠেছিল তার চোখের ওপর। ওপারে সবুজ অরণ্যে ছাওয়া পাহাড়। এপারে গীতাভবনের মন্দির চূড়া। মাঝে প্রবাহিনী গঙ্গা। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, গাছগাছালির ফাঁকে ওপারের ছবি স্পষ্ট দেখা গেলেও এপারের কোন মানুষজনের গতিবিধি ওপার থেকে লক্ষ্য করা সম্ভব নয়।

ওরা দাঁড়াল একটি গুহার সামনে। একে গুহা বলা যায় কিনা সন্দেহ। গুহার বাঁদিকে একটি খাড়া পাথর দাঁড়িয়ে। ঐ পাথর গুহাটিকে লোকচক্ষুর একেবারে আড়াল করে রেখেছে। সামনে একখণ্ড মসৃণ শিলা তাকে ঘিরে কিছু গাছপালা। গুহার সামনে একটি চৌকো পাথর গুহামুখের প্রবেশপথটিকে আড়াল করে রেখেছে। পাশ দিয়ে সংকীর্ণ একটি পথে ঢুকতে হয়। গুহার প্রবেশপথের মাথায় কতকগুলি ফোকর। সম্ভবত আলো হাওয়া প্রবেশের পথ। প্রযোজন মত কেটে কেউ যেন তৈরি করেছে।

জয়কিষণ গুহামুখে দাঁড়িয়ে বার কয়েক সাধুর নাম ধরে ডাক দিলেন। কোন সাড়া এল না ভেতর থেকে। জয়কিষণ রুদ্ধদ্বার শিলার পাশ দিয়ে গুহার ভেতর ঢুকে গেলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে রইল প্রেমা।

বেশ কিছু সময় কেটে যাবার পর প্রেমার প্রতীক্ষাকাতর চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেন জয়কিষণ।

বললেন, সাধু শ্রীধর শর্মাজী বাইরে কোথায় গেছেন। কিন্তু একটি চিঠি লিখে রেখে গেছেন।

জয়কিষণ হাতে ধরে থাকা চিঠিখানা প্রেমার দিকে এগিয়ে দিলেন। প্রেমা বলল, আমি তো হিন্দি পড়তে জানি না জয়কিষণ। তবে বুঝতে পারি, বলতেও পারি কিছু কিছু। তুমি পড়ে শোনাও। আর আমি অবাক হচ্ছি, তিনি কি করে জানলেন তোমার হৃষিকেশে আসার খবর? তুমি কি চিঠি পাঠিয়েছিলে আসার আগে?

জয়কিষণ হাসলেন। বললেন, চিঠি পড়লেই সব বুঝতে পারবে।

জয়কিষণ চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন।

প্রিয় জয়কিষণ,

তোমাকে আজ সকালে লছমনঝোলা পুলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কয়েক বছর তোমাদের কাউকে দেখিনি। কিন্তু আমি জরুরী কাজে বেরিয়ে যাচ্ছি। অপেক্ষা করে থাকা চলল না।

তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করব। আমি এই ভেবে চিঠি লিখলাম যে তুমি যখন হৃষিকেশে এসেছ তখন একবার আসবে আমার আস্তানায়। যদি একান্তই ফিরতে দেরী হয় তাহলে হিমালয়ের দেবতার কাছে তোমাদের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করে গেলাম।

তোমাদের শুভার্থী শ্রীধর শর্মা।

প্রেমা বলল, তুমি কি ফিরে যেতে চাও এক্ষুনি?

তোমার কি ইচ্ছে?

এতদূর যখন পাহাড় ভেঙে এলাম তখন খানিক অপেক্ষা করাই যাক না। সাধুর ডেরায় আসাও তো একটা পুণ্যের ব্যাপার।

জয়কিষণ প্রেমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, বেশ তাই হবে।

আচ্ছা প্রেমা, পাপ পুণ্য সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি রকম?

প্রেমা একটুও না ভেবে বলল, খাঁটি কথা যদি বলতে হয় তাহলে প্রচলিত পাপ পুণ্যের ধারণার সঙ্গে আমার মিল বড় কম।

যেমন?

প্রেমা অমনি বলল, এই যেমন ভোগের ভেতর থাকা পাপ আর ইন্দ্রিয় শাসন একমাত্র পুণ্য কর্ম।

জয়কিষণ বললেন, কথাটা ঠিক তা নয়। আমাদের সনাতন শিক্ষা হল কোন কিছুর অতিরিক্তটাই পাপ।

প্রেমা হেসে বলল, ঐ যেমন গঙ্গা বইছে তার স্বাভাবিক প্রবাহে, জীবনও বয়ে চলবে তার একেবারে স্বভাবধর্মে। খিদের অতিরিক্ত খেতে গেলে যেমন প্রবৃত্তির কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবাদ ওঠে, ইন্দ্রিয় ভোগের বেলাতেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটবে। এটা কাউকে বলে দিতে হবে না। মানুষের স্বভাবধর্ম আর অভিজ্ঞতা তাকে অতিরিক্তের হাত থেকে রক্ষা করবে।

জয়কিষণ বললেন, তোমার কথার ভেতর অদ্ভুত একটা জোর আছে প্রেমা। সেই জোরেই তুমি নদীর মত স্বাভাবিক খাতে বয়ে যাও।

প্রেমা নিজের প্রশংসায় খুশী হল কিন্তু প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে গিয়ে বলল, যদিও এটা সাধুর পুণ্যভূমি তবুও পাপ-পুণ্যের আলোচনা চালাতে আর মন চাইছে না। তার চেয়ে চল শর্মাজীর গুহার ভেতরটা ঢুকে দেখি।

জয়কিষণ আগে আগে ঢুকলেন। প্রেমা ঢুকবার জন্যে মাথা নীচু করে থমকে থেমে গিয়ে বলল, সাধুর গুহায় মেয়েদের ঢোকার বারণ নেই তো?

ভেতর থেকে জয়কিষণ বললেন, আগেই তো বলেছি শর্মাজী সে ধরনের সাধু নন।

প্রেমা মাথা নীচু করে ঢুকে পড়ল গুহার ভেতর।

দেখা গেল গুহাটির পরিসর খুব একটা সংকীর্ণ নয়। দাঁড়ালে জয়কিষণের মাথা ছাদে ঠেকে গেলেও প্রেমা স্বচ্ছন্দে মাথা উঁচিয়ে হেঁটে বেড়াতে পারে। দুজনের থাকার পক্ষে স্থানটি প্রশস্ত না হলেও একেবারে সংকীর্ণ নয়।

গুহার বাইরে হাওয়ায় যে ঠাণ্ডার আমেজ ছিল তা ভেতরে আরামদায়ক উষ্ণ অভ্যর্থনায় রূপান্তরিত হয়েছে। বাইরের আলো ওপরের কটি ছিদ্রপথে গুহার ভেতরে এসে পড়লেও এতখানি গুহাকে আলোয় ভরে দিতে পারেনি। একটি প্রদীপ তাই গুহাটির এক প্রান্তের কোণে জ্বলছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে স্তূপীকৃত কতকগুলি বই আর খাতা। ঠিক উল্টো প্রান্তে বাইরের আবছা আলোয় একটি স্টোভ আর দু-চারটি পাত্র পড়ে। অন্য কোণে গেরুয়া রঙে ছোপান কটি পোশাক পাট করা কম্বলের ওপর লুটিয়ে পড়ে আছে।

জয়কিষণ মেঝেতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়েছিলেন। তাঁর পক্ষে বেশিক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। প্রেমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য করছিল। এবার সেও বসে পড়ে জয়কিষণের দিকে চেয়ে একটু হাসল। জয়কিষণ হাসিতে তার উত্তর দিল।

প্রেমা প্রথম কথা বলল, প্রদীপটা উনি জ্বালিয়ে রেখে গেছেন চিঠিখানা তোমার চোখে পড়বে বলে।

জয়কিষণের সংক্ষিপ্ত উত্তর, মনে হয়।

প্রেমার গলায় কৌতূহল, আচ্ছা জয়কিষণ, গুহায় থাকেন অথচ বইখাতা, রান্নার বিশেষ উপকরণ, এ কি ধরনের সন্ন্যাস?

জয়কিষণ বললেন, আমি সতের বছর বয়েসে বাবার সঙ্গে এসে ওঁর সঙ্গে দেখা করি। সেই থেকে এদিকে এলেই ওঁর সঙ্গে দেখা করে যাই। প্রথম যেদিন ওঁকে দেখেছিলাম সেদিন শুধু ওঁর দিকে সারাক্ষণ চেয়েইছিলাম। এমন আকর্ষণীয় রূপ আমি আগে কখনও দেখিনি।

প্রেমা হঠাৎ মন্তব্য করল, তোমার চেয়েও?

জয়কিষণ বললেন, যাঁরা লালসিয়া স্টেটের কুমারবাহাদুরকে রূপবান বলে বারে বারে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, জয়কিষণের ভাগ্য ভাল যে তাঁরা কেউ এসে শর্মাজীকে দেখে যাননি। তাহলে আমি হলফ করে বলতে পারি মুহূর্তে মত বদল হয়ে যেত।

এখন ওঁর বয়স কত হবে জয়কিষণ?

আন্দাজ ষাট-বাষট্টি। কিন্তু তুমি বুঝতেই পারবে না। হাঁটা চলা হাসি ঠাট্টা কথাবার্তা সবই বিশ বছরের তরুণের মত।

শেষ কবে তোমার সঙ্গে দেখা?

জয়কিষণ বললেন, মধুবন্তীর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে।

প্রেমার আবার প্রশ্ন, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কি ওঁর দেখা হয়েছে কোনদিন?

জয়কিষণ বললেন, আমি আর মধুবন্তী শেষবার একসঙ্গেই এসেছিলাম।

হঠাৎ জয়কিষণ শর্মাজীর চিঠিখানা অস্পষ্ট আলোয় চোখের অনেক কাছে নিয়ে গভীর আগ্রহে কি যেন দেখতে লাগলেন। কিছু পরে চিঠিখানা কোলের ওপর ফেলে রেখে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। প্রেমা জয়কিষণের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করল। সে ইচ্ছে থাকলেও কোনরকম প্রশ্ন করে জয়কিষণকে বিরক্ত করতে চাইল না।

একসময় জয়কিষণ বললেন, জান প্রেমা, সাধুরা আগের থেকে অনেক কিছুই অনুমান করতে পারেন।

শুনেছি।

জয়কিষণ কিছুটা যেন উত্তেজিত হলেন, শুনেছি নয় একেবারে খাঁটি সত্যি।

কোলের ওপর থেকে চিঠিখানা তুলে নিয়ে প্রেমার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, চিঠির ভেতর একটা লাইন বেশ ভাল করে কাটা দেখতে পাচ্ছ?

প্রেমা ঝুঁকে পড়ে দেখল সত্যিই তাই।

বলল, দেখছি কিন্তু কি লেখা ছিল ওতে?

জয়কিষণ চিঠির দিকে চেয়ে বললেন, এই কাটা অংশটাতে উনি লিখেছিলেন, মনে হয় মধুবন্তী তোমার সঙ্গে এসেছে।

প্রেমা বলল, তাতে কি বোঝাল?

জয়কিষণ বললেন কেটে দেওয়াতে অনেক কিছুই বোঝাল।

প্রেমা বলল, এমন কিছুই বোঝায় না। প্রথমে আমাকে দূর থেকে দেখে মধুবন্তী বলেই ভেবেছিলেন। পরে মনে হয়েছে অন্য কেউ হতে পারে, তাই লাইনটা লিখেও কেটে দিয়েছেন।

হাসলেন জয়কিষণ। বললেন, না ব্যাপারটার সমাধান এত সহজে হবে না প্রেমা।

আমার তো তাই মনে হয়েছিল।

জয়কিষণ বাধা দিয়ে বললেন, না, আমি আর মধুবন্তী শেষবার যখন ওঁর সঙ্গে দেখা করি তখন উনি ওঁর জীবনের অনেক গল্প শুনিয়েছিলেন। দারুণ ইন্টারেস্টিং সে সব গল্প। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করছিলাম, উনি গল্পের মাঝে মাঝে আচমকা থেমে গিয়ে মধুবন্তীর মুখের দিকে অর্থভরা চোখ

মেলে তাকাচ্ছিলেন। যেন মধুবন্তীর অন্তর্জীবনকে একস্‌রে আইতে দেখে নিচ্ছিলেন।

যাবার সময় হলে মধুবন্তী যখন পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল তখন উনি দুহাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে সরে দাঁড়ালেন। বললেন, বড় মহৎ তোমার হৃদয় মধুবন্তী। তবে মনে হয় আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, একথা কেন বলছেন?

হটাৎ একটা বিষণ্ণ করুণ হাসি মুখে ফুটে উঠল। বললেন, ওপরওয়ালার ডাক কখন এসে পড়ে তার কি কোন স্থির আছে।

আমি ফেরার পথে ভেবেছিলাম শর্মাজী নিজের জীবনের দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে লঘুভাবে হয়ত কথাটা বলেছেন। কিন্তু এখন বুঝেছি তিনি মধুবন্তীর মুখে সুস্পষ্ট মৃত্যুর ছায়া দেখেছিলেন।

প্রেমা বলল, আশ্চর্য!

জয়কিষণ বললেন, দূর থেকে তোমাকে আমার সঙ্গে দেখে শর্মাজীর নিশ্চয় ভ্রম হয়েছিল। তাই তিনি মধুবন্তীর কথা লিখেও ছিলেন। কিন্তু একটু চিন্তা করে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর গণনায় ভুল নেই। তাই ঐ ছত্রটিকে কালি বুলিয়ে অস্পষ্ট করে দিয়ে গেছেন।

প্রেমা বলল, এখন মনে হচ্ছে এটাই সম্ভব।

জয়কিষণ বললেন, অথচ দেখ, উনি আনন্দময় একটি মানুষ। সাধনভজন বড় একটা করেন বলে মনে হয় না। মানুষের উপকার করেই বেড়ান।

প্রেমা বলল, উনি যে চিঠিতে লিখেছেন জরুরী কাজে বেরুলেন, কিছু কাজ কি উনি করেন?

জয়কিষণ বললেন, সে অনেক কথা। আসলে উনি ছিলেন বোটানির প্রফেসার। তারপর হিমালয়ে বেড়াতে এসে হিমালয়ের প্রেমে পড়ে যান। শুধু হিমালয় নয় একটি হিমালয় কন্যাও ওঁর হৃদয় হরণ করে। সেকথা থাক। সে অন্য কাহিনী। কিন্তু উনি আর হিমালয় ছেড়ে নীচে নামেন নি। অবশ্য ওঁর মা-বাবা না থাকায় পেছনে টানও ছিল না।

উনি এখানে থাকতে থাকতে শেষ পর্যন্ত ফারমাকোলজিস্টের কাজ শুরু করে দেন। এক ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে ভ্রমণ করে দুষ্প্রাপ্য গাছগাছালি সংগ্রহ করতে থাকেন। এর থেকে যা রোজগার হত সবই খরচ করতেন পাহাড়ীদের সেবায়।

প্রেমা বলল, এখনও কি উনি এ কাজ করেন?

না, তবে পাহাড়ী যুবকদের নিয়ে একটি দল তৈরি করে তাদের হিমালয়ের গাছগাছালি লতাপাতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে তুলেছেন। ওঁর নির্দেশ নিয়ে তারাই এখন সব কাজ করছে।

প্রেমা হাঁটুতে মুখ গুঁজে জয়কিষণের মুখের ওপর চোখ রেখে কথাগুলো শুনছিল। হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, কিন্তু উনি মানুষের জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে এমন ভবিষ্যৎবাণী করতে পারলেন কি করে? উনি তো কর্মী মানুষ। সাধু সন্তের মত ধ্যানধারণা করে অসাধারণ কোন ক্ষমতা কি লাভ করেছিলেন?

জয়কিষণ বললেন, নিরাসক্ত কর্মী উনি। মানুষের কল্যাণের কথা যিনি সর্বদা ভাবেন তাঁর দৃষ্টি অনেক স্বচ্ছ, অনেক গভীর। যথার্থ সাধু তাঁরাই। শর্মাজী হয়ত নিজেকে সবার জন্যে বিলিয়ে দিয়ে দিব্যদৃষ্টি পেয়েছেন।

প্রেমা বলল, ভবিষ্যৎ বলে দেওয়া একটা আশ্চর্য ক্ষমতা।

জয়কিষণ হেসে বললেন, সাধনার পথে যাঁরা এগিয়ে যান তাঁদের কাছে এটি কোন ক্ষমতাই নয়। তাঁরা এসব নিয়ে কোন চর্চাও করেন না। হঠাৎ কোন সময় কোন প্রসঙ্গে তাঁদের মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে পড়ে। আমরা তখন অবাক হয়ে যাই।

প্রেমা আবার হাঁটুতে মুখ গুঁজে দৃষ্টি গুহার একটি দেয়ালের গায়ে ফেলে বসে রইল। ওখানে ওপরের ফোকর থেকে একটা সাদা আলো এসে পড়েছিল। বাইরের কোন একটি গাছের ঝিরিঝিরি পাতায় ভরা ডালের ছবি ছায়ারূপ ধরে দুলে দুলে নাচছিল।

প্রেমা মগ্ন হয়ে দেখতে লাগল সে নাচ। প্রকৃতি কি আশ্চর্য নর্তকী! ঘূর্ণির ঘাঘরা পরে প্রবল আবর্তে পাক খেতে খেতে নাচে। ঝর্নার দ্রুত লয়ে পায়ের কাজ করতে করতে সামনে এগোয়। আবার গাছের

পুষ্পিত ডালে মন্থর দুলুনি দিতে দিতে নাচে। সত্যিই প্রকৃতি অনন্য নর্তকী।

হঠাৎ ধ্যান ভেঙে প্রেমা এক সময়ে উঠে বসে বলল, আচ্ছা, শর্মাজী কোন এক পাহাড়ী মেয়েকে ভালবাসতেন বললে না? কাহিনীটা একটু শোনাবে?

জয়কিষণ বললেন, কাহিনীটা আমার স্বয়ং শর্মাজীর কাছ থেকেই শোনা। আর সেদিন মধুবন্তীও উপস্থিত। বড় একটা ঘরোয়া পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সেই দিনটিতে। মধুবন্তীই চেয়েছিল শর্মাজীর জীবনের কথা শুনতে। শর্মাজী যে কত বড় কথক তা সেদিন তাঁর কথা শুনে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছিলাম। বাইরে চলছিল শীতের হাওয়ার হাহাকার। ভেতরে তিনটি প্রাণী বসেছিলাম কাঠের আগুনের সামনে। গল্প বলছিলেন শর্মাজী তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে।

একটু থেমে জয়কিষণ বললেন, আমি তো তাঁর মত করে বলতে পারব না প্রেমা। আর তাছাড়া যাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যাপার তিনিই তা সবচেয়ে সুন্দর করে বলতে পারেন।

প্রেমা অমনি বলল, তাহলে শর্মাজীর কথা থাক তোমার নিজের জীবনের ঐ ধরনের কিছু কাহিনী শোনাও।

জয়কিষণ বললেন, আমার জীবনে বলার মত তেমন কোন ঘটনা নেই প্রেমা।

বিশ্বাস করতে পারছি না।

বিশ্বাস করা না করা তোমার অভিরুচি।

কি করে বিশ্বাস করতে পারি বল? ভোরবেলা উঠে বিশ্বকর্মা যাকে নিপুণ হাতে নিখুঁতভাবে তৈরি করে সূর্যের সোনালী রঙ মাখিয়ে দিয়েছেন, কুবের যার হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁর ধনভাণ্ডারের মূল্যবান সব সম্পদ, সে মানুষ অস্পৃশ্য হয়ে রইল রমণী সমাজের কাছে একথা কোন মেয়ে বিশ্বাস করবে জয়কিষণ?

জয়কিষণ হেসে বললেন, উজ্জয়িনীর গুণগ্রাহী রাজা বিক্রমাদিত্যের কালে জন্মালে তিনি নিশ্চিত তোমাকে তাঁর সভাকবি করে নিতেন।

প্রেমা বলল, সে সুযোগ যখন আর নেই তখন একালের লালসিয়া স্টেটের কুমারবাহাদুর তাঁর নাটমণ্ডপের নর্তকী নিযুক্ত করলে ধন্য হই।

হেসে উঠলেন জয়কিষণ। গুহার ভেতর হাসিটা অলৌকিক বলে মনে হল।

হাসি থামলে প্রেমা মুখখানাকে যদ্দূর সম্ভব গম্ভীর করে বলল, হাসছ যে? এদিকে তো জান না, মেয়ের আর্জি পেশ হয়েছে তাকে নাচ শেখাতেই হবে।

জয়কিষণ বললেন, কথা আদায় করে নিয়েছে নিশ্চয়।

বলেছি, গেস্ট হাউসটা আমার জন্যে পারমানেন্টলি বুক করে রাখতে। আর সপ্তাহে দুদিন করে প্লেনে কেরালা থেকে আসার ভাড়াটা লালসিয়া স্টেট থেকে দেবার ব্যবস্থা করতে।

দোলনের হয়ে তার বাবা প্রস্তাব মঞ্জুর করছে।

প্রেমা বলল, মেয়েকে নাচ শেখানোর আগ্রহ না কুমারবাহাদুরের নিজেরই নাচ দেখার আগ্রহ?

জয়কিষণ হেসে বললেন, দুটোই।

প্রেমা কিছু সময় চুপ করে থেকে অন্য প্রসঙ্গে এল, আমরা আসল কথা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি জয়কিষণ। শর্মাজীর গুহায় বসে তাঁর জীবনের কথাটাই শোনাও। কুমারবাহাদুরের কথা তাঁর প্রাসাদে বসেই শোনা যাবে।

জয়কিষণ বললেন, তরুণ অধ্যাপক শ্রীধর শর্মাজী হিমালয়কে ভালবেসেই প্রতি বছর ছুটি পড়লে চলে আসতেন। এই আসা-যাওয়ার পথে পাহাড়ী এক পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ডিসেম্বরের শীতে পথের ধারে জমে যাবার অবস্থা হয়েছিল তাঁর একবার। অসহায়ভাবে ভয়ঙ্কর রাতের দিকে যখন তিনি চেয়েছিলেন তখনই শিউপূজন তাঁকে দেখতে পায়। বলিষ্ঠ শিউপূজন তাঁকে প্রায় কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যায় নিজের ডেরায়। সেখানে শিউপূজনের বউ লহরী সারারাত আগুন জ্বেলে তাঁর সেবা করে সুস্থ করে তোলে। সেই থেকে তরুণ শর্মাজী তাজা দুটি পাহাড়ী প্রাণের সঙ্গে এক হয়ে যান।

শিউপূজন পাহাড়ী এলাকায় গাইডের কাজ করত। কোন পর্বতারোহী দল এলে খোঁজ পড়ত

শিউপূজনের। পাহাড়ে চড়তে সে ওস্তাদ। বরফের ওপর কোথায় মরণ-ফাঁদ পাতা আছে সে সম্বন্ধে তার অনুভূতি এমনি তীক্ষ্ণ ছিল যে অভিযাত্রীরা বলত, শিউপূজন হাওয়ায় বিপদের গন্ধ পায়।

বউ লহরী একটা নদী পারাপারের পুলের কাছে পাথরের দেয়াল ঘেরা ছোট কোঠিতে থাকত। যাত্রীদের কাছে সে পকৌড়া বেচত। তার হাসিতে আর চোখের তারায় নাকি এমন এক যাদু ছিল যে যাত্রীরা দু'দণ্ড লহরীর দোকানের সামনে না বসে পুল পার হতে পারত না।

শিউপূজন তার সোমত্ত বউকে দারুণ ভালবাসত। কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভালবাসত বুঝি হিমালয়কে। তাই কোথাও থেকে ডাক এলেই সে অমনি বউ ফেলে ছুটত। শর্মাজীর ভাষায়, বুকের ভেতর জড়িয়ে নেওয়া বউকে এক পাশে ঝেড়ে ফেলে দিয়েও সে উঠে চলে যেত।

প্রেমা মন্তব্য করল, বউ রাগ করত না?

জয়কিষণ বললেন, করত বই কি। এক একবার তো শাসিয়েই বলত, এবার পাহাড় থেকে ফিরে এসে আর আমাকে দেখতে পাবে না।

শিউপূজন হেসে বলত, কেন, কোথায় যাবি? আমাকে ছেড়ে পালাবি নাকি? নতুন ঘর বাঁধবি?

হাতের কাছে যা পেত তাই নিয়ে অমনি তাড়া করত লহরী! শিউপূজন পালিয়ে বাঁচত। অনেক দূর দৌড়ে গিয়ে পিছু ফিরে তাকাত শিউপূজন। লহরী অমনি নদীর দিকে আঙুল দেখিয়ে দিত। ইঙ্গিতটা, পালাব ওরই গর্ভে।

এসব শর্মাজী নিজের চোখে দেখেছেন। তখন আসা-যাওয়ার পথে পরিচয় হয়েছে ওদের সঙ্গে। বন্ধুত্বও জমে উঠেছে। অতিথি হয়ে ওদের সঙ্গে গাদাগাদি থেকে ঐ কোঠীতেই কাটিয়েছেন কয়েক রাত।

শর্মাজী আর লহরীর ভেতর দিনে দিনে একটা অদৃশ্য আকর্ষণ গড়ে উঠল। কিন্তু কেউ পারল না পরস্পরের কাছাকাছি যেতে। শিউপূজনের আকাশের মত খোলা মন, ভোরের রোদের মত উপভোগ্য হাসি ওদের মিলনে বাধা হয়ে রইল। শর্মাজী নির্জন কোন মুহূর্তে লহরীর দিকে এগোতে চাইলেই চোখের সামনে ভেসে উঠত একটা মানুষ। পাহাড়ে উঠতে উঠতে বার বার ফিরে ফিরে চাইছে। হাত তুলে যেন শর্মাজীর দিকে একমুখ অনাবিল হাসি উপহার দিচ্ছে। সংশয়ের ছায়া নেই চোখে। সন্দেহের কাঁপুনি নেই মনে।

এই ছবি দেখার পর শর্মাজীর সংস্কৃত মন আর এগোতে পারত না। কত জ্যোৎস্নাঝরা রাত শুধু নদীর নির্জন পুলের ওপর বসে লহরীর সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দিতেন।

মাঝে মাঝে কানে বাজত শিউপূজনের একটা কথা, ভাইসাহেব তুমি আমার দোস্ত। তোমার জিম্মায় আমার লহরীকে রেখে গেলাম।

এরপর আর কথা চলে না। যৌবনের অশ্ব উদ্দাম হলেই কড়া চাবুক লাগাতেন। এদিকে শর্মাজী কঠিন পাথরের মত যত বেশি সংযম দেখাতেন পাহাড়ী নদীর মত তত বেশি দুরন্ত আবেগে আছড়ে পড়ত লহরী। খিল খিল হাসি উপহার দিত। সামান্য কথায় অভিমানে ফেনার মত ফুঁসতো।

এক সময় নিজেকে বিশ্লেষণ করলেন শ্রীধর শর্মাজী। যৌবনের ঢল যে কোন মুহূর্তেই তীরের বাঁধন ভেঙে ফেলতে পারে। তাই নিজেকে কিছুকালের জন্যে লহরীর কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে চাইলেন। পর পর দুবছর এলেন না হিমালয়ে।

একটি বছর যেতে না যেতেই চিঠি এল। শিউপূজন চিঠিতে দারুণ দুঃখ আর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আরও জানিয়েছে, দোস্তকে বহুৎ দিন না দেখতে পেয়ে লহরী তার মুখের হাসি লুকিয়েছে।

তার পরেও এক বছর কোন খবর না দিয়ে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন শর্মাজী। কখানা চিঠি পর পর দিয়ে ওপক্ষ জবাব না পেয়ে চুপ হয়ে গেল।

দু' দুটো বছর পার করে হঠাৎ এলেন শর্মাজী। নদীর ধারে কোঠীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। সূর্যাস্তের আয়োজন চলেছে তখন সামনের পাহাড়ের মাথায়। কেউ নেই কোথাও। কাঠের দরজা ভেজান। চারদিক কেমন যেন শ্রীহীন।

শর্মাজী শিউপূজনের নাম ধরে ডাকলেন। লহরীর নাম ধরে ডাকতে গিয়ে এতদিনের বিচ্ছেদে

গলাটা কেঁপে উঠল। ভেঙে গেল স্বর। এক সময় সূর্যাস্ত হল। সন্ধ্যার ঘোলাটে আলো চারদিক থেকে ঢেউয়ের মত এগিয়ে আসতে লাগলো। শর্মাজী বসে পড়লেন কোঠীর দাওয়ায়।

হঠাৎ চোখ পড়ল নদীর ওপর। পুলের নীচ থেকে কে যেন উঠে আসছে। কাছাকাছি আসার আগে চিনতে পারলেন না।

লহরী সামনে এসে দাঁড়াল। সত্যি তাকে চেনা কষ্টকর। তার ছিমছাম রঙীন পাজামা আর চোলি গেল কোথায়? কানের গয়না, গলার হাঁসুলি উধাও। অতি জীর্ণ একটা পোশাকে লজ্জা ঢেকে এক ঘড়া জল মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লহরী।

শর্মাজী সে রাতে ঐ ছোট কোঠীতে বসে শুনলেন লহরীর দুর্ভাগ্যের কথা। শিউপূজন আর নেই। কয়েক মাস আগে একটি বিদেশী দলের সঙ্গে কোন এক একস্‌পিডিশনে নাকি গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার পথে ক্রমাগত ব্লাড ভমিট করতে থাকে। দলের ডাক্তার কঠিন কিছু একটা রোগ সন্দেহ করে একেবারে দিল্লীতে এনে ফেলল। সেখানে পরীক্ষার পর জানা যায় রোগটা আরোগ্যের বাইরে। আভাসে ইংগিতে কথাটা জানতে পেরেছিল শিউপূজন। সে আর তিলমাত্র সময় নষ্ট করল না। হাসপাতালের এতখানি সুব্যবস্থা, নার্সদের ঘন ঘন আসা-যাওয়া কিছুই তাকে বেঁধে রাখতে পারল না। একটা পাহাড়ী নদীর পুলের ধারে ছোট একটা কোঠীর ছবি তার চোখের ওপর ভেসে উঠল। একটা নিঃসঙ্গ পাহাড়ী মেয়ের বুকের আশ্রয়ে গোনাগুনতি দিন কটা কাটাবার জন্যে শিউপূজন হাসপাতালের লোকদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এল।

লহরীর কাছে শর্মাজী শুনলেন, মাত্র মাস দুয়েক আগে শিউপূজন মারা গেছে। মারা যাবার দিনও নাকি বারবার শর্মাজীর নাম ধরে ডেকেছিল।

শর্মাজী সে রাতে কি ভাবলেন কে জানে। লহরীকে বলে এলেন ওখানেই থাকতে। বললেন, ঠিক মাসখানেকের ভেতর তিনি ফিরে আসবেন।

এলেনও তাই। কেউ ছিল না নিকট আত্মীয়। ছিল কিছু জোত জমি আর পূর্ব পিতামহের সঞ্চিত সম্পদ। জোত জমি বেচে জমানো টাকা পয়সা নিয়ে শর্মাজী চলে এলেন লহরীর কাছে। বললেন, চলো লহরী আমার সঙ্গে।

কোথায় বাবুজী?

মানুষের কষ্ট ঘোচাতে।

লহরী কিছু বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল শর্মাজীর দিকে।

শর্মাজী বললেন, শিউপূজনের রোগের ওষুধ বেরোয় নি। চল আমরা হিমালয়ের পথে পথে রোগের ওষুধ খুঁজে বেড়াই। হাজার হাজার লতাপাতা গাছগাছালির ভেতর কোটি কোটি মানুষের নিরাময়ের ওষুধ লুকিয়ে আছে। আমরা জানি না, তাই রোগের কাছে আমরা হার মানি।

এর পর চলল গাছগাছালি খোঁজার পালা। বড় একটি ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হল। নতুন নতুন অনেক ওষুধও তৈরি হতে লাগল হিমালয়ের গাছগাছালি থেকে।

প্রেমা বলল, লহরী এখন কোথায়?

জয়কিষণ ম্লান হেসে বললেন, শর্মাজীর হৃদয়ের ভেতর। বছর কয়েক আগে লহরী মারা গেছে।

প্রেমার গলায় কৌতূহল, একটা কথা একটুখানি অসংগত হলেও কি জিজ্ঞেস করতে পারি?

অসংকোচে, বললেন জয়কিষণ।

প্রেমা বলল, শর্মাজী কি লহরীকে তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলেন?

জয়কিষণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, জড়িয়ে নিয়েছিলেন বৈকি। একই সঙ্গে জীবনের কতকগুলি বছর দুজনে দুর্গম পাহাড়ে দিন রাত্রি ঘুরে বেড়িয়েছেন। শর্মাজী বলেছেন, একটা নেশার ঘোরে তাঁরা কাটাতেন দিন, মাস, ঋতু, বছরগুলো। কোন গাছের রোগ নিরাময় ক্ষমতার খবর পেলেই শর্মাজী আর লহরী ছেলেমানুষের মত আনন্দে চীৎকার করে উঠতেন।

একটু থেমে জয়কিষণ বললেন, কিন্তু এত কাছে থেকেও এক দিনের জন্যে লহরীর দেহ স্পর্শ করেননি শর্মাজী।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য ঘটনা সন্দেহ নেই, কিন্তু একেবারে সন্দেহাতীত। এখানেই শর্মাজীর সঙ্গে অন্যদের তফাত প্রেমা। দেহধর্মে তাঁরা যুক্ত হতে পারছেন, এতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু শর্মাজী তা পারেন নি। যে মানুষটি তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছিল, তাঁকে বন্ধুর মত বিশ্বাস করেছিল, সেই মানুষটিকে কোনদিনই শর্মাজী মৃত বলে ভাবতে পারেন নি। তাই লহরীকে নিয়ে দিনে-রাতে কাজ করে গেছেন। কিন্তু স্ত্রী হিসাবে কাছে পেতে চান নি। কোনদিন মন চঞ্চল হলেও নিজেকে শাসন করেছেন। আরও দুর্গম অঞ্চলে অনেক বেশি শ্রমসাধ্য কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে দেহের ক্ষুধা ভুলেছেন।

প্রেমা বলল, অন্যপক্ষ? তারও কি ক্ষুধাতৃষ্ণা ছিল না? যোগীর সঙ্গে সেও কি যোগযুক্ত হয়ে গিয়েছিল?

ঠিক তাই। শর্মাজীর কাছে সে নিজেকে যাকে বলে সঁপে দিয়েছিল। মনে তার কি ছিল তা শর্মাজীর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। সম্ভব হলেও তিনি জানতে চাইতেন না। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারতেন দিনের পর দিন লহরী গভীর হচ্ছে। কাজের ভেতর সে পাগলের মত নিজেকে ডুবিয়ে ফেলতে চাইছে।

প্রেমা বলল, এখন শর্মাজী কি কাজে জড়িয়ে রয়েছেন?

জয়কিষণ বললেন, এখন নিজে আর লতাপাতার খোঁজে ঘুরে বেড়ান না। পাহাড়ী ছেলেদের এ কাজে শিক্ষিত করে তুলেছেন। তারাই এখন এসব কাজ করছে। আমি শেষবার তাঁর সঙ্গে যখন দেখা করি তখন তিনি একটি হাসপাতাল তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর জীবনের সব সঞ্চয় ঢেলে তিনি তা গড়ে তুলেছিলেন। মধুবন্তী তাঁকে শ্রদ্ধা করে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল, তিনি তা নিতে চান নি। অবশ্য তাঁর প্রত্যাখ্যানটা ছিল অত্যন্ত স্নেহ সৌজন্যে ভরা। হেসে মধুবন্তীকে বলেছিলেন, যখনই তুমি দেবার কথা বলেছ তখনই আমি অন্তরে তা গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমি যে কাজ করছি সেটা আমাকে একাই করতে দাও। ওরা আমার জন্যে যা করেছে তার কিছু যদি শোধ দিয়ে যেতে পারি। আমি ওদের নামেই সেবা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছি।

শেষে বললেন, তোমাকে দুঃখ দেব না, তুমি একটি টাকা আমাকে দান করে যাও। ওটি আমি নারী সেবা সদনের কাজে লাগিয়ে দেব। এ আমার জীবিতকালের ভেতর হবে প্রথম আর শেষ দান গ্রহণ।

প্রেমা বলল, আর একটি কথা। উনি এখনও এমনি একটা গুহায় থেকে কৃচ্ছ্র সাধন করছেন কেন?

জয়কিষণ বললেন, মধুবন্তী ঠিক একই প্রশ্ন করেছিলেন শর্মাজীকে। তিনি বলেছিলেন, এক রাতে কাজের শেষে ক্লান্ত হয়ে আমি আর লহরী এই গুহাতেই আশ্রয় খুঁজে পাই। সে রাতে আশ্চর্য উজ্জ্বল পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছিল আকাশে। আমরা ক্লান্ত থাকলেও ঘুমুতে পারিনি।

লহরী শুধু বলেছিল, এমন একটি নির্জন গুহার ভেতর সারাটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়।

সেই থেকে গুহাটিকে আমি পরিত্যাগ করিনি। ওর ইচ্ছা আর স্বপ্নকে মর্যাদা দিয়ে শেষ অব্দি আমি থেকে গেছি। জীবনের শেষ কটা দিনও এইখানেই শয্যা পাতব।

শর্মাজীর কথা শেষ হলে জয়কিষণ কিছু সময় নীরব হয়ে বসে রইলেন।

প্রেমা এক সময় বলল, আমরা শর্মাজীর জন্যে কি সন্ধে অব্দি অপেক্ষা করব?

জয়কিষণ কৌতুক করে বললেন, কেন সারারাত অপেক্ষা করতে আপত্তি আছে কি?

প্রেমা কৌতুকটা বুঝল। সে অমনি বলল, কিছুমাত্র না। কুমার জয়কিষণের আপত্তি না থাকলে নর্তকী প্রেমা মেননেরও আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না।

সন্ধ্যা নেমে আসার আগেই কিন্তু উঠে দাঁড়ালেন জয়কিষণ। বললেন, তুমি আমার মধু রাসের সম্মানীয় অতিথি প্রেমা। তুমি গুহায় থাকার কষ্ট হয়ত সইতে পারবে কিন্তু আমি তো তোমাকে কষ্ট দিতে পারব না।

প্রেমা বলল, এখন প্রেমা মেননের নিজস্ব ইচ্ছার কোন দাম নেই। কুমার বাহাদুরের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। যখন যেখানে নিয়ে যাবে কৃতজ্ঞ অতিথির মত চলে যেতে হবে সেখানে।

গুহা ছেড়ে চলে আসার সময় জয়কিষণ চিঠি লিখে রেখে গেলেন। শর্মাজীর সঙ্গে দেখা হল না বলে দুঃখ প্রকাশ করে প্রণাম জানিয়ে গেলেন। মধুবন্তীর বিয়োগ সংবাদটিও দিয়ে যেতে ভুললেন না।

দুদিন একান্তে জয়কিষণকে পেয়ে প্রেমার কেবলই মনে হতে লাগল দেবনের কথা। এমনি বলিষ্ঠ সুন্দর এক পুরুষ দেবন। সংযমের শ্রী তার সমস্ত আচরণে। জয়কিষণের সঙ্গে পার্থক্য শুধু এক জায়গায়। দেবন বিষয়বিরাগী আত্মমগ্ন শিল্পী আর জয়কিষণ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন শিল্পানুরাগী।

গাড়িতে লালসিয়া ফেরার পথে প্রেমা বলল, আর একটা কৌতূহল মেটাবে?

জয়কিষণ হেসে বললেন, অফুরন্ত কৌতূহল তোমার। বল, সাধ্যমত উত্তর দেব।

প্রেমা বলল, রাতে বিছানায় শুয়ে বেহালার সুর শুনতে পাই। যখনই ঘুম ভাঙে তখনই শুনি বেহালা বেজে চলেছে। কে এই বেহালাবাদক জানতে খুব ইচ্ছে করে।

জয়কিষণ বললেন, দোলন কিছু বলেনি?

আমি জানতে চেয়েছিলাম। ওর কথা থেকে সবকিছু স্পষ্ট হয়নি। তবে উনি যে বাঙালী আর দোলনের মায়ের নাচের কোন কোন অংশে বেহালা বাজাতেন, তা শুনেছি। কিন্তু উনি সারাটা রাত জেগে বেহালা বাজান কেন? ওঁর কি সংসার নেই?

জয়কিষণ সহসা কোন উত্তর দিলেন না। গাড়ি চালাতে লাগলেন পথের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে। প্রেমা যখন বুঝল উত্তর দেবার সম্ভাব্য সময় পার হতে চলেছে তখন সে মনে মনে লজ্জাই পেল। হয়ত তার এ প্রশ্ন তোলা ঠিক হয় নি। হয়ত এই একটি মাত্র প্রশ্নে সে জয়কিষণের পুরাতন কোন আহত স্থানে আঘাত করে বসেছে। এখন সেই আহত স্থান থেকে রক্তক্ষরণের জ্বালা হয়ত নীরবে সইছে জয়কিষণ। প্রেমা এই মুহূর্তে তার প্রশ্নটা ফিরিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু নিক্ষিপ্ত তীরের মত যা একবার ধনু থেকে বেরিয়ে চলে গেছে তাকে ফেরাবে সে কোন ইচ্ছাশক্তির বলে। এখন নিশ্চেষ্ট দর্শকের ভূমিকায় বসে থাকা ছাড়া অন্য কোন করণীয় নেই প্রেমা মেননের।

জয়কিষণ কথা বললেন, মেয়েদের ভাবনা অনেক দূর অব্দি যেতে পারে। ছেলেরা এ ক্ষেত্রে হার মেনে যায়। আমি বলছি, ভালবাসার ভাবনার কথা।

প্রেমা তাকাল জয়কিষণের মুখের দিকে। জয়কিষণ প্রেমার দিকে চেয়ে একটুখানি হেসে বললেন, তোমার মনে যে ধারণা অস্পষ্ট হলেও জন্মেছে তা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেবার শক্তি আমার নেই। ঐ বেহালাবাদকটিকে বলতে পার আমার ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রেমা বলল, আশ্চর্য! তুমি জেনেও সহ্য করলে কি করে?

জয়কিষণ বললেন, আমি তো মধুবন্তীর ভেতর কোনরকম বিকার দেখিনি। প্রতারণা তো দূরের কথা।

তবে?

জয়কিষণ বললেন, মানুষটি বড় তদ্গত শিল্পী। হয়ত কোন মুহূর্তে তার মধুবন্তীকে ভাল লেগে থাকবে। সেই ভাল লাগার টানেই মানুষটি হয়েছিল একদিন দেশান্তরী, তারপর আর ঘরে ফিরতে পারেনি।

প্রেমা বলল, তুমি কি নিশ্চিত করে বলতে পার তোমার স্ত্রী ওঁর ভালবাসার কোন উত্তাপই পাননি? আমি হয়ত কথাটা ঠিকভাবে তোমাকে বোঝাতে পারলাম না। আমার মনে হয় প্রত্যেক মেয়ের মত তোমার স্ত্রীরও ঐ মানুষটির গোপন মনের খবর জানার ক্ষমতা ছিল।

জয়কিষণ বললেন, এত করে বোঝাতে হবে না প্রেমা। মধুবন্তীকে কোনদিন এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে আমার রুচিতে বেধেছে। তবে আমি এও জানতাম, মধুবন্তী এ বিষয়ে সচেতন ছিল। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব না মধুবন্তীর মনের গোপনে সামান্য কোন অনুরাগ ছিল কিনা, তবে ভায়োলিনের সুরে নাচতে নাচতে সে যে উদ্দীপ্ত হত তা আমি দর্শক আসনে বসে স্পষ্ট অনুভব করতাম।

প্রেমা বলল, এত বছর একসঙ্গে মানুষটি রইল, কোনদিন দুজনের কোন সান্নিধ্য কি চোখে পড়েনি?

না। দেখা হয়েছে দুজনের। নাচের জন্যে বাজনা কম্পোজ করে শুনিয়েছে কিন্তু চোখেমুখে আকাঙক্ষার কোন ছবি ফুটে উঠতে দেখা যায়নি।

প্রেমা বলল, এ ভালবাসা দেহের সীমা ছাড়িয়ে গেছে জয়কিষণ। শিল্পীর ওপর শিল্পীর ভালবাসা। এ তো দেশকাল আর ব্যক্তির বাঁধনে বাঁধা নয়।

জয়কিষণের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, তোমার অনুমান একেবারে সত্যি প্রেমা। তাই আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও ঐ মানুষটিকে আমি সমান সমাদরে আমার লালসিয়ার বাড়িতে রেখেছি।

প্রেমা তদ্‌গত হয়ে বলল, যে কোন শিল্পীর সঙ্গে তার সংগতকারের একটা নিবিড় সংযোগ গড়ে ওঠে। নাচ, গান, বাজনা, সকল ক্ষেত্রেই এই অদৃশ্য বাঁধন আপনা আপনি তৈরি হয়ে যায়। বোলের তালে নৃত্যের তালে যে রস ছলকে ওঠে সেই রসটুকু পান করার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় দর্শকদের ভেতর। করুণ সুরে যখন ভায়োলিন বেজে ওঠে তখন কৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা-কাতর রাধার বুক কাঁপতে থাকে। তার করুণ চোখের দৃষ্টি পাতার মত বিছান থাকে দূর পথের ওপর। ধীরে ধীরে কাতরতার একটি মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় রাধারূপী নর্তকী।

আচ্ছা জয়কিষণ, সুরস্রষ্টার যে সুর নৃত্যশিল্পীর হৃদয়কে স্পর্শ করে তাকে রূপান্তরিত করে দিল তার সঙ্গে অগোচর বাঁধনে বাঁধা পড়বে শিল্পী এটাই কি স্বাভাবিক নয়?

জয়কিষণ বললেন, তুমি শিল্পী বলে কথাগুলোকে এমন করে ফুটিয়ে তুলতে পারলে। তুমি যে কথা বললে প্রেমা, সে সত্য আমার অজানা নয়। তাই মধুবন্তীকে বিয়ে করে আর পাঁচটি মানুষের মত আমি মনে মনে যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হইনি। তবে একটি সত্য আজ আমি তোমার কাছে স্বীকার করব, মধুবন্তীকে সর্বভারতীয় নৃত্যের আসরে ছেড়ে দিতে আমার প্রাণ চাইত না। বলতে পার মানুষ হিসেবে সেখানেই আমার হার। আমার উদারতা এতদূর পৌঁছতে পারত না প্রেমা।

প্রেমা বলল, স্বাভাবিক। সেজন্যে আমার মনে হয় শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর মিলনই বাঞ্ছনীয়। শিল্পক্ষেত্রে, সংসারক্ষেত্রে দু জায়গাতেই ওদের যুক্ত হওয়া দরকার। বিত্তবানের সঙ্গে শিল্পীর যোগ প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু তাকে যোগ না বলে ভোগ বললেই ভাল হয়। সেখানে শিল্পীর মোহ ভাঙতে বেশি সময় লাগে না। তখন শুধু আক্ষেপ, শুধু বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে পথ খোঁজা।

কথাগুলো বলে প্রেমার মনে হল সে হয়ত জয়কিষণকে আহত করেছে। তাই সে আবার বলল, তবে বিত্তবান যদি রসিক সমঝদার হন, তাহলে সেখানে শিল্পীর সঙ্গে মিলনে কোন বাধা থাকতে পারে না।

জয়কিষণ একটা পাহাড়ী জলধারার সামনে এসে পড়েছিলেন। আস্তে পার হতে হবে। তাই গাড়িটা ব্রেক করে তাকালেন প্রেমার দিকে। হেসে বললেন, শেষের কথাটুকু কি সঙ্গীর জন্যে সান্ত্বনা পুরস্কার?

প্রেমা বলল, তোমার দিকে তাকিয়েই কথাটা মনে পড়েছে ঠিক, কিন্তু আমি বানিয়ে স্তুতি করে কোনদিনই কথা বলতে পারি না জয়কিষণ।

আচ্ছা তাহলে আর একটা প্রশ্ন।

বল।

এমনি কোন সম্ভ্রান্ত সমঝদারকে গ্রহণে তোমার আপত্তি আছে কি? ধর জীবনে যদি এমন কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হও তাহলে তুমি কি তোমার আজকের এই মুহূর্তের উক্তিকে মর্যাদা দিতে পারবে?

সহসা কোন জবাব দিতে পারল না প্রেমা। তার সুন্দর মুখখানাতে লালের ছোপ লাগল। একটা জবাব তাকে দিতেই হবে। কিন্তু নিজের কথার মর্যাদা রাখতে গেলেই তাকে হতে হবে বন্দিনী। এ যে নিজের কথার জালে নিজের জড়িয়ে পড়া!

অসহায়ের মত জয়কিষণের মুখের দিকে চেয়ে সে শুধু মাথাটা নাড়ল!

জয়কিষণ হেসে বললেন, সম্মান দিয়ে যাকে এনেছি, আমার কাছ থেকে তার ভয় পাবার কোন কারণ নেই প্রেমা। তুমি শিল্পী বলে আমার আকর্ষণ আছে তোমার ওপর, আর কোন অসম্ভব ইচ্ছা আমার এই মুহূর্তে নেই।

জয়কিষণ পাহাড়ী জলপ্রবাহের ওপর দিয়ে সাবধানে গাড়ি পার করে নিয়ে চলে গেলেন।

আগামী রাতেই মধুরাস। আকাশে জ্বলবে আকাশ দেবতার সবচেয়ে উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলোর গোলক। পূর্ণ চাঁদের জ্যোৎস্না ডুবিয়ে ভাসিয়ে দেবে চরাচর। লতাপাতা ফুল, সৌধ পর্বত উপত্যকা নদী মাখামাখি

হয়ে যাবে জ্যোৎস্নার সেই ঘন কিরণ ধারায়।

জয়কিষণ প্রেমাকে নিয়ে উৎসবের আগের রাতে ঢুকলেন নাটমণ্ডপে। সুসজ্জিত আলোকিত মণ্ডপে প্রেমার এই প্রথম আগমন।

এ যেন এক বিস্ময়। সমস্ত সৌধটি শ্বেত পাথরের গড়। সামনে গোল গম্বুজ। বৌদ্ধ রীতির তোরণ। তোরণের ওপরে একটি ময়ূর। পেখম ধরে দাঁড়িয়ে আছে নৃত্য-ভঙ্গিমায়। গ্রীবা থেকে ঊর্ধ্বমুখী শিখা পর্যন্ত ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিতে স্থাপিত। অপূর্ব জয়পুরি কাজ করা পেতলের ময়ূর। ওপরের উজ্জ্বল একটি বিদ্যুৎবাতির চক্রাকার আলো এসে পড়েছে ময়ূরটির ওপর। মাজা পেতলের ওপর আলো পড়ে স্নিগ্ধ সোনালী একটা আভা ছড়িয়ে পড়ছে। নাটমণ্ডপের গায়ে কোনো আলো নেই। তার চারদিক ঘিরে যে মঞ্জরিত শালগাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে তাদের ডালে ডালে বাঁধা আলোগুলো ফোয়ারার মত ছড়িয়ে দিচ্ছে দুগ্ধধারা। সেই ধারায় স্নান করছে শ্বেতপাথরের নাটমণ্ডপ। রাত বারোটার পর যখন মেন-সুইচ অফ করে দেওয়া হয় তখন নাটমণ্ডপের আর এক রূপ। সেদিনের মত উৎসবের সমাপ্তি। দর্শকরা চলে যান যে যার আশ্রয়ে। শুধু জেগে থাকে শ্বেত সৌধটি নীল আকাশের তলায় তাজমহলের ক্ষুদ্র একটি সংস্করণের মত। আকাশের চাঁদ তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে আর ভালবাসায় বিগলিত হয়ে সুধা ঝরায়। দু-একজন সত্যিকারের রসজ্ঞ এই জনশূন্য মুহূর্তগুলোকে অনুভবের মধ্যে খোদাই করে রাখার জন্যে নাটমণ্ডপের চারদিকে নিশি পাওয়ার মত ঘুরে বেড়ান।

অডিটোরিয়ামে ঢোকার আগে প্রেমা শুধু বলল, তোমার স্ত্রীকে এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি জয়কিষণ। বোধ হয় এর চেয়ে ভাল করে দেখা আর কোনরকমে হতে পারে না।

জয়কিষণ বললেন, শিল্পীই শিল্পীকে চিনতে পারে। চোখের বাইরের বস্তুকে চোখের সামনে স্পষ্ট করে দেখার ক্ষমতা একমাত্র শিল্পীরই আছে।

প্রেমা বলল, চোখ হল সবচেয়ে ছোট জানালা, যার ভেতর দিয়ে বিশ্বভুবন দেখা যায়। কিন্তু শিল্পীর আছে বাড়তি আর একটি চোখ। সে চোখের দৃষ্টি অনন্তের সৌন্দর্য ভাণ্ডারকে ছুঁয়ে আছে। তাই শিল্পীমাত্রেই দ্বিতীয় স্রষ্টার সম্মান পায়।

জয়কিষণ বললেন, তোমার কথাগুলো শিল্পীর মত। আমার স্ত্রীকে দেখতাম, কত গভীর রাতে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে কাজ করছেন। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াতাম। উনি কিন্তু লক্ষ্য করতেন না, নিজের মনে স্কেচ করতেন আর তার পাশে পাশে কিসব লিখতেন।

আমার সঙ্গে হঠাৎ চোখাচোখি হলেই চমকে উঠতেন। চমক ভাঙলে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন। বলতেন, এত রাতে কি অন্যায় দেখতো, তোমার ঘুম ভাঙালাম।

আমি অমনি বলতাম, কি করছ জানতে বড় ইচ্ছে করে।

উনি আরও সঙ্কুচিত হয়ে কাগজখানা তুলে বুকের কাছে চেপে রাখতেন।

বলতাম, তোমার ও রত্নে আমার অধিকার নেই জানি, আর এও জানি আমার এ কৌতূহলের কোন দামই নেই তোমার কাছে।

মধুবন্তী বিচলিত হয়ে আমার চোখের সামনে ওঁর আঁকিবুকি কাটা কাগজখানা মেলে ধরে বলতেন, এই সামান্য জিনিসের জন্যে এত কৌতূহল তোমার। দেখ, শুধু নতুন একটা নাচের ছক তৈরি করছি আমি। ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখি নাচের। ইন্দ্রসভায় উর্বশী নতুন নাচ পরিবেশন করছেন। ঘুম ভেঙে গেলে আমি তাই এঁকে রাখার চেষ্টা করি। প্রায়ই স্বপ্নে আমি নানা ধরনের নাচ দেখতে পাই।

প্রেমা অমনি বলল, শিল্পী মাত্রেই তদ্‌গত কিন্তু শিল্পের দেবীর আশীর্বাদ না থাকলে স্বপ্নের ভেতর দিয়ে এমন আশ্চর্য সব দর্শন হয় না।

জয়কিষণ অন্যমনস্ক হলেন। সম্ভবত তাঁর মধুবন্তীর কথা সে মুহূর্তে বেশি করে মনে পড়ল।

কয়েক মুহূর্তের পরেই স্বাভাবিক হলেন জয়কিষণ। বললেন, চল ভেতরে যাই।

প্রেমা যেন আপন মনে বলে উঠল, সত্যি, এখানে এসে যেমন অনেক কিছু পেলাম, তেমনি হারালামও অনেক।

যেমন?

প্রেমা বলল, ওঁর মত একজন গুণী শিল্পীর আশ্চর্য সব পরিকল্পনা দেখলাম, কিন্তু সঙ্গ পেলাম না।

জয়কিষণ হঠাৎ বললেন, তুমি নিজে যে কত বড় শিল্পী প্রেমা সে সম্বন্ধে তোমার নিজের কোন ধারণাই নেই। আমরা যারা তোমার নাচ দেখি তারাই শুধু বুঝি।

ওরা ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে অডিটোরিয়ামের স্টেজের মুখোমুখি। সামনে দু'সারি দর্শক আসন। দর্শকদের দিকে ধনুকের মত বাঁক নিয়ে উঠেছে শ্বেতপাথরের মঞ্চ। প্রেমার চোখ স্থির হয়ে আছে মঞ্চের পেছনের একটি পেন্টিং-এর ওপর। চারদিক ধবধবে সাদা পাথরের রঙে আশ্চর্য প্রশান্ত। তার মাঝখানে ঐ ছবিখানা ভোরের সূর্যের লাল হলুদ রঙে রঙীন।

একটি সোনালী রথে বসে আছেন দেব দিবাকর। সাতটি গতিশীল বলদৃপ্ত অশ্ব আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে সেই সজ্জিত রথ। সূর্যের হাতে সোনালী রজ্জু। উদ্দীপ্ত ভঙ্গিতে তিনি চালনা করছেন রথ। সারা আকাশ জুড়ে লালে হলুদে মেশা রঙের সমারোহ। টুকরো টুকরো রঙীন মেঘের সঙ্গে দিগন্তের দিকে উড়ে চলেছে প্রভাতী পাখির দল।

ছবির তলায় শ্বেতপাথরের টানা প্যানেলের ওপর এক সারি আধফোটা পাথরের তৈরি পদ্ম।

প্রেমা মঞ্চের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দুহাত তুলে নমস্কার করল।

জয়কিষণ প্রেমার মুগ্ধ ভাবটি লক্ষ্য করে বললেন, শিল্পী সারদা উকিলের এমনি সূর্য-সারথির একটি ছবি মধুবন্তী কোথায় যেন দেখেছিলেন। ছবিখানার গতিভঙ্গি তাঁর মনে দারুণভাবে রেখাপাত করেছিল। তিনি ঐ ছবির একটি রঙীন প্রতিলিপিও কোন পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। মঞ্চ তৈরি শেষ হলে ব্যাকগ্রাউন্ড ডেকোরেশানের সময় ঐ ছবিখানাই কুশলী এক বাঙালী শিল্পীকে দিয়ে আঁকিয়ে নেন।

তদ্‌গত প্রেমা বলল, সূর্য তো এক অর্থে ছন্দ। সূর্যের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাখির ডানায়, প্রজাপতির পাখনায়, ফুলের পাপড়িতে ছন্দের কাঁপন লাগে। জলের বুকে ঢেউয়ের দোলায় সূর্যের ভালবাসার টান। চারদিকে প্রাণের ছন্দ তো ঐ সূর্যের ছোঁয়ায়; জলে স্থলে আকাশে অগ্নিতে সূর্যেরই লীলা, সূর্যেরই ছন্দ। ঋতুর নৃত্যমহিমাও তো আমাদের এই পৃথিবীর সূর্য-প্রদক্ষিণের ফল।

জয়কিষণ বললেন, কিন্তু আমি মধুবন্তীকে বলেছিলাম, নটরাজের মূর্তি মঞ্চের পশ্চাৎপটে খোদিত করাই তো রীতি। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত নটরাজের উপাসক। তিনি শ্রেষ্ঠ নর্তক বলেই তো নটরাজ।

মধুবন্তী বলেছিলেন, প্রতিদিন ভোরে যে চলমান সূর্যকে চোখের সামনে দেখছি, তাঁকেই আমার নৃত্যগুরু বলে মনে মনে বরণ করেছি। তাঁকে আমি বাইরের চোখেও দেখি আবার ধ্যানের চোখেও দেখি। তাঁকে বুঝতে, তাঁর ছন্দে দেহমন দুলিয়ে দিতে তাই আমার কোন কষ্ট হয় না। অবলীলায় তিনি আমার ঘুমন্ত ভাবনাগুলোকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলেন। আমি তাই চিরদিনই সূর্য উপাসিকা।

প্রেমা বলল, আমি তো আগেই বলেছি, সূর্যের ভেতরে ছন্দের লীলা। মধুবন্তী তাই সূর্যকেই তাঁর নৃত্যদেবতারূপে বরণ করেছিলেন। কিন্তু মহাদেবকে শ্রেষ্ঠ নটরূপে গ্রহণ করার ভেতরেও একটা যুক্তি আছে।

জয়কিষণ তাকালেন প্রেমার দিকে। তাঁর চোখে জানবার কৌতূহল।

প্রেমা বলল, আমার গুরু বলেন, স্থিতি আর গতি, ধ্যান আর প্রকাশ একই সঙ্গে বিরাজ করে। পর্বতের ওপর যখন তুষারের স্তূপ স্থির হয়ে থাকে তখন তার ধ্যানের মূর্তি, আবার তুষার যখন গলে ঝরে পড়ে তখন তার গতির লীলা। মহাদেবের পরিকল্পনায় একদিকে স্থিতি অন্যদিকে গতি। যখন তিনি ধ্যানে মগ্ন তখন তিনি শান্তম। আবার যখন তিনি নৃত্যরত তখন তাণ্ডব নটরাজ। দুটি রূপেই সম্পূর্ণতা।

একটু থেমে আবার প্রেমা বলল, মাধবী আম্মা একটি ডালিম একদিন হাতে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, এটি কি বল তো?

আমরা বলেছিলাম, ডালিম।

উনি বলেছিলেন, সে তো সাদা চোখেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আসলে এটি একটি ধ্যান। এই ধ্যান থেকেই একদিন জন্ম নেবে বৃক্ষ। তার থেকে জাগবে তার ছন্দিত শাখাপ্রশাখা। তার রঙীন ফুল। তার রসে ভরা ফল। বীজে যার ধ্যান, বৃক্ষের শাখায় পুষ্পে ফলে তার প্রকাশ। নাচও ঠিক তাই। ধ্যানের

ভেতর দিয়ে তার সমস্ত রূপটা ভেবে নিতে হয়।

আরও বলেছিলেন, স্বামীকে যখন শয্যায় গ্রহণ করবে তখন আগে ধ্যানের ভেতর তাঁর রূপটিকে চিন্তা করবে। তবেই তো দেহের লীলা হবে উৎসব।

আশ্চর্য তোমার গুরুর শিক্ষা প্রেমা!

প্রেমা বলল, তিনি নাচের আগে আমাদের সাজিয়ে দেবার পর ধ্যান করতে বলতেন কিছুক্ষণ। যে চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে চাই, ধ্যানের ভেতর দিয়ে সেই চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে যেতে বলতেন।

জয়কিষণ বললেন, তোমার গুরু যদি এ অনুষ্ঠানে তোমার সঙ্গে থাকতেন, তাহলে আমার মধুবন্তীর নাটমণ্ডপ ধন্য হয়ে যেত।

উনি আজকাল কোন নাচের অনুষ্ঠানেই অংশ নেন না।

জয়কিষণ বললেন, শুধু উপস্থিতি। তার দাম কি কম।

প্রেমা জয়কিষণের শ্রদ্ধার উত্তাপটুকু অনুভব করে মাথা নেড়ে জানাল, তা ঠিক।

এবার জয়কিষণ বললেন, এসো, অডিটোরিয়ামের দেয়াল-চিত্রগুলো তোমাকে দেখাই।

ওরা ঘুরে ঘুরে দেয়ালের ছবি দেখতে লাগল। সবকটি ছবিই রাধাকৃষ্ণলীলার। মহারাসের ছবিতে প্রতি গোপিনীর সঙ্গে মণ্ডলী রচনা করে নৃত্য করছেন কৃষ্ণ। যত গোপিনী তত কৃষ্ণ। কৃষ্ণের হাত ধরে উধাও হয়ে যাবার আকুলতা প্রকাশ পাচ্ছে ব্রজবধূদের চঞ্চল চরণ চালনায়।

পাশের চিত্রটি বিরহ-কাতর রাধিকার। ঘনমেঘে বিদ্যুতের বিকাশ। শিহরিত কদম্বতরুর তলায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে প্রিয়তমের আসা পথের দিকে চেয়ে আছে শ্রীমতী রাধা। শিথিল হাতখানা অবগুণ্ঠনের ওপরে স্থির হয়ে রয়েছে। উত্তাল যমুনা তরঙ্গ কান্নায় আছড়ে পড়ছে প্রতীক্ষা কাতর রাধার চরণপ্রান্তে।

অন্য একখানি চিত্র বসন্ত রাগিণীর। মন্দিরা, মৃদঙ্গ আর করতালের ধ্বনি তুলেছে গোপিনীর দল। সেই তালে বাঁশরীর মোহন সুর তুলেছেন শ্রীকৃষ্ণ মাধব। চারিদিকে বসন্ত পুষ্পের সমারোহ।

এমনি কৃষ্ণলীলার বহুচিত্রে মনোরম করে সাজান প্রেক্ষাগৃহ। সবকটি চিত্রই রাজপুত অথবা কাংড়া শৈলীর মাধ্যমে আঁকা। সাদা মার্বেলের দেয়ালে ভারমেলিয়ন রেড, গোল্ডেন ইয়োলো, স্কাই ব্লু, পেল গ্রে, ডিপ গ্রীন রঙের ব্যবহারে ছবি গুলো দারুণভাবে চোখে লাগে। কিন্তু আশ্চর্য! কোথাও চড়া রঙের চোখ ধাঁধান ব্যবহার নেই। সব ছবিতেই একটা কোমল লাবণ্য মাখান।

ছবির ভেতর রাধার চোখমুখের অভিব্যক্তি চেয়ে চেয়ে দেখার মত। প্রেমা তাই দেখছিল আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা শ্রীমতী রাধায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল। বিপ্রলব্ধা রাধার ছবি দেখতে দেখতে প্রেমার বুক ঠেলে ঠেলে উঠে আসছিল একটা ব্যাথার ঢেউ। সে ঢেউ ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল তার চোখের পাতা।

জয়কিষণ ছবিগুলোর ইতিহাস বলে যাচ্ছিলেন। কিছু শুনছিল প্রেমা। অনেক কথাই আবার তার কানে যাচ্ছিল না। নাচ শেখার শুরুতেই প্রায় জয়দেবের গীত-গোবিন্দের সঙ্গে তার পরিচয়। দক্ষিণ ভারতের শিল্পীদের কাছে জয়দেব বহু দিনের আত্মীয়। কেরালার মোহিনী আট্যমের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণরাধার লীলারঙ্গের যোগ অনেকখানি। তাই রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ জয়কিষণের মুখ থেকে শোনার দরকার ছিল না প্রেমার। তবু জয়কিষণের কথা বলার ভঙ্গিতে আকৃষ্ট হচ্ছিল প্রেমা।

এক জায়গায় এসে প্রেমা থমকে দাঁড়াল। দেয়ালের মাঝ বরাবর একটা হালকা লাল চুণার স্টোনের পিলার। তার সারা দেহ ভাস্কর্যে খোদিত। ফুললতা বিতানের তলায় পদচারণার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে লীলাবতী নর্তকী। উদ্ধত বুকের ওপর দিয়ে বাহু প্রসারিত করে দুই হস্তে ধৃত কেশপাশ বেণীবদ্ধ করে চলেছে। অভিসারে বিলম্ব না হয় তাই কবরী রচনার সঙ্গে সঙ্গে পথচলা।

এমনি অডিটোরিয়ামের চারটি পিলারে চার নায়িকা মূর্তি। কটি ও পদ বিভঙ্গে, বাহুমুদ্রায় ললিত নৃত্যের ছন্দ রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় গোলাপী আভার মসৃণ পাথরে মূর্তিগুলো মনে হচ্ছে জীবন্ত।

জয়কিষণ বললেন, বর্তমান উড়িষ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ভুবনেশ্বর মহাপাত্রের হাতের স্পর্শ আছে এ মূর্তিতে।

প্রেমা বলল, এ মূর্তি কিন্তু বেলুরের নর্তকী মূর্তির অনুকরণে তৈরি। আমাদের কলাকেন্দ্রমে নাচ শেখার সময়ে ভারতের মন্দির-ভাস্কর্য দেখে বেড়াতে হয়েছে। অবশ্য একথা স্বীকার করব মূর্তির অলংকরণের কোন কোন ক্ষেত্রে কলিঙ্গ ভাস্কর্যকে বেলুরের মূর্তিগুলি অতিক্রম করে গেলেও মুখের অভিব্যক্তির দিক থেকে বিচার করলে ভারত-ভাস্কর্যে কলিঙ্গের শিল্পীরা অদ্বিতীয়। আমার তো মনে হয় বেলুরের মূর্তিগুলোর অঙ্গবিভঙ্গের সঙ্গে কলিঙ্গমূর্তির একসপ্রেশান যুক্ত হলে ভারত-ভাস্কর্যের নবদিগন্ত খুলে যাবে।

জয়কিষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন প্রেমার দিকে। নৃত্যের বাইরে অন্য একটি শিল্পকে এমন করে স্টাডি করা তো সাধারণ শিল্পীর কাজ নয়।

জয়কিষণ বললেন, তোমার নাচ কেন যে এমন করে দর্শকের চোখের দ্বার পেরিয়ে একেবারে হৃদয়ে পৌঁছে যায় তা বুঝতে পারলাম। যে কোম শিল্পীরই অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে স্টাডি করা দরকার।

প্রেমা লজ্জা পেল জয়কিষণের প্রশংসায়। তবু সে বলল, মাধবী আম্মা আমাদের নাচ শেখানোর সময়ে এক-একটা অনুকরণীয় একসপ্রেশান দেখিয়ে বলতেন, আমাকে অতিক্রম করে যাও।

বলতাম, অসম্ভব আম্মা।

অমনি মাধবী আম্মা ক্ষেপে গিয়ে বলতেন, ভারতের মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে তাহলে কি দেখলে এতদিন। ঠোঁটের কোনায় শিল্পীর কুশলী হাতের আঁচড়ে হাসি ফুটে উঠতে দেখনি? চোখের চাহনিতে? কামনার কান্না দেখনি? নিজেদের সেই সব মূর্তি বলে কল্পনা করে নাও। তবে আমাকে ছাড়িয়ে উঠতে পারবে।

মুখ নীচু করে থাকতাম। গুরুকে বড় বলে ভাবতেই শিখেছিলাম। তাঁকে অতিক্রম করে যাবার কথা ভাবতে পারতাম না।

একদিন সমুদ্রের ধারে আমাদের কজনকে নিয়ে বসেছিলেন মাধবী আম্মা! হালকা মেজাজে নানা রকম গল্প করতে করতে হঠাৎ বললেন, আমি একবার আমার গুরুর সঙ্গে একই মঞ্চে নাচতে নেমেছিলাম। প্রায় সব কটিই সোলো পারফরমেন্স। গুরু কুঞ্জকুট্টি আম্মা একটি নাচ নেচে এলে আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে ভিন্ন একটি নাচ পরিবেশন করছিলাম। বয়েস কম। তাই ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে মাতোয়ারা। অনুষ্ঠানের মাঝে উৎসাহীরা একবার স্টেজের ওপর উঠে এসে আমাকে ঘিরে এমন অভিনন্দন জানাতে লাগল যে আমি একেবারে দিশেহারা।

ওরা ফিরে গেলে আবার নাচ শুরু হল। নাচছি পাখির ডানার মত হালকা দুটো হাতকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে। সারা দেহটা ঘুরছে একটা ঘূর্ণির মত। আমার চোখে মুখে ফুটে উঠছে বর্ষা বসন্তের লীলা! প্রশংসা-ধ্বনির সঙ্গে করতালি মিশে দারুণ উন্মাদনা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আমি রাজহংসীর মত উদ্ধত নৃত্য-ভঙ্গিমায় ঢুকলাম উইংস পেরিয়ে গ্রীন-রুমের ভেতর।

পরবর্তী নাচ গুরু কুঞ্জকুট্টি আম্মার। আর এটিই ছিল অনুষ্ঠানের শেষ নাচ। ঘোষক আড়ালে থেকে তাই ঘোষণা করলেন।

অমনি অডিটোরিয়াম ভেঙে পড়ল চীৎকার ধ্বনিতে। আমরা মাধবীকে চাই। মাধবীর নাচ দেখে তবে ফিরব।

গ্রীনরুমে কুঞ্জকুট্টি আম্মা তখন শেষ অনুষ্ঠানের সাজে নিজেকে সাজিয়ে তুলছিলেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে বসে চেয়েছিলাম তাঁর মুখের দিকে। তিনি চোখের কোণে কাজলের টান টানছিলেন। ওদের চীৎকার আমাদের কানে এসে পৌঁছল। আমি সে শব্দে চমকে উঠলাম। একি! আমার গুরুর নাচ দিয়ে শেষ হবে অনুষ্ঠান। ওরা কি পাগল হয়ে গেল নাকি!

সমানে তখন চীৎকার উঠছে দর্শক আসন থেকে।

আমি স্পষ্ট দেখলাম, কাজলের স্টিক চোখের কোণে থেমে গেছে কুঞ্জকুট্টি আম্মার। আমি নিজেকে তাঁর এই অসম্মানের কারণ ভেবে দুহাতে চোখ ঢেকে ফেললাম। আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। বুক ঠেলে কান্নার ঢেউ উঠে এল। আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

কুঞ্জকুট্টি আম্মা আমাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে বললেন, ছিঃ পাগলী কাঁদছিস কি রে! আজ এতদিন পরে আমি তোর কাছে গুরুদক্ষিণা পেলাম।

তখন কান্নায় আমার মুখবুক ভেসে যাচ্ছে। আমি ক্রমাগত বলে চলেছি, আমি আর নাচব না। কোনদিনও নাচব না।

কুঞ্জকুট্টি আম্মা আমার কান্না ভেজা মুখ খানা জোর করে দুটি হাতের পাতায় তুলে ধরলেন। আমি চেয়ে দেখলাম, তাঁর চোখে জল টলমল করছে, কিন্তু মুখে এক অপার্থিব হাসি। আমাকে তাঁর দিকে তাকাতে দেখে বললেন, তুই আমার সন্তান মাধবী। গুরু পিতা, গুরু মাতা। আজ আমার এতদিনের এত শ্রমের মূল্য মিলেছে। আমার কন্যা আমার শিষ্যা আমাকে অতিক্রম করে গেছে। এর চেয়ে বড় পুরস্কার জীবনে আর পাব না রে। এ আমার হার নয়, এ আমার বিজয় গৌরব।

তিনি আমার চোখের জল মুছিয়ে আমাকে সোনালী আলোর রঙের একটি কাঞ্জিভরমে সাজালেন। নিজে পরেছিলেন একটি নীলাম্বরী শাড়ি। আমাকে সাজিয়ে তিনি বুকের কাছে টেনে নিয়ে ছোট্ট মেয়ের মত চুমু খেয়ে বললেন, আমার নীল শাড়ির সঙ্গে এই সোনালী হলুদ শাড়িখানা কি সুন্দর মানিয়েছে। নীল আকাশের বুকেই তো সোনালী আলোর খেলা রে। আজ থেকে আমি বসে বসে তোর খেলাই দেখব।

আমাকে নাচের মুদ্রায় আহ্বান করতে করতে কুঞ্জকুট্টি আম্মা মঞ্চের মাঝখানে নিয়ে গেলেন। তারপর তিনি করজোড়ে নাচের বিশেষ মুদ্রায় দাঁড়ালেন। আমি জোড়হস্তে উপবেশন মুদ্রায় তাঁর চরণ তলে বসলাম। তিনি দর্শকদের দিকে চেয়ে বললেন, আপনারা আজ মাধবীকে গ্রহণ করে আমাকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারই দিয়েছেন। শিষ্য আর সন্তানের কাছে পরাজয়ে গ্লানি নেই। আছে শুধু জয়ের আনন্দ। আপনারা আমাকে আজ সেই দুর্লভ আনন্দই দিয়েছেন। আমি আজ আমার মাধবীকে আপনাদের সামনে রেখে যাচ্ছি। সে যেন আপনাদের অফুরন্ত ভালবাসার মর্যাদা রাখতে পারে।

কুঞ্জকুট্টি আম্মা নমস্কার করে সরে যেতে চাইলে দর্শক আসনের সবাই হাত জোড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা আপনাকে স্টেজ ছেড়ে চলে যেতে দেব না। আজ দ্বৈত নাচেই আসরের সমাপ্তি ঘটুক।

থামল প্রেমা। মাধবী আম্মার মুখখানা তার চোখের ওপর স্পষ্ট ভেসে উঠল। হঠাৎ তাঁর মনে হল, মাধবী আম্মার অবয়ব যেন অন্য কোন মধ্যবয়সী নারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। ইনি কে ? ইনিই কি মাধবী আম্মার গুরু কুঞ্জকুট্টি আম্মা!

প্রেমা এবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল। তার গৌরদেহ মাধবী আম্মার শ্যামল দেহবর্ণে পরিণত হয়েছে। বহু বছর আগের এক অসাধারণ শ্যামাঙ্গী তরুণী নর্তকী ধীরে ধীরে তার মধ্যে জেগে উঠেছে।

একটা আচ্ছন্ন ভাবের ভেতর কতক্ষণ কেটে গেল প্রেমার। সে তাকিয়েছিল মঞ্চের দিকে। সে দেখছিল স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে গুরু আর তাঁর পায়ের তলায় যুক্ত করে উপবেশন মুদ্রায় বসে আছে তরুণী শিষ্যা।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে জল এল প্রেমার। চোখের জলে ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে গেল মঞ্চের ওপরের দুটি মূর্তি।

জয়কিষণ প্রেমার পাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ্য করছিলেন। তিনি একবার আস্তে ডাকলেন প্রেমার নাম ধরে। কিন্তু তদ্গত প্রেমার কানে সে ডাক পৌঁছল না।

কিছুক্ষণ পরে প্রেমা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। সে তাকাল জয়কিষণের দিকে। সলজ্জ একটা হাসি বর্ষণক্ষান্ত আকাশের বুকে কোমল করুণ রোদ্দুরের মত ফুটে উঠল তার মুখে।

শেষ হল মধুরাস। নিমন্ত্রিত দর্শকেরা দারুণভাবে অভিনন্দন জানাল প্রেমাকে। ভারত নাট্যমের শেষ পর্বে যখন সে সিঁদুর রাঙা শাড়িতে দেহ আবৃত করে গোলাপের পাপড়িতে বেণী বন্ধন করে নমস্কারের মুদ্রায় নাচতে নাচতে থেমে দাঁড়াল তখন মধুবন্তীর নাটমণ্ডপ ভেঙে পড়ল করতালির ধ্বনিতে।

যবনিকা পড়ল। দলে দলে বিশিষ্ট দর্শকেরা অভিনন্দন জানাতে এলেন। তাঁরা অকুণ্ঠভাবে বলে গেলেন, এই মঞ্চে কয়েক বছর ধরে ভারতের যে সকল গুণী শিল্পী নৃত্য পরিবেশন করে গেছেন তাঁদের নাচ দেখার সৌভাগ্য তাঁদের হয়েছে, কিন্তু আজকের নাচ অবিস্মরণীয়।

প্রেমা রোমাঞ্চিত হয়েছে। তবু হাত জোড় করে বলেছে, দয়া করে এভাবে প্রশংসা করবেন না। ওঁরা সকলেই আমার নমস্য শিল্পী।

যবনিকা আবার উঠেছে। এবার মঞ্চে দাঁড়িয়েছে প্রেমা। সুসজ্জিতা দোলন ড্রিমল্যাণ্ডের পরীর মত গোলাপী একখানা ফ্রক পরে হাতে রুপোর ট্রে নিয়ে উইংসের ভেতর দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে প্রেমার পাশে। মায়ের স্মৃতির স্মারক চিহ্ন দেবার ভার প্রতি বছর পড়ে তারই ওপর।

রুপোর ট্রে নীচে নামিয়ে সে তার থেকে তুলে নিয়েছে সোনার তারের কাজ করা সুদৃশ্য মুকুট। চুণী আর পান্নার সেটিংয়ের মাঝখানে একখণ্ড কমল হীরে জ্বল জ্বল করছে।

প্রেমা একবার বিজয়িনীর হাসি হাসল। কিন্তু পরক্ষণেই মাথা নত করল শ্রদ্ধায়। আর দোলন নিপুণ হাতে প্রেমার মাথায় পরিয়ে দিল সে মুকুট।

আবার করতালিধ্বনি আর উল্লাসের শব্দে আলোড়িত হল নাটমণ্ডপ। সঙ্গে সঙ্গে সে বছরের মত মধুবন্তীর নৃত্যমঞ্চে নেমে এল শেষ যবনিকা।

দর্শকেরা চলে গেছেন। গায়ক বাদকের দলও চলে গেছে অতিথি ভবনে। শুধু থেকে গেছেন জয়কিষণ, প্রেমা আর দোলন। তারা এখন বসেছে নাটমণ্ডপের পেছনে শালবীথির তলায় বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে। এদিকে জোরাল আলোর চমক নেই। সবুজ কটি বাল্ব থেকে যে আলো ঝরে পড়ছিল তা ভারী স্নিগ্ধ আর সুখকর। তবে তা নীচের অন্ধকারকে তরল করে দিলেও একেবারে দূর করতে পারে নি।

নাটমণ্ডপের পাশেই পোশাক পরিবর্তনের ঘর। ঝকঝকে বাথরুম। প্রেমা গীজার চালিয়ে গরম জল করে স্নান সেরে নিয়েছে। পোশাক বদলে ঝরঝরে মনে হচ্ছে এখন। সাদা পোশাকে প্রেমাকে শ্বেতপাথরের গ্রীক কোন মডেল বলে মনে হয়। গা এলিয়ে গল্প করতে বেশ লাগছে এখন। একটু আগেই গরম কফি খেয়েছে।

প্রেমা কথায় কথায় বলল, এত মূল্যবান উপহার পাবার মত যোগ্যতা আমার আছে বলে আমি মনে করি না। আমার কিন্তু ভীষণ সংকোচ হচ্ছিল উপহার পেয়ে।

জয়কিষণ বললেন, খুশী হও নি?

খুশী যে একেবারে হইনি তা বলব না তবে অস্বস্তি বোধ করেছি অনেক বেশি।

তুমি তৃপ্তি না পেলে মধুবন্তীর আত্মা আজকের এই অনুষ্ঠানে অতৃপ্ত থেকে যাবে প্রেমা।

প্রেমা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, তৃপ্তি পাইনি এমন কথা তো বলি নি। তবে এ আমার সৌভাগ্যের অতিরিক্ত।

দোলন বলল, দিল্লী থেকে তোমার নাচ দেখে ফিরে এসে আমি আর বাবা এ বছরের অনুষ্ঠানের জন্যে এই উপহার দেব বলে ঠিক করেছিলাম।

প্রেমা বিস্ময়ের গলায় বলল, প্রতি বছর এমন বহুমূল্য উপহার দেওয়া বোধ করি লালসিয়া স্টেটের কুমারবাহাদুরের পক্ষেই সম্ভব।

জয়কিষণ বললেন, প্রতি বছরের পুরস্কারের সঙ্গে এ বছরের কোন মিলই রাখেনি দোলন। সে নিজেই এবারকার পুরস্কারের বস্তুটি নির্বাচন করেছে।

দোলন বাবার মুখের ওপর তার খুশী খুশী চোখের দৃষ্টি ফেলে বলল, তোমার মত নিয়েই তো প্ল্যানটা করেছি বাবা।

জয়কিষণ মেয়েকে ইসারায় সম্ভবত আর বেশি কিছু বলতে বারণ করলেন। বাবা আর মেয়ের ইসারাটুকু প্রেমার চোখ এড়াল না।

প্রেমা বলল, নির্বাচন যার দ্বারাই হোক উপহার শুধু দামে নয় রুচিতেও অসাধারণ। আমি নিখুঁত করে দেখার সুযোগ এখনও পাইনি তবে এক ঝলকেই উপহারদাতার শিল্পরুচিকে প্রশংসা না করে

পারি নি।

দোলন হঠাৎ বলল, আমার মা ওটা পছন্দ করে তৈরি করিয়েছিলেন আন্টি। মায়ের সব কিছুর ভেতর দারুণ রুচির পরিচয় আছে। এই যেমন মায়ের প্ল্যানে তৈরি নাটমণ্ডপ। ভাল লাগে নি তোমার?

এত ভাল লেগেছে যে ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারব না দোলন।

জয়কিষণ তাকিয়েছিলেন মেয়ের দিকে। দোলন তাঁদের ভেতরের কোন সিক্রেট যাতে ফাঁস করে না ফেলে সেই জন্যে স্থির চাহনির ভেতর দিয়ে নীরব শাসন।

ওদের একটু দূরে এসে দাঁড়াল পরিচারিকা। দোলন-মহলে এই ছিমছাম পরিচ্ছন্ন তরুণী মেয়েটি তার আচার আপ্যায়নে প্রেমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কুমারবাহাদুরের সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়াতে সে স্বভাবতই সংকোচ বোধ করছিল। দোলন উঠে গিয়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে কি যেন কথা বলল তার সঙ্গে। ফিরে এসে প্রেমাকে বলল, ভেরি সরি আন্টি এখুনি তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আঙ্কেল এখন আমাকে ভায়োলিন বাজিয়ে শোনাবেন।

প্রেমা বলল, উনি কি রোজ তোমাকে এ সময় শোনান?

শুধু এই রাসের দিনটিতে। যখন সব অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায় তখন আঙ্কেল তাঁর কাছে বসিয়ে আমাকে বাজনা শোনান।

আচ্ছা তাহলে তো তোমাকে শুনতেই হবে দোলন। আমি চলে যাবার আগে তোমার আঙ্কেলের বাজনা শুনব কিন্তু।

এখনি চল না আমার সঙ্গে।

এই মুহূর্তে প্রেমার বড় ক্লান্ত লাগছিল। সে সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, চল যাওয়া যাক।

কুমার জয়কিষণ প্রেমার অনিচ্ছুক সম্মতিটুকু লক্ষ্য করে বললেন, এইমাত্র আন্টি নাচ শেষ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দোলন। অন্য একদিন নিয়ে যেও আঙ্কেলের কাছে।

দোলন মেয়েটির স্বভাবে একটা আকর্ষণীয় মাধুর্য আছে। সে কাউকে আঘাত দিতে চায় না তার জেদ দেখিয়ে। বয়োজ্যেষ্ঠ পরিচারিকাদের ওপর কঠোর আদেশ জারি করে সে কখনো তার মনের সুকুমার সৌন্দর্যের হানি ঘটায় না। তবু তার কিশোরী অবয়বের কোথায় যেন একটা ব্যক্তিত্ব আছে। যাকে অবহেলা করা বা এড়িয়ে চলা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

বাবার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠল দোলন। যেন প্রস্তাবটা দিয়ে সে অন্যায় করে ফেলেছে এমনি একটা সংকোচের ছবি ফুটে উঠল তার মুখে। বলল, তুমি ঠিক বলেছ বাবা। আমি অন্য দিন নিয়ে যাব।

প্রেমা তাকে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সে ততক্ষণে পরিচারিকাটির সঙ্গে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিয়েছে। যেতে যেতে বলছে, আজ নয়, কোন মতেই আজ নয় আন্টি।

ওরা চলে গেলে প্রেমা সিধে হয়ে বসে বলল, তুমি আমাকে বাধা দিলে কেন জয়কিষণ। দোলন মনে মনে হয়ত কষ্ট পেল।

একটুও না। মনে আর মুখে বলতে পার ও একটু বেশি রকমেই এক। আর তাছাড়া এখন তোমার বিশ্রামের দরকার।

প্রেমা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল আবার। বলল, নাচে সারা শরীরে একটা তোলপাড় চলতে থাকে। সুখ-দুঃখের এক্সপ্রেশানগুলোতেও মনের ওপর চাপ পড়ে খুব বেশি। তবে শিল্পসৃষ্টির আনন্দ সব কিছুর ওপর দারুণ একটা তৃপ্তি এনে দেয়।

জয়কিষণ বললেন, তুমি মোহিনী আট্যম আর ভারত নাট্যমের মাঝখানে যখন সেই ইয়ার রিং খোঁজার অভিনয় করতে করতে স্টেজ থেকে নেমে এসেছিলে তখন আমরা কেউ ভাবতেও পারিনি যে তুমি অভিনয় করছ। তোমার চোখেমুখে প্রিয়বস্তু হারানোর দুঃখ, প্রাপ্তির সম্ভাবনা, আশানিরাশার দোলা সবকিছু মিলে সে এক অবর্ণনীয় এক্সপ্রেশন।

প্রেমা বলল, আমার গুরু মাধবী আম্মা এই উপভোগ্য অনুষ্ঠানটুকুতে যে রকম কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন তার শত ভাগের এক ভাগও যদি আমি দেখাতে পারতাম তাহলে তোমার আমন্ত্রিত অতিথিরা

সত্যিকারের কিছু দেখতে পেতেন।

তুমি খুব বেশি রকমের গুরুভক্ত প্রেমা।

সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?

আমি কিন্তু তোমাকে কোন রকম পরিহাস করতে চাই নি প্রেমা, আমি শুধু সত্যটুকুই প্রকাশ করতে চেয়েছি।

প্রেমা বলল, তোমার স্ত্রীর বুক সেল্‌ফে ইন্ডিয়ান আর্টের ওপর একখানা বই আছে। তাতে প্রত্যক্ষদর্শী লেখকের দারুণ একটা বর্ণনা দেখতে পাবে। পড়ে দেখো।

কিসের বর্ণনা প্রেমা?

এই যে আমাকে যে নাচটির ওপর কমপ্লিমেন্ট দিলে সে নাচটি সম্বন্ধে। আর আমার গুরুই সে নাচ তাঁর যৌবনে নেচেছিলেন। দর্শক ছিলেন ঐ গ্রন্থের লেখক স্বয়ং।

জয়কিষণ হেসে বললেন, আমি জানি তোমার গুরু কত বড় শিল্পী। তবু বলব তুমি তোমার নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন নও।

একটু কি ভেবে নিয়ে প্রেমা বলল, থাক ও প্রসঙ্গ। কিন্তু জয়কিষণ সত্যি করে আমাকে একটা কথা বলবে?

আমি বুঝি সব কথাই বানিয়ে বলি?

অমনি রাগ হয়ে গেল তো!

আচ্ছা বল কি বলতে চাও।

আমাকে আজ যে বস্তুটি দিয়ে সম্মানিত করলে সেটি কি তোমার স্ত্রীর জিনিস?

তুমি বুদ্ধিমতী প্রেমা। দোলনের কথার ভেতর থেকে সবকিছু আঁচ করে নিয়েছ।

এবার আর একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?

বল।

কেন তোমার স্ত্রীর এত সখের জিনিসটা আমাকে দিলে?

আমি তো দিই নি। দোলন তার মায়ের জিনিস তোমাকে ভালবেসে দিয়েছে।

অন্য দিকে চেয়ে চুপ করে রইল প্রেমা।

কিছুক্ষণ পরে জয়কিষণের মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, তোমার সম্মতি ছিল না এই উপহারে?

খুব কঠিন প্রশ্ন করে বসলে প্রেমা। সম্মতি ছিল না একথা কি করে বলি। তবে পরিকল্পনাটা এসেছে দোলনের কাছ থেকে। আর ওর মায়ের জিনিসে একমাত্র ওরই অধিকার। তাই আমি ওকে বাধাও দিই নি।

প্রেমা আবার প্রশ্ন তুলল, যদি দোলনের না হয়ে ওটা তোমার অধিকারে থাকত তাহলে পারতে এমন করে স্ত্রীর আকাঙক্ষার জিনিসটাকে একজন স্বল্পপরিচিতা নর্তকীর হাতে তুলে দিতে?

জয়কিষণ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। একসময় বললেন, তোমার আমার পরিচয় যে খুব বেশি দিনের নয় তা ঠিক, তবে তোমার নাচের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক গভীর। তোমার মনের স্রোতের আঁক-বাঁক সম্বন্ধে এখনও আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম কিন্তু তোমার নাচের প্রতিভার ওপর একটা যথাযথ প্রবন্ধ লেখা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে খুব একটা অসম্ভব কাজ নয়। এবার আসল কথায় আসা যাক। উপহারটা প্রেমা মেনন নামের একজন সুন্দরী তরুণীকে দেওয়া হয়নি, হয়েছে একজন প্রতিভাময়ী নর্তকীকে।

থামলেন জয়কিষণ। প্রেমা বলল, আমার আসল প্রশ্নের জবাব কিন্তু এখনও পাইনি।

প্রশ্নের ভঙ্গিতে তাকালেন জয়কিষণ।

প্রেমা আবার বলল, স্ত্রীর এমন প্রিয় বস্তুটি তোমার হেফাজতে থাকলে তুমি কি পারতে ওটা আমাকে দিতে?

একটু চিন্তা করে জয়কিষণ বললেন, আমি মানুষ প্রেমা, তাই শুধু নাচ ভালবাসি বললে মিথ্যে বলা হবে। নাচের সঙ্গে সঙ্গে নর্তকীকেও ভাল লেগে যায়। আর ভাল লাগার জনকে তো সব কিছু দিতেই

ইচ্ছে করে।

প্রেমা অমনি বলল, এই মুহূর্তে মধুবন্তী আমাদের মাঝখানে থাকলে পারতে তুমি এমন কথা বলতে ?

জয়কিষণ বললেন, কথাটা তো মিথ্যে নয় তবে স্ত্রীর সামনে এমন এক গুণী নর্তকীকে এই সত্যি কথা বুক ঠুকে বলতে পারতাম এমন কথা হলপ করে বলি কি করে।

প্রেমা অন্যমনস্কভাবে বলল, আমার ভাবতেই কেমন কষ্ট লাগছে।

কিসের কষ্ট প্রেমা?

তোমরা বাবা আর মেয়েতে যুক্তি করে মধুবন্তীর স্মৃতিটুকু আমার হাতে তুলে দিলে।

আগেই তো বলেছি প্রেমা এতে মধুবন্তীর আত্মা তৃপ্তি পাবে। আমি বিশ্বাস করি আমার মনের ভেতর বেঁচে থাকার চেয়ে একজন গুণী শিল্পীর স্মৃতির ভেতর বেঁচে থাকতে পারলে তার আত্মা তৃপ্ত হবে বেশি।

প্রেমা বলল, আমি তোমাদের পরিবারের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছি জয়কিষণ। তুমি আমার চেয়ে বড় তাই আশীর্বাদ কর যেন তোমাদের এই দানের মর্যাদা আমি রাখতে পারি।

প্রেমা জয়কিষণের জানু স্পর্শ করতে যাচ্ছিল, জয়কিষণ উঠে দাঁড়িয়ে প্রেমার দুটো হাত ধরে ফেললেন।

আমাকে এতখানি মর্যাদা দিও না প্রেমা। একজন প্রতিভাধর শিল্পীকে শুধু বয়সের দাবীতে আশীর্বাদ জানাব এমন গুরুজন আমি নই। তবে আজ তোমার দুটো হাত আমার হাতের ভেতর ধরা রয়েছে। শুধু এই অন্তরঙ্গতার দাবীতেই বলব, তুমি আমার অতি প্রিয় শিল্পী। জীবনে কোনদিন তোমার কোন প্রয়োজনে আসতে পারলে আমি দারুণ তৃপ্তি বোধ করব।

প্রেমাকে তার চেয়ারে বসালেন জয়কিষণ। নিজে প্রেমার পাশের চেয়ারটিতে বসলেন।

এক সময় কোমল আলোছায়ার রহস্যময়তার ভেতর প্রেমাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে জয়কিষণ বললেন, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ প্রেমা। চল বিশ্রামের আয়োজন করা যাক।

তেমনি চেয়ারে গা এলিয়ে বসে প্রেমা বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দিল জয়কিষণের দিকে। চোখ দুটি কিন্তু রইল ভ্যালির দিকে যেখানে কুয়াশার স্তূপের ওপর চাঁদের আলো মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে।

জয়কিষণ প্রেমার বাড়িয়ে দেওয়া হাতখানা ধরলেন। ছোট ছোট বাক্যহারা খেলায় কখন মেতে উঠল অবাধ্য আঙুলের প্রেমের লীলায় এই আঙুলের ভূমিকাই বোধহয় সর্বাধিক। পত্র রচনা থেকে হাতে হাতে শব্দহীন কথকতার অননুভূত বিদ্যুৎস্পর্শ এই আঙুলগুলির দান।

কতকগুলো প্রহর এমনি হাতে হাত রেখে কেটে গেল। দুজনে নির্বাক। দুটি মনের ভেতর শুধু আলোড়ন। প্রেমার স্মৃতি থেকে এই মুহূর্তে মুছে গেছে দেবন, যার জন্যে সে সবকিছু উজাড় করে দিতে পারে। তার যৌবন তার সম্পদ এমন কি তার অভাবনীয় জনপ্রিয়তা। যে দেবনকে সে তার শিল্পী জীবনের সঙ্গী বলে ভাবতে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সেই আশ্চর্য প্রতিভাধর নর্তক যেন কোনদিন তার জীবন মঞ্চে দেখা দেয় নি এমনি এক অপরিচয়ের কুয়াশা তার স্মৃতিকে এই মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

সাগরপারের যে পাখিটি নীল আকাশে ডানা ভাসিয়ে একদিন উড়ে এসেছিল কোভালম বীচের সবুজ নারিকেল কুঞ্জে, যার সোনালী ডানার আড়ালে একদিন প্রেমা অননুভূত উত্তাপের স্বাদ পাবার জন্যে হারিয়ে গিয়েছিল, সেই সিন্ধুপারের পাখিও আজ আর তার স্মৃতির আকাশে নেই। এখন তার পূর্ণ তরুণী দেহের তটে আছড়ে পড়ছে যে ঢেউ, রোমাঞ্চিত বিস্ময়ে সেই উদ্দাম স্পর্শগুলো সে এখন অনুভব করছে। তার মনে হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ-এ গা ভাসিয়ে দিয়ে যে বলিষ্ঠ পুরুষ এগিয়ে আসছে, তটভূমি স্পর্শ করতে তার বেশি বিলম্ব নেই। দুটি বাহু বুক সর্বাঙ্গ দিয়ে সে পুরুষ আলিঙ্গন করবে নরম চিক্কণ সোনালী দেহ। প্রেমার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। থরথর করে কাঁপতে লাগল। তীব্র একটা উত্তাপের ছোঁয়ার জন্যে সে যখন সতৃষ্ণ দুটো চোখের দৃষ্টি ফেলল জয়কিষণের মুখের ওপর তখন দেখল আশ্চর্য প্রশান্ত দুটি চোখ তার দিকেই চেয়ে আছে। সে চোখে আগুনের লকলকে শিখার

মত ক্ষুধার চিহ্ন নেই। ঐ নীল আকাশের পূর্ণ চাঁদের মত তার দুর্বার আকর্ষণ। সে আকর্ষণে উত্তাল হয়ে আছড়ে পড়ে সাগরের ঢেউ, কিন্তু আকর্ষণকারীর চিত্তের সামান্যতম আলোড়নও চোখে পড়ে না।

প্রেমা বলল, কি দেখছ আমার দিকে চেয়ে?

উত্তেজনায় গলা কেঁপে গেল প্রেমার।

জয়কিষণ বললেন, গাছের পাতার একটা ভারী সুন্দর ছায়া পড়েছিল তোমার মুখের ওপর। খানিক আলো খানিক ছায়া এতক্ষণ লুকোচুরি খেলা খেলছিল। আমি তাই অবাক হয়ে দেখছিলাম। এখন যেই মুখ তুলে তাকালে অমনি খেলা ফেলে ওরা পালাল।

রুদ্ধ একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল প্রেমার বুক ঠেলে। আর ঐ নিঃশ্বাসের মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমার মনের উত্তাল ঢেউগুলোও হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল।

প্রেমা বলল, জান জয়কিষণ পরিবেশ মানুষের মনে আশ্চর্য রূপান্তর ঘটিয়ে দেয়। আমার তো মনে হয় পরিবেশ যেন এক নিপুণ যাদুকর। সে তার যাদুদণ্ড দুলিয়ে তোমার চৈতন্যটুকু লুপ্ত করে দিয়ে তার ইচ্ছেমত কাজ তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেবে। সে যখন সরে যাবে আর তুমি চেতনা ফিরে পাবে তখন নিজের বোকামীর কথা ভেবে তুমি নিজেই লজ্জা পাবে।

জয়কিষণ চাঁদের আলো ধোয়া দূর উপত্যকার রহস্যময়তার দিকে চেয়ে বললেন, ঠিকই বলেছ প্রেমা। আজ পরিবেশ সত্যি যাদুকর সেজেছে। আজ যদি ও আমাদের সমাজ সংসার বিবেককে মিথ্যে করে দেয় তাহলে লজ্জা পাবার কিছু নেই।

প্রেমা তখন আর ভাবনার জগতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। সে পরিবেশের কথা চিন্তা করতে করতে অনেক দূর চলে গেছে।

হঠাৎ প্রেমা বলল, একদিন দাঁড়িয়েছিলাম আরব সাগরের ধারে। দমকা বাতাস ধেয়ে এল। ঘনিয়ে উঠল মেঘ। কতকগুলো পাখি মেঘের সঙ্গে উড়তে লাগল। বাতাস ওদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল কতদূর তারপর বাতাস থামলে ওরা পাখা টেনে চক্কর দিতে লাগল। সে এক আশ্চর্য খেলা। আমি পাখি হয়ে গেলাম। আমার হাত দুটো ডানার মত বাতাসে ভাসিয়ে ভেজা বালির ওপর দিয়ে আমি দৌড়ে গেলাম কতদূর। তারপর হঠাৎ থেমে পাক দিয়ে দিয়ে ওদের মত ঘুরতে লাগলাম।

সেদিন আমার মনে হয়েছিল অনেকদিন পরে একটা শ্রেষ্ঠ নাচ নাচলাম।

জয়কিষণ বললেন, তুমি আর পরিবেশ অভিন্ন প্রেমা। বিভিন্ন পরিবেশ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের মত। তুমি উত্তেজক সুরা। যে পাত্রে আশ্রয় নাও, তারই আকার পাও তুমি।

প্রেমা উঠে পড়ে জয়কিষণের হাত ধরে টান দিয়ে ওঠাল। বলল, এসো আমার সঙ্গে একবার নাটমণ্ডপে।

খেয়ালীর খেলার পুতুলের মত জয়কিষণ প্রেমাকে অনুসরণ করে চললেন মঞ্চের দিকে।

নাটমণ্ডপে ঢুকেই প্রেমা সামনের দর্শক আসনের একটিতে বসিয়ে দিল জয়কিষণকে। নিজে সিঁড়িতে পায়ের ছন্দ এঁকে এঁকে উঠে গেল মঞ্চের ওপর। মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, হৃষিকেশের গঙ্গার নাচ দেখেছ? ঐ যেখানে বিরাট বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে গঙ্গা আঁচল উড়িয়ে পাক দিতে দিতে ছুটে চলে যায়?

জয়কিষণ বললেন, গঙ্গার ও রূপ আমার দেখা।

তাহলে মিলিয়ে নাও।

কথাটা বলেই প্রেমা নাচের ভঙ্গিতে মঞ্চের একদিকে ছুটে গেল। তারপর যেন বিরাট এক বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে আশ্চর্য কয়েকটা পাক দিতে দিতে ছুটে গেল মঞ্চের আড়ালে। বাঁ হাতে উড়িয়ে দেওয়া সাদা আঁচলখানা ঠিক যেন ছলকে ওঠা জলের একটুকরো আঁচল বলে মনে হল।

এত দ্রুতলয়ে প্রেমা নেচে চলে গেল যে জয়কিষণের মনে হল, প্রেমা সাধারণ কোন নর্তকী নয়, সে খরপ্রবাহিনী গঙ্গা।

এবার নেমে এল প্রেমা আসনের কাছে। জয়কিষণের মুখের অনেক কাছে মুখ নামিয়ে এনে বলল, কেমন দেখলে জয়?

প্রেমার হাত নিজের মুঠোয় ভরে নিয়ে জয়কিষণ বললেন, তুমি গঙ্গা প্রেমা।

নাচের পরদিনই পুরো দলটা রওনা হয়ে গেল। শুধু বাতিল হল প্রেমার যাত্রা। সারারাত দোলনের সে কি কান্না। সে জেগে বসে রইল প্রেমার বিছানার পাশে। নিজে ঘুমোতে গেল না প্রেমাকেও ঘুমোতে দিল না।

প্রেমার প্রথম প্রবোধ, আমি আসব দোলন।

না তুমি যাবে না, দোলনের গলায় বারণ উপচে উঠল।

আমি কি তোমাদের কাছে হাজার হাজার বছর থাকব বলে এসেছি? প্রেমার মনে হাসি, গলায় উত্তর শোনার কৌতূহল।

থাকবে। মোট কথা কাল তোমার যাওয়া হবে না।

আচ্ছা বেশ, রাত ভোর হতে এখন অনেক বাকি। তারপর সূর্য উঠবে। এক ঘণ্টা অন্তর ঢং ঢং ঢং ঢং করে রাজবাড়িতে চার চারটে ঘণ্টা বাজবে। তখন বেলা দশটা। গাড়ি আসবে গেস্ট হাউসে। মালপত্র বোঝাই হবে। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পালা। সে সব চুকে-বুকে যেতে প্রায় দুটোর কাছাকাছি। তারপর দলবল গাড়িতে উঠে রওনা দেবে আগে। তারা স্টেশনে পৌঁছে লাগেজ ভ্যানে মাল তুলবে কতক্ষণ ধরে। তখন ধর, বেজেছে চারটে। তোমার বাবার গাড়ি এসে দাঁড়াল আমাকে নিয়ে যেতে।

না, বাবার বাড়ি আর আসবে না। তুমিও যাবে না।

তাহলে আমার সঙ্গীরা ট্রেনে বসে কি ভাববেন বল তো?

ওঁরা খুব ভাল লোক। ওঁরা কিছুই ভাববেন না। তাছাড়া যাবার আগেই তো ওঁরা জেনে যাচ্ছেন তুমি যাবে না ওঁদের সঙ্গে।

ওঁদের সঙ্গে আমাকে না দেখলে আমার বোন খুব দুঃখ পাবে দোলন। তোমার মত রাগ করতেও পারে।

ওঁকে আনিয়ে নেব আমাদের কাছে। তোমারও দুঃখ থাকবে না। আর তোমার বোনও রাগ করবে না আর।

দারুণ মেয়ে তো তুমি, এত সহজে সব সমাধান করে দিলে। আমার বুঝি বাড়ি-ঘর নেই? সেখানে টাকা-পয়সার দরকার নেই?

কত টাকা চাই তোমার আন্টি?

হেসে ফেলল প্রেমা। বলল, তোমার বুঝি অনেক টাকা আছে, আর লোককে তাই বিলিয়ে বেড়াও?

বল না আন্টি তোমার কত টাকা চাই? কত টাকা পেলে তুমি আর আমাকে ছেড়ে যাবে না?

দোলন তার সর্বস্ব এই মুহূর্তে বিলিয়ে দিতে পারে তার আন্টির জন্যে।

দারুণ হাসি পেল প্রেমার। তবু সে গম্ভীর গলায় বলল, তা মাস গেলে হাজার পাঁচেক পেলেই চলে যাবে আমার।

বাবাকে বলে তোমাকে সব টাকা দিয়ে দেব আন্টি। তুমি কথা দাও আমার কাছে থাকবে।

প্রেমা এখনও নিষ্ঠুর। বলল, আচ্ছা, আগে তোমার বাবাকে বল, তারপর থাকা না থাকার কথা ভাবা যাবে।

দোলন অমনি বলল, বাবা ঠিক রাজি হয়ে যাবে।

প্রেমার মুখে মৃদু হাসি, মাথাটা অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে।

এক লাফে প্রেমার বিছানা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল দোলন। দরজা পেরিয়ে যেতে খেয়াল হল প্রেমার। সে চেঁচিয়ে উঠল, যাচ্ছ কোথায় দোলন, শুনে যাও।

কে শোনে কার কথা। বাবাকে এনে হাতে-নাতে সে প্রমাণ করে দেবে যে তার কথার কত দাম।

বারান্দা পেরিয়ে প্রায় দৌড়ে বাইরের মহলে গিয়ে পড়ল দোলন। বড় বড় পামগাছগুলো তিন তলায় গিয়ে ঠেকেছে। তার মাথা দুলিয়ে যেন জানতে চাইছে এমন নিশুতি রাতে এই নিষিদ্ধ এলাকায় দোলনের আগমনের কারণ।

দোলনকে দেখে রাতের পাহারাদার উঠে দাঁড়াল। দোলন ড্রয়িংরুম পেরিয়ে ঢুকে পড়ল বাবার শোবার ঘরে। দরজা ভেজান ছিল তাই বেল টিপে ওঠাতে হল না। দোলন ভেতরে ঢুকেই ডাক দিল, বাবা।

জয়কিষণ বসেছিলেন স্ত্রীর পালঙ্কে। তিনি আজ নিজের শয্যায় যান নি। ধূপ জ্বলছিল পেতলের ধূপদানিতে। শয্যার শিয়রে রানী মধুবন্তীর বাঁধান ছবিতে মালা দেওয়া। জয়কিষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন সেই দিকে।

দোলনের ডাক শুনে পেছন ফিরে তাকালেন জয়কিষণ। অসময়ে দোলনের আসাতে কিছুটা বিস্ময় চোখে মুখে ফুটে উঠল।

দোলন কাছে এসে বাবার গলা জড়িয়ে বলল, আমি আন্টিকে কথা দিয়েছি বাবা।

কোন ভণিতা নেই দোলনের কথায়।

জয়কিষণ বললেন, কথা যখন দিয়েই ফেলেছ তখন তা রাখতেই হবে।

জয়কিষণ জানতেও চাইলেন না কি কথা।

দোলন এবার বাবার একখানা হাত ধরে টান দিয়ে বলল, আমার সঙ্গে এসো না একবারটি।

জয়কিষণ বাধ্য ছেলের মত উঠে দাঁড়ালেন। দোলন তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল অন্দরমহলের দিকে।

শোবার ঘরের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালেন জয়কিষণ। মেয়েটার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। একেবারে টেনে আনল শোবার ঘরে। দোলন আবার টান দিয়ে বলল, এসো না বাবা আন্টির কাছে।

প্রেমা বিছানায় বসে জড়োসড়ো। নাইটির ওপর দামী র‍্যাপারখানা জড়িয়ে নিয়েছে সে।

জয়কিষণ বললেন, তোমার আন্টি ঘুমুচ্ছে দোলন, এখন তাকে ডিস্টার্ব করো না।

যদ্দুর সম্ভব নিজেকে আবৃত করে প্রেমা ভেতর থেকে বলল, আমি জেগেই রয়েছি। এসো ভেতরে।

জয়কিষণ সবুজ আলোর রাজ্যে ঢুকে এলেন।

প্রেমা বসতে বলল জয়কিষণকে।

জয়কিষণ বসলে প্রেমা বলল, কি খেয়ালী মেয়েই না তোমার। রাত দুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে ধরে আনল তোমাকে।

না, আমিও জেগেছিলাম। কিন্তু দোলন কাকে যেন কি কথা দিয়েছে বলে আমাকে এখানে টানতে টানতে নিয়ে এল।

প্রেমা খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, ব্যাপারটা তোমার এখনও জানা হয় নি বুঝি?

দোলন বিজ্ঞের মত হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, আচ্ছা বাবা শোন, আন্টির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, আমি যদি আন্টিকে মাসে মাসে পাঁচ হাজার করে টাকা দি তাহলে আন্টি আর দেশে যাবে না, আমার কাছেই থেকে যাবে। আমি বলেছি দেব বলে।

প্রেমা হাসতে হাসতে খাটের বাজুখানা ধরে সামলে নিল।

জয়কিষণ বললেন, এই কথা। তা তুমি যখন কথা দিয়েছ আর তোমার আন্টিও রাজি হয়েছে তাহলে তো সব ফয়সালাই হয়ে গেছে।

আন্টি, তোমাকে বলেছিলাম না, বাবা রাজি হবেই হবে।

প্রেমা বলল, হার মানছি। টাকা আমার আর চাই না। দোলন মুক্তি দিলে তবে আমার ছুটি।

দোলন এসে প্রেমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, লক্ষ্মী আন্টি। আমার স্কুল ক'দিন পরেই খুলে যাবে, তখন তোমার ছুটি। তার আগে নয়।

জয়কিষণ বললেন, যাবে প্রেমা মুসৌরী? ক'দিন সবাই মিলে ওখানে কাটিয়ে দোলনকে কনভেন্টে রেখে ফিরে আসা যাবে।

হৈ হৈ করে উঠল দোলন, দারুণ আইডিয়া বাবা। কালই যাই চল।

জয়কিষণ তাকালেন প্রেমার দিকে।

প্রেমা বলল, এখন তো আমার নিজের ইচ্ছা বলে কিছু নেই। দোলন যখন আমাকে কিনে নিয়েছে

তখন ওর ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা।

জয়কিষণ মেয়ের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। প্রেমাকে বললেন, দেখ কেমন শক্ত জালে জড়িয়েছে তোমাকে দোলন। পালাবার পথটুকুও রাখেনি।

জয়কিষণের পূর্বপুরুষ গর্গেরা কেবল বিত্তবানই ছিলেন না, তাঁরা সম্পদের সদ্ব্যবহারও জানতেন। মুসৌরীতে বিরাট গ্রীষ্মাবাস তৈরি করিয়েছিলেন তাঁরা। কোম্পানি বাগানের পথে সে এক দর্শনীয় প্রাসাদ। ছোট দুর্গের আকারে তৈরি। প্রতিটি গৃহের শীর্ষদেশ বল্লমের আকারে সূচল। সব কটি ঘরের থেকেই তুষার পাহাড়ের ছবি দেখা যায়। ওদিকে লাল টিব্বার গায়ে থরে থরে উঠে গেছে পাইনের গাছ। ভ্যালির ওপারে গীর্জা।

একটি অবাক ভুলভুলাইয়া আছে সৌধটির ভেতর। বিশেষভাবে না অভ্যস্ত হলে ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে ঘরের ভেতর ঘর আর করিডোর পেরিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসা যায় না।

নির্দিষ্ট ঘরখানাতে ঢুকেই ভারী ভাল লেগে গেল প্রেমার। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, এক টুকরো মেঘ ভ্যালির ওপারে গীর্জার চুড়োয় থমকে আছে। পাইন বনেব মাঝামাঝি একখণ্ড কুয়াশা পাতলা র‍্যাপারের মত জড়িয়ে আছে বনের গায়ে।

ছিমছাম সুন্দর ঘর। দোলন বেয়ারা দরোয়ানদের সঙ্গে কি যেন আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। তার গলার সুরেলা আওয়াজ ভেসে আসছে।

যেন গায়ে কার উষ্ণ একটা নিঃশ্বাসের ছোঁয়া লাগল। ছবি দেখায় তন্ময় প্রেমা সেই উষ্ণতার উৎস নিয়ে মাথা ঘামাল না।

পাশ থেকে কে যেন বললেন, জায়গাটা তোমার ভাল লেগেছে প্রেমা?

চমকে ফিরে চাইল প্রেমা। জয়কিষণ তার পাশে দাঁড়িয়ে।

একটা দারুণ তৃপ্তির ছবি চোখে মুখে ফুটিয়ে প্রেমা বলল, এ ভাল লাগা তো ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না জয়কিষণ। তবে এটুকু বলব, এখানে না এলে অনেক দেখাই আমার অপূর্ণ থেকে যেত।

জয়কিষণ বললেন, আমার সবচেয়ে দুঃখ এ বাড়িখানা গভর্নমেন্টকে ছেড়ে দিতে হবে।

কেন? বিস্ময়ে দুঃখে যেন ভেঙে পড়ল প্রেমা।

কেনর তো কোন জবাব নেই। অনেকদিন অনেক সুখ-সুবিধে ভোগ করার পর বলতে পার এখন একটু ত্যাগ করা দরকার।

এ তো স্বেচ্ছায় ত্যাগ নয়। দুঃখ নিয়ে সরে যাওয়া।

তোমার বিশ্বাস করতে হয়ত বাধবে, কিন্তু আমি কোন কিছুতেই আর দুঃখ পাই না প্রেমা। আর তাছাড়া আমার একার সুখের চেয়ে দেশের মানুষের যদি কিছু উপকার হয় তাহলে মন্দ কি।

একটু থেমে আবার হেসে বললেন, বড় বেশি জনহিতের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে আমার কথায়, তাই না? বলতে পার উপায়হীনের আত্মতুষ্টির চেষ্টা।

প্রেমা বলল, আইন হলেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু আমার বাড়ি হলে সরকার বাহাদুরকে একটা অনুরোধ করতাম, এখানে একটা কলাভবনের প্রতিষ্ঠা হোক। আর তা যদি একান্ত নাও হয় তাহলে আর যা হয় হোক কিন্তু সরকারী কোন অফিস নৈব নৈব চ।

শুনেছি একটা হাসপাতালের পরিকল্পনা আছে গভর্নমেন্টের।

প্রেমা সোচ্ছ্বাসে বলল, সরকার দীর্ঘজীবী হোক। হাসপাতালের পরিকল্পনাকে বরং আমরা স্বাগত জানাতে পারি।

হঠাৎ কলাভবন ছেড়ে হাসপাতালের ওপর অনুরাগী হয়ে উঠলে যে বড়?

না, আমার ফার্স্ট প্রেফারেন্স কলাভবন। তা নইলে হাসপাতালকেই চাইতে পারি একমাত্র।

কেন?

এই জানালাগুলো দিয়ে বাইরে তাকালেই রোগীদের আদ্দেক রোগ ভাল হয়ে যাবে।

জয়কিষণ প্রেমার উচ্ছ্বাসের কারণটা বুঝতে পেরে হেসে উঠলেন।

হাসছ যে?

কারণ আছে নিশ্চয়ই।

আমি কি অকারণে হাসছ বলে বলেছি।

জয়কিষণ বললেন, প্রথমত রোগ ব্যাপারটাই ভয়ের। তাই নিরুপায় না হলে মানুষ হাসপাতালে আসতে চায় না। দ্বিতীয়ত দেহের সামান্য যন্ত্রণা থাকলেও সৌন্দর্য উপভোগ সম্ভব নয়। তৃতীয় আর একটা কারণ আছে, তা হল, এখানকার রোগীরা এই প্রাকৃতিক দৃশ্যে অভ্যস্ত। তাই নতুন করে মনে সাড়া জাগানোর মত উপাদান এর ভেতর বড় একটা নেই।

প্রেমা সঙ্গে সঙ্গে তার মত বদল করে বলল, তোমার কথাই ঠিক জয়কিষণ। বড় জোর এটা আফটার কিওর রেস্ট হাউস হতে পারে।

জয়কিষণ বললেন, তুমি জান, আমি একজন ডাক্তার?

সন্দেহের চোখে জয়কিষণের দিকে তাকাল প্রেমা। বলল, শুধু ডাক্তার কেন, অনেক কিছুই হতে পার তুমি।

বিশ্বাস অবশ্য না হবারই কথা। আমাকে কোন দিন তো আর কলে বেরোতে দেখনি।

সত্যি বলছ জয়, তুমি ডাক্তার?

কোন এক জন্মান্তরে হয়ত ছিলাম, এখন নয়। এখন আমি ঘোরতর ব্যবসায়ী।

ওকথা বল না। জয়কিষণ একজন রুচিবান ব্যক্তি। সে যে প্রফেশানের হোক না কেন তাতে কি এসে যায়।

জয়কিষণ বললেন, অভয় পেলাম।

প্রেমা আর কোন কথা বলল না। মুখে হাসি ফুটিয়ে চেয়ে রইল জয়কিষণের মুখের দিকে।

খাবার পরেই প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেল দোলন আর জয়কিষণ। কথা রইল ওরা ফিরে এসে আবার বেরুবে মার্কেটের দিকে প্রেমাকে নিয়ে। প্রেমা একা রইল দুর্গ-প্রাসাদে।

নিজের ঘরে খুব বেশি সময় বন্দী হয়ে থাকতে ইচ্ছে হল না তার। সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ছোট একটা ব্যালকনিতে। চোখ গিয়ে পড়ল প্রবেশপথের ওপর। কেউ কিছু খাবার ছড়িয়ে দিয়েছে। ধবধবে সাদা আর ব্রাউন রঙের অনেকগুলো পায়রা একসঙ্গে জট বেঁধে হুটপাট করে তাই খাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর সে আবার আর একদিকে চলতে লাগল। সামনের অনেকগুলো ঘরই বন্ধ। করিডোর পেরিয়ে বাঁদিকে ঘুরে একটা ঘোরানো সিঁড়ির দেখা মিলল। সিঁড়িটা একেবারে ছাদের ওপর গেছে নাকি। ছাদ থেকে নিশ্চয় আশ্চর্য সুন্দর লাগবে চারদিকের ছবি! প্রেমা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। বেশখানিক উঠেই সিঁড়িখানা থেমে গেল এক চিলতে শ্বেতপাথরের ল্যান্ডিং-এ। প্রেমার চাঁপা রঙের দুটো পা শ্বেতপাথরের ওপর ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। যে কোন শিল্প রসিক সিঁড়ি থেকে প্রেমার পা বাড়িয়ে অবতরণ দৃশ্যটুকু মুগ্ধচোখে চেয়ে দেখত। পায়ের গোছ থেকে কাপড় ঈষৎ তুলে সুঠাম আঙুলগুলো গোলাপের পাপড়ির মত বেঁকিয়ে নাচের ছন্দে সে যেন নেমে এল শ্বেতপাথরের মঞ্চে।

কেউ ছিল না সেখানে জাত নর্তকীর প্রতিটি ভঙ্গি চোখের ক্যামেরায় ধরে রাখার জন্যে। নির্বোধ দুটো পায়রা দেওয়ালের একটা ঘুলঘুলিতে বসে অপরিচিতার দিকে ভয় মেশান কৌতূহলের চোখে চেয়েছিল।

প্রেমা সামনে ঘরখানাতে উঁকি দিল। দামী ফরাস পাতা। বোধহয় এককালে জলসাঘর ছিল এটি। দেয়ালে নানারকম বাদ্যযন্ত্র ঝোলান। কোনটি আবরণ দেওয়া, কোনটি বা নিরাবরণ, ছিন্নতন্ত্রী। ফরাসের ওপর একটি সরোদ রাখা আছে। তার পাশেই খোলা পড়ে আছে তবলা। এখানে বাতাসে ধুলোর বিশেষ কর্তৃত্ব নেই। তাই যন্ত্রগুলিতে ধুলো জমে ওঠেনি। আর তাই বোঝাও গেল না কতদিন আগে যন্ত্রী তাঁর শেষ রজনীর বাজনা বাজিয়ে গেছেন এই রাজবাড়ির জলসাঘরে।

প্রেমার মনে হল আবছা আলো অন্ধকারে হঠাৎ বাজনাগুলো বেজে উঠল। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই বিচিত্র সব সুর শুনতে লাগল। কিন্তু কোন শিল্পীকে তার চোখের সামনে দেখতে পেল না।

ঘোর কাটল এক সময়। আবার পা চালাল সামনের দিকে। এবার আঁকাবাঁকা সব বারান্দা।

বারান্দার দেয়াল-সংলগ্ন অনেকগুলি তৈলচিত্র। কেউ অশ্বারোহী, কেউ বা সভায় বসে ফরসিতে ধূমপানরত। পায়রা উড়ছে আকাশে। এক রাজবধূ প্রাসাদ অলিন্দ থেকে তাই দেখছেন। এক রাজকুমার বীণা বাজাচ্ছেন। অপূর্ব তাঁর দেহের গঠন।

চোখ তুলে কতক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিগুলো দেখতে লাগল প্রেমা। এই গর্গ পরিবারের ছবি বলেই মনে হল তার। জয়কিষণের মুখের সঙ্গে তার পূর্বপুরুষের আদলের মিল খুঁজতে লাগল সে। একসময় কথায় কথায় অবাক করে দেবে সে জয়কিষণ আর দোলনকে। চুপি চুপি সব দেখে ফিরে যাবে সে নিজের ঘরে। তারপর আভাসে ইঙ্গিতে এমন সব কথা বলবে যাতে বিস্মিত হয়ে যাবে ওরা।

ওদের ফিরে আসার আগেই প্রাসাদখানা ঘুরে নিতে হবে।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে নতুন নতুন রহস্যের সন্ধানে চলল প্রেমা। প্রতিটি ঘরই দর্শনীয়। প্রতি বাঁকে এসে থমকে দাঁড়াতে হয়। হঠাৎ যেন প্রকৃতির এক একখানা জানালা খুলে যায়। বিভিন্ন কোণ থেকে দেখা যায় মুসৌরীর ছবি। আবার ঘর আবার করিডোর। নতুন নতুন রহস্য। অবাক করে দেওয়া সব আবিষ্কার।

একটা নেশার ঘোরে সে কতক্ষণ ঘুরে চলেছিল তা আর মনে নেই, হঠাৎ একটা ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। অন্ধকার নেই আলোও নেই। সবকিছু দেখা যাচ্ছে কিন্তু স্পষ্ট নয়। ঘরের দরজা আধখোলা। সাহসী প্রেমা পায়ে পায়ে ঢুকল ঘরের ভেতর। ঢাল তলোয়ার বল্লম বন্দুকে ঠাসা ঘরখানা। চারটে বড় বড় দেয়াল জুড়ে আশ্চর্য সব রেখাচিত্র। ব্লু পটভূমির ওপর ব্ল্যাক দিয়ে একদল চেয়ে থাকা বাইসনের দারুণ ছবি এঁকেছে শিল্পী। শিকারীকে দেখে যেন রুখে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে সারা দলটা। একটা হরিণ কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে। বিপদের গন্ধ পেয়েছে সম্ভবত। একটা গাছের বিশাল শাখা বেয়ে গুঁড়ি মেরে নেমে এসেছে একটা চিতা। লাফাবার পূর্ব মুহূর্তে থমকে থেমে দাঁড়িয়েছে জানোয়ারটা, হিংস্র চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

এক জঙ্গল জন্তুজানোয়ারের ছবিতে ভরা এ ঘরের দেওয়ালগুলো।

দেয়ালের বেশখানিক ওপরে বাঘ বাইসনের মাথাগুলো সাজান। শিকারীদের কৃতিত্বের সব স্বাক্ষর। ঘরে ঢোকার সময় পেতলের ঢাল-উৎকীর্ণ দরজার মাথায় বিরাট শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষের মত শৃঙ্গ যুক্ত হরিণের একটি মুখ চোখে পড়ে।

প্রেমা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সব। হঠাৎ তার মনে হল ছবিগুলো প্রাণ পেয়েছে। দারুণ শব্দ করে লাফিয়ে পড়ল চিতা হরিণটার ওপর। বাইসনগুলো লাল লাল চোখের বাতি জ্বেলে হুড়হুড় একটা শব্দ তুলে তেড়ে আসতে লাগল।

প্রেমার মনে হল সে টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। টিলার চারদিকে ভ্যালি। ভ্যালির ওপর ছোট ছোট ঝোপ আর ঝরনা। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে শাখাবাহু মেলে কয়েকটা বড় বড় গাছ। ঐ ভ্যালিতেই চলেছে একটা ভয়াবহ নাটকের অভিনয়। প্রেমা যার একমাত্র দর্শক।

ভয় প্রেমার বুকখানাকে কোন দিনই কাঁপিয়ে তুলতে পারেনি, তাই আজও সে ভয় পেল না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকের ভয়াবহ দৃশ্যগুলো দেখতে লাগল।

ঐ যে দরজার মাথায় বসান শতশৃঙ্গ হরিণটি কোথা দিয়ে যেন এসে গেল রঙ্গমঞ্চে। বিশাল দেহ তার। শিংগুলো যেন বিচিত্র অরণ্যশাখা। হাওয়ায় দেহখানা ভাসিয়ে সে যখন এসে দাঁড়াল জানোয়ারগুলোর সামনে তখন সচল মিছিলটা যেন স্টিল পিকচার হয়ে গেল। ঐ সুন্দর শক্তিমান পশুটিকে কোন অলৌকিক দেহধারী বলে মনে হল।

দেবযোনি উদ্ভূত মৃগটিকে দেখতে দেখতে প্রেমার মনে হল সে যেন কথাকলি নৃত্যের আসরে বসে আছে। সুন্দরকান্তি এক রাজকুমার হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে প্রবেশ করেছে অরণ্যভূমিতে। মাতঙ্গের মত তার গতিভঙ্গি। রাজহংসের মত গ্রীবার সঞ্চালন। মাথায় কথাকলির কিরীটম। তার চক্রাকার বেষ্টনীর পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছে বৃত্তাকারে সাজান তীরের তীক্ষ্ণ ফলা। নাচের মুদ্রায় হাত দুটিকে ঢেউয়ের মত আন্দোলিত করে সে এসে দাঁড়াল অরণ্যের মাঝখানে।

হঠাৎ কোথা থেকে তেড়ে এল রাক্ষসের দল। কৃষ্ণ মুখ রক্ত চক্ষু। আশ্চর্য ভঙ্গিমায় দেহখানা

বেঁকিয়ে তূণীর থেকে শর তুলে ধনুতে সংযোজন করল কান্তিমান কুমার। অমনি মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল রাক্ষসকুল। শুধু শরাহত রাক্ষসরাজ পড়ে রইল ভূমি স্পর্শ করে।

ছবি আবার বদলে গেল। বাইসনের দল পালাচ্ছে পিছু হটে। হরিণের উদ্যত শৃঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে ভয়ঙ্কর চিতার দেহখানা।

সব মুছে গেল ধীরে ধীরে। চোখের ওপর ভেসে উঠল দেবনের কথাকলি নৃত্যভঙ্গিমার ছবি। কি অনায়াস দক্ষতায় শরসন্ধান করে দেবন। যুদ্ধের সীনগুলোতে দেবনের পদবিক্ষেপ, দেহসঞ্চালন চেয়ে চেয়ে দেখে আশ মেটে না। ও এমন দুর্লভ সুগঠিত শরীর পেল কী করে! বৃহৎ বেত্রদণ্ডের মত আশ্চর্য নমনীয় ওর দেহখানি। অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে এমন এক হয়ে যাওয়া শুধু বুঝি দেবনের পক্ষেই সম্ভব।

এই মুহূর্তে দেবনকে কাছে পেতে চাইল প্রেমা। অপ্রাপ্তির যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তার।

কতক্ষণ পরে বুকের ভার কিছুটা হালকা হলে সে চোখ মুছে তাকাল বাইরের দিকে। সামনের জানালা দিয়ে তখন হিমেল একটা হাওয়ার সঙ্গে ঢুকে আসছিল তাল তাল ঘোলাটে অন্ধকার! প্রেমা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল জানালার বড় বড় গরাদ ধরে। মুসৌরীর দৃশ্য ভাসমান কুয়াশার বোরখায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। দূরে ভ্যালির ওপারে অস্তসূর্যের আলো পড়েছে গীর্জার সাদা চূড়ায়। ভ্যালি থেকে গীর্জা অবধি উঠে গেছে সারি সারি পাইন। পাইনের সবুজ গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কোমল হলুদ আলো। এক দঙ্গল কুমারী মেয়ে যেন বেলাশেষের আলোর প্রপাতে স্নান করছে। হঠাৎ একটা ছবি ফুটে উঠল। পাইন বনের গা বেয়ে উঁচু নীচু পথ। ঐ পথের ওপর দিয়ে সাদা পোশাকে দেহ ঢেকে নানেরা চলেছে চার্চে সান্ধ্য প্রার্থনায় যোগ দিতে। তুষার ঝরা ঝর্নার মত আঁকা বাঁকা পথে সারি দিয়ে চলেছে ওরা।

লুব্ধ চোখে প্রেমা দেখতে লাগল ওদের। ঈশ্বরের অলৌকিক করুণা প্রার্থনা করতে করতে অন্তর মন্ত্রের মত বেজে উঠল। সে দুটি হাত প্রার্থনার ভঙ্গিতে জড়ো করে হলের ভেতর চলতে লাগল। তার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন ঈশ্বরের মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা। প্রেমার মনে হল সে এমনি করে স্টেজের ওপর দিয়ে প্রেমাস্পদ কৃষ্ণের উদ্দেশে যাত্রা করবে। ঠিক আজকের এই মুহূর্তের ভাবটিকে সে চিরদিন অন্তরে অক্ষয় করে রেখে দেবে।

হলেব ভেতরে একটা ভাবের গভীরে ডুবে এমনি পদ-চারণা করতে করতে কখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনাল টেরও পেল না প্রেমা। হঠাৎ ঘোর ভাঙলে সে দেখল ঘরের সব ছবি এক হয়ে গেছে। সে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। করিডোরে তখনও ঘোলাটে আলো। সে দ্রুত করিডোর পার হয়ে কতকগুলো ঘরের সামনে এসে পড়ল। ঘরগুলো পার হতেই একটা বাঁকা পথ। পথের ধারে দেয়ালে সারি সারি ছবি টাঙান। প্রেমার মনে হল এই পথেই সে এসেছিল। এমনি দেয়ালটার গা জুড়ে ছিল অনেকগুলো ছবি। সে চোখের ভেতর অনেকখানি শক্তি জড়ো করে ছবিগুলোর ওপর ফেলল। না, এগুলো তো আগের দেখা ছবি নয়। লম্বা লম্বা পপলার এভিনিউ-এর তলায় দুটি ভিনদেশী প্রেমিক-প্রেমিকা হাত ধরাধরি করে চলেছে। আর একটি ছবি মনে হয় কোন যুদ্ধ জাহাজের। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে আর জাহাজটা ডুবে গেছে প্রায় অর্ধেকটা।

মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। সে তাহলে কি ঠিক পথে আসেনি। আরও খানিক পথ এগিয়ে গেল সে। ঐ তো সেই ঘোবান সিঁড়িটা। অনেকখানি আশ্বস্ত হল সে। সিঁড়ি বেয়ে ঘুরে ঘুরে নেমে এল নীচে। নেমে এসেই করিডোর। এখান থেকে পথটা দেখা যায়। সন্ধার আবছায়ায় প্রেমা পথের দিকে চেয়ে দেখল, কিন্তু দুপুরের সেই পথের কোন চিহ্নই সে দেখতে পেল না। শুধু দেখল, একটা পাহাড়ী ঢাল অনন্ত অন্ধকারে গড়িয়ে গেছে।

সে সেই করিডোর পেরিয়ে আর এক প্রস্থে এসে পড়ল। এখানে এক টুকরো ব্যালকনি ঘরের অতিরিক্ত অংশের মত বাইরে বেরিয়ে আছে। একদিকে টানা দেয়াল, তিনদিক আলসে দিয়ে ঘেরা। দেয়ালের গায়ে একখানা ঘর। প্রেমা উঁকি দিয়ে দেখল আদ্যিকালের ঢাউস ঢাউস কটা সোফা পড়ে আছে। ঘরের দরজা আধখোলা। কারা যেন গল্প করতে করতে ঘর খোলা রেখে এইমাত্র বেরিয়ে

গেছে।

প্রেমা এসে দাঁড়াল ব্যালকনিতে। সেখানে লোহার ফ্রেমে আটকানো কাঠের একটি বেঞ্চ পাতা। প্রেমা ভেঙে পড়ল বেঞ্চের ওপর। সে হাঁপাচ্ছিল। কতক্ষণ চোখ বুজে থেকে তার মনে হল, সে এই বৃহৎ কেল্লা প্রাসাদের অনেক গভীরে হারিয়ে গেছে।

চোখ খুলে বাইরে তাকাল প্রেমা। তখন অন্ধকারে সব একাকার। কিন্তু অনেক অনেক দূরে কতগুলো জোনাকীকে সে যেন ঝিলমিল করে উঠতে দেখল। ঠিক জোনাকী বলা যায় না। নীল, সবুজ, হলুদ, লাল আর সাদা রঙের ঝিলিমিলি। দূর কোন উপত্যকা-শহরের ছবি। এমন বিভ্রান্তিকর অবস্থার ভেতর প্রেমার হঠাৎ ছবিটা দারুণ ভাল লেগে গেল। সে কালো কার্পেটের ওপর হরেক রঙের বুটি তোলা একটা সুন্দর ঝলমলে কাজ নিপুণ রসিকার মত দেখতে লাগল।

প্রসাদের এপার থেকে বোধ হয় শহর দেখা যায় না। নইলে মুসৌরী শহরের আলো চোখে পড়ত।

প্রেমা অনেক সময় বাইরে বসে রইল। রাত বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল প্রচণ্ড একটা শীত তার দেহের সঞ্চিত উত্তাপটুকু ভ্যাম্পায়ারের মত শুষে নিচ্ছে।

সে উঠে এল ব্যালকনি সংলগ্ন ঘরের সামনে। দরজায় অনুমানে হাত ঠেকাল। দরজা আধখোলা ছিল, পুরোপুরি খুলে গেল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় সে আগেই দেখে নিয়েছিল ঘরের চেহারাটা। দেয়াল ধরে ধরে সে এগোতে লাগল নিশ্চিদ্র অন্ধকারে। হাতে ঠেকল সোফা। প্রেমা বসে পড়ল তার ওপর। সোফার ভেতর আধখানা শরীর ঢুকে যেতেই প্রেমা আবার ফিরে পেল তার দেহের উত্তাপ। সে ভাবতে চেষ্টা করল জয়কিষণ আর দোলনের কথা। এতক্ষণে তারা হন্যে হয়ে খুঁজছে তাদের অতিথিকে। ইতিমধ্যেই হয়ত তোলপাড় করে ফেলেছে সারা মুসৌরী শহরটা। কিন্তু কি আশ্চর্য, সে রয়েছে জয়কিষণের প্রাসাদের একেবারে অন্দরমহলে।

এই মুহূর্তে কিছুই আর ভাবতে ভাল লাগছে না প্রেমার। একটা মানসিক উত্তেজনায় ভুগে সে এখন ঘুমের ভেতর তলিয়ে যেতে চাইছে। সে আর জোর করেও নিজেকে জাগিয়ে রাখতে পারছে না।

রাত কটা কে জানে। চাঁদ কখন পাহাড়ের মাথায় গুঁড়ি মেরে উঠে প্রেমা মেননের দিকে তার অতি ঠাণ্ডা আলোর হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে, তা ঘুমন্ত প্রেমা জানতেই পারেনি। একটি তরুণীর ঘুমে-ডোবা মুখ লোভীর মত দেখছিল কৃষ্ণা চতুর্থীর চাঁদটা।

হঠাৎ মঞ্চের ভেতর নতুন অভিনেতার আবির্ভাব হল। ঘরের ভেতর সুইচ টেপার অতি মৃদু আওয়াজ হল। টের পেল না তন্দ্রামগ্ন তরুণীটি। একটা অল্প পাওয়ারের সবুজ আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরের ভেতর। তারপর কে যেন আবার আলোটা নিভিয়ে দিলে।

গায়ে পুরুষ হাতের ছোঁয়ায় চমকে জেগে উঠল প্রেমা। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় প্রেমা চিনতে পারল জয়কিষণকে। সে আবেগে জড়িয়ে ধরতেই জয়কিষণ প্রেমাকে বুকের ভেতর লুফে নিলেন। দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনে প্রেমাকে অস্থির রুদ্ধবাক করে দিলেন জয়কিষণ।

ঠোঁট দুটি একটুখানি শিথিল করে জয়কিষণ শুধু অস্ফুটপ্রায় স্বরে বলতে লাগলেন, প্রেমা, আমার প্রেমা। এত কষ্টও দিতে পার তুমি!

ততক্ষণে প্রেমার চোখ আকুল করা কুয়াশায় ভরে উঠেছে।

কেম্‌টি ফল্‌স-এর তলায় বড় বড় পাথরের স্তূপের ওপর বসে ঝর ঝর ঝরেপড়া জলের কণায় গা ভেজাতে লাগল দুজনে। চেয়ে রইল ঝরে-পড়া জলধারার তৈরি ইন্দ্রধনুর দিকে।

দোলন এখন কনভেন্টে। দেরাদুনে ফেরার আগের দিনটিতে কেম্‌টি ফল্‌সের জলে দুজনের স্নানলীলা। সরকারী বাস আসবে যাত্রী নিয়ে। ভীড় জমে যাবে এই ছোট্ট স্নানের জায়গাটাতে। এ সব জেনেশুনে সময় হিসেব করে বেরিয়েছে ওরা। পাহাড়ী পথে গাড়ি চালানোর অভ্যেস নেই প্রেমার। তবু স্টিয়ারিং ধরেছিল সে প্রায় আদ্দেক পথ। পাহাড়ী সংকীর্ণ বাঁকগুলো অবলীলায় ঘুরে সে বেশ কয়েকবারই বাহবা কুড়িয়েছে জয়কিষণের মুখ থেকে।

জয়কিষণ বলেছেন, তোমার দিকে তাকালেই বিস্ময় কথাটার যথার্থ অর্থ বোঝা যায়। তুমি সব দিক

থেকেই বিস্ময়ে তৈরি প্রেমা।

গাড়ি চালাতে চালাতে প্রেমা সেই মুহূর্তে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়েছে। হাত গাড়ির বাইরে বের করে বলেছে, ঐ দেখ আসল বিস্ময়।

পাহাড়ের ঢালে পাইনগাছের ফাঁকে টুকটুকে লাল ছাদ দেওয়া একটি বাড়ি। পাহাড়ী গোঁলাপ, লতানে গোলাপে জায়গাটি মনোরম। কিন্তু তার গা ঘেঁষে সংকীর্ণ একটা পাঁচিল। আর ঠিক পাঁচিলের গা বেয়ে পাহাড়টা নেমে গেছে প্রায় হাজার দেড়েক ফুট নীচে। বিস্ময়ের ব্যাপারটা ওখানে নয়, বিস্ময় বিন্দুর মত লেগে আছে বছর তিন বয়সের একটি শিশুর পায়ে। সেই সংকীর্ণ ভয়াবহ পাঁচিলের ওপর দিয়ে দৌড়োদৌড়ির খেলা খেলছে। দর্শক, তার চেয়ে কিছু বড় কিছু ছোট ছেলেমেয়ের দল। তারাও বিপদজনক জায়গাটায় পা দুলিয়ে দোল খাচ্ছে।

জয়কিষণ বলছেন, তোমাদের চোখে এটা বিস্ময়, কিন্তু এখানকার পাহাড়ীরা এ ব্যাপারটাকে আদপেই বিস্ময় বলে মনে করে না। ঐ দেখ পাকদণ্ডীর পথে পাঁচিলের পাশ দিয়ে একদল মেয়েপুরুষ চলে যাচ্ছে। তারা ফিরেও দেখছে না ওদের দিকে। ওটা ওদের কাছে যেন দর্শনীয় ব্যাপারই নয়।

প্রেমা আবার নিজের প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলছে, তুমি বার বার আমার ভেতর বিস্ময়ের এত কি পাও জয়কিষণ?

জয়কিষণ হেসে বলেছেন, তুমি বিস্ময়ের পর্বত। প্রতিটি গুহা-গহ্বর শৈলশিরা অরণ্য স্রোতোধারায় নতুন নতুন বিস্ময়।

প্রেমা লজ্জা পেয়েছে যত উপভোগ করেছে তার চেয়ে বেশি। মনের ভাবটুকু গোপন করে মুখে বলেছে, আমি কিন্তু মোটেও পর্বতের সঙ্গে উপমিত হবার যোগ্য নই। আমার দেহের দিকে তাকিয়ে কি সেই প্রমাণ পেয়েছ?

জয়কিষণ হেসে বলেছেন, ভদ্রমহিলাদের দেহের দিকে তাকান আমার স্বভাব নয়।

প্রেমা গাড়ি চালাতে চালাতে হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ছিল। দারুণভাবে সামলে নিয়ে ব্রেক কষেছে।

জয়কিষণের মুখের ওপর তীর্যক চোখের দৃষ্টি হেনে ঠোঁটে চাপা হাসি ফুটিয়ে স্থির হয়ে থেকেছে।

ভাবটা অতি স্বচ্ছ। একটি মেয়েকে ভুল-ভুলাইয়ার ভেতরে ঘুমন্ত অবস্থায় আবিষ্কার করে কে তার দুটো ঠোঁটের উত্তাপ শুষে নিয়েছিল মশাই। তখন বোধহয় কুমারবাহাদুরের খুব শীত করছিল। শাল-আলোয়ানে সানায়নি।

জয়কিষণ প্রেমার চোখের ভাষায় মুখের রেখা সবই পড়ে নিয়েছেন। তিনিও প্রেমার হাসিকে সমর্থন জানিয়েছেন নিজের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে।

কেম্‌টি ফল্‌সের উৎসের দিকে চেয়ে প্রেমা বলল, দেখ একটা দুধ রঙের সাপ যেন এঁকে বেঁকে নেমে আসছে ওপরের পাহাড় থেকে।

জয়কিষণ বললেন, ও সাপটা হল মায়ানাগ। দেখছ না নিঃশ্বাসে জলের কণা উড়িয়ে কেমন রামধনু তৈরি করেছে।

প্রেমা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে বলল, আমি স্নান করব।

বেশ, তাহলে একটু থামো, আমি ক্যামেরাটা বের করি।

একজন নর্তকীর স্নানলীলার ছবি তুলতে চাও, তাই না?

জয়কিষণ বললেন, আপত্তি আছে?

না আপত্তি থাকবে কেন? তবে উপযুক্ত মূল্য চাই।

পাবে।

আমার চাহিদা না জেনেই কথা দিলে?

প্রেমাকে তো জানি। আর কিছু জানার দরকার আছে কি?

তুমি কোনদিন দারুণ রকম আঘাত পাবে কারু কাছ থেকে। এত বিশ্বাস ভাল নয়।

বিশ্বাস করে আঘাত পাওয়াতেও আনন্দ আছে!

প্রেমা বলল, যে সেধে আঘাত চায় তার আঘাত ঠেকায় কে।

এখন বল কি চাই তোমার?

প্রেমা বলল, কিছু চাই না!

সে কি!

যে ব্ল্যাঙ্ক চেক লিখে দেয় তার কাছে তো চাইবার কিছু নেই।

কথাটা বলেই প্রেমা মেনন শিলাস্তূপগুলোর ওপর দিয়ে নাচের ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরতে লাগল। ঝিরি ঝিরি জলকণাতে প্রথমে তার চুলে গুঁড়ি গুঁড়ি মুক্তোর দানা জমল। পরে বড় বড় মুক্তো গাল বেয়ে গড়াতে লাগল।

ছবি তুলতে তুলতে জয়কিষণ বললেন, চুল ভেজালে, পুরো ঠাণ্ডাটা মাথায় বসবে যে!

প্রেমা আরও বেশি করে ঝরে পড়া জলের আঁচলে চুল ভেজাতে ভেজাতে বলল, বেশ হবে। অনেকদিন কেরালা ফেরা স্থগিত হয়ে থাকবে।

জয়কিষণ প্রেমার একদিকে ভিজে যাওয়া দেহের একটা ছবি তুললেন। সাদা নাইলন জর্জেটখানা ঝরে-পড়া জলের ছোঁয়ায় যেন গলে গেল। আর অমনি শ্রেষ্ঠ কোন ভাস্করের হাতে তৈরি একটি মার্বেল পাথরের নারীমূর্তি চোখের সামনে আশ্চর্য মহিমায় ফুটে উঠল।

জয়কিষণ সেই দুর্লভ মুহূর্তের ছবি তুলে নিয়ে বললেন, তোমাকে আমার কাছে আটকে রাখার জন্যে আমি নিশ্চয়ই তোমার অসুস্থতা কামনা করব না প্রেমা। তবে স্বেচ্ছায় যে কদিন থাকবে সেই আমার লাভ।

নিজের দেহের পরিবর্তনের দিকে প্রেমার বিন্দুমাত্র হুঁস নেই। জলের ছোঁয়ায় সে যে আদি নারীতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে সে চেতনা তখনও তার ভেতর জাগে নি।

প্রেমা ওপর থেকে ঝরে পড়া জলধারার নীচে শিলাখণ্ডের ওপর পদ্মাসনে বসল। বসেই বলল, আমি ধূর্জটি। দেখ জয়কিষণ গঙ্গাকে আমার জটাজালের ভেতর ধারণ করেছি।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আবার এই দেখ আমি ভগীরথ। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাকে নিয়ে চলেছি আহ্বান করে।

প্রেমার প্রসারিত বাহু, সুন্দর পদবিক্ষেপে গঙ্গা-আহ্বানের ভাবটি ফুটে উঠল।

প্রেমা এবার তার চূড়া বাঁধা চুল খসিয়ে ফেলল। বিশেষ মুদ্রায় দক্ষিণ চরণের জানু স্পর্শ করল উত্তোলিত বাম পদ দিয়ে। এক হস্ত ত্রিবলীর ওপর সর্প ফণার মত স্থাপন করে অন্য হস্ত অভয় মুদ্রায় উত্তোলিত করে বলল, জয়কিষণ, এখন আমি গঙ্গা। স্বর্গভূমি থেকে এসেছি মর্তলোকে।

প্রেমার এইসব বিস্ময়কর ভঙ্গীর কালার ছবি তুলে নিলেন জয়কিষণ। এগুলি তাঁর অক্ষয় সম্পদ। সেদিন নাটমণ্ডপে মধুরাসের উৎসব-নৃত্যেরও প্রায় শতাধিক ছবি তুলেছেন তিনি। যখন প্রেমা আর লালসিয়া স্টেটে থাকবে না তখন এই ছবিগুলিই হবে তাঁর স্মৃতির মণিমুক্তা সঞ্চয়।

প্রেমা এখন সচেতন হয়ে উঠেছে। সে নারীর স্বাভাবিক সঙ্কোচ আর লজ্জা ফিরে পেয়েছে। জয়কিষণের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের বিকশিত দেহটাকে আবৃত করার চেষ্টা করছে।

জয়কিষণ সরে গেলেন। খানিক দূরে গিয়ে প্রেমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ভ্যালির দিকে চেয়ে রইলেন।

কতক্ষণ পরে প্রেমার হাতের ছোঁয়ায় জয়কিষণ চমকে ফিরে দেখেন, প্রেমা ভেজা কাপড়খানা নিংড়ে যদ্দুর সম্ভব জল ফেলে দিয়েছে। কিন্তু শীতের কামড়ে দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে তার।

জয়কিষণ উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু সেই মুহূর্তে কি করা দরকার তা ভেবে পেলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হল, প্রেমা একসেট পোশাক এনেছে তার সঙ্গে কিন্তু পোশাকগুলো রয়ে গেছে গাড়ির ভেতর।

জয়কিষণ বললেন, তোমার জামাকাপড়গুলো এক্ষুনি এনে দিচ্ছি দাঁড়াও।

প্রেমা শক্ত করে জয়কিষণের হাত ধরে বলল, অনেক ওপরে, যেতে আসতে অনেক সময় লাগবে। তুমি বরং তোমার কোটখানা—

কথা শেষ করতে পারছিল না প্রেমা।

জয়কিষণ কোটটা খুলে ফেললেন তাড়াতাড়ি।

জড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলেন প্রেমার গায়ে। প্রেমা ইঙ্গিতে বাধা দিয়ে লং কোটটা হাতে ধরে নিয়ে বলল, আমি পোশাক বদলে পরব।

জয়কিষণ আবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন ভ্যালির দিকে। প্রেমা ভিজে পোশাক সরিয়ে গরম লং কোটখানা গায়ে চাপিয়ে দিল। জয়কিষণ প্রেমাকে জড়িয়ে ধরে পাকদণ্ডীর পথে অনেক কষ্টে তুলে আনলেন ওপরে। কারের ভেতর থেকে পোশাক বের করে পরেও প্রেমা জয়কিষণের গরম কোটখানা ছাড়তে পারল না।

গাড়ির সবকটা গ্লাস উঠিয়ে দিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসেছিলেন জয়কিষণ। ফ্লাস্ক থেকে গরম কফি বের করে প্রেমা ধরিয়ে দিল জয়কিষণের হাতে।

জয়কিষণ বললেন, কি হচ্ছে প্রেমা, আগে তুমি নাও। তোমারই ওটার দরকার সবচেয়ে বেশি।

নাও তো। আমাদেব দেশের মেয়েরা কবে আবার আগে কিছু মুখে তুলেছে ছেলেদের না দিয়ে।

জয়কিষণ কথা বাড়ালেন না। তিনি চুমুক দিয়ে নিঃশেষ করে ফেললেন প্লাস্টিকের কাপে ঢালা কফিটুকু।

দরজা খুলে কাপ হাতে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রেমা বলল, বেরুচ্ছ কোথায়?

এই একমেবাদ্বিতীয়ম কাপখানা ধুয়ে আনতে।

প্রেমা জয়কিষণের হাত থেকে কাপটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বলল, ছেলেরা যত অকাজ করার ওস্তাদ। চুপটি করে বস তো।

কাপটা হাতে নিয়ে একটুখানি কফি ঢেলে ধোবার অভিনয় করল প্রেমা। বাইরে যা ফেলল তা ফোঁটা কয়েকের বেশি নয়।

জয়কিষণ বললেন, ব্যস হয়ে গেল ধোয়া?

কাপে কফি ঢালতে ঢালতে প্রেমা বলল, না তো কি। তুমি কি মনে করেছ এমন গরম কফিটা কাপ ধুতে ধুতেই শেষ করে ফেলব!

একটু একটু করে গরম কফিটুকুতে চুমুক দিয়ে প্রেমা বেশ আরাম পেল।

জয়কিষণ বললেন, রোদ্দুরে একটু ভাল করে গা-টা তাতিয়ে নাও।

খিল খিল করে হেসে উঠল প্রেমা। হাসি থামলে বলল, এখনও যদি গাটা গরম না হয় তাহলে সে তো তোমার কোটেরই বদনাম।

তা হোক। তবু তুমি গাড়ির বাঁ-দিক ঘেঁষে বস। ওদিকে অনেক রোদ্দুর।

প্রেমা বলল, হিমালয়ের হাওয়ায় রোদ্দুরেরও গায়ে র‍্যাপার জড়ানোর জোগাড়।

জয়কিষণ বললেন, তাহলেও সূর্য সূর্যই। ওর জুড়ি কেউ নেই।

অন্যমনস্ক হয়ে গেল প্রেমা।

কি ভাবছ?

চমকে মাথা ঝাঁকাল প্রেমা।

নিশ্চয়ই কিছু ভাবছিলে।

প্রেমা বলল, তোমার কথা শুনে আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল।

কে তিনি?

দেবন। আমরা একই সময়ে কলাকেন্দ্র থেকে পাস করে বেরিয়েছি।

হঠাৎ তার কথা তোমার মনে পড়ল!

বলেছি তো. তোমার কথা শুনে। ঐ যে তুমি বললে সূর্য সূর্যই। ওর জুড়ি কেউ নেই। দেবনও সূর্যের মতই প্রখরতা আর প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে। আমি ও ধরনের শক্তি আর কারু ভেতর দেখি নি

তুমি দেবনকে ভালবাস?

কি করে এ ধরনের অনুমান তোমার হল?

খুব স্বাভাবিক। দুই প্রতিভা চিরদিনই প্রতিদ্বন্দ্বী। তুমি যখন প্রতিদ্বন্দ্বীব প্রশংসা করলে তখন এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে ভালবাসা।

দেবনকে আমি ভালবাসি জয়কিষণ।

দেবনও তোমাকে নিশ্চয় ভালবাসে?

জানি না।

কথাটা বলেই ছলছলিয়ে উঠল প্রেমার দুটো চোখ।

জয়কিষণের গলায় বিস্ময়, সেকি !

প্রেমা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, দেবনের সঙ্গে বোধহয় ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় না। দেবন একেবারে আলাদা চরিত্রের।

জয়কিষণ অমনি বললেন, তাহলে তোমার সতীর্থ দেবন হয় অতিমানব নয় তোমার ভালবাসা পাবার যোগ্যতা তার নেই।

ওকথা বল না জয়কিষণ। সে একেবারে অনন্য, অসাধারণ। বরং তাকে তুলনা করতে পার নার্সিসাসের সঙ্গে। আমার মনে হয় সে নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসতে জানে না।

জয়কিষণ বললেন, এটা একজন যুবকের দাম্ভিকতা বলেই মনে হয়। তোমার মত একটি মেয়ের সান্নিধ্য পেয়েও যে তার সদ্‌ব্যবহার করতে চায় না।

ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠল প্রেমার মুখে। বলল, সে যে কি চায় আর চায় না, তা বোধহয় নিজেই জানে না। বিত্তবানের ছেলে নয় সে যে অর্থের অহংকার করবে। সেরা নাচিয়ে সে কলাকেন্দ্রমের কিন্তু কোনদিন তার ভেতর দম্ভ কি অহংকার দেখিনি। মঞ্চের বিচারকেরা যখন তার প্রাপ্য পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়ে আমার হাতে তুলে দিয়েছে তখনও তাকে সবাই নিস্পৃহ দেখেছে। বন্ধুরা তাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করলেও সে হেসে বিষয়টাকে হাল্কা করে দিয়েছে। আমার মুখোমুখি হলে সে আমার নাচের প্রশংসা করেছে। আমি কতদিন আমার অন্যায়ভাবে পাওয়া পুরস্কার তার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছি, এ পুরস্কার আমার নয়। তোমার পুরস্কার কেড়ে নিয়ে ওঁরা আমাকে পুরস্কার দেবার বদলে তিরস্কারই করেছেন।

দেবন অনেক যত্নে আমার ফেলে দেওয়া পুরস্কার কুড়িয়ে এনে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছে, তুমি কত ভাল পারফরমেন্স করেছ তা তুমি নিজেই জান না। আর যাঁরা বিচারকের আসনে বসেন তাঁরা সকলেই সমঝদার গুণী মানুষ।

আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছি, চিরদিনই পুরুষ বিচারকেরা মেয়েদের জিতিয়ে দেয়।

ও অমনি হা হা করে হেসে উঠে বলেছে, একজন পুরুষ বিচারকের আসন এখনও খালি পড়ে আছে, সে এলে দেখবে সব মেয়েরাই হেরে গেছে।

একটানা দেবনের কথা বলে ক্লান্ত নয় প্রেমা। দেবনের প্রসঙ্গ উঠলে সে যেন অফুরন্ত কথার প্রবাহে ভেসে যেতে পারে।

প্রেমা কথায় খানিক ছেদ ফেলতেই জয়কিষণ বললেন, তুমি বিশ্বাস কর প্রেমা তোমার ঐ প্রতিভাধর বন্ধুটিও তোমাকে ভালবাসে।

একটুও না। প্রেমা সক্ষোভে বলল।

এ তোমার অভিমানের কথা প্রেমা।

অভিমান নয় জয়কিষণ। পাথরের তৈরি ডেভিডের মূর্তির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। তার দৃপ্ত পৌরুষকে ভাল না বেসে পারা যায় না, কিন্তু তার কাছ থেকে রক্ত মাংসের ভালবাসা পাওয়া তো সম্ভব নয়। দেবন একেবারে পাথরের তৈরি আশ্চর্য মূর্তি।

জয়কিষণ হঠাৎ কি ভেবে বললেন, যদি ইচ্ছে কর তাহলে আধ ঘণ্টার ভেতর তোমাকে একটা জায়গায় ঘুরিয়ে আনি। হয়ত জায়গাটা তোমার ভাল লাগবে।

অন্যমনা প্রেমা বলল, যেখানে খুশি চল।

জয়কিষণ গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ড্রাইভ করে চললেন।

প্রায় দশ পনের মিনিট গাড়িখানা চলল পাহাড়ী নানান আঁকবাঁক ওঠানামা পেরিয়ে। এদিকে পাহাড়ী বস্তি বাড়িঘর বড় একটা দেখা গেল না।

এক সময় ওরা একটা পাহাড়ের বাঁক ঘুরে এসে পৌঁছল এমন এক জায়গায় যেখানে দুটো পাইন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তার তলায় বাঁধান একটা পাথরের বেদি। পাশ দিয়ে একটা ঝোরা কিশোরী মেয়ের মত খিল খিল হাসি ছড়াতে ছড়াতে ছুটে নেমে চলেছে। নীচে বিস্তৃত ভ্যালি, ওপরে অনন্ত আকাশ। ভ্যালিতে নীলাভ কুয়াশা এখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

গাড়ি থেকে জয়কিষণ নামলেন। প্রেমার হাত ধরে নামালেন। এতক্ষণ প্রেমা কিংবা জয়কিষণের ভেতর কোন কথাই হয়নি। প্রেমা ডুবেছিল তার ভাবনার ভেতর। দেবনের প্রসঙ্গ ওঠার পর থেকেই সে একেবারে অন্যমনা। মুসৌরীর পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে সে কেরালার সমুদ্রতীরের স্বপ্ন দেখছে। দেবনের হাত ধরে সে চলেছে বালির ওপর দিয়ে। দুজনের পায়ের ছন্দে এত মিল। গতিতে এমন সামঞ্জস্য! মাঝে মাঝে শঙ্কর পার্বতীর মত দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে।

জয়কিষণ কথা বলে উঠতেই ধ্যান ভাঙল প্রেমার।

জায়গাটা বড় নির্জন তাই তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম।

প্রেমা চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, শুধু নির্জন নয় বড় সুন্দর।

এসো আমরা ওখানে একটু বসি। বলেই প্রেমার হাত ধরে পাইনগাছের তলায় গিয়ে পৌঁছলেন জয়কিষণ।

বাঁধান বেদির ওপর পাশাপাশি বসল দুজনে।

প্রেমা বলল, আচ্ছা জয়কিষণ লোকালয় তো কোথাও দেখছি না, তাহলে এই দুটো গাছের তলায় বেদিটা বাঁধাল কে?

কোন সরকারি অফিসার নিশ্চয়ই। যাঁর চোখ বলে দুটো বস্তু আছে আর কোথায় বসে রূপ দেখা যায় সে সম্বন্ধে যাঁর ধারণা আছে।

কিছু সময় দুজনেই নীরব।

হঠাৎ জয়কিষণ বললেন, জান প্রেমা এখানে এলেই কেন জানি না আমার ফুজিয়ামার কথা মনে হয়।

আধ ডজন প্রশ্ন কলকলিয়ে উঠল প্রেমার মুখে।

তুমি জাপানের ফুজিয়ামা পর্বতের কথা বলছ তো? গেছ তুমি জাপানে? দেখেছ ফুজিয়ামা নিজের চোখে? ফুজিয়ামার সঙ্গে সামনের পাহাড়ের বিশেষ কি কোন মিল আছে? ছবি দেখেছি আমি, কিন্তু মিল তো খুঁজে পাচ্ছি না।

জয়কিষণের গলায় একটা গভীর সুর বাজল, না তা নেই, তবু আমার কেন জানি না এখানে এলে ঐ পাহাড়ের কথাই মনে হয়।

আশ্চর্য তোমার ভাবনা তো। রূপের অমিল থাকলেও এক বলে মনে কর তুমি।

জয়কিষণ এবার প্রেমার মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি ফেললেন। ধীরে ধীরে বললেন, তুমি আজ যেখানটাতে বসে আছ অনেকদিন আগে ওখানে আমারই পাশে বসেছিল আর একটি মেয়ে। তার সঙ্গে তোমার আকৃতির কোন মিল নেই তবু এই মুহূর্তে তোমাকে দেখে কেন জানি না তার কথাই মনে পড়ছে। সেদিনের মেয়েটির সঙ্গে আজকের মেয়েটি একেবারে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

প্রেমা অনুমান করল মেয়েটি মধুবন্তী।

মুখে বলল, তুমি কবি জয়কিষণ। এমন করে কথা বলতে পারে কবিরাই।

জয়কিষণের মুখে ম্লান একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, কবিতা আমি কোনদিনই লিখিনি, কিন্তু কবিতা আমি ভালবাসি। হিন্দী, উর্দু, বাংলা, ইংরাজি, জাপানি এসব ভাষার বহু কবিতা আমার জানা। আমি জাপানি ভাষাও এক সময় শিখেছিলাম। ব্যবসার ব্যাপারে জাপানে যেতে হয়েছিল কয়েকবারই।

জাপান দেশটা খুব সুন্দর, তাই না?

সব দেশই সুন্দর প্রেমা। দেখার চোখ থাকলে সামান্যও অসামান্য হয়ে ওঠে। আমার দেশ কি কম সুন্দর।

আমি সে কথা বলছি না। সব দেশের নিজস্ব একটা রূপ আছে।

জয়কিষণ বললেন, সামনে ফুজিয়ামা, চেরীফুলের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে কিমোনো পরা জাপানি মেয়ে। এমনি টুকরো টুকরো অজস্র ছবির দেশ জাপান।

তুমি ফুজিয়ামার ধারে গেছ?

ওপরে উঠেছি।

ওপরে!

আমি, আমার জাপানি এক বন্ধু আর তার লাভার, তিনজনে উঠেছিলাম।

কত সময় লাগল?

প্রায় তিনদিন।

রেস্ট নিচ্ছিলে কোথায়? তাঁবু ছিল সঙ্গে?

তাঁবুটাবু কিছুই ছিল না। পথে দু'এক জায়গায় অতি ছোট ডেরা আছে। ওখানে সামান্য রেস্ট নিয়ে উঠে চলা।

দারুণ একসাইটিং তো!

তা বলতে পার। চাঁদনি রাত ছিল, আমরা গান করে গল্প করে সময় কাটিয়েছি।

আমার খুব ইচ্ছে করে এমনি সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে। দারুণ ভাল লাগত আমি যদি তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারতাম।

একটা অ্যাকসিডেন্টের হাত থেকে বড় বাঁচা বেঁচে গেছি।

তুমি! তোমার অ্যাকসিডেন্ট?

বিস্ময় প্রকাশ করল প্রেমা উচ্চগ্রামী গলায়।

হ্যাঁ, বন্ধু সাবধান করে দিয়েছিল আগে কিন্তু খেয়াল ছিল না আমার।

কি রকম অ্যাকসিডেন্ট?

চিহ্নিত পথের ঠিক পাশেই অজস্র নুড়িপাথর পড়ে আছে। ভুলে একবার ওখানে পা পড়লেই হল। গড়াতে গড়াতে ঠেকতে হবে কোন অতলে। বুঝতেই পারছ হাড়গোড়গুলো আর থাকবে না।

তুমি পড়ে গেলে?

ভুলের ফাঁদে পা দিয়েছি কি গড়াতে লাগলাম নীচে।

দারুণ উত্তেজনা আর ভয় মেশান একটা আওয়াজ তুলল প্রেমা।

জয়কিষণ বললেন, ভাগ্য ভাল কিছুদূর গড়িয়ে একটা উঁচু জায়গায় ঠেকে গেলাম।

তারপর!

আমি তাকিয়ে দেখি পাহাড়ের সামান্য উঁচু একটা শিরায় আমি আটকে আছি। আর ঠিক তার পরেই অনন্ত ঢাল। এদিকে নুড়ির ওপর দিয়ে আসল পথে ফেরার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কি করলে?

হেসে বললেন জয়কিষণ, জ্ঞান হারালাম। যখন জ্ঞান হল, দেখি বন্ধুর প্রেমিকাটির কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি।

ফিরলে কি করে?

আমাদের কাছে পাহাড়ে ওঠার রোপ ছিল। আমার বন্ধুর প্রেমিকা কোমরে সেই দড়ি জড়িয়ে টেনে রাখল আর বন্ধু সেই দড়ি ধরে নামতে লাগল। পিছু না তাকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দড়ি ধরে নুড়ির ওপর দিয়ে হাঁটা রীতিমত বিপজ্জনক ব্যাপার। এদিকে ভেবে দেখ বন্ধুর প্রেমিকাটির অবস্থা। ভারী একটা বস্তুকে সারাক্ষণ টেনে রাখা কি অমানুষিক শক্তির ব্যাপার। তার ওপর তার মানসিক অবস্থা বন্ধুটি পড়ে গেলে তার সর্বস্ব গেল। তাই হাতে না ধরে সে কোমরে একেবারে গিঁট দিয়ে বেঁধে নিয়েছিল দড়িটা। শক্তিতে না কুলোলে সেও পড়বে বন্ধুটির সঙ্গে একটি অতলে। পরে শুনেছিলাম, বন্ধু তাকে কোমরে দড়ি বাঁধতে বারে বারে বারণ করেছিল কিন্তু মেয়েটি তার কথায় একেবারেই আমল দেয়নি।

প্রেমা হঠাৎ বলল, ওরা অসাধারণ। এমন একটা বিপদের ঝুঁকি ওরা নাও নিতে পারত।

ঠিক, কিন্তু একজন বন্ধুর জন্যে ওরা সব কিছুই করতে পারে।

তারপর ওরা কি করল?

বন্ধুটি আমাকে দড়ি দিয়ে বাঁধল। আমি একেবারে জানতেই পারিনি! তার পর ও দড়ি ধরে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেল। তারপর দুজনে মিলে অপেক্ষা করতে লাগল আমার জ্ঞান না ফিরে আসা অব্দি।

একসময় জ্ঞান ফিরে এল আমার। দেখলাম, আমি দড়ির বাঁধনে বাঁধা পড়েছি। ওপরে চাইলাম। ওরা দারুণভাবে হাত নেড়ে উৎসাহ দিতে লাগল। আমি তখন সাহস ফিরে পেয়েছি। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে এগোতে লাগলাম। এমনি করে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সেদিন ফিরে এসেছিলাম।

প্রেমা হঠাৎ বলল, ওরা এখন সুখী পরিবার নিশ্চয়ই।

জয়কিষণ কিছুক্ষণ থেমে থেকে বললেন, না ওদের বিয়ে হয়নি।

সে কি!

বিয়ের আগে ছেলেটি অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছিল। একটা স্টীল প্ল্যান্টে কাজ করত বন্ধুটি।

প্রেমা কোন কথা বলতে পারল না। একটা অবরুদ্ধ আবেগ তার কণ্ঠের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছিল।

জয়কিষণ একটু থেমে বললেন, বড় করুণ একখানা চিঠি লিখেছিল আমার বান্ধবীটি। চিঠির শেষে একটা মন্তব্য ছিল।

'যদি ফুজির ওপরে সেদিন আমাদের মৃত্যু হত তাহলে আজকের এই অসহনীয় জীবনের ভার বইতে হত না।'

প্রেমা বলল, তুমি কেন আমাকে এমন একটা দুঃখের কাহিনী শোনাবার জন্যে এখানে নিয়ে এলে?

বিশ্বাস কর, কোন কাহিনী শোনাবার জন্যে তোমাকে এখানে আমি নিয়ে আসিনি। কথায় কথায় এসে পড়ল।

হঠাৎ প্রেমা এক কাণ্ড করে বসল। জয়কিষণের মাথাটা বুকের কাছে টেনে এনে বলল, কান পেতে শোন কি রকম শব্দে ওঠানামা করছে।

একেবারে নির্বিকার কিশোরী হয়ে গেছে প্রেমা।

জয়কিষণ বললেন, ওঠ প্রেমা আমাদের ফিরতে হবে।

প্রেমা দূরের উপত্যকার দিকে চেয়ে জয়কিষণের একখানা হাত চেপে ধরে বলল, আর একটু বসি। ওদের কথাটা কিছুতে ভুলতে পারছি না জয়কিষণ।

জয়কিষণ বললেন, এইখানেই ভালবাসার মূল্য প্রেমা। পাত্রপাত্রী সরে যায়, কিন্তু ভালবাসা দাঁড়িয়ে থাকে একই জায়গায়। সৃষ্টির আগে কবে তার জন্ম হয়েছিল কে জানে কিন্তু তার মৃত্যু নেই। শুধু আছে আবির্ভাব। সে যেন পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাম্প পোস্ট। যে তার পাশ দিয়ে যায় সে হঠাৎ আলোর ছোঁয়ায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আবার তার পাশ থেকে সরে গেলেই সারা অন্তর জুড়ে অন্ধকারের হাহাকার।

প্রেমা হঠাৎ বলল, তুমি ঐ মেয়েটির চিঠির উত্তর দিয়েছিলে?

দিয়েছিলাম।

একটু থেমে প্রেমা বলল, যদিও কৌতূহলটা অন্যায় তবু জানতে ইচ্ছে করে কি লিখেছিলে তুমি।

শুধু একটি কবিতায় উত্তর দিয়েছিলাম। ওরই দেশের এক কবির কবিতা। যদিও তা সব দেশের সব কালের প্রেমের বেদনাকে ছুঁয়ে আছে। তোমার আমার মধুবন্তী দেবন কিংবা ঐ বেহালাবাদক সবার মনের অনুচ্চারিত প্রেমের যন্ত্রণার কথা।

কবিতাটা মনে আছে তোমার?

কবির নাম, ফুজিওয়ারা নো য়োশিৎসুনে। একটু বস, কবিতাটা তোমাকে তর্জমা করে লিখে দিই।

জয়কিষণ একটু নীচে নেমে গাড়ির কাছে গেলেন। ব্যাগ খুলে প্যাড আর পেন বের করে গাড়ির ভেতর বসে কবিতাটা লিখলেন। হাতে একটুকরো কাগজ নিয়ে এসে আবার বসলেন প্রেমার পাশে।

কি লিখলে পড়।

জয়কিষণ স্বচ্ছন্দ গলায় পড়ে গেলেন :

নরম সবুজ এই ঘাসে
কবে যেন আমাদের
পায়ের পাতার ভর পড়েছিল,
চারিদিকে ফুলের উৎসব :
আজ তুমি কাছে নেই
অনেক দূরের কোন দেশে,
চিহ্ন সব গেছে মুছে
সবুজ ঘাসের ঐ নরম শরীরে,
ফুলেরা এখন শুধু শব।

কবিতাটা পড়া হলে জয়কিষণ প্রেমার হাতে কাগজখানা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, চল ওঠা যাক। হয়ত আর কোনদিন এখানে আমরা একসঙ্গে আসব না।

চার

কুট্টানাড়ম পুঞ্জইলে
কচ্ছু পেন্নে কুইলাপ্লে
কুট্টাভেনম্ কুঁডাভেনম্
পুডাভাভেনম্
ও তিত্তিত্তাগা
তিত্তিথেই
তিথেই
তাগদাই তোম্।

তালে তালে ওয়াঞ্জীপাট চলছে। জল কেটে ছুটছে তীরের গতিতে এক সারি চুণ্ডন ভাল্লম্। কায়েলের জল শত শত দাঁড়ের ঘায়ে কাচের মত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। দুই তীরে উৎসুক দর্শকের মিছিল।

আশি থেকে একশো বিশ ফুট অব্দি নৌকোগুলো সাপের মত হিল্ হিল করে এগিয়ে যাচ্ছে। চোদ্দ ফুট আমরম উঁচু হয়ে জেগে আছে নৌকোর পেছনে। সাজান হয়েছে কাপড় আর মালা দিয়ে। নীচে বিরাট ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে গায়কেরা করে চলেছে ওয়াঞ্জীপাট। উৎসাহে কায়েলের জলের মত ফুঁসছে ভাল্লমের দাঁড়িরা।

ওনাম উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অঙ্গ এই বোট রেস।

আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ঘরে ঘরে উঠে গেছে পরিপূর্ণ ফসল। সুখী সম্পন্ন কেরালাবাসীর মনে তাই উৎসবের ঢল নেমেছে। প্রতিটি বীড অথবা কেটেডমের আঙিনা ফুলের আল্পনা আর মালায় মালায় সাজান। নীলা ভিল্লাকু জ্বালিয়ে তার চারদিকে গানের সঙ্গে করতালি দিতে দিতে ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছে বিভিন্ন মহল্লার মেয়েরা। দোলনায় দুলছে তরুণী, কিশোরী। কেউ ফুলে ফুলে সাজিয়েছে দোলনা। কেউ সখিকে ধাক্কা দিয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিতালি পাতাবার জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছে শূন্যে।

রাজা এসেছেন ওনামে। কেরালাবাসীদের চিরদিনের সব সেরা লোকপ্রিয় রাজা মহাবলী। অসুর মহাবলী মহাদাতা। শ্রীর নিত্য স্থিতি তাঁর রাজ্যে। প্রজারা সুখী সম্পন্ন এমন রাজার রাজত্বে।

ঈর্ষায় জ্বলতে লাগল দেবতাদের অন্তর। অসুর হবে লোকপ্রিয়, এ যে অসহ্য। বিষ্ণুকে দেবতারা জানালেন মনের ক্ষোভ। বিষ্ণু অমনি ধরলেন বামন রূপ। মহাবলীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন ত্রিপাদভূমি। সঙ্গে সঙ্গে দাতা করলেন গ্রহীতার প্রার্থনা মঞ্জুর। ধীরে ধীরে বামন বিষ্ণু ধরলেন বিশাল কায়া। এক পদে ঢেকে ফেললেন পৃথিবী। অন্য পদে অন্তরীক্ষ—রসাতল। বললেন, বল মহাদাতা এখন

আমার তৃতীয় চরণ কোথায় রাখি। স্থান তো আবৃত হয়ে গেছে।

মহাবলী বললেন, আমার বাক্য তো ফিরবে না। রাখ আমার মস্তকে।

বিষ্ণু মহাবলীর মাথায় পা দিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন চির অন্ধকারের রাজ্য রসাতলে।

কিন্তু ভক্ত প্রজারা ধরলেন বিষ্ণুকে, এ কেমন কথা, আমরা দেখতে পাব না আমাদের রাজাকে!

স্থির হল বছরের প্রথম দিনটিতে পাতাল থেকে রাজা মহাবলী আসবেন তাঁর দেশে। দেখা দিয়ে যাবেন তাঁর প্রজাদের। দেখে যাবেন তাদের সমৃদ্ধ জীবন।

রাজা এসেছেন তাই সারা দেশ মেতেছে উৎসবে। চোখের আড়াল থেকে রাজা দেখছেন সব। তাই ঘরের ভেতরে বাইরে সব জায়গাতেই উৎসব। তিনি দেখবেন প্রতিটি ঘর। প্রতিটি মানুষের মুখ।

উৎসব উৎসব। আনন্দের রোশনাই সারা কেরালা জুড়ে। প্রবাসীরা এসেছে ঘরে। পরেছে নতুন পোশাক। চলেছে ভোজের আদান-প্রদান। উৎসবের সব সেরা অনুষ্ঠান বোট রেস দেখতে ছুটেছে আলেপ্পি।

রেস শুরু হয়ে গেছে। দ্রুত লয়ে ওয়াঞ্জীপাট চলেছে :

কুট্টানাড়ম পুঞ্জইলে

কচ্ছু পেন্নে কুইলাপ্পে......

তরুণী বউ তার মানুষটিকে বলছে, এমন সোনার ফেসল ফলেছে, তুমি আমাকে কিছু দেবে না? একটি সুন্দর বাকস একটি শাড়ি আর বর্ষার দুরন্তপনা থেকে বাঁচার জন্যে একটি ছাতা। দেবে না?

ওয়াঞ্জীপাটের ভেতর ঐ সামান্য চাওয়ার সুরটি অসামান্য হয়ে বাজছে।

সব মানুষের উদ্দাম চীৎকারের ভেতর একটি মানুষ নিজেকে সরিয়ে রেখেছে সবার চোখের আড়ালে। সে সাবি সারি নারকেল অরণ্যের ভেতর পায়ে চলা পথে আপনার খুশীতে নেচে চলেছে। ওয়াঞ্জীপাটের তালে তালে সে নাচ কম্পোজ করে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে।

কুট্টানাড়ম পুঞ্জইলে

কচ্ছু পেন্নে কুইলাপ্পে

কুট্টাভেনম্ কুঁডাভেনম্....

সে সারা দেহে অজস্র মুদ্রা ফুটিয়ে অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে জনহীন নারকেল বীথির ছায়া পথে। পার্শেই কায়েলের জল মুক্তো ছড়াচ্ছে হাজার বৈঠার ঘায়ে। হাজার দাঁড়ির গলায় বেজে উঠছে ওয়াঞ্জীপাটের সুর।

শরৎকাল। আকাশে তবু বড় আকারের ক'টি জলশূন্য মেঘ থমকে থেমে আছে। দুপুরে কায়েলের আর্শিতে তারা প্রতিবিম্ব দেখছিল। একটু পরেই নৌকোয় নৌকোয় কায়েলের জল কালো হয়ে উঠল। মেঘগুলো তাই বুঝি বিস্মিত স্তম্ভিত হতবাক। এখন সন্ধ্যা নেমেছে। যে যার ঘরের পথে রওনা হয়ে গেছে। দূরে কোথায় যেন উদ্দাম উল্লাস চলেছে। তার শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে।

আলেপ্পির নির্জন পথে কটি নারকেল গাছের তলায় প্রেমার প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টখানা দাঁড়িয়ে। গাড়ির হেড-লাইট নিভিয়ে প্রেমা ঐ দূরাগত উল্লাসের শব্দটা শুনছে। যারা জয়ী হয়ে ট্রফি জিতেছে তাদেরই আনন্দ কলরব বলে মনে হয়।

একটা সেতার প্রেমার মনের কোথায় যেন চাপা কোন দুঃখের সুর অতি ধীরে বাজিয়ে চলেছে। সে জয়ী হয়েছে বহু জায়গায়। কিন্তু জীবনের কোথায় যেন একটি হার তার পিছু নিয়েছে। ভালবাসা পেয়েছে সে অযাচিত দানের মত। কিন্তু হাওয়ার ঘায়ে জেগে ওঠা তরঙ্গের মত আবেগে উচ্ছ্বাসে প্রমত্ত হয়ে তা আবার কখন স্থির হয়ে গেছে। যেন কোনদিন দেহের তটে কোন ঢেউ আছড়ে পড়ে নি। একেবারে চরণচিহ্নহীন মসৃণ শান্ত বেলাভূমি।

বেলাশেষের একটা ছবি চোখের ওপর ভেসে উঠতেই বিবশ দেহটা নড়ে চড়ে উঠল প্রেমার। সরিতা আর ইন্দ্রকে সে চোখের সামনে দেখছে। ঐ উল্লাস উন্মাদ জনতার ভেতর ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিল। মাঝে এক সময় সরিতার বাঁ হাতখানা পেছন থেকে জড়িয়ে ধরছিল ইন্দ্রের কোমর।

ভোর রাতের কথাটা মনে করে হাসি পেল প্রেমার। দু'বোনে পাশাপাশি খাটে শুয়েছিল। সরিতার খাটটা শব্দ করে উঠল। প্রেমা শুয়ে শুয়ে ভাবছিল তাদের কথা যারা তার জীবনকে ছুঁয়ে গেছে, যারা হয়ত আর কোনদিনও ফিরে আসবে না তার জীবনে। হঠাৎ তার ভাবনা ভাঙল সরিতার খাটখানা নড়ে ওঠার শব্দে।

সরিতাই কথা বলল, কিরে দিদি জেগে আছিস নাকি ?

কি করে বুঝলি ?

সদ্য ফিরেছিস সাউন্ড অব মিউজিকের দেশ থেকে। এত সহজে কি আর সে সব সুর ভোলা যায়।

আমার চেয়ে ক'বছরের ছোট বল তো তুই?

এখন অ্যাডাল্ট হয়ে গেছি। এখন সমান সমান।

খিল খিল করে হেসে উঠল প্রেমা।

যা একখানা ডেঁপো চূড়ামণি হয়েছিস না।

সরিতা আদুরে গলায় বলল, বল না দিদি, কুমারবাহাদুরের সঙ্গে কদ্দূর অব্দি গড়িয়েছিল?

প্রেমা বলল, সে অনেক পথ, অনেক বাঁক। তবে বিশ্বাস কর সর্বহারা হয়ে ফিরি নি।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। সব হারালে তো আর ফেরার পথ থাকে না।

প্রেমা কথান্তরে গেল, এ ক'দিনের ভেতর হোটেলে গিয়েছিলি?

ওরে বাবা ও-সবের ভেতর আমি নেই। ওটা প্রেমা মেননের রাজ্যের এলাকাভুক্ত।

কতদিন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে এভাবে এড়িয়ে বেড়াবি? এদিকে তো বলছিস অ্যাডাল্ট হয়ে গেছিস।

তোমার ঐ গোমড়ামুখো ম্যানেজার যতদিন ওখানে থাকবে ততদিন ওমুখো হচ্ছে না সরিতা মেনন।

কেন রে, মিঃ রায় তো তোফা ভদ্রলোক। তাছাড়া দারুণ অনেস্ট। দেখ না হোটেলের ইনকাম কি পরিমাণ বেড়ে গেছে।

সরিতা বলল, ঐ জন্যেই তো বলেছিলাম ভদ্রলোক বড় কঠিন ঠাঁই। বান্ধবীদের কোনদিন হোটেলে নিয়ে গেলে জানিস দিদি একেবারে চিনতেই পারে না। কড়ায় গণ্ডায় পাওনা আদায় করে তবে ছাড়ে।

প্রেমা খুব একচোট হেসে নিয়ে বলল, এ মাস থেকেই মিঃ রায়কে দুটো ইনক্রিমেন্ট দিতে হবে।

সরিতার গলায় বিস্ময়ের সুর, কেন?

তোকেও যখন ছাড়ে নি তখন তার অনেস্টি আনকোয়েশ্চেনেবল। আর তাই ডবল ইনক্রিমেন্ট দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করা উচিত।

খুব যে মালিকানা দেখাচ্ছিস!

প্রেমা বলল, তুই ইনডাইরেক্টলি সার্টিফাই করলি যে।

সরিতা বলল, অমন মানুষকে সার্টিফাই করতে আমার ভারি বয়েই গেছে।

তুই একটুতে ক্ষেপে যাস কেন বল তো! মানুষটা নিজের বাড়ি-ঘর ছেড়ে কতদূরে এসে পড়েছে। তার কথাটা তো একটু ভাবতেই হবে।

সরিতা বলল, তুই যত খুশি ভাব আর দরাজ হাতে দান করে যা। আমার ওসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। হ্যাঁ শোন, আজ কি প্রোগ্রাম তোর।

সকালবেলাটা ঘরে থাকব, দুপুরে একটু বেরুবো।

কোথায়?

সম্ভবত প্যালেস হোটেলের দিকে।

ব্যস আর কোথাও না?

ভাল লাগছে না রে।

সরিতা অমনি বলল, তা হলেই হয়েছে। মেজাজ সরিফ না থাকলেই তো তুই বারে ঢুকবি।

তুই কি ভগবান, সব জানতে পারিস?

সরিতা বলল, নিজের হোটেলে তো বার রয়েছে সেখানে ড্রিংক করতে পারিস?

প্রেমা বলল, জমে না। স্থান মাহাত্ম্য আছে তো। পরকীয়া প্রেম চিরদিনই বেশি আকর্ষণীয়।
তোর ফিলজফি নিয়ে তুই থাক, আমি একটু বেরুবো।
তা যা যেখানে খুশি। রাতে ফিরবি তো?
না ফিরে উপায় আছে?
কেন?
তুই কি অবস্থায় ফিরিস তা দেখতে হবে তো।
প্রেমা আবার হাওয়ায় মিষ্টি শব্দ ছড়িয়ে হাসল।
হাসি থামলে বলল, তুই যা হুল্লোড়বাজ, বন্ধুদের সঙ্গে জমে গেলে আর ঘরে ফেরার কথা মনে থাকবে না।
সে দেখা যাবে। আমি একটু আলেপ্‌পির দিকে যাব।
আলেপ্‌পি!
তুই যেন বিলেতে আছিস বলে মনে হচ্ছে। আজ যে ওনামের বোট রেস রে।
সত্যি আমি একটা যা তা হয়ে গেছি না রে? দেশের ঐতিহ্য টৈতিহ্য সব ভুলে মেরে বসে আছি।
এসব প্রতিভার লক্ষণ।
বল বল। আমার যখন বলার কিছু নেই তখন তোর বকুনিগুলো শোনা ছাড়া উপায় কি।
সরিতা এত ভোরে বিছানা ছাড়ে না। কিন্তু আজ ক'দিন ধরে সে খুব সকাল সকালই উঠছে। ঘরের সামনে তিন চারটি কাজের মেয়ের সঙ্গে সেও উৎসবের ফুল সাজায়।
প্রেমার ওসব ব্যাপারে ঔৎসুক্য কম। সে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের ক্রিয়াকলাপগুলো দেখে। সেদিন পাড়ার মেয়েরা সরিতার ডাকে ওদের ঘরের আঙিনায় জড়ো হয়েছিল। তারা ঘুরে ঘুরে নেচেছিল কৈকট্টিকলি। প্রেমা ওদের সঙ্গে যোগ দিতেই ওদের নাচে যেন আনন্দের তুফান উঠেছিল। প্রেমাকে ওরা একটু আলাদা চোখে দেখে। ওর দেশজোড়া নাম ওকে ওর বয়েসী মেয়েদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তাদের আচার আচরণ দৃষ্টিপাতে প্রেমার ওপর তাদের সম্ভ্রমের পরিমাণ বোঝা যেত। সেই প্রেমা যখন সাধারণ নাচের আসরে এগিয়ে ওদের হাত ধরল তখন ছোট্ট আসরে উৎসাহের বান ডেকে গেল।
অনেকক্ষণ সেদিন হাততালি দিয়ে সবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নেচেছিল প্রেমা। সরিতাও নাচে যোগ দিয়েছিল কিন্তু গানের গলা তার উঠেছিল সবার ওপরে।
নাচতে নাচতে প্রেমা তো প্রায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। এত ভাল গলা সরিতার! সরিতা মাঝে মাঝে গানের চর্চা করে তা সে জানে। তার নাচের সঙ্গে বেশ কয়েকটি বাঁধাধরা গানও সে সুন্দর গলায় অবলীলায় গেয়ে যায়। কিন্তু এ গলা যে একেবারে নতুন। সম্মোহনী মন্ত্রের মত এই গলায় গাওয়া গান শ্রোতাকে মুহূর্তে আবিষ্ট করে ফেলে। গলায় এ যাদু কি করে আয়ত্ত করল সরিতা!
সেদিন তার কৌতূহলের সন্তোষজনক কোন উত্তরই সে সরিতার কাছ থেকে পায় নি কিন্তু আজ তার কাছে সব স্বচ্ছ হয়ে গেছে। ভালবাসার ছোঁয়ায় মনের ভেতর ধুলো জমে পড়ে থাকা অলখ বীণা আশ্চর্য সুরে বেজে ওঠে। এ সুরের সঙ্গে গায়কের কোন পূর্ব পরিচিতিই নেই। তার ভেতর দিয়ে অন্য কোন নামী শিল্পী যেন গেয়ে যায়। বাল্মীকির হঠাৎ পাওয়া শ্লোক যেমন তার অনুশীলনের ফল নয় ঠিক তেমনি ভালবাসার স্পর্শে যে রাগিণী জন্ম নেয় তাও গায়কের পরিশীলিত গলার সৃষ্টি নয়। সে হঠাৎ পাওয়া এক অভাবনীয়।
সরিতা তাহলে ইন্দ্রকে ভালবাসে। শুধু খবর গোপন রাখার জন্যে তার সঙ্গে মিথ্যার একটুখানি মিষ্টি অভিনয়। সৎ সুন্দর সুশোভন এই বাঙালী তরুণটি। এর সঙ্গে সরিতার একান্ত প্রিয় সম্পর্ক গড়ে তোলবার বাধা কি আছে।
ওকে দেখতে পায়নি ওরা। বোট রেসের শেষে ওরা চলে গেল হাত ধরাধরি করে। প্রেমা তার গাড়িটা দিতে চেয়েছিল সরিতাকে কিন্তু সরিতা নিতে চায়নি। হেসে বলেছিল, তোর গাড়ির নম্বর দেখলেই তোর ফ্যানেরা ছুটে এসে গাড়িখানা ছেঁকে ধরবে তারপর যখন গাড়ির ভেতর তোকে পাবে

না, তখন মারতে মারতে আমাকে থানায় নিয়ে যাবে।

থানায় কেন।

গাড়ি চোর বলে। ভি আই পি-র গাড়ি হাওয়া করে দেওয়ার অপরাধে।

মজা করে কথাগুলো বললেও প্রেমার গাড়ি কিন্তু নেয়নি সরিতা।

বলেছিল, আমি বন্ধুদের গাড়ি ম্যানেজ করে নেব। অন্যকে অয়েল করে তার তেল পোড়াব।

প্রেমা হেসেছিল, কোন কথা আর তখন বলেনি। পরে প্যালেস হোটেলের বার থেকে বেরিয়ে মনে হল তার, সরিতাকে আলেপ্পি থেকে গাড়িতে তুলে নিলে মন্দ হয় না। এসেও ছিল। কিন্তু ওদের দিকে তাকিয়ে ডিস্টার্ব করতে ইচ্ছে হল না। ওদের একান্তে চলে যেতে দিল প্রেমা। না, কোন বান্ধবীর গাড়িতেই ওরা ফিরল না। হয়ত বাসে ফিরবে অথবা ট্যাক্সি ধরে নেবে পথে। যে করেই ফিরুক, প্রেমা এই মুহূর্তে ওদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইল। ভালবাসার মুহূর্তগুলোতে মানুষ ইচ্ছে করেই দুঃখ পেতে চায়। রোজকার সুখ-সুবিধাগুলোকে এড়িয়ে চলাতেই আনন্দ।

ওদের ভালবাসার আবীর ছড়ান আকাশের দিকে চেয়ে প্রেমা কিছু সময় দারুণ খুশী হয়ে উঠেছিল। তারপর ধীরে ধীরে একটা বিষণ্নতা দূর কোন পল্লীর ধূসর সন্ধ্যায় ছড়িয়ে পড়া ধোঁয়ার মত তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। একটা ঘর বাঁধার স্বপ্ন সে কেন এতদিন দেখল না। শুধু জীবনটাকে ফুলের মত ফুটিয়ে তুলল ডালে ডালে। ঝরিয়ে দিল গাছের তলায়। সবাই বাহবা দিল ফুল ফোটানোর খেলা দেখে। কেউ বা কুড়িয়ে নিল গাছের তলার ফুল। গন্ধ শুঁকল মুঠিভরে। তারপর। তারপর দু'দণ্ডের আনন্দ উল্লাসের শেষে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

প্রেমা তার ভাবনার আকাশে হঠাৎ ভেসে-আসা একটুকরো কালো মেঘকে এড়িয়ে যাবার জন্যে গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়ি একটা নির্জন রাস্তা পেরিয়ে এসে পড়ল মেন রোডে। সামান্য কিছু সময় চলার পর আবার কায়েলের ধার দিয়ে রাস্তা শুরু হল। নারকেলের বন চলেছে পাশে পাশে। একটু ভেতরের দিকে লোকালয়।

হঠাৎ সমবেত গলায় একটা গানের সুর ভেসে এল। গাড়ি এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে সুরটাও অনেক কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। পরিচিত সেই ওয়াঞ্চীপাটের সুর। গাড়িখানা আসরের কিছু দূরে কতকগুলো নারকেল গাছের আড়ালে রেখে দিল প্রেমা।

গাঁয়ের মানুষেরা ঐ বিশেষ পরিচিত গানের সুর ধরেছে, আর সেই ওয়াঞ্চীপাটের সুরে নাচছে একটি মানুষ। চেণ্ডা বাজছে। বাজছে ইলত্তালম্ আর মাদলম্। দ্রুত লয়ে নাচছে নর্তক। পাশে জ্বলছে লম্বা পেতলের ভিলক। তার মরা হলুদ আলোয় ভালো করে দেখা যাচ্ছে না নর্তকের মুখ। কিন্তু প্রেমার অভিজ্ঞ চোখ ধরে ফেলেছে এ সাধারণ জাতের নর্তক নয়।

নাচের ভেতরে ঘন ঘন করতালি পড়ছিল। নাচ থামলে হৈ হৈ করে উঠল গ্রাম্য মানুষগুলো।

তারপর নর্তককে দারুণ ভাষায় সাধুবাদ জানাতে জানাতে মানুষগুলো সব চলে গেল। যাবার সময় সম্ভবত কিছু প্রীতি-দর্শনী দিয়ে গেল নর্তককে।

ভিলক জ্বলছিল। নাচের শেষে মানুষটি তার মুখের রঙ তুলে আটপেটিতে গোছগাছ করে তুলছিল পোশাক-আশাক।

প্রেমা গাড়ি থেকে নেমে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সে ভাবতে পারেনি তার জন্যে এতবড় একটা চমক অপেক্ষা করে আছে।

হ্যাঁ, দেবন। অনেক আগেই তার চেনা উচিত ছিল। এমন অনায়াস দক্ষ নর্তকের অন্য নাম দেবন।

প্রেমার দিকে পিঠ রেখে বসেছিল দেবন। একটি একটি করে খুলছিল পারত্তিকা মণি, কারুত্তারম, কোল্লারম্, পাডি আরঞ্জানম।

হস্তকটকম্ খোলার জন্যে বামবাহু দক্ষিণ মণিবন্ধে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমা পেছন থেকে ধরে ফেলল দেবনের হাতখানা। চমকে ফিরে তাকাল দেবন।

বিস্ময় চোখে, বিস্ময় গলার স্বরে, তুমি! প্রেমা!

কি মনে হচ্ছে? প্রেমা অনেক বদলে গেছে?

না, সে-কথা নয়। বরং মনে হচ্ছে তুমি বদলে যাওনি। সারা দেশের কাগজে যার ছবি, সে হঠাৎ যদি এই অখ্যাত জায়গায় এসে দাঁড়ায়, তাহলে তার পরিবর্তন হয়েছে কি করে বলি।

দেবন তার নিজস্ব ধারায় আবার গোছগাছে মন দিল।

প্রেমা বলল, তোমার কি দু'দণ্ড স্থির হয়ে কথা বলারও সময় হবে না দেবন?

দেবনের হাত বন্ধ হয়ে গেল। চুলে ভরা মাথায় একবার আঙুল চালিয়ে দেবন উঠে দাঁড়াল। হেসে বলল, এত প্রশংসার কথা শুনেও কি তোমার তৃপ্তি হয়নি প্রেমা? ভাল খাবার খেতে খেতে মানুষের যখন মুখ বদলের দরকার হয় তখন তারা অতি সাধারণ খাবাব খেতে চায়। তোমার কি তাই?

প্রেমা বলল, তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসিনি দেবন, তোমার কথা শুনতেও নয়। আকস্মিকভাবে চলার পথে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চিনতে না পারলে চলে যেতাম। কিন্তু সে কথা থাক। বন্ধু বলেও তো আমরা দু-চারটে কথা বলতে পারি।

দেবন অনেক কাছে এগিয়ে এসে অসংকোচে প্রেমাব হাত ধরল।

তুমি তেমনি অভিমানী রয়ে গেছ প্রেমা।

প্রেমা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল, তুমি ঠিক তেমনি অহংকারী।

দেবন বলল, আমি বুঝি দারুণ দাম্ভিক?

তোমার আচরণ তাই বলে।

দেবন অকৃত্রিম গলায় বলল, বিশ্বাস কর প্রেমা নাচ আমি ভালবাসি, কিন্তু নাচের ব্যাপারে গর্ব করার কথা ভাবতেও পারি না।

প্রেমা সহজ হল। সে বলল, আজ দৈবাৎ তোমার সঙ্গে দেখা, কিন্তু বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আমি দারুণভাবে চাইছিলাম তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাক।

দেবন কৌতুকের হাসি হেসে বলল, তোমার উত্তর ভারত বিজয়ের খবর পেলাম জন্মভূমি পত্রিকায়।

বিজয় বলছ কেন দেবন। বলতে পার দেশ দেখে বেড়ালাম।

মিঃ পিল্লাই তোমার দারুণ শুভানুধ্যায়ী। তিনি জন্মভূমিতে তোমার লালসিয়া বিজয়ের খবর সবিস্তারে লিখেছেন। তোমার সোনার মুকুট পাওয়ার খবরও পেয়েছি।

ফিরে এসে মিঃ পিল্লাইয়ের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। মনে হয় সরিতার কাছ থেকে খবর সব পেয়েছেন।

দেবন বলল, তোমার দেখা পাওয়া যত কঠিন, তোমার খবর পাওয়া তত সোজা।

প্রেমা অমনি বলল, তুমি এত দুর্লভ যে তোমার দেখা অথবা খবর কোনটাই পাওয়া সম্ভব নয়।

দেবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, দুর্লভ বলতে চাও বল। তবে সমঝদারের চোখের সামনে থেকে আমি অনেক দূরে সরে এসেছি। এখন আমার চারদিকে যারা ভিড় করে আসে, তারা অতিসাধারণ মানুষ প্রেমা। সারাদিন নৌকো বাইবার পর অথবা ক্ষেতখামার চষার পর তারা আকণ্ঠ কোল্লম গেলে। তারপর আসে আমার নাচ দেখতে। ভাল লেগে গেলেই হৈ-হৈ করে ওঠে। ওরা আমাকে পুরস্কারও দেয়। নাচের শেষে আমি না চাইলেও ওরা আমাকে ছাড়ে না। পাকড়াও করে কাঁধে তুলে নিয়ে ওদের জেলে বস্তি আর কিষাণ পাড়ায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। জান প্রেমা, ওদের বাড়ির মেয়েরা আমাকে কত যত্ন করে খেতে দেয়। নিজেদের রান্নাকরা খাবারের ভাগ থেকে টেনে নিয়ে আমার খাবার থালা সাজায়।

তুমি ভাগ্যবান দেবন। সত্যিকারের ভালবাসার স্বাদ তুমি পেয়েছ। কিন্তু .....

কথাটা বলতে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ থেমে দাঁড়াল প্রেমা।

প্রেমাকে থামতে দেখে দেবন বলল, কিন্তু কি প্রেমা?

ক্ষোভে অভিমানে সেই মুহূর্তে জল এসে গেল প্রেমার চোখে। সে ঝড়ের বেগে ভেতরে জমে থাকা রুদ্ধ আবেগটাকে মুক্ত করে দিয়ে বলল, কি অধিকার আছে তোমার এমনি করে নিজেকে নষ্ট করার। এই কি তোমার জায়গা? তাহলে এত কষ্ট করে এত সব নাচের মুদ্রা শিখেছিলে কেন? ওরা

তোমাকে ভালবাসতে পারে কিন্তু তোমার ঐ নাচের মর্যাদা দেবার কানাকড়ি ক্ষমতাও ওদের নেই।

তা আমার অজানা নয় প্রেমা।

কান্না আর ক্ষোভ মিশে গেছে প্রেমার গলায়, তবে এখানে পড়ে থাকা কেন?

গুনিজনেরা আমাকে কি চায় প্রেমা?

কেউ না চাইলেও একজন তোমার প্রতিভাকে ঠিকই চিনে নিয়েছিল দেবন। আর সে প্রায় প্রতিদিন তোমাকে সারা হৃদয় ঢেলে তার শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে।

দেবন প্রেমার ছেড়ে দেওয়া হাতখানা আবার নিজের মুঠোয় ভরে নিয়ে বলল, সে আমার অচেনা নয় প্রেমা। আর সে আমার মনের থেকে বেশি দূরেও নয়।

প্রেমা এবার নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে দেবনের দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতেই ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন দেবন।

কোথায় তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাও প্রেমা?

আপাততঃ আমার কাছে, তারপর ভারতের শ্রেষ্ঠ সমঝদারদের চোখের সামনে। আমি তাঁদের জানাতে চাই প্রতিভাবান তদ্বির কিংবা তোষামোদের দাস নয়। প্রতিভাকে খুঁজে পেতে হয়, আবিষ্কার করতে হয়।

তুমি আমার জন্যে এত ভাব প্রেমা?

প্রেমার চোখে জল মুখে হাসি। সে মাথা নেড়ে জানাল, একটুও না।

দেবন হাসল। হাসিটা অনেকখানি মেঘের ফাঁক থেকে করুণ আলোর মত ফুটে উঠল।

কিন্তু।

আর কোন কিন্তু নেই দেবন।

কথা দিচ্ছি তোমার সঙ্গেই যাব প্রেমা। তবু যাবার সময় এই মানুষগুলোকে ভুলতে পারছি না। আমার দুঃখের দিনে এরাই আমাকে ভালবাসা আর প্রেরণা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। সবাই একদিন ভুলে যায় প্রেমা, কিন্তু এই মানুষগুলো একবার কাউকে বুকের মাঝখানে টেনে নিলে মরার আগে আর ভোলে না।

তোমার কথাগুলো সত্যি দেবন, তবু ওদের ছেড়ে চলে যেতে হয়। শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কখনও লোকরঞ্জনের জন্যে নয়। এর জন্যে চিরদিনই গুণীর নিক্তির কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। গুণীর সামান্য একটুকরো প্রশংসা সাধারণের হাজার হাততালির চেয়ে অনেক দামী দেবন।

মানি, কিন্তু তোমার সে গুণী কই যাঁর চোখের সামনে দাঁড়ালে ভক্তিতে আপনিই মাথাটা নুয়ে আসে। তাঁর কাছ থেকে ফিরে এলে নিজেকে ছোট বলে মনে হয় না।

আছে দেবন, তবে সংখ্যায় তাঁরা অনেক কম। যাঁরা মুরুব্বি সমঝদার সেজে হাঁকডাক করে বেড়ান, তাঁরাই আজ বাজার জাঁকিয়ে বসে আছেন। আমাদের কানাকড়ি দরকারও তাঁদের কাছে নেই। গুরু পাণিক্কর, মাধবী আম্মার মত গুরু যতকাল আছেন আমাদের সাধনার বস্তুগুলো নিয়ে বার বার তাঁদের কাছে যাচাইয়ের জন্যে যেতে হবে।

আমার আর কোন কথা নেই প্রেমা। এখন থেকে তোমার ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছা মিলে গেল। চল যেখানে নিয়ে যেতে চাও।

প্রেমা আজ জয়ী হয়েছে। যাকে ঘিরে তার এতদিনের স্বপ্ন তাকে সে নিজের ইচ্ছার পথে চালাতে সমর্থ হয়েছে। এতবড় একটা প্রতিভাকে বিনষ্টির হাত থেকে উদ্ধার করতে পেরে একটা গভীর তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে তার মন। মূল্যবান একখণ্ড হীরেকে সে আসল জহুরীর কাছে যাচাই করে ফিরবে। তাদের বলতে হবে, এ হীরে সহজে পাবার নয়। তখন মহামূল্য মণির মত সে তাকে তুলে নেবে তার শিরোভূষণ করে। সে আর কিছু চায় না, শুধু দেবনকে চায়। তার সম্পদ তার সম্মান তার সাধনার সকল সঞ্চয় সে নির্দ্বিধায় দেবনের হাতে তুলে দেবার জন্যে প্রস্তুত।

এই মুহূর্তে প্রেমার মনে হলে, বিচিত্র জীবনের বহু অভিজ্ঞতার পথ পেরিয়ে সে এখন এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার দুচোখ আকুল আবেশে বন্ধ হয়ে আসতে চাইল।

সারা ভারত থেকে শিল্পী নির্বাচন করে আনতে হবে। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর চেয়ে প্রতিশ্রুতিবান শিল্পীর দরকারই বেশি। পরিকল্পনা চলতে থাকে। নতুন দল গড়ার উত্তেজনায় দৈনন্দিন জীবনের রুটিনগুলো দমকা হাওয়ায় কোথায় উড়ে যায়। দেবন আর প্রেমা বেরুবে দিগ্বিজয়ে। তার আগে চাই উপযুক্ত সৈন্য নিয়ে বাহিনী গঠন। ওরা দুজনে ঘুরে বেড়াবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। ক্ল্যাসিক্যাল নাচের সঙ্গে থাকবে লোকনৃত্য। দলে চাই সব রকম শিল্পী। শিল্পী নির্বাচন সবচেয়ে বড় কথা। তার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব। পর্বত প্রমাণ সমস্যা। কিন্তু তাকে অতিক্রমের ইচ্ছা আকাশ ছোঁয়া।

দেবনকে দেওয়া হয়েছে সান-অ্যান্ড-সী হোটেলের প্রশস্ত একখানা ঘর। ওখানেই প্রেমা পরিকল্পিত নতুন দলের অফিস। রাত দিন দুই শিল্পী ওখানে বসে প্ল্যান তৈরি করে চলেছে। নতুন ব্যালে গ্রুপের নামকরণ করা হয়েছে 'সঙ্গম'। পরিকল্পনায় প্রেমা মেনন আর রূপকার দেবন।

উত্তরে হিমাচল দক্ষিণে সাগর। তার মাঝে উপবীতের মত মিলন সূত্রটি বেঁধে দিয়েছে গঙ্গা। গোমুখ থেকে বেরিয়ে পাহাড় পর্বত পার হয়ে সমভূমিতে নেমে এসেছে নদী! তারপর সাগর সঙ্গমে সে পেয়েছে তার পূর্ণতা।

প্রাচীন পুরাণের ভগীরথ উপাখ্যান দিয়ে শুরু ওদের ব্যালে। পর্বত আর নদী তীরের বিচিত্র জীবন-ছন্দ রূপায়িত হবে নৃত্যের মাধ্যমে। এখানে পাহাড়ী স্রোতধারার মত অজস্র লোকনৃত্যের ধারা এসে মিলবে মূল কাহিনীর নৃত্যরূপের সঙ্গে। নদী যেখানে নগর ছুঁয়ে আসছে সেখানে ক্লাসিক্যাল নাচের রাজকীয় সমৃদ্ধি। সাগর সঙ্গমে ভারতের সব রকম নৃত্যের চুম্বক প্রদর্শিত হবে। তারপর চলবে সমুদ্র মন্থন লীলা। এর পরেই অমৃত নিয়ে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব। সব শেষে নৃত্য মঞ্চে মোহিনীর আবির্ভাব। নৃত্যে বিমোহিত করে অমৃত নিয়ে প্রস্থান। নীলকণ্ঠের নৃত্য। মোহিনী মায়ায় মোহগ্রস্ত শিবের মোহিনীর সঙ্গে যুগল নৃত্য। শেষে মোহিনী আর শঙ্করের মিলনে শাস্তার জন্ম। আইআপ্পানের পূজারতিতে নৃত্যের সমাপ্তি।

প্রেমা বলে, তুমি ভগীরথ।

দেবন অমনি বলে, তাহলে তুমি গঙ্গা।

আমি কি তোমার নমস্য?

প্রতিটি নারীই প্রবাহিনী। গঙ্গা গোদাবরী নর্মদা কৃষ্ণা কাবেরী। প্রতি নদী নমস্য।

ব্যালের শুরুতে তুমি ভগীরথের ভূমিকা নিলেও শেষে তোমার ভূমিকা কিন্তু শঙ্করের।

দেবন বলে, আর তুমি মোহিনী।

প্রেমা আশ্চর্য মোহিনী দৃষ্টি হানে। মনে মনে বলে, চিরদিনই আমি যেন তোমার চোখে মোহিনী মায়ার অঞ্জন পরাতে পারি দেবন।

পরিকল্পনা আর প্রস্তুতি নয়, এ যেন তপস্যা। দুজনের সীমাহীন উত্তেজনা, অন্তহীন ভাবনা। আরব সাগরের উদ্বেলিত তরঙ্গের নিরন্তর উচ্ছ্বসিত আবেগে ভেঙে পড়ার মত।

অনেক রাতে ঘরে ফেরে প্রেমা। হোটেলে দেবন আর সে একই সঙ্গে কাজের ফাঁকে ডিনার শেষ করে নেয়।

সেদিন রাতে ঘরে ফিরে এল প্রেমা। তখন রাত গভীর। সে একখানা চিঠি পেয়েছিল হোটেলের ঠিকানায়। দেবন তখন নৃত্য কাহিনীর ভেতর কোথায় কি ধরনের নাচ দেওয়া যায় তাই নিয়ে মগ্ন ছিল চিন্তায়। পাশে বসে তাকে সাহায্য করছিল প্রেমা। হোটেলের বেয়ারা চিঠি দিয়ে গেল। খামের পাশে প্রেরকের নাম চোখে পড়তেই চঞ্চল হয়ে উঠল প্রেমা। চিঠিখানা সে তখন না খুলেই রেখে দিল ব্যাগের ভেতর। এক উত্তেজনার তরঙ্গের ওপর আছড়ে পড়ল আর এক উত্তেজনার ঢেউ! মগ্ন দেবন কিছু জানল না, প্রেমাও নির্বাক হয়ে নিজের চিন্তার ভেতর ডুবে রইল।

ডিনারের পরে প্রেমা বলল, আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে দেবন।

দেবন হেসে বলল, সরিতা আবার না তোমার শরীরের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

প্রেমা ম্লান একটুখানি হেসে উঠে পড়ল।

সে কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘরে ফিরল না। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলল প্যালেস হোটেলের দিকে। বারে ঢুকে একটা কোণ বেছে নিয়ে বসল। ড্রিঙ্কের অর্ডার নিয়ে সার্ভ করে গেল ওয়েটার। স্তিমিত আলোয় জয়কিষণের চিঠিখানা খুলল সে।

প্রেমা,

তোমার নামের আগে একটা কিছু বিশেষণ বসাব বলে অনেক ভেবেও কূল না পেয়ে নিরাভরণই রাখলাম। ভাবছি, আভরণের দরকারই বা কি। তোমার নাচের প্রতিটি মুদ্রা প্রতিটি এক্‌প্রেশানই তোমার আভরণ।

কবে তুমি যেন এখান থেকে চলে গেলে। তারপর একটা শূন্যতা লালসিয়া স্টেটের চরাচরের ওপর স্থির হয়ে রইল। নাটমণ্ডপ নিস্তব্ধ। কত যুগ আগে যেন নূপুরের ধ্বনি উঠেছিল। তারপর হঠাৎ থেমে গেছে সবকিছু। নটী তার চঞ্চল পায়ের নূপুর খুলে রেখে চলে গেছে। স্মৃতির নিঃশব্দ যন্ত্রণায় ভুগছে নাটমণ্ডপ।

যে শাল অরণ্যের ভেতর আমরা শেষের ক'টি দিন হাত রেখে ঘুরেছি, পাতার প্রলাপ শুনেছি, এখন তারা একেবারে নির্বাক। বেলা শেষে ঘোড়া নিয়ে ওপথে ফিরে আসার সময় দ্রুত পথটুকু পেরিয়ে আসবার জন্যে ঘোড়া ছুটিয়েছি, কিন্তু তাতে নিঃশব্দ অরণ্যের বুকের ধ্বনির মত শুনিয়েছে ঘোড়ার খুরের শব্দ।

তোমার লালসিয়া ছেড়ে চলে যাবার দিনটির কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। ট্রেন পর্যন্ত সারাটা পথ আমার বুকের ভেতর তোমার চুলে ভরা মাথাটা রেখে দিয়েছিলে। একটা মিষ্টি গন্ধ পাপড়ি খোলা ফুলের মত আমার সমস্ত চেতনাকে স্পর্শ করেছিল, আচ্ছন্ন করেছিল।

তুমি হঠাৎ এক সময় বলে উঠলে, তোমার মন থেকে মধুবন্তীর স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে যাক, এ আমি চাই না জয়কিষণ। তাই নিজেকে সরিয়ে রাখছি তোমার কাছ থেকে।

আমি কোন উত্তর দিতে পারি নি। মধুবন্তীর কাছে যেমন চরম অপরাধী হতে চাই নি, তেমনি চাই নি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে সেই মুহূর্তে বুকে চেপে ধরতে। যতদিন ভালবাসা সীমাহীন উত্তেজনায় দেহের তটে না আছড়ে ভেঙে পড়ে ততদিনই ভালবাসার পরমায়ু প্রেমা। তাই সমস্ত দেহমন ধরে রাখতে চাইলেও তোমাকে যেতে দিয়েছি, আমাদের অনুচ্চারিত ভালবাসাকে (যদি অবশ্য তুমি একে ভালবাসা বলে মনে কর) অনেক দিন ধরে বুকের মধ্যে পুষে রাখার জন্যে।

এই দেখ তো চিঠির শুরুতেই ভালোবাসার দর্শন নিয়ে আলোচনা জুড়ে দিয়েছি।

দোলনকে তুমি চিঠি লেখ আর আমি লোভীর মত তার প্রতিটি ছত্র পড়ে পড়ে দেখি। যদি দোলনের চিঠিতে জয়কিষণের সামান্য প্রসঙ্গও কর্পূরের শেষ সুরভির মত লেগে থাকে।

দোলন তোমাকে চিঠি লেখে। সে লেখা আমি দেখতে পাই না। কিন্তু তোমার চিঠি এলে দোলন আমার টেবিলে রেখে যায়। অমনি আমার নির্জন নিঃসঙ্গ দিন তোমার উপস্থিতিতে ভরে ওঠে।

সেদিন হঠাৎ দোলনের কনভেন্টের কি যেন একটা ছুটি ছিল। ও আমাকে অবাক করে দিয়ে একাই এসে হাজির হল। আসতে হলে আমার কেয়ার-টেকারকে সঙ্গে নিয়েই ও আসে। কিন্তু একেবারে একলা এই ওর প্রথম।

আমি মনে মনে অবাক হলেও মুখে ওকে বাহ্‌বাই দিলাম। ও আমার বড় দুঃসাহসী মেয়ে। কিন্তু মনটা ওর ঐ গঙ্গার মত করুণায় ভরা।

ও এসেই আমাকে অনেকক্ষণ ধরে আদর করে তোমার চিঠি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, পড়ে দেখ বাবা।

চিঠিখানা পড়লাম। ঐ চিঠিতেই তোমার ব্যালে গ্রুপ গড়ে তোলার খবর পেলাম। সারা ভারতে এমন কি ইন্ডিয়ার বাইরেও যে তুমি দল নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্ন দেখছ তা জানতে পারলাম।

তোমার চিঠির শেষে তুমি লিখেছ, এত বড় একটা কাজের ঝুঁকি নিয়ে হয়ত তুমি সময় মত দোলনকে চিঠি লিখতে পারবে না তাতে ও যেন কিছু মনে না করে।

দোলন কিছু মনে করবে কিনা জানি না তবে আরও কেউ দোলনের কাছাকাছি আছে যে কিছু মনে করতে পারে। তোমার কাছ থেকে সে মানুষটা আর কিছু চায় না শুধু তোমার ধাপে ধাপে এগিয়ে চলার খবরটুকু ছাড়া।

আর এক জায়গায় তুমি ছোট্ট একটু রসিকতা করেছ। যদিও ছোট তবুও তাকে কৌতুক বলে ফেলে দিতে পারলাম না। তুমি লিখেছ লালসিয়ার পাহাড়গুলোর মত যদি আমার টাকার পাহাড় থাকত তাহলে আমি আমার নাচের দলবল নিয়ে চাঁদের দেশেও চলে যেতে পারতাম।

তোমার ঐ সামান্য কথার সূত্র ধরে আমাকে কি একটুখানি ধৃষ্টতা দেখাতে দেবে প্রেমা? দোলনের সঙ্গে বেলা শেষে বেড়াতে বেরিয়ে ঐ শাল জঙ্গলের ভেতর বসে তোমার চাঁদের দেশে যাবার পাথেয়ের কথা তুললাম। দোলন অমনি বলল, তুমি না মায়ের নাট মণ্ডপের জন্যে অনেকগুলো টাকা আলাদা করে রেখেছিলে। তাই দাও না আন্টিকে।

বিশ্বাস কর প্রেমা এ আমার কথা নয়, তোমার অনেক আদরের দোলনের কথা। ও সত্যিই তোমাকে ভালবাসে।

আমি জানি তুমি এখন তোমার কাজের ভেতর ডুবে আছ, তাই চিঠিকে আর দীর্ঘ করতে চাই না। তবে আবার একবার শুধু এটুকু বলার অনুমতি দাও যে প্রেমার কাজে জয়কিষণ সামান্য কিছু অংশ নিতে পারলেও নিজেকে সুখী মনে করবে।

তোমার জয়।

কয়েকবার চিঠিখানার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রেমা এক সময় উঠে দাঁড়াল। প্যালেস হোটেলের বাইরে তখন অন্ধকার। কৃষ্ণপক্ষের কোন এক তিথি। চাঁদ তখনও আকাশের আসরে এসে পৌঁছয়নি। হোটেলের প্রবেশ প্রাঙ্গণে একটা আলো কর্তব্যনিষ্ঠ প্রহরীর মত অন্ধকার লুঠেরাদের কোন রকমে ঠেকিয়ে রেখেছে।

প্রেমা গাড়ি চালাল বাড়ির পথে। দু'পাশের নারকেল অরণ্য পিছলে সরে যাচ্ছে পেছনে। এক একটা টিলা এগিয়ে আসছে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। স্পীডে গাড়ি চলছে! বাঁকগুলোতে গাড়ির আওয়াজ উপচে উঠছে।

প্রেমার মনে হচ্ছে তার পাশে বসে আছে জয়কিষণ। সে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলেছে লালসিয়ার পাহাড়ী পথে।

প্রেমা ভাবছে সে আর প্রেমা মেনন নয়, সে লালসিয়া স্টেটের কুমারবাহাদুর জয়কিষণের নতুন পরিণীতা বধূ প্রেমা গর্গ। সদ্য মুসৌরী থেকে হানিমুন সেরে ফিরছে লালসিয়া। জয়কিষণ, জয়কিষণ, জয়কিষণ। বুকের ভেতরে ভেতরে ক্রমাগত বাজছে ঐ নামটা। একটা উদ্বেল সুখ আরব সাগরের ঢেউয়ের মত আছড়ে আছড়ে পড়ছে সোনালী জম্বরে ঢাকা বুকের ওপর। ভিজিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সবকিছু।

সামনের পথ আবছা হয়ে উঠতে প্রেমা ব্রেক কষল। সুখের কুয়াশায় কখন ভিজে উঠেছে চোখের পাতা।

চোখ মুছল প্রেমা। স্বপ্নের জগৎ থেকে এখন ফিরে এসেছে সে। জয়কিষণ নেই। নির্জন পথ। নিস্তব্ধ চরাচর। ঘড়ি দেখল। কয়েক মিনিট পরেই মধ্য যামে গড়িয়ে যাবে রাত। প্রেমা আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল। সামান্য সময়ের ভেতরেই সে এসে পড়ল তার ডেরায়।

ওপরের ঘরে আলো জ্বলছিল। সরিতা এখনও ঘুমোয় নি। মেয়েটা বড্ড ঘুম কাতুরে। সাড়ে দশটার ভেতরেই ঘুমিয়ে পড়ে পড়াশোনা খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে। আজ ও জেগে রয়েছে এতক্ষণ! প্রেমা একটু অবাক হল বৈ কি !

গাড়ি থেকে নেমে সোজা উঠে গেল ওপরে। সরিতা বিছানার ওপর বসে কি যেন একটা বই পড়ছিল। প্রেমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে বই রেখে তাকাল।

কিরে তুই যে বড় এতক্ষণ জেগে?

সরিতা বলল, তোর জন্যে।

আমার জন্যে আবার তুই কবে জেগে থাকিস?

জাগি না, তবে আজ জেগে আছি।

কি ব্যাপার বল তো? প্রেমেটেমে পড়েছিস নাকি? সমাধান করতে পারছিস না একা একা?

কথা বলতে বলতে প্রেমা সরিতার পাশে বসে তার পিঠে হাত রাখল। সরিতা হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। সে প্রেমার একখানা হাত টেনে নিয়ে তার পাতায় মুখখানা ঢেকে ফেলল। প্রেমা হাতখানা সরাতে গিয়ে দেখল সরিতা শক্ত করে ধরে আছে।

কি হল তোর পাগলী! বল না আমাকে?

অন্য হাতখানা দিয়ে জড়িয়ে ধরল সরিতাকে।

সরিতা কোন কথা বলতে পারল না। সে প্রেমার হাতে মুখখানা ঘষতে লাগল।

আমি জানি তুই ইন্দ্রকে ভালবাসিস। বিয়ে করতে চাস, এই তো?

আরও জোরে প্রেমার হাতখানা মুখে চেপে ধরল সরিতা।

যখন হাত সরিয়ে নিতে পাবল প্রেমা তখন চোখের সামনে একটা স্থলপদ্ম ফুটে উঠল। লজ্জা আর অনুরাগের যুগল আভায় সারা মুখখানা স্থলপদ্মের রূপ নিয়েছে।

সরিতা অন্য দিকে চেয়ে বলল, তুই বিয়ে না করলে আমি কক্ষনো বিয়ে করব না দিদি।

আবার প্রেমা হাত রাখল সরিতার পিঠের ওপর। বলল, শিল্পীরা সবার মত ঘর বাঁধতে পারে না সরিতা। শিল্পের সঙ্গেই তাদের মিলন হয়। সমাজের মন্ত্র পড়া বাঁধনে তাদের মন বাঁধা পড়ে বলে আমি বিশ্বাস করি না। যেখানে সুন্দর সেখানেই তাদের মনের যোগ। কিন্তু সেও তো স্থায়ী নয়। এক সুন্দর থেকে আর এক সুন্দরে তার উড়ে উড়ে ফেরা। তাই আমার বিয়ের কথা তুই ভাবিস না সরিতা।

সরিতার চোখ দুটো জলে টলটল করে উঠল।

প্রেমা তার মুখখানা নিজের দুটো হাতের পাতায় তুলে ধরতেই কয়েক ফোঁটা তপ্ত ধারা গড়িয়ে পড়ল প্রেমার হাতে।

প্রেমা বলল, তুই এত ভাবছিস কেন বল তো? সুখী হওয়া, তৃপ্তি পাওয়া নিয়েই তো কথা। একজন মানুষের মন যেখানে এসে সুখ পায় সেখানেই তার সব সেরা আশ্রয়।

সরিতা বলল, সাবা জীবন তুই এমনি করে কাটাবি, আমি ভাবতেও পারি না। এতে তুই সত্যি কি সুখ পাবি দিদি?

প্রেমা একটু চিন্তা করে বলল, সুখ পাই কিনা তা বলতে পারি না সরিতা। তবে বার বার এক একটা মানুষের মনের কাছ থেকে সরে সরে আসার সময়ে যে দুঃখ পাই তা নতুন সৃষ্টির জোয়ার এনে দেয়। এ আমার এই সামান্য জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

সরিতা এবার প্রেমার চোখের ওপর তার কাতর দুটো চোখের দৃষ্টি ফেলে বলল, আঘাতে আঘাতে একদিন ঝাঁঝরা হয়ে যাবে বুকখানা। তখন কি আর তোর সৃষ্টির শক্তি থাকবে?

প্রেমা হেসে বলল, সেদিন তুই না বলেছিলি মালী আমাদের বাগানের অনেকদিনের গোলাপ গাছটা তুলে ফেলে দিয়েছে। আমরা সেদিন দুঃখ পেয়েছিলাম গাছটার কথা ভেবে। কতদিন ঐ গাছের আধ ফোটা ফুল চুলে গেঁথে নিয়ে কত অনুষ্ঠানে গেছি। সে বারে বারে ফুল ফোটানর খেলা দেখিয়ে আমাদের অবাক করে দিয়েছে। কিন্তু একদিন যখন তার খেলা থেমে গেল তখন তাকে সরে যেতে হল বাগান থেকে। ও যে এতকাল তার বুকের পাঁজর ফাটিয়ে রক্তের মত তাজা গোলাপ ফুটিয়েছিল সে কথা বড় বেশি করে কেউ মনে রাখবে না। তবে আমরা যে ওর দেওয়া ফুল মাথায় গুঁজে অনেকের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছি ওখানেই ত ও সমঝদারের স্মৃতির মধ্যে বেঁচে রইল সরিতা।

তুই কি কাউকে জীবনে গভীর করে ভালবাসিস নি?

প্রেমার দৃষ্টি এবার নিজের গভীরে ডুব দিল। সে বলল, ভালবাসার স্বাদ আমি পেয়েছি সরিতা। যখন যাকে ভালবেসেছি তখন গভীর করেই বেসেছি। সেখানে কোন ছলনা বা খাদ ছিল না। কিন্তু আমি এটুকু অনুভব করেছি, কোন একজনকে সারা জীবন ভালবাসা যায় না। কারণটা আমি মনে মনে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয়েছে কোন একটি মানুষের ভেতর ভালবাসা আকর্ষণের

সব উপাদান নেই। বোধহয় থাকা সম্ভবও নয়। ডেভিডের ভেতর কিংবা মিঃ পিল্লাই অথবা জয়কিষণের ভেতর ভাল লাগার অনেক উপাদান আছে কিন্তু একজনের ভেতর তো সব পাওয়া যাবে না। এদিকে মনের চাহিদার তো শেষ নেই। ওদের ভালবেসেছি খণ্ড খণ্ড সময়ের এক একটা নির্জন সীমার ভেতর। আবার মন কখন ভেঙে বেরিয়ে গেছে ঐ সীমার গণ্ডি। ঠিক প্রজাপতির সোনালী গুটি ভেঙে বেরিয়ে আসার মত।

সরিতা বলল, তুই দেবনকে ভালবাসিস না দিদি?

এখনও তার মনের পুরোপুরি ছবিটা আমি দেখতে পাই নি, বোধহয় তাই তাকে ঘিরে এখন আমার মন ভালবাসার সোনালী জাল বুনছে। আর তাছাড়া....

কথার মাঝখানে থেমে গেল প্রেমা।

তাছাড়া কি?

তদ্‌গত প্রেমা বলল, দেবন নিজেকে এমন একটা জায়গায় সরিয়ে রেখেছে সেখানে সবাই যেতে পারে না। ওর সাধনার সেই জায়গায় পৌঁছে করাঘাত করলেও যে দ্বার খুলবে এমন সম্ভাবনা কই!

সরিতা বলল, আমার মনে হয় তোর বন্ধু দেবন সবার চেয়ে স্বতন্ত্র।

সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না সরিতা। ও দেবতার মত স্থির। বলতে পারিস ওকে ঘিরে আমাদের উৎসব। ও নিজের মনের আনন্দ থেকে ফুটে ওঠা একটা ফুল। ওর চারদিকে ভালবাসার প্রজাপতিরা শুধু নেচে নেচে ফিরে যায়।

সরিতা বলল, বিশ্বাস কর দিদি দেবনকে মুখোমুখি দেখলে মনে হয় ও যেন সূর্য। সামনে এলে মুখে একটা হাসির আভা দেখা যায় কিন্তু ভাল করে দেখলে বোঝা যায় ও হাসি কারু জন্যে নয়। ও ওর মনের ভাবনার ছড়িয়ে পড়া দীপ্তি।

প্রেমা উত্তর করল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

প্রসঙ্গে ছেদ ফেলে এক সময় বলল, এখন দেবনের কথা থাক, ইন্দ্রের কথা বল।

সরিতা বলল, ও অতি সাধারণ দিদি।

প্রেমা বলল, সাধারণই জীবনে সুখ দিতে পারে সরিতা। যত ব্যথা অসাধারণকে বুকে ধরার স্বপ্ন দেখলে।

সরিতা হঠাৎ বলল, তুই কি করে ইন্দ্রের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাটা জানতে পারলি দিদি?

প্রেমা হাসল। বলল, তুই যে আমার বোন। এক রক্ত শরীরে। তাই তোর মনের কথা জানা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়!

ও সব কথা ছাড়। সত্যি করে বল না দিদি কি করে আঁচ করলি?

বার বার আমি ইন্দ্রের কাজের যখন প্রশংসা করি তখন তুই খালি খুঁত ধরিস। তখনই মনে হয়েছে কোথায় যেন একটা লুকোচুরি চলেছে। আর তাছাড়া পৃথিবীটা গোলাকার বলে দু'জন ভিন্ন দিকে চলা শুরু করেও একদিন এক জায়গায় মুখোমুখি হলাম।

মানে?

মানে খুব সোজা। ওনামের বোট রেস দেখতে তুই বন্ধুকে নিয়ে পালালি আর আমি প্যালেস হোটেল থেকে বোনকে গাড়ি করে আনব বলে ছুটলাম আলেপ্‌পির দিকে। সেখানেই ভিড়ের ভেতর দেখলাম যুগল মিলন।

সরিতা দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

প্রেমা বলল, ভেবেছিলি খুব ধুলো দিলাম দিদির চোখে। কিন্তু নাচ শিখে আর কিছু হোক বা না হোক চোখের যে উন্নতি হয়েছে সেটা বুঝলাম ভিড়ের ভেতর তোদের আবিষ্কার করে।

সরিতা চোখের থেকে হাত নামিয়ে বলল, ডাকলি না কেন?

আমি কি বাল্মীকির ব্যাধ যে বেরসিকের মত দুটি কুজনরত পাখির দিকে বাণ ছুঁড়ব!

সরিতা হঠাৎ প্রেমার হাত ধরে ভেঙে পড়ে বলল, এখন আমি কি করি দিদি।

ভাবছি। প্রথমেই ইন্দ্রের কিছু সাজা হওয়া দরকার। ওকে হোটেল থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব

সরাতে হবে।

চমকে উঠল সরিতা। চোখে মুখে ফুটে উঠল অসহায় একটা ছবি। কথাগুলোকে ভেঙে জড়িয়ে বলল, বিশ্বাস কর, মানে ইন্দ্রকে তুই ভুল বুঝবি না। ও বেচারার কি দোষ বল। আমি তো ওকে ভালবেসেছি। কতদূর থেকে এসেছে তোর কাছে চাকরি নিয়ে। এখন চাকরি গেলে বেচারার কি হাল হবে। দোষ আমার, তুই আমাকে শাস্তি দে।

প্রেমা বলল, একেবারে হাবুডুবু যে রে! তা ইন্দ্র ছেলেটা বেশ। যেমন দেখতে তেমনি কাজের। তবে ওকে তো আর হোটেলে রাখা চলবে না। বোনের বর হতে চলেছে তার সম্মান নেই। লোকে বলবে ম্যানেজারের সঙ্গে মালিকের বিয়ে হল। আগে ম্যানেজারকে মালিক করি তারপর বিয়ে দেব বোনের সঙ্গে।

কোথায় পাঠাবি ইন্দ্রকে ?

সে ভাবনা আমার। মোট কথা দেশান্তরী করব না। তবে আপাততঃ কিছুদিন সরিতা মেননের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা সাক্ষাতটা বন্ধ থাকবে।

মরে যাব তাহলে।

সে কি রে! এত ঘন ঘন দেখা হতে থাকলে যে সবকিছু চটপট পুরোনো হয়ে যাবে।

সরিতা আঙুলে আঙুল বেঁধে চুপচাপ বসে রইল দেখে প্রেমা বলল, ঘাবড়াস কেন। গাড়ি তো রয়েছে আর আরব সাগরটাও উধাও হয়ে যাচ্ছে না। গাড়ি নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবি দুজনে। রাতে ইচ্ছে হলে সমুদ্রের বালির ওপর বসে গল্প ফাঁদবি। মোট কথা সবার চোখের সামনে নয়।

সরিতা এক মুখ হাসি ছড়িয়ে বলল, তাহলে সব ঠিক আছে।

প্রেমার চোখে লাগল এবার ভাবনার ছোঁয়া। বলল, নতুন একটা ফিসারি তোর আর ইন্দ্রের নামে করে দেব ভেবেছি। ওটা ইন্দ্রই ম্যানেজ করবে। ও এখন কিছুদিন ফিসারি গড়ার কাজে থাক কোচিনে। মাঝে মধ্যে ও আসুক, তুইও যাবি।

দারুণ মজা হবে। সরিতা কলকলিয়ে উঠল।

প্রেমা অমনি বলল, মজা বলে মজা! রায় অ্যান্ড মেনন ফিসারিজের লঞ্চে বসে আরব সাগরের জলে মাছ ধরার আছিলায় যখন গভীর জলে ডুব দিবি দুই পার্টনার তখন আর যা হোক অন্তত ঘণ্টা কয়েকের জন্যে নিরীহ মাছগুলো বেঁচে যাবে।

সরিতা ছেলেমানুষের মত হেসে উঠে প্রেমার হাতখানা টেনে ধরে বলল, তোকেও একদিন তোর লাভারের সঙ্গে ঐ লঞ্চটা দেব ঢেউয়ের ওপর দোল খাবার জন্যে।

প্রেমা বলল, আমার লঞ্চের দরকার হবে না। স্টেজের ওপরেই পার্টনারের সঙ্গে ইচ্ছে হলে দোল খাব।

প্রেমা শেষ রাতে বিছানা ছেড়ে উঠল। চাঁদের একটুকরো আলোয় দেখল ঘুমন্ত সরিতার মুখখানা। ঘুমের ভেতরও সুখের একটা ছবি ফুটে উঠেছে সরিতার মুখে। প্রেমার এত আনন্দ হল যে চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল।

প্রেমা পাশের ঘরে গিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে চিঠি লিখতে বসল।

তুমি চিরদিন আমার কাছে একটা বিস্ময়চিহ্ন হয়ে রইলে। কয়েকটা বিহ্বলকরা রাতের স্মৃতি আমাকে আজও অবাক করে দেয়। সেই হরিদ্বারে গঙ্গার শব্দ শুনতে শুনতে রয়েল হোটেলে পাশাপাশি ঘরে রাত কাটান। ঘুম ছিল না কারু চোখে। মুসৌরীর সেই হারিয়ে যাওয়া রাতে ঘুম ভাঙল তোমার কোলে মাথা রেখে। তোমার উদ্বেগ আর আনন্দেভরা বুক থেকে বেরিয়ে আসা তপ্ত একটা নিশ্বাস আমার মুখের ওপর এসে পড়ল। তারপর লালসিয়াতে কটি রাতের স্মৃতি। দোলন নেই। বিরাট মধুবন্তী মহলে মুখোমুখি বসে জীবনের কত টুকরো গল্প বলে যাওয়া। দূর উপত্যকায় কুয়াশা আর জ্যোৎস্নার

আলোয় জড়িয়ে থাকার ছবি দেখা। সত্যি সে যেন এক রহস্যের যাদু মহল পেরিয়ে পেরিয়ে আমাদের কটি দিন কটি রাত পাশাপাশি চলা। তখন নিজেকে মনে হত একটি মোমের পুতুল। তোমার বুকের উত্তাপে গলে নিজের সবকিছু হারিয়ে ফেলব।

কিন্তু তুমি তা হতে দাওনি। তোমার বুকের শব্দে আমি আমার সুখের মৃত্যুর ডাক শুনেছি। যখন মরণটাকে বরণ করে নেবাব জন্যে তৈরি তখন তুমি অমিত বীর্যবান কোন পুবাণ পুরুষের মত নিজেকে সরিয়ে রেখেছ।

আমি কথার ছলে জেনেছি অতিথিকে উৎসবমঞ্চে ডেকে এনে তুমি কোনরকমেই তাকে অসম্মানিত করতে চাও না। যদিও আমি তাকে অসম্মান বলে কোনদিনই মনে করতাম কিনা জানি না।

কিন্তু আমিও পুরোপুরি এগিয়ে যেতে পারলাম কই জয় আমার মোহিনীমায়ার অমোঘ অস্ত্রগুলো নিয়ে। কাছে গিয়েও দেখেছি তোমার আমার মাঝখানের ছোট ব্যবধানটুকু ভরে রেখেছে আর একটি অদৃশ্য সত্তা। সে তোমার মনের লীলাসঙ্গিনী মধুবন্তী। তাকে উপেক্ষা করার শক্তি তোমার ছিল না আর তাকে পেরিয়ে যাবার সাহসও আমি কোনদিন পাইনি।

জয়, ওটা আমাদের চিত্ত জয়ের একটা সাধনপর্ব বলে ধরে নাও না কেন। এতে হয়ত আমাদের হেরে যাবার দুঃখ কিছুটা লাঘব হবে।

এবার তোমার আর একখানা ছবির পাশে এসে দাঁড়াতে হল। তুমি তোমার অযাচিত সাহায্যের হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছ আমার দিকে। তোমার দান উপেক্ষা করার শক্তি আমার নেই। তবু একটা কথা শুধু জানিয়ে রাখি, আমার বাবা দুবোনের জন্যে যা রেখে গেছেন তা অফুরন্ত না হলেও একেবারে পরিমিত নয়। তাই আমাকে আগে আমার সঞ্চয়গুলো কাজে লাগাবার সুযোগ দাও। তারপর তোমার অক্ষয়দানে আমার হাত পড়বে।

দোলন যে তার বাবার যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে তা সোনার শিরোপা পাবার দিনেই বুঝেছিলাম। সে যে আবার তার মাতৃধন আমার হাতে তুলে দিতে চাইছে এতে আমি তার আকাশের মত মন আর আলোর মত উদার হাতে সবকিছু বিলিয়ে দেবার পরিচয় পাচ্ছি। যাকে আদর জানাতে পারলাম না তার প্রতিনিধিকে বুক উজাড় করা ভালবাসা জানালাম।

তোমার প্রেমা।

প্রেমা আর দেবন পুরোপুবি একটি বছর সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ মঞ্চগুলোর পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াল। কখনো তাদেব দেখে মনে হল পুষ্পিত বসন্তের রঙীন সজ্জায় পুষ্পধনু রতি; কখনো বা যুগল যোগাসনে ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি পার্বতী। আবার কখনো শরত আকাশে উড়ে চলা হংসমিথুন।

দর্শক বিহ্বল। সংবাদপত্র গুণী শিল্পীযুগলের প্রশংসায় সরব। সবচেয়ে আশ্চর্য, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দর্শকেরা দুজনকে অভিন্ন যুগল শিল্পী বলে ধরে নিয়েই তাদের অনুষ্ঠান দেখতে লাগল।

এ হল প্রেমা আর দেবনের শিল্পী আর অর্থ সংগ্রহের অভিযান। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতকারে তারা জানাল তাদের প্রাণ-গঙ্গার পরিকল্পনার কথা। সাগব সঙ্গমে ভারতাত্মার পূর্ণ রূপের কথা। তাবা আবার আসবে তাদের সঙ্গম ব্যালে গ্রুপ নিয়ে। তাদের ধ্যানের ভারতবর্ষকে তারা রূপ দেবে নৃত্য কাহিনীর ভেতর দিয়ে।

শিল্পী সংগ্রহ করল তারা পঞ্চনদের দেশ থেকে। গঙ্গা বিধৌত উত্তর ভারত থেকে। গুজরাটের শস্যক্ষেত্রের শিল্পীরা এল তাদেব দলে। মণিপুরের গোপরাস আর কর্তাল চোলম, পাঙ্গ চোলমের কৃতী শিল্পীরা তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে। শিল্পীতে শিল্পীতে ঈর্ষা নয়, অভিন্ন হৃদয়ের মিলন। উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের শিল্পী সমন্বয়ে এক অখণ্ড ভারতের সংস্কৃতি-সত্তা।

যেন উত্তরের হিমবন্তের তরঙ্গিত তুষারের ঢল কল্লোল উচ্ছ্বাসে নেমে এল দক্ষিণ পশ্চিম সমুদ্র লক্ষ্য করে। প্রেমার হোটেল রূপান্তরিত হল ব্যালে গ্রুপের সাময়িক আবাসে।

স্থগিত রইল ইন্দ্রের কোচিন যাত্রা। সরিতার লোক দৃষ্টির আড়ালে প্রিয় অভিসার। তার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শিল্পী সঙ্ঘের পরিচর্যার ভাব নিজেদেব হাতে তুলে নিলে।

রাতে ঘুম ভেঙে যায় প্রেমার। চিন্তার মুকুলে দেহ রোমাঞ্চিত। পাশে শুয়ে সরিতা। আজকাল দিদির সঙ্গে একই বিছানায় তার বিশ্রাম। বড় চঞ্চল হয়ে গেছে সরিতার ঘুম। প্রেমার পাশ ফেরার আওয়াজে সে জেগে উঠল।

কত রাতে শুলি। এখুনি ঘুম ভেঙে গেল তোর! কি করে ভোরে নাচের রিহার্সেল দিবি বল?

জোরে একটা শ্বাস ফেলে প্রেমা বলল, ঘুম আসছে না সরিতা। বার বার মনে হচ্ছে এতবড় একটা কাজ পণ্ড না হয়ে যায়।

তা কেন হবে। দেবন আর তুই দেখছিস নাচের দিক। আর আমরা দুজন ম্যানেজমেন্টের দিকটা। বেশ তো এগিয়ে চলেছে। এখন এমন নার্ভাস হয়ে পড়লে চলে।

প্রেমা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। এক সময় বলল, সবিতা, আমার বুকের ভেতরটা একবার হাত দিয়ে দেখ। কেমন দ্রুত ওঠা-পড়া করছে।

কেন তুই আবার এমন করছিস বলতো?

প্রেমা বলল, শোন, দেবনের জন্যে বড় ভাবনায় পড়েছি।

কেন, কি হল তার?

দেবনের ধ্যান ভাঙাবার জন্যে তরুণী শিল্পীরা একযোগে যেন উঠে পড়ে লেগেছে।

তাই বুঝি! কিন্তু দেবনকে কাছে থেকে দিনের পর দিন দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছে, দেবন অপরাজেয়।

প্রেমা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হয়ত তাই। কিন্তু .....।

কিন্তুটা আবার এলো কোত্থেকে?

সেদিন দেখলাম ওর গলায় কাগজের ফুল দিয়ে তৈরি একটা মালা।

জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় পেলে?

ও অমনি দারুণ খুশীর বান তুলে বলল, সুদর্শনা দিয়েছে।

বললাম, সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে।

শিশুর মত সরল হাসিতে ভরে উঠল ওর মুখ। আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেল ওর রুমের ভেতর। বাক্স খুলে বের করল একটা ধুতি উত্তরীয় আর মাথার পাগড়ী। বলল, এও সুদর্শনা দিয়েছে।

বললাম, বড় ছিমছাম সুন্দর পোশাক। কিন্তু উপলক্ষ্যটা কি দেবন?

মনে হল দেবন লজ্জা পেয়েছে। এক সময় ও বলল, ডিসেম্বরে আমার জন্ম মাস। সেদিন কোভালম বীচে বেড়াবার সময় ওরা কথায় কথায় জেনে নিয়েছিল। তাই সুদর্শনা এগুলো দিয়েছে। অবশ্য জন্মতিথি আমার তিরুআদিরা, এখনও সে তিথি আসে নি।

হেসে বললাম, এ পোশাকগুলো পরে তুমি আবার না মণিপুরী হয়ে যাও।

দেবন বলল, কর্তালচোলমে সেদিন আমি অংশ নিয়েছিলাম, এই পোশাক পরে। ভ্রমরের মত ঘুরে ঘুরে যখন নাচ হচ্ছিল তখন সুদর্শনারা খুব হাততালি দিলে।

নীলকণ্ঠ শর্মা বলল, আশ্চর্য! তুমি এমন তাল লয় রেখে নাচলে কি করে! বিশ্বাস কর বহু বছরের সাধনা না হলে এমন ময়ূর খঞ্জন পদক্ষেপ আর দেহ-ভঙ্গিমায় নাচা সম্ভব নয়।

আমি বললাম, তোমরা আমাকে যে নাচের পোশাক পরিয়ে দেবে কয়েক বার দেখেই আমি অবিকল ঐ নাচ নেচে যাব।

আমি তখন দেবনকে বললাম, তুমি তো কোনদিন আমাকে তোমার জন্মদিনের কথা বল নি।

দেবন আবার লজ্জা পেল। বলল, আমি কি ক্ষণজন্মা পুরুষ যে সবাই আমার জন্মদিনের কথা জানবে।

সুদর্শনাদের সৌভাগ্য তারা তোমার জন্মদিনের খবর পেয়েছে। মনে হচ্ছে সুদূর মণিপুর থেকে তারা এসেছে তোমাকে অভিনন্দন জানাতে।

অমনি দেবন কি বলল জানিস? বলল, ওরা বড় ভাল তাই না প্রেমা?

বললাম, কতটা ভাল জানি না, তবে আমার চেয়ে যে ভাল তা বলতে পারি।

ততক্ষণে ও বুঝল, এটা আমার অভিমানের কথা।

ও আমার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে কারু তুলনা অন্তত আমি করতে যাব না প্রেমা। তোমাকে যারা চেনে না তারা যা খুশী তাই করুক।

এতবড় কমপ্লিমেন্টের যোগ্য আমি নই দেবন।

নিজের যোগ্যতা বিচারের ভার নিজের হাতে নাই বা তুলে নিলে। ওটা থাক না আমাদের হাতে।

আমি ও প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম সেদিন।

সরিতা বলল, কিন্তু এতে দেবনের ধ্যান ভাঙার কোন লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে কি ?

হয়ত নয় সরিতা তবে রিহার্সেলের শেষে মেয়েরা ওকে বীচে ধরে নিয়ে গেলে ও বেশ খুশী হয়েই ওদের সঙ্গে চলে যায়।

সরিতা বলল, এটা তোর ঔদার্যের অভাব। অনেক দূর জায়গা থেকে সবাই এসেছে। ওরা একজন তরুণ গুণী শিল্পীর সঙ্গ যদি চায় কিছুক্ষণ তাতে অন্যায়ের কি আছে।

প্রেমা আত্মমগ্ন গলায় বলল, আমি দিন দিন মনের দিক থেকে বড় ছোট হয়ে যাচ্ছি, তাই না রে! আমি তো কোনদিন এমন ছিলাম না।

সরিতা বলল, লক্ষণটা শুভ। দেবনই বুনে দিয়েছে তোর মনে ঈর্ষার বীজ। ঈর্ষা নইলে ভালবাসার জোয়ার জাগবে কি করে।

প্রেমা এবার হাসল। বলল, এরই ভেতর এত অভিজ্ঞতার আগুিল হয়ে বসে আছিস?

তা কিছু কিছু হয়েছে বই কি। সে যাক। কিন্তু তুইও তো যেতে পারিস দেবনের সঙ্গে বীচে বেড়াতে। সবার থেকে তুই আলাদা হয়ে থাকিস কেন।

সবাই যা পারে আমি তা পারি না সরিতা। তুই কোনদিন আমাকে দেখেছিস দল বেঁধে হৈ-হুল্লোড় করে বেড়াতে ? মনের ভেতর আমার একটা নিঃসঙ্গ জগৎ আছে। সেখানে আমি একা থাকতেই ভালবাসি। মনের মত কোন মানুষ পেলে কেবল তাকেই সেখানে ডেকে নি। আমার সবকিছু উজাড় করে দেওয়া শুধু তার কাছেই।

সরিতা বলল, দেবনকে তেমন করে ডাকলে সাধ্য কি তার তোকে উপেক্ষা করে।

প্রেমা জানালার বাইরে চোখ রেখে কি যেন ভাবল। এক সময় বলল, শুধু আমাকে এগিয়ে যেতে হবে সরিতা আর কেউ এগিয়ে আসবে না আমার দিকে ?

সরিতা এর কোন জবাব দিল না। প্রেমাকে সে জানে। চিরদিনই একা থাকতে প্রেমা ভালবাসে। তার গুণগ্রাহীর সংখ্যা যত বেশি বন্ধুর সংখ্যা তত কম। একটুখানি হুল্লোড়ের মাঝখানে পড়ে গেলেই সে হাঁফিয়ে ওঠে। নাচের ভেতর সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। একা থাকলে আপন মনে অনেকখানি সময় সে নাচের মুদ্রাগুলো অনুশীলন করে কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু জনতার মাঝখানে তাকে কেমন যেন দিশেহারার মত দেখায়। প্রেমা যথার্থই নির্জনতা ভালবাসে। তার নির্জন জগতে একান্ত মনের মানুষ ছাড়া আর কারু আমন্ত্রণ নেই। প্রেমার চরিত্রের এসব খবর সরিতার অজানা নয়। সে আরও জানে, প্রেমার দেহ সম্বন্ধে কোন সামাজিক সংস্কার নেই। তার ভাল লাগার মানুষের কাছে সে বিনা বিচারে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সে লীলা তার ক্ষণিকের। দেহসুখের পরেও যে বৃহৎ একটা আনন্দের আশ্রয় আছে সেখানে তার নিত্য বিহার। তাই মানসিক বিকারের শিকার তাকে কোনদিই হতে হয়নি।

সরিতা বলল, দুজনেই তোরা শিল্পী। তোদের মিলন তো সহজ হবার কথাই রে। আর্টের খাতিরে দুজনকেই তো এগিয়ে আসতে হবে। সেদিন রিহার্সেল রুমে দেবন আর তুই যখন মোহিনী আর শংকরের নাচ নাচতে নাচতে এক দেহ হয়ে গেলি তখন কে বলবে তোরা স্বামী-স্ত্রী নয়। দেবনের মুখেচোখে সে-কি উগ্র কামনার ছবি! কাউকে পাবার জন্যে উতলা না হলে তো এমন ছবি ফোটে না।

প্রেমার চোখ দুটো করুণ হয়ে উঠল। মুখে ফুটে উঠল একটুকরো হাসি। বলল, দেবন ফিনিশ্‌ড আর্টিস্ট। সে মোহিনী মায়ায় বদ্ধ কামনায় কাতর শিবের ভূমিকা নিয়েছে। সুতরাং সে তখন দেবন নয়, কামার্ত শঙ্কর। আবার যখন নাচে সম পড়ল আর দেবন ঢুকল গ্রীনরুমে তখন তার অন্য চেহারা।

অবুঝ শিশুর মত একটা হাসি মুখে লেগে আছে। আমাকে ঢুকতে দেখে কৌতূহলী একটি কিশোরের মত বলে উঠল, যারা সব দেখছিল বসে বসে তাদের রিমার্কগুলো জানতে পারলে?

বললাম, দর্শকের রিমার্ক জানবার আগে তোমার নিজের পারফরমেন্স সম্বন্ধে ধারণা কি তাই বল?

ও বলল, আমি তো সাধ্যমত মহাদেবের ভূমিকাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

বললাম, ব্যস ওতেই সাকসেস। আমরা নিজেরা তুষ্ট হলেই হল।

আমার ঐ কথাতে দেবন একটি শিশুর মত খুশী হয়ে উঠল। চোখে তার ভালবাসার কোন ছবিই ফুটল না।

এখন ভেবে দেখ সরিতা দেবনের কামনা কাতর চোখে এই মুহূর্তে যে ছবি ফোটায় পরমুহূর্তে তার কোন চিহ্নই আর থাকে না। এ যেন অন্য চোখ ভিন্ন দৃষ্টি। আগের চোখ দুটি যেন দেবন রেখে এসেছে নৃত্যমঞ্চের কোন এক কোনায়।

সরিতা হাসি হাসি মুখ করে বলল, উত্তাপের ছোঁয়া পায় নি কোনদিন। তাপ লাগলেই ওর তুষার-তপস্যা গলে ঝরে প্রবল বন্যার আকার নেবে।

প্রেমা কথায় ছেদ টেনে বলল, ঐ আশাতেই থাক। ওর ওপর জীবনের ভার রাখা আর জলের ওপর দাঁড়ানোর চেষ্টা একই কথা।

সামনে আসছে তিরু আদিরা। শ্রীসম্পদদায়িনী আদ্রা তিথি। ধনু মাস পৌষের পূর্ণিমায় মহাদেবের জন্মলগ্ন। পার্বতীর নিরম্বু উপবাস। পবিত্র পুণ্য মাস।

ঐ উৎসব শেষ হলেই 'সঙ্গম' গ্রুপের শুরু হবে ভারত-পরিক্রমা। এই কটি দিনের অপেক্ষা।

গ্রুপের সবাই গেছে কন্যাকুমারী দেখতে। ট্রি-সী লজের দুটো ফ্লোর বুক করা হয়েছে দুদিনের জন্যে। ওখান থেকে ফিরে এলে প্রেস শো হবে প্যালেস হোটেলের অডিটোরিয়ামে।

এখন সান-অ্যান্ড-সী হোটেল শূন্য। এ সিজিন-এ কোন টুরিস্টকেই হোটেলে স্থান দেওয়া যায়নি।

উজ্জ্বল ডিসেম্বরের দুপুর। চারদিকে সবুজের সমারোহ। ওনাম শস্যের ঋতু। তিরু আদিরাতেও ফসলের দ্বিতীয় সমারোহ। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী কেরালার ঋতুপর্বে সবচেয়ে আকর্ষণীয় কাল। ঝকঝকে রোদ্দুর, প্রকৃতি সবুজ। রাতে ঈষৎ আমেজী শীতলতা।

প্রেমা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সরিতা আর ইন্দ্র এ দুদিন একটুখানি শ্বাস নেবার জন্যে গাড়ি নিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়েছে।

প্রেমার এই ডিসেম্বরের দুপুরটা বড় ভাল লাগছে। সে গাড়ি নেয়নি। ঘর থেকে হোটেলের পথটুকু দেখতে দেখতে যাবে সে। কতদিন পায়ে হেঁটে একটু বেড়িয়ে বেড়ান হয়নি।

ঘর থেকে বেরিয়ে সে এসে দাঁড়াল খামার বাড়ির সামনে। কটি মজুরানী কাজ করছে। সম্ভবত কোন একটা ফসল ঝাড়াইয়ের কাজ। কাঞ্জির সঙ্গে মুরে মিশিয়ে খাচ্ছে ওদেরই কটি ছেলেমেয়ে। পান্তা আর ঘোল খেতে পেলে ওরা আর কিছু চায় না। দিনে ক'বার ধরেই চুক চুক করে খায়। পাশে পাতা ঢাকা চারুয়ম খুলে মা কিছুটা কাঞ্জি তুলে দিল ছোট ছেলেটির পাত্রে। ওরা সারাদিন কাজ করছে। কতটুকুই বা দিনমজুরী পায় তবু ছেলেমেয়ে নিয়ে এই কর্মব্যস্ত দুপুরে ওরা কত সুখী।

প্রেমা সেখান থেকে পা চালিয়ে এসে পড়ল বড় রাস্তায়। রাস্তা বড় কিন্তু মানুষজন বড় একটা নেই। এই দুপুরে হয় অফিস ঘরে নয়তো ক্ষেত-খামারে কাজের ভেতর রয়েছে ওরা।

বাঁদিকে কায়েলের জল চক চক করে উঠল। সূর্যের কিরণগুলো জলের ওপর রুপোলী মাছের মত ঝলকাচ্ছে। মাথায় বিশাল টুপি পরে ছোট্ট এক চিলতে কদুম্বু ভাল্লমে চেপে মাছের আশায় কায়েল ঢুড়ছে এক তোপিকোড়া।

প্রেমা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। কি আশ্চর্য ব্যালেন্স ওদের। ডোঙার কানায় কানায় জল। একটু নড়াচড়া করলেই ডোঙাটা নির্ঘাত ডুবে যাবে কায়েলের থৈ থৈ জলে। কিন্তু ওরই ভেতর নিখুঁত ভারসাম্য রেখে লোকটি প্রয়োজনের কাজটুকু সেরে নিচ্ছে।

প্রেমার মনে হল, সে যখন বাম চরণ দক্ষিণ জানুর ওপর তুলে এক পায়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে

তখন এমনি অনায়াস দক্ষতার ভাবটি নিজের ভেতর আসা দরকার।

তারপর মনে হল জীবনের জটিল সমস্যা আর ঝুঁকির মাঝখানে দাঁড়িয়ে এমনি স্থির হয়ে থাকতে পারলে সব সমস্যাই সহজ হয়ে আসে।

কথাটা ভাবতে ভাবতে প্রেমার মনে হল সে অনেকখানি মুক্ত, অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেছে।

আবার চলতে লাগল প্রেমা পথের ওপর দিয়ে। পাশের নারকেল বাগানে ঠক ঠক করে কটা গুটি ঝরে পড়ল। এই অকিঞ্চিৎকর শব্দটুকুও কান থেকে এড়িয়ে গেল না প্রেমার। চেল্লিতে ডাবের গুটি কুরে কুরে কেটে ফেলছে। ভোমরার মত উড়ে এসে নিঃশব্দে তাদের ধ্বংসের কাজ করে চলেছে।

জীবনের কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্দেহ সংশয় চেল্লি কীটের মত মনের ভেতর এসে পড়ে। তারপর অলক্ষ্যে কুরে কুরে বুকখানাকে ঝাঁঝরা করে দিয়ে চলে যায়। কত সবুজ সুন্দর ভাবনা ছোট নারকেলের গুটির মতই পুষ্ট হবার আগে খসে ঝরে যায়।

একটা আম্বালমের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। সবুজ নারকেল গাছের ভেতর দিয়ে ওর কলসাকৃতি মণ্ডুড়ম পানপাতার মত শীর্ষ নিয়ে পবিত্র এক ধরনের সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে। একটি মেয়ে মাথায় পীচিপুর সাদা মালা পরে তেঙ্গা তপ্পমের ভেতর দিয়ে ঐ মন্দিরের দিকেই চলেছে। প্রেমা অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল। যতক্ষণ না মেয়েটি ঘন নারকেল গাছের বনে অদৃশ্য হল ততক্ষণ ও চোখ ফেরাতে পারল না। ও এখন চলতে চলতে ভাবতে লাগল মেয়েটির কথা। প্রিয় কোন মানুষের স্বপ্ন বুকে ভরে নিয়ে ও হয়ত দেবতার কাছে তার মনের প্রার্থনা জানাতে চলেছে।

প্রেমা ঐ মেয়েটির ইচ্ছা পূরণের জন্য ঈশ্বরের কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানাল।

ও যখন হোটেলে এসে পৌঁছল তখন একমাত্র পাহারাদার সুগদন বাইরে বসে। প্রেমাকে ঢুকতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। প্রেমা খোঁজ নিয়ে জানল দেবন ঐ নারকেল বাগানের পথ ধরে সী-বীচের দিকে গেছে।

প্রেমা এগিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে। নারকেল বাগানের ভেতর এদিক-ওদিক কতকগুলো বেতের চেয়ার সাজান আছে। হোটেল থেকে এই ব্যবস্থা করে রেখেছে ইন্দ্র। যে-সব টুরিস্ট হোটেলে আসবে তারা যাতে নির্জন ছায়াচ্ছন্ন নারকেল কুঞ্জে সঙ্গিনীদের নিয়ে সমুদ্র উপভোগ করতে পারে তারই ব্যবস্থা।

দূর থেকে প্রেমা দেখল দেবন বসে আছে একখানা সাদা রঙের চেয়ারে গা এলিয়ে। পেছন থেকে ওর একরাশ চুলই কেবল চোখে পড়ছে। কাঁধটা চেয়ারের ওপর এলিয়ে দিয়েছে।

দীর্ঘ স্কন্ধ দেবন। চুলগুলো কাঁধে এসে যখন পড়ে তখন প্রেমার কেন জানি না ওর চুল নিয়ে খেলা করতে ভারী ইচ্ছে করে।

প্রেমা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল দেবনের কাছাকাছি। মনে হল দেবন কোন কিছু ভাবনায় ডুবে আছে। ভারী রাগ হয় প্রেমার ওকে ভাবনার ভেতর তলিয়ে যেতে দেখলে। সারা ভারত ঘুরে ওরা যখন শিল্পী সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিল তখনও দেবনের ঐ একই রূপ। কত নিভৃত অবসরে প্রেমা প্রতীক্ষা করেছে তার সতীর্থের কাছ থেকে উত্তপ্ত আহ্বান পেতে, কিন্তু সেই একই মগ্নতা। শিল্পী অথবা শিল্পের কথা নিয়ে বিভোর দেবন। সে যেন এই মাটির পৃথিবীর মানুষই নয়। প্রেমের দেবতা শুধু কি ওকে রূপই দিয়েছেন, একটু প্রাণ দেন নি। যে প্রাণ চঞ্চল হয় ফাল্গুন দিনের নতুন পাতার মত। রঙীন হয় বসন্ত দিনের বনভূমির মত। যে প্রাণ জোয়ারের স্রোতের মত ভাসিয়ে ডুবিয়ে দেয় দুই তীর!

অনেক সময় মনে হয়েছে দেবন চেতনাহীন কোন মূর্তির মত। ওকে দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু জীবনের সঙ্গে জড়াবার কথা ভাবাই যায় না। তবু সরে আসতে পারছে কই প্রেমা দেবনের কাছ থেকে। এমন অবহেলা বলেই কি এত আকর্ষণ।

প্রেমা একেবারে কাছে এসে দেখল দেবন ঘুমিয়ে পড়েছে। বুকের ওপর দুটি হাত আড়াআড়ি পড়ে। নারকেল গাছের দীর্ঘ পাতাগুলো ছায়া ফেলছে দেবনের মুখে। একপালি আলো একফালি ছায়া। যেন শিল্পীকে নাচ দেখাচ্ছে দ্বিপ্রহরের নির্জন প্রকৃতি। চোখ বন্ধ করে তদ্‌গত হয়ে দেবন সেই নাচ মনের গভীরে রুপোলী পর্দায় দেখছে।

সমুদ্রে এখন হাওয়ার দস্যুতা নেই। ঢেউগুলো চুপি চুপি গোপনচারিণী অভিসারিকার মত চুম্বন এঁকে দিয়ে যাচ্ছে সোনালী বেলাভূমিতে।

দেবনের কাছে নিঃশব্দে হাঁটু গেড়ে বসল প্রেমা। তার মনে হল দেবন যেন ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি। আর সে এসেছে পার্বতীর মত তার আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করতে।

সমুদ্র থেকে হঠাৎ বয়ে এল এক ঝলক হাওয়া। নারকেলের ডালপাতা কাঁপিয়ে একটা শব্দ সৃষ্টি করে সে-হাওয়া বয়ে চলে গেল। দেবনের বুক আর মুখের ওপর পড়ে থাকা লম্বা ছায়ার তীরগুলো হঠাৎ যেন প্রাণ পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে হল আড়াল থেকে প্রেমের যাদুকর পুষ্পধনু তীর ছুঁড়েছে দেবনকে লক্ষ্য করে।

সত্যি ঘুম ভেঙে গেল দেবনের। সে চমকে সোজা হয়ে চেয়ারে উঠে বসতে গিয়ে প্রেমাকে পাশে দেখতে পেল।

কখন এলে প্রেমা? আরে আরে মাটিতে বসে যে।

দেবন চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত ধরে তুলল প্রেমার। তখন জ্যোৎস্নার মত একটা মূর্চ্ছা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে প্রেমার চৈতন্য।

দেবন প্রেমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বসিয়ে দিল পাশের চেয়ারে। উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, খারাপ বোধ করছ প্রেমা?

প্রেমা শুধু মাথা নাড়ল। কোন কথা না বলে স্থির চোখে চেয়ে রইল সমুদ্রের ঢেউগুলোর দিকে।

দেবন জানে প্রেমার এই ধরনের ভাবান্তরের মুহূর্তগুলোতে কথা বলা নিরর্থক। সারা ভারত ভ্রমণের সময় বেশ কয়েকবারই সে প্রেমার এরকম মানসিক অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে।

চুপচাপ বসে রইল দুজন পাশাপাশি। এখন আবার হাওয়ার খেলা শুরু হয়েছে সমুদ্রে। ঢেউগুলো আবেগে উত্তাল হয়ে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। প্রেমার শ্যাম্পু করা চুলগুলো তার কপাল আর গালের ওপর নাচের খেলা শুরু করে দিয়েছে। সেদিকে খেয়াল নেই প্রেমার। সে চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। কিন্তু দৃষ্টি তার সেখানে নেই। সে তার বুকের বেলাভূমিতে দেখছে একটা ছবি। দেবন ঢেউয়ের মত দুটো বাহু দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসছে তার বুকের তটভূমি লক্ষ্য করে।

এখন কেমন বোধ করছ প্রেমা?

চমকে চূর্ণ চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে দিতে দিতে প্রেমা বলল, ভাল। খু-উ-ব ভাল।

তুমি ভীষণ রকম মুডি প্রেমা। নিজের ভেতর যখন থাক নাগাল পাওয়া যায় না।

হেসে তাকাল প্রেমা দেবনের মুখের দিকে। বলল, কোনদিন আমার মনের খোঁজ নিতে এসেছ কি দেবন?

আবার দেবনের সারা মুখে সেই অসহায় অবুঝ ছবির রেখা পড়ল। সে শুধু মৃদু হাসল। কোন উত্তর দিতে পারল না।

প্রেমা এবার কথান্তরে গেল।

তুমি তো ওদের সঙ্গে গেলে পারতে দেবন। এখানে একা একা থাকার কোন মানেই হয় না।

দেবন যেন ভারী আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল, একা একা কেন, তুমি তো রয়েছে।

মনে মনে হাসল প্রেমা। দেবনের হাতখানা টেনে নিয়ে বলল, পরীক্ষা করে দেখত প্রেমা নামের মেয়েটি তোমার কাছে আছে কিনা।

দেবন প্রেমার হাতখানা ধরে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। বলল, একেবারে বিশ্বকর্মা শিল্পীর হাতখানা গড়ে তোমার শরীরে যেন বসিয়ে দিয়েছেন। আশ্চর্য তোমার আঙুলের গড়ন।

প্রেমা খুশী হল, দেবনের মুখে তার দেহ-সৌন্দর্যের কথা শুনে। কিন্তু হতাশ হল তার মনের কথাটা বুঝল না বলে।

প্রেমা বলল, যে কোন পুরুষ তোমার ঐ আকৃতি পেলে বিশ্বজয় করতে পারে।

দেবন বলল, সবাই বলে আমার দাদুর শরীরের সঙ্গে নাকি আমার অদ্ভুত সাদৃশ্য। সেদিন তোমার মত রোশেনারাও ঐ কথা বলেছিল।

প্রেমা দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল মনে মনে। কত্থকশিল্পী রোশেনারারও চোখ পড়েছে দেবনের ওপর।

মুখে শুধু বলল, যারা সুন্দর সব মেয়েই তাদের পূজারী হয়।

দেবন সঙ্গে সঙ্গে বলল, মেয়েরাও তোমার মত রূপ পেলে ছেলেরা তাদের জন্যে পাগল হয়।

প্রেমা অমনি বলে উঠল, তারও ব্যতিক্রম আছে।

কি রকম?

নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। তুমি কি কোনোদিন কোন আকর্ষণ বোধ করেছ কারুর জন্যে?

দেবন আজ নিবিড় চোখে তাকাল প্রেমার মুখের দিকে। বলল, বাস্তব জগতের অনেক আইনকানুনই আমার অজানা প্রেমা, কিন্তু তা বলে আমার নিজের সীমা ছাড়িয়ে যাব হয়ত এতটা নির্বোধ আমি নই।

প্রেমা বলল, তুমি অহংকারী দেবন। সীমা মেনে চলা তোমার একটা ছলনা।

সবার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে যদি কোন দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় তাহলে আমি দাম্ভিক। আর সীমা মেনে জীবনের পথে চলার নাম যদি ছলনা হয় তাহলে আমি নিঃসন্দেহে কপট।

প্রেমা সহজ হল। দেবনের হাতখানাতে নাড়া দিয়ে বলল, তোমাকে আজ বড় চঞ্চল করে তুলছি না? তোমার মুখে ক্ষোভের ছায়া তো কোনদিন দেখিনি তাই একটু দেখতে ইচ্ছে হল বলে এত কথা বললাম।

দেবন বলল, কিছু মনে কর না, একটা সত্য আমাকে বলতে দাও। আমি তোমাদের মত সম্পন্ন পরিবারের ছেলে নই। কলেজ ইউনিভারসিটির শিক্ষা-দীক্ষাও নেই আমার। ছেলেবেলা থেকে শুধু একটা শিল্পকে আঁকড়ে ধরে সান্ত্বনা পেয়েছি মনে মনে। তাই বিশ্বাস কর সব ভুলে আমি আমার শিল্পের ধ্যানেই সময় কাটাতে শিখেছি। আমার নিঃসঙ্গ জীবনের সান্ত্বনা বল আর সঙ্গীই বল এই নাচটুকু।

প্রেমা এবারও আর গভীর কোন আলোচনার দিকে গেল না। সে হঠাৎ আলোচনায় ছেদ টেনে দিয়ে বলল, তুমি আমার বন্ধু দেবন, ব্যস। এর চেয়ে বড় পরিচয় তোমার আর কিছুই নেই।

দেবন বলল, তোমাদের স্বীকৃতিতেই আমার সান্ত্বনা। ভাবব আমার বন্ধুভাগ্য ভাল।

প্রেমা সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে এল।

রোশেনারার পারফরমেন্স তোমার কেমন লাগছে?

ওর পায়ের কাজে দর্শকদের চোখকে টেনে রাখবে। তাছাড়া মোগল কসটিউমে ওর চক্করগুলো দেখবার মত।

অনসূয়া পাণিগ্রাহীর ওড়িশি?

দেবন বলল, কবরীহস্তকরণ মুদ্রায় ও যখন সম্বলপুরী লাল শাড়িতে সেজে রুপোর ঝকঝকে অলংকার পরে দাঁড়ায় তখন ওকে কল্পনাব উর্বশী বলে মনে হয়। পদ্ম মুদ্রায় যখন হাতের আঙ্গুল পদ্মের পাপড়ির মত গোল করে মেলে ধরে ঈষৎ হেসে স্থিরদৃষ্টিতে তাকায় আর আলোর রশ্মিটা এসে পড়ে মুখের ওপর, তখন মনে হয় সূর্যের ছোঁয়ায় সারা মুখখানা ওর পদ্ম হয়ে গেছে।

আর সুদর্শনার মণিপুরী?

ওর স্থানক মুভমেন্টের অনায়াস কাজগুলো দেখার মত। শাড়ির স্বচ্ছ সাদা উত্তরীয়খানা কোমরে জড়িয়ে চোলির ওপর লাল-সাদা ফুলের মালাটি দুলিয়ে যখন চলতে থাকে, তখন শ্রীরাধার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে হয়।

ঐ সুন্দর মালাটিই তো তোমাকে দিয়েছে, সুদর্শনা, তাই না?

দেবন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে প্রেমার হাত ধরে বলল, এস আমার সঙ্গে।

ওরা এক সময় এসে ঢুকল দেবনের ঘরের ভেতর। নির্জন হোটেল। ততোধিক নির্জন ঘরখানা। দূরের সমুদ্র দেখার জন্যে একটা জানালা খোলা। শেষবেলার সোনালী উত্তরীয় কাঁপছে সামনের নারকেল পাতার ঝালরে।

দেবনের উদ্দেশ্য প্রেমার অজানা। একটা কৌতূহল কাঁপছে তার চোখের তারায়।

দেবন বাক্‌স খুলে সুদর্শনার দেওয়া মালাখানা বের করে প্রেমার দিকে তুলে ধরে বলল, নাও এ মালা। এতে আমার কোন প্রয়োজনই নেই।

প্রেমা বলল, অমি কারু উচ্ছিষ্ট নেওয়াতে অভ্যস্ত নই দেবন।

এখন এ মালা আমার। একে খুশীমত বিলিয়ে দেবার অধিকারও আমার।

প্রেমার এই মুহূর্তে দারুণ আঘাত দিতে ইচ্ছে করল দেবনকে। কিন্তু পরমুহূর্তে সে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল, প্রাণের থেকে যে পুরস্কার দেবে সেই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পাওয়া। যদি কোনদিন সে পুরস্কার জোটে তাহলে কেবল সেদিনই আমি তোমার সে পুরস্কার অনেক আদরে অনেক মান দিয়ে বুকে তুলে রাখব দেবন।

দেবনের চোখের দৃষ্টি নত হল। সুদর্শনার দেওয়া মালাটা সে ঘরের এককোণে ছুঁড়ে ফেলে দিতে প্রেমা এগিয়ে গিয়ে সে মালা কুড়িয়ে এনে দেবনের হাতে তুলে দিয়ে বলল, একটা হৃদয়কে তুমি এভাবে উপেক্ষা করতে পার না দেবন। সে তোমার জন্মদিনকে স্মরণ করে এ ভালবাসার উপহারটুকু দিয়েছে।

দেবন অভিভূতের মত সে মালা আবার হাতে তুলে নিল।

প্রেমা বলল, আমার একটা অনুরোধ রাখবে আজ দেবন? বলতে পার দারুণ এক খেয়ালী দাবী।

বল।

সেদিন তুমি মণিপুরী পোশাক পরে নেচেছিলে। আমি তোমার সে বেশ দেখিনি। একবার সুদর্শনার দেওয়া সেই ধুতি উত্তরীয় পরে আসবে আমার ঘরে।

দেবন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল। একসময় বলল, বেশ যাও তোমার ঘরে, আমি এখুনি আসছি।

হোটেলে প্রেমার জন্যে নির্দিষ্ট একখানা ঘর। ঘরখানা বেশ বড়। বার্মাটিকের পালিশ করা বড় গোল একটা টেবিলের চারদিকে ক'খানা লাল গদীআঁটা সুদৃশ্য চেয়ার। এই টেবিল ঘিরে বসে গুণী শিল্পীরা প্রতিদিন তাদের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনায় মাতে। ছোটখাট নানারকম পরিবর্তন ও সংযোজন এই ঘরে বসেই স্থির হয়। প্রেমা যে এই গ্রুপের শুধু পরিচালিকাই নয় মধ্যমণি সে কথা সকলেই জানে। কিন্তু প্রেমা সব কাজেই দেবনকে সামনে এগিয়ে দেয়। কোন বিষয়ে মতামত যাচাইয়ের সময় দেবনের মতই চূড়ান্ত বলে মেনে নেয় প্রেমা। নিজের কিছু পরিকল্পনা থাকলে আগেই আলোচনা করে রাখে দেবনের সঙ্গে। কিন্তু সবার মুখোমুখি বসে নিজের মত জাহিরের চেষ্টা করে না সে।

ঘরে এসে ঢুকল প্রেমা। ঘরের কোণে পড়ে থাকা একখানা চেয়ারে বসল সে। থুতনিতে আঙুল ঠেকিয়ে দরজার দিকে চুপচাপ বসে রইল।

প্রেমা যেন প্রেক্ষামঞ্চের এক নিবিষ্ট দর্শক। প্রতীক্ষা করে আছে শ্রেষ্ঠ কোন শিল্পীর আগমনের।

ঘরে এসে ঢুকল দেবন। পলক পড়ছে না প্রেমার চোখে। অনাবৃত উর্ধ্ব অঙ্গ। একখানা সুন্দর মণিপুরী কাজকরা সাদা স্বচ্ছ উত্তরীয় বুকের দুই প্রান্ত দিয়ে নেমে গেছে জানু পর্যন্ত। পরনে তেমনি শুভ্র ধুতি। হাতে দুলছে মালা।

চেয়ার থেকে উঠে এল প্রেমা। দেবনের পাশে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ দেখল তাকে। একসময় দেবনের হাত থেকে মালাটা নিয়ে বলল, এটা হাতের অলংকার নয় দেবন, গলায় দোলাবার জন্যে তৈরি।

মালাটা দেবনের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলল, সুদর্শনা থাকলে সেই তোমার ত্রুটিটুকু শুধরে দিত কিন্তু সে যখন নেই তখন শিল্পের খাতিরে তার হয়ে এ কাজটুকু আমাকেই করতে হল।

দেবন প্রেমার একখানা হাত নিজের দু'হাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে বলল, তোমার অভিমান কোনদিনও ভাঙবে না প্রেমা!

সকাল থেকেই সকলে নীরবে কাজ করে চলেছে। একটা ব্যস্ততা কোভলম হোটেলের প্রতিটি ঘরে। সুদর্শনা রোশেনারা অনুসূয়ার দল পায়ের নূপুরের বাঁধন পরীক্ষা করছে। শাড়ি নির্বাচন করে সাজিয়ে

রাখছে পাশে পাশে। পুরুষ শিল্পীরা মালাগুলো গেঁথে নিচ্ছে। মুল্লি কোল্লারমে সূচের স্টিক দিয়ে বাঁধন শক্ত করে তুলছে। কেউবা আয়রন করে নিচ্ছে ধুতি উত্তরীয় পাগড়ী।

আজ প্যালেস হোটেলে প্রেস শো। বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত অতিথির সামনে 'সঙ্গম' ব্যালে গ্রুপ তাদের ভারত-পরিক্রমার আগে নাচ পরিবেশন করবে। বিখ্যাত পত্র পত্রিকার কলাসম্পাদকেরা থাকবেন উপস্থিত।

মিঃ পিল্লাইয়ের ব্যস্ততার শেষ নেই। তিনি এইমাত্র প্রেমার ঘর থেকে দ্রুতপায়ে কি একটা জরুরী কাজ সেরে বেরিয়ে গেলেন।

সরিতা ইন্দ্রের কাছে এসে বলল, নিউজ এডিটর, রিপোর্টার মিলে প্রায় তিরিশজনের লাইট রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইন্দ্র স্টেজের ভেতরের ডেকরেশান সম্বন্ধে দুটি লোককে নির্দেশ দিচ্ছিল। সরিতার কথায় পেছন ফিরে বলল, আরও কয়েকটা বাড়তি প্লেট রেখে দাও।

কেন? অন্য কোন নিমন্ত্রিতের জন্যে তো কফি ছাড়া আর কিছু রাখা হবে না ঠিক হল।

ইন্দ্র লোক দুটিকে শেষ দু-চারটে কথা বলতে তারা কাজ বুঝে নিয়ে চলে গেল।

ইন্দ্র সরিতার কথার উত্তরে বলল, ক'টি বিদেশী ট্যুরিস্ট এসেছেন। তাঁদের ভেতর নাকি লেখক-শিল্পী-সাংবাদিক রয়েছেন কয়েকজন। এসেছেন ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে। প্যালেস হোটেলের ম্যানেজার জানিয়েছেন ওঁদের অডিটোরিয়ামে নাচ দেখার জন্যে ইন্‌ভাইট করলে ভাল হয়।

আমি ছ'খানা কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছি। তাই বলছিলাম আরও খানকয়েক প্লেটের ব্যবস্থা রাখ।

সরিতা চলে যেতে যেতে দুষ্টুমি করে বলল, বিদেশিনী কজন?

ইন্দ্র অমনি বলল, একমাত্র সরিতা মেনন।

একটা কিল বাতাসে ঠুকতে ঠুকতে অদৃশ্য হয়ে গেল সরিতা।

প্রেমা এসে ঢুকল দেবনের ঘরে। হাতে একখানা কাগজ। কোন সীনে কোন আর্টিস্ট মঞ্চে আসবে তারই তালিকা। একবার দেবনকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবার ইচ্ছে। ভুলচুক থেকে যেতে পারে।

দ্রুত পায়ে এসেছিল প্রেমা কিন্তু থমকে থেমে দাঁড়াতে হল।

দেবন ধূপদীপ জেলে পূজার আসনে স্থির হয়ে বসে আছে। সামনে মহাদেবের ছোট্ট একটি মূর্তি।

হঠাৎ প্রেমার মনে পড়ল, আজ 'তিরু আদিরা'। মহাদেবের জন্মদিন। পার্বতীর উপবাস। সারা কেরালার সীমন্তিনী মেয়েরা আজ স্বামীর কল্যাণে উপবাস করবে। কুমারী বিবাহিতা সবাই আজ মাঝরাতে সমবেত হবে মন্দির সংলগ্ন পুষ্করিণীর সোপানে সোপানে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়বে জলে। সারা রাত হস্ততাড়নার বিচিত্র এক ধরনের শব্দ তুলবে তারা। ভোরের আগেই উঠে আসবে জল থেকে। শুদ্ধবস্ত্রে দেহ আবৃত করে তারা চোখের পাতায় দেবে অঞ্জনের প্রলেপ। কপালে আঁকবে তিলক। চুলে দেবে সুগন্ধী ফুলের মালা জড়িয়ে। নববধূরা খোঁপায় দেবে দশপুষ্পম। প্রেমের দেবতা মদনের গান গাইবে মেয়েরা সমবেত গলায়। তাম্বুলের রঙে রাঙা করবে সুচারু ঠোঁট দুটি। ঘরে ঘরে বাঁধা হয়ে আছে সজ্জিত দোলনা। ওনজালে দোল খেতে খেতে স্পর্শ করবে তারা পৃথিবীর মাটি আর শূন্যলোক। মনে হবে শূন্য থেকে দেবপরীরা একবার নেমে আসছে মর্ত্যে আবার হাওয়ায় পাখা দুলিয়ে উড়ে চলেছে শূন্যলোক লক্ষ্য করে।

দেবনেরও তো আজ জন্মদিন। তাই বুঝি ও আজ বসেছে পূজার আসনে ইষ্ট দেবতার বিগ্রহ সামনে রেখে। অচঞ্চল নিবিষ্টমূর্তি।

প্রেমা পায়ে পায়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দেবনের ঘর থেকে। তার মনে হল আজ সেও এই পবিত্র দিনটিকে উদ্‌যাপন করবে পার্বতীর মত উপবাসী থেকে।

প্যালেস হোটেল অডিটোরিয়ামে শুরু হয়েছে নাচ। বিখ্যাত আলোকসম্পাত শিল্পী রায়ারিচ্চন আলো ফেলছেন। একটা হেভি গ্লাসের তৈরি সিঁড়ি আলোর প্রবাহে মনে হচ্ছে স্রোতস্বিনী। তার পাশে পাশে উপল ছড়ান। নীচে একটা হলুদ আলোর বৃত্তে ভগীরথরূপী দেবন তপস্যারত। রৌদের মত হলুদ বসন পরিধানে। ঊর্ধ্ব অঙ্গ অনাবৃত। ঝুঁটিবদ্ধ কেশগুচ্ছ। একটি উজ্জ্বল দীপ্তিমান তাপস বলে

মনে হচ্ছে দেবনকে। আকর্ষণীয় দেহভঙ্গি তরুণ তাপসের।

ঐক্য সংগীতের সুরে চকিত হল প্রেক্ষামঞ্চ। সুরলোক থেকে নেমে আসছেন গঙ্গা। শুভ্র বসন পরিধানে। কেশগুচ্ছের পুষ্পিত সুষমা। তরঙ্গিত বাহু। ভক্তের আহ্বানে নেমে আসছেন তরঙ্গিনী।

প্রেক্ষামঞ্চে করতালি ধ্বনি উঠল। প্রেমা মেননের দিব্য আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানাচ্ছে দর্শককুল।

প্রপাত থেকে যখন গঙ্গা এসে দাঁড়ালেন প্রেক্ষামঞ্চে তখন ভক্ত ভগীরথ উঠে দাঁড়াল তার আকাঙ্খিত দেবীর সামনে নমস্কার নিবেদনের ভঙ্গিতে। প্রসন্ন দেবী হাত তুলে ভক্তের প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করলেন।

শুরু হল ভগীরথের নৃত্য। এত দুঃখের পথ পরিক্রমার পরে সে আজ করবে তার অভিশপ্ত পূর্বপুরুষদের উদ্ধার। সংশয়ের মেঘছায়া সরে গেছে মনের ওপর থেকে। এখন রোদের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ভগীরথের প্রসন্ন অন্তর। নৃত্যের ভেতর সেই পরমপ্রাপ্তির লীলা। তার অন্তরের আকুতি বার বার সকৃতজ্ঞ প্রণতির রূপ ধরে নিবেদিত হচ্ছে দেবীর উদ্দেশে।

কি অনায়াস দেহচালনা দেবনের। হস্তনয়ন চরণের মুদ্রাগুলি যেন দেহের শাখায় শাখায় ফুটিয়ে তুলছে নানা আকৃতির কুসুম।

নাচের মুদ্রাগুলি শেষ করে যখন তার সঙ্গে আসার জন্যে ভগীরথ আহ্বান জানাল দেবীকে একটি বাহু প্রসারিত করে তখন শুরু হল আবার করতালিধ্বনি। দেবনের অতি স্বচ্ছন্দ নৃত্যভঙ্গিমার প্রতি দর্শকদের সাদর স্বীকৃতি।

এরপর অভাবনীয় আলোর লীলা। শঙ্খমুদ্রায় হাতদুটিকে ওষ্ঠে স্থাপন করে ভগীরথ লীলাভরে মঞ্চ প্রদক্ষিণ করছে। আর তার পশ্চাতে দেবী সুরধুনী চলেছেন এঁকে বেঁকে। যেদিক দিয়ে যাচ্ছেন সেইদিকে তাঁর চরণে আলোর জলরেখা সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

পরিকল্পনাটি এত দৃষ্টিসুখকর যে ভগীরথ আহ্বান করে গঙ্গাকে যখন উইংসের পাশ দিয়ে নিয়ে চলে গেল তখন দর্শককুল ফেটে পড়ল করতালিধ্বনিতে। তখনও মঞ্চের ওপর আলোয় আঁকা হয়ে আছে জলের আবর্তিত প্রবাহ।

প্রথম মঞ্চে অবতরণের পর প্রেক্ষাগৃহ থেকে যে কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে তা উৎসাহজনক।

রোশেনারা ছুটে এল দেবনের কাছে। প্রণাম করে দাঁড়াল। অপূর্ব তোমাদের নাচ। এখন আশীর্বাদ চাইতে এসেছি। এর পরেই আমার স্টেজে নামার পালা।

একটু দূরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রোশেনারা আর দেবনের ছবি দেখতে পাচ্ছিল প্রেমা। স্ক্রিনের ভেতরে তবলায় বোল উঠেছে। কত্থক-নর্তকী প্রস্তুত। উইংসের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যবনিকা তোলার অপেক্ষায়। ছুটে গেল দেবন তার পাশে। রোশেনারার পায়ের নূপুর শক্ত করে বাঁধা হয়নি। লক্ষ্য এড়ায়নি দেবনের। নীচু হয়ে বসে সে ক্ষিপ্রহাতে বেঁধে দিল তার পায়ের নূপুর।

আর একজনের দৃষ্টি এড়াল না। দেয়ালের প্রসারিত আয়নায় কিছুক্ষণের এ ছবি ধরা রইল। তারপর ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিন উঠল। তবলা তরঙ্গের তালে তালে নূপুরের ধাতবধ্বনিও মিশে গেল। ছবি মুছল দেয়াল আয়নার ওপর থেকে কিন্তু নায়িকা প্রেমা মেননের মনের আয়না থেকে সে ছবি সহজে মিলিয়ে গেল না। সে ভারতনাট্যমের প্রসাধন নিতে ঢুকে গেল ড্রেসিংরুমে। কে যেন ওপাশের উইংস থেকে কিছু বলতে চাইছিল তাকে কিন্তু প্রেমা দূরের অস্পষ্ট ধ্বনির মত উপেক্ষা করল সে ডাক।

মেয়েদের ড্রেসিংরুম থেকে সবাই এখন বেরিয়ে গিয়ে গ্রীনরুমে ছড়ান চেয়ারগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে। প্রত্যেকের হাতে একখানা করে ছাপা প্রোগ্রাম।

প্রেমা ড্রেসিংরুমে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। দেবনের জন্যে সে উপবাস করে আছে। কেউ জানে না তার আজকের এই তিরু-আদিরা ব্রতের কথা। পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিম সাগরে ডুবে গেলে তবেই ব্রতভঙ্গ হবে তার।

কেন জানি না অনুষ্ঠানের সবটুকু উত্তেজনা নিস্তেজ হয়ে এল প্রেমার মনের ভেতর। সে গালে হাত রেখে বসে রইল আর দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার বুকের ওপর।

ধ্যান ভাঙল সরিতার ডাকে। প্রসাধনের ছলনা করে তোয়ালেতে মুখখানা মুছে নিয়ে তাকাল সরিতার দিকে।

সরিতা একখানা কার্ড প্রেমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, অসাধারণ। একেবারে অ্যাপোলো মূর্তি। গ্রীক আর্টিস্ট। নিজে এসে কার্ড দিয়ে গেল।

সরিতা দাঁড়াল না। কথাকটি বর্ষণ করেই সে যেন বিদ্যুৎ হেনে বেরিয়ে গেল।

প্রেমা দেখল সাদা কার্ডের ওপর অরেঞ্জ কালারের ফেল্ট পেন দিয়ে তারই নাচের একটা ভঙ্গির অবিকল স্কেচ। নীচে লেখা—বিস্ময়কর অনুষ্ঠান।

সবশেষে নাম সই করেছে আর্টিস্ট—মাইরন।

কার্ডগুলো বোধহয় ছবি এঁকে বাইরে পাঠানোর জন্যে তৈরি। কার্ডের কোণে ঠিকানা লেখা প্যালেস হোটেলের। থার্ড ফ্লোর। রুম নাম্বার—সেভেন। ঠিকানাটা আগে লেখা হয়েছিল বলে মনে হল প্রেমার। কারণ ওটা ফেল্ট পেনের কালিতে লেখা নয়।

কার্ডখানা যত্ন করে ব্যাগের ভেতর ভরে নিল প্রেমা। এই মুহূর্তে একটা অসাধারণ প্রেরণা উত্তেজক সুরার মত তার বিধ্বস্ত মনটাকে জাগিয়ে তুলল।

প্রেমা নিজেকে সাজাতে বসল। বেশ কিছু সময় পরে তার পারফরমেন্স। তাই সময় নিয়ে ধীরে ধীরে ভারতনাট্যমের নর্তকীর ভূমিকায় সাজল সে। সাহায্যকারিণী এল। রক্তজবা রঙের শাড়ি বিশেষ ভঙ্গিতে পরা হল। বেণীবদ্ধ কেশগুচ্ছ সাজান হল গোলাপী আভার ফুলে। মুক্তোর ঝুরি দেওয়া সিঁথিমৌর আর কর্ণাভরণ সুদৃশ্য সোনার ব্রোচ দিয়ে আটকান হল কেশকলাপের সঙ্গে। তিলকে চর্চিত হল ললাট। পদচিত্রণ পূর্বাহ্নেই সাঙ্গ করে রাখা হয়েছিল। তার ওপর বাঁধতে লাগল নূপুর। বাঁধতে গিয়ে হাতখানা একবার স্থির হয়ে গেল প্রেমার। ঠোঁটের কোণে একটা চাপা হাসির রেখা ফুটে উঠল। রোশেনারার সৌভাগ্য তার দেবনের হাতের স্পর্শ পেয়েছে। হঠাৎ সমস্ত শরীরটা পরনের রক্তাম্বরের মত জ্বলতে লাগল। মুখে ফুটে উঠল স্থলপদ্মের রক্তোচ্ছ্বাস। ঈর্ষার কাঁটার মাঝখানে যেন ফুটে রয়েছে একটি গোলাপ।

পরক্ষণেই অনুশোচনায় ভরে উঠল প্রেমার মন। ছিঃ ছিঃ এত ক্ষুদ্র সে। যদি দেবনের মনকে রোশেনারা কিংবা সুদর্শনা আকর্ষণ করতে পারে তাহলে সেটা নিশ্চয় তাদের ক্ষমতারই পরিচয়। সে যদি এ ক্ষেত্রে ওদের কাছে হার মানে তাহলে ঈর্ষা দিয়ে তার প্রতিশোধ নিতে যাবার ক্ষুদ্রতা আর কিছুতে নেই।

কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ছায়া সরে গেল প্রেমার মুখের ওপর থেকে। ধীরে ধীরে ফুটে উঠল একটা উদার প্রসন্নতা। কিছু পরেই মনের ভেতর থেকে উঠে আসতে লাগল সর্বজয়ী একটা ভাব। আত্মপ্রত্যয়ের শক্তিতে উদ্বোধিত হল প্রেমা মেনন।

দুটো নাচ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। শিল্পীরা সম্বর্ধিত হয়েছে করতালি-ধ্বনিতে। কোন কিছু কিন্তু কানে এসে পৌঁছয়নি প্রেমার। সে এতক্ষণ ডুবেছিল নানা চিন্তার আবর্তে। ইতিমধ্যে পড়ে গেছে ড্রপ সীন।

সরিতা ছুটে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুই এখনও বসে। ওদিকে সারা স্টেজ তোলপাড় করে তোকে খোঁজা হচ্ছে। সংগতকারীরা সব বসে গেছে মঞ্চে। এখুনি ঘণ্টা পড়বে। বেরিয়ে আয় চটপট। আমি চললাম। সোল্লু-কুট্টুর বোল তুলতে হবে।

সরিতা বেরিয়ে যেতেই উঠে দাঁড়াল প্রেমা। নিজেকে মনে হল বহু যুগ পূর্বের অপূর্ব স্থাপত্য খচিত কোন মন্দিরের দেবদাসী। নাটমণ্ডপের চারদিকে জ্বলছে নিলা ভিলাক্কু। বসে আছেন পুরোহিত পারিষদ পরিবৃত তরুণ রাজা। আলোছায়ার রহস্যময় অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছে সে নর্তকীর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি হলেই মঞ্জীরের ঝঙ্কার তুলে এগিয়ে যেতে হবে নাটমণ্ডপের দিকে। তরুণ রাজার সঙ্গে হবে তার প্রথম দৃষ্টি বিনিময়।

ঘণ্টা বেজে উঠল। প্রেমা বিদ্যুৎচালিতের মত গিয়ে দাঁড়াল স্টেজের ওপর। বেজে উঠল মৃদঙ্গ মন্দিরা ত্রিশ্রম মিশ্রম তালে। সরিতার গলায় শুরু হয়ে গেছে সোল্লু-কুট্টুর বোল। উঠে যাচ্ছে আরব

সাগরের মত নীল তরঙ্গিত স্ক্রিন। দাঁড়িয়ে আছে প্রেমা ঈষৎ বিযুক্ত পায়ে জানু দুটি বহির্ভাগে নত ও প্রসারিত করে। যুক্ত কর সুশোভিত মস্তকের ওপরে নমস্কারের মুদ্রায় স্থাপিত। অধরে বিশ্বজয়ী হাসির রেখা।

প্রেমার উপস্থিতি যে দর্শকচিত্তের আলোড়ন তা বোঝা গেল করতালির অভিনন্দনে।

বোলের সঙ্গে সঙ্গে স্থিরদৃষ্টিতে এল স্পন্দন। যুগল ভ্রূ-লহরী লীলায় ওঠা-নামা করতে লাগল। স্কন্ধের ওপর মুখমণ্ডল দক্ষিণ থেকে বামাবর্তে ধীরে ধীরে হতে লাগল আন্দোলিত।

ভারতনাট্যমের সূচনা অংশ আলারিপ্পু। কুঁড়ি থেকে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠার প্রথম পর্ব। অর্থও তার তাই।

প্রেমা মেনন তার নৃত্য আর মূক অভিনয়ের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠতে লাগল।

আলারিপ্পুকে অনুসরণ করে এল যতিস্বরম্। তালসংযোগে রাগভিত্তিক স্বরলিপি।

প্রেমা এখন বিশুদ্ধ মুদ্রায় নেচে চলেছে। নয়ন চরণ স্কন্ধ বাহু চকিত আন্দোলিত হচ্ছে। বায়ুতাড়িত নারকেল পত্র প্লাবিত জ্যোৎস্নার নৃত্যলীলা ফুটে উঠছে চোখের সামনে।

প্রেমা মেনন শুদ্ধ নৃত্যভঙ্গিমায় শ্রেষ্ঠ ভাস্করের তৈরি এক শিল্প-প্রতিমায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

এবার এল সঙ্গীত। সঙ্গীতের কথাবস্তু অনুসরণে চলল অভিনয়। সম্পূর্ণ নতুন নৃত্যভঙ্গিমা। সমস্ত মঞ্চ জুড়ে শিল্পীর পদচারণা। ভুরুতে নয়নে নব নব মুদ্রার প্রকাশ। ওষ্ঠে অকথিত বাণীর কম্পন। সঞ্চালিত গ্রীবায় অভিনয়ের নিপুণ প্রকাশ। ভাব রাগ আর তালের এ যেন ত্রিবেণী সংগম।

শেষ হল শব্দম্। এল বর্ণম্। শব্দম্-এর পরিপূর্ণ প্রকাশ বর্ণমে। আকুল অভিনয়ে ব্যাকুল দেহ। দমকে দমকে বর্ষার বারিধারা ঝরে ঝরে পড়ছে। অমনি চমকে ফুটে উঠছে যুথি, কেতকী, কদম্ব। গানের কথা আসছে বর্ষাধারার মত। প্রেমার দেহের মুদ্রায় সে কথা মুকুলিত পুষ্পিত হয়ে উঠছে।

স্তব্ধগৃহ। স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টি দর্শককুল।

প্রেমা এবার মদনের ভূমিকায়। বাম চরণ বাম বাহু সম্মুখে প্রসারিত। দক্ষিণ কর ধনুর জ্যা আকর্ষণেব মুদ্রায় স্থাপিত। সমস্ত আননে নয়নে বিশ্ববিমোহন হাসির রেখা। পুষ্পশর সন্ধান করছে প্রেমের দেবতা অনঙ্গ লীলায়।

একি। নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হয়ে যায়। তারভঙ্গ হতে চলেছে। প্রেমা মেনন স্থির। লক্ষভেদে উদ্যত। সামনে দর্শক আসনে বসে আছে গ্রীক শিল্পী মাইরন। হাতে তার স্কেচের পেন স্থির হয়ে গেছে। দৃষ্টি তার প্রেমার অচঞ্চল আঁখিতে নিবদ্ধ। কয়েক মুহূর্ত দুই শিল্পীর দৃষ্টিসঙ্গম থেকে বাস্তব বিশ্ব বিলুপ্ত।

নাচ শেষ হয়ে গেছে। প্যালেস হোটেলের অডিটোরিয়াম থেকে চলে গেছে শেষ উৎসাহী দর্শকটিও। অভিনন্দনের পালা চুকেছে। মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে 'সঙ্গম' গোষ্ঠীর শিল্পীরা অভিবাদন করেছে দর্শকদের। করতালি আর সাধুবাদে শব্দিত হয়েছে প্রেক্ষামঞ্চ।

একক শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী দর্শককে সবিনয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ হল গোষ্ঠীর নাচ। এখানে একের উৎকর্ষের স্থান নেই। প্রশংসা যদি কিছু থাকে সে সকলেরই প্রাপ্য।

কর্মীরা নাচের সকল সরঞ্জাম সরিয়ে নিয়ে গেছে কোভালম হোটেলে। শিল্পীরা চলে গেছে দেবনের সঙ্গে। সরিতা ঘরে ফেরার আগে প্রেমার কাছে এল। গ্রীনরুমের ভেতর একটি সোফায় গা এলিয়ে বসেছিল প্রেমা। এই নাট্যকাহিনীর সব চেয়ে বৃহৎ অংশ জুড়ে ছিল তার ভূমিকা। সারাদিন উপবাস করে আছে সে। অসম্ভব মানসিক শক্তি ছাড়া অভুক্ত অবস্থায় বোধকরি এত বড় একটা পারফরমেন্স সম্ভব নয় কারু পক্ষে। প্রেমার মনোবল চিরদিনই সাধারণের চিন্তার বাইরে।

সরিতা বলল, তুই কি এখন ফিরবি আমার সঙ্গে ?

একটু বসতে দে। বড্ড ক্লান্ত লাগছে।

জানিস, দিদি, সেই বিদেশী আর্টিস্ট তোর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল আমরা যখন ওদের কফি সার্ভ করছিলাম।

প্রেমার চোখ দুটো ঝলকে উঠল।

সরিতা আবার বলল, কিন্তু তোরাই তো নিয়ম করেছিলি কোন একক শিল্পীর সঙ্গে কাউকে দেখা

করতে দেওয়া হবে না, তাই ওকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রেমা উঠে সোজা হয়ে বসে বলল, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে!

তাইতো হল। দেবন হাতজোড় করে অক্ষমতা জানিয়ে ফিরিয়ে দিলে।

দেবন কোথায়!

তার অপরাধ কি হল। পরিচালক হলেও নিজেদের তৈরি নিয়ম তো সে আর ভাঙতে পারে না।

প্রেমা আবার সোফায় এলিয়ে দিল দেহ। এই মুহূর্তে তার চোখের ওপর ভেসে উঠল সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর মূর্তি। দেহের প্রতিটি রেখায় দীপ্ত পৌরুষের সঙ্গে আশ্চর্য কমনীয়তার মিশ্রণ।

প্রেমা সরিতাকে বলল, আজ নাও ফিরতে পারি। হয়ত মিঃ পিল্লাইয়ের সঙ্গে একবার যোগাযোগ করতে হতে পারে। তুই চলে যা। দারুণ খাটুনি গেছে তোর আর ইন্দ্রের ওপর দিয়ে।

সরিতা বলল, তোরও তো ক্লান্তির শেষ নেই।

ও কিছু নয়। দু-চারটে দিন বিশ্রামের ভেতর থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে। গুনিজনের সাধুবাদ হল সঞ্জীবনী সুরা। ঐ টনিকেই দেখিস দু-একদিনের মধ্যে সবাই তাজা হয়ে উঠবে।

সরিতা চলে যেতেই অডিটোরিয়ামের ফোনটা হাতে তুলে নিল প্রেমা। এক্সচেঞ্জকে বলল, থার্ড ফ্লোর—রুম নাম্বার সেভেন।

প্রেমার গলাটা কেন জানি না একটু কেঁপে গেল।

রুম নাম্বার সেভেন থেকে কথা ভেসে এল।

প্রেমা বলল, আমি প্রেমা মেনন কথা বলছি অডিটোরিয়াম থেকে। তোমার অপূর্ব কার্ডের জন্য ধন্যবাদ।

ওপার থেকে মাইরন বলল, তোমার ফোনের জন্য ধন্যবাদ। ইন্ডিয়াতে এসে তোমার নাচ না দেখলে আমার দেশ দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

প্রেমা নূপুরের ঝঙ্কারের মত হাসি ছড়িয়ে বলল, এটা কি নর্তকীর পাওনার অতিরিক্ত উপহার নয়?

মাইরন বলল, নানাভাবে বলেও কিন্তু তোমার নাচের উপযুক্ত কমপ্লিমেন্ট দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রেমা বলল, তোমার অডিটোরিয়ামে বসে আঁকা ছবি আমাকে বিস্মিত করেছে।

আমি তোমার শরসন্ধানের ছবিটা নিয়ে পড়েছি। রাতের ভেতরেই শেষ করে ফেলতে হবে।

প্রেমা বলল, এত তাড়া কিসের?

মর্নিং-এর ফ্লাইটে চলে যাচ্ছি। তার আগে শেষ করে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছে। দেখা যখন হল না।

এই মুহূর্তে তোমার হাতের তুলির কাজ দেখতে আমার দারুণ ইচ্ছে করছে।

চলে এস। এক্ষুনি। অবশ্য যদি তোমার অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকে।

প্রেমা বলল, রাতের মত এখন আমার ছুটি। আসছি তোমার রুমে।

ফোন ছেড়ে দিল প্রেমা কিন্তু সেই মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল না। উত্তেজনায় এখন কাঁপছে তার সারা শরীর। সেই অ্যাপোলো মূর্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তাকে। তার রোমাঞ্চকে সে কেমন করে ঢেকে রাখবে। এ কি যোগাযোগ তার জীবনে। এমন ক্ষণিকের অতিথিকে সে বিনিময়ে কিই বা দিতে পারে।

এক সময় মনে হল, থাক কাজ নেই গিয়ে। অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ যাদের তাদের কাছে যাওয়া মানেই দুঃখ পাওয়া।

আবার মনে হল এ আকর্ষণকে এড়িয়ে যাবার সাধ্য কি তার।

উঠে দাঁড়াল প্রেমা মেনন। এক অদৃশ্য শক্তি তাকে টানছে। তার সমস্ত দেহের অণুতে পরমাণুতে সে টান এসে পৌঁছেছে। চাঁদের অদৃশ্য টানে ফুলে ফুলে উঠছে সারা আরব সাগরের প্রতিটি জলবিন্দু।

প্রেমা মেনন অডিটোরিয়াম পেছনে ফেলে জয়কিষণের দেওয়া কাশ্মিরী শালখানায় যদ্দুর সম্ভব নিজেকে ঢেকে বিশাল প্যালেস হোটেলের থার্ড ফ্লোরে সাত নম্বর রুমের সামনে এসে দাঁড়াল।

না, প্রেমা মেনন এখন একটুও দুর্বল নয়। জীবনে সুযোগ এলেই সে করেছে বিজয়িনীর ভূমিকায়

অভিনয়। অপরিচিত চরিত্রের মুখোমুখি হওয়াতেই তো তার আনন্দ। আশ্চর্য এক আবিষ্কারের উত্তেজনা রয়েছে এর ভেতর।

প্রেমা কলিং বেলে হাত দিল।

দরজা খুলে যেতেই প্রেমা ঢুকল। আবার ভেতর থেকে দরজা আপনি লক হয়ে গেল।

শিল্পী মাইরন প্রেমার হাতে নাড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল।

সোফায় পাশাপাশি বসল দুজনে।

প্রেমার চোখ পড়ল সামনে। একটা ইজেলের ওপর ছবি আঁকা রয়েছে। ছবিটি আকারে খুব ছোট নয়। নীচে আর একখানা ছোট্ট কার্ড পড়ে। প্রেমা কৌতূহলী হয়ে উঠে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে ছোট্ট কার্ডখানা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে লাগল। তারই ছবি। প্রেমের দেবতা মদনের ভূমিকায় ধনুতে শর সংযোগ করে দাঁড়িয়ে আছে সে। পাশের বড় ছবিটি ওরই অনুকরণে আঁকা। শুধু স্কেচ করা হয়েছে রঙ পড়েনি এখনও। কার্পেটের ওপর রঙের সরঞ্জাম।

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কখন মাইরন। ছবি দেখা শেষ করে ফিরে দাঁড়াতে গিয়ে প্রেমা চমকে তাকাল সেই অ্যাপোলো মূর্তির দিকে।

মাইরনের চোখের দৃষ্টি গভীর। মুখে অদ্ভুত আকর্ষণীয় হাসি। প্রেমার চোখ দুটো যেন চুম্বকের টানে মাইরনের মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল।

সামান্য কয়েকটি মুহূর্ত। প্রেমা চোখ নামাল।

মাইরন বলল, ভারতীয় মেয়েদের চোখের এক্সপ্রেশান যে এত সুন্দর তা আমার জানা ছিল না।

প্রেমা অমনি একমুখ হাসি হেসে বলল, গ্রীকরা সুন্দর কিন্তু এত সুন্দর তা তোমাকে না দেখলে বোঝা যেত না।

প্রেমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মাইরন। প্রেমা মাইরনের প্রায় অনাবৃত হাতখানা স্পর্শ করে রোমাঞ্চিত হল। মাইরন আর প্রেমা হাত ধরাধরি করে এসে বসল সোফার ওপর।

প্রথম কথা বলল মাইরন, আমি এদেশে আসার আগে শুনেছিলাম ভারতীয় মেয়েরা ভীষণ শাই।

প্রেমা অমনি কথাটা শেষ করল, আমাকে দেখে তোমার সে ধারণা পাল্টে গেছে—তাই তো?

মাইরন প্রেমার দিকে তাকিয়ে হাসল। ধরে থাকা হাতখানাতে আলতো করে চাপ দিল।

প্রেমা আবার বলল, কথাটা তুমি প্রায় ঠিকই শুনেছ। তবে ভারতীয় মেয়েরা একবার যাকে মনে মনে বন্ধু বলে মেনে নেয় তার কাছে তাদের কোন সঙ্কোচই থাকে না।

মাইরন আবার প্রেমার হাতে চাপ দিল। বলল, আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে ভাবতে পারি মিস মেনন কারণ তুমি বন্ধু বলে আমার হাতে হাত মিলিয়েছ।

প্রেমা রহস্যময় চোখে মাইরনের দিকে চেয়ে হাসল।

মাইরন হঠাৎ বলল, তুমি যে ঐ তীর ছোঁড়ার অভিনয়টা করলে এর অর্থ কি?

প্রেমের দেবতা মদনের পাঁচটি শর আছে। ঐ শর যার হৃদয় লক্ষ্য করে ছোঁড়া হবে তারই হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে ফুটে উঠবে ভালবাসার রক্ত গোলাপ।

মাইরন অমনি বলল, তোমার ঐ অলক্ষ্য তীরগুলো কাকে নিশানা করে আজ ছুঁড়েছিলে প্রেমা?

যার হৃদয় আছে তারই দিকে নিশানা করেছিলাম।

সে নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান।

প্রেমার মুখে মিষ্টি হাসি। বলল, জানি না কে ভাগ্যবান। যে বাণ ছুঁড়েছে সে না যার হৃদয়ে বাণ বিঁধেছে সে।

মাইরন বলল, তুমি বিদুষী। কথা বলতে জান।

জলতরঙ্গের মত হেসে উঠল প্রেমা, তোমার প্রশংসার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

মাইরন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তোমাকে একটা অনুরোধ করব?

বল।

একবার এই পোশাকেই তুমি দাঁড়াবে ঐ শর নিক্ষেপকারীর ভঙ্গিতে? তোমার চোখ আর ঠোঁটের

এক্সপ্রেশানটা আর একবার দেখে নিতে চাই।

প্রেমা খুলে ফেলল গায়ে জড়ানো শালখানা। মুণ্ডি না পরে সাদা একখানা শাড়ি পরে এসেছিল সে। শাড়ির আঁচল ভাল করে কোমরে জড়িয়ে নিল। সী-গ্রীন রঙের জম্বরখানা শুধু রইল প্রেমার উর্ধ্ব অঙ্গ আবৃত করে। প্রেমা আবার সেই নৃত্যের মুদ্রায় ধনুতে শর সংযোগ করল। প্রেমার দৃষ্টিতেও সেই অব্যর্থ-লক্ষ্য শরের ছবি ফুটে উঠেছে। অধরের হাসিতে লক্ষ্য ভেদের সুনিশ্চিত প্রত্যয়।

মাইরন ইজেলের ছবিতে দরকারী রেখাগুলো টেনে নিল।

এক সময় বলল, আমার প্রয়োজন মিটে গেছে। এখন বস সোফায়। আমি খুব দ্রুত ছবি আঁকতে পারি। রঙ দেওয়া হয়ে গেলে তোমাকে ডাক দেব। তখন ঠিক ঠিক বিচার করতে পারবে।

প্রেমা পিছু হটে আবার এসে বসল সোফায়। সাদার ওপর সারা জমিতে পিঙ্ক ফুল আর পাতার কাজ করা শালখানা গায়ে জড়িয়ে নিল। মাথায় তুলে নিল শালের খানিকটা অংশ ঘোমটার আকারে। প্রেমা মেননের মুখখানা একটা আধফোটা ম্যাগনোলিয়া ফুল হয়ে গেল।

ছবিতে বেশ কিছু সময় মগ্ন হয়ে রঙ তুলির কাজ করল মাইরন। প্রেমা বসে বসে চিত্রকর মাইরনকে দেখতে লাগল।

কত বয়েস হবে মাইরনের? কোন মতেই সাতাশের বেশি নয়। সাইড থেকে ওর প্রোফাইলখানা আরও সুন্দর। আচ্ছা ও কি কোন মেয়েকে ভালবাসেনি? নিশ্চয়ই। আর ওর না বেসে উপায় আছে। মেয়েরা কি এমন অ্যাপোলো মূর্তিকে স্পর্শ না করে ছেড়ে দেবে? কালই চলে যাবে ও! কদিন আগে কেন পরিচয় হল না ওর সঙ্গে।

কথাগুলো মনের ভেতর নাড়াচাড়া করতে করতে একসময় বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল প্রেমার।

এমনি একজন শিল্পীকেই তো তার জীবনের সঙ্গী করতে চেয়েছে সে। একজন নৃত্যশিল্পী অন্যজন চিত্রশিল্পী। প্রেমা নাচবে আর মাইরন আঁকবে সে নাচের ছবি। চারদিকের গুণী সমঝদারেরা বলবে, আশ্চর্য যুগলবন্দী।

মাইরনের কথায় ধ্যান ভাঙল প্রেমার।

কতখানি সময় আর তুমি আমাকে দিতে পারবে মেনন?

অফুরন্ত।

আচমকা কথাটা বলে ফেলেই প্রেমা সোফায় নড়েচড়ে বসল।

মাইরন ছবির থেকে মুখ তুলে তাকাল প্রেমার দিকে। বলল, এত অঢেল সময় তোমার হাতে আছে মেনন?

প্রেমা বলল, শিল্পীর কাছে বসে বসে তার সৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকাও তো একটা কাজ। আমার সময়টাকে এমনি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে পারলেই আমি খুশী হই।

মাইরন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে প্রেমার কাছে এগিয়ে এল। অনেক সময় ধরে গম্ভীর চোখে চেয়ে কি যেন দেখতে লাগল।

প্রেমা একসময় বলল, কি দেখছ এমন করে?

তোমার এমনি বসে থাকার ছবিখানা আমি মনের ভেতর এঁকে রাখলাম। দেশে ফিরে গিয়েই রূপ দেব।

প্রেমা বলল, তুমি আমার সব কিছুতেই যেমন সুন্দর দেখছ তাতে আমার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

কিসের সন্দেহ?

আমি সত্যিই সুন্দর কিনা।

মাইরন বলল, অন্যের চোখ কি বলবে জানি না তবে আমার চোখ যে তোমার দিকে তাকিয়ে বারে বারে তৃপ্তি পাচ্ছে একথা জোরের সঙ্গে বলতে পারি।

প্রেমা বলল, আমার এই বসে থাকার ছবি যখন আমি কোনদিনও দেখতে পাব না তখন এর

ভালমন্দ বিচারের ভার তোমার।

মাইরন আবার প্রেমার হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোয় ধরে নিয়ে বলল, ভারতের মন্দিরের ভাস্কর্য আর নর্তকী মেনন আমার চোখে অভিন্ন। দুটিকেই আমি সমান বিস্ময় আর আগ্রহ নিয়ে দেখছি।

প্রেমা মাইরনের দুটো হাত মাথায় ঠেকিয়ে আবার বুকের কাছে ধরে রেখে বলল, ও কথা বল না মাইরন। ভারতের ভাস্কররা মন্দিরে মন্দিরে যে মূর্তি সৃষ্টি করেছে তার তুলনা পাওয়া ভার। তাদের মুখের এক্সপ্রেশানগুলোর দিকে শুধু লক্ষ্য করে যাবে। জীবনের গভীরে এমন কোন দুঃখসুখের অনুভূতি নেই যা তাদের সৃষ্টির রেখায় ফুটে ওঠেনি। আমার অভিনয়ে আমি সেইসব অনুভূতির কতটুকুই বা ফোটাতে পেরেছি মাইরন।

তোমার কথা হয়ত ঠিক কিন্তু নাচের সময় তোমার দেহের নানা ফর্ম আর নানা ধরনের এক্সপ্রেশান শিল্পীর চোখ নিয়ে আমি গভীর আগ্রহে দেখেছি মেনন। শিল্পীর সাবজেক্ট হিসেবে তুমি যে কত বড় সম্পদ নিজের ভেতর ধরে রেখেছ তা তুমি জান না।

প্রেমা নত মুখে বসে রইল। এ তার প্রাপ্য কি প্রাপ্যের অতিরিক্ত তা সে বুঝতে পারল না।

মাইরন যে দারুণ মুডি তা বোঝা গেল যখন সে প্রেমাকে বলল, তুমি মাথায় ঐ গায়ের র‍্যাপারখানা তুলে যেমন বসেছিলে তেমনি একটু বসবে কি ? আমি তোমার একটা স্কেচ করে নেব। স্মৃতি চুঁড়ে আঁকতে গেলে ঠিক এমনটি তো আব পাওয়া যাবে না।

প্রেমা হাসি ছড়িয়ে বলল, হেরে গেলে তো। তাও বা কি করে বলি। বরং বলব, তোমার মনের গভীরে রেখা ফেলার মত ক্ষমতা আমার নেই। তাহলে স্মৃতি থেকে যা আঁকতে তাই সত্য হত।

মাইরন হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। সে প্রেমার মুখোমুখি হাঁটু গেড়ে বসে শালখানা প্রেমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে মাথার খানিক অংশ ঢেকে দিলে। অসংকোচে প্রেমার মুখখানা দু-হাতের পাতায় চেপে ধরে ডানদিকে একটুখানি কাত করে প্রেস করল। তারপর হাত সরিয়ে নিয়ে নিজের মাথাটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

প্রেমা যেন একটি পুতুল। বুকে আর গলার কাছে শালের সুন্দর নিটোল কটি ফোল্ড। মুখখানা অতি নিপুণ হাতে দক্ষ কোন পুতুল-শিল্পী যেন তৈরি করেছে। আর আশ্চর্য! প্রেমা তাকিয়ে আছে মাইরনের দিকে মুগ্ধ চোখে। পাতাটি পড়ছে না, তারাটিও নড়ছে না।

মাইবন কতক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এবার তোমাকে অবিকল এঁকে নিতে আমার একটুও ভুল হবে না মেনন।

প্রেমা বলল, কথাটা শুনে ভাল লাগল কিন্তু তোমার পরীক্ষা নিতে চাই মাইরন।

মাইরন বলল, পরীক্ষা? কিসের?

আমার দিকে না চেয়ে তুমি এখুনি স্কেচ করে দেখাতে পারবে?

ও এই কথা।

মাইরন আর একবারও তাকাল না প্রেমার দিকে। একখানা ইজেলে সে তন্ময় হয়ে স্কেচ করতে বসে গেল।

প্রেমা তেমনি গায়ে চাদরটি জড়িয়ে চুপচাপ বসে রইল। সারা দিনের উপবাস, এত বড় দীর্ঘ ব্যালেতে অংশ নেওয়া সবকিছু ক্লান্তি তাকে এখন একটা অলস স্বপ্নের জগতে এনে ফেলল। সে যেন ইচ্ছে করলেও আর কোথাও যেতে পারবে না। কোন এক যাদুকর যেন তাকে মন্ত্রের গণ্ডি দিয়ে বেঁধে রেখে দিয়েছে। সেই যাদুকরটি সামনে বসে সাদা ইজেলের ওপর কিসব আঁকিবুকি কেটে চলেছে। এক আশ্চর্য রহস্যময় যাদুকর বলে মনে হচ্ছে তাকে। কতক্ষণ পরে প্রেমার মনে হল ঐ মানুষটি উঠে দাঁড়াল। আর অমনি জানালার নীচে আরব সাগর থেকে উঠে এল একটা দমকা হাওয়া। সমস্ত দেয়ালগুলো তাসের ঘরের মত উড়ে যাচ্ছে। একটা তুফান থৈ থৈ করে এগিয়ে আসছে প্যালেস হোটেলের সংলগ্ন পাহাড়ের চুড়ো লক্ষ্য করে। তারপর। প্রেমা দেখতে পাচ্ছে ঐ ঢেউয়ের মাথায় একটা হলুদ রঙের নৌকো। ঐ নৌকোটি এসে মন্ত্রের জোরে থেমে গেল একেবারে ওদের পায়ের কাছে। একি ! যাদুকর তাকে বুকে তুলে নিয়ে উঠে পড়ল সেই নৌকোয়। তারপর ঢেউয়ের ভেতর

গভীর থেকে অনেক গভীরে তলিয়ে যেতে লাগল তারা। কানে এসে বাজতে লাগল সারা সাগর জুড়ে অদ্ভুত এক ঘুম পাড়ানিয়া গান।

রাত কত ? না ভোর হয়ে এসেছে? ঐ তো অস্পষ্ট গ্রীন বাল্বটা রহস্যময় আলো ছড়াচ্ছে। প্রেমা আচ্ছন্ন আবছায়ার ভেতর থেকে চৈতন্যের জগতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে লাগল।

সামনের টেবিলে বিয়ার আর হুইস্কির বোতল। পানপাত্র তেমনি পড়ে। প্রেমার একটু একটু মনে পড়ছে সে মাইরনের সঙ্গে ড্রিংক করেছিল। ঐ তো টিপয়ের ওপর রাখা তারই শাল মুড়ি দেওয়া ছবিখানা।

মনে পড়ছে এখন। স্পষ্ট মনে পড়ছে। মাইরন ছবিখানা এঁকে তার সামনে তুলে ধরে বলেছিল, মিলিয়ে নাও। আচ্ছা ছবিখানা ধর আমি আসছি।

বলেই মাইরন একখানা আয়না এনে তার মুখের সামনে ধরে রেখে বলেছিল, এবার মিলিয়ে নাও ভাল করে।

বিস্ময়ে কতক্ষণ কথা ছিল না প্রেমার মুখে। শুধু বলেছিল, তুমি অসাধারণ মাইরন।

মাইরনও বলেছিল, তুমি অসাধারণ প্রেমা।

কেন মাইরন?

তুমি সামান্য হলে ছবি অসামান্য হয় কি করে?

প্রেমা কোন কথা আর না বলে, ছবির দিকে না তাকিয়ে শুধু চেয়েছিল মাইরনের মুখের দিকে।

মাইরন ছবিখানা টিপয়ের ওপর প্লেস করে বলেছিল, এস এখন একটু ড্রিংক করা যাক। আপত্তি আছে নাকি ?

প্রেমা মাইরনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শুধু মাথাটা নেড়েছিল। অবসাদে তার শরীর তখন নরম সোফার ভেতর ডুবে গিয়েছিল।

মাইরন টেবিলে বোতল আর গ্লাস সাজিয়ে ডাক দিয়েছিল প্রেমাকে। প্রেমা ওঠেনি। সে শুধু বাড়িয়ে দিয়েছিল তার হাতখানা। মাইরন উঠে এসেছিল। প্রেমাকে হাত ধরে তুলে আবার হাতের বেষ্টনে জড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল।

ওরা দুজনে বসে বসে ড্রিংক করেছিল কত রাত ধরে।

তারপর! তারপর বিশেষ কিছু মনে নেই প্রেমার। একটা স্বপ্নচালিতের মত সে মাইরনের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। মাইরনের উত্তপ্ত একটা প্রস্তাব শুনে সে কতক্ষণ ধরে দ্রুত হারমোনিয়াম বাজানোর মত হেসেছিল। তারপর হঠাৎ হাসি থামতেই কেমন যেন কান্না পেয়ে গিয়েছিল তার। সে দুটো হাতের পাতায় চোখ চেপে ধরেছিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটু আগের দেখা স্বপ্নের যাদুকরের মত মাইরন তাকে বুকে ভরে নিয়ে সমুদ্রের অনেক গভীরে তলিয়ে গিয়েছিল।

প্রেমা মুখ ফিরিয়ে দেখল মাইরন তখনও ঘুমিয়ে।

পশ্চিমের জানালায় চোখ আটকে গেল প্রেমার। পাহাড়টা যেখানে সমুদ্রে নেমেছে সেখান থেকে আকাশের নীল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো নারকেল গাছ। শেষ রাতের পূর্ণ চাঁদটা তখন পাণ্ডুর হয়ে নারকেল পাতার ঝালরের প্রান্তটুকু ছুঁয়ে আছে। এর পরেই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে অথৈ সমুদ্রের বুকে।

প্রেমার সারা বুক ঠেলে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত কান্না উঠে আসতে লাগল। সে বিশ্লেষণ করে জানতে চাইল না, কেন তার এই কান্না।

প্রেমা এক সময় অতি সন্তর্পণে মাইরন-এর দিকে চোখ রেখে উঠে দাঁড়াল। বিস্রস্ত পোশাকগুলো যদ্দূর সম্ভব ঠিক করে নিল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ইজেলের দিকে। একটা স্কেচের প্যাড আর পেন্সিল পড়েছিল। হাঁটু গেড়ে বসে লিখতে লাগল।

বিদেশী বন্ধু, আমি চলে যাচ্ছি। তুমি যখন জেগে উঠে আমাকে খুঁজবে তখন আমি অনেক দূরে। তোমার দস্যুতার চিহ্ন মুছে যাবে কিন্তু তোমার এই ছবির স্মৃতি হয়ত জন্মান্তরেও মুছে ফেলতে পারব

না। তোমার ভোরের যাত্রা শুভ হোক। —প্রেমা।

নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে এল প্রেমা। প্রশস্ত করিডোর পার হয়ে নীচে নেমে এল। সামনে নারকেল গাছের তলায় খড়ে ছাওয়া দুটো কিয়স্ক। পূর্ণিমার চাঁদ একেবারে পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে। তার অস্পষ্ট আলোয় গোলাকার কিয়স্ক রহস্যাবৃত। প্রেমা দাঁড়াল তার তলায়। সমুদ্র থেকে রাত শেষের হাওয়া ঝলকে ঝলকে উঠে আসছে। তীরে ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার শব্দ। নারকেল পাতার হঠাৎ হঠাৎ বেজে ওঠা। সব মিলিয়ে প্রেমার অর্ধচেতন মনের কাছে একটা কিসের যেন অমন্ত্রণ পৌঁছে দিল।

প্রেমা সোজা বালি ভেঙে সমুদ্রের দিকে নেমে গেল না। সারা প্যালেস হোটেলের দরজা জানলাগুলো চোখের মত চেয়ে আছে। সে এই মুহূর্তগুলোয় নিজেকে সবার চোখের আড়ালে সরিয়ে রাখতে চায়। প্রেমা সামনের কটেজগুলোকে পেছনে ফেলে সরু রাস্তা ধরে ছুটে চলল। উঁচুনীচু পাথুরে পথ। নারকেল অরণ্যের ছায়ায় অস্পষ্ট। অভ্যস্ত পথে প্রেমা দ্রুত পা ফেলে চলেছে। মানসিক উত্তেজনায় কাঁপছে পা দুটো। দু-তিনবার আছাড় খেয়ে পড়ল প্রেমা।

ডানদিকের নারকেল বাগানের ভেতর ক'ঘর সাধারণ মানুষের বসতি। ছোট শিবমন্দির। বাঁধান একচিলতে পুকুর। কটি মেয়ে মাঝরাত থেকে স্নানে নেমেছিল। বাহুর আঘাতে চঞ্চল করে তুলেছিল জল। এখন তারা গান গাইতে গাইতে ভিলাক্কু জ্বালিয়ে শিবমন্দিরে পুজো দিতে চলেছে। তিরু আদিরার ব্রত উদ্‌যাপনের গান।

ধনুমাসত্তিল তিরু আদিরা ভগবান তণ্ডে
তিরুণাল্ আণ।
ভগবান তণ্ডে, তিরু নালিন নাল্।
ভগবতী কু
তিরু নোলম্বু আন।
ভগবতীড়ে, তিরু নোলম্বিন নাল্।
উণ্ণারুতে, উরাঙারুতে।

ধনুমাসের শুভ আদ্রা তিথি আজ। ভগবান মহাদেবের শুভ জন্মদিন। ভগবানের জন্মদিনে উপবাস করে আছেন ভগবতী পার্বতী। এদিন উপবাসের দিন। অভুক্ত থেকে জাগরণে নিশি যাপনের দিন।

প্রেমার ইচ্ছে হল সেও স্নান করে যোগ দেবে ওদের সঙ্গে পুজোয় কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, ঐ সামান্য কায়েলের জলে মিটবে না তার স্নানের তৃষ্ণা।

প্রেমা ছুটে চলল সমুদ্র লক্ষ্য করে। এখন সে খাড়াই একটা টিলার ওপরে আছাড় খেতে খেতে উঠে দাঁড়াল। সামনে অনাবৃত সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে। তীরে কিসের আক্ষেপে যেন আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়ছে ঢেউগুলো। সেই দিগন্ত ছোঁয়া রঙ্গমঞ্চে শত শত নর্তকীর নাচের মহড়া চলেছে।

প্রেমা সমুদ্রের দিকে নিস্পন্দ চেয়ে রইল। হু হু করে বয়ে আসছে হাওয়া। চুল উড়ছে। শাড়ীর আঁচল কখন লুটিয়ে পড়েছে পায়ের তলায়।

প্রেমা এবার নেমে চলল। নির্জন সৈকতে এসে সে বালির ওপর দিয়ে জলের দিকে ছুটতে লাগল। সমুদ্রের জল ছুঁয়ে তখন দাঁড়িয়ে আছে রক্তরাঙা গোলাকার চন্দ্র। এখুনি অনন্ত জলরাশির তলায় ডুব দেবে।

প্রেমা মনে মনে উচ্চারণ করল, আমি মোহিনী। অমৃত হরণ করে নিয়ে চলেছি নৃত্যের মায়ায় বিশ্বজনকে ভুলিয়ে। হে সমুদ্র তোমার অমৃত তুমি ফিরিয়ে নাও। থেমে যাক মোহিনীর মিথ্যা মায়ার খেলা।

সমুদ্রের জল ছুঁতে গিয়ে থেমে গেল প্রেমা। কে যেন পেছন থেকে এসে ধরে ফেলল তার একখানা হাত। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমা ফিরে দাঁড়াল।

দুটো বিশাল বাহুতে ততক্ষণে বাঁধা পড়েছে সে।

ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও দেবন, আমি সমুদ্রের কাছে অমৃত ফিরিয়ে দিতে এসেছি। আমি আজ স্নান করে অতি সাধারণ প্রেমা হয়ে জন্ম নিতে চাই।

তুমি জান না প্রেমা আজ সারা দিনরাত্রি আমি অভুক্ত। মনে মনে ইচ্ছা ছিল তোমার কাছ থেকে কিছু চেয়ে নিয়ে আজ আমার ব্রত ভাঙব।

ডুকরে কেঁদে উঠল প্রেমা। আমিও তো তাই চেয়েছিলাম দেবন। তোমার উপবাস ভাঙতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু কি হল দেবন! আমার প্রবল একটা ইচ্ছার স্রোতে সব ধ্যান ভেসে গেল।

দেবন আরও নিবিড় করে প্রেমাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে নিয়ে বলল, মহাদেবের জন্মলগ্নে আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি প্রেমা, আমাকে তুমি ভোলাতে পারবে না। আমি জানি, একদিকে তুমি মোহিনী অন্যদিকে তুমি তাপসী।

প্রেমা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, বারে বারে মোহিনী মায়ায় ভুলিয়ে আলোড়িত হৃদয়ের অমৃত হরণ করতে আর প্রাণ চাইছে না দেবন।

দুঃখ পেও না প্রেমা। আমি আজ সারা রাত এই নারকেল বনের ছায়ার গভীরে বসে নিজের মনকে প্রস্তুত করেছি। চাঁদের আলোয় দেখেছি তোমাকে অডিটোরিয়ামের বাইরে বেরিয়ে এসে আবার প্যালেস হোটেলের ওপরে উঠতে। আমি জেগে বসে সারাটা রাত তোমার ফেরার আশায় প্রতিটি পল অনুপল গুনেছি।

কেন, কেন তুমি বসেছিলে দেবন এ মোহিনীর জন্যে প্রতীক্ষা করে। বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে এমন অমৃত দিতে পারব না যা অন্যের স্পর্শের অতীত। দেবন প্রেমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়েও তৃপ্তি পাচ্ছিল না। সে যেন প্রেমার ভেতর একাকার হয়ে মিশে যেতে চাইছিল।

গভীর আবেগে এক সময় দেবন বলল, অমৃত কখনও কলুষিত হয় না প্রেমা। তাকে পাবার জন্যে দেবাসুর সকলেই উন্মুখ। আর সবাই যদি তোমার কাছ থেকে অমৃতের অংশ পায় তাহলে সে আস্বাদন থেকে আমিই বা কেন বঞ্চিত রইব প্রেমা?

প্রেমা আকুল হয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলল, তুমি এত ভালবাস আমাকে দেবন!

দেবন প্রেমাকে বাহুবেষ্টনে জড়িয়ে নিয়ে বলল, ঐ দেখ চাঁদ ডুবে গেছে আর পুব দিগন্তের দিকে চেয়ে দেখ সূর্যের রঙিন আভা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশের নীল ছুঁয়ে। এ মুহূর্তে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না প্রেমা। আমি মোহিনীর অন্তরে সঞ্চিত স্বর্ণকুম্ভ থেকে অনিঃশেষ অমৃত পান করে মৃত্যুঞ্জয় হতে চাই।

প্রেমার দেহে সোনালী সকালের আলো এসে পড়েছে। সে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে অমৃত প্রতিমায়। তার ঠোঁটের রেখায় বিশ্ব-বিমোহিনী হাসি আর তার আঁখির তারায় চির তৃষাতুর প্রকৃতির সৃষ্টির আকুতি।

দেবন মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল সেই আশ্চর্য মূর্তির দিকে।

কিন্নরী

কিন্নর কৈলাসের আড়ালে অস্তগামী চাঁদটা তাম্রপ্রস্তর যুগের একটা ধাতুপাত্রের মত তলিয়ে যাচ্ছে। আকাশের অগণিত নক্ষত্র জ্বলজ্বল চোখ মেলে চেয়ে দেখছে তাকে।

কামরু পাহাড় থেকে নেমে আসছে সে। ছায়া ছায়া পাকদণ্ডীর পথ। অভ্যস্ত পায়ে দ্রুত উৎরাই বেয়ে পাহাড়ী ঝোরার মত নামছে সে। বাঁকের মুখে অদৃশ্য হচ্ছে, আবার জেগে উঠছে। মাথার ওপর পরে নেওয়া সুন্দর ভেলভেটের শেউখানা উঁকি দিচ্ছে। তার তলায় সোনালী সেব ফলের মত মুখখানা। উদ্ধত বুক চোলির বাঁধনে বাঁধা পড়তে চাইছে না। পা অবধি এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দামী কম্বলের দোরি কাঁধ থেকে বুক ঢেকে নেমে গেছে নীচে। মোটা রেশমী গাচ্ছং বা কাপড়ের প্যাডে কটীদেশ বাঁধা পড়েছে।

পাহাড়ের ওপর কয়েক শতাব্দী আগেকার রহস্যময় কাঠের কেল্লা পেছনে পড়ে রইল। সে সুপ্ত কামরু গাঁওয়ের ঘুম না ভাঙিয়ে নেমে এল সাংলা উপত্যকায়। হলুদ দুপ্‌রু ফুলের ক্ষেত থেকে ভেসে আসছে একটা মিষ্টি গন্ধ। বুক ভরে সেই বাতাসের গন্ধটা টেনে নিতে নিতে সে একটা কুহলের কাছে এসে দাঁড়াল। এক ঝাঁক বাসরজাগা তরুণীর মত খল খল হাসিতে লুটোপুটি খেতে খেতে ছুটে চলেছিল ঝর্নাটা। একটু থমকে থেমে মুখখানা নামিয়ে জলের ওপর জেগে থাকা পাথরের মাথায় সাবধানে পা ফেলে ফেলে পেরিয়ে এল সে।

আখরোট গাছের প্রান্তর। ডালপাতা মেলে দাঁড়িয়ে অছে গাছগুলো। অল্প অল্প বাতাসে পাতাগুলো নড়ছে। একটা হাতপাখা যেন চালাচ্ছে কেউ। মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে শব্দ, আবার ঝড়ঝড় আওয়াজ উঠছে। ঘুমে ঝিমুতে ঝিমুতে যেন পাখা চালাচ্ছে গাছগুলো।

দুটো ধাপ পাহাড়ে উঠে ইয়াক ব্রিডিং সেন্টারের তারের বেড়ার পাশ দিয়ে সাংলা তহশীল অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল সে। চারদিকে একবার চেয়ে দেখল। সাংলা পি. ডব্লিউ. ডি. রেস্ট হাউস। বেড়া দেওয়া চত্বরের নীচে পুলিস চৌকি। পেছনের টিলায় ওভারসিয়ারের কোয়ার্টার। পোলট্রি ফার্ম, ফ্রুট নার্সারীর অফিসঘর। দূরে বাস্পা নদীর ধারে ট্রাউট ফার্ম। জাফরান ক্ষেতের চাষীদের ঘরগুলো অনেক দূরের থেকে কয়েকটা কালো ভালুকের মত দেখাচ্ছে।

তহশীলদারের অফিসের পেছনে একখানা শ্লেটপাথরের চালা দেওয়া কাঠের ঘর। একটা বড় গোছের আখরোট গাছ ডালপাতা মেলে ছোট্ট ঘরখানাকে যেন আদরে সোহাগে আগলে রেখেছে। ঝোরকার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাক দিল সে, সুজয়, সুজয়।

অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে একটা মিশ্রিত আওয়াজ শোনা গেল। কেউ যেন আচমকা ঘুম ভেঙে খাটিয়ার ওপর উঠে বসল। সারা ঘরে দড়ি আর কাঠের একটা আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল।

কে, নীলম?

হ্যাঁ আমি, আমি! ঝটপট বেরিয়ে এসো। উখাং-এর ফুল আনতে যাবে না? ভুলে গেলে নাকি?

ভেতরে এসো, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ?

আমি ঠিক আছি। ভেতরে গেলেই দেরী হয়ে যাবে। তুমি বরং চটপট চলে এসো।

ধৌলাধার পর্বতের মাথায় বরফ, তার ঠিক উল্টো দিকে হিমালয়ের প্রধান শাখায় কিন্নর কৈলাশ। ছোট-বড় অনেকগুলো বরফে ঢাকা শৃঙ্গ। তার চারদিকে। বরফের তলার পাহাড় দেওদার, কাইল,

সিডার আর ফার গাছের জঙ্গলে ছাওয়া।

কনকনে কঠিন ঠাণ্ডায় বাইরে দাঁড়িয়ে রইল নীলম। ভ্যালির চারদিকে বরফের মাথা-উঁচু পাহাড়গুলো যেন ডিপ ফ্রিজের ভেতর সারা উপত্যকার সব কিছুকেই ভরে রেখেছে।

এতটুকু উত্তাপ আবহাওয়ার কোথাও নেই। তা না থাক, উত্তাপ ছিল নীলমের বুকে। রাত পোহালেই ক্যালেন্ডারের পাতা জানিয়ে দেবে পাঁচই সেপ্টেম্বরের তারিখটা। উখাং উৎসবের উন্মাদনাময় চিহ্নিত দিন। 'উ' মানে ফুল। 'খাং' মানে চেয়ে দেখা। ফুলের সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে দেখার উৎসব। কিন্নরের মানুষ ফুল ভালবাসে। তাই সব উৎসবেই তাদের ফুলের সমারোহ। কিন্তু এই উখাং বা ফুলের উৎসবটি ফুলেরই খেলা। ফুল আনতে হবে দূর দুর্গম পাহাড়ের চুড়ো থেকে। পাহাড়ের গায়ে গভীর বনের ভেতর থেকে আর তুষার পাহাড় থেকে ঝরে পড়া স্রোত ধারার তীর থেকে।

সে ফুল দেওয়া হবে মাহাসু দেবতা, বদরীনাথ আর মহাকালীর চরণে। তারপর দেওয়া হবে গোপনে একান্ত প্রিয়জনের কবরীতে।

উৎসবের ফুলের সন্ধানে ছুটবে প্রতিটি ঘরের যুবা পুরুষেরা। কে কত ফুল সংগ্রহ করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলবে। ডঙর, লোসকার্চ, খাসবল, গালচি— কত বিচিত্র রঙ আর গন্ধে ভরা ফুল গিরিগাত্র থেকে সংগ্রহ করে আনবে প্রতিযোগীরা।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল সুজয়। ছামু কুর্তির ওপর পরেছে একখানা লম্বা ছুবা। ছামু সুতান বা উলের পাজামা পরেছে সে। কে বলবে সুজয় বাঙালী সন্তান। ভূগোলের মালমশলা সংগ্রহ করতে এসে তরুণ অধ্যাপক সুজয় সেন হয়ে গেছে টিপিক্যাল কিন্নর। প্রবল ভূমিকম্পে ওলট-পালট হয়ে গেছে সারা দেশটা। পথঘাটের চিহ্ন নেই। আজ চার মাস সে একই জায়গায় বন্দী।

নীলম সুজয়ের দিকে চেয়ে বলল, কোটিং আননি, ফুল নিয়ে আসবে কিসে?

বাস্কেট তো আমার কাছে নেই,—অসহায় গলায় বলল সুজয়।

তুমি একেবারে ভুলো, কাল আমি তোমার চারপাইয়ের তলায় রেখে দিয়ে গেছি না?—বলতে বলতে ঘরে ঢুকে কোটিংখানা বের করে আনল নীলম। সুজয়ের হাতে দিয়ে বলল, নাও ধর। এখন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এসো আমার সঙ্গে।

ওরা অবছা আলো-আঁধারির ভেতর দিয়ে চলতে লাগল। সাংলা গ্রাম ঘুমিয়ে আছে। পায়ের জোম্বা বা উলের তৈরী রবারের সোল আঁটা জুতো থেকে বিশেষ কোন শব্দ উঠছে না। সাংলা ডানদিকে রেখে ওরা নেমে এলো বাস্পা নদীর ছামের কাছে। কাঠের ছাম্ বা পুল বেরিয়ে ওরা এলো পাহাড়ের তলায়। পথ দেখা যায় না। চাঁদ ডুবে গেছে। ক্যালমং গাছের বনও শুরু হয়ে গেছে।

থমকে দাঁড়াল সুজয়। নীলম পেছন ফিরে বলল, কি দাঁড়ালে যে, হাত ধরতে হবে নাকি?

বলতে বলতে সে সুজয়ের দিকে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিল। সুজয় কুর্তির পকেটে ডানহাতখানা ভরে হাঁটছিল এতক্ষণ। শীতে তার জমে যাবার যোগাড়। এখন কুর্তির পকেট থেকে হাত বের করে ধরল সে নীলমের হাত।

একপা একপা করে পাহাড়ের ওপর উঠছিল ওরা। পথ যেন মুখস্থ নীলমের। মানচিত্রের ওপর দক্ষ জিয়োগ্রাফারের না তাকিয়ে পয়েন্টিং করার মত। কিন্তু এই ধৌলাধার পর্বতের ওপর সুজয় একেবারে আনাড়ী।

অনেক চড়াই ভেঙে ওরা এসে দাঁড়াল একটা বড় পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে। কনকনে ঠাণ্ডায়ও হাঁপাচ্ছিল সুজয়। নীলম হঠাৎ সুজয়ের ছামু কুর্তির ভেতর দিয়ে হাতটা চালিয়ে দিল বুকের মাঝখানে। হাত দিয়ে বার কয়েক বুকটা ঘষে দিল। হাত বের করে নিয়ে বলল, এখন তোমাকে যার জিম্মায় দিয়ে যাব, সে তোমাকে পাহাড়ী ফুলের সন্ধান বলে দেবে। আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকব না। মেয়েদের ফুল তুলতে যেতে নেই উখাং-এর দিনে। ভোরের আগেই আমাকে আমার কিমে পৌঁছতে হবে।

আবার সুজয়ের হাত ধরল নীলম। মুখখানা সুজয়ের দিকে সরিয়ে এনে বলল, তুমি জয়ী হবে। আমি চাই, কাল উখাং মেলায় সবাই তোমার জয়ধ্বনি দিয়ে ফিরুক।

পাথরের চাঁইটা ঘুরে ওপারে যেতেই সুজয়ের চোখে পড়ল একটা দৃশ্য। এই রাতের অন্ধকারে

পাহাড় আর বনের ভেতর দৃশ্যটাকে অলৌকিক বলে মনে হল তার।

একটা বড়সড় গুহার মত আস্তানা। একখানা পাথর মূল পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসে ছাদের মত আচ্ছাদনের সৃষ্টি করেছে। তার তলায় আগুন জ্বলছে। কাঠ পুড়ছে চিড়্ চিড়্ আওয়াজ তুলে। একপাল ভেড়া সমুদ্রের বেলাভূমিতে জমে থাকা ফেনার মত পেটের ভেতর মুখ গুঁজে লটকে পড়ে আছে একটু দূরে। একটা মেয়ে আগুনের পাশে শুয়ে আছে কম্বল মুড়ি দিয়ে, আর একটা লোক পাহাড়ে পিঠ ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে বসে ঘুমোচ্ছে।

ভেড়া চরিয়ে বেড়ায় এরা। পাহাড়ে পাহাড়ে বহুদূর চলে যায়। অনেক উঁচু উঁচু পাহাড়ও ওদের কাছে অনধিগম্য নয়। কাংড়া আর কুলু উপত্যকায় ওরা গদ্দী, কিন্নরে ওদের নাম হয়েছে পালস।

এসব জানে সুজয়। পালসদের পাল পাল ভেড়া চরিয়ে নিয়ে যেতে দেখেছে সে। মুখে চিৎ চিৎ করে অদ্ভুত একরকমের শব্দ তুলে ভেড়াগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঐ আওয়াজকে ওরা বলে সিসরং।

নীলম এগিয়ে গেল লোকটির দিকে। হাঁটু গেড়ে তার কাছে বসে অসংকোচে গায়ে হাত রেখে বলল, তেতে, তেতে।

সুজয় দেখল লোকটি চোখ মেলে চাইল আর সঙ্গে সঙ্গে নীলমকে দেখে ছড়ানো পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে ভদ্র হয়ে বসল।

কি রে, কখন এলি?

নীলম বলল, এই এখুনি এলাম। সঙ্গে আমার সেই কানেশ এসেছে। বন্ধুটির কথা তো আগেই বলেছি।

লোকটি সুজয়ের দিকে একবার চেয়ে দেখে চোখ নামিয়ে বলল, বসুন, হাত-পা একটু গরম করে নিন।

সুজয় আগুনের ধারে উবু হয়ে বসে গা-হাত-পা সেঁকতে লাগল। সে এইটুকু বলার অপেক্ষাতেই ছিল।

নীলম বলল, পাহাড় পেরিয়ে সালং নিয়ে কবে যাচ্ছিস ওপারে?

হাসল লোকটি। বলল, তুই কি আমাকে এই রাং থেকে তাড়িয়ে দিতে চাস্ নাকি রে?

নীলম বলল, এ কথা বললি তুই! আর কোনদিন তোর কাছে আসব না।

রাগ করিস কেন,—বলেই লোকটি নীলমের বিনুনি ধরে টেনে দিয়ে হাসতে লাগল।

নীলম বলল, তোর সঙ্গে কথা বলার সময় এখন আর আমার নেই। সন্ধ্যে থেকে ওপারের পাহাড়ের গুহায় কামরুর ছেলেগুলো সব ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে। ভোরের আলো ফুটলেই ওরা ছুটবে ফুলের খোঁজে। আমি আমার বন্ধুকে এদিকে নিয়ে এলাম শুধু তোর ভরসায়।

হাসল লোকটি। বলল, ভরসা যখন করেছিস তখন চুপচাপ বসে থাক।

হঠাৎ পা বাড়িয়ে এক ঠ্যালা লাগাল ঘুমন্ত মেয়েটাকে।

যুবতী মেয়েটি দেহটাকে ভেঙেচুরে দুটো হাত ছড়িয়ে মুঠো পাকিয়ে আলসেমী ভাঙল। তারপর ঝাঁকুনি মেরে উঠে বসল।

পালস লোকটি বলল, নীলম তার কানেশকে নিয়ে এসেছে, দুধ গরম করে দে।

সুজয় বলল, এসবের কি দরকার। অকারণে ভোর রাতের ঘুমটা ভাঙানো হল।

নীলম বলল, ও তোমাকে গরম দুধ না খাইয়ে ছাড়বে ভেবেছ? ও চলে ওর নিজের খেয়াল-খুশিতে, কারো কথায় কান দেবার দরকারই মনে করে না।

মেয়েটি একটা বাটি হাতে তুলে নিয়ে ছাগলের দঙ্গলের কাছে উঠে গেল। একটা ছাগলীকে গুঁতো মেরে তুলে তার থেকে খানিকটা দুধ চুঁই চুঁই করে দুয়ে নিল।

নির্জন পাহাড়ে অন্ধকারের কালো জোব্বা পরে দাঁড়িয়ে আছে সিডার আর ফার গাছের সারি। তুষার পাহাড় থেকে নেমে আসছে একটা কনকনে ঠাণ্ডা। সমস্ত পার্বত্য প্রকৃতিকে সে যেন তার নিঃশব্দ শাসনে স্তব্ধ করে রেখে দিয়েছে। তারই মাঝে খানিকটা গনগনে আগুন দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠছে।

এক চিলতে জায়গা জুড়ে তার রাজত্ব। সেখানে সারা ধৌলাধারের শীতের শাসন অচল।

গরম দুধ খাওয়া শেষ হলে নীলমের কানের কাছে লোকটি মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে কি যেন বলল।

নীলম মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে সুজয়ের দিকে চেয়ে বলল, থারচেন বলছে, তার কাছে তো আঙ্গুরী নেই, তুমি কি ঘন্টি খেতে পারবে?

সুজয় বলল, মদে আমার আসক্তি কম, তবে আঙ্গুরী নেই বলে যে অন্য কোন ফাসুর ছোঁব না, এমন গোঁড়ামি আমার নেই।

ঐ দুধের পাত্রেই ঘন্টি ঢালা হল। সুজয় সামান্য নিলে, কিন্তু নীলম স্পর্শ করল না।

সুজয় এ ক'মাসে দেখেছে, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাড়িতে গেলেই তারা আঙ্গুরী অফার করে অতিথিকে। তারা নিজেরা খায়, কিন্তু মেয়েরা খায় না। সারা কিন্নরে সাধারণতঃ মদ চোলাই করে মেয়েরা, কিন্তু পুরুষ ছাড়া কোন মেয়েকে ফাসুর খেতে দেখা যায় না।

আঙ্গুরী অনেক দামী সুরা, আঙুর থেকে জন্ম তার। নীলমের বাড়িতে ঐ আঙ্গুরীরই চলন। সুজয় গেলেই নীলমের মা আর বোনেরা তাকে আঙ্গুরী এগিয়ে দেয়, কিন্তু কেউ ঠোঁটে ছোঁয় না সে ফাসুরের পাত্র।

অনেকখানি ঘন্টি গলায় ঢেলে থারচেন নামের পালসটি উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সুজয় আর নীলমও উঠল।

থারচেন বলল, চলুন, যাওয়া যাক।

নীলম রহস্যভরা চোখে একবার তাকাল সুজয়ের দিকে, তারপর যে পথে এসেছিল সেই পথে পা বাড়াল।

থারচেনকে অনুসরণ করে সাবধানে চলতে লাগল সুজয়। একবার পিছন ফিরে দেখল, থারচেনের বউ মাথা নীচু করে বসে আগুনে কাঠের টুকরো ফেলছে।

মেলা-প্রাঙ্গণ সুজয়ের জয়ধ্বনিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে। একজন বিভূঁইয়ের লোকের এই কৃতিত্ব ভাবাই যায় না। ঈর্ষা নেই কারো মনে। মেয়েরা গলা সপ্তমে তুলে সুজয়ের সাধুবাদ দিচ্ছে, কামরুর ছেলেরা সুজয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে।

সুজয় সবরকম ফুলই এনেছে, তার ওপর নিয়ে এসেছে দুর্লভ চম্বক।

মেলা-প্রাঙ্গণের ওপরে একটা পাহাড়ী গুহা। সেই গুহা বা উদাব্রোতে সকলের সংগ্রহ করা সব ফুল রাখা হয়েছে। উখাং উৎসবের এই নিয়ম। মাহাসুর পুরোহিত অভ্যর্থনা করে এনেছে পুষ্প-সংগ্রহকারীদের। তারপর মহাকালীর মন্দিরে পুজো দিতে গেছে সকলে। বলি পড়েছে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে বেজে উঠেছে ঢোল, রণসিং, কন্নাল। পুজো হয়েছে কামরুর মহাদেবতা বদরীনাথের। করদার পাহাড়ী ঝর্না থেকে জল নিয়ে এসে বদরীনাথের গ্রোচের মাথায় ছিটিয়ে দিতেই এক ধরনের অস্বাভাবিক রূপান্তর ঘটে গেছে তার। লোকটি তখন বলে গেছে দেশের আগামী শস্যের সম্ভাবনার কথা। শুভ-অশুভ ভবিষ্যৎবাণী।

তার ঠিক পরেই বুশেহারের রাজা এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে। দেবতার গ্রোচ তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে প্রথম পুষ্পগুচ্ছ। এরপর উদাব্রো উজাড় করে সবার হাতে দেওয়া হয়েছে ফুল। অমনি শুরু হয়ে গেছে নাচ। দোলনায় দুলছেন দেবতা, আর তাঁকে ঘিরে উখাং-এর গান গাইতে গাইতে নাচের দোলায় দুলছে সারা কামরু আর সাংলা দেশাং-এর নারীপুরুষ।

নেই শুধু নীলম। সারা মেলায় ঘুরে ঘুরে সুজয়ের সন্ধানী চোখ খুঁজে পায়নি নীলমকে। সে কাউকে প্রশ্ন করেনি, কারণ নীলম সম্বন্ধে তার সীমাহীন কৌতূহল থাকলেও কামরুর মানুষদের মনে অকারণ সন্দেহ সে জাগাতে চায়নি। নীলমের বোনেদের সে দেখেছে উৎসবে যোগ দিতে। নীলমের মা অতি সম্ভ্রান্ত পোশাকে একবার এসে দাঁড়িয়েছিলেন উৎসব-প্রাঙ্গণে। সে সময় পুরোহিত উদাব্রো থেকে আনা ফুল দিচ্ছিল বুশেহারের রাজার অঞ্জলিবদ্ধ হাতে। বুশেহারের প্রৌঢ় রাজা গুলাব সিং হাসতে হাসতে

সে ফুলের কিছু দিলেন নীলমের মায়ের হাতে। তারপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভ্রান্ত নারী-পুরুষের আরও কেউ কেউ সে ফুল পেল। যতক্ষণ না রাজার হাতের ফুল নিঃশেষিত হল ততক্ষণ রাজা গুলাব সিং জনতাকে প্রীতি দেখালেন তাঁর ফুল বিলিয়ে দিয়ে।

তিন দিন ধরে চলল মেলার নাচ-গান। একসময় সমাপ্তি ঘটল উৎসবের, কিন্তু সুজয়ের সীমাহীন বিস্ময় আর উদ্বেগকে শান্ত করতে কেউ এসে দাঁড়াল না তার সামনে।

তহশীলদারের দেওয়া ছোট্ট ঘরে সুজয় বিমর্ষ হয়ে বসেছিল। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সে ভাবছিল তার অবস্থার কথা। হিমালয়ের বিভিন্ন হিমবাহ আর তাদের গতিপ্রকৃতি, হিমবাহ সৃষ্ট বিভিন্ন লেক ও তাদের স্রোতস্বিনীর রূপান্তরের ছবিগুলি স্বচক্ষে দেখার জন্যেই সে বহুদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলগুলিতে। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয়ের অদম্য একটা ইচ্ছা ছিল তার মনে। তাই ছুটি হলেই সে বেরিয়ে পড়ত। কষ্টকর ভ্রমণে সে কাউকে সঙ্গী করত না। একা একা ঘুরে বেড়ানোতেই ছিল তার উৎসাহ আর উন্মাদনা। কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে বহুবার, কিন্তু সাহসের সঙ্গে সে সব বাধার মোকাবিলা করেছে।

শুধু হার মানতে হল তাকে এই কিন্নর ভূমিতে এসে। জায়গাটা যেমন দুর্গম, তেমনি রহস্যময় আর সুন্দর। রোমাঞ্চকর রমণীয়তা আছে কিন্নর দেশে। যত গভীরে প্রবেশ কবা যায় ততই যেন রহস্য ঘনীভূত হয়ে ওঠে। পাহাড়ের পর পাহাড় ভয়াবহ মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পথ অতি সংকীর্ণ। পায়ে হেঁটে চলা, অথবা পথ পরিষ্কার থাকলে গাড়ি চড়ে কিছু পথ এগিয়ে চলা। বিরাট বিরাট পাহাড় কল্পকথার দৈত্যপুরীর মত জেগে আছে। পথের ওপরে ঝুঁকে আছে পাথরের ছাদ। যেন হাজার হাজার স্থপতি সিস্ট রকগুলোকে কেটে কেটে দৈত্যরাজের পাষাণ প্রাসাদ বানিয়েছে। একটা দুরন্ত মেয়ের মত পাহাড়ের অনেক নীচ দিয়ে শতদ্রু নদীটা পালাচ্ছে, কিন্তু পালাতে পারছে না। যেদিকে ছোটে সেদিকে পাহাড়। ধাক্কা খেতে খেতে ছুটে চলেছে নদী।

মৃত্যুর ফাঁদ পাতা আছে সব জায়গায়। সিস্ট রক পেরিয়ে গিয়ে পড়ছে ঝুরো পাথরের তৈরি পাহাড়। বাতাসে মাটি মেশানো পাথর ঝুর ঝুর করে ঝরছে। কখনো বা ধুলোর ঝড়ে পথঘাট অন্ধকার। তার ভেতর সরে যাওয়া ঝুরো মাটি থেকে নেমে আসছে ছোট-বড় ঝাঁক ঝাঁক বোল্ডার। বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে আসছে নীচে। পথ ভেঙে লাফিয়ে পড়ছে বহু নীচে শতদ্রুর জলে। আবার কতক্ষণ পরে সবকিছু প্রশান্ত। পথ থেকে বোল্ডার সরানো হচ্ছে, মেরামত হচ্ছে পথ। বোল্ডারপাতের সময় মানুষ, যানবাহন সামনে পড়ে গেলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে শতদ্রুর অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সীমাহীন সৌন্দর্যের দেশ এই কিন্নর। ধৌলাধার আর হিমালয়ের প্রধান শাখাটি যেন মেতে উঠেছে সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায়। ঝক্ ঝক্ করছে ধবল তুষার। সূর্যের উদয় আর অস্তের মুহূর্তগুলোতে তুষার চূড়ায় রঙের আশ্চর্য খেলা চলে। সবুজ সীডার আর ফারের অরণ্য আদি যুগ থেকে আবৃত করে রেখেছে পর্বতের নিম্নদেশের নগ্নতা। কোথাও শুভ্র ফেনা তুলে তরঙ্গিত ভেড়ার পাল চলেছে গিরিপথ বেয়ে। পালসদের মুখে বেজে উঠছে সিসরংয়ের অদ্ভুত সব শব্দ।

কিন্নর পেরিয়ে যারা বিভুঁইয়ে গেছে, কিন্নরে ফেরার জন্যে তাদের প্রাণ আকুল। গানে গানে ঝরে পড়ছে তাদের মনের ব্যথা।

জ্যেষ্ঠং আষাঢ়ং গরমি দোয়ারা
ইয়ালুচি উ উ।
নিঙমাজোন সারগেও
কিনোরিং বিমু চালসে
মন বন সুন চেয়াসে।—

গরমের মরশুম এখন। ইয়ালু ফুল ফুটেছে। ঐ ফুলের দেশে যাবার জন্যে মন আমার উদাস। আমার মা-বাবার কাছে ফেরার জন্যে অস্থির হয়ে উঠছে মন।

জ্যোৎস্নারাতে গাঁয়ের ঘরবাড়ি গাছপালা আর অদ্ভুত বৌদ্ধ স্তূপের মত মন্দিরচূড়া যখন মায়াময় হয়ে ওঠে তখন কিন্নর-কিন্নরীর দল সন্তং-এর মাঝে দাঁড়িয়ে নাচে আর গায়। কিন্নরীদের উচ্চগ্রামী গলার সুর পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজতে বাজতে, সিডার বনের শন্ শন্ শব্দের সঙ্গে মিশে বাস্পা, স্পিতি, শতদ্রু নদীর তরঙ্গের ধ্বনির সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

ভূগোলের মালমশলা সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে রূপ দেখবে দুচোখ ভরে এই ছিল সুজয়ের ইচ্ছা, কিন্তু বাদ সাধল ভূগর্ভের অদৃশ্য সংক্ষোভ। সাংলার উপত্যকায় বেড়াচ্ছিল সে। সন্ধান করে ফিরছিল ইউসেপ্ ভ্যালির। পাশে দাঁড়িয়েছিল নীলম। তাকে বোঝাচ্ছিল সুজয়, কেমন করে সহস্র সহস্র বছর আগে একটা শ্বেত দৈত্যের মত হিমবাহ নেমে এসেছিল পাহাড় কাটতে কাটতে পথ করে। তারপর এই ভ্যালির মধ্যে গলে গিয়ে তার শ্বেত দেহখানা হয়ে গিয়েছিল নীলকান্ত মণির মত। একসময় সেই নীল সবোবর খুঁজে পেয়েছিল তার মুক্তির পথ। বাস্পা নদীর রূপ ধরে সে ছুটে গিয়েছিল নুড়ির নূপুর বাজিয়ে বনের পথ চিরে। একসময় মিশে গিয়েছিল কলনাদিনী শতদ্রুর সঙ্গে।

সুজয় নদীতীর থেকে নুড়িগুলো হাতে তুলে নিয়ে নীলমকে দেখিয়ে বলেছিল, এই দেখ মোরেণ। হিমবাহের গতিপথের পরিত্যক্ত চিহ্ন। নীলম গল্পের মত শুনছিল সে কাহিনী। হাতে নিয়ে দেখছিল সুজয়ের দেওয়া মোরেণগুলো। এমন সময় ধৌলাধারের শিখরে শেষ সূর্য কাঁপতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল সারা পর্বত। কেঁপে উঠল বন পাহাড় উপত্যকা। সুজয়ের বুকের কাছে টলে পড়ল নীলম। ভূমিকম্প, ভূমিকম্প। একটা আর্তনাদ বেজে উঠল নীলমের ভয়ার্ত কণ্ঠে।

সাংলার বৌদ্ধ মন্দিরের ঘণ্টা তখন পাহাড় কাঁপিয়ে ঢং ঢং শব্দে বেজে চলেছে।

রাত তখন কত অনুমান করা কঠিন, আলোর চিহ্ন কোথাও নেই। ছোট ছোট কম্পনে তখনও ধরিত্রীর দেহ শিউরে শিউরে উঠছে। বাস্পার অতি শীতল জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে ভয়ার্ত দুটো দেহ। নিবিড় বাঁধনে তখন দুটো দেহ এক হয়ে গেছে।

নীলমকে দুহাতে তুলে ধরে উঠল সুজয়। দুটো দেহ তখনও শঙ্কাতুর উত্তেজনায় কাঁপছে।

নীলম এবার সুজয়কে বেষ্টন করে ধরেছে। অন্ধকার পথে সুজয় একেবারে অন্ধ। নীলম তাকে নিয়ে চলল রেস্ট হাউসের দিকে। পথ ভেঙে গেছে, মাঝে মাঝে সৃষ্টি হয়েছে গভীর গর্ত, বড়-ছোট বোল্ডার গড়িয়ে নেমে এসেছে পাশের পাহাড় থেকে। অতি সন্তর্পণে সুজয়কে ধরে রেস্ট হাউসের সামনে দুজনে এসে যখন দাঁড়াল তখন তারার অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল, শ্লেটপাথরের একদিকের ছাদ ধ্বসে গেছে। কয়েকটা কাঠের বর্গা প্রেতাত্মার লম্বা কালো হাতের মত ঝুলে আছে।

নীলম ছুটে দরজা খুলতে যেতেই তাকে বাধা দিল সুজয়। ভূমিকম্পের জের মেটেনি, সারা বাড়িখানা যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। দিনের আলো ফোটা পর্যন্ত বাইরে ফাঁকা জায়গাটুকুতে অপেক্ষা করা ভাল।

নীলম বলল, তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি কামরুর অবস্থাটা দেখে আসি। ওরা বেঁচে আছে তো!

বলতে বলতে গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল নীলমের। সুজয় জানে, মানসিক শক্তির দিক থেকে নীলমের তুলনা হয় না। তবু তাকে এমন করে ভেঙে পড়তে দেখে সুজয় বলল, চল আমরা একসঙ্গে যাই, তোমাকে একা আমি কিছুতেই যেতে দিতে পারব না।

নীলম বলল, দুজনে একসঙ্গে বিপদের মুখে পড়ে কি লাভ বল? তুমি তো পথ চিনে যেতে পারবে না, তাই আমি একা যেতে চাই।

সুজয় বলল, বিপদ হলে দুজনেরই হোক ! যখন বড় বিপদটা একই সঙ্গে থেকে পার হয়ে এসেছি তখন ছোটখাট বিপদে আর ছাড়াছাড়ি কেন।

সেদিন নীলম আর বাধা দিতে পারেনি সুজয়কে। দুজনেই ভাঙাচোরা উঁচু নীচু পথের ওপর দিয়ে এগিয়েছিল।

কামরু গ্রাম আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়েছিল। ভূকম্পন-তরঙ্গ হিমালয়ের এই প্রস্থিত অংশটিকে স্পর্শ না করে চলে গেছে চিনি ভ্যালির দিকে। চিনি ভ্যালির বহু অংশ যেখানে পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে

সেখানে কামরু পাহাড় প্রায় অক্ষত থেকে গেছে। তার পাঁচতলা প্রা বা কেল্লা, মন্দির, ঘরবাড়ি সবই দাঁড়িয়ে আছে পূর্ব মহিমায়।

ছোটখাট দু'একটি অনুল্লেখ্য ক্ষয়ক্ষতি এত বড় একটা ভূমিকম্পের কাছে কিছুই নয়। মানুষগুলি কিন্তু কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে নেমে এসেছিল আখরোট গাছের প্রান্তরে। দূর থেকে ওরা শুনেছিল কামরুর আর্ত অধিবাসীদের বদরীনাথের জয়ধ্বনি দিতে।

নীলমকে ফিরে পেয়ে শুধু তার পরিবার নয়, গাঁয়ের সকলেই আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল।

বিদেশী সুজয়কে নীলমের সঙ্গে দেখে সেদিন অখুশি হয়নি কামরুর অধিবাসীরা।

সেই থেকে এই ক'মাস নীলমের বাড়িতে তার আসা-যাওয়াকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতেই দেখে আসছে সকলে। বিপদের দিনের বিদেশী এখন সারা গাঁয়ের আশ্রিতজন। রেস্ট হাউসে বেশি দিন থাকার নিয়ম নেই, তাই গ্রামের মানুষদের সাহায্যে সে তহশীল অফিসের পেছনের খালি ঘরখানাতেই থাকার সুযোগ পেয়েছে। আর সেখানেই নীলমের চলেছে রাত্রিদিন যাওয়া-আসা। কামরু থেকে সাংলার স্কুলে সে পড়াতে আসে। পথেই তহশীল অফিসের সেই ঘর। আখরোট গাছের আড়ালে পথটা অদৃশ্য হয়ে যায়। নীলম সুজয়ের ঘরে ঢুকে আসে। চরাচরের কেউ দেখতে পায় না তাকে।

এদিকে সুজয়ের দেশে ফেরার পথ এখনও খোলেনি। পাহাড়ী পথ মেরামতের কাজ অত সহজ নয়। তাই বাধ্য হয়ে সুজয়কে থাকতে হয় তার ঘরে, তার কাজকর্ম ভুলে। তার এই দুঃখের দিনে সান্ত্বনার একমাত্র উৎস এই নীলম মেয়েটি।

আশ্চর্যভাবে পরিচয় হয়েছিল তার নীলমের সঙ্গে। সিমলা থেকে কিন্নরের পথে আসছিল সে। রামপুরে এসে বাসটা দাঁড়িয়ে গেল। কয়েকটি যাত্রী নেমে গেল। কয়েকজন পুলিস সেই শূন্য সীটগুলোতে উঠে এসে বসল। সঙ্গে উঠল একটি সুবেশা তরুণী। পথে সুজয় রামপুর বুশেহারের যেসব মেয়েকে দেখেছে তাদের থেকে এর রং আর গড়নই শুধু সুন্দর নয়, পোশাক-আশাকও অন্য ধরনের। বিশেষ করে এ অঞ্চলের মেয়েদের মত তার মাথায় স্কার্ফ ছিল না, একটা সুন্দর টুপি ঘিরে ছিল তার চুলে ভরা মাথাটা।

গাড়ি পুলিস ফাঁড়ির কাছে সামান্য সময় থেমেই আবার চলতে লাগল। একটু দূরে বাস-স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়াবে। সেখানেই নামবে সুজয়। একদিন রামপুরে থেকে এস. ডি. এম.-এর কাছে কিন্নর প্রবেশের অনুমতি-পত্র নিতে হবে তাকে। সুরক্ষিত এলাকা কিন্নর। পারমিশন ছাড়া কোন ভারতীয়ের পক্ষেই প্রবেশের অধিকার নেই।

বাস-স্ট্যান্ডের কাছে এস. ডি. এম.-এর অফিস। কন্ডাক্টর সেখানেই নামিয়ে দেবে বলেছে। চুপচাপ বসে সুজয় লক্ষ্য করছে মেয়েটিকে। মেয়েটি পুলিশ অফিসারটির পরিচিত বলে মনে হল। নাইলনের সুতোয় বোনা ব্যাগ থেকে কয়েকটা আড়ু বের করে সে অফিসার আর ক'টি পুলিসের হাতে একটি একটি করে দিয়ে দিল। অফিসারটি হেসে বলল, কোত্থেকে যোগাড় করলেন?

মেয়েটি সুন্দর একমুখ হাসি দর্শকদের উপহার দিয়ে বলল, গাছ থেকে।

অফিসারটি হেসে বলল, সে তো বটেই। ফল কি গাছে ছাড়া হয়?

মেয়েটি বলল, আত্মীয়ের বাড়ি থেকে গাড়ি ধরার জন্যে আসছিলাম, পথের ধারে গাছটা পড়ল। একেবারে আড়ুর ভারে নুয়ে পড়েছে। তাই গাছটার ভার একটু হাল্কা করলাম।

কপট গাম্ভীর্য গলায় এনে অফিসারটি বলল, তাহলে তো মাল সুদ্দো চোরকে অ্যারেস্ট করতে হয়।

ততক্ষণে অফিসার আর পুলিসদের আড়ুতে কামড় বসানো হয়ে গেছে।

মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, চোরাই মালে ভাগ বসানোও সমান অপরাধের।

সুজয় হেসে উঠতেই মেয়েটি তার দিকে এক ঝলক হেসে একটি আড়ু এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনি দেখছি আমার পক্ষে, এই আড়ু নিন।

সুজয় অমনি বলল, ঘুষ কিংবা চুরির দায়ে পড়ব না তো?

পুলিশ অফিসার সমেত সকলেই হো হো করে হেসে উঠল।

অফিসারটি সুজয়ের দিকে চেয়ে বলল, কোত্থেকে আসছেন?

কলকাতা।

আবার প্রশ্ন, যাবেন কোথা?

সুজয় বলল, আপাততঃ রামপুর বাস-স্ট্যান্ড। কাল এস. ডি. এম.-কে দিয়ে অনুমতি-পত্রে সই করিয়ে কিন্নরে ঢুকব।

অফিসারটি বলল, এস. ডি. এম. আজ সকালেই সিমলা রওনা হয়ে গেছেন। ফিরতে দেরী হবে শুনেছি। ওখানে বিভিন্ন কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করবেন।

সুজয়ের মাথায় যেন পাথর খসে পড়ল।

এখন উপায়! আমার তো বসে থাকা চলবে না।

অফিসারটি বলল, অনুমতি আপনাকে নিতেই হবে। অনুমতি ছাড়া কিন্নরে ঢোকা অসম্ভব।

সুজয় বলল, তাহলে ফিরে যাওয়া ছাড়া গতি নেই আমার। এখান থেকেই ফিরতে হবে।

এমন বিষণ্ন হতাশ গলায় কথাগুলো উচ্চারণ করল সুজয় যে মেয়েটি তার সীটে একটু নড়ে চড়ে বসে পুলিশ অফিসারটিকে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন জিজ্ঞেস করলে।

দুজনের বেশ কিছু সময় কথা হল। কথা হচ্ছিল ওদের দেশোয়ালী ভাষায়, তাই কোন কিছু বোঝা যাচ্ছিল না।

কন্ডাক্টর সুজয়ের কাছে এসে বলল, এখানেই আপনাকে নামতে হবে।

সুজয় সীট থেকে উঠে দাঁড়াতেই মেয়েটি ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলল।

দোটানায় পড়ে গেল সুজয়। ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা তার। ফিরে যদি যেতে হয় তাহলে রামপুরে নামাই ভাল। কিন্তু কি আশ্চর্য মোহিনী শক্তি ঐ মেয়েটির। সুজয় ওর ইঙ্গিতটুকু উপেক্ষা করে গাড়ি থেকে নেমে যেতে পারল না। ওকে ওর সীটের ওপর কে যেন জোর করে বসিয়ে দিলে।

একটু উত্তেজিত কথাবার্তা চলছিল মেয়েটির সঙ্গে পুলিশ অফিসারটির। শেষে একটি ইংরাজী বাক্য উচ্চারণ করে মেয়েটি তার কথায় ছেদ টেনে দিল। অমনি সুজয় বুঝল, মেয়েটি পুলিস অফিসারের কাছে একটা কিসের চ্যালেঞ্জ রাখল।

কন্ডাক্টর আবার এল সুজয়ের কাছে। জিজ্ঞেস করল, এখন কোথায় যাবেন?

সুজয় একেবারে অন্ধকারে। সে জানে না কোথায় যেতে হবে। মেয়েটি তার সীট থেকে কন্ডাক্টরকে বলল, নাচারের টিকিট দিন।

সুজয় কন্ডাক্টরের কাছ থেকে নাচারের টিকিট নিয়ে পয়সা দিয়ে আবার চুপচাপ বসে রইল।

নাচার এলে মেয়েটি সুজয়ের কাছে এসে বলল, এখানেই আমাদের নামতে হবে।

সুজয় বাধ্য ছেলের মত পাশে রাখা স্লিপিং ব্যাগ আর অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে মেয়েটির সঙ্গে নেমে পড়ল।

গাড়ি ছেড়ে দিতেই মেয়েটি পুলিশ অফিসারটির দিকে চেয়ে হাত তুলল। অফিসারটি একটুখানি হাত তুলে হাসল।

পথের ধারে পাহাড়। গাড়িটা শতদ্রুর তীর ধরে ভয়ঙ্কর পাহাড়ী পথে এঁকে বেঁকে তাপ্রীর দিকে ছুটে চলল।

গাড়িটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত ওরা দাঁড়িয়ে রইল পাহাড়ের গা ঘেঁষে।

মেয়েটি সুজয়ের দিকে চেয়ে অসংকোচে বলল, আমার নাম নীলম, আপনার?

সুজয়।

মেয়েটি আবার বলল, আপনি যদি কিন্নরের ভেতরে ঢুকতে চান সিধে পথে, তাহলে একটু দূরেই চেকপোস্টের কাছে আপনাকে আটকাবে। এখন পেছনে যে পাহাড়টা দেখছেন, ওটার গা বেয়ে একটা 'ওম্' পথ আছে। বনের ভেতর দিয়ে পথ, তাই বড় একটা কেউ হাঁটে না ঐ পায়দলের পথে। আপনি যদি রাজী থাকেন তাহলে ওপথে হয়তো আপনাকে পার করে নিয়ে যেতে পারি। ওখানে আপনাকে আটকাবে ফরেস্ট গার্ড, কিন্তু এই রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার আমার আত্মীয়। ওঁকে যদি কোনরকমে সামনের ব্লকে পেয়ে যাই তাহলে আমাদের অনেক দিক থেকে সুবিধে হয়ে যাবে।

সুজয় হেসে বলল, আমি যে-কোন রকম কষ্ট সইব বলেই এসেছি, কিন্তু আপনাকে কষ্টে ফেলার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। আপনি সোজা পথে চলে যেতে পারতেন, আমার জন্যে অকারণে আটকে পড়লেন। আমার খুবই খারাপ লাগছে আপনাকে ঝামেলায় ফেললাম বলে।

নীলম বলল, বিশ্বাস করুন, আপনাকে সাহায্য করব বলে বাস ছেড়ে পথে নামিনি। পুলিশ অফিসারের কাছে চ্যালেঞ্জ রেখে এই দুঃসাহসিক কাজে নেমে পড়েছি। উনি বলেছিলেন, পারমিশান ছাড়া চেষ্টা করলেও আমি আপনাকে কিন্নরের ভেতরে নিয়ে যেতে পারব না।

সুজয় বলল, মিথ্যে ঝুঁকি নিলেন।

মেয়েটির মুখ রাঙা হয়ে উঠল। সে বলল, কোন কিছু পারব না বললেই দারুণ একটা জেদ চেপে যায়। এ ব্যাপারটা পুরোপুরি সেই জেদের ব্যাপার।

সুজয় বলল, তাহলে আমি তৈরি, যেদিকে নিয়ে যাবেন সেদিকে যাব।

নীলম পাহাড়ের দিকে পা চালিয়ে বলল, চলুন।

সুজয়ের পাহাড়ে চড়ার অভ্যেস আছে, তাই খাড়াই পাহাড়ে উঠতে তার তেমন কষ্ট হচ্ছিল না, কিন্তু যেভাবে নীলম অবলীলায় চড়াই ভেঙে উঠছিল, তা সুজয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সুজয় পিছিয়ে পড়ছিল। নীলম কোন একটা ঝোরার কাছে অথবা গাছের তলায় পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে সুজয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। সুজয় কাছে এলে আবার ওরা চলতে শুরু করে দিচ্ছিল।

ফরেস্ট বাংলোর কাছে এসে নীলম বলল, জানেন, আমার বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে।

সুজয় চিন্তিত মুখে বলল, কেন কি হল?

নীলম ছেলেমানুষের মত বলে উঠল, বুঝছেন না, কতবড় রিস্ক নিয়ে আমি নিয়ে এসেছি আপনাকে। এখন যদি রেঞ্জ অফিসারকে না পাই তাহলে আর মুখ থাকবে না।

মনে মনে খুশি হল সুজয়, ও তাই বুক ঢিপ্ ঢিপ্।

মুখে বলল, আপনি কিন্তু খুব দুঃসাহসী মেয়ে।

আর বলবেন না, এ সব জেদের কাজ করতে গেলে ফ্যাসাদ কি কম।

সুজয় একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, মেয়েটি ওকে কথা বলার কোন সুযোগই দিলে না। সামনের দিকে চেয়ে চেঁচাতে লাগল, সুন্দরলাল, সুন্দরলাল।

কে, রেঞ্জার সাহেব নাকি?—জানতে চাইল সুজয়।

নীলম বলল, আপনি কিচ্ছু জানেন না. ও রেঞ্জ অফিসার হতে যাবে কেন, ও তো চৌকিদার সুন্দরলাল।

সুজয় চুপ করে রইল। একটা লোক এগিয়ে এল জঙ্গলের লতাপাতা সরাতে সরাতে।

নমস্কার করে বলল, সাহেব তো নেই, তবে আজ সন্ধেয় আসাব কথা আছে।

নীলম গম্ভীর হয়ে বলল, আমি কি সাহেবের কথা জানতে চেয়েছি? এখন তোমার বাংলোতে রাত কাটাবার মত জায়গা আছে কিনা বল?

চৌকিদার সুন্দরলাল বলল, সাহেব এলে একে নম্বরে থাকবেন। দু'নম্বর পুরো খালি। তবে দু'নম্বরে একখানা খাট আছে। আর একখানা খাট দরকার হলে লাগিয়ে দেব।

নীলম বলল, চলুন, আজকের মত চলায় ইতি। অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে রেঞ্জ অফিসারের জন্যে।

বাংলোতে এল তিনজনে। সুজয় ভাবল, মজা মন্দ নয় তো। এ যে রীতিমত অ্যাডভেঞ্চার।

দু'নম্বর স্যুইট মূল বাংলোর থেকে একটুখান তফাতে। সংলগ্ন কিচেন।

ঘরে ঢুকে দুজনেই খুব খুশি। নতুন প্ল্যাস্টিক কালারে ঘরখানা ঝকঝক করছে। সুন্দর ডিজাইনের পর্দা। সাদা জাফ্রি কাটা পেলমেট। ধবধবে সাদা দরজায় লাগানো পেতলের নব। ডানলোপিলোর গদির ওপর পিঙ্ক কাপড়ের কভার। তার ওপর বড় বড় গোলাপ ফুলের ডিজাইনওয়ালা সাদা চাদর।

একমুখ খুশি নিয়ে নীলম বলল, আজ তাপ্‌রী পৌঁছতে পারলাম না বলে মনে কোন ক্ষোভ রইল না, কি বলেন?

সুজয় বলল, সবটাই তো আমার অনিশ্চিত। তার ভেতর এক রাতের জন্য এ আশ্রয়টা অনেকখানি নিশ্চিন্ত করল বৈকি।

চৌকিদার সুন্দরলাল রসিক বলেই মনে হল। সে এক চক্কর দিয়ে এসে বলল, মেমসাব, আর একটা খাটের পায়া ভেঙে আছে। মিস্ত্রী লেগেছে কিন্তু সারাই হয়নি এখনও। দড়ির একখানা চারপায়া রয়েছে, আনব কি ?

নীলম তার চাঁদা মাছের মত চকচকে সুন্দর চোখের কোনা দিয়ে ঘরের একপাশে পড়ে থাকা ইজিচেয়ারখানার অবস্থা দেখে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, আর কষ্ট করে খাটিয়া বয়ে আনতে হবে না।

রাতে রেঞ্জার সাহেব এলেন না। নীলম আর সুন্দরলাল যৌথ প্রচেষ্টায় চাউল, চাপাটি, ডাল আর একটা সবৃজি বানাল। ফরেস্ট রেস্ট হাউসে এই খাবার যোগাড় করাই এক মুশকিল ব্যাপার।

খাবার পাট চুকলে চৌকিদার তার ডেরায় চলে যেতেই বাধল আসল ঝঞ্ঝাট। সুজয় তার স্লিপিং ব্যাগটা খুলে নিয়ে বসল গিয়ে ইজিচেয়ারে।

অমনি চেঁচিয়ে উঠল নীলম, আমার জায়গাটা দয়া করে অকুপাই করবেন না। আপনি ঐ ঢালা বিছানায় শুয়ে পড়ুন।

সুজয় আরামের ভঙ্গিতে ইজিচেয়ারের মাথায় হাত দুটো তুলে দিয়ে বলল, দোহাই আপনার, আর ঠাঁই নাড়া করবেন না। দারুণ আরামের জায়গা পেয়ে গেছি।

নীলম অনুনয়ের সুর গলায় ঢেলে বলল, আমি অনেকক্ষণ থেকে ওটায় শোব বলে তাক করে রয়েছি, আমাকে জায়গাটা ছেড়ে দিন, প্লিজ।

দুজনেই দুজনকে শোবার জন্যে ভাল জায়গাটা ছেড়ে দিতে চায়। কিন্তু উপভোগ্য একটা অভিনয় চলল কিছুক্ষণ।

শেষে সুজয়কে মুখের কথায় কোন রকমে ওঠাতে না পেরে হাত ধরে টানাটানি জুড়ে দিল মেয়েটা।

সুজয় নীলমের কাছে হেরে গিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বলল, খাটে যেতে পারি একটা শর্তে।

নীলম কথাটা শোনার জন্যে সুজয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল দেখে সুজয় বলল, আমার এই স্লিপিং ব্যাগটা আপনাকে নিতে হবে তাহলে।

নীলম বলল, আমি ব্যাগটা নিয়ে নিই আর আপনি সারারাত পাহাড়ী শীতে হি হি করুন আর কি !

কিছু হবে না আমার। আমি তো আরাম করে খাটের ওপর শুয়ে থাকব। দরকারটা হবে আপনারই।

নীলম বলল, ব্যাগের ভেতর ঢুকে গেলে মনে হবে, আমি যেন কোথায় হারিয়ে গেছি, আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তাই তো বলছিলাম, যার যেথা স্থান। ব্যাগটা আমাকে দিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মত চুপচাপ শুয়ে পড়ুন গিয়ে বিছানার ওপর।

শেষে ঠিক হল, স্লিপিং ব্যাগের ভেতর ঢুকবে নীলম। সে ইজিচেয়ারেই শোবে।

সুজয় বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে বলল, আপনি ব্যাগটায় ঢুকুন, আমি সুইচ অফ করছি।

নীলম মাথা নেড়ে বলল, করুন।

সুজয় আলো নিভিয়ে দিল। কিছুক্ষণ একটানা খসমস একটা শব্দ উঠল, তারপর সব চুপচাপ।

সুজয় শুয়ে শুয়ে ভাবছে, সারাদিনের আশ্চর্য সব ঘটনার কথা, এমন সময় একটা খসখস শব্দ মনে হল তার খাটের দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে খাটের ওপর কে যেন আছাড় খেয়ে পড়ল।

বেডসুইচটা জ্বেলে দিতেই দেখা গেল নীলম এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তার খাটের একপাশে। হাতে ধরা গরম একখানা চাদর। স্লিপিং ব্যাগের ভেতর আধখানা দেহ ঢোকানো।

কি হল ?—সুজয় তাড়াতাড়ি উঠে বসে প্রশ্ন করতেই নীলম হেসে কুটিপাটি।

বলল, ধরা পড়ে গেলাম। চুপি চুপি এসে চাদরখানা দিয়ে যাব ভেবেছিলাম কিন্তু ব্যালেন্স রাখতে পারলাম না।

সুজয় হেসে বলল, তাই মহাপুরুষবা বলেন, গোপনে কোন কাজ করতে নেই।

নীলম বলল, এসব স্লিপিং ব্যাগ-ট্যাগের ভেতরে ঢোকার অভ্যেস নেই। আমাকে মুক্তি দিন এর থেকে। বিশ্বাস করুন, শীত আমাকে একটুও কাবু করতে পারবে না। বরং আমার গরম চাদরখানা ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, ওতেই আমি ঘেমে নেয়ে উঠব।

নীলম সুজয়ের কোন কথাই আর শুনতে চাইল না। সে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর থেকে নিজেকে টেনে বার করল। নীলমের গায়ে তখন সোয়েটার ছিল না, শুধু বুকে জড়ানো একখানা চোলি আর কম্বলের দোরি নিম্নাঙ্গে।

নীলম ইজিচেয়ারে শুয়ে আরামে একটা আওয়াজ তুলল। তারপর আলো নিভল, চরাচর চুপচাপ।

ভেন্টিলেটারের ভেতর দিয়ে প্রথম ভোরের আবছা আলো এসে পড়তেই ঘুম ভেঙে সুজয় উঠে বসল বিছানায়। সামনে চেয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। ম্যাজিক নাকি, ইজিচেয়ারখানাও হাওয়া। মেয়েটির কোন চিহ্নই ঘরে দেখা গেল না।

হাতমুখ ধুয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সুজয়। ইজিচেয়ারটা বারান্দার একপাশে পড়ে আছে, মানুষজন নেই। ঘরের ভেতরের চেয়ারখানা নিঃশব্দে বাইরে কখন বের করে নিয়ে গেল মেয়েটি, তার সামান্যতম আঁচও পায়নি সুজয়।

সে বাইরে পায়চারি করছে, এমন সময় দুটো বড় বড় রিঠে গাছের ফাঁকে উঁকি দিতে দেখা গেল নীলমকে।

সুজয় তার দিকে তাকাতেই নীলম এগিয়ে এসে বলল, রেঞ্জ অফিসার কাল অনেক রাতে এসেছেন। আমি দূর থেকেই গাড়ির আওয়াজ পেয়েছিলাম। শেষ রাতটা আরামেই কাটিয়েছি এক নম্বর বাংলোতে।

সুজয় বুঝল, রেঞ্জার ভদ্রলোকটির গাড়ির আওয়াজ শুনে নীলম তাড়াতাড়ি চেয়ারখানা বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে তারই ওপর শুয়েছে। তারপর আত্মীয় ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। চলে গেছে এক নম্বর বাংলোয় আরামদায়ক শয্যায়।

কেন জানি না সেই মুহূর্তে সুজয়ের বুকে অদ্ভুত এক ধরনের প্রচ্ছন্ন ব্যথার ঢেউ উঠেছিল। কে এই রেঞ্জার, কি ধরনের সম্পর্কে ভদ্রলোক নীলমের সঙ্গে জড়িত, কতখানি বয়স তাঁর, দেখতেই বা কেমন। এই সব অবান্তর প্রশ্ন মনে ভিড় করে আসছিল সুজয়ের।

সাধ্যমত নিজের মনোভাবটুকু গোপন করে রেখে সুজয় বলল, একটুও টের পাইনি আমি। ঘুমিয়েছি নিঃসাড়ে। আপনার অন্তত রাতের বিশ্রামটা সুখের হয়েছে জেনে খুশি হলাম।

নীলম ওদিক দিয়ে আর গেল না। বলল, অনেক রাত অবধি আমাদের প্ল্যান হয়েছে। আজ দুপুর নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়তে পারব।

সুজয় বলল, ঐ চেক পোস্ট পার হয়েই কি আমাদের যেতে হবে?

তাছাড়া দ্বিতীয় রাস্তা নেই।

ধরা পড়লে হাজতবাস, কি বলুন?

নীলম বলল, সবকিছুর জন্যে তৈরি থাকতে হবে। ভয় পেলে এখনও রামপুরের উল্টো বাসে চড়ার সুযোগ আছে।

আমি সামনে এগিয়ে যাবার জন্যে তৈরি। কোন রকম অঘটনের পরোয়া করি না। কিন্তু আমার জন্যে আপনারা বিপদ ডেকে আনবেন, এটা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে।

বলেছি তো, নীলম বলল, এটা আমার একটা চ্যালেঞ্জ নেওয়া।

সুজয় চুপ করে রইল। নীলম বলল, আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না, তাহলে ওরা তন্ন তন্ন করে গাড়ি তল্লাশি করবে।

তাহলে?

নীলম বলল, আপনি যাবেন রেঞ্জ অফিসারের জিপে। একটু কষ্ট করে ডজন কয়েক চারাগাছের ভেতর খানিক সময় আত্মগোপন করে থাকতে হবে।

আর আপনি?

নীলম বলল, তাপ্‌রির অগে অথবা তাপ্‌রিতে দেখা হয়ে যাবে আপনার সঙ্গে। তাপ্‌রিতে পি. ডব্লিউ. ডি. ডাকবাংলোতে অপেক্ষা করতে হবে। যিনি আগে যাবেন তিনিই অপেক্ষা করবেন।

রেঞ্জার সাহেব চমৎকার মানুষ। বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়। কথায় কথায় সরস মন্তব্য। নীলমের সঙ্গে একটা কি যেন রসিকতার সম্পর্ক ওঁর। নীলমের সঙ্গে সুজয়কে জড়িয়ে রসিকতা করতে ছাড়লেন না।

সুজয় লজ্জা পাচ্ছিল দেখে ভদ্রলোক বললেন, লজ্জা একমাত্র নারীরই ভূষণ, পুরুষের নয়।

নীলম বলল, তা হলে পুরুষকে কি আপনি নির্লজ্জ হতে বলেন?

ভদ্রলোক হা হা করে হেসে উঠে বললেন, অসংকোচ আক্রমণেই পুরুষের পৌরুষ আর শোভা। লজ্জায় নয়।

বলেই দুটো বলিষ্ঠ হাতে নীলমকে জড়িয়ে ধরলেন। সুজয়ের সামনে তিনি এমন আচরণ করলেন, যেন কেউ কোথাও নেই।

নীলম বলল, আপনার বজ্জাতির জ্বালায় গেলাম। কি ভাবছেন বলুন তো এই অপরিচিত ভদ্রলোকটি।

রেঞ্জার বললেন, উনি শিক্ষানবিসি করছেন। নারীকে কিভাবে বলের দ্বারা বশীভূত করতে হয় তাই দেখে উৎসাহিত হচ্ছেন।

নীলম বলল, বলের দ্বারা না হাতি। অতর্কিতে আক্রমণ করাকে বল বলে না।

রেঞ্জার সাহেব নীলমকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, এসো তাহলে, সামনা-সামনি এক হাত লড়াই হয়ে যাক।

নীলম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হেরে গেছি।

রেঞ্জার বললেন, এত সহজে হারার পাত্রী তো তুমি নও। নীলম।

নীলম বলল, আপনার সঙ্গে যুদ্ধে নেমে ভদ্রলোকের কাছে আর এক দফা অপ্রস্তুত হই আর কি।

খাওয়া-দাওয়া চুকলে গাড়ি করে রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে বেরিয়ে গেল নীলম।

যাবার সময় সুজয়ের দিকে চেয়ে হাত তুলে মিষ্টি করে হাসল।

এখন সুজয় গাড়ি ফিরে আসা অবধি অপেক্ষা করবে ফরেস্ট বাংলোতে। তারপর আবার সে যাবে রেঞ্জার সাহেবের জিপে বৃক্ষশিশুদের ভেতর আত্মগোপন করে।

একসময় জিপ এল। চৌকিদার সুন্দরলাল তৈরি গাছগুলোকে কাঠের চৌকো টবে বসিয়ে একটি একটি করে জিপে তুলতে লাগল। পাশে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিতে লাগলেন রেঞ্জ অফিসার।

কিছুটা বোঝাই হয়ে গেলে রেঞ্জার সাহেব বললেন, এবার কিছু সময়ের জন্য আপনাকে বনবাসে যেতে হবে মিঃ সেন।

সুজয় হাসিমুখে উঠে পড়ল। অমনি আরও কতকগুলো বাক্স সাজানো হল তার সামনে। এখন চারদিকে অরণ্য আবৃত সুজয়।

জিপে উঠে স্টিয়ারিং ধরলেন রেঞ্জার সাহেব। জিপ পাহাড়ী পথে গড়িয়ে চলল। রেঞ্জ অফিসারের মুখে এখন আর কোন কথা নেই।

কিছু পরেই সংকীর্ণ পথ ছেড়ে গাড়ি এসে পড়ল প্রধান সড়কে। তারপর ছুটে চলল তাপ্‌রির দিকে।

এক সময় গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে গেল চেকপোস্টের কাছে।

রেঞ্জার সাহেব গাড়িতে বসে কাকে যেন ডাক দিলেন। একটি অফিসার গাড়ির কাছে এগিয়ে এল। রেঞ্জার একটা গোলাপের চারা টব সমেত তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এতদিনে ঋণমুক্ত হলাম। কেমন ফুল ফুটল জানাবেন।

বাইরে থেকে কৃতজ্ঞতাসূচক আওয়াজ আসতে লাগল।

রেঞ্জার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললেন, চলি তাহলে।

বলেই তিনি গাড়িখানা চেকপোস্ট থেকে বের করে নিয়ে সামনে এগিয়ে চললেন।

ইতিমধ্যেই কিন্তু চেকপোস্ট থেকে একটি পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছিল জীপের পেছনে। সুজয় তাকে

দেখতে পেলেও অরণ্যের আড়ালে আত্মগোপনকারীকে সে দেখতে পায়নি। তারপর অফিসারটি এসে রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে সে গুমটির ভেতরে সরে গেছে।

নীলমের দেখা পাওয়া গেল কিছু পথ এগিয়ে। একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হাত তুলে চেঁচাতে লাগল। তার কাছে গিয়ে জিপ থামিয়ে লাফ দিয়ে নামলেন রেঞ্জার সাহেব।

আর্ত গলায় বললেন, হেরে গেলে নীলম, একেবারে হার। ইন্সপেক্টর সুদ ছিলেন ভাগিস, নাহলে আমার বিরুদ্ধেও অ্যাকশন নেওয়া হত।

নীলম কান্নামাখা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, কি হল তাঁর।

রেঞ্জার বললেন, অনেক অনুনয় করলাম দুজনে মিলে, কিন্তু ছাড়া পেলেন না ভদ্রলোক।

নীলম বলল, আমি এখুনি যাব সেখানে।

রেঞ্জার সাহেব অমনি বলে উঠলেন, পাগলের মত কি যা তা বলছ। তুমি যাবে ওঁর হয়ে ওকালতি করতে ? আমি গভর্নমেন্টের লোক হয়ে পারলাম না, আর তুমি পারবে?

দেখব চেষ্টা করে, নীলম বলল, আমার জন্যেই ভদ্রলোক এই বিপদে পড়লেন। আপনি একটুখানি আমাকে চেকপোস্টের দিকে এগিয়ে দিন। একমিনিটও আর দেরী করবেন না, দোহাই আপনার।

শেষের দিকে গলাটা রুদ্ধ হয়ে এল উদগত কান্নায়।

সুজয়ের ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, তবু সে চুপচাপ গাছের আড়ালে বসে রইল।

গাড়িতে উঠল নীলম। রেঞ্জার বললেন, মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে ভালবেসে ফেলেছ।

নীলম দুহাতে মুখ ঢেকে এবার সত্যিই ফোঁপাতে লাগল।

রেঞ্জার গাড়িতে উঠে বললেন, একদিনের পরিচয়ে এত ভালবেসে ফেললে। পথে এমনি কত মানুষের সঙ্গেই তো পরিচয় হয়। তাবলে এত বড় বিপদের ঝুঁকি কেউ কি কারো জন্যে নেয়?

একটু থেমে আবার বললেন, তুমি তোমার সাধ্যের বাইরে করেছ নীলম।

অমনি নীলম রেঞ্জার সাহেবের কথা শেষ হতে না হতেই বলল, আমার শেষ চেষ্টায় বাধা দেবেন না দয়া করে। আমি অফিসার-ইন-চার্জের হাতে পায়ে ধরব দরকার হলে। বলব, শুধু মানুষটিকে ফিরে যেতে দিন তাঁর নিজের দেশে।

রেঞ্জার বললেন, তুমি না পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম. এ. পাস করেছ, গভর্নমেন্ট স্কুলের মিস্ট্রেস, তুমি যাবে অফিসারের হাতে-পায়ে ধরতে, আশ্চর্য!

নীলম বলল, দোহাই আপনার, আমাকে ওসব আর মনে করিয়ে দেবেন না, আমার মাথায় এখন আর কিছু নেই।

হঠাৎ রেঞ্জার সাহেব বলে উঠলেন, মাথায় কিছু না থাক, বুকের ভেতর নিশ্চয়ই আছে। সেখানে এক ভিনদেশী বহাল তবিয়তে বাসা বেঁধেছে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে চললেন রেঞ্জার।

নীলম করুণ গলায় বলল, কোথায় চললেন? গাড়ি ফেরান।

রেঞ্জার সাহেব ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে বললেন, বিশ্বাস কর নীলম, তোমার বন্ধুটিকে বিপদমুক্ত করে তবে এসেছি তোমার কাছে।

নীলম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, সত্যি?

রেঞ্জার বললেন, আমার কথায় আস্থা রাখতে পার, তাঁর বিপদ কেটে গেছে।

নীলম বলল, তিনি কি ফিরে গেছেন রামপুর বুশেয়ারের পথে?

রেঞ্জার বললেন, ফিরে গেলে খুশি হবে না তুমি? এত বড় একটা ফাঁড়া কেটে গেছে বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবে না?

নীলম বলল, খুশি হয়েছি কিনা বলতে পারব না, তবে তাঁর মুক্তির জন্য ঈশ্বরকে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানাব।

রেঞ্জার বললেন, ভদ্রলোক কিন্তু ছাড়া পেয়ে তোমার কথাই আমাকে বলেছিলেন। তোমার চেষ্টা সফল হল না বলে তিনি তোমাকে দুঃখ করতে বারণ করে গেছেন। আর একটা কথাও সেই সঙ্গে তিনি

বলেছেন, তোমাকে কোনদিনও তিনি ভুলতে পারবেন না।

নীলম কিছুক্ষণ চুপচাপ কি যেন ভাবল। তারপর একসময় বলল, আপনি আমাকে এইখানে নামিয়ে দিন, এখুনি তাপ্‌রি থেকে সিমলার বাস এসে পড়বে, আমি ঐ বাসে রামপুর চলে যাব। তাঁর সঙ্গে আজই আমার দেখা হতে পারে। হয় উনি রামপুরে আজ রাত কাটিয়ে ভোরের বাস ধরে সিমলা যাবেন, নয়তো এই তাপ্‌রি-সিমলার বাসটাই ধরবেন। আমি এই বাসে গেলে রামপুরে অথবা পথে ওঁকে নির্ঘাৎ পেয়ে যাব।

রেঞ্জার সাহেব বললেন, এত কষ্ট করে ভদ্রলোকের কাছে যাবার কারণটা জানতে পারি কি?

নীলম বলল, ক্ষমা চেয়ে নেব। আমার খেয়ালের খেলায় ওঁর যে মেহনৎ হল, সেজন্যে ক্ষমা চাইব। নাহলে শান্তি পাব না।

রেঞ্জার বললেন, শুধু ক্ষমা ভিক্ষা করতে যাবে, আর কোন ভিক্ষা নেই? সত্যি করে বল, আমার কাছে কিছু লুকিও না।

আবার নীরবতা, আবার ফোঁপানির শব্দ। নীলম কোন কথা বলতে পারল না।

রেঞ্জার বললেন, তোমাকে যদি তাঁর কাছে পৌঁছে দি তাহলে তুমি আমাকে কি পুরস্কার দেবে?

কান্না থেমে গেছে নীলমের। হাসি হাসি মুখ করে বলল, যা চাইবেন।

রেঞ্জার বললেন, চাইবার কি শেষ আছে? জান তো মানুষ বড় লোভী। তাই সবকিছু উজাড় করে দেবার প্রতিশ্রুতি কাউকে দিতে নেই, বলতে হয় সাধ্যমত দেব।

নীলম বলল, আমি যে কথা একবার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করি তা কখনো ফিরিয়ে নিই না।

রেঞ্জার বললেন, বেশ, এতই যখন তোমার অহঙ্কার তখন চাইব। তোমার সবটুকু ভালবাসা নিঃশেষে উজাড় করে দাও আমাকে। আমি ইচ্ছে মত বিলিয়ে দেব কাউকে। অবশ্য কারু যদি প্রয়োজন থাকে সে ভালবাসায়।

একটু থেমেই পেছন ফিরে বললেন, কি মশায়, এই সুন্দরী, শিক্ষিতা, বিদেশিনী তরুণীটির ভালবাসায় প্রয়োজন আছে আপনার? অবশ্য জোর করে দান করতে চাই না। ভেবে দেখুন। কিন্নরের সেরা আপেল।

সুজয় মাথা নাড়া দিয়ে জিপ থেকে নেমে এসে সামনে দাঁড়াল। ততক্ষণে মার শুরু হয়ে গেছে। রেঞ্জার ভদ্রলোকের বুকে মুখ লুকিয়ে নীলম তাঁর পিঠে কীল মেরে চলেছে।

ভদ্রলোক সকাতরে বলছেন, দেখুন তো মশাই, পরোপকার করার কি বিপদ।

অন্ধকার ঘরে বসে এসব স্মৃতির জোনাকীদের নিয়ে খেলা করছিল সুজয়। উখাং উৎসবের শেষে বিজয়ীর উত্তেজনা ছিল না তার মনে, একটা দুশ্চিন্তা আর অবসাদ তাকে অক্টোপাশের নিষ্পেষণে অবসন্ন করে ফেলেছিল।

রাত তখন কত, অনুমানের উপায় ছিল। এ কোঠিতে বিজলী বাতি নেই। মোমবাতি জ্বালিয়ে কাজ চালায় সুজয়। পথের ধারে একটা মুদির দোকানের সঙ্গে সামান্য খরচে প্রাণধারণের মত একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছে সে।

বিছানায় শরীরটা ঢেলে দেবার আগে উখাং উৎসব থেকে নিয়ে আসা ম্যাগনোলিয়া ফুলটাকে ঠোঁটে ছুঁইয়ে স্পর্শ করল সে। জলের মধ্যে যত্ন করে সুজয় রেখে দিয়েছে ফুলটিকে। এই দুর্লভ ফুল সে উপহার দেবে তাকে, যে উখাং উৎসবে বিজয়ীর সম্মান লাভের পথ দেখিয়েছে। কিন্তু সে কোথায়? সারা সাংলা উপত্যকার বাতাসে বিষণ্ণতার ঢেউ তুলে সে হারিয়ে গেল কোথায়? নীলম চিরদিনই খেয়ালী। তার চলাফেরায় বিধি-নিষেধ আরোপ করার মত ব্যক্তি কেউ নেই কামরু গ্রামে। সে স্বাধীন, সে স্বেচ্ছাবিহারিণী।

ক্লান্তির ঘুম নেমেছিল সুজয়ের চোখে, কে যেন তাকে স্পর্শ করে জাগিয়ে দিল।

কে, কে? সুজয় উঠে বসল।

চুপ্, আমি আমি।

নীলম?

বিছানার ওপর উঠে বসে নীলমকে জড়িয়ে ধরল সুজয়।

তুমি কোথায় ছিলে নীলম? সারা উখাং উৎসব আমার অন্ধকার হয়ে গেল। বিশ্বাস কর, তোমার এই হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ায় আমি দারুণ আঘাত পেয়েছি।

নীলম বসল না, দাঁড়িয়েই রইল। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা গলার শব্দ তুলে বলল, বড় ক্লান্ত সুজয়। আমি স্নান করে ঘুমুব।

সুজয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, স্নানের ঘরে জল তোলা আছে, কিন্তু গরম করার ব্যবস্থা তো নেই।

দরকার নেই, ক্লান্ত গলায় বলল নীলম, আমার গায়ের ভেতরটা একেবারে জ্বলে যাচ্ছে, সারা ধৌলাধারের বরফগলা জলেও আমার সে জ্বালা জুড়োবে না।

সুজয় অনুভব করল, অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে। সে বাতি জ্বালাতে যাচ্ছিল কিন্তু নীলম তাকে বাধা দিয়ে বলল, একটুও আলো না। আমি অন্ধকারেই স্নান করব।

একটু থেমে বলল, আমার সারা শরীর বড় নোংরা হয়ে আছে, তুমি আমাকে ছুঁয়েছ। আগে তুমি স্নানের ঘরে গিয়ে শুদ্ধ হয়ে এস।

সুজয় বলল, ওতে আমার কিচ্ছু হবে না।

নীলম অধীর গলায় বলল, বড় ক্লান্ত সুজয়, আমাকে বেশী কথা বলিও না। লক্ষ্মীটি, যা বলি শোন।

সুজয় অগত্যা স্নানের ঘর থেকে হাত মুখ ধুয়ে এল। নীলমের ইচ্ছে মত পোশাক পরিবর্তন করল। তারপর খাটের ওপর বসে ভাবতে লাগল নীলমের কথা।

নীলম স্নানের ঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ ধরে কনকনে ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢালতে লাগল। প্রচণ্ড শীতে ঐ বরফ জলগুলো নীলম গায়ে ঢালছে, আর ঘরের ভেতর বসে সেই জল ছড়িয়ে পড়ার শব্দে সুজয় কেঁপে কেঁপে উঠছে।

কতক্ষণ পরে নীলম বলল, তোমার একখানা সুতান আর ছুব্বা আমাকে দাও। অন্ধকারে সুজয় তাকে এগিয়ে দিল।

নীলম কিছু পরে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, দাও তোমার দেশলাইটা।

তাই দিল সুজয়। দরজা খুলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল নীলম।

কিছুক্ষণের ভেতরে বাইরে কাপড় পোড়ার একটা গন্ধ পাওয়া গেল। সুজয় মুখ বাড়িয়ে দেখল, কতকগুলো পোশাক দাউ দাউ করে জ্বলছে। নীলম দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে। তার ছায়াটা অদ্ভুতভাবে কাঁপছে। অশরীরী কোন আত্মার মত মনে হচ্ছে নীলমকে।

কতক্ষণ পরে এক বোঝা পোশাক পুড়িয়ে আগুনটা নিভল। নীলম ঘরে ঢুকে বালতিতে জল ভরে নিয়ে গিয়ে সেই ছাইয়ের স্তূপে হুড় হুড় করে ঢেলে দিল।

ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সুজয়ের খাটের পাশে এসে দাঁড়াল।

সুজয় তার এইসব অদ্ভুত অনুষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করল না। শুধু বলল, মনে হচ্ছে তুমি বড় ক্লান্ত, এসো, একটু ঘুমিয়ে নাও।

নীলমের হাত ধরে টানতেই সে সুজয়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

সুজয় যত সান্ত্বনা দেয়, কান্না তত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

ঐ কান্না ভাঙা গলায় নীলমকে বার বার বলতে শোনা গেল, আমি অপবিত্র হয়ে গেছি সুজয়, আমি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছি।

সুজয় কিছু না বুঝেই বলল, কিছু হয়নি তোমার। এমন করে মিথ্যে ভেঙে পোড় না। কেউ কাউকে নষ্ট করতে পারে না কখনো। নিজে ছাড়া নিজেকে নষ্ট করার সাধ্য আর কারো নেই। তুমি শান্ত হও।

সুজয় নীলমের মাথাটা বুকে চেপে ধরে তার ভেজা চুলের ভেতর হাত বুলোতে লাগল। সুজয়ের কোল আর বুক জুড়ে নীলমের তরুণী দেহটা কিসের এক সান্ত্বনাহীন শোকে থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

নীলম বলে চলল, উখাং-এর ফুল তোলার ব্যাপারে তোমাকে পাহাড়ে তুলে দিয়ে আমি নেমে

এলাম। বাম্পার তীরে এসে ছাম পার হতে গিয়ে দেখলাম ওপারে আবছা আলো-আঁধারিতে একখানা জিপ দাঁড়িয়ে। প্রথমে ভাবলাম, এত ভোরে জিপ! এখানে তো বড় একটা জিপ আসে না। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম। ছামের ওপর এক পা আর নীচে এক পা, —আমি ভাবছি তো ভাবছিই। পাশে এসে দাঁড়াল একটা লোক! আমি ভীষণ রকম চমকে উঠলাম। লোকটাকে তো এপারে দেখিনি। ছামের তলায় লুকিয়েছিল নাকি!

লোকটা কিন্তু বিনয়ের একটা নমস্কার ঠুকে বলল, আপনাকে বিদ্যাসিংজী একখানা চিঠি দিয়েছেন।

মুহূর্তে আমার কি যেন হয়ে গেল। বললাম, ভাল আছেন তিনি? আঃ বাঁচলাম। সেই ভূমিকম্পের পর পথ ভেঙে যাওয়ায় সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমি তাঁর কোন খোঁজই পাচ্ছিলাম না। কই, চিঠি কই?

লোকটা আমার হাতে চিঠি দিল, কিন্তু এত অল্প আলোয় চিঠি পড়া সম্ভব হল না।

বললাম, কোথায় আছেন এখন তিনি?

লোকটি বলল, রুগাং ফরেস্ট বাংলোতে। হাঁটাচলার ক্ষমতা হারিয়েছেন। ভূমিকম্পে পায়ের ওপর পাথর গড়িয়ে পড়ে দুটো পা-ই প্রায় থেঁতলে গেছে। মেডিক্যাল হেল্প কিছু পেলেও পথ খারাপের জন্যে বড় কোন হসপিটালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

দারুণ ধাক্কা খেয়ে বললাম, তাঁর স্ত্রী কাছে আছেন তো?

লোকটি বলল, আমি ছাড়া ওঁর পাশে বলতে এখন আর কেউ নেই। স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে কল্পাতে রয়েছেন। তাঁরাও যে কে কেমন আছেন কেউ জানে না। আমি অনেক কষ্টে আপনার খোঁজ করে এখানে এসেছি। পথ বড় দুর্গম। রাতে এসে এপারে ফরেস্ট বাংলোতে ছিলাম। বাংলোর চৌকিদার বলল, আপনাকে সে পাহাড়ে উঠতে দেখেছে। সে ঐ ছামের কাছে সিপ্ ব্রিডিং সেন্টারে রাত কাটিয়েছে। উখাং-এর ফুল তুলতে যাবে বলে উঠেছে অনেক রাতে।

আমার তখন কথা বলার মত অবস্থা নয়। বললাম, আপনি কি জিপ নিয়ে এখুনি ফিরছেন?

লোকটি বলল, কাল সন্ধ্যার মুখে এসে পড়েছি, তাই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। যদি আপনার দেখা পেতাম তাহলে যত দুর্গম হোক কাল রাতেই সাহেবের কাছে ফিরে যেতাম। একা পড়ে রয়েছেন তিনি।

কি যে ঢুকল আমার মাথায়, আমি লোকটাকে বললাম, চলুন, আমিও যাব আপনার বাড়িতে।

তুমি বুঝতে পারছ সুজয়, বিদ্যাসিং ফরেস্ট অফিসার আমার পিসতুতো দিদির স্বামী। তাঁরই চেষ্টায় তুমি চেকপোস্ট অফিসারের চোখে ধুলো দিয়ে চলে এসেছিলে।

তারপর শোন, আমি অপরিচিত লোকটির জিপে কিছু না ভেবেই উঠে বসলাম। সাত আট ঘণ্টা জিপ চালিয়ে লোকটা পুরনো তিব্বত-হিন্দুস্থান রোডের পাশে একটা জঙ্গলে ঢুকল। চারদিকে কোন জনবসতি নেই। জঙ্গলের ভেতর কিছু পথ গিয়ে দেখা গেল একটা বিধ্বস্ত ডাকবাংলো। জিপ থামলে আমি লাফ দিয়ে নেমে দৌড়ে ঢুকে গেলাম ঐ পোড়ো বাড়ির ভেতর।

না, আমার ভগ্নীপতি সেখানে ছিলেন না। তার জায়গায় দেখলাম, অনন্তরাম নেগীকে।

একটা চারপায়ার ওপর বসে আমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে।

সুজয় তুমি জান এই লোকটাকে। আমার সম্বন্ধে তোমাকে বহুদিন নানারকমের কথা জিজ্ঞেস করে উত্যক্ত করেছে। এই সাংলা তহশীলের সবচেয়ে বড় ক্লথ মার্চেন্ট এই লোকটা। ভেতরে ভেতরে তেজারতি কারবারও করে। মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়ানোর রোগ আছে।

আমি যখন স্কুলের ওপর ক্লাসের ছাত্রী তখন ও আমাকে একবার কৌশলে প্রপোজও করেছিল। আমি হেসে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। বাড়িতে বলিনি। গ্রামের কোন লোককে তো নয়ই। আর তা ছাড়া তুমি জান, আমার বাবা ছিলেন বিলাসপুরের ডি-সি। তিনি মারা যাবার পর আমিই সংসারে বড়। অবশ্য মা থাকলেও তিনি চিরদিনই শান্ত প্রকৃতির। পুজো-আর্চা নিয়ে থাকেন। ছেলেবেলা থেকেই প্রায় আমি ছেলেদের মত সব কাজকর্ম করতাম। আজও তাই আমাকেই সংসারের হাল ধরতে হয়। আমি কখন কোথায় থাকি কি করি, সে কৈফিয়ত কাউকেই দিতে হয় না আমাকে।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। ঐ অনন্তরাম নেগীকে আমার সামনে দেখে আমি মুহূর্তে ব্যাপারটা আঁচ করে নিলাম। বিরাট এক জালে বন্দী হয়ে গেছি, পালাবার পথ নেই। মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। একমুখ হাসি ছড়িয়ে বললাম, হিম্মত আছে আপনার লালাজী। আর এমনি মরদকেই আমি ভালবাসি। যোগাযোগ করে একটা ভোঁতা বুদ্ধির লোকের সঙ্গে বিয়ে হল, সংসার করলাম, সে আমার পছন্দ নয় আদপেই। এমনি একটা অদ্ভুত বন্য জায়গায় একটা শেরের সঙ্গে খেলা করলাম, এর চেয়ে বড় থ্রীল জীবনের আর কোথায় পাওয়া যাবে?

লোকটার মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেল। সে ভেবেছিল, আমি ভয়ে আধমরা হয়ে যাব, কান্নাকাটি করে ওর পায়ে গড়িয়ে পড়ব, কিন্তু তার কিছুই হল না দেখে ও কেমন যেন হতবাক্ হয়ে গেল।

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে খাটের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস।

আমি বিনা দ্বিধায় খাটের এক কোনায় বসে পড়ে বললাম, কি চালাকিটাই না করলেন লালাজী। এখন আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, রেঞ্জার বিদ্যাসিংয়ের নামে চিঠি দিলেন কেন?

অনন্তরাম বলল, যাওয়া-আসার পথে বিদ্যাসিংজীর সঙ্গে আমার বহুবার দেখা হয়েছে। আমি সাংলায় থাকি জেনে ভদ্রলোক তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন। তুমি যে তাঁকে কি পরিমাণ ভক্তি কর আর ভালবাস তাও তিনি বলেছেন। তোমার ঐ বাঙালী বন্ধুটির পুলিসের চোখে ধূলি দিয়ে চোরের মত ঢুকে পড়ার খবর তাঁর মুখ থেকেই শুনেছি। তিনি অবশ্য আমাকে বন্ধুর মত ভেবে নিয়ে সব কথা বলেছেন। তোমার ঐ পেয়ারের বন্ধুটিকে যাতে ফিরে যাবার সময় সাহায্য করতে পারি, সেজন্যে অনুরোধও জানিয়ে রেখেছেন। পুলিশের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, কথাটা উঠতেই উনি আমাকে চেকপোস্ট পার করে দেবার ব্যাপারে তোমার ঐ বন্ধুটিকে সাহায্য করতে বলেছিলেন। এইসব দেখে-শুনে ওঁর নামেই চিঠিটা লিখে পাঠাই।

বললাম, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের প্যাডটা যোগাড় করলেন কি করে?

লালা অনন্তরাম বিরাট বিরাট দাঁতগুলো বের করে হাসল।

হাসি থামলে বলল, এই ফরেস্ট বাংলো থেকেই যোগাড় হয়েছে।

বললাম, বাংলোর রেঞ্জ অফিসার বিদ্যাসিংজী এখন কোথায়?

অনন্তরাম ওপর দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, আর্থকোয়েকের বলি হয়ে গেছে বেচারা।

কথাটা শুনেই আর স্থির থাকতে পারলাম না, কান্নায় ভেঙে পড়লাম। তখন আমার মনের ভাব গোপন করে অভিনয় করার মত অবস্থা ছিল না।

লোকটা সেই সুযোগে আমাকে সান্ত্বনা দেবার ছলে বুকে জড়িয়ে ধরল।

আমার কান্না থেমে গেল। সারা শরীরটা শিউরে উঠল। আমি কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলাম সুজয়।

একসময় উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, লালাজী আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দিন। অনেক পথ পেরিয়ে আসতে হয়েছে, তাও আবার ভাঙা পথের ওপর দিয়ে।

হেসে বললাম, খাবারের ব্যবস্থা কিছু রেখেছেন কি এখানে?

নিশ্চয়, নিশ্চয়—লালা ব্যস্ত হয়ে উঠতেই বললাম, আমার জন্যে বলছি না, সবাইকে তো খেতে দিতে হবে, আর এরপর থেকে রান্নার ভার তো রইবে আমারই ওপর।

লালার মুখ থেকে যেন নাল গড়িয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নিশ্চয়, নিশ্চয়, তোমার সংসার তুমি দেখে নাও। আমি জানতাম, তুমি মনে মনে আমাকে ভালবাস। স্কুলে যাবার সময় আমার দোকানের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে, আমি তখনই ভাবতাম, তোমার ভালবাসা একদিন আমি পাবই।

আমি ইঙ্গিতপূর্ণ একটা হাসি হেসে ঘরের ভেতরে চলে গেলাম। বুকের ভেতর কিন্তু অজস্র চিন্তার পাষাণভার। কি করে মুক্তি পাই। কি করে এই শয়তানটার হাতের মুঠি আলগা করে পালিয়ে যেতে পারি।

এক ঝলক বিদ্যুৎচমকের মত মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। লালাকে ভেতর থেকে ইশারায় ডাকলাম।

একটা জিভ ঝোলা লোভী কুকুরের মত লোকটা ছুটে এল আমার পাশে।

বললাম, ক'টি সাগরেদ আছে আপনার?

লালা বলল, সাগরেদ বলতে আমার ড্রাইভার।

বললাম, ব্যস, আর কেউ নেই?

লালা বলল, তোমার দরকার হলে সারভেন্ট আনিয়ে নিতে পারি।

বললাম, আমার কোন দরকার নেই। তবে একটা উপকার যদি কাউকে দিয়ে করাতে পারেন তাহলে বড় ভাল হয়।

লালা অমনি বলল, বল কি করতে হবে?

বললাম, কাছেপিঠে কোন ওষুধের দোকান আছে?

লালা বলল, ঠিক কাছে তো নেই, আছে কারছামে। যদি দরকার হয় তাহলে এখুনি ড্রাইভার পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে আজ তো বেচারা ফিরতে পারবে না, কাল সকাল সকাল ওষুধ পেয়ে যাবে।

একটা ওষুধের নাম লিখে দিলাম লালার কাছ থেকে কাগজ-কলম চেয়ে নিয়ে।

ড্রাইভার লোকটা কিছু খেয়ে নিয়ে হুকুম তামিল করার জন্যে বেরিয়ে গেল।

এখন ঐ পোড়ো বাড়ির ভেতর রইলাম আমি আর ঐ লালা।

লোকটা বার বার ভেতরে আসছে আর আমার দিকে লোলুপ চোখে চাইছে। যেন একটা মুহূর্তও সে আর বৃথা কাটাতে চাইছে না।

আমি টুকটাক বিকেলের রান্নার কাজগুলো সারার ভান করছি আর ওকে মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছি।

বেলা যখন পড়ে এল, পাশের বাগান থেকে একগুচ্ছ গোলাপ নিয়ে এলাম। আয়না চিরুনী ছিল, চুল বাঁধলাম। বিছানাটা তারই মধ্যে ঝেড়ে-ঝুড়ে ঠিকঠাক করলাম। টিপয়টা টেনে এনে একটা খালি মদের বোতলে ঐ ফুলগুলো সাজিয়ে তার ওপর বসিয়ে দিলাম।

মনে হল যেন আমি লোকটাকে হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছি। আমার এইসব কাজ সে দারুণ আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করছিল, আর ক্ষুধার্ত হায়েনার মত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজছিল। আমি ওর সামনে যেন একটা চঞ্চল হরিণের মত খেলা দেখাচ্ছিলাম।

লালা বলল, তোমাকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যেতাম নীলম।

আমি বললাম, আপনি একটা ভুল প্রথমেই করেছেন। আমাকে যদি ভালবাসতেন তাহলে আমার এত কাছে থেকে মতামতটা আগেই জেনে নিতে পারতেন। আপনি জানেন, আমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করি, আর আমি কারো ভালো বলা মন্দ বলার তোয়াক্কাই করি না। তাছাড়া আমি যদি কাউকে কোন কথা দিই তাহলে সব খুইয়েও তা রাখার চেষ্টা করি।

লালা বলল, এ কাজ আমি না বুঝে করেছি নীলম। মনে ভয় ছিল তোমাকে পাব না।

বললাম, তা বেশ করেছেন, এসব বোঝাপড়া পরে হবে। এখন একটা কথা জিজ্ঞেস করি, এ ঘরটা বসার ঘর, পথের দিকের জানালাটাও ভাঙা, রাতে কি এখানেই শোবেন, না ভেতরের ঘরখানায় বিছানা করব?

লালা বলল, ঠিক বলেছ, কিন্তু ভেতরে তো কোন খাট-বিছানা নেই।

হেসে বললাম, ধরাধরি করে এই খাটখানা দুজনে ভেতরে নিয়ে যেতে পারব না? কি রকম শক্তি আপনার তা পরীক্ষা হয়ে যাক।

লালা পৌরুষে আঘাত পেল। বলল, পারব না মানে, তোমাকে সুদ্দু খাটের ওপর বসিয়ে তুলে নিয়ে যেতে পারি।

বললাম, তার আর দরকার নেই, আসুন, দুজনেই ধরে নিয়ে যাই।

আমি আগেই দেখে রেখেছিলাম, ভেতরের ঘরখানার ভেন্টিলেটার ছাড়া কোন জানালা নেই।

লালা খাটের একদিক ধরে প্রথমে কসরৎ করতে করতে ঘরের ভেতর ঢুকতে লাগল। দরজা পেরিয়ে অনেক কষ্টে খাটখানাকে ঘরের ভেতর ঢোকানো হল। দরজার চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে তখন

আমি। লালা ভারী খাটখানাকে ধরে নুয়ে প্রাণপণ জোরে টানছে। কে যেন আমার কানে কানে বলল, এই সুযোগ, না হলে তোমাকে সর্বস্ব খোয়াতে হবে।

মুহূর্তে দরজা টেনে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা দরজার ওপর আছড়ে পড়ল। দমাদ্দম লাথি চালাতে লাগল। একটা ক্রুদ্ধ জানোয়ারের প্রবল গর্জন আমি শুনতে পেলাম। এক মুহূর্ত আর বিলম্ব নয়। ছুটতে লাগলাম হিন্দুস্থান-তিব্বত রোড ধরে। বোল্ডারে ক্ষতবিক্ষত হল আমার পা, তবু চলায় ছেদ পড়ল না।

তিনটে রাত আর দিন কি করে যে কাটিয়েছি তা তোমাকে বলতে পারব না সুজয়। জিপের শব্দ পেলেই লুকোতাম পাহাড়ের চাঁইয়ের আড়ালে, কখনো বা বনের ভেতর। এক সন্ধ্যায় জিপের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি লুকোবার জায়গা খুঁজতে গিয়ে পা পিছলে পড়লাম নদীর দিকে। কিন্তু বিধাতার কি দয়া, আটকে গেলাম একটা গাছের কাণ্ডে। ভয় ভাবনার বাইরে তখন আমি, তাই ভয়াবহ পরিণতির কথা না ভেবে স্বাভাবিক আত্মরক্ষার চেষ্টায় গাছের কাণ্ডটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম।

পথের ওপর আলো ফেলতে ফেলতে জিপটা চলে গেল।

তোমার কথা আমার মনে হত সুজয়। বাড়ির কথা বড় ভাবতাম না। কারণ আমার এখানে ওখানে যখন খুশি কিছু না বলে যাওয়া-আসাটাকে সকলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু আমি জানতাম তুমি উখাং মেলায় আমাকে দেখতে না পেলে অস্থির হবে। তোমার হাত থেকে গোপনে ফুল নেব বলে কত আশা ছিল। পথের কষ্টে আমার একটুও জল আসেনি চোখে, কিন্তু আমি তোমার হাত থেকে উৎসবের ফুল পেলাম না বলে পথ চলতে কান্নায় ভেঙে পড়েছি।

সুজয় গ্লাসের জলে রাখা ম্যাগনোলিয়া ফুলটা তুলে এনে অন্ধকারে নীলমের হাতে দিয়ে বলল, তোমার জন্যে তুলে রেখেছি নীলম, দেখ এখনও কেমন তরতাজা রয়েছে। প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত আমার তোমার ভাবনাতে কেটেছে। দূরদেশে মা ভাইবোন বুড়ো বাবা পথ চেয়ে আছে, হয়তো বা তারা এখন আমার ফেরার আশা একটু একটু করে ছেড়ে দিতে শুরু করেছেন। তাদের কাছে যাবার জন্যে মন আমার অস্থির, তবু কেন আজকাল মনে হয়, দিনান্তে একবার তোমাকে দেখতে না পেলে মন আমার একেবারে শূন্য হয়ে যাবে।

নীলম বলল, আমার বদরীনাথজী বড় দয়ালু, তোমার হাত দিয়ে ভালবাসার ফুলটি ঠিক পাঠিয়ে দিলেন। এখনও কি মিষ্টি গন্ধ জড়িয়ে আছে ফুলটির গায়ে।

সত্যি তুমি কত ভালবাস আমাকে সুজয়। আমার সব কষ্ট কোথায় চলে গেছে। এই মুহূর্তে আনন্দে মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

সুজয় ফুলসমেত নীলমের দুটো হাত ধরে এই প্রথম চুমু খেল। কতদিন দুজনে আখরোট গাছের তলায় পাশাপাশি বসেছে। কত কথা বলে গেছে। সুজয় তার সংসারের কত ছবি এঁকেছে নীলমের কাছে। কিন্তু কোনদিন এমন করে স্পর্শ করেনি নীলমকে। তাই নীলমও সুজয়কে ভালবেসেছে গভীর একটা শ্রদ্ধা মিশিয়ে।

সারারাত নিবিড় হয়ে ওরা দুজনে কাটাল। শেষ রাতে জানালার ফাঁকে কিন্নর কৈলাসের মাথায় চাঁদটাকে স্পর্শ করতে দেখে সুজয়ের কপালে আলতো করে একটি চুমু এঁকে উঠে গেল নীলম।

সূর্যের উদয় হয়। ধৌলাধার আর কিন্নর কৈলাসের চূড়ায় রঙের ছোঁয়া লাগে। সন্ধ্যার ছায়ায় সে রঙ আবার মুছে যায়। তাল তাল মেঘ কখনও ভেসে আসে দূরদিগন্ত থেকে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে মুক্তোর দানা ছড়িয়ে পড়ে। স্নোরেঞ্জে সে বৃষ্টির ফোঁটা ধবধবে সাদা বিন্দুতে জমে যায়। বৈশাখে খুবানির ডাল ভরে পিঙ্ক ফুল ফুটে ওঠে। ছোট ছোট লাল রঙের কিমপেয়াচ পাখিগুলো হুটোপুটি করে। খুবানির গোলাপী ফুল ঝরতে থাকে পাহাড়ী প্রান্তরে। দুপুরে কুপ্‌পু পাখিটা কুপ্‌পু—কুপ্‌পু করে বুক ফাটিয়ে ডাকে। মন উদাস হয়ে যায় সে ডাকে সুজয়ের, ঘরে ফেরার জন্যে আকুল হয়ে ওঠে সে।

পথ মেরামতের কাজ শেষ হয়ে আসে। প্রতিদিন শোনা যায়, তাপ্‌রি থেকে সাংলার পথ দ্রুত

এগিয়ে আসছে। ওদিকে রামপুর বুশেয়ারার পথও তাপ্রি ছুঁই ছুঁই করছে। নীলম এসে বলে, আর তোমাকে ধরে রাখা যাবে না সুজয়।

সুজয় বলে, এই আখরোট গাছের তলায় বসে কিন্নর কৈলাসের দিকে দুজনের চেয়ে থাকার কথা কি করে ভুলি নীলম? চাঁদের ঢেউ দেওয়া রাতগুলোতে বাস্পা নদীর উপল মাড়িয়ে হাতে হাত ভরে নিয়ে চলার কথা কি করে ভোলা যায়? ঘরে ফিরে যে আমার অন্য জগৎ, অন্য মুখ, ভিন্ন কাজ। সেখানে যে আমার নীলম নেই।

নীলম বলে, তবু যেতে হয়। সেখানে তোমার আশা ছেড়ে দিয়ে যে মানুষগুলো বসে আছে, তারা যখন তোমাকে দেখে আনন্দে কান্নায় ভেঙে পড়ে চেঁচাতে থাকবে, তখন সে ছবির তুলনা কই।

সুজয় বলে, নীলম, তুমি কি দূরদেশে কারো সঙ্গী হতে পার না?

নীলম কিছু সময় চুপ করে থেকে বলে, আমার ওপর নির্ভর করে বসে রয়েছে আমার মা আর ছোট দুটি বোন। তাদের অসহায় দুর্গতির মধ্যে ফেলে রেখে স্বার্থপরের মত কোথায় পালাব সুজয়? মন কাঁদলেও কামরু পাহাড়ের একখণ্ড পাথরের ভার বুকে নিয়ে পড়ে থাকতে হবে আমাকে এই সাংলা ভ্যালিতে।

কামরু আর সাংলা দেশাংয়ের কুমারী মেয়েরা 'তোসিমিগ কন্যা' উৎসবে মেতেছে। ওদের দলের নেত্রী হয়েছে নীলম। 'তোসিমিগ কন্যা' উৎসবের আয়োজন হয়েছে পি. ডব্লিউ. ডি. ওভারসিয়ার সাহেবের বাংলোতে। জায়গাটা একেবারে পাহাড়ী একটা স্পারের শেষ প্রান্তে। কয়েকটা কনহোর গাছ হাল্কা ভায়োলেট রঙের উর্ধ্ব-শিখা ফুল ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে গাছের ফাঁকে ফাঁকে মুনাল পাখি খেলা করে। একেবারে যেন ছোট আকারের ময়ূর। রঙের কি বাহার।

ওভারসিয়ার গেছেন বউ বাচ্চা নিয়ে ছুটি কাটাতে দেশের বাড়ি মাণ্ডীতে। চৌকিদার খুলে দিয়েছে কোয়ার্টার। সেখানে উৎসব চলছে। সাতদিন ওরা কেউ ঘরে ফিরবে না। খাওয়া-দাওয়া, নাচগান চলবে ওখানে। মেয়েরা রান্না করে ডেকে আনবে তাদের প্রেমিক পুরুষদের। তারা এসে ভোজে যোগ দেবে। নাচ-গান করবে মেয়েদের সঙ্গে। মেয়েরা কিন্নর কণ্ঠের সুর তুলবে বাতাসে। ছেলেরা নাচের তালে তালে বাজাবে ঢোল, বাগজল, বাঁশরিং, ডাল্‌কি বান আর সোন্নাল। জ্যোৎস্নারাত গভীর হবে, ওরা এমনি নাচ গান আর হুল্লোড় করবে! সে এক অলৌকিক জগৎ বলে মনে হবে। তাদের গানের সুর পাহাড়ে-পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরবে। বুড়ো-বুড়িদের কানে সে সুর গেলে তারা আর ঘুমুতে পারবে না। তারা হেঁটে হেঁটে পার হয়ে যাবে অনেকগুলো বছর। তরুণ-তরুণীর শরীর আর মন পেয়ে যাবে তারা! তাদের অনুচ্চারিত গলায় বাজতে থাকবে সঙ্গীত গুরুর প্রাথমিক আলাপ :

গুলি গোহ্না
হায়া বিহ্না
দশংস বিনা
গুলদার গোরিংডেন।

দিন আর রাতের সীমা উঠে গেছে। আনন্দ আনন্দ শুধু আনন্দ। রান্নার আনন্দ, নাচে আনন্দ, কথায় আনন্দ।

একটি ছেলে গেয়ে উঠল,

'এলি কুন্তা বরেইয়ো অংদুরি মাভোনা?'

(কুন্তা, তুমি আমার সঙ্গে প্রেম করবে কিনা বল?)

অমনি ছেলেটির প্রেমিকা জবাব দিয়ে গাইল,

'গতা কান্দোরি মাভোইয়ো কাতা রখতন।'

(তুমি কালো : আমি ফর্সা ছেলেকেই ভালবাসি।)

ছেলেটি অমনি ভারী গলায় ধাক্‌কা দিতে দিতে গাইল,

'এলি কুন্তাবরেইয়ো
কানু পুয়মিব কেতকিয়ো'

(আমি সবার চোখের সামনে দিয়ে তোমাকে তুলে নিয়ে চলে যাব। রমণী বীরভোগ্যা।)

মেয়েটি অমনি গেয়ে উঠল,

'কানপোমিভ কানবালে পাথেয়।'

(কেমন করে নিয়ে যাও তো দেখি, আমি তোমার নজরের বাইরে চলে যাব।)

দৌড়োদৌড়ি খেলা শুরু হয়ে গেল। মেয়েটিকে ধরার জন্যে ছেলেটি ছুটেছে। খল খল খুশি ছড়াতে ছড়াতে মেয়েটি ঘুরছে কনহোর গাছগুলোতে পাক দিয়ে। শেষে এক দৌড়ে এসে দাঁড়াল মণ্ডলীর মাঝখানে। মেয়েরা রইল তাকে ঘিরে। ছেলেটা চারদিকে ফাঁক খুঁজছে আর মেয়েটা এক একবার সবার আড়ালে লুকোচ্ছে, আবার উঠে দাঁড়িয়ে কীল মারার অভিনয় করছে।

এ খেলা হুল্লোড়ে শেষ হল। অমনি নীলমের উচ্চগ্রামী গলা বেজে উঠল,

'কনিচ ইহাই কনিচ
আং কিসমৎ খোটা,
ডোংখং দেন গরিচ্ছং'

(সাথী, আমার সাথী, কি খারাপ ভাগ্য আমার। পাহাড়ের ওপারে আমার সাদি হয়েছে।)

করুণ কান্নার মত সুরটা বাজতে লাগল। যারা এতক্ষণ হুল্লোড় করছিল তারা গালে হাত রেখে করুণ মুখ করে শুনতে লাগল নীলমের গান।

শেষ দিনটি বিষাদের। উৎসবের শেষ, গান ভাঙার পালা। প্রতিটি মেয়ে তাদের ভালবাসার জনকে পৌঁছে দিয়ে আসছে তাদের ঘরে। বিদায় নিচ্ছে ব্যথাভরা চোখ তুলে। চারচোখে পুনর্মিলনের প্রতিশ্রুতি। এই হল এ উৎসবের রীতি।

নীলম শেষ রাতে সুজয়কে নিয়ে এসে দাঁড়াল তহশীল অফিসের পেছনের ডেরায়। আখরোট গাছের আড়ালে চাঁদটা আটকে আছে, বুকের ভেতর ভালবাসার যন্ত্রণার মত।

ওরা বিশেষ কোন কথা বলতে পারছিল না। বিচ্ছেদের সময় এগিয়ে এসেছে। ওরা জানে কাল থেকে সারাই পথের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। হিমাচলের পরিবহন মন্ত্রী আসছেন সিমলা থেকে সাংলায়। কাল পি. ডব্লিউ. ডি. ডাকবাংলোয় অবস্থান। পরশু চিটকুল ঘুরে আবার সাংলা ছুঁয়ে কল্পায় যাত্রা। তারপর পু সামদো হয়ে ফিরবেন চারদিনের হ্যারিকেন ট্যুর শেষ করে।

পি. ডব্লিউ. ডি. ডাকবাংলো ছেয়ে আছে সরকারী কর্মচারী আর পুলিসে। সিকিউরিটি বিভাগের লোকেরা ঘোরাফেরা করছে। সারাদিন কামরু আর সাংলা অঞ্চলে চাঞ্চল্য।

কাল ওভারসিয়ারের বাংলোটা ছেড়ে দিতে হবে! অনেক অফিসারের আমদানী হয়েছে, তাদের থাকার জায়গা চাই।

'তোসিমিগ কন্যা' উৎসব ঠিক সময়েই শেষ হয়েছে, নইলে অনুষ্ঠানের স্থান নিয়ে বিপর্যয় ঘটত।

নীলম বলল, তোমার চলে যাবার কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে বাধছে সুজয়। তবু তোমাকে আটকে রেখে তোমার ঘরের মানুষদের দুঃখ বাড়াতে চাই না। তাঁদের দীর্ঘশ্বাস অনেক দূর থেকেও কানে এসে বাজছে।

সুজয় নীলমের দুটো হাত চেপে ধরে বলল, আমি আবার আসব নীলম। যেখানে থাকি আমার নীলমকে আমি কোনদিন ভুলব না।

নীলম আর কোন কথা বলল না, হয়তো কথা বলতে পারল না। সে তহশীল অফিস পেছনে রেখে উদগত অশ্রু চাপতে চাপতে কামরুর পথে পা বাড়াল।

আখরোট গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে নীলমের চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইল সুজয়।

নীলমের হাতে বোকা বনে যাবার দিন থেকে লালা অনন্তরাম চুপচাপ বসে থাকত তার দোকানে।

ঐ পথে নীলম যখন ইস্কুলে যেত তখন ঘাড় হেঁট করে বসে থাকত সে। নীলম আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখত। তার খুব মজা লাগত।

সেদিনের লালার কার্তিকলাপ একমাত্র সুজয় ছাড়া সে কাউকেই জানায়নি। এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষগুলোর মহাজন লালা। সোনা রুপো বন্ধক রেখে টাকা দেয়। তাছাড়া চড়া দামে লালার কাছ থেকে রোজকার ব্যবহারের জিনিসপত্র ধারে কেনে প্রায় সকলে। লালা বলত, সবার টিকি আমার হাতে বাঁধা। টান দিলেই হুমড়ি খেয়ে পায়ে এসে পড়বে।

বেলা দশটায় ইস্কুলের পথে চলেছিল নীলম। ক'দিন ছুটির পর এই তার প্রথম ইস্কুলে যাওয়া। মনটা বিষণ্ণ। আসন্ন একটা বিদায়েব যন্ত্রণা বুকটাকে মোচড় দিয়ে যেন ভেঙে ভেঙে দিচ্ছে। সে ক্লান্ত পায়ে চলছিল। লালার দোকানের কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তার মনে পড়ে গেল, লালার সাহায্য ছাড়া সুজয়ের পক্ষে সিমলা যাওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ জিপ ছাড়া রামপুর বুশেয়ারা অবধি যাওয়ার অন্য কোন যানবাহন নেই। আর লালার দু'তিনখানা জিপ সাংলা থেকে রামপুর অবধি যাওয়া আসা করে মালপত্র নিয়ে। পথের যাত্রীরা ওতেই চড়ে বসে।

নীলম অনেকদিন পরে ঢুকে পড়ল অনন্তরামের দোকানে।

অনন্তরাম তখনও বোধকরি সুদ কষছিল। খদ্দের ছিল না দোকানে।

নীলম ঢুকেই বলল, লালাজী, একটু দরকারে এলাম আপনার কাছে।

লালা অনন্তরাম চোখ তুলে চেয়ে রইল নীলমের দিকে। চোখে জিজ্ঞাসা চিহ্ন আঁকা।

নীলম বলল, দু'এক দিনের ভেতর আপনার জিপটা কি রামপুর বুশেয়ারার দিকে যাবে?

কেন, কি দরকার?

নীলম বলল, আমার এক বন্ধু যাবেন। তাঁর সিমলা ফেরার তাড়া আছে।

লালা বলল, সেই বাঙালী আদমী, যে আজ চার-পাঁচ মাহিনা কিনোরে ডুব দিয়ে আছে?

রাগ হলেও রাগের কথা বলল না নীলম। কার্যোদ্ধার করা চাই। শুধু বলল, ভদ্রলোককে জানেন দেখছি।

লালা বলল, আমার জানা-না-জানায় কিছু যায় আসে না। যাঁদের জানার দরকার তাঁরা জেনে বসে আছেন। আমার কাছে জিপের খোঁজ নেবার দরকার কি, তোমার বন্ধুটির জন্যে সরকারী রথ আসছে শিগ্‌গির, তাতে চেপে সরকারী অতিথিশালায় যাবেন, আর অন্তত বছরখানেক সরকারী ভোগ খেয়ে ঘুমোবেন।

নীলমের সমস্ত শরীরটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। সে মুহূর্তে বুঝতে পারল লালাই পুলিসকে খবরটা দিয়েছে। এখন উপায়? কি করে সে রক্ষা করবে তার সুজয়কে? কেমন করেই বা সে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে কিন্নরের এলাকা পার করে দেবে তার এই প্রাণের মানুষটিকে।

অসহায়ের মত নীলম চেয়ে রইল লালার মুখের দিকে। সুজয়ের কথা ভেবে বুক ঠেলে কান্না উঠে এল।

লালা হাসছে। ক্রূর একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেছে লালার সারা মুখে।

নীলমকে কে যেন এগিয়ে দিলে। সে লালার গদীর নীচে নতজানু হয়ে বসল। লালার হাতখানা দুহাতে তুলে নিয়ে চেপে ধরে বলল, একটা অনুরোধ আমার রাখতে হবে লালাজী। দুটো দিন অন্ততঃ পুলিসকে আপনি ঠেকিয়ে রাখুন। এর জন্য যে কোন দাম দিতে আমি প্রস্তুত।

লালা আর একখানা হাত নীলমেব হাতের ওপর চেপে দিয়ে বলল, কথা ঠিক থাকবে তো, না সেবারের মত ফিকির এঁটে পালাবে? তোমাকে বিশ্বাস নেই।

নীলমের গলা কান্নায় বুজে এল। অনেক কষ্টে কান্নাভেজা গলায় বলল, বিশ্বাস করুন, আমি কথা দিলে সে কথা প্রাণ গেলেও রাখব।

লালা বলল, বেশ, পুলিশ অফিসারকে আমি এ দুদিন ঠেকিয়ে রাখছি, কিন্তু তৃতীয় দিনে যদি তোমাকে না পাই, মানে তুমি যদি ফাঁকি দিয়ে পালাও, তাহলে তোমার ঐ বন্ধুর দফাটি একেবারে

নিকেশ হয়ে যাবে। আর দেখ, জিপ দিয়ে আমি সাহায্য করতে পারব না, কারণ ওর লুকিয়ে থাকার খবরটা চারদিকে জানাজানি হয়ে গেছে। বর্ডার লাইনের খবর সংগ্রহের ও একটা এজেন্ট। কি করে যে ঐ চালিয়াৎটার চালে পড়লে তুমি, তাই ভাবছি। যাক, এ দুদিনে ওকে যেখানে পার লুকিয়ে রাখ, আমি কিছু বলব না, কিন্তু তৃতীয় দিনটিতে আমি তোমাকে চাই! স্পষ্ট করে কথাটা বললাম বলে কিছু মনে কোর না যেন। সোজাসুজি কথা বলতেই আমি ভালবাসি।

নীলম উঠে দাঁড়িয়ে ছোট্ট করে বলল, পরশু রাত শেষে বাস্পা নদীর ঐ ছামের ধারে আপনি আমার দেখা পাবেন।

কথা পাক্কা? বলল লালা।

চলে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল নীলম, আমি কখনও কথা দিলে কথার খেলাপ করি না।

নীলম স্কুলে বসে সুজয়কে চিঠি লিখল :

বন্ধু,

তুমি দেশে পৌঁছে দেখবে আমার চিঠিখানা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তুমি অবাক হয়ে যাবে। হয়তো আর কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানি না, তবে জেনো ফুলের মৃত্যু নেই। সে ভালবাসায় বন্দী। ইয়ালু ফুল ঝরে যায় শুধু নতুন করে ফুটে ওঠার জন্যেই।

তোমার জন্মান্তরের বন্ধু।

চিঠি লেখা শেষ করে ড্রয়ার থেকে খাম বের করে যত্ন করে ভরল চিঠিখানা। সুজয়ের নাম আর দেশের ঠিকানা লিখল খামের ওপর। তারপর উঠে গিয়ে স্কুলের বাইরে লেটার বক্সে ফেলে দিয়ে এল।

আবছা আলো-অন্ধকারে দুটি ছায়ামূর্তি সিডার বনের ভেতর দিয়ে সন্তর্পণে উঠছে পাহাড়ের ওপর। আজ পূর্ণিমা। আলো ছড়িয়ে পড়ছে সাংলা আর কামরুর ঘুমন্ত গ্রামে। কেউ জেগে নেই। মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে। এত রাত্রে জ্যোৎস্নার জলে স্নান করছে কিন্নর কৈলাস আর ধৌলাধার।

ওরা নিঃশব্দে উঠে এল সেইখানে, উখাং উৎসবের দিন নীলম সুজয়কে যেখানে এনেছিল। সেই খাড়া পাথরখানা দাঁড়িয়ে আছে।

নীলম দাঁড়াল। সুজয় দাঁড়াল। নীলম বলল, থারচেন তোমাকে রূপীন গিরিপথ পার করে নিয়ে যাবে পাবার ভ্যালিতে। সেখান থেকে পুবমুখে হেঁটে যেও। একসময় দেরাদুনে গিয়ে পৌঁছবে। অবশ্য এ পথে বড় কষ্ট পেতে হবে তোমাকে, সেই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ রইল। আমিই তোমার সব কষ্টের কারণ হয়ে রইলাম সুজয়।

সুজয় নীলমকে বুকের মাঝে টেনে আনল। তার মুখখানা চাঁদের আলোয় কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল। একসময় বলল, তুমি সারাপথ আমার ভাবনার সঙ্গী হয়ে থাকবে নীলম। আমার সব কষ্ট আনন্দের ফুল হয়ে ফুটবে।

থারচেন তৈরি হয়েই ছিল। অনেক পথ যেতে হবে। ভেড়াগুলো পাহাড়ী প্রপাতের মত চলতে লাগল। থারচেন মুখে সিসরং-এর আওয়াজ তুলে এগিয়ে চলেছে, পাশে সুজয়।

নীচে থেকে চেয়ে চেয়ে তাদের দেখছে নীলম। একবার পাহাড় আর বনের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে, আবার জ্যোৎস্নার আলোয় ভেসে উঠছে।

কতক্ষণ পরে দুটো কালো পুতুলের মত নড়তে নড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা।

চোখ মুছল নীলম। এখন ফিরে যেতে হবে তাকে। কথা দিয়েছে সে অনন্তরামকে। কথা সে রাখবেই। দ্রুত নামতে লাগল নীলম। একি, পা দুটো যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে তার। পায়ের তলার পাথর ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়ছে নীচে। সে সীডার গাছের কাণ্ডটা ধরে হাঁপাতে লাগল। অনেক পথ নেমে এসেছে সে। ঐ তো বাস্পা নদীর ওপর ছামটা দেখা যাচ্ছে। ওখানে তাকে পৌঁছতে হবে।

অনন্তরামকে কথা দিয়েছে ঐখানে তার সঙ্গে দেখা হবে। কথা সে রাখবেই।

একটা হরিণীর মত লাফিয়ে লাফিয়ে সে নামতে লাগল ছাদের দিকে। কি হল, হঠাৎ, পা দুটো টলে উঠল নীলমের। এতদিন যে পা দুটো অনেক বিপদ থেকে তাকে পার করে এনেছে তারা হঠাৎ তার দেহের ভার বইতে অক্ষম হয়ে গেল। নীলম ঝাপসা চোখ মেলে দেখল কিন্নর কৈলাসের মাথায় চাঁদ ডুবছে।

আদিম নারীর মত একখণ্ড পাথরের ওপর পড়ে আছে নীলম। প্রাণহীন দেহটাকে স্পর্শ করছে ধৌলাধারের তুষারছোঁয়া বাতাস। বাস্পা নদীর জলকণা বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে তার গায়ে। আদিম অরণ্য আর পাহাড়ের স্তূপগুলো স্তব্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

ভোর হবে। ছুটে আসবে অনন্তরামের জিপ নীলমকে তুলে নিতে। এসে দেখবে রক্তাক্ত প্রাণহীন শিকারের মত পড়ে আছে তার কামনার নারী। নীলম তার কথা রেখেছে, সে পালিয়ে যায়নি তার কানেচের সঙ্গে। সে ফিরে এসেছে সাংলায়।

●

ফরেস্ট বাংলো

সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। সামনের সমুদ্রে রঙের খেলাটুকু তন্ময় হয়ে দেখছিলেন ভারত-বিখ্যাত শিল্পী অনির্বাণ চৌধুরী। এই নিরালা নিবাসের সামনের বারান্দায় বসে দীর্ঘ পঁচিশটি বছরের কত দিন যে তিনি সমুদ্রকে কতভাবে দেখেছেন তার কি আর লেখাজোখা আছে। পাশে ধূ ধূ সোনালি বালির প্রান্তরে ছোট ছোট ঝাউয়ের যে গাছগুলিকে তিনি প্রথমে এখানে এসে দেখেছিলেন, তারা এখন বৃহৎ বৃক্ষসংসারে পরিণত হয়েছে। মাঝরাতে কখনো ঘুম ভেঙে গেলে শিয়রের জানালা দিয়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন। মরা জ্যোৎস্নায় ঝাউয়ের পাতাগুলোকে ঠিক যেন বেহালার একগোছা তার বলে মনে হয়। তিনি কান পেতে শোনেন, বেহালা বাজছে। অনেক দূরের অস্পষ্ট জগতের একটা সঙ্গীতের সুর কে যেন ছড়ের টানে টানে সেধে চলেছে।

এই সমুদ্রতীরের বারান্দায় বসে কত কথাই না মনে পড়ে তাঁর। পেছনে ফিরে তাকালে তিনি স্পষ্ট দেখতে পান একটা প্রসারিত পথ। সে পথে হেঁটে চলেছে একটি কিশোর। দেহে দারিদ্র্যের মলিন চিহ্ন। শুধু দুটি চোখ তার ব্যতিক্রম। একটা উজ্জ্বল স্বপ্নের ছবি আঁকা হয়ে আছে সে চোখের চাহনিতে।

পথের এক পাশে একটি বিরাট সৌধ। কি বিস্ময় নিয়ে কিশোরটি তাকিয়ে রইল সেদিকে। ভাগ্য কি দেবে তাকে সেখানে প্রবেশের সামান্যতম সুযোগ?

জীবনের সিঁড়ি ভাঙার কত ইতিহাস স্মৃতির পাতায় লেখা হয়ে আছে শিল্পী অনির্বাণ চৌধুরীর।

আজ তিনি 'শিল্প বিদ্যা ভবনের'ই কেবল অধ্যক্ষ নন, শিল্পী হিসেবে ভারতজোড়া তাঁর নাম। সরকারী বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠানের শিল্প বিভাগের শীর্ষে আজ কর্মরত তাঁর ছাত্ররা।

তিনি নিজে ফাইন আর্টসের ছাত্র হয়েও কমার্শিয়াল আর্টের ছেলে-মেয়েদের উৎসাহ দেন। কাছে ডেকে নিয়ে বলেন, কমার্শিয়াল আর্টস হল প্রথমা স্ত্রী, আর ফাইন আর্টস দ্বিতীয়া।

কেউ যদি বলে, এ কথা কেমন করে বললেন অনির্বাণদা?

অমনি অনির্বাণ বলেন, যা সত্য তাই বলছি। দ্বিতীয়াকে নিয়ে পেয়ার করবি, রঙে রসে জাল বুনবি, কুসুমে চন্দনে সাজাবি, কিন্তু ক্ষিদে পেলেই দ্বারস্থ হতে হবে প্রথমার। সে-ই পরিপাটি করে খাবার এনে তুলে ধরবে মুখে। তবে ঘরোয়া বলে তাকে ঘেন্না করতে নেই, তাকেও সাজাতে হয়, তার মন জুগিয়ে চললে তবেই সব সচল। জাতশিল্পী কমার্শিয়াল আর্টকেও ফাইন আর্টসের পর্যায়ে তুলতে পারেন।

অনির্বাণ চৌধুরী বিয়ে করেননি। বিয়ের সময়টা ছবি এঁকে পার করে দিয়েছেন। এখন ছাত্রছাত্রীরাই তাঁর সংসার, তাঁর সব।

এই সন্ধ্যার মুহূর্তগুলিতে তাঁর পাশে এসে বসেন আর একজন। তিনি এই নিরালা নিবাসের মালিক রত্নমঞ্জুলা দেবী। যৌবনের শেষপ্রান্তে এসেও আশ্চর্য এক শ্রীতে উদ্ভাসিত তাঁর দেহ। মুখে প্রশান্তির ছাপ। জীবনে সব পেলে যে তৃপ্তির আলো ফুটে ওঠে সে আলোর খবর তাঁর চোখের তারায়। কিন্তু সিঁথিতে নেই তাঁর সিঁদুরের চিহ্ন। নিরালা নিবাসে নেই কোন আত্মীয়-সমাগম। নির্জনতা তিনি প্রাণভরে ভালবাসেন, তাই এই সমুদ্রতীরে জীবনের অনেকগুলি বছর তিনি কাটিয়ে দিলেন।

শুধু এখানে আসেন শিল্পী অনির্বাণ আর আসে তাঁর ছাত্রছাত্রী দল। তারা কেউ জানে না রত্নমঞ্জুলা দেবীর আসল পরিচয়। জানে না অনির্বাণ চৌধুরীর সঙ্গে রত্নমঞ্জুলার পরিচয়ের কোন গোপন সূত্র।

সেদিন রত্নমঞ্জুলা দেবী বসেছিলেন রোজকার মত শিল্পীর পাশটিতে। দেখছিলেন সমুদ্রের জলে

শেষ সূর্যের খেলা। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল পাশের ঝাউবীথির ভেতর দিয়ে মালবী আর শঙ্খ নিরালা নিবাসের দিকেই ছুটে আসছে। আর্ট কলেজের এ দুটি সেরা ছাত্রছাত্রীকে এবার সঙ্গে এনেছেন শিল্পী চৌধুরী।

ব্যাপারটা জানবার জন্যে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে গেলেন রত্নমঞ্জুলা দেবী। ওপরে তেমনি স্থির হয়ে বসে আছেন শিল্পী অনির্বাণ। সামনের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে ঢেউগুলো। কোটি কোটি বছরের এই সমুদ্রের গান আজও একই সুরে বেজে চলেছে। সৃষ্টির কোন আদিম ঊষায় পরেছিল অনন্তযৌবনা সমুদ্র একখানা নীল শাড়ি, মাথায় গুঁজেছিল সাদা মল্লিকার মালা, তা আজও খোলেনি। জলে রৌদ্রে সে নিত্য শুদ্ধ।

কয়েকটি পায়ের সাড়া বেজে উঠল সিঁড়িতে। মালবী আর শঙ্খ চেঁচিয়ে উঠল একসঙ্গে, অনির্বাণদা, ইন্টারন্যাশনাল এগজিবিশনে আপনার ছবি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে।

শঙ্খ আনন্দে হিপ্ হিপ্ হুররে আওয়াজ তুলল। মালবী ততক্ষণে অনির্বাণের চোখের সামনে ধরল সন্ধ্যার মেলে আসা স্টেটসম্যান কাগজখানা।

অনির্বাণ চৌধুরী দেখলেন খবরটা। সত্যিই তাঁর ছবি শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের সম্মান পেয়েছে। এই ছাত্রছাত্রীরাই জোর করে ফ্রান্সের ওয়ার্লড ফেয়ারে ছবিগুলো পাঠিয়েছিল। শিল্পী অনির্বাণ চৌধুরী সত্যি বলতে কি সে সময় সঙ্কুচিত হয়েছিলেন মনে মনে। তবে ভারতীয় শিল্পীর কাজ ওদের চোখে পড়ুক এ ইচ্ছাটুকুও যে মনের ভেতর ছিল না তা নয়। কিন্তু এ ধরনের স্বীকৃতি ছিল তাঁর একেবারে আশার বাইরে।

মালবী আর শঙ্খ পায়ে হাত ছোঁয়াতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাদের আশীর্বাদ করলেন।

কাগজের লেখাটা ভাল করে পড়ার জন্যে মালবীর হাতে দিলেন।

কাগজে খবর যা বেরিয়েছে তাতে পুরস্কৃত হয়েছে ওঁর 'ফরেস্ট ফায়ার' ছবিখানা। ছবির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি ছোট্ট সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আছে।

অরণ্যবহ্নি লক লক রসনা মেলে ঘিরে ফেলেছে। একটি কৃষ্ণচূড়ার সবুজ গাছ মাথায় দুটি আগুনরঙা লাল ফুল ফুটিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। ঠিক তার তলায় ভীত দুটি হরিণ পালাবার পথ না পেয়ে পরস্পর মুখে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্রান্সের এক চিত্রসমালোচকের মন্তব্য তুলে দেওয়া হয়েছে : মৃত্যুর মুখোমুখি জীবনের এক আশ্চর্য অনুভূতি যেন সারা ছবিখানির মধ্যে স্পন্দিত হয়েছে।

রত্নমঞ্জুলা উঠে এলেন ওপরে। সন্ধ্যায় পথের বাঁকে জুঁইফুল গেঁথে সুন্দর কাজললতা তৈরি করে একটি ছেলে। তিনি তার কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন কাজললতা। অনির্বাণের অতি প্রিয় এই ফুলের কারুকর্মটি।

রত্নমঞ্জুলা কাজললতাটি অনির্বাণের হাতে ধরিয়ে দিয়ে প্রণাম করার জন্য নত হতেই তিনি তাঁকে হাত ধরে বসালেন পাশে। বললেন, আজ প্রণাম নয় মঞ্জুলা, শ্রদ্ধা দেখিয়ে দূরে সরিয়ে দিও না আমাকে। এতদিনে তোমারই জয় হল। আজ তোমার প্রতীক্ষার পুরস্কার এল অনেক দূরের মানুষের কাছ থেকে।

মালবী আর শঙ্খ ততক্ষণে বসে পড়েছে ওঁদের দুজনকে ঘিরে।

আশ্চর্য একটা চাঁদ ঝাউগাছের ঝিরিঝিরি পাতার ফাঁকে হঠাৎ জেগে উঠল। কি কোমল লাবণ্যেভরা আলো ঝরে পড়েছিল ঝকঝকে রুপোর ভরা পাত্রখানা থেকে।

ওদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন শিল্পী অনির্বাণ চৌধুরী।

বললেন, শিল্পীর জীবন বড় সুখের নয় শঙ্খ। অনেক ঝড়ের পথ তাকে পেরিয়ে আসতে হবে। কারো সাহায্য পেলে সে তোমার সৌভাগ্য, কিন্তু তার জন্যে তোমার কোন প্রত্যাশা থাকবে না। শুধু একটি কথা আজ মনে রেখো, শিল্পীর সমাজ নেই, সংসার নেই, কেবল নিজের সৃষ্টিকে ঘিরে প্রতি মুহূর্তের পথ চলা। যদি এমনি করে শিল্পসৃষ্টির ভেতর জীবনকে মেশাতে পার তাহলেই একদিন তোমার শিল্প যথার্থ সৃষ্টির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে। জীবনের সবটুকু সুখ-দুঃখের অনুভূতি ছড়িয়ে দিতে

হবে ছবির সর্বাঙ্গে, না হলে কোন সৃষ্টিই সফল হবে না মালবী।

মালবী বলল, দাদা, আজ এই সময়টিতে আপনার নিজের মুখে আপনারই ফেলে আসা জীবনের কথা শুনতে বড় ইচ্ছে করছে। আপনার শিল্পী জীবনের সুখ-দুঃখ সাধনার কথা।

চুপচাপ কতক্ষণ নীরবে বসে রইলেন শিল্পী অনির্বাণ চৌধুরী। বেশ বোঝা গেল স্মৃতির অতলে ডুব দিয়ে তিনি দুঃখের মুক্তোগুলো কুড়োবার চেষ্টা করছেন।

একসময় বলে উঠলেন, একটু আগে যে কথা বললাম তারই সূত্র ধরে আমার জীবনের দুচার কথা বলব। যে ছবিটি আজ স্বীকৃতি পেল তার পেছনে আমার জীবনের যে অভিজ্ঞতাটুকু জড়ানো রয়েছে তা তোমাদের দুজনের কারোরই জানা নেই। তোমাদের অনির্বাণদার জীবনের সেই অজানা রহস্যটুকু আজ জেনে নাও। শুধু অনির্বাণ চৌধুরী তোমাদের শিল্প বিদ্যা ভবনের অধ্যক্ষই নয়, কিংবা ছাত্রদের প্রতি সহৃদয়ই নয়, তারও একটি ব্যক্তিগত জীবন আছে। সে জীবনের ভাল-মন্দ থেকে মানুষটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখো না।

অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে হঠাৎ থামলেন অনির্বাণ চৌধুরী।

একসময় আবার শুরু করলেন তাঁর জীবনের কথা।

বছর পনেরো বয়স তখন মা-বাবা কয়েক মাসের ব্যবধানেই মারা গেলেন। আমি দু'দুটো বছর আত্মীয়দের বাড়ি ঘুরে ঘুরে কাটালাম। তারপর একদিন নিঃসম্বল অসহায় অবস্থায় পথে এসে নামলাম।

আমাদের দেশ থেকে কলকাতার দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। একদিন কলকাতার পথে হেঁটেই পাড়ি জমালাম। চলার পথে কোন কোন বাড়িতে গৃহভৃত্যের কাজ নিয়ে থেকেও গেছি। দু-চারদিন পরে গায়ে চলার জোর পেলে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়েছি।

আমি শুনেছিলাম, কলকাতায় আর্ট স্কুল আছে, যেখানে কেবল ছবি আঁকা শেখান হয়। ছেলেবেলা থেকেই আঁকার দুরন্ত নেশা আমার। যদি কোনরকমে ওখানে ছবি আঁকাটা শিখতে পারি।

ইতিমধ্যে মফস্বল একটা শহরে সিনসিনারি আঁকার ব্যাপারে সাগরেদী করে ছবি সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেই জ্ঞানটুকু সম্বল করে একদিন চলে এলাম আমার স্বপ্নের তীর্থ কলকাতায়।

অনেক খুঁজে পেলাম আর্ট স্কুলের হদিস। কিন্তু প্রবেশের পথ পাই কি করে? এদিকে খাবার সংস্থান নেই, থাকার আস্তানা খোলা আকাশের নীচে।

দারোয়ানকে ধরে বললাম, একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

ও বলল, প্রিন্সিপাল বহুৎ আচ্ছা মানুষ আছে, ওঁর কাছে ধরে পড়লে একটা কিছু হইয়ে যাবে। কাছে-পিঠে অপেক্ষা করুন, উনি ময়দান থেকে বেড়ায়ে ফিরবেন, তখন মেজাজটাও শরীফ থাকবে, সেই সুযোগে সব কথা বলবেন।

তখনও রোদের সোনা আকাশ থেকে মিলিয়ে যায়নি। আমি পকেট থেকে রঙীন চক বের করে আর্টস্কুলের গেটের সামনের ফুটপাথে রাম-রাবণের যুদ্ধের একটি ছবি আঁকতে লেগে গেলাম।

আঁকতে আঁকতে তন্ময় হয়ে গেছি, কোন দিক দিয়ে যে কত সময় পার হয়ে গেছে জানতে পারিনি। অন্ধকার ঘন হয়ে এসে যখন ছবির টানগুলোকে অস্পষ্ট করে দিল তখন ফুটপাথ থেকে মুখ তুললাম।

চমকে দেখলাম, আমার পাশে প্রশান্ত এক প্রৌঢ়-মূর্তি দাঁড়িয়ে। তিনি মগ্ন হয়ে তখনও আমার ছবি দেখছিলেন।

আমার মনে হল ইনিই প্রিন্সিপাল। আমি সেই সৌম্যমূর্তি ভদ্রলোককে নত হয়ে প্রণাম করলাম।

কোথায় থাক তুমি? পড়াশোনা কর, না ছবি এঁকে বেড়াও?

বললাম, এখানে আমার কোন আস্তানা নেই। আমি ছবি আঁকতে খুব ভালবাসি। আপনি একটু দয়া করলে আমি আপনার স্কুলে ছবি আঁকার সুযোগ পাই।

উনি বললেন, কাল এসো, দেখব।

বলেই চলে গেলেন গেট পার হয়ে কোয়ার্টারের দিকে।

আমার তখন আনন্দে দিশাহারা অবস্থা। আমি ফুটপাথ ধরে প্রায় নাচতে নাচতেই এগিয়ে চললাম।

হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনলাম, বাবু, ও বাবুসাহেব!

পেছন ফিরে দেখি স্কুলের সেই দারোয়ান। অনেকখানি পথ আমার পেছনে ছুটে এসেছে, তাই হাঁপাচ্ছে।

বলল, প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, আপনার নাকি থাকবার ডেরা নাই, আপনাঁকে তলব করিয়েছেন, চলুন হামার সঙ্গে।

আমি তো অবাক। হঠাৎ আমার চোখে জল এসে গেল। কতদিন মানুষের স্নেহ পাইনি। একটা মিষ্টি কথা একটি দিনের জন্যেও মুখ ফুটে কেউ বলেনি।

আমি যখন আর্টস্কুলের বড় বড় থামওয়ালা বিল্ডিং পেরিয়ে প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারে পৌঁছলাম তখন চারিদিকে সন্ধ্যার বাতি জ্বলে গেছে।

প্রিন্সিপাল ড্রইংরুমে বসেছিলেন। দারোয়ানের সঙ্গে আমি ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। প্রিন্সিপালের সামনের টেবিলে রবীন্দ্রনাথের একটি পাথরের মূর্তি। তিনি সেদিকে তাকিয়েছিলেন নিবিষ্ট হয়ে। আমরা যে ঘরে ঢুকলাম, তিনি টেরই পেলেন না। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে ঘরের চারিদিকে দেখতে লাগলাম। দেয়াল জুড়ে ছবির মেলা। সব মিলিয়ে মনে হল বসন্তের বনে যেন রঙের জোয়ার লেগেছে।

এক সময় ধ্যান ভাঙলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

আমার কাছে এসে বললেন, ছবি দেখছ, এসব আমার স্কুলের ছাত্রদের আঁকা।

উনি ঘুরে ঘুরে এক একটা ছবির বৈশিষ্ট্য কি তা বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। কোন্ ছবি কোন্ মিডিয়ামে আঁকা তাও বলে দিলেন। ছবির কথা বলা হয়ে গেলে তিনি আমাকে একটা আসন দেখিয়ে বসতে বলে নিজেও বসলেন।

আমরা তখন দুজনের মুখোমুখি।

প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী বললেন, বাড়িতে কে আছেন তোমার?

কেউ নেই স্যার। বাবা-মা মারা গেছেন। ভাই-বোনও নেই।

তোমার দেশের বাড়ি-ঘর তুমি না থাকলে কে দেখাশোনা করবে?

একটা জঙ্গলের ভেতরে পড়ো ভাঙা বাড়িতে আমরা থাকতাম। এখন সেখানে কেউ থাকে না।

তোমার আসবাবপত্র কিছু সেখানে নেই?

কিছু নেই স্যার।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তুমি আমার কোয়ার্টারে আজ রাত থেকেই থাকবে। কাল তোমাকে আর্টস্কুলে ভর্তি করে নেব।

সাহস করে বললাম, মাইনে দেবার ক্ষমতা নেই আমার।

উনি বললেন, সেটা ভেবে নিয়েই তো তোমাকে ভর্তি করছি।

সেদিন থেকে একটা সতেরো বছরের ছেলে এক হৃদয়বান শিল্পীর বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে গেল।

সেখানেই আমার পরিচয় সেঁজুতির সঙ্গে। প্রিন্সিপাল ললিতমোহন চক্রবর্তীর মেয়ে। বয়সে আমার চেয়ে কিছু ছোট হবে। কিন্তু ডানপিটের ওস্তাদ।

আমি প্রথম ঘরে ঢুকে সেঁজুতিকে দেখতে পাইনি, কারণ সে তখন মাসীর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। রাতে যখন আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছি তখন ওরা এলো। দারোয়ানের কাছেই আমি সেঁজুতি সম্বন্ধে সব খবর পেয়েছিলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল ওরা। একটি মেয়ের গলা কল কল করে বেজে উঠল। বুঝলাম সেঁজুতির গলা।

ওরা উঠে গেল তিনতলায়।

আমি শুয়ে শুয়ে নিজের ভাগ্যের কথা ভাবছি। জানালা দিয়ে খোলা ময়দানের অনেকখানি দেখা যায়। আমি সেদিকে তাকিয়ে আকাশের তারা দেখতে লাগলাম। অগণিত নক্ষত্রের সংসার। নিয়ম শৃঙ্খলায় সাজানো। নিজের জীবনের কথা ভাবলাম। কত এলোমেলো, কত বিশৃঙ্খল।

কতক্ষণ রাতের আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে এমনি সব ভাবছিলাম মনে নেই, হঠাৎ ওপর থেকে

কার গলা যেন বেজে উঠল, এই বুক্‌নি যাসনে, এখন যেতে নেই!

কে কাকে কি জন্যে বারণ করছে বোঝার আগেই সিঁড়িতে দুড়দাড় পায়ের আওয়াজ বেড়ে উঠল। মুহূর্তের ভেতর আমার ঘরের বাতিটা টুক করে জ্বলে উঠল। সারা ঘর আলোয় আলোময়। খালি গায়ে শুয়েছিলাম। অপ্রস্তুত হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি একটি বছর পনেরো বয়সের মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমাকে তার দিকে ফিরে তাকাতে দেখেই মুহূর্তে সে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সিঁড়িতে দ্রুত শব্দ তুলে ওপরে উঠে গেল।

আমার অপ্রস্তুত অবস্থাটা কাটতে সময় লাগল।

কিন্তু স্বাভাবিক হলাম যখন তখন সেঁজুতি ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই। ভারী সুন্দর দেখতে মেয়েটিকে। যেমন মুখের চেহারা, দেহের গড়ন, তেমনি দুধ-হলুদ মেশানো রঙ। মেয়েটি সম্বন্ধে দারোয়ান রামপ্রসাদের মুখে যা শুনেছিলাম তার পরিচয় প্রথম রাতেই পাওয়া গেল।

ওর কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ হাসি পেল। ওকে ওপর থেকে নীচে আসতে যিনি মানা করেছিলেন, তিনি 'বুক্‌নি' বলেই ওকে ডেকেছিলেন। তাহলে সেঁজুতি ওর পোশাকী নাম। আসলে ও যে নামে পরিচিত সেটা 'বুক্‌নি'। ওকে যদিও সে রাতে একটি কথাও আমার মুখোমুখি বলতে শুনিনি, তবু ডানপিটেমির যে নমুনা ও দিয়েছে তাতে বুক্‌নিতে ও যে একটা ভাল প্রাইজ পাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অনেকদিন ভাল করে ঘুমোইনি, তাই এমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে ভোরে বিছানা ছাড়তে পারিনি।

হঠাৎ দরজার কাছে একটা গলা শোনা গেল, শুনছেন, এই যে শুনছেন কালাচাঁদবাবু, আমার মাস্টারমশায় আসার সময় হয়ে গেছে, এখন উঠতে পারেন।

খুব লজ্জিত হয়ে উঠে পড়লাম। বিছানাপত্র একপাশে সরিয়ে রাখলাম। হঠাৎ মনে হল, মেয়েটা আমাকে কালাচাঁদবাবু বলে ডাকল কেন? আমার রঙটা একটু ময়লা বলে কি?

ঘর থেকে জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় বললাম, আমার নাম কালাচাঁদ নয়, অনির্বাণ চৌধুরী।

মেয়েটি দরজার একপাশে দাঁড়িয়েছিল, মুখখানায় অদ্ভুত ভঙ্গি করে বলল, ইস্!

সতেরো বছরের ছেলে, রাগ যে একটু হয়নি এ কথা বলি কি করে।

হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, বক বক কর সারাদিন, তাই বুঝি তোমার নাম বুক্‌নি।

দেখলাম, চোখে-মুখে ওর বিস্ময়ের একটা ছবি ফুটে উঠেছে। ওর নামটা এক রাতের ভেতর আমি কি করে জেনে ফেললাম তাই ও ভাবতে লাগল।

বেশিক্ষণ নয়, নামতে যাচ্ছি, ও বলল, অনেক বেলা অবধি ময়দানে বেড়ানো খুব বিচ্ছিরি, তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ওপরে মায়ের কাছে যেও। মা খাবার নিয়ে বসে থাকবে।

আমি বেরিয়ে গেলাম।

যখন ফিরে এলাম তখন স্যার সঙ্গে। তিনি রোজ সকালে ময়দানে অনেক সময় ধরে হেঁটে বেড়ান।

কোয়ার্টারে ঢোকার মুখেই দেখলাম এক দৃশ্য। সেঁজুতি মস্ত উঁচু পাঁচিলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। একটা বিরাট পাখির ডানার মত দুটো হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে শরীরের ব্যালেন্স রাখছে।

আমি ভয়ে থমকে দাঁড়ালাম। ওখান থেকে একবার পড়লে নির্ঘাত পা দুটো ভাঙবে।

দৃশ্যটার দিকে স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যেতেই উনি মুখে আঙুল রেখে আমাকে কিছু মন্তব্য করতে বারণ করলেন।

ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, দেখি তার আগেই ও এসে বসে আছে। তাকিয়ে দেখি জানালার গরাদ নেই। ওদিক দিয়ে কার্নিশ বেয়ে পাঁচিলে নেমে আপন মনে খেলা দেখাচ্ছিল।

ওপর থেকে চা আর জলখাবার খেয়ে নেমে এলাম আমার দোতলার ঘরে। ও টেবিল-চেয়ার সাজিয়ে বসেছিল। বোধকরি টিউটরের প্রতীক্ষা করছিল।

বললাম, বিনি পয়সায় একটা খুব ভাল সার্কাস দেখলাম।

ও ছেলেমানুষের মত লাফিয়ে উঠে বলল, কোথায়, কোথায়?

বললাম, আর্টস্কুলের পাঁচিলের ওপর।

ও এবার ধ্যাৎ বলে চেয়ারে বসে পড়ল।

একটু পরেই ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, অনির্বাণদা তুমি এখন পাশের ড্রইংরুমে একটু যাবে, আমাদের আতঙ্কভঞ্জনবাবু আসছেন।

বললাম, যাচ্ছি, কিন্তু আতঙ্কভঞ্জনবাবু কে সেঁজুতি?

ও বলল, আমার টিউটর। অঙ্ক আর ভূগোলের আতঙ্কভঞ্জনের জন্যে মা ওঁকে নিযুক্ত করেছেন।

বলতে বলতে সিঁড়িতে আতঙ্কভঞ্জনবাবুর চটিজুতোর ফটাস ফটাস আওয়াজ শোনা গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে সরে পড়লাম।

ওঘরে বসে কিন্তু মনের ভেতর আমার একটা ভাবনা এল। সুন্দর একটা সুখের ভাবনা। আলতো করে পাতাসমেত গন্ধরাজের একটা ফুল নাকের ওপর ছুঁইয়ে নিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি কোমল মধুর একটা অনুভূতি আমার সতেরো বছরের তরুণ জীবনটাকে প্রথম ছুঁয়ে গেল। সেঁজুতি আমাকে মিষ্টি গলায় অনির্বাণদা বলে ডেকেছে! আমার কানে বার বার বাজতে লাগল সে ডাক। তারপর সেই ডাকটুকু হাওয়ায় ভর করে আলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঐ ময়দান পেরিয়ে আকাশের দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

আতঙ্কভঞ্জনবাবু চলে যেতেই সেঁজুতি এল আমার ঘরে। খুব মিষ্টি আর শান্ত গলায় বলল, তোমাকে অনেকক্ষণ একা বসে থাকতে হল, তাই না?

বললাম, এ ঘরখানা ছবি দিয়ে মোড়া, তাই একা বসে আছি মনে হয় না।

সেঁজুতি বলল, কাল আমরা ফিরে আসতেই বাবা তোমার কথা বলল। কি ভাল যে তোমার ছবির হাত সেই কথা মাকে বলছিল। তুমি গেটের সামনে রাম-রাবণের দারুণ একটা যুদ্ধের ছবি এঁকেছ। বাবার মুখে শুনে খেতে খেতেই আমি উঠে দৌড়ে গিয়ে দেখে এসেছি।

বললাম, তুমি আমার ঐ ছবিটা দেখেছ? সত্যি করে বল কেমন লেগেছে?

সেঁজুতি সঙ্গে সঙ্গে মুখখানাকে কুঁচকে বলল, বিচ্ছিরি।

সত্যি বলছ?

ও বলল, দারুণ লেগেছে আমার রাবণের মুখখানা। দশখানা মুখ আর দশজোড়া চোখে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

বললাম, রামচন্দ্রকে কি রকম লাগল?

বড় বড় টানা টানা খুব সুন্দর চোখ, কিন্তু রাগ নেই। হাতে তীর-ধনুক আছে, তাই যুদ্ধ করছে বলে মনে হচ্ছে।

বললাম, খুব রাগ দেখায় যে সে বড় বেশি যুদ্ধ করতে পারে না। কথায় বলে, যত গর্জে তত বর্ষে না।

ও বলল, আজ সকালে কেন পাঁচিলে উঠেছিলাম জান?

মাথা নেড়ে জানালাম, না।

সেঁজুতি বলল, ভেবে ভেবে একটা কিছু বলই না।

অনেক ভেবে বললাম, তুমি ব্যালেন্স বেস প্র্যাকটিশ করছিলে।

সেঁজুতি বলল, দুর, হল না।

আবার ভাবতে লাগলাম। এবারে বললাম, নিশ্চয়ই মর্নিং ওয়াক করছিলে।

সেঁজুতি মুখ ভেংচে হাত নেড়ে বলল, তোমার মুণ্ডু।

তারপর নিজের কথাতে অপ্রস্তুত হয়ে বলল, তুমি কিছু মনে করলে না তো অনির্বাণদা?

ওর কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, আমি হেরে গেছি, এখন তুমি বল কি জন্যে পাঁচিলে উঠেছিলে।

ও বলল, তুমি একটা হেবো। আচ্ছা বলছি শোন, তোমার ছবি দেখতে উঠেছিলাম।

অবাক হয়ে বললাম, আমার ছবি দেখতে? মিছে কথা। সে তো তুমি কালই দেখেছ। তাছাড়া

দেখার ইচ্ছে হলে নীচে গিয়েই তো দেখতে পারতে।

ও বলল, তুমি ছবি হয়তো আঁকতে পার কিন্তু তার নিয়ম জান না। ছবিকে বার বার দেখতে হয় নানা অ্যাঙ্গেল থেকে। তাই ওপর থেকে দেখছিলাম কেমন দেখায়। এরোপ্লেন থেকে তোলা ছবি দেখনি, কি সুন্দর দেখায়।

কেমন লাগল ওপর থেকে আমার ছবি?

অদ্ভুত লাগল। মনে হল, ঠিক যেন ঘোলা জলের ওপর মস্তবড় কাগজের একখানা ছবি ভেসে আছে।

ওর কথা শুনে আমার হাসি পেল।

আমাকে হাসতে দেখে ও গম্ভীর হয়ে বলল, বিশ্বাস না হয় দেখে এসো না।

বললাম, আমি কি বাঁদর যে পাঁচিলে লাফ দিয়ে বেড়াব।

ও হঠাৎ আমার মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলল, তার মানে, আমাকে বাঁদর বলা হচ্ছে?

উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময় সিঁড়ি ভেঙে কেউ আসছে বলে মনে হল, আর এক পলকে পাখির মত হুস্ করে উড়ে পালাল সেঁজুতি।

বলতে বলতে একটুখানি থামলেন অনির্বাণ চৌধুরী। শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের আমার ছেলেমানুষী কাহিনী বলে বোর করছি না তো?

মালবী বলল, কি বলছেন দাদা, অদ্ভুত ভাল লাগছে আমার। মনে হচ্ছে আমি ঐ আর্টস্কুলের ভেতর দাঁড়িয়ে আপনাদের দেখছি।

শঙ্খ বলল, আপনার জীবনের এই অজানা দিকটা আপনি আজ না বললে আমরা কোনদিনই জানতে পারতাম না।

অনির্বাণ এবার একটু মৃদু হেসে তাকালেন রত্নমঞ্জুলার দিকে।

রত্নমঞ্জুলা মুখে হাসি টেনে সে হাসির উত্তর দিলেন।

অনির্বাণ চৌধুরী বললেন, কম বয়সের কথা বলতে গিয়ে মানুষ একটু বেশি প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে। অন্যের ভাল লাগা না লাগার দিকে খেয়াল থাকে না।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, আমার কাহিনীর পাতা থেকে চারটে বছরের খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে দাও। একটি কিশোরী মেয়েকে দিনের পর দিন আমি বড় হতে দেখলাম। তার চপলতা আস্তে আস্তে কমে এল। সে মনে মনে গভীর হল। এখন সে বর্ষা ঋতুতেও বসন্তের কথা ভেবে উতলা হয়। একুশ বছরের অনির্বাণ চৌধুরীর মনেও ওর ঐ মাধুরীর ঢেউ এসে লাগে।

সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করে প্রেসিডেন্সীতে ঢুকল সেঁজুতি। কিন্তু ইতিমধ্যে সে আর একটা বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠছিল। আশ্চর্য বলিষ্ঠ রেখার টান ছিল তার হাতে। রঙের পরিমিত ও কোমল ব্যবহারে তার যেন স্বাভাবিক দক্ষতা ফুটে উঠত। সে আর্টস্কুলে শিখত না, কিন্তু বাড়িতে আমার রঙ-তুলি নিয়েই কাজ শুরু করেছিল। প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী একদিন হঠাৎ আমার আঁকার ঘরে তার ছবি দেখে বিস্ময়ে থমকে গেলেন।

আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করলেন, এ বুকুনির নিজের হাতে আঁকা, তুমি ঠিক বলছ? কোন সাহায্য তুমি তাকে করনি?

আমি বললাম, প্রথম প্রথম সামান্য সাহায্য করেছি, কিন্তু এখনকার সব ছবিই ওর নিজের হাতের তৈরি, নিজের মাথা থেকে সাবজেক্টও ঠিক করেছে ও।

উনি শুনে বললেন, ওকে কলেজে পাঠিয়ে বোধহয় ভুলই করলাম অনির্বাণ। আর্টস্কুলে ঢুকিয়ে নিলেই পারতাম।

একটু থেমে বললেন, যা হবার হয়েছে, এখন তুমি ওর ছবি আঁকার দিকে একটু লক্ষ্য রেখো।

বেরিয়ে যাবার সময় ফিরে তাকিয়ে বললেন, যখন বাইরে কোথাও স্কেচ করতে যাবে তখন সঙ্গে

নিয়ে যেও বুক্‌নিকে।

সেঁজুতি কলেজ থেকে এলে ওকে আর তিনতলায় উঠতে না দিয়ে মাঝপথে আমার ঘরে ডেকে নিলাম। খবরটা শোনাতে ওর মুখে একটা খুশীর ভাব খেলা করে গেল।

শেষে যখন বললাম, এবার থেকে স্যারের অর্ডার হয়েছে, যখনই আমি স্কেচ করঁতে বাইরে বেরোব তখনই তুমি আমার সঙ্গী হবে। তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে স্কেচ করে বেড়াবে।

সেঁজুতি বলল, এটুকু তোমার বানানো।

বিশ্বাস কর সেঁজুতি।

ও চোখে-মুখে আশ্চর্য সুন্দর একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, সত্যি বলছ অনির্বাণদা, আমি আর তুমি একসঙ্গে স্কেচ করতে বেরোব?

আমিও মুখে হাসি ফুটিয়ে মাথা নাড়লাম।

ও ওপরে চলে গেলে আমি ভাবতে লাগলাম, কত পরিবর্তন হয়েছে সেঁজুতির স্বভাবের। কত গভীর আর মৃদুভাষী হয়েছে ও। কিশোরী সেঁজুতি হলে আমার কথা শুনেই বলে উঠত, তোমার সঙ্গে বেরোব না হাতী! আর যদি বেরোই তাহলে তুমি যখন মোষের স্কেচ করবে তখন আমি তোমার ছবি আঁকব। মিলিয়ে দেখো দুটো একই রকম হবে।

কিশোরী সেঁজুতি কিন্তু আমি স্কেচ করতে বেরোলেই ছায়ার মত নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সঙ্গে চলত। ওর মুখের ভাষা আর কাজের মিল ছিল না তখন।

আজকের তরুণী সেঁজুতির সঙ্গে কত তফাত সেদিনের কিশোরী কন্যাটির।

এরপর ঘন ঘনই আমরা স্কেচ করতে বাইরে বেরোতে লাগলাম।

তোমরা নিশ্চয়ই ধারণা করতে পার আমরা ছবির জগৎ থেকে ধীরে ধীরে পরস্পরের অন্তরের জগতেরও সন্ধান নিতে লাগলাম। এমনি করে একদিন দেখলাম, আমরা পরস্পরকে রেখার বাঁধনে ধরে রাখতে আনন্দ পাই।

আর ঠিক সেই সময় একটা ঘটনা ঘটল। আর্টস্কুলে যে মেয়েটি মডেলের কাজ করত সে কোন কারণে বাংলাদেশের বাইরে চলে গেল।

আমাদের স্কুলের ছেলেরা দারুণ অসুবিধায় পড়ল মডেলের অভাবে।

আমি আর সেঁজুতি ছবি আঁকছিলাম আমার ঘরে। একসময় কথায় কথায় স্কুলের মডেলের চলে যাওয়ার কথাটা উঠল।

ছবি আঁকতে আঁকতে হঠাৎ সেঁজুতি মুখ না তুলেই বলল, তুমিও মডেলের অভাবে অসুবিধায় পড়লে নাকি ?

বললাম, খুবই স্বাভাবিক। এখন ডিটেল নিয়েই কাজ হচ্ছিল। এ সময়ে ওর চলে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে মুশকিলের ব্যাপার বই কি।

ও একটুও সংকোচের সুর গলায় না ঢেলে স্পষ্ট করেই বলল, আমাকে দিয়ে কাজ চলবে তোমার?

আমি কথাটা শুনে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কি বলছে সেঁজুতি!

মুখে বললাম, তার মানে, আজকাল কিছু না ভেবেই কথাবার্তা বলছ নাকি ?

ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, অনির্বাণদা জীবনে তোমাকে আর কিছু দিতে না পারি অন্তত তোমার শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে সামান্য সাহায্য করতে পারলে অগাধ তৃপ্তি পাব জানবে।

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না।

শেষ পর্যন্ত ওর আগ্রহেই রাজী হতে হল। কিন্তু আমাদের কাজ চলল বড় সাবধানে আর সংগোপনে।

ও কলেজে যাবার নাম করে আমার ঘরে এসে ঢুকত। সেঁজুতির মা প্রায়ই দুপুরের দিকে বেড়াতে যেতেন বোনের বাড়ি। স্যার স্কুল ছুটির আগে নিতান্ত জরুরী পারিবারিক দরকার ছাড়া কোনদিন কোয়ার্টারে আসতেন না। আমি বাইরে স্কেচ করতে যাবার নাম করে চলে আসতাম আমার ঘরে।

আমি সেঁজুতির পূর্ণ দেহ-ভঙ্গিমা দেখবার আর আঁকবার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রায় নিরাবরণ

দেহটা আঁকতে গিয়ে এতটুকু বিকার আসত না আমার মনে। আমি মগ্ন হয়ে আমার কাজ করে যেতাম। বোধহয় সত্যিকারের কোন শিল্পীরই কাজের ভেতর ডুবে গেলে দেহ-বাসনার কথা মনে আসে না।

আমার আঁকা শেষ হলে ও একে একে ওর বেশবাস পরে নিত। আমি ওর দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যেতাম। একটুও বিকারের ছবি ফুটে উঠত না ওর মুখে। রবীন্দ্রনাথের বিজয়িনী কবিতাটি পড়েছিলাম। অপূর্ব নগ্ন সৌন্দর্যের অধিকারিণী বিকারহীন নারীর চরণে প্রেমের দেবতা মদন তূণশূন্য করে সমর্পণ করেছিল তার পূজা-উপচার।

আমার মনে হত, কেন জানি না ও নগ্ন সৌন্দর্য নিয়ে আমার সামনে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হত, ও যেন কবির সেই অচ্ছোদ সরসী নীরে স্নানরতা নগ্ন নারী, যার স্তনাগ্রচূড়ায় এসে পড়েছে প্রভাতের স্বর্ণ রবি-রশ্মি।

আবার মনে হত, ও যেন উর্বশী কবিতার সেই নারী, যে জায়া নয়, জননী নয়, কন্যাও নয়। সে শুধু নারী। অনন্তযৌবনা প্রকৃতি।

একদিন রবীন্দ্র-রচনাবলী থেকে ওকে বিজয়িনী আর উর্বশী কবিতা দুটি পড়ে শোনালাম। ও চিবুকে হাত রেখে শুনল। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ও কবিতার নায়িকাতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

পড়ার শেষে আমি কবিতা দুটি সম্বন্ধে আমার অনুভূতির কথা বলছিলাম।

ও এক সময় মুখ তুলে বলল, কলেজের প্রফেসার হলে তুমি খুব নাম করতে।

হেসে বললাম, একজন অশিক্ষিত শিল্পীকে এতখানি কমপ্লিমেন্ট দিও না, মাথা ঘুরে যাবে।

ও অমনি বলল, ভাগ্যিস প্রফেসার হও নি, তাহলে শিল্পী অনির্বাণ চৌধুরীকে দেশ হারাত।

ইতিমধ্যে কলকাতার কয়েকটা এগজিবিশনে আমার ছবি পুরস্কৃত হল। কয়েকখানা ছবি বিক্রি হল খুব চড়া দামে। প্যাস্টেলে আঁকা 'হারভেস্ট' ছবিখানা কিনলেন এক শিল্পরসিক ইংরাজ মহিলা।

ছবি বিক্রি হলে সেঁজুতির মুখখানা কেমন ভারী হয়ে উঠত। চোখ দুটো ওর ছল ছল করত। মনে হত যেন ওর একান্ত আপনার সঞ্চিত ধন অন্য কেউ অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।

স্যার আমার মাথায় হাত রেখে বলতেন, ছবি বিক্রি হওয়া ভাল। তোমার প্রতিভা এমনি করেই ছড়িয়ে পড়বে। সমঝদাররা শিল্পীর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু।

একদিন সেঁজুতির কি খেয়াল হল, ও বললে, এমন একখানা ছবি তুমি আঁকতে পার যাতে তোমার কাছ থেকে কোনদিন আমি হারিয়ে যেতে না পারি? ঐ ছবির ভেতর দিয়ে আমরা দুজনের কাছে চিরদিনের হয়ে থাকবে।

বললাম, এ মুহূর্তে তা কেমন করে বলি সেঁজুতি। আমাদের ইচ্ছা যদি গভীর হয় তাহলে দেখো একদিন আপনিই সে ছবি জন্ম নেবে।

একবার কলারসিকরা খুব উচ্ছ্বসিত হলেন আমার একটা ছবির সিরিজ প্রদর্শনীতে দেখে।

আমি কবিগুরুর 'সাগরিকা' কবিতাটি অবলম্বন করে কয়েকখানি ছবি এঁকেছিলাম। ঐ ছবির নায়িকা সেদিন কে ছিল তা নিশ্চয়ই তোমাদের বলে দিতে হবে না। শুধু নায়িকা নয়, নির্জন ঘরে মডেল হয়ে ও 'সাগরিকা' সিরিজের ছবিগুলিকে সার্থক করে তুলেছিল।

কথার ভেতর থামলেন অনির্বাণ চৌধুরী।

ধীরে ধীরে তাঁর গলায় বেজে উঠল সাগরিকা কবিতার কয়েক ছত্র। তিনি যেন মগ্ন হয়ে তাঁর আঁকা ছবির সঙ্গে কবিগুরুর কথাগুলো মিলিয়ে দেখছেন।

সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীত বাস
মাটির 'পরে কুটিলরেখা লুটিল চারিপাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।

অনির্বাণ বললেন, সদ্য স্নান করে এলো চুলে ও সেদিন সম্পূর্ণ নিরাবরণ আর নিরাভরণ দেহে আমার সামনে বসেছিল। সিক্ত কাপড়খানা লুটিয়ে পড়েছিল একপাশে। ওর মুখে ফুটে উঠেছিল স্বর্ণচাঁপার লাবণ্য। কি অপূর্ব আদিম রমণীর মহিমা সেদিন ওকে ঘিরে বিরাজ করছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমার শুধু মনে হয়েছিল ও সৃষ্টির সদ্যজাত প্রথম কুমারীকন্যা।

এমন সময়ে সেখানে এসে দাঁড়াল পরদেশী। তার কণ্ঠে বেজে উঠল আকুতি।

মকরচূড় মুকুটখানি পরি ললাট 'পরে
ধনুকবাণ ধরি দখিন করে
দাঁড়ানু রাজবেশী—
কহিনু, 'আমি এসেছি পরদেশী'।

কবিতাটি পড়ে পড়েই ছবি আঁকছিলাম। এই অংশে তুলি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমার অঙ্গে নেই রাজবেশ, হাতে নেই ধনুর্বাণ, মাথায় নেই মকরচূড় মুকুট, তাই এ হতভাগ্য আর তোমার পরদেশী হতে পারল না।

ও অমনি মিষ্টি হেসে বলল, তুমি আমার ভিখিরী রাজপুত্র।

আমি সাধারণত দরজা বন্ধ করেই ছবি আঁকতাম। আমাদের এই লুকোচুরির খবর জানত একটি মাত্র লোক। সে হল আমাদের বুড়ো দারোয়ান রামপ্রসাদদা। সে আমাকে আর তার বুকনিকে বড় ভালবাসত। আমাকে চৌধ্রী ভেইয়া বলে ডাকত।

একদিন ছবি আঁকতে বসেছি, সামনে বসেছে সাগরিকার মডেল, হঠাৎ দরজায় কে টোকা দিল। দারুণ চমকে উঠে দাঁড়াল সেঁজুতি। চোখে-মুখে ভয়ের সে কি অভিব্যক্তি ! ছড়ানো কাপড়খানা পলকে মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে চেপে ধরল বুকে। ও তখন দস্তুরমত কাঁপছিল।

আমি তখনও তুলি হাতে নিয়ে ওর দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে বসে আছি দেখে ও ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেল।

আমি ওর ঐ অবস্থার স্কেচ করতে করতে বললাম, ঠিক অমনি করে দাঁড়িয়ে থাক, চমৎকার ছবি ফুটেছে সাগরিকার!

স্কেচ সেরে ওর দিকে তাকিয়ে আবৃত্তি করলাম,

চমকি ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি শিলা-আসন ফেলে
শুধালে 'কেন এলে?'
কহিনু আমি, 'রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে।'

আবৃত্তি সেরে ওকে বললাম, ভয় নেই, বোস! তোমার এই ত্রাসের ছবিটুকু নেবার জন্যেই রামপ্রসাদদাকে টোকা দিতে বলেছিলাম।

ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দেখাচ্ছি বুড়োকে মজা। আমাকে এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল যে এখনও বুকের ধুকধুকুনি যায়নি।

বললাম, যে শাস্তি দেবে আমাকেই দাও। দূত চিরদিন অবধ্য। তাছাড়া বুড়ো টোকা দিয়েই পালিয়েছে ইস্কুলে। এ তল্লাটেই নেই।

কিছুদিন পরে একটি ঘটনা ঘটল। আমার সাগরিকা সিরিজের ছবি পুরস্কার পাবার পর একটা চাপা সমালোচনার গুঞ্জন আর্টস্কুলে। সে গুঞ্জন আর্টস্কুল ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। আমার আঁকা সাগরিকার সঙ্গে হুবহু একটা মিল নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে সেঁজুতির। এমন কি ঠোঁটের নীচের তিলটি পর্যন্ত।

প্রিন্সিপাল চক্রবর্তীর কানে কথাটা পৌঁছতেই তিনি বললেন, খুব স্বাভাবিক। বুকনিকে ও কত বছর ধরে দেখছে। এমন সুন্দর ক'টি ছবি আঁকতে গিয়ে ওর কথা অনির্বাণের মনে পড়াটা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়।

প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু মা হয়ে মেয়ের নামের রটনা হেসে উড়িয়ে

দিতে পারলেন না সুতপা দেবী। তিনি মেয়েকে এ বিষয়ে কোনকিছু বললেন না। আমি আড়ালে আবডালে থেকে সব শুনছিলাম। সেঁজুতির মুখখানা ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছিলাম।

একদিন সেঁজুতি কলেজে গেছে, আমি আর্টস্কুলে, দারোয়ান রামপ্রসাদদা আমাকে বাইরে ডেকে এনে বলল, মাইজী তোমাকে তলব দিয়েছে চৌধ্রী ভেইয়া।

গলাটা কেমন শুকিয়ে এল। বললাম, কি জন্যে জানো রামপ্রসাদদা?

ও আমি বলতে পারব না। তবে মুখখানা বহুৎ বেজার দেখলাম।

আমি কোয়ার্টারের দিকে যেতে যেতে ভাবলাম, এবার আমার শাস্তি নেবার পালা। পথের থেকে যাঁরা আমাকে কুড়িয়ে এনে দু'হাত ভরে এতকিছু দিলেন, আমি তাঁদের কি পুরস্কারই না দিয়েছি। তাঁদের একটি মাত্র আদরের মেয়ে তাঁদেরই বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজনেব কাছে আমারই জন্যে আজ অপমানিত হচ্ছে।

মনে মনে প্রস্তুত হলাম। যে শাস্তি সুতপা দেবী দেবেন মাথা পেতে বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নেব।

একথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে মনে দারুণ জোর পেলাম। সেই সঙ্গে একটা কথার উদয় হল মনে। আমি সেঁজুতির সঙ্গে কোনরকম ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি। সুযোগ এসেছিল, চরম সুযোগ, কিন্তু আমি কিংবা সেঁজুতি কেউই তাকে গ্রহণ করিনি।

মডেল দেখে ছবি আঁকা যদি পাপ হয় সে পাপ আমি করেছি। আর মনে তিলমাত্র বিকার না রেখে মডেলের কাজ করলে যদি পাপ হয় তাহলে সেঁজুতিকে সে পাপ স্পর্শ করেছে।

আমি তিন তলায় উঠে গিয়ে দেখলাম, সুতপা দেবী আমারই জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছেন।

কাছে গিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট গলায় বললাম, আমাকে ডেকেছেন মা?

সুতপা দেবী আমার মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, বোস বাবা কথা আছে।

আমি তাঁর পাশেই একটা আসনে বসে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সুতপা দেবী বললেন, এগজিবিশনে তোমার ছবিগুলোর খুবই প্রশংসা হয়েছে শুনে দেখতে গিয়েছিলাম।

বললাম, আপনার কেমন লাগল।

সুতবা দেবী বললেন, খুব সুন্দর কাজ হয়েছে তোমার।

একটু থেমে বললেন, সঙ্গে ছিলেন তোমার মাসীমা। উনি এমন একটা মন্তব্য করলেন যা শুনে মনটা বড় দমে গেল বাবা।

আমি বেশ জানি কথাটা কোনদিকে মোড় নিচ্ছে। তবু বললাম, ছবি ওঁর ভাল লাগেনি বুঝি?

উনি বললেন, সে রকম কোন মন্তব্য উনি করেননি। তবে ছোট্ট করে বললেন, এ যে বুক্নি বসে আছে দেখছি, তাও বে-আব্রু।

একটু থেমে বললেন, তুমি বুঝতে পারছ বাবা, মা হয়ে কথাটা আমার প্রাণে কতখানি বেজেছে।

বললাম, মিথ্যা বলে লাভ নেই মা, সেঁজুতির আদল আমার ছবিতে এসে গেছে। তবে শুধু একটা কথা আপনাকে বলব, অন্যায় কোন কাজ জ্ঞানত আমি করিনি।

সুতবা দেবী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, সে আমি জানি বাবা। তোমার মুখে সরল সুন্দর একটা ভাব দেখেছিলাম বলেই তোমাকে আমার বাড়িতে ঠাঁই দিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করিনি।

বললাম, আপনাদের ঋণ এ জীবনে শোধ হবার নয়।

সুতপা দেবী আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

এক সময় বললেন, বুক্নির বিয়ের প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন ওর মেসো। এ সময় একটা মিছে বদনাম রটলে বিয়ে ভেঙে যেতে কতক্ষণ।

বললাম, আমারই ভুল হয়েছে মা। এখন যাতে ওগুলো আর অন্য কোন এগজিবিশানে না যায় তার ব্যবস্থা করব।

সুতপা দেবী বললেন, বড় স্নেহ পড়ে গেছে বাবা তোমার ওপর, আজ এতগুলো কথা বলতে তাই

কষ্ট পাচ্ছি। কিছু যেন মনে কোরো না।

বললাম, আপনাদের আমি লজ্জায় ফেললাম, এ জন্যে নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে।

সুতপা দেবী বললেন, না না, ওকথা মনে করছ কেন? একটা ঘটনা তোমার অজানতে হয়ে গেছে, তুমি সেটা জানতে পেরে সাবধান হলে, ব্যস। এতে অত সংকোচের কি আছে!

বললাম, আমি এখন ক্লাসে যাই মা।

আমি উঠে দাঁড়াতেই উনি বললেন, হ্যাঁ একটা কথা, বুকনির বিয়ের খবরটা এখুনি কাউকে দিও না যেন। একেবারে পাকা হয়ে গেলে তখন তো সবাই জানতে পারবে।

মাথা নেড়ে জানালাম যে তাঁর কথা প্রতিপালিত হবে।

উনি এবার বললেন, ছেলেটি ফরেস্টে কাজ করে। এখন রেঞ্জার, একদিন হয়তো কনজারভেটারও হতে পারবে।

বললাম, খুব সুখবর, সেঁজুতির কাছ থেকে খাবার আদায় করতে হবে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন সুতপা দেবী, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তোমরা ভাইবোনের মত, এ বিয়েতে আনন্দ আমোদ তো তোমরা করবেই।

আমি সেদিন মুখে হাসি টেনে বেরিয়ে এলাম সুতপা দেবীর ঘর থেকে। নিজের ঘরে ফিরে এসে চুপচাপ বসে রইলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাল। আলো জ্বালতে ইচ্ছে হল না। জানালা দিয়ে অন্ধকার ময়দান আর আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এক সময় বার বার কেন জানি না মনে হতে লাগল সেঁজুতি সেই প্রথম রাতের মত তার অগাধ কৌতূহল নিয়ে অপরিচিতকে দেখবার জন্যে ঘরে এসে ঢুকবে, আর টুক করে সুইচ টিপে আলোয় আলোয় ভরিয়ে দেবে অন্ধকার ঘর।

আমার আশা পূর্ণ করবার জন্যে আমার আঁধার ঘরে দীপ জ্বালতে কেউ এল না। এমনকি রাতে যখন খাবার ডাক পড়ল আর আমি ওকে দেখবার আকুল ইচ্ছা নিয়ে ওপরে গেলাম, তখনও ওকে প্রতিদিনের মত খাবার টেবিলে দেখতে পেলাম না।

খাবার পরে নেমে আসছি, সিঁড়িতে দেখা হল রামপ্রসাদদার সঙ্গে। তার মুখেই শুনলাম, ক'দিনের জন্যে ওকে মাসীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে পাকা দেখার কাজ হয়ে গেলে ফিরে আসবে এখানে।

সে রাতে কেন জানি না আমি ঘুমোতে পারিনি। চোখ দুটো বন্ধ করে শুধু ছবি দেখেছিলাম, এ বাড়িতে আসার প্রথম দিনটি থেকে সেঁজুতির আজকের অনুপস্থিতি পর্যন্ত। ছবিগুলো এলোমেলো আসছিল। আকাশের পটে ভেঙে-চুরে যাওয়া মেঘ মিছিলের মত।

ভোরের পাখি দক্ষিণের আমগাছের ফাঁকে ডেকে উঠতেই আমি উঠে পড়লাম। ওদিকে তাকিয়ে পাখিটাকে খুঁজতে গিয়ে দেখলাম, ডাল-পাতার ফাঁকে একটি নীড় রচনা করা হয়েছে। সেই নীড়ে বসে একটা পাখি ভোরের বাতাসে করুণ সুর ছড়াচ্ছে।

মনে কেন জানি না এই ভাবনা এল, সেঁজুতি বিবাহিত জীবনে স্বামীকে তার ভালবাসায় ভরিয়ে দিতে পারবে তো!

পরক্ষণেই মনে মনে একটা প্রার্থনা উচ্চারিত হল, ও যেন সুখী হয়। আমি ওর ভালবাসার অংশীদার হতে চাই না। সবটুকু ভালবাসা দিয়ে ও তার নতুন জীবন শুরু করুক। ওর মনে যদি কিছু স্থান থেকে থাকে আর কারো জন্যে, সে নিভৃত স্থানটুকু ওর স্মৃতি থেকে সরে যাক।

আমার ভোরের এই প্রার্থনা দিয়ে রাতের অশান্ত আহত মনটাকে শান্ত সুস্থ করে তুললাম।

জলখাবার খেতে গিয়ে শুনলাম, প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী আর সুতপাদেবী মধ্যাহ্ন-আহার এখানে করবেন না।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় সুতপাদেবী আমার ঘরে এসে বললেন, অনির্বাণ, আজ তুমি একা খেয়ে নিও বাবা, সন্ধের আগে ফিরতে পারব না।

ওঁরা চলে গেলেন। আমি বুঝতে পারলাম সেঁজুতির বিয়ের আগের কোন একটি অনুষ্ঠান হতে

চলেছে।

মনে মনে দুঃখ পেলাম। আমার সাগরিকা সিরিজের ছবিগুলো নিয়ে কানা-ঘুষো না হলে সেঁজুতির বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো হয়তো এখানেই হত।

কিন্তু কি আশ্চর্য মানুষ এঁরা। যে-কোন মুহূর্তে আমাকে সরিয়ে দিতে পারতেন তাঁদের কোয়ার্টার থেকে। অকৃতজ্ঞ বলে মুখোমুখি ধিক্কারও দিতে পারতেন, কিন্তু তার কিছুই করলেন না। বরং সুতপাদেবী অত্যন্ত স্নেহের সুরে কথা বললেন।

পরিপূর্ণ একটা কৃতজ্ঞতাবোধ আমার মনকে মুহূর্তে ভরে তুলল।

ওরা চলে গেলে রামপ্রসাদদা এসে ঢুকল আমার ঘরে।

বলল, চৌধ্রী ভেইয়া বুক্‌নি দিদিমণি বড় কাঁদতেছিল।

বললাম, তুমি জানলে কি করে রামপ্রসাদদা?

ও বলল, দিদিমণিকে আমি তো মাসীর বাড়িতে রেখে আইলাম।

বললাম, তোমার দিদিমণি কি তার পাকা দেখার কথা আগে জানত?

নেহী নেহী, কিছু জানত নাই। মাসীর বাড়িতে যাবার আগে মাইজীর কাছ থেকে শুনল।

বললাম, তোমাকে কিছু বলেছিল?

কি আর বলব চৌধ্রী ভেইয়া, শুধু বলল, আমি মাসীর বাড়ি থেকে পালায়ে আসব।

রামপ্রসাদদা তাড়াতাড়ি চলে গেল। স্কুলে ঘণ্টা দিতে হবে।

যাবার সময় শুধু বলে গেল, বুক্‌নি দিদিমণি দুঃখ পেলে হামার বুকখানা ফেটে যায় ভেইয়া।

ও চলে গেলে আবার ভাবতে বসলাম, সেঁজুতি তাহলে ব্যাপারটা জানত না। এখন আমার দিক থেকে করণীয় কি আছে? ভাবলাম, কিন্তু কোন একটা কূলকিনারা পেলাম না। এলোমেলো ভাবনাগুলো কেবল বেড়েই চলল।

সন্ধ্যার পর ওঁরা ফিরে এলেন। দেখলাম, সেঁজুতিও এসেছে।

সে রাতে একসঙ্গে সবাই খেতে বসলাম। সেঁজুতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে একটুখানি খেয়ে উঠে পড়তেই আমি হঠাৎ বললাম, কি হল তোমার, খিদে নেই বুঝি?

ও একটুখানি ম্লান হেসে চলে গেল। সুতপাদেবী বললেন, আজ পাকা দেখা হয়ে গেল বাবা। ওঁদের খুব পছন্দ হয়েছে আমার বুক্‌নিকে।

হেসে বললাম, তাই বোধহয় ও আনন্দে আর খেতে পারল না।

ওঁরাও আমার কথা শুনে হাসতে লাগলেন।

সেঁজুতি তখনও বেসিন ছেড়ে যায়নি। নিশ্চয়ই আমার কথাগুলো শুনছিল। ভারী ইচ্ছে করছিল ওর মনের অবস্থাটা জানতে।

সেঁজুতির বিয়ের আগের দিন থেকে আমি সামনের তোরণ আর বিয়ের মণ্ডপ সাজাচ্ছিলাম। প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী এটুকু দায়িত্ব আমাকেই দিয়েছিলেন।

ও এক সময় আমার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল. চমৎকার ভাগ্যের খেলা। যার আজকে কোন কাজ করারই কথা নয়, সে কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেছে। দাও, ভাল করে সাজিয়ে দাও। বনবাসে দেবার আগে উৎসবের আয়োজনটা সম্পূর্ণ হোক তোমার হাতে।

বললাম, এমন করে কথা বললে আমার পক্ষে মণ্ডপ সাজানো যে অসম্ভব হয়ে উঠবে সেঁজুতি।

ও অমনি বলল, আগুন লাগিয়ে দেবো তোমার মণ্ডপে। অরণ্যকাণ্ডের আগে লঙ্কাকাণ্ডটা হয়ে যাক।

হেসে বললাম, মনে হচ্ছে পছন্দ হয়েছে আমার তোরণের কাজটা।

ও বলল, তা হয়েছে। আমাকে যে ভালবাসে সেকি কোনদিন হেলাফেলা করে কাজ করতে পারে।

আমি বললাম, তুমি খুব সুখী হবে সেঁজুতি।

ঝাঁঝিয়ে উঠে ও বলল, মা-বাবাদের মত ঐসব কথা তোমার মুখে শুনলে আমি একেবারে সইতে

পারি না।

তুমি অসুখী হও, এ কথাই কি আমার মুখ থেকে শুনতে চাও?

কোন কথাই আমি শুনতে চাই না তোমার কাছ থেকে। দোহাই তোমার, আমাকে চুপচাপ চলে যেতে দাও।

ও আর কোন কথা না বলে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ফিরে বলল, দেখ, বিয়েতে সাতপাক ঘোরাবার সময় দয়া করে তুমি যেন পিঁড়িটা ধোর না।

হেসে বললাম, তোমাকে সবার সামনে তুলে ধরার ঐ তো আমার একটি মাত্র সুযোগ। তাও না দিলে শুধু দর্শকের আসন থেকেই তাকিয়ে থাকতে হবে।

ও বলল, এসো, মালাবদলের সময় তোমার গলাতেই পরিয়ে দেব মালা, তারপর যা হয় হোক।

বিয়ের লগ্নে সত্যিই পিঁড়ি ধরার জন্যে ডাক পড়েছিল আমার। হাতে চোট লেগেছে বলে এড়িয়ে গেলাম আমি। হয়তো কিছুই হত না, তবু মনে হল, বিশ্বাস নেই ওকে। যদি সেঁজুতি হঠাৎ কিশোরী বুকনি হয়ে যায় তাহলে নির্ঘাৎ মালাটা আমার গলাতেই পরিয়ে দেবে।

বিয়ের পর ও চলে গেল ফরেস্টে। যাবার আগে ওর আঁকা ছবিগুলো নিয়ে যাবার অছিলায় ঢুকল এসে আমার ঘরে।

দু'একটা ছবি হাতে তুলে নিয়ে বলল, শুধু বনেই আমি যাচ্ছি না অনির্বাণদা, একটা বাঘের গুহায় সবাই মিলে আমাকে ফেলে দিলে।

অত্যন্ত আহত হয়ে বললাম, এ কথা কেন বলছ সেঁজুতি?

ও কান্নাটাকে শক্ত তুষার করে বুকে চেপে রেখে বলল, জানো অনির্বাণদা, বাসরঘরে গভীর রাতে ওর বন্ধু এসে ওকে ড্রিঙ্ক করিয়ে গেছে। আমাকে খাওয়ানোর জন্যে দুজনের সে কি ধস্তাধস্তি! সমস্ত শরীর আমার সারারাত বিষিয়ে উঠেছে।

মাথা নীচু করে বসে রইলাম।

ও বলল, জীবনে একথা যেন তৃতীয়জন না জানতে পারে অনির্বাণদা। ভাগ্য নিয়ে এবার আমার সত্যিকারের জুয়াখেলা শুরু হল।

ও চলে গেল। আমার বুকখানাকে কে যেন টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিয়ে গেল।

দু'বছর পরের কথা। আর্টস্কুলের পড়া শেষ হয়েছে, কিন্তু কাজ জোটাতে পারিনি কিছু। এদিকে প্রিন্সিপাল চক্রবর্তী সদ্য অবসর নিয়েছেন। তাঁরা সম্প্রতি চলে গেছেন হুগলী জেলায় নিজের বাড়িতে। অবসর দিনগুলি কাটাবেন সেখানে।

ওঁদের চলে যাবার পর আমি আবার পথে নামলাম। ফাইন আর্টসের ছেলের চাকরি নেই। ছবি বেচে আমাদের দেশে আর যা হোক পেট চালানো যায় না।

কিছুদিন বন্ধুবান্ধবের এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে কাটালাম। দু'একটা ছবির টিউশনি করলাম। কিন্তু পেট ভরে না, মন তো নয়ই।

ঠিক এমনি দিনে রামপ্রসাদদার সঙ্গে দেখা।

আমাকে স্কুলের গেটের সামনে দেখেই বলে উঠল, আরে চৌধ্রী ভেইয়া, তোমাকে কত রোজ ঢুঁড়ছি। বুক্‌নি দিদিমণি তুমার লিয়ে একটা লেফাফা ভেজিয়েছে।

সেঁজুতি আমাকে চিঠি দিয়েছে রামপ্রসাদদার ঠিকানায়। আমি যেন একটা আনন্দের রঙীন পাখি হাতের মুঠোয় ধরে ফেললাম।

রামপ্রসাদদার ঘরে বসে বসেই চিঠিখানা পড়তে লাগলাম।

অনির্বাণদা, একবার এসো আমার কাছে, কতদিন তোমাকে দেখিনি। যদি আমাকে দেখার ইচ্ছে তোমার এতদিনে মিটে গিয়ে থাকে তাহলেও অন্তত এসো একবার এখানে। এই গভীর বনে আশ্চর্য এক শিল্পী তাঁর শিল্পের সম্ভার সাজিয়ে রেখেছেন। শুধু পৃথিবীর কোন শিল্পীর কপি করে নেবার

অপেক্ষায়।

আমি কেমন আছি জানতে চেও না। ওই অরণ্য আর পাহাড়ের ভেতর তোমার সেঁজুতি চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে।

বাবা-মায়ের সঙ্গে যতটুকু যোগাযোগ না রাখলে নয় ততটুকুই আছে। আমি বুঝতে পারি তাঁরা একটিমাত্র মেয়ের পরিণতি দেখে অনুতাপ করছেন, কিন্তু আর কিই বা তাঁরা করতে পারেন!

রামপ্রসাদদাকে কতদিন দেখিনি। তোমার কাছে সে কি আমার কথা বলে?

কত দুপুর কত বিকেল কাঁধে ঝোলা নিয়ে স্কেচ করে ঘুরে বেড়িয়েছি আমরা। কত কথা দুজনে দুজনকে বলেছি, সে কি হারিয়ে গেছে হাওয়ায়? সত্যি বল না অনির্বাণদা? আচ্ছা তোমার সাগরিকা সিরিজের ছবিগুলো আর এগজিবিশানে দাও না? এখন তো আর তোমার সাগরিকার দুর্নামের ভাবনা নেই।

এখানে এলে সঙ্গে করে ওগুলো আনবে কি? দেখতে দারুণ ইচ্ছে করে। তাছাড়া জান, এক একদিন বুকটা কেমন করে ওঠে। মনে পড়ে যায় সাগরিকা সিরিজের ছবি আঁকার সময়ে রামপ্রসাদদার সেই ঘরের দরজায় টোকা দেবার কথা। সেদিনের সেই ভয় আজকের স্মৃতিতে কত মধুর।

অনেক কথা লিখে ফেললাম। জানি না তুমি আসবে কিনা। আর এও জানি না, এ চিঠি তুমি পাবে কিনা!

তোমার সাগরিকা।

চিঠির তলায় সিংভূমে ওদের ফরেস্ট বাংলোয় কেমন করে যেতে হবে তার নির্দেশ দেওয়া আছে। কবে কোন গাড়িতে যাচ্ছি তা জানাতে বলেছে।

বেলা তিনটে নাগাদ এক নির্দিষ্ট দিনে গাড়ি পৌঁছল গুয়া স্টেশনে। সেঁজুতির নির্দেশ অনুযায়ী আমি ঐ স্টেশনে নেমে পড়লাম। আমার সঙ্গে কোন বেডিং ছিল না, সাধারণ একটা সুটকেস হাতে নিয়েই নেমে পড়লাম।

ছোট্ট ছিমছাম স্টেশন। পাহাড় আর শালের বন। একটু দূরে গুয়ার ছোট্ট টাউন দেখা যাচ্ছে। ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টীলের লৌহআকর এখানকার পাহাড় ডিনামাইটের সাহায্যে ফাটিয়ে সংগ্রহ করা হয়। সেগুলির পাথর আর লোহা যন্ত্রের সাহায্যে আলাদা করে চালান দেওয়া হয় ট্রেন যোগে।

এসব কথা আমি আসার সময়ে জেনে সেছিলাম। এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে মোটামুটি দেখে নিলাম জায়গাটা।

চেকারের হাতে টিকিট দিয়ে বেরিয়ে আসামাত্র ঝপ করে আমার হাতটা কে ধরে ফেলল।

তাকিয়ে দেখি সেঁজুতি। চেনাই যায় না। অনেক ভারী, কিন্তু অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। ও আনন্দে কথা বলতে পারছে না। আমার অবস্থাও তাই। ও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চাঁদামাছের মত চক চক করছে দুটো চোখ।

কতক্ষণ পরে ও বলল, তুমি সত্যিই এলে অনির্বাণদা!

বললাম, তুমি ডেকেছ, না এসে পারলাম কই বল।

হঠাৎ আর এক কাণ্ড। এক ভদ্রলোক আমার হাত থেকে সুটকেসটা টেনে নেবার চেষ্টা করতেই আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু অবাক হলাম। পরমুহূর্তেই মনে হল ইনি নিশ্চয়ই সেঁজুতির স্বামী। বিয়ের রাতে আমি ভদ্রলোককে ভাল করে দেখিনি। সুটকেসটা পায়ের কাছে রেখে হাত তুলে নমস্কার করে বললাম, চিনতে পারিনি। সেই একটিবার মাত্র আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

ভদ্রলোক আমায় প্রতি-নমস্কার না করে হ্যান্ডসেকের জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। হাতে জোর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমার সুটকেসটা তুলে নিয়ে এগিয়ে চললেন। আমি বাধা দিতে গেলাম, কিন্তু ততক্ষণে উনি জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে গেছেন।

সেঁজুতি আমার হাত ধরে পাশাপাশি চলতে চলতে বলল, তোমাকে নিয়ে আর পারা যাবে না অনির্বাণদা। উনি সুজন সিং। মিঃ ভট্চায কুপে গেছেন। উনি আমাদের পারিবারিক বন্ধু। হাসতে হাসতে

বলল, বন্য পরিবারের বুনো বাইসন।

বললাম, ভদ্রলোকের রঙটা তো বাইসনের মত বলে মনে হল না।

ও বলল, রঙে নয় মেজাজে। তবে অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। দিনের পর দিন ওর মেজাজ আর চরিত্রের যত পরিচয় পাচ্ছি ততই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

আমি একটু জোরে কথা বলতে যেতেই ও মুখে আঙুল রেখে আমাকে বারণ করল।

আস্তে বলল, ও বাংলা জানে। বলতেও পারে অনর্গল। সামান্য একটু টান ছাড়া ত্রুটি কিছু নেই। আর দু'দুটো বছর ধরে আমিই ওকে শিখিয়েছি।

ব্যস, ঐ পর্যন্ত কথা। আমরা একটা জিপের কাছে এসে পড়লাম।

সুজন সিং জিপে বসে হাত নাড়ছে।

আমি আর সেঁজুতি পেছনের সীটে বসামাত্র গর্জন করে লাফিয়ে উঠল জিপখানা। সুজন সিং একটা ন্যাড়া পাহাড়ের দিকে জিপটা চালিয়ে দিলে।

দু'চার মিনিটের ভেতর জিপ পাহাড়টাকে বেষ্টন করে বনের সীমানায় ঢুকে পড়ল।

আমি খোলা জিপে বসে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। হাতখানা কিন্তু বন্দী হয়ে রইল সেঁজুতির হাতের মুঠোয়।

বড় বড় কয়েকটা গাছের জটলা পেরিয়ে আসার সময় আমি গাছের ডালে পাখির ডাক শুনতে পেলাম। ধীরে ধীরে বন ঘন হয়ে উঠল। সূর্যের হলুদ আলো পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে বড় গাছগাছালির মগডালগুলোকে ছুঁয়েছিল।

শীতের বন-পাহাড়ে শেষসূর্যের আলো কেমন নিস্তেজ আর মায়াময়।

আমাদের জিপখানা একটা ছোট্ট ঝাঁকুনি দিয়ে বিপুল গর্জন করতে করতে পাহাড় ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগল। গাড়ি যত উপরে উঠতে লাগল নীচে ততখানি গিরিখাদ সৃষ্টি হল। বড় বড় গাছগুলো এখন নীচে নেমে যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে নতুন গাছের সারি। শেষবেলার আলোয় তেজ কমে এলেও ওপরে উঠে আসার জন্যে চারদিক বেশ দৃশ্যমান হয়ে উঠছিল।

আমি হঠাৎ একটা নদী দেখতে পেলাম। উপত্যকার উপর দিয়ে চলেছিল। আলো পড়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল ওর বহমান জলধারা।

গাড়ি ঘুরতে ঘুরতে একসময় নেমে এল ঐ উপত্যকায়। উপল-ছড়ানো নদী পার হয়ে আবার ওপারের বন-পাহাড়ের ভেতর ঢুকে পড়ল। এখন বন অনেক নিবিড়। সূর্যের আলো একটুও দেখা যাচ্ছিল না। তবে গোধূলির আভার মত একটা আলো তখনও পথের ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই আলোয় পথ দেখে গাড়ি ওঠা-নামা করছিল ওপরে আর নীচে।

আমি সেঁজুতির হাতটা চেপে ধরে নিজের আনন্দ আর তৃপ্তির গভীর অনুভূতিটুকু জানাচ্ছিলাম। এতক্ষণ আমাদের ভেতর কোন কথাই প্রায় হয়নি।

এবার বন আরও গভীর হল। হঠাৎ করে যেন চোখের সামনে থেকে ম্লান আলোটুকু কেউ নিঃশেষে মুছে নিল। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল আলোয় ঝলসে ওঠা তলোয়ারের মত জিপের হেডলাইট বনের অন্ধকারের বুক চিরে জ্বলে উঠল।

হেসে বললাম, দু-এক ঘণ্টার ভেতরে এই বন-পাহাড় আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

সেঁজুতিও হাসল। বলল, যাদু আছে এ পাহাড়ে।

হঠাৎ সুজন সিং মুখখানা পাশে ফিরিয়ে বলল, আর বললে না বহুরানী, মধু আছে সারান্দা বনে।

সেঁজুতি আমার হাতে জোরে একটা চাপ দিয়ে বলল, দারুণ মজার মজার মন্তব্য করতে পারে আমাদের এই বন্ধুটি !

বললাম, সিং সাহেব, আপনার মুখে এমন নিখুঁত বাংলা শুনে আমি সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

সুজন সিং বলল, সব কিছু বহুরানীর কেরামতি। ও-ই তো আমাকে বাংলা বোলতে শিখায়েছে।

বললাম, এতে কিন্তু আপনার গুরুর কৃতিত্ব কম। যিনি শিখেছেন তাঁর ধৈর্য আর নিষ্ঠার বেশী প্রশংসা করতে হয়।

হেসে বলল সুজন সিং, গুরুকে সব সময়ে বড় মান দিতে হয় চৌধুরীবাবু।

বললাম, আপনার মত এমন বিনয়ী ছাত্র পেলে যে-কোন গুরু পরম আগ্রহে শেখাতে লেগে.যাবে।

সেঁজুতি বলল, বিনয়ী বটে। মেজাজে মেদিনী কেঁপে উঠবে। একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'বর্তন' কথাটা বাংলাতে কি হবে বহুরানী?

আমি বললাম, 'বাসন'।

ও অমনি ক্ষেপে উঠে বলল, আমাকে ভুল শিখলাচ্ছ। আমি তোমার ভাষা জানি না বলে আমাকে বুড়বক বানাচ্ছ। 'বর্তন' আর 'বাইসন' এক চিজ হল?

আমি তো তাজ্জব। যত বলি, বাসন, বাসন, ও তত ক্ষেপে উঠে বলে, বাইসন, বাইসন। তুমি আমাকে লিয়ে খেলা করছ বহুরানী। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে আমি বাইসন দেখাব। 'বর্তন' আর বাইসন তখন মিলায়ে দেখবে।

ঐ ভুলটা ওর ভাঙাতে আমার বেশ সময় লেগেছিল।

সুজন সিং বলল, সে আমার বহুৎ গোস্তাকি হয়েছিল বহুরানী।

বললাম, শিখতে গেলে এমন অনেক দুর্ঘটনাই ঘটে থাকে। জবরদস্ত ছাত্র পি ইউ টি-র 'পুট' উচ্চারণ শুনলে বি ইউ টি-র উচ্চারণ করতে গিয়ে সহজে 'বাট' বলবে না। বার বার 'বুট'ই বলবে। তাকে যদি জোর করে বলা হয়, বি ইউ টি 'বাট'ই হয়, তখন সে পি ইউ টি-কে অবশ্যই 'পাট' বলতে চাইবে।

হেসে উঠল সুজন সিং দারুণ জোরে। আর অন্ধকার গাছ থেকে কি একটা পাখি ভয় পেয়ে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে গেল।

বললাম, একটা পাখিকে আমরা বাসা-ছাড়া করলাম এ রাতে।

সুজন সিং বলল, ওটা সিল্লী পাখি আছে, রাতে-ভিতে ঘুরপাক খাবার অভ্যেস আছে ওর। জোছন রাতে ওদের ডাক শুনলে কেমন উদাস উদাস লাগে।

সেঁজুতি বলল, তোমারও রাতে ঘুরপাক খাবার অভ্যেস আছে।

সুজন সিং অমনি বলল, রাতে আমার হাঁক শুনলে দিলটা কি কারো উদাস হয়ে যায় বহুরানী?

সেঁজুতি বলল, তোমার হাঁক শুনলে উদাস হয় না কারো দিল, বরং ভয়ে গুর্ গুর্ করে ওঠে।

আবার সেই বন কাঁপিয়ে ঠা-ঠা হাসি সুজন সিংয়ের।

এবারও একঝাঁক পাখি বাসা-ছাড়া হল। পাখার ঝাপটে মনে হল, এরা সংখ্যায় বেশ ভারী।

বললাম, এ কোন্ পাখি সিং সাহেব?

সঙ্গে সঙ্গে সুজন সিং বলল, সারোময়নার ঝাঁক আছে।

আমি বললাম, পাখি না দেখে চিনলেন কি করে?

সেঁজুতি বলল, দারুণ অভিজ্ঞতা ওর। পাখা টানার আওয়াজে ও পাখির গাঁই-গোত্র সব নিখুঁত বলে দিতে পারে। আমরা রাতে টর্চ ফেলে ওর কথার সত্যতা অনেক সময় যাচাই করে নিয়েছি। তাছাড়া একসঙ্গে হয়তো বসে আছি, মাথার ওপর দিয়ে সাঁ-সাঁ আওয়াজ তুলে পাখি উড়ে গেল, ও না দেখে যা বলল, আমরা চোখ মেলে দেখলাম, ঠিক তাই।

সুজন সিং বলল, চিড়িয়া আর জানোয়ারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট দোস্তি আছে। ওদের চলাফেরা, ওড়া নড়া সব আমার জানা হইয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ হয়ে আর একটা মানুষকে ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না চৌধুরীবাবু।

বললাম, যে জীবের বুদ্ধি যত বেশি তার মনটাকে লুকিয়ে রাখার ক্ষমতাও তত বেশি। তাই পশু পাখির চেয়ে মানুষের মনের খবর পাওয়া এত শক্ত।

সুজন সিং বলল, হয়তো আপনার কথাটাই ঠিক আছে।

একটু থেমে হঠাৎ বলে উঠল, জানেন চৌধুরীবাবু, এক এক সময় মনে হয় মানুষের ডেরা ছেড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে শেষ জীবনটা কাটায়ে দি।

গাড়ি এসে দাঁড়াল কুমাডির বাংলোতে। একটা লোক হ্যাজাক আলো হাতে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। সুজন সিং কিন্তু নামল না।

ভদ্রতা করে বললাম, বসে রইলেন কেন, নেমে আসুন।

সুজন সিং বলল, এখন তো আছেন কিছু দিন, রোজ আমার মুখ দেখতে দেখতে বহুরানীর মত ব্যাজার হইয়ে যাবেন।

ফোঁস করে উঠল সেঁজুতি, আমি বুঝি তোমাকে দেখলে বিরক্ত হই?

সুজন সিং হেসে বলল, গুস্তাকি মাফ কিজিয়ে।

একটু থেমে বলল, সরি, অপরাধ নিও না!

ও আমাকে উদ্দেশ করে ওর ডান হাতখানা কপালের কাছ বরাবর নিয়ে গিয়ে একটু হাসল।

আমি অনুরূপভাবে হাত তুললাম।

ও সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে গাড়ির মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে গেল। একটা জানোয়ার যেন প্রাণফাটা আর্তনাদ করতে করতে গভীর বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে মিঃ ভট্চায সম্বন্ধে অনুচ্চ গলায় কি যেন জিজ্ঞেস করল সেঁজুতি। সবটুকু বোঝা গেল না। তবে লোকটির স্পষ্ট উত্তর থেকে জানা গেল, রেঞ্জার সাহেব আজ দিনে কাজ শেষ করতে না পারলে থলকোবাদের বাংলোতে থেকে যাবেন।

বুঝলাম, মিঃ ভট্চাযের আজ রাতে এ বাংলোয় ফেরা অনিশ্চিত।

শীত এখানে প্রবল। একে পাহাড় তার ওপর অরণ্য বহু জায়গায় বদ্ধ করে রাখে সূর্যালোক প্রবেশের পথ।

সেঁজুতি বলল, এসো, আমার নরকবাসটা দেখে দু'চোখ সার্থক কর।

বললাম, এমন করে অতিথি আপ্যায়ন করলে কিন্তু এখান থেকেই ফিরে যেতে হবে।

ও হেসে বলল, এটা মহাভারতের চক্রব্যূহ। এখানে অভিমন্যুর প্রবেশের পথ আছে, কিন্তু বেরিয়ে যাবার পথ নেই।

বললাম, তোমার হাতে যখন পড়েছি তখন যেখানে নিয়ে যাবে আপাতত সেখানেই যেতে হবে।

আলো দেখিয়ে লোকটা পায়ে পায়ে এগোতে লাগল, আর সেঁজুতির সঙ্গে আমি একটা মোরাম ফেলা প্রান্তর পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। বাঁদিকে লম্বা ইউক্যালিপ্টাস গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাজাকের আলোয় দীর্ঘ সাদা সাদা কাণ্ডগুলো অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

এবার বাংলো বাড়িটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। খড়ে ছাওয়া কাঠের সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো একখানা চমৎকার বাড়ি। বাংলোর সামনে এসে দেখলাম, চারদিক ঘিরে মরশুমী ফুলের বেড। আলোয় হরেক রঙ ঝলমল করে উঠল।

আমরা বারান্দা পেরিয়ে একখানা বড় হল-ঘরে ঢুকে পড়লাম।

চমৎকার সাজানো। ছবি-ফুল-পাতায় ঘরটি দারুণ রকম আকর্ষণীয়। দেখলাম, ঘরের সব জায়গাতেই সেঁজুতির নিপুণ হাতের কারিকুরি।

ও আমাকে বসতে বলে ভেতরে চলে গেল।

আমি সারা ঘর খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

কাঠ কেটে বিরাট হাতীর দাঁতের মত একটি ধবধবে সাদা বসার আসন করা হয়েছে। তার গোড়ার কিছুটা অংশে ডানলোপিলোর ওপর টুকটুকে লাল কভার দেওয়া। সাদার ওপর সেই লালের কাজটুকু অত্যন্ত উজ্জ্বল আর সুন্দর মানিয়েছে।

এদিকে দেওয়ালের গায়ে একটি শুকনো বিশেষ ভঙ্গির ডাল আটকানো। তার সরু সরু শাখাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে পিঙ্ক রঙের আঁকা ফুলগুলো বেশ জীবন্ত মনে হচ্ছে।

গাছের লম্বা কালো একটি কাণ্ড ঘরের কোণে টিপয়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপর জাপানী পোর্সিলেনের একটি সাদা পাত্র বসানো। ঐ পাত্রটিতে মরশুমী হলিহক, সুইট সুলতান আর পিটুনিয়া

বিশেষ ভঙ্গিতে সাজানো। মাঝে মাঝে বুনো কতগুলো সবুজ পাতা গুঁজে দেওয়া হয়েছে। একটি চমৎকাব ইকাবানার পরিকল্পনা।

ও ট্রেতে কফি নিয়ে এল।

বলল, রাত হয়েছে, খাবারও রেডী। এখন শীতের বন পেরিয়ে এসেছ, একটু গরম কফি খেয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নাও।

কফির কাপটা ট্রে থেকে তুলে নিয়ে বললাম, এতক্ষণ তোমার নরক-নিবাসটা দু'চোখ ভরে দেখে নিলাম।

ও কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, নরকের বাইরের সাজসজ্জাটা স্বর্গের চেয়ে অনেক বেশি চকচকে। তাই মানুষের আকর্ষণ এদিকেই বেশি।

হঠাৎ বললাম, তুমি কি এ পরিবেশের সঙ্গে কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছ না?

ও মাথা নিচু করে শুধু কফিতে কয়েকবার চুমুক দিল। এক সময় মুখ তুলে বলল, উপায় কি বল। মানুষ মনে মনে যা ভাবে, সমাজ সংসার পরিবেশ পরিস্থিতি তাকে বানচাল করে দেয়। হাজারে একটি মানুষ হয়তো ভাগ্যের প্রসাদ পেয়ে যায়। আমি সে ভাগ্যবানের দলে নই অনির্বাণদা। তোমরা সবাই আমাকে ভুলে গেলে, তাই নিজের সান্ত্বনা নিজের কাছেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আমি সেই চঞ্চল কিশোরী বুকুনি আর মখমলসবুজ পাতার মত লাবণ্যময়ী তরুণী সেঁজুতির পরিণতি দেখে মনে মনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

একসময় বললাম, সেঁজুতি, তোমাকে কোনদিন তোমার অনির্বাণদা ভোলেনি, হয়তো তার পক্ষে কোনদিন ভোলা সম্ভবও হবে না। তুমি জানবে, যেখানেই আমি থাকি না কেন, আমার মনের মধ্যে আর একটা মনকেও বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি একথা জানি, এটা তোমার কাছে হয়তো কোন আশ্বাস নয়, তবু যদি মনে কর যে তোমার দুঃখের একজন সঙ্গী আছে তাহলে হয়তো কিছুটা সান্ত্বনা পেলেও পেতে পারবে।

সেঁজুতি অমনি বলল, তাই তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি অনির্বাণদা।

বললাম, তোমার এ অবস্থার কথা বাবা-মাকে জানিয়েছ?

স্পষ্ট করে না জানলেও ওঁদের বুঝতে কোন অসুবিধে হয়নি। ওঁরা কিছুদিন মেয়ের কাছে কাটাতে এসেছিলেন। বুঝতে পেরেছেন সবই। মনের আগুনে জ্বলছেন দুজনেই।

বললাম, যে ক'টা দিন এখানে থাকব. তোমার স্বামীর প্রতিবাদ প্রবল না হলে তোমাকে আমি আবার ছবির জগতে নিয়ে যাব।

ও বলল, একটি বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার অনির্বাণদা। আমার স্বামী আর যাই করুক, কোনদিন বাধা দেয় না আমার কাজে। আর সত্যি বলতে কি স্ত্রী হয়ে ঐখানেই আমার প্রতিবাদ। উদাসীন স্বামীকে কোন স্ত্রী পছন্দ করে কিনা আমি জানি না। অন্তত আমি করি না। ও যদি আমাকে সন্দেহ করত পদে পদে তাহলেও আমি গভীর তৃপ্তি পেতাম।

বললাম, তোমাকে হয়তো তিনি বিশ্বাস করেন সেঁজুতি, তাই তোমার সকল কাজে স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন।

সেঁজুতি বলল, তুমি জান না অনির্বাণদা ওর সম্পূর্ণ চরিত্রের খবর তাই ও ধরনের মন্তব্য করছ। ওর এই নিস্পৃহ ঔদাসিন্যের পেছনে দুটো জিনিস কাজ করছে। এক, সুরা আর অন্য নারী।

বললাম, কি বলছ তুমি সেঁজুতি। ড্রিঙ্ক অনেকেই করে, কিন্তু তোমার মত স্ত্রীকে ফেলে অন্য মেয়েতে কেউ আসক্ত হতে পারে এ যে আমার ধারণার বাইরে।

এবার ম্লান হাসি ফুটল সেঁজুতির মুখে।

বলল, সুজন সিংকে দেখলে না? ওর ভালবাসার পাত্রীর ওপর তোমাদের রেঞ্জার সাহেবের খুব লোভ।

সুজন সিং জানে সে কথা?

হয়তো জানে, বলল, সেঁজুতি, কিন্তু যেহেতু ও বনের ইজারাদার সেজন্যে রেঞ্জারকে ঘাঁটাতে চায়

না।

এ ঘটনা কতদিনের পুরনো?

ও বলল, আমার বিয়ের আগে থেকেই চলছে।

তোমাকে এ খবর জানাল কে?

সেঁজুতি বলল, মদ।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, মদ! তার মানে?

ও বলল, মাতালদের চরিত্রই তাই। মদ খেলে দিলদরিয়া। মনের ভেতর জমে থাকা গোপন কথা তখন একটি একটি করে বেরিয়ে আসে।

বললাম, আশ্চর্য!

সেঁজুতি বলল, আশ্চর্যের কিছু নেই, এটাই স্বাভাবিক। মদ খেয়ে ও একদিন একা একা টেবিলে বসে সুজন সিংয়ের সঙ্গে লড়াই লাগিয়ে দিলে। ওর লড়াইয়ের কারণটা আমি জেনে নিলাম।

বললাম, আজকাল সুজন সিংয়ের সঙ্গে ব্যবহারটা কেমন করছে?

মদের নেশা কেটে গেলে ও তখন অন্য মানুষ। সুজন সিং তখন ওর সবচেয়ে বড় দোস্ত। একসঙ্গে বসে টাকার পাওনাগণ্ডার হিসাব চলবে, একই জিপে কুপে কুপে ঘুরে বেড়াবে। লাঞ্চ, ডিনার একসঙ্গে খাবে। আবার একই মেয়ের জন্যে দুজনে লড়াইয়ের প্যাঁচ কষবে।

তারপর মদ্ পেটে পড়লেই মেজাজ যাবে বিগড়ে। গ্লাস ছুঁড়ে মারবে সুজন সিংকে লক্ষ্য করে। লাভের মধ্যে ভাঙবে কাচের শার্সি, না হয় দেয়াল স্নান করবে দামী মদে।

বুঝিয়ে কিছু বলার সুযোগ হয়নি তোমার কোনদিন?

সেঁজুতি হেসে বলল, মাতালরা তাদের বউদের গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে আর কোনদিন গিলবে না ঐ বিষগুলো। কিন্তু ঠিক সময়ে বউয়ের কাছে এসে মিনতি করে বলবে, কেবল আজকের দিনটার মত বোতলটা বের করে দাও, কাল কোন আহাম্মক ছুঁয়েছে। তারপর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। দেখে দেখে হাল ছেড়ে দিয়েছি অনির্বাণদা। এখন নিজের হাতে বিষ ঢেলে দিয়ে দূরে বসে দেখি, একটা মানুষ কেমন করে তিলে-তিলে জাহান্নমে যাচ্ছে।

বললাম, তুমি দেখেছ সুজন সিংয়ের প্রেমিকাকে?

ও বলল, তার চেয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস কর, আমি আমার সতীনকে দেখেছি কিনা।

বললাম, ও-কথা আমি কোনদিন মুখ ফুটে বলতে পারব না তোমাকে সেঁজুতি।

ও হেসে বলল, অপ্রিয় সত্যকে প্রকাশ করতে সকলের সাহসে কুলোয় না অনির্বাণদা।

তারপর কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, মেয়েটাকে দেখতে কিন্তু দারুণ। ছোটনাগরার হো-সর্দারের মেয়ে। চুলে করণ্‌জার তেল মেখে, একদিক হেলিয়ে আলগা খোঁপা বেঁধে, তাতে লাল ফুল গুঁজে ও যখন নিটোল সুন্দর দেহখানাকে বনের কোন গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড় করায়, অথবা হাসি ছড়াতে ছড়াতে হাটের পথে হেঁটে চলে যায় তখন, বিশ্বাস কর অনির্বাণদা, আমি ওর দিকে অবাক চোখ মেলে তাকিয়ে থাকি। আমার তখন একটুও ঈর্ষা হয় না ওর ওপর।

তুমি আজও মনে-প্রাণে শিল্পী রয়ে গেছ সেঁজুতি।

সেঁজুতি বলল, ঘড়িতে দশটা বাজে। এখন শীতের দিনে মাঝরাত বলতে পার। খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তাছাড়া রাঁধুনীকেও ছুটি দিতে হবে, এখন চল যাই আহার পর্বটা চুকিয়ে ফেলি।

বললাম, মিঃ ভট্‌চায এসে পড়তেও তো পারেন, ওঁর জন্যে আর একটুখানি অপেক্ষা করলে হত না?

সেঁজুতি দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, থলকোবাদের ডাকবাংলোয় তোমাদের রেঞ্জার সাহেব এতক্ষণে বনমোরগের রোস্ট খেয়ে শরীর গরম করছেন।

কথাগুলো বলেই সেঁজুতি ভেতরে উঠে গেল। আমি ওর তাৎপর্যে ভরা হাসির অর্থভেদের চেষ্টা করতে লাগলাম। বেশিক্ষণ ভাবতে হল না। একটা কালো পাথরে গড়া অপূর্ব মূর্তি আমার চোখের ওপর ফুটে উঠল। ঈষৎ হেলানো খোঁপা করণ্‌জার তেলে মসৃণ। খোঁপার ভেতর একটা কাঠের কাঁকই

আধগোঁজা হয়ে রয়েছে। তার পাশ দিয়ে মাথা তুলে জেগে আছে সবুজ পাতা সমেত দুটো লাল ফুল। সেঁজুতির বনমোরগের ছবিটা কি এই রকমের?

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ডাক দিল সেঁজুতি, উঠে এসো অনির্বাণদা।

খাবার টেবিলে বসে অনেক কিছু খেলাম।

শেষে ছানার পায়েস পরিবেশন করল সেঁজুতি। বলল, মায়ের হাতের তৈরি পায়েস একসঙ্গে বসে কাড়াকাড়ি করে খেয়েছি, আজ তাই তোমাকে খাওয়াতে গিয়ে পায়েসের কথা মনে পড়ল।

পায়েস মুখে দিয়ে বললাম, একেবারে মায়ের হাতে তৈরি পায়েসের স্বাদ কতদিন পরে পেলাম তোমার কাছে। মনে আছে সেঁজুতি, মায়ের বাটির শেষটুকু চেঁছেপুছে কে নেবে তাই নিয়ে দুজনের কত হুড়োহুড়ি?

হঠাৎ সেঁজুতির চোখে জল এসে গেল। ও উঠে বেরিয়ে গেল ডাইনিং হল থেকে। কিছু পরে আবার ফিরে এসে বসল আমার পাশে। খাবার পাট আমাদের চুকে গিয়েছিল। আমিও মুখ ধুয়ে এসে বসলাম পাশাপাশি।

ও বলল, ড্রইংরুমটা বাইরের দিকে, তাই ঠাণ্ডা এখানকার চেয়ে বেশি। এখন খাবার ঘরে বসে বসেই কথাবার্তা বলা যাক।

অনেকক্ষণ থেকে কল কল একটা আওয়াজ কানে এসে বাজছিল। কথার ভেতর ডুবে ছিলাম তাই শব্দটা তেমন করে বাজেনি কানে।

সেদিকে কান পেতে আছি দেখে সেঁজুতি বলল, তোমার সব কৌতূহল এক দিনেই মিটিয়ে নিতে চাও?

হেসে বলল, ক্রমশ প্রকাশ্য।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলাম।

ও বলল, ওটি 'কারো'র ডাক।

বললাম, তোমাদের এই বনাঞ্চলে রাতে-ভিতে কেউ ডাকে নাকি?

ডাকে বইকি, প্রবাহিনী 'কারো' ডাকে। বড় মিঠে সে ডাক। তার ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়। গরমের দিনে আমি প্রায় সারাক্ষণ ওকে ছুঁয়ে বসে থাকি।

বললাম, কারো নদীটা কি বাংলোর খুব কাছে?

ও বলল, বাংলোর সীমানা ছুঁয়ে, পিটিস ঝোপের ডালে পাতায় নাড়া দিয়ে ও বয়ে চলে যাচ্ছে। বাংলোর নৈঋত কোণে দাঁড়িয়ে আছে যে শিমুলগাছ, ফাল্গুনে অজস্র লাল ফুল ফোটে তাতে। মাঝে মাঝে দশ বিশটা ফুল ও ফেলে দেয় দুষ্টু ঘর-পালানো মেয়েটার আঁচলে।

জান অনির্বাণদা, ওর দুষ্টুমির খেলা দেখতে দেখতে আমার দিন কেটে যায়। ও আমার চোখাচুখীর সঙ্গী। যে-কোন ঘরের জানালা খুললেই আমি ওকে দেখতে পাই।

বললাম, দেখাবে না তোমার সখিকে?

সেঁজুতি বলল, আমাকে কি ওর মত দস্যি পেলে যে ওকে আমার সখি বলছ?

তুমি ওর চেয়েও দুষ্টু।

ও বলল, কখ্খনো নয়। তুমি বছর খানেক এখানে থেকে যাও, প্রতিটা ঋতুতে ওর কাণ্ডগুলো দেখতে পাবে। এখন ও শান্ত, কিন্তু পাহাড়ে এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে যাক, দেখবে দুরন্ত দস্যুতায় ও সবকিছু ভেঙে-চুরে লুটেপুটে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

বললাম, এত লোভ দেখিও না, হয়তো এই বন পাহাড় আর নদীর দেশে সারাজীবন কাটিয়ে দেব।

তাহলে আমি বেঁচে যাই অনির্বাণদা। তুমি আমার কাছে থাকলে এ নরকও স্বর্গ হয়ে উঠবে।

হেসে বললাম, তা সম্ভব হলে আমার আনন্দ তোমার চেয়ে কম হত না সেঁজুতি। কিন্তু ইচ্ছাপূরণ যিনি করেন তিনি আমাদের মনের অনেক ইচ্ছাকেই অপূর্ণ রাখেন, কারণ, ইচ্ছা পূরণ হয়ে গেলে চাইবার আর কিছু থাকবে না বলে।

ভারী ঠাণ্ডা একটা হাওয়া হু হু করে বয়ে এল ঘরের ভেতর। আলোয়ান আর সার্জের পাঞ্জাবী

ফুঁড়ে সে হাওয়ার করাত হাড়ে এসে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত কারোর খল খল দুষ্টুমির হাসিটা স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

সেঁজুতি উঠে গিয়ে হঠাৎ খুলে যাওয়া জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে এল।

সোফায় বসতে বসতেই বলল, আজ চাঁদনী রাত হলে এতক্ষণে তোমাকে টেনে নিয়ে যেতাম নদীর ধারে। শীতকে থোড়াই কেয়ার করতাম।

বললাম, মিঃ ভট্‌চায এ ধরনের নিশিবিহারে নিশ্চয়ই তোমাকে মাঝে মাঝে সঙ্গ দিয়ে থাকেন?

সেঁজুতি বলল, আমার মুখ দিয়ে আর কত পতি-নিন্দা তুমি শুনতে চাও অনির্বাণদা?

আমি সত্যি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। আমার অজ্ঞাতসারে ওকে যে আমি আঘাত দিয়ে ফেলেছি তা বুঝতে পারিনি।

বললাম, হালকাভাবে কথা বলেছি সেঁজুতি, তোমার মনে আঘাত দিতে কিন্তু চাইনি।

ও আগের কথার জের টেনে বলল, গোয়ালা যদি নিজের দুধ খেত তাহলে ভুলেও কোনদিন জল মেশাত না। তোমাদের রেঞ্জার সাহেব যদি তার বউয়ের হাত ধরে ঐ নদীর ধারে ভুলেও একদিন গিয়ে বসত তাহলে ভালবাসার সবটুকু মধু এমন উজাড় করে ঢেলে দিতে পারত না ঐ বুনো মেয়েটার ওপর।

কথাগুলো আবার সেঁজুতির ব্যথার জায়গাগুলোকে ছুঁয়ে যাচ্ছে দেখে প্রসঙ্গ পাল্‌টে বললাম, ওসব আলোচনা এখন থাক সেঁজুতি, কালকে আমাদের প্রোগ্রামটা কি হবে তাই বল?

সেঁজুতি বলল, কাল দূরে কোথাও যাব না। এই নদী আর বাংলোর আশেপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াব। আমি বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারি তুমি হাঁপিয়ে উঠবে না। ছবি আঁকার অনেক কিছু হাতের সীমানার ভেতর পেয়ে যাবে।

আমরা এরপর হালকা টুকরো টুকরো কথার পাপড়িগুলো ছড়াতে লাগলাম। অনেক স্মৃতির গন্ধ মাখা সেই সব ছেঁড়া কথার টুকরো।

রাত যখন বারোটার ঘণ্টা বাজাল তখন আমার শোবার ঘরখানা দেখিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল সেঁজুতি।

আমি বিছানার আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দেওয়ামাত্র ঘুমের গভীরে ডুবে গেলাম।

ট্রেন-জার্নি তার শোধ তুলল। পরের দিন বেলা আটটার আগে বিছানা ছাড়তে পারলাম না।

বেশ খানিকটা লজ্জিত মুখে ঘর ছেড়ে বেরোলাম। বাইরের রোদ্দুর তখন ঘরের সংলগ্ন বারান্দায় এসে পড়েছে। হাত-মুখ ধুয়ে বেরোতে যাব, সেঁজুতি পাশে এসে দাঁড়াল।

হেসে বলল, এতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হল কুম্ভকর্ণ মশাইয়ের? চল, মিঃ ভট্‌চায বাইরের ঘরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

বললাম, সেকি, উনি এত সকালেই এসে পড়েছেন?

সেঁজুতি বলল, না মশায়, রাত্তির ঠিক তিনটের সময় এসেছে। তুমি তখন ছিলে মগন গহন ঘুমের ঘোরে। অনেক হেডলাইটের আলো, অনেক হাঁকডাকের ভেতরেও তোমার ঘুম ভাঙেনি। তাই বলছিলাম, তুমি একালের কুম্ভকর্ণ।

একটু বিব্রত হয়েই বললাম, আমাকে ডেকেছিলে রাত্রে? সত্যি, আমি একটুও জানতে পারিনি। চল চল, মিঃ ভট্‌চায কি ভাবছেন।

ও বলল, তোমাকে ডাকব কেন, এমনি হাঁকডাক হচ্ছিল।

এত রাতে মিঃ ভট্‌চায এলেন কি ব্যাপার?

সেঁজুতি বলল, কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই ঘটেছিল। কারণ অবশ্য অজ্ঞাত।

আমি সেঁজুতির সঙ্গে সঙ্গে ডাইনিং হলে এসে পৌঁছলাম।

মিঃ ভট্‌চায উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি হাতে হাত মেলালাম।

আমরা টেবিলে বসলে বেয়ারা চা দিয়ে গেল।

মিঃ ভট্‌চায যতক্ষণ চায়ের টেবিলে রইলেন ততক্ষণ একটা না একটা নিজের কথার ভেতরেই

জড়িয়ে রইলেন।

আমাদের চা-পর্ব শেষ হবার আগেই উনি উঠে দাঁড়ালেন। একবার আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, রাতের বিশ্রামটা এখন করে নেব ভেবেছি। আপনার বান্ধবী রইল, আশা করি কিছু অসুবিধে হবে না।

মিঃ ভট্চায চলে গেলে আমি সেঁজুতিকে বললাম, একটু বাইরে ঘুরেফিরে সারান্দার সঙ্গে শুভদৃষ্টিটা সেরে আসি। তুমি ততক্ষণে দরকার মত স্বামী-সেবাটেবা কর। অথবা অতিথি-আপ্যায়নের কিছু আয়োজন।

ও বলল, বাংলোর কম্পাউন্ড ছেড়ে বেশি দূরে যেও না যেন, কাছাকাছি থেকো, আমি তোমাকে খুঁজে নেব।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। ভোরের ঠাণ্ডা কাঁপা কাঁপা আলোয় চারদিকে চেয়ে মনে হল, এ জগৎ আমার সম্পূর্ণ অজানা। আমি যেন সমুদ্রে জাহাজ-ডুবির পর একটা অচেনা অরণ্য-অধ্যুষিত দ্বীপে ভেসে এসেছি।

মরশুমী ফুলের বেড সারা বাংলো ঘিরে রয়েছে একটা দামী শাড়ির পাড় আর আঁচলের মত। তাদের রঙের অভ্যর্থনার পর আমি রাতে অস্পষ্ট দেখা ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় এসে দাঁড়ালাম। দীর্ঘ গাছগুলো সাদা সাদা কাণ্ড আর কিছু এলোমেলো পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকাল বেলার বড় উপভোগ্য আলোয় চারদিকের গাছপালা স্নান করছিল। পাখিদের বহু বিচিত্র ডাক শুনতে শুনতে বাংলোর উঁচু কাঁটাতারের বেড়ার সীমা পেরিয়ে এলাম।

বাঁ দিকে ফিরতেই নদীটা চোখে পড়ল। নুড়িগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে তীর জুড়ে। দুপারে বন, মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে কান্তিময়ী কারো। শীতে শীর্ণ হয়েছে কায়া, কিন্তু আঁকাবাঁকা মন্থর চলনে ভারী সুন্দর একটা ছন্দ আছে।

আমি কতক্ষণ নদীটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার নীল জলধারা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট-বড় বিচিত্র আকারের নুড়ির রাশি, দুপারে যতদূর দেখা যায় বৃক্ষের ঘনবসতিপূর্ণ সংসার। সব মিলিয়ে কারো সত্যি একটা জাদুর জগৎ তৈরি করে রেখেছে।

অমি ভোরবেলাকার শীতের কামড় উপেক্ষা করে কারোর জলে পা ডোবালাম।

নদী আমাকে উত্তপ্ত অভ্যর্থনা জানাল না ঠিক, কিন্তু তার ছোঁয়ায় আমি যেন একটী তীব্র প্রাণের সাড়া পেলাম।

কারো নদীর নুড়ির ওপর দিয়ে কিছু পথ হেঁটে বেড়ালাম। ওপারের কয়েকটা গাছে শীত তার দৌরাত্ম্যের স্বাক্ষর রেখে গেছে। নিষ্পত্র বৃক্ষগুলি ডালপালা ছড়িয়ে যেন অদৃশ্য দেবতার কাছে যৌবন ফিরে পাবার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে।

আমি গত রাত্রে সেঁজুতির মুখে শোনা সেই শিমুলগাছটার খোঁজ করতে লাগলাম। বাংলোর এক কোণে তাকে পাওয়া গেল। তার ছড়িয়ে পড়া কয়েকটা শেকড়ে নাড়া দিয়ে চলেছে কারো নদীটা। দুষ্টুমি করে যেন বলছে আমার ফুল কই ফুল, টকটকে রাঙা ফুল!

পেছন থেকে কে যেন এসে আমার গায়ে ছোঁয়া দিয়ে বলে উঠল, এখুনি এত ভালবাসায় পড়ে গেলে আমাদের জন্যে কিছু রইবে তো?

সেঁজুতি কখন নিঃশব্দে এসেছে আমি জানতে পারিনি। ওর দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বললাম, যেখানে লোকালয় সেখানে আমার ভালবাসা ফেরি করে বেড়িয়েছি, নেয়নি। তাই এখানে সারান্দা বনে যাচাই করে দেখছি কেউ নেয় কি না।

ও বলল, তেমন করে দিলে নেবার লোকের অভাব কি।

বললাম, এই জীবনটাতে ভেবেছি আর মানুষের ঘরে ভালবাসা নিয়ে যাব না। বনের পশুপাখি, পাহাড়, গাছপালা, ফুল আর নদীর বুকে ভালবাসা ছড়িয়ে দেব।

সেঁজুতির গলা ভারী হয়ে উঠল। ও আমার একখানা হাত খপ্ করে ধরে ফেলে বলল, বল, এমন কথা কেন বললে। আমার কাছে তুমি এমন করে বলতে পারলে কথাটা!

বললাম, কি পাগলামী করছ সেঁজুতি, হাত ছেড়ে দাও, বাংলোতে মিঃ ভট্‌চায রয়েছেন।

ও বলল, আগে উত্তর দাও তারপর ছাড়ব।

বললাম, আমার ঘাট হয়েছে সেঁজুতি, আর কোনদিন ভালবাসার কথা মুখে আনব না।

ও হেসে হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, ভীতু, ভীতু কোথাকার! ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ফয়সালা করে নিলে।

বললাম, বাঘের গুহায় বাস করতে করতে তার স্বভাব আর চালচলন সম্বন্ধে তুমি ওয়াকিবহাল হয়ে গেছ, কিন্তু আমি এখানে একেবারে আনাড়ী, তাই বিপদ আমার পায়ে পায়ে ফিরছে।

ও আবার হেসে বলল, বাঘকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি। এখন আমরা নিশ্চিন্তে ওর গুহার চারদিকে ঘুরে বেড়াতে পারি।

আমি হেসে বললাম, শাস্ত্রবাক্য লঙঘন করে পরদ্রব্যে বড় বেশি লোভ দিয়ে ফেলছি। জান তো লোভের পরিণতি কি ?

ও আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল, এসো বসি এই শিমুলগাছটার আড়ালে।

আমরা দুজনে বাংলোর পেছনে শিমুলগাছের আড়ালে বসে পড়লাম। নদীর দিকে আমাদের মুখ। কল-কল খল-খল খুশী ছড়িয়ে চলেছে কারো।

এবার অন্য প্রসঙ্গের উত্থাপন করলাম, সেঁজুতি, আমার কিন্তু এখুনি রঙ-তুলি নিয়ে বসে যেতে ইচ্ছে করছে।

ও বলল, দোহাই তোমার, আর দু'চারটে দিন পরে বোস, এখনই ছবিতে মাতলে আর তোমাকে পাব না।

বললাম, তোমার হাতে আমার হাত বাঁধা, যেমন চালাবে তেমনি চলব।

ও অমনি আমার ধরে থাকা হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বলল, চাই না অমন করে বেঁধে রাখতে। ছেড়ে দিয়ে যাকে পাওয়া যায় তাকেই আমি পেতে চাই। জোর করে ধরে-বেঁধে যে পাওয়া তা নিজের শক্তির অপমান ছাড়া কিছু নয়।

আমি বললাম, তোমার ভালবাসার রঙ ঢেলেই তো আমি ছবি আঁকি। আমার সব সেরা ছবি কিন্তু এখনও অবধি তোমাকে নিয়েই।

সেঁজুতি মনে হল খুব খুশী হয়েছে আমার শেষের কথাটায়। ও মুখ নীচু করে গভীর আনন্দটুকু লুকোবার চেষ্টা করল। কিন্তু ওর নরম আঙুলগুলো আমার হাতের ওপর দিয়ে অকারণ খেলায় মেতে উঠল।

বললাম, আজ সকালে কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করনি তুমি।

সেঁজুতি আমার মুখের ওপর প্রশ্নের ভঙ্গিতে দুটো চোখ মেলে তাকাল।

বললাম, মিঃ ভট্‌চায সকালে বললেন, আপনার বান্ধবী রইল, আশা করি কিছু অসুবিধে হবে না।

ও বলল, আমার কান দুটো তখন ঘুমিয়ে ছিল না অনির্বাণদা।

আমাদের সম্বন্ধে উনি কি ভাবেন সেঁজুতি?

ও বলল, আমরা বন্ধু, এই কথাই ভাবে। দু'জন কয়েক বছর একই আস্তানায় কাটিয়েছি তাও ওর অজানা নয়। সুতরাং বন্ধুত্বের সম্পর্কটা যে নিবিড় সে ধারণা ওর আছে।

বললাম, এ নিয়ে মিঃ ভট্‌চায কোন ইঙ্গিত তোমাকে করেন নি?

সেঁজুতি বলল, ও অনেক চালাক, তোমার আমার অথবা সুজন সিংয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কের ছোট্ট একটা কিছু ইঙ্গিত করে ও থেমে যায়।

এর অর্থ?

সেঁজুতি বলল, ও যে সুজনের প্রেমিকা হো-মেয়েটার সঙ্গে মাখামাখি করছে সে সম্বন্ধে যেন আমি কোন কথা না তুলি।

আমি বললাম, তোমাকে ফেলে যার ওপর আসক্ত হয়েছেন রেপ্পাব, নিশ্চয়ই সে মেয়েটি অসাধারণ। আমি সেই অনন্যার ছবি আঁকতে চাই।

ও হেসে বলল, লড়াইটা তাহলে জমবে ভাল। ত্রিভুজ যুদ্ধ।

বললাম, যুদ্ধে জয় আমার অনিবার্য।

কি রকম?

বললাম, ওর একটা রঙীন ছবি এঁকে ওকে উপহার দিলেই যুদ্ধ-জয়।

সেঁজুতি হেসে গড়িয়ে পড়ল। হাসি থামলে বলল, তুমি কি সবাইকে তোমার সেঁজুতি পেলে যে ছবির যাদুতে বাঁধবে? হয়তো দেখবে, তোমার দেওয়া ছবিখানা দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে ও একবার সুজন সিং আর একবার রেঞ্জারকে দেখাচ্ছে।

আমি বললাম, তবু ওর ছবি আমাকে আঁকতেই হবে।

সেঁজুতি হঠাৎ বলল, আমার মত কেউ তোমার নির্জন ঘরে মডেল হয়ে বসবে না কিন্তু।

ওর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল ওর ভেতর একটি কাতর নারী জেগে উঠেছে। যে তার ভালবাসার মানুষের কাছে অন্য নারীর প্রতিষ্ঠা সইতে পারে না।

আমি বললাম, মডেল হতে গেলে যে মানসিক শক্তির দরকার তা সবার নেই! তাছাড়া সাহস থাকলেও তোমার মত কেউ কি পারবে প্রাণ ঢেলে দিতে?

ও খুশী হল। বলল, বেশ, লিজার ছবি আমরা দুজনে মিলেই আঁকব।

বললাম, লিজা কে?

ও বলল, যার ছবি তুমি আঁকতে চাইছ ও-ই তো লিজা কুই।

অবাক হলাম। বললাম, তুমি না বলেছিলে ও হো-দের মেয়ে? তবে লিজা নাম এল কি করে?

সেঁজুতি বলল, ছোট নাগরার হো-রা ফাদার বার্নার্ড-এর কাছে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। ফাদার আদর করে ওর নাম রেখেছেন লিজা। আর হো-দের ভাষায় 'কুই' মানে মেয়ে।

বললাম, এত সব ব্যাপার! আচ্ছা, সেঁজুতি চল না একদিন চার্চ দেখে আসি ছোট নাগরায়।

ও বলল, খুব ভাল লাগবে তোমার। একটা উঁচু পাহাড়ের মাঝামাঝি সাদা ধবধবে চার্চের বাড়িখানা উঠে গেছে।

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, কিছু এখন শুনব না আমি সেঁজুতি, নিজের চোখে দেখব। দারুণ একটা থ্রিল।

ও বলল, আজই তোমাকে নিয়ে যেতাম, কিন্তু রেঞ্জার বেরিয়ে গেল নিজের ধান্দায়, এদিকে সুজন সিংটার পাত্তাই নেই। গাড়ি নইলে এত দূরে যাওয়া অসম্ভব।

বললাম, সুজন সিং তো কাল রাতেই পৌঁছে দিয়ে গেলেন। তিনি কি আর কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি আসবেন?

ও রোজ কয়েকবার করেই আসে, রেঞ্জার থাকুক আর না থাকুক। সামনের পথটাই ওর চলাফেরার একমাত্র রাস্তা! প্রায়ই দেখবে সুজন সিংয়ের জিপ ছুটছে। বাংলোতে এসেই বলবে, কাঠ কাটাতে গিয়ে গলাটা কাঠ হইয়ে গেছে বহুরানী, একটুখানি ভিজায়ে লিয়ে যাই।

বললাম, মাতলামি করে না?

ও বলল, কোনদিন দেখিনি। তবে বেশি মাত্রায় পড়ে গেলে গম্ভীর হয়ে যায়। কখনো-সখনো সাধারণ কথাগুলো জোরে বলে। হা হা করে ঐ তোমার পাখি-ওড়ানো হাসি হাসে।

আমরা খাওয়ার পর লনে চেয়ার পেতে বসে গল্প করছিলাম। রোদ্দুরটা বড় মিঠে লাগছিল। উল বুনছিল ও। পায়ের কাছে উলের গোলাটা গড়িয়ে গড়িয়ে খেলায় মেতেছিল। এক একবার গোলাটা ছুটে গিয়ে পিটুনিয়ার লিকলিকে সরু দেহটাকে নাড়া দিয়ে আসছিল আবার সেঁজুতির পা ছুঁয়ে পড়েছিল শান্তশিষ্টের মত। বোনার হাত চললেই ওর দাপাদাপি! বোনা থামলেই ও একেবারে চুপ।

বললাম, উলের রঙটা কিন্তু ভারী সুন্দর।

পছন্দ হয়েছে তোমার?

বললাম, পছন্দ মানে, দারুণ ভাবে চোখে লাগার মত।

ও বলল, এটা তোমার জাম্পার তৈরি হচ্ছে।

অসম্ভব।
ওর বোনা থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উলের গোলাটার দুষ্টুমিও গেল থেমে।
ও বলল, কি অসম্ভব?
ওসব তো আমি পরি না।
ও একটুখানি বিষণ্ণ হল। এক সময় বলল, অনেক দূর থেকে তোমার জন্যে রঙের নমুনা দিয়ে এই উল আনিয়েছি। তোমার আসার খবর পেয়েই সুজন সিংকে পাঠিয়ে আনিয়েছিলাম। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে তুমি জাম্পার পরবে না।
ওকে আশ্বস্ত করবার জন্যে বললাম, জাম্পার গায়ে চড়ালে আমাকে কি রকম মানাবে বলে তুমি মনে কর?
ও উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, সত্যি বলছি অনির্বাণদা, দারুণ মানাবে। এই দেখ, তোমার গায়ে রংটা চাপিয়ে দেখাচ্ছি।
ও উঠে এসে সামান্য বোনাটুকু আমার হাতের ওপর চেপে ধরে মুখখানাকে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে তারিফ করতে লেগে গেল।
তৈরি হয়ে যাক, তখন পরে দেখো কি স্মার্ট লাগবে তোমাকে।
বললাম, তোমার ভাল লাগলেই আমি পরব।
ও বলল, তার মানে?
হেসে বললাম, আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা।
সেঁজুতি বলল, আমাকেই শুধু খুশী করবার জন্য তুমি পরবে? তাহলে তোমাকে পরতে হবে না।
বললাম, তোমাকে খুশী করার জন্যে পরব না তো কি লিজা কুইকে মাতাল করার জন্যে পরব?
ও হেসে বলল, তোমার ও চোহারার ওপর এ রঙের জাম্পারখানা চাপালে যে-কোন মেয়েকে তুমি ঘায়েল করতে পারবে।
বললাম, এমন মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত কথা বললে কিন্তু তোমার কষ্ট করে বোনা ঐ জাম্পার আমি গায়ে তুলতে পারব না।
বেশ, বলব না।
আমি বললাম, ওই জাম্পারখানা পরে যদি আমি একটি বিশেষ মেয়ের দুটি চোখের চাউনিকে কেড়ে নিতে পারি তাহলেই আমি দিগ্বিজয় করেছি বলে মনে করব।
ও ঠোঁটের ওপর উল বোনার একটা কাঁটা চেপে ধরে কি যেন ভাববার চেষ্টা করল, তারপর একসময়ে বলল, কি একটা বলব বলে খুব মনে হচ্ছিল, দূর ছাই ভুলে গেলাম।
আমি হেসে বললাম, সব কথা আমরা যদি বলতে পারতাম তাহলে মহাভারত দশগুণ লেখা হয়ে যেত। ভাগ্যিস ভুলে যাই অনেক কিছু।
ও বলল, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে।
কথাটা আর বলা হল না, সামনের পথে দারুণ গর্জন তুলে একটা জিপ এগিয়ে এল। বাংলোর ভেতর ঢুকে আমাদের সামনে এসেই ব্রেক কষে দাঁড়াল জিপটা।
স্টিয়ারিং ধরে হাসছে সুজন সিং।
উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আরে আসুন, অনেকদিন বাঁচবেন। এই কিছুক্ষণ আগে আপনাকেই স্মরণ করছিলেন আপনার বহুরানী।
স্টিয়ারিং ধরে বসে বসেই সুজন সিং বলল, বহুৎ সৌভাগ্য আমার।
সেঁজুতি বলল, গলা ভেজাতে নাকি?
সুজন সিং নেমে এল, কি যে বল বহুরানী! ভদ্রলোকের কাছে আমার মান বলে কিছু রাখলে নাই।
সেঁজুতি ছেলেমানুষের মত আব্দারের সুরে বলল, আজ কি খুব ব্যস্ত আছ তুমি, খু-উ-ব ব্যস্ত?
সুজন সিং ঘাড়টা একটু কাত করে চোখের মণি ওপরে তুলে বলল, কিছু হুকুম আছে বহুরানীর? বলে ফেল চটপট, হাজিব আছে বান্দা।

সেঁজুতি বলল, এমন করে কথা বললে আমি কিন্তু আর একটিও কথা বলব না।

সুজন সিং বলল, এইবারটা মাপ করে দিন। আর বলবে না এ বান্দা।

খিল খিল করে হেসে উঠল সেঁজুতি।

জানো অনির্বাণদা, সিং সাহেবের সঙ্গে বরাবর দুটি করে চাকর থাকে। কথা বলতে গেলেই ও-দুটিকে ও কাজে লাগাবেই। কখনো নোকর, কখনো বান্দা।

এবার আমরা সকলেই সেঁজুতির হাসিতে যোগ দিলাম।

একসময় উঠে পড়ল সেঁজুতি। সুজন সিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, এস আমার সঙ্গে। আগে তোমার ভেজাবার ব্যবস্থাটা করে দি, তারপর বলা যাবে আমার কথা।

সুজন সিং অতি বিনীত অনুচরের মত উঠে গেল সেঁজুতির পিছু পিছু ঘরের ভেতর।

একটু পরে একা সেঁজুতি বেরিয়ে এসে দাঁড়াল আমার চেয়ারের হাতলটা ধরে। বলল, কারণবারিতে ডুবিয়ে রেখে এসেছি, এরপর ওকে যা বলব ও তাই শুনবে।

বললাম, এমন করে মদ গিললে লোকটার লিভার না পচে যায়।

থোড়াই কেয়ার করে ওরা লিভারের। মদ ওদের রাজা বানায় আবার ঐ মদই ওদের খায়।

বললাম, কাজ করে কি করে?

মদের ঘোরে। বলতে পার ওরই জোরে।

আমি বললাম, এক একটা জায়গা আছে যেখানে মদের চলন খুব বেশি। যেমন তোমাদের এই বন-পাহাড়ে, খনি-ফ্যাক্টরিতে। যেখানে বেশির ভাগ মানুষ কুলি-কামিনের কাজ করে।

ও বলল, কুলি-মজুর খাটাতে গিয়ে বাবুরা যত হিমসিম খাচ্ছে ততই মদ খাওয়ার মাত্রাও যাচ্ছে বেড়ে।

বললাম, শুনেছি একবার ও বস্তু ধরলে ছাড়া মুশকিল।

ও বলল, কথাটা মিথ্যে নয়! তোমাদের রেঞ্জারের মনটা ঐ লিজার কাছে থেকে ছিনিয়ে আনবার জন্যে, আমি কিছুকাল ওর বোতলের সঙ্গী হয়েছিলাম।

ছাড়লে কি করে?

অসীম মনের জোর আর একজনের ওপর ভালবাসা আমাকে একদিন মদ ছাড়তে সাহায্য করল।

বললাম, এত করেও রেঞ্জার সাহেবের মন ফেরাতে পারলে না?

সেঁজুতি বলল, যেই আমার ভুল ভাঙল অমনি আমি সর্বনাশের পথ থেকে পা-টা টেনে নিলাম।

বললাম, তোমার সেই ভালবাসার পাত্রটি কে সেঁজুতি, যে তোমাকে এমন বিপদ থেকে উদ্ধার করল?

ও অমনি বলল, যে আমাকে জীবনে সবচেয়ে বেশি কাঁদিয়েছে।

বললাম, তোমাকে যে কাঁদাতে পারে সেঁজুতি তাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারতাম না।

ও হেসে বলল, নিজের হাতে নিজের শাস্তির ব্যবস্থা কর তাহলে!

বললাম, নিজেকে আমরা প্রতিদিন কতভাবেই তো শাস্তি দিই, কিন্তু প্রিয়জনের কাছ থেকে শাস্তি পাওয়া দারুণ একটা ভাগ্যের ব্যাপার।

সেঁজুতি বলল, অনেক শাস্তি তোমার পাওনা হয়ে আছে, একসঙ্গে সেগুলো যখন পড়বে তোমার ওপর, সইতে পারবে?

বললাম, সব তোমার ঐ শিমুলের ফুল হয়েই পড়বে। তোমার ভালবাসার মার আর কেউ পারুক বা না পারুক আমি ঠিক সইতে পারব সেঁজুতি।

আমাদের কথার ভেতর শক্ত বুটের আওয়াজ তুলে এসে দাঁড়াল সুজন সিং।

সেঁজুতি এবার ছোটনাগরায় যাবার কথাটা পাড়তেই ও যেন লাফিয়ে উঠল।

আলবাৎ যাবে। একটা খুবসুরৎ চিড়িয়া আছে ছোটনাগরায় চৌধুরীবাবু। ঐ চিড়িয়াটা ধরার সাধ আমার বহুৎ রোজ থেকে। চিড়িয়াটা খালি উড়ে বেড়ায়, তাই ওকে ধরবার সাধটা মাথায় চিড়িক দিয়ে ওঠে। ওকে ধরতে পারছি না বলেই তো ওর পেছন পেছন হররোজ কাজ-কাম ফেলে ছুটে বেড়াই।

ও বহুৎ সুন্দর গানা গায়, আর হরেক কিসিমের ওড়ার খেলা দেখায়। ওহি চিড়িয়া মেরা, চলিয়ে বাবু ছোটনাগরা।

একটু থেমে বলল, শালার পাখিটা ধরতে না পারলে একদিন ছর্‌রায় বিঁধে জান লিয়ে লেব, তবু কারো হাতে তুলে দিতে পারব নাই। হাঁ, সাচ্‌ বাৎ। সুজন সিং ভাল তো সাচ্চা দোস্ত, বিগড়াল তো জানী দুশমন।

আমরা গাড়িতে উঠলাম। শীতের বেলাটুকু বন-পাহাড় মুহূর্তে শুষে নেবে। তাই সেঁজুতি গাড়িতে উঠেই তাড়া লাগাল, সিধে চল ছোটনাগরার চার্চে, ওখানে বসেই আমরা সূর্যাস্ত দেখব। আর কোন স্পটে আজ গাড়ি থামাবার দরকার নেই।

যো মর্জি বহুরানী, বলে সুজন সিং তার জিপখানাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে। একটা ভোমরা যেন বোঁ-বোঁ আওয়াজ তুলে উড়ে চলল ফুলের সন্ধানে।

এ বন গভীর। সূর্যের আলো আর গাছের ছায়া বেদে মেয়ে-পুরুষের মত পথের ওপর পাশাপাশি লুটিয়ে আছে।

মনের খুশীতে গান ধরেছে সুজন সিং। অনেকদিন পরে প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হতে চলেছে কোন উতল-হৃদয় প্রেমিক। পথ যেন আর ফুরোয় না। সে একটি চিঠি পাঠিয়েছে পাখির মুখে কিন্তু প্রিয়ার কোন খবর পায়নি সে।

মোটামুটি গানের এই ধরনের একটা বিষয়বস্তু উদ্ধার করা গেল। শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে কাঁপা কাঁপা সুরটা মন্দ লাগছিল না।

সেঁজুতি আমার কানে ফিস ফিস করে বলল, খোশ-মেজাজে আছে সিং সাহেব। পেটে রঙীন জল পড়েছে তাই গান-টান বেরিয়ে আসছে গলা ঠেলে।

আমরা কোথাও কোথাও নিবিড় বন পেরিয়ে এলাম। উপত্যকার উপর দিয়ে ছোট ছোট ঝোরা ছুটে চলেছে। আমাদের গাড়ি নুড়িপাথরের উপর দিয়ে শব্দ করতে করতে জল ছিটিয়ে পেরিয়ে এল। পাহাড়ের কোল বেয়ে আসার সময় নীচে গভীর খাদ দেখলাম। একটু বেতাল হলেই আরোহী-সমেত গাড়ি যাবে হারিয়ে ঐ বন আর পাহাড়ের গহন গভীরে।

পাহাড় পাহাড় পাহাড়, সংখ্যাতীত পাহাড়। সবুজ তরঙ্গের মত প্রবাহিত হয়ে গেছে। কত প্রাচীন বৃক্ষের সংসার ওর দেহে, কত পশুর জন্মমৃত্যুর লীলা ওর গুহায়, কত পাখি ওর দেহ-সংলগ্ন অরণ্যে সুপ্রাচীন শতাব্দী থেকে নীড় রচনা করে আসছে।

এ পাহাড় হিমালয়ের তুষার মৌলির মত উদ্ধত মহিমায় আকাশে মুকুট ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। এ পাহাড় নীল আকাশের বিরাট বিস্তৃত সূর্যোদয় সূর্যাস্তের পটে ঋতুতে ঋতুতে রঙ বদলায়। গরমের দিনে ওর দেহের লৌহ উপাদান দারুণ উত্তাপে মাঝে মাঝে ঠিকরে বেরিয়ে আসে। অমনি শিলায় শিলায় সংঘর্ষে আগুন জ্বলে ওঠে। শুকনো পাতা ঐ আগুনকে বয়ে নিয়ে চলে বন থেকে বনান্তে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন রাতের পাহাড়ে দীপাবলীর উৎসব শুরু হয়েছে।

শীত পড়লে রাশ রাশ পাতা ঝরে পড়ে পাহাড়ি পথের ওপর। প্রবল শীতেও এদের মাথায় প্রকৃতিদেবী পরিয়ে দেয় না বরফের মুকুট।

বসন্ত এখানে সত্যিই ঋতুপতি। ফুলে ফুলে অরণ্য-উৎসব চলে পুরো দুটি মাস। বিচিত্র গাছ-পালায় বিভিন্ন সবুজের সমারোহ। প্রজাপতি পাখি ফুল, সে যেন এক মহা-মহোৎসবের আয়োজন।

গাড়ি যখন চার্চের এলাকায় ঢুকল, বেলা তখন তিনটের ঘর ছুঁই-ছুঁই।

আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। সুজন সিং কিন্তু নামল না। ও বলল, ঠিক পাঁচটায় গাড়ি নিয়ে বান্দা হাজির থাকবে বহুরানী।

সেঁজুতি চোখেমুখে একটা ইঙ্গিতভরা হাসি ফুটিয়ে নীচের দিকে অঙুল দেখাতেই সুজন সিং চোখ ছোট করে হাসল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ঘুরিয়ে সে নীচের দিকে নেমে গেল।

আমি এবার চার্চের দিকে তাকালাম। সত্যি স্থান নির্বাচনে দক্ষতা আছে বিদেশীদের।

পেছনে একটা পাহাড়, সামনে পাহাড়ের কোলে বেশ খানিকটা সমতল ভূমি। সাদা রঙের চার্চের

চূড়ো পাহাড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের সমতলটুকু জুড়ে সবুজ ঘাসের লন। ক্যানা আর হরেকরকম মরশুমী ফুলের বাগান। লনের ঠিক মাঝখানে কয়েকটি শালগাছের জটলা। তার তলায় লাল সিমেন্ট বাঁধানো বেদী। একটি বেদীর ওপর কাঠের ফ্রেমে ঝুলছে বিরাট আকারের এক ঘণ্টা।

সেঁজুতি আমাকে একটি বেদীর ওপর বসতে বলে নিজে পাশে বসল। আমাদের পেছনে রইল শালগাছের জটলা আর তার পেছনে চার্চ। আমরা এখন সামনের দিকে তাকিয়ে বসেছি। দু'পাশে পাহাড় জুড়ে গভীর বন। সামনে বিরাট এক উপত্যকা। উপত্যকার শেষ সীমায় পাহাড়ের রঙ অস্পষ্ট ধূসর। কিন্তু বাঁ দিকের একটা পাহাড় অনেক দূর থেকে ছুটে এসে উপত্যকার প্রায় মাঝামাঝি থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। সে পাহাড়ে বন তত ঘন নয়। কিন্তু তার গায়ে সূর্যের আলো পড়ে জায়গায় জায়গায় রূপোর পাতের মত ঝক্ ঝক্ করছে।

একটা ছোট নদী ঐ পাহাড়ের ধারে ধারে নেমে এসে উপত্যকার বুকের ওপর দিয়ে পৈতের মত চলে গেছে। সূর্যের আলো ঐ নদীর এক একটা জায়গায় ঝিলিক দিচ্ছে।

আমি এই বিস্তীর্ণ উপত্যকার দিকে তাকিয়ে রইলাম। উপত্যকার শেষ প্রান্ত থেকে একটি বনরেখা ঐ নদীর তীরে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে থেমে গেছে।

উপত্যকার দক্ষিণে বিরাট বিরাট পাথর সারিবদ্ধভাবে চলে গেছে। মনে হচ্ছে যেন পাথর দিয়ে এককালে প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিল।

সেঁজুতি যেন আমার মনের কথাটি জানতে পেরেছে। ও বলল, ঐ যে দূরে পাথর দিয়ে গড়া ভাঙা প্রাচীরের মত দেখছ, ওটার ভেতরে অনেকে মনে করে একটা দুর্গ এককালে কে বা কারা তৈরি করেছিল। সে দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও কিছু কিছু দেখা যায়। বাকী অংশ অনেকে অনুমান করে ভূমিকম্পের ফলে উপত্যকার তলায় চলে গেছে।

হো-রা বলে ওদেরই কোন রাজা অনেক বছর আগে এখানে রাজত্ব করত। তখন এই সমস্ত পাহাড় আর বন ছিল তারই রাজ্যের মধ্যে।

বললাম, সবই সম্ভব সেঁজুতি। কিন্তু আমি ভাবছি কি বিপুল সৌন্দর্যের ভাণ্ডার এই উপত্যকা। বন, পাহাড়, নদী, প্রান্তর সব মিলে এ এক অবিশ্বাস্য স্বপ্নের রাজ্য।

ও বলল, দূরে দেখছ নদীর তীর ঘেঁষে কিছুটা বন। ঐ বনের ভেতর আর আশে-পাশে হো-দের বসতি। ওরা ঐ নদীটা ব্যবহার করে। বনের গাছপালা লুকিয়ে চুরিয়ে কাটে। কাছে-পিঠে উপত্যকায় সামান্য ফসল ফলায়। এই বনের এটাই ওদের কাছে সবচেয়ে দামী জায়গা।

বলতে বলতেই একটা ছবি ফুটে উঠল চোখের ওপর। একসার মোষ ডান দিকের ঐ ভাঙা পাথরের প্রাচীরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। দু'চারটে প্রায় উলঙ্গ ছেলে তাদের পিঠের ওপরে বসে আছে। হাতে তীর-ধনুক।

মোষগুলো সম্ভবতঃ চরতে চরতে এতদূর এসে পড়েছিল, তারপর রোদ্দুরে ঐ ভাঙা দুর্গ আর শালবনের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল, এখন ফিরে চলেছে গাঁয়ের দিকে। নদীর ধারে ধূ-ধূ প্রান্তরের বুকের ওপর দিয় ছবির মত ওরা এঁকে-বেঁকে চলল। কতক্ষণ আমরা ঐ দিকে তাকিয়ে রইলাম। শেষে কয়েকটা কালো কালো বিন্দুর মত ওরা দূরের অরণ্যে হারিয়ে গেল।

সেঁজুতিকে বললাম, আশ্চর্য সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যায় এখান থেকে উপত্যকা নদী আর পাহাড়ের। মাঝে মাঝে এখানে ছবি আঁকার জন্যে কি করে আসা যায় বল তো?

ও বলল, আমাকে ঘুষ কবুল কর তাহলে আসার বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

বললাম, তোমাকে ঘুষ দেওয়া আমার মত লোকের পক্ষে কি সম্ভব হবে?

এত বেশি বেশি ভাবছ কেন, যৎকিঞ্চিৎ দিলেই আমি খুশী।

কি নেবে বল?

ও অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, যখন গতিশীল কোন কিছু তোমার কলমে বা তুলিতে ধরা পড়বে, তখন তারই দু'একটা স্কেচ আমার হাতে তুলে দিও।

বললাম, এ আর এমন কি কথা।

ও বলল, তোমার কাছে যা সামান্য অনির্বাণদা, আমার কাছে তাই অনেক বড়। জীবনটা একেবারে ঐ দূরের পাহাড়ের মত বদ্ধ অচল হয়ে গেছে। একটু গতি একটু চাঞ্চল্যের ছোঁয়া কোথাও পেলে মনে হয় অনেক পাওয়া।

আমার মনে হল ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠেছে সেঁজুতি। সারাদিন বাংলোর ভেতরে উল বুনতে বুনতে ও উলের একটা গোলার মত হয়ে গেছে। চঞ্চল ডানপিটে মেয়েটা একটা পঙ্গু বাতে ধরা পাখির মত খাঁচায় বন্দী হয়ে আছে।

বললাম, যে ক'টা দিন তোমার কাছে আছি সেঁজুতি, চেষ্টা করব তোমার পুরনো দিনগুলোকে মনে করিয়ে দিতে।

ও আমার হাত দুটো নিজের হাতের ভেতর নিয়ে বলল, হয় এখনি চলে যাও এ বন ছেড়ে নয়তো অনেক অনেক দিন থেকে যাও আমার কাছে।

বললাম, আজও তেমনি পাগল রয়ে গেছ সেঁজুতি।

ও বলল, জানো অনির্বাণদা, শুধু ড্রিঙ্ক করে বলেই যে আমি ওর ওপর বিরূপ তা নয়, ও বিয়ে করার পর থেকেই ভেবে নিয়েছে আমি ওর ঘরে রোজ ব্যবহার করা কাপ প্লেটের মত। যখন চাই তখনই ব্যবহারের জন্যে পাওয়া যাবে।

ওর মনটাকে হাল্কা করে দেবার জন্যে বললাম, দেখ সেঁজুতি, হঠাৎ কোন একটা ঘটনা একটি মানুষের ভেতর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারে।

সেঁজুতি ম্লান হাসি হেসে বলল, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা কর না অনির্বাণদা।

একটি ঘটনা বললেই তুমি ওর ছবিটা স্পষ্ট বুঝতে পারবে। ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসার এল একদিন ইন্সপেকশনে। ও তার গাড়িতে আমাকে তুলে দিয়ে বলল, স্যার মিসেস ভট্‌চায আপনাকে যদি সিরিবুরুর বাংলোতে পৌঁছে দেয় তাহলে কি খুব অসুবিধে হবে?

ওর হায়ার অফিসার বলল, ঠিক আছে মিঃ ভট্‌চায, ভাবনার কিছু নেই, আপনি এখানকার কাজ শেষ করে ধীরে-সুস্থে আসুন।

ও আমার কানে কানে ফিস ফিস করে বললে, বাবুর্চি আছে ওখানে, গিয়েই ডিনারের অর্ডার দিও। দেখো যেন অভ্যর্থনার এতটুকুও ত্রুটি না হয়।

আমি তখন প্রায় নতুন এসেছি ফরেস্টে, ওকে তখন চিনে উঠতে পারিনি। স্বামীর উদ্বেগটুকু দূর করার জন্যে মাথা নেড়ে বললাম, তুমি ভেবো না, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব। কাজ হয়ে গেলেই কিন্তু চলে এসো।

ও মাথা নাড়ল। আমি পরম নিশ্চিন্তে সিরিবুরুর বাংলোর দিকে রওনা দিলাম।

পথেই বুঝলাম, লোকটা ভীষম রকম গায়ে-পড়া গোছের। আমি ওর কথার জবাব দিচ্ছিলাম, কিন্তু প্রায় সারাক্ষণই সিঁটিয়ে বসেছিলাম।

লোকটা বলল, মিসেস. বনে থাকলে কিন্তু শহরের সভ্যতা-ভব্যতাগুলো ছাড়তে হবে। এখানে পশুপাখিদের জীবনই প্রায় আমাদের জীবন! ওরা স্বাধীন, মুক্ত। ওরা আদিম জীবনের স্বাদ জানে।

একটু সন্ধ্যা নামতেই ও আমার গা ঘেঁষে বসার চেষ্টা করতে লাগল। গাড়ি সামান্য টাল নিলেই ও প্রায় হুড়মুড়িয়ে পড়ছিল আমার ওপর।

এক সময় বলল, আপনি সত্যি সুন্দর। যেমন ঘর সাজানোতে তেমনি নিজেকে সাজানোতে।

আমি ওর কথা শুনে তো ঘামছি। সামনে যে ড্রাইভার বসে আছে সেদিকে লোকটার খেয়ালই নেই।

শেষ পর্যন্ত বলল কি, মিঃ ভট্‌চায সত্যিই ভাগ্যবান। আপনাকে পেলে কোন পুরুষই না নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করে বলুন।

গাড়ি এসে পৌঁছতেই আমি বাংলোতে গিয়ে চোখে-মুখে মাথায় জল দিলাম। বাবুর্চিকে খাবার অর্ডার দিয়ে একটা ঘরে ঢুকে বিছানায় এলিয়ে পড়লাম। মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছিল।

লোকটা তখন বসেছিল বারান্দায় ইজিচেয়ারের ওপর।

কিছুক্ষণ পরে বাবুর্চি এসে বলল, মেমসাব চা তৈরি করেছি, সাহেবের সঙ্গে আপনি কি বাইরে খাবেন?

বললাম, তুমি এখানেই আমাকে দাও। এ ঘরে আলো দিতে হবে না, সাহেবের কাছে আলো নিয়ে যাও। সাহেব জিজ্ঞেস করলে বোল আমার একটু মাথা ধরেছে।

ব্যস, আর যায় কোথা, ঐ অছিলায় লোকটা ঢুকে পড়ল আমার ঘরে। বলল, মিসেস ভট্চায, খুব খারাপ বোধ করছেন কি ? ওষুধবিষুধের কিছু ব্যবস্থা—বলতে বলতে আমার খাটের একেবারে গায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

ভাগ্যিস সে সময় বাবুর্চিটা আলো নিয়ে এল ঘরের ভেতর। সাহেব অন্ধকারে কিছু দেখতে পাবে না তাই বুদ্ধি করে ও আলো এনেছে। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, কিন্তু ধমক খেল বাবুর্চি, বুড়বক কোথাকার, মেমসাবের মাথা ধরেছে আর তুমি একটা জ্বলজ্বলে আলো নিয়ে হাজির হলে!

আমি বিছানায় ইতিমধ্যেই উঠে বসেছিলাম। তাড়াতাড়ি বললাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি আবার অন্ধকার ঘরে একা থাকতে পারি না।

লোকটা অমনি বলে উঠল, ভয় করে বুঝি ? এই আমিই তো রয়েছি।

বললাম, বেয়ারা, আলো এখানে থাক, তুমি সাহেবের জন্যে একটা কুর্শি নিয়ে এসো বরং।

বেয়ারা-কাম-বাবুর্চি বেরিয়ে গেল।

ঠিক সেই সময় বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। আমি যেন প্রাণ পেলাম অনির্বাণদা। নিশ্চয়ই মিঃ ভট্চায এসেছে মনে করে আমি প্রায় দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এসে দেখি গাড়ি থেকে নামল সুজন সিং।

এই লোকটা সম্বন্ধে তখন আমার বিশেষ কোন ধারণা গড়ে ওঠেনি। দু'চারবার আমাদের বাংলোতে এসে ওর সঙ্গে ড্রিঙ্ক করে গেছে মাত্র।

আমার সঙ্গে অত্যন্ত সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছে। সুতরাং মদ খেলেও সুজন সিংকে বদ লোক বলে ভাববার কোন কারণ ঘটেনি আমার।

সুজন সিংকে একা নামতে দেখে আমি একটু দমে গেলাম. মিঃ ভট্চায এল না দেখে আমার যেন কান্না পাচ্ছিল।

সুজন সিং বাইরে দাঁড়িয়ে বাবুর্চিকে ডাক দিল। বাবুর্চি এলে গাড়ির ভেতর থেকে মালগুলো নামিয়ে নিতে বলল।

ইতিমধ্যে ফরেস্ট অফিসার এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। সুজন সিং লম্বা একটা সেলাম লাগাল। কোন রকমে আধখানা হাত তুলল অফিসারটি। বেশ বুঝলাম সুজন সিং আসাতে মেজাজটা তার গরম হয়ে উঠেছে। কিন্তু মেজাজ সরিফ হতে বেশি দেরি লাগল না যখন সুজন সিং কর্তার কাছে মদের তালিকাটা পেশ করল।

রান্না শেষ হবার আগেই একবার গ্লাস ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। তারপর ডিনার চুকলে দুজনে জমিয়ে বসল মদের বোতল নিয়ে।

মদের ঘোরে আমার হাত ধরে অফিসারটা তো টানাটানির যোগাড়। ওদের সঙ্গে বসে আমাকেও মদ গিলতে হবে। আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

সুজন সিং সামনে এসে দাঁড়াল। মাতাল অফিসারটার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল গেলাসের সামনে। যখন লোকটা বেহুঁশ মাতাল হয়ে পড়ল তখন তাকে বিছানায় ঠেলে শুইয়ে দিয়ে বারান্দায় আমার পাশে এসে দাঁড়াল সুজন সিং।

আমি ওকে দেখে ভয় পাচ্ছিলাম লক্ষ্য করে ও আমাকে বলল, বহিনজী, তোমার ইজ্জৎ লিয়ে শয়তান খেলা করবে এ আমার জান থাকতে হতে দিব না। ডর না করে ঘর বন্ধ করে তুমি আরাম কর রাতভোর।

ওর মুখে এই আশ্বাসের কথা শুনে সে রাতে আমি প্রাণ ফিরে পেলাম।

পরে আরও অনেক ঘটনার ভেতর দিয়ে জানতে পেরেছিলাম, তোমাদের রেঞ্জার ওপরের

অফিসারদের মন রাখার জন্য তার স্ত্রীর মান খোয়াতেও পেছ-পা নয়।

কিন্তু আমি অবাক হয়েছিলাম সেদিন মাতাল সুজন সিংয়ের কাণ্ড দেখে।

পরে ওর আগ্রহে আমি ওকে বাংলা শেখাই।

একদিন ঐ ভয়াবহ রাতের ঘটনা নিয়ে সুজন সিং আর আমার ভেতর কথা হচ্ছিল।

আমি বললাম, তুমি সে রাতে সিরিবুরুর বাংলোতে না গেলে আমাকে বোধহয় পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়তে হত।

সুজন সিং বন কাঁপিয়ে হাসল। হেসে বলল, একটা মাতালকে তুমি একা ঘায়েল করতে পারতে না বহুরানী? একটা ধাক্কা দিলে ওহি তো খাদে গড়ায়ে পড়ত।

বললাম, তোমার কি সে রাতে বাংলোয় আসার কথা ছিল?

ও বলল, একদম না। আমি মিঃ ভট্‌চাযের সঙ্গে দেখা করতে এসে শুনলাম, তুমি আর ঐ অফিসারটা সিরিবুরুর বাংলোতে বেরিয়ে গেছ। কথায় কথায় আরও জানলাম মিঃ ভট্‌চায রাতে ও বাংলোতে আর যাবে নাই। বহুরানী, বনে শিকার করতে বের হলে আমি দূর থেকে জানোয়ারের গন্ধ পাই। ঐ জানোয়ার অফিসারটাকে আমি চিনতাম। আমাকে একবার ঐ শুয়ার কা বাচ্চা হো-দের গাঁওতে লিয়ে যেতে বলেছিল। সেখানে ওর আঁখ দেখে মালুম হয়েছিল শালা মেয়েমানুষদেরকে গিলে খাচ্ছে। আমি আরও জানতাম ও হারামের বাচ্চা পাঁড় মাতাল আছে।

তাই একটা খারাপ গন্ধ আঁচ করে মিঃ ভট্‌চাযকে না বলে সে রাতে আমার টেন্ট থেকে দামী দামী মদের বোতল নিয়ে সিরিবুরুর বাংলোতে গাড়ি ছুটায়ে গিয়েছিলাম।

ওকে বললাম, সে রাতে বনের দেবতার মত তুমি গিয়ে আমাকে রক্ষা করেছিলে।

ও দারুণ লজ্জা পেয়ে জিভ কেটে বলল, ছি ছি বহুরানী, সুজন সিংকে দেওতা বলছ তুমি! ও একটা মাতাল আছে, শালা একদম বেহুঁশ মাতাল।

আবার সেই হা হা করে বন কাঁপানো পাখি ওড়ানো হাসি।

আমি সেদিন জেনেছিলাম আমার স্বামীর চেয়ে এই মাতাল ইজারাদার অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। আর এও জেনেছিলাম এই গভীর সারান্দা বনে একটি মাত্র খাঁটি মানুষ আছে, আর সব ক'টা জানোয়ার হয়ে গেছে। যদি কোনদিন মান নিয়ে টানাটনি পড়ে তাহলে ঐ মাতাল সুজন সিংই আমাকে রক্ষা করতে পারবে, আর কেউ নয়।

সেঁজুতির কথা শেষ হলে বললাম, আশ্চর্য মানুষ তো সুজন সিং। লোকটার ওপর মাতাল বলে যে খারাপ ধারণাটা ছিল তা উবে গিয়ে মনে হচ্ছে, দুনিয়ায় এমন মাতাল থাকলেও লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই!

এক ঝাঁক পাখি মাথার ওপর দিয়ে শন শন শব্দে উড়ে যেতেই আমরা তাকালাম। পেছনের পাহাড়ে সূর্যাস্তের আয়োজন। শীতের শেষ বিকেলে পাহাড়ের পেছন থেকে আলোর রশ্মিগুলো আকাশের দিকে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল। এমন কোমল একটা সোনালী মধুর রঙ ছড়াচ্ছিল যে তা ভোলার নয়।

পাখিগুলো এখন আমাদের সামনের উপত্যকার উপর দিয়ে উড়ে চলেছে! গুণটানা ধনুকের ভঙ্গিতে উড়ে যাচ্ছে বিরাট ঝাঁকটা।

এতগুলো পাখি তবু কি অদ্ভুত শৃঙ্খলা ওদের ভেতর।

এবার ওরা একটা তীরের ফলার মত হয়ে গেল। কিছু সময়ের ভেতর এক ছাড়া গ্রন্থিহীন মালার মত ওরা নদীর তীর ধরে দুলতে দুলতে চলল। এরপর নীল নীল পাহাড় আর সবুজ সবুজ বন তাদের ডেকে নিল রাতের বিশ্রামের জন্যে।

বললাম, সেঁজুতি, এখানে না এলে আমার জীবনে অনেক কিছু অদেখা থেকে যেত।

ও হেসে বলল, আরও অনেক কিছু দেখতে পাবে, শুধু যাবার কথাটি মুখে এনো না।

আমিও ওর হাসিতে যোগ দিয়ে বললাম, বনের প্রেমে পড়ে গেলে তখন তাড়ালেও যাব না কিন্তু।

ও কিশোরীর মত আমার হাতে একটি চড় মেরে ধরে ফেলল হাতটা। বলল, আমার কাছে থেকে তুমি অন্যকে ভালবাসবে সে আমি সইতে পারব না।

বললাম, তোমার ঈর্ষাটাও যে এত মধুর তা আগে জানতাম না।

ও বলল, তুমি আমার কতটুকু জান অনির্বাণদা!

বললাম, তোমার যতটুকু জেনেছি তা সুন্দর, আর যা জানতে পারিনি তা আরও সুন্দর।

ও অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, কি রকম?

বললাম, তুমি যেখানে অচেনা সেখানে তোমাকে ঘিরে অজানা রহস্য। তোমার. সে রহস্যের রূপ সুন্দরতর।

ও অন্যমনা হয়ে গেল। ভারী সুন্দর একটি গান এল ওর গলায়। প্রথমে ও সুর ভাঁজল কতক্ষণ। তারপর এক সময় বলল, জানো অনির্বাণদা আমি আর গান গাই না আজকাল। সব কথা ভুলে যাই।

ধীরে ধীরে ও গাইল :

বনে যদি ফুটল কুসুম নেই কেন সেই পাখি।
কোন্ সুদূরের আকাশ হতে আনব তারে ডাকি।।
হাওয়ায় হাওয়ায় মাতন জাগে,
পাতায় পাতায় নাচন লাগে গো—
এমন মধুর গানের বেলায় সেই শুধু রয় বাকি।।

এ পরিবেশে গান আপনিই এসে যায় গলায়।

গান শেষ হলে বললাম, সেঁজুতি, সেই যে স্কেচ করতে যেতাম কত দূরে দূরে বালিগঞ্জের ট্রেনে করে। তারপর নেমে পড়তাম কোন এক অখ্যাত স্টেশনে। পায়ে হেঁটে পেরিয়ে যেতাম মাঠ ঘাট। কোন কৃষ্ণচূড়া অথবা বট অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে যেতাম স্কেচ করতে, আর তুমি পাশে বসে একটার পর একটা গান গেয়ে শোনাতে। সেদিনগুলো মন থেকে মুছে ফেলি কি করে সেঁজুতি।

ও হঠাৎ বলল, আমরা এখানে নতুন করে ছবি আঁকা শুরু করব অনির্বাণদা।

বললাম, খুব রাজি। কেবল তোমার কর্তাটি গররাজি না হলেই বাঁচি।

ও বলল, রেঞ্জার নিজের খেলা নিয়ে এমনি মেতে রয়েছে যে আর কারো দিকে তাকাবার ফুরসতই তার নেই।

আমরা বসে বসে এমনি টুকরো টুকরো গল্প করছিলাম, হঠাৎ গীর্জায় প্রার্থনার ঘণ্টা বেজে উঠল। একটানা কতক্ষণ বেজে চলল সে ঘণ্টা। তারপর এক সময় থামল।

আমরা বসে বসে শুনতে পেলাম, চার্চের ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। উপত্যকা থেকে মুখ সরিয়ে চার্চের দিকে ফিরে বসলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ঘটনা ঘটল।

যারা চার্চের ভেতরে প্রার্থনার জন্য ঢুকছিল তাদের থেকে একটি মেয়ে ছিটকে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। দূর থেকে মেয়েটিকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে সেঁজুতি।

দেখলাম মেয়েটি এ দেশীয় বটে। কিন্তু শিল্পের দিক থেকে এমন দেহগঠন সত্যি দুর্লভ। অতি পরিচ্ছন্ন একটি সাদা কাপড় এমনি আঁটসাঁট করে পরেছে যে দেহের সীমারেখাগুলো সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাথার খোঁপা একদিকে এলিয়ে বাঁধা, সমুদ্রতীরের নুলিয়া মেয়েদের মত। ঐ খোঁপায় লাল আর সাদা ফুল গোঁজা।

মেয়েটি হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। কাছে এলে দেখলাম, সারল্যের সঙ্গে আশ্চর্য বুদ্ধির দীপ্তি মিশে আছে।

সেঁজুতিকে দেখে ও বলে উঠল, এখানে একা বসে আছ কেন?

সেঁজুতি বলল, একা কই, পাশেই তো আরো একজন রয়েছে।

ও আমার দিকে মুখখানা কাত করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে তাকিয়ে রইল। মেয়েটির বয়েস অনুমান বিশ-বাইশের বেশি হবে না। ও দেহাতী হিন্দী আর টুকরো টুকরো ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলছিল।

সেঁজুতির উত্তর দেবার পরে বেশ খানিকটা সময় আমাকে দেখতেই কেটে গেল মেয়েটির। তারপর আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সেঁজুতিকে বলল, তোমার মানুষটি কোথায়।

সেঁজুতি ঠিক আগের মতই বলল, এই তো আমার পাশেই রয়েছে।

ও মাথা নেড়ে নেড়ে অবিশ্বাসের হাসি হাসতে লাগল।

সেঁজুতি এবার পাল্টা প্রশ্ন করল, তোমার মানুষটি কোথায়?

ও প্রথমটা একটু চমকে উঠল। তারপর হেসে হেসে বলল, কোন মানুষটার কথা বলছ?

সেঁজুতি অমনি বলে উঠল, আমি তোমার পয়লা নম্বরের মানুষটার কথাই বলছি।

মেয়েটার গায়ে সেঁজুতির সূক্ষ্ম কথার খোঁচাটা বিঁধল না।

ও বলল, সুজনের কথা বলছ, ও কি এসেছে এ তল্লাটে!

সেঁজুতি অবাক হয়ে বলল, সেকি, সে তো তোমার কাছেই গেছে, সেই তিনটে নাগাত!

সুন্দর মিষ্টি মুখখানায় একটুখানি মেঘছায়া রঙ লাগল।

ও বলল, কই না তো। তাহলে ও গেছে আমাদের সাসাংদার আস্তানায়। ও কি জানে না শুক্রবার আমি এই চার্চের এলাকায় থাকি। ছোট ছেলেমেয়েদের বাইবেলের গল্প শোনাতে হয়।

এবার আমি কথা বললাম, সিং সাহেবের আসার কিন্তু সময় হয়ে গেছে। এখুনি দেখা হয়ে যাবে।

মেয়েটি আর দাঁড়াল না। আমার কথা শেষ হতেই মিষ্টি একটা হাসি হেসে প্রায় দৌড়ে পালাল চার্চের দিকে।

সেঁজুতি আমার মুখের ওপর স্থিরদৃষ্টি ফেলে বলল, কেমন দেখলে?

হেসে বললাম, দেখলাম আর কই।

ও বলল, মিথ্যে কথাটি আর বোল না মশাই। দেখা শুধু নয়, দামী লেন্সে বুকের ভেতরের ফিল্মে ফটো তোলা পর্যন্ত হয়ে গেছে।

বললাম, তাহলে সে ফটো একেবারেই মাটি হয়ে গেছে। একই ফিল্ম দু'বার ইমপ্রেশান পড়লে কি আর ফটো ঠিক থাকে।

কথাটা বুঝতে না পেরে মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলল সেঁজুতি, হেঁয়ালী রাখ, বলত তোমার আসল কথাটা।

বললাম, ফিল্মে আর একটি মেয়ের ছবি আগেই পড়েছিল, এখন যদি এ মেয়েটির ছবিও পড়ে তার ওপর তাহলে অবস্থাটা কি হবে নিশ্চয়ই তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

বুঝেছি। তবে তুমি যে এত হিসেবী তা আমি জানতাম না।

বললাম, মেয়েটি এমন করে চলে গেল কেন?

তোমার বোকামীর জন্য।

আমি বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ও আবার বলল, তুমি সোজা-সুজি তার প্রেমিকের আসার খবরটা ঘোষণা করলে তাই ও লজ্জা পেয়ে সরে গেল।

বললাম, আমার যদি কিছু অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে বলব ও আবার ফিরে আসবে এখানে। আমার দেওয়া খবরটা পেয়ে যেমন এখানে থাকতে পারল না বেশিক্ষণ, তেমনি দূরেও সরে থাকতে পারবে না বেশিক্ষণ।

চার্চের ঘড়ির কাঁটা সাড়ে পাঁচটার ঘর ছুঁই ছুঁই এমন সময় সুজন সিং এসে গেল।

এসেই বলল, দোষ নিও না বহুরানী, বহুৎ দেরী হয়ে গেল।

সেঁজুতি বলল, এমন কিছু দেরী হয়নি, আমরা গল্প করতে করতে সময়ের কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ তুমি যে জন্যে গাড়ি ছুটিয়ে গিয়েছিলে তার কি হল?

সুজন সিং শালগাছের কাণ্ডে দেহের ভর রেখে বলল, বহুরানী, চিড়িয়া কোন্ বনে ফিরছে হদিস করতে পারলাম না।

সেঁজুতি গলায় বিস্ময় ঢেলে বলল, সে কি কথা সিং সাহেব, পোষমানা চিড়িয়া বুঝি এমন করে পালিয়ে বেড়ায়?

সুজন সিং বলল, বহুৎ ঢুঁড়েছি বহুরানী। ঘরে কুলুপ লাগায়ে কোন বাজারে মুর্গীর লড়াই দেখতে গিয়ে থাকবে। আমি আসব জানলে বাহির হত না একদম।

সেঁজুতি বলল, এমনও তো হতে পারে, লিজার মিষ্টি হাসি অন্য কেউ চুরি করে দেখছে।

সুজন সিং হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে বলল, তাহলে সুজন সিং বেকার পাঁচ বরষ ধরে বক্সিং লড়েছে।

বহুরানী, লিজার হাসিটাতে এ বান্দা আর কাউকে ভাগ বসাতে দিতে পারবে না। বরং ওর হাসিটা চিরদিনের মত বন্ধ করে দেব।

সেঁজুতি বলল, তুমি তো বড় সাংঘাতিক লোক দেখছি সিং সাহেব। অমন মিষ্টি হাসি তুমি ঘুষি মেরে বন্ধ করে দেবে!

হা হা করে হাসতে গিয়ে চার্চের কথা ভেবে থেমে গেল সুজন সিং।

বলল, তুমি কি সত্যি আমার কথা বিশোয়াস করলে বহুরানী? ওকে আমি কি কখনো মারতে পারি!

সেঁজুতি বলল, তুমি সব পার, তোমাকে বিশ্বাস নেই সিংসাহেব, কোন কিছুতে বিশ্বাস নেই।

সুজন সিং হাতজোড় করে দেহটাকে একটুখানি সামনে ঝুঁকিয়ে বলল, মাপ কিজিয়ে বহুরানী। বান্দা অ্যায়সা বাৎ আউর কভি নেহি বোলেঙ্গে।

সেঁজুতি হেসে বলল, বেশ বেশ, মাপ যখন চাইলে তখন আর শাস্তির কোন প্রশ্নই নেই। বোস এখানে, এবার আমি তোমাকে একঠো মিঠাই খিলাব। এ তল্লাটে সবসেরা মিঠাই।

বলেই সেঁজুতি পায়ে পায়ে চার্চের দিকে চলে গেল।

সুজন সিং আমার পাশে বসে বলুল, বহুরানীর দিল চৌধুরীবাবু একদম সাফ্। বহুরানীর লিয়ে জান্ দিতে ভি আমি তৈয়ার।

বললাম, আপনার আজ মিঠাইয়ের যোগ আছে সিং সাহেব। দুর্ভোগের পর মিষ্টি যোগটা ভালই হবে।

সুজন সিং বলল, বহুৎ খেয়াল আছে বহুরানীর। কত খাওয়ায়েছে।

বলেই মাথা নেড়ে নেড়ে হাসতে লাগল।

কতদিন এ বনে কাটল আপনার সিং সাহেব?

একটু ভেবে সুজন সিং বলল, তা ছ'সাত বরষ তো হইয়ে গেল।

আপনার দেশ কোথা সিংজী?

সুজন সিং বলল, একঠাই আমার কোন দেশ নাই চৌধুরীবাবু। আমি ক্ষেত্রী আছি। তিন-চার পুরুষ আগাড়ী দেশ ছিল আমার পাঞ্জাবে, তারপর জয়পুর। সেখান থেকে পিতাজী একটা মাইনের ম্যানেজার হয়ে সিংভূম জিলায় চলিয়ে এসেছিল। এখন আমরা বিহারের মানুষ বলতে পারেন।

বললাম, সংসারে কে আছে আপনার?

বাপের এক লেড়কা আছি আমি। মা আর বাপ—বলে সুজন সিং আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখালে।

বিয়ে করেন নি কেন?

সুজন সিং বলল, প্যার শেষ হল না চৌধুরীবাবু, সাদি করব কাকে?

বললাম, তা প্রেম করে বিয়ে-সাদি করা একদিক থেকে ভাল।

ও বলল, চিনলাম নাই, জানলাম নাই, খপ্ করে হাতখানা ধরে বললাম, চল আমার ঘর। ওতে দিল ভরবে নাই চৌধুরীবাবু। প্যার করলাম, পাব কি না পাব তাই লিয়ে কলিজাখান, একদম টুটাফুটা হইয়ে গেল, হাঁ, সেই আওরাৎ জনমভোর দিল খুশ্ করিয়ে দিবে চৌধুরীবাবু। দুখ দিয়েছে, তাই মালুম হবে, হাঁ, জিনে নিলাম বটে।

বললাম, এমন প্যারের খবর আছে নাকি?

সুজন সিং হাসল। ওকে এই প্রথম আওয়াজ না করে বিনীত একটা হাসি হাসতে দেখলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে পায়ের সাড়া পেয়ে পেছন ফিরে দেখি সেঁজুতি ঐ মেয়েটির হাত ধরে টেনে আনছে।

মেয়েটি বাধা দেবার চেষ্টা করেও হার মানছে বার বার। টুকরো টুকরো হাসির লহর তুলে এসে দাঁড়াল আমাদের পাশে।

সুজন সিং বলল, আরে ব্যস, বহুরানী, এ তো বহুৎ বঢ়া মিঠাই আছে।

সেঁজুতি বলল, দেখলে তো, আমি যা বলি তাই করি, মিথ্যে আশা কাউকে দিই না।

সুজন সিং বলল, একবার বেয়াদপি মাফ করতে হবে বহুরানী। একঘণ্টা আউর ছুট্টি মঞ্জুর করিয়ে দাও।

সেঁজুতি বলল, যাচ্ছ যাও, তবে তুমি যে-রকম হুল্লোড়বাজ আছ, মেয়েটাকে যেন আবার কষ্ট দিও না।

বাজপাখির মত ছোঁ মেরে লিজাকে টেনে নিয়ে চলে গেল সুজন সিং। লিজার ক্ষীণ প্রতিবাদ বাজের দৃঢ় নখে বদ্ধ ঘুঘুর মত মনে হল।

একটু পরে গাড়ির গর্জন শোনা গেল, পরমুহূর্তে একটা আলো ঝিলিক দিয়ে অন্ধকার অরণ্যে হারিয়ে গেল।

আমরা সেই বেদীর ওপর আবছা অন্ধকারে পাশাপাশি বসে রইলাম।

বসে থাকতে থাকতে তরল একটা অন্ধকার শীতের বাতাসে ঢেউয়ের মত বইতে শুরু করল। আকাশের দিকে তাকালাম। অগণিত নক্ষত্র শীতের আকাশে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

আমার মনে হল, আমরা যে বেদীটার ওপর বসে আছি সেটা একটা চলমান নৌকো হয়ে গেছে! আমরা সামনের উপত্যকা ভরা অন্ধকারের অগাধ জলরাশি ঠেলে এগিয়ে চলেছি। আমার হাতে ধরা আছে সেঁজুতির হাতখানা। আমরা নির্বাক। এই আশ্চর্য অন্ধকার আমাদের অনেক নিবিড় করে দিয়েছে। আমরা হারিয়ে যাচ্ছি সবার আড়ালে এক দুস্তর দিকদিশাহীন সমুদ্রের অতল গভীরে।

অন্ধকারে হঠাৎ বেজে উঠল সেঁজুতির গলা। আমার সারা শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিল।

ও বলল, তোমার হাতটা এত গরম আর এমন থরথর করে কেঁপে উঠছে কেন অনির্বাণদা।

হাসির চেষ্টা করে বললাম, কই আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না সেঁজুতি।

তুমি নিজেকে একেবারেই বুঝতে পার না অনির্বাণদা, আমি কিন্তু তোমাকে অনেক বেশি বুঝতে পারি।

বললাম, তোমার কাছে আমার যা ধরা পড়ে, আমি জানি সেটাই আমার আসল পরিচয়।

সেঁজুতি আমার হাত ধরে তেমনি বসে রইল।

একসময় বলল, অনির্বাণদা, অন্ধকার যে এত গভীর, এমন করে বুক ভরে দেয় তা আজ এই নিবিড় বন, উপত্যকা আর আকাশের তলায় না বসলে বুঝতে পারতাম না। আজ বেশ বুঝতে পারছি, আলো নয়, অন্ধকারই দুটি হৃদয়কে সবচেয়ে বেশি করে পরস্পরের কাছে চিনিয়ে দিতে পারে।

সেঁজুতি কথা বলছিল, আমি কিন্তু একটা ভয়কে আমার মনের ভেতর উঁকি ঝুঁকি মারতে দেখলাম।

আমার মনের গভীর গহনে যে চিতাটা লুকিয়ে ছিল, সে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল একেবারে নাগালের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা হরিণটার ওপর। কিন্তু এই রক্তক্ষরা দৃশ্যের ভাবনাটা আমাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল যে আমি ভয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠছিলাম আর কি! না, গলা দিয়ে আওয়াজটা বেরোল না। শুধু সেঁজুতির হাতখানা আরও জোরে চেপে ধরে নিজেকে রক্ষা করলাম।

আমি একটা কথা পরে ভেবেছিলাম, সে রাতে সেঁজুতি আমার এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকেও কিন্তু একটুও সুযোগ কেন গ্রহণ করে নি। সে যে আমাকে সারা মন দিয়ে চায় তা তো আমার অজানা নয়। তবু সেঁজুতি সেই অন্ধকারের ক্ষুধিত মুহূর্তে নিজেকে সংযত রেখেছে। বোধহয় যাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসা যায় তার কাছে ক্ষুধার উলঙ্গ চেহারাটা তুলে ধরতে প্রাণ সায় দেয় না। সে আমার, এই অনুভূতির রোমাঞ্চটুকু দেহ ছাড়িয়ে অনেক গভীরে গিয়ে পৌঁছয়।

সেদিন আমি আর সেঁজুতি অনেকক্ষণ বসেছিলাম সেখানে। কথা আমাদের ভেতর খুবই কম হয়েছিল, কিন্তু আমরা দুজনকে বেশি করে পেয়েছিলাম।

সেখানে বসে থাকতে থাকতে সেঁজুতি একসময় বলল, চার্চের দিকে তাকিয়ে দেখ, পাহাড়ের উঁচুতে যে ঘরখানায় ফাদার থাকেন সেটা থেকে ক্ষীণ একটা আলোর রশ্মি বেরিয়ে আসছে। উপত্যকার ওপার আর আশপাশের পাহাড়গুলো থেকেও ফাদারের ঐ আলোটুকু দেখা যায়।

বললাম, চল না একবার ফাদারের সঙ্গে দেখা করে আসি।

সেঁজুতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, খুব ভাল মানুষ ফাদার বার্নার্ড। আশী বছরের বৃদ্ধ, মুখে হাসিটি লেগে আছে সারাক্ষণ।

আমরা পায়ে পায়ে চার্চের দিকে এগিয়ে চললাম। সেঁজুতি আগে আগে আমার হাত ধরে চলল তার চেনা পথে।

আমরা পাহাড়ের গায়ে কাটা সিঁড়ি বেয়ে অতি সাবধানে অনেক ওপরে উঠে এলাম। হাতল শক্ত না হলে সেই অন্ধকারে এত ওপরে ওঠা অসম্ভব হত।

ফাদারের ঘরের দরজা ভেজান ছিল। হাত লাগাতেই খুলে গেল। অমনি ঘরের ভেতরের আলোটা ছাড়া পাওয়া সোনালী ডানার চিলের মত উড়ে গিয়ে বসল পাশের ন্যাড়া পাহাড়ের একটা উঁচু খাঁজে।

ভেতরে ফাদার বসে আছেন। টেবিলের ওপর, আলোর সামনে বিরাট আকারের একখানা বই খোলা। নিবিষ্ট মনে অশীতিপর এক বৃদ্ধ আশ্চর্য মগ্নতায় ডুবে গেছেন। তাঁর পেছনের দেয়ালে যীশুখ্রীষ্টের ছবি। স্বল্প আলোয় মনে হচ্ছিল যীশু নিবিষ্ট ভক্তের দিকে করুণার দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন।

সেঁজুতি ফাদারের সামনে গিয়ে মাথা নত করে দাঁড়াল। আমিও তার দেখাদেখি তাই করলাম।

ফাদার পায়ের সাড়া পেয়েছিলেন। মুখ তুলে তাকালেন। কুঞ্চিত দুটি চোখের দৃষ্টি আমাদের ওপর ফেলে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

আমি তাকিয়েছিলাম তাঁর প্রশান্ত আনন্দময় মুখখানার দিকে।

সেঁজুতি বলল, আমি ফরেস্ট রেঞ্জার মিঃ ভট্চাযের স্ত্রী সেঁজুতি, ফাদার। কলকাতা থেকে আমার শিল্পী বন্ধুটি এসেছে, তাকে আপনার কাছে নিয়ে এলাম। ও আপনার আশীর্বাদ চায়।

ফাদার উঠে দাঁড়িয়ে হাতখানা আশীর্বাদের ভঙ্গিতে একটুখানি তুললেন। তারপর আমাদের দুজনকে সামনের আসনে বসতে বললেন।

আমরা বসলে তিনি সেঁজুতির দিকে চেয়ে বললেন, মিঃ ভট্চাযের কুশল তো?

সেঁজুতি বলল, প্রভুর কৃপায় সব খবরই ভাল।

এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বল কেমন লাগছে?

বললাম, বন আমার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। আজ আপনার এখানে এসে বন, পাহাড়, নদী আর উপত্যকার ছবি একসঙ্গে দেখলাম! এ আমার জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা সন্দেহ নেই।

ফাদার বললেন, ঈশ্বর এখানে সহজেই প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেন। ভোরবেলা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাহাড় পেরিয়ে নেমে আসেন বনে। বনের সবুজ ছুঁয়ে পশুপাখি মানুষজনকে জাগিয়ে ঐ কারো নদীর স্রোতে স্নান করেন। আমি আমার জানালা খুলে ভোরের দেবতাকে দেখতে পাই।

উনি যখন কথা বলছিলেন আমি আশ্চর্য হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল ফাদার এই যে তাঁর প্রভাতের অনুভূতিটুকু প্রকাশ করলেন, এখানেই দেবতার জন্ম হল। মানুষের শ্রেষ্ঠ অনুভূতিগুলিই দেবতার আকার নিয়ে আমাদের মনকে অভিভূত করে।

সেঁজুতি বলল, ফাদার, এত ওপর থেকে আবার প্রার্থনার ঘরে নামতে আপনার কষ্ট হয় না?

আশী বছরের বৃদ্ধ ফাদার হাসলেন। দন্তহীন মুখের নির্মল হাসি।

বললেন, আমার এই ঘর থেকে পঞ্চাশটি বছর ধরে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখেছি। প্রভুর মহিমাকে আর কোথা থেকে এমন করে দেখতে পাব বল। চোখের আলো নেভার আগে পর্যন্ত আমি এখান থেকে ঐ উপত্যকা, বন, পাহাড়, নদী, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত সব কিছু দেখে নিতে চাই।

একটু থেমে আবার বললেন, নীচে নামার কথা বলছ। ওখানে যে প্রার্থনার ঘর। প্রভুকে নীচে নেমে নত হয়ে প্রার্থনা জানাতে হয়। ওঠা নামার কষ্টটুকু আমার আনন্দ দিয়ে ভরিয়ে তুলি।

সেঁজুতি বলল, কি পড়ছিলেন ফাদার?

ফাদার একটু হেসে বললেন, এ কোন ধর্মগ্রন্থ নয়, এ বইখানা এক নাবিকের ডায়েরী। এই বইটি পড়েই আমি ঘর ছেড়েছিলাম। সঙ্গে অবশ্য বইটিকে আনতে ভুলিনি। প্রতিদিন এই বই-এর কয়েকটি করে পাতা আমি পড়ি।

বললাম, আপনার একটুখানি পড়ে শোনাতে কি খুব কষ্ট হবে ফাদার?

বললেন, এটা আনন্দের ব্যাপার। আর যা কিছু মহৎ, যা কিছু প্রেরণা দেয় তা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়।

উনি একটুখানি পড়লেন নাবিকের ডায়েরী থেকে।

খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬২, ৯ই জুন।

এইমাত্র ঝড় থেমে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের উদ্বেগও। একটি তরুণী মা তার শিশুটিকে নিয়ে ডেকের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে আকাশ এতক্ষণ ভয় দেখাচ্ছিল সে এখন শান্ত। দুটো সমুদ্র সারস সাদা ডানা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছে। আগে যেখানে ছিল ভয়ঙ্কর সেখানে এখন সুন্দর হাসছে। যেন সাজ খুলে ফেলে ভয়ঙ্কর হয়েছে সুন্দর। ঢেউগুলো এখনও উত্তাল। যে দোলা দিয়েছিল সে ঝড়ের বাতাস থেমে গেছে, কিন্তু জলের বুকে এখনও স্মৃতির আলোড়ন থামেনি।

তরুণী মা বুকের শিশুটিকে নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। মাথা নত করে অভিবাদন জানাল।

ঝড়ের সময় মেয়েটি ভয়ঙ্কর কিছু পরিণতির কথা ভেবেছিল নিশ্চয়ই, আর সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছিল তার শিশপুত্রকে। আমি নিশ্চয় অনুমান করতে পারি শিশুটিকে স্পর্শ করে সে নিজের মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়েছিল। শুধু কাতর হয়ে পড়েছিল তার শিশুর কথা ভেবে।

মেয়েটি কৃতজ্ঞতার সুর ঢেলে বলল, ক্যাপটেন, আপনার চেষ্টা আর অভিজ্ঞতা আজ জাহাজের এতগুলি প্রাণকে রক্ষা করেছে।

বললাম, নোয়ার জাহাজকে ঈশ্বরই রক্ষা করেছিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাও।

আর তোমার বুকের শিশুটিকে দেখ, কত নিঃশঙ্ক। তুমি যখন প্রাণের ভয়ে কাতর হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেছিলে তখন তোমার ঐ শিশু তার মায়ের বুকে পরম নিশ্চিন্ততার আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল।

ভয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক আচরণ আর বুদ্ধিকে স্থির রাখতে পারলে অনেক সময় ভয়ঙ্কর আমাদের তেমন করে ভয় দেখাতে পারে না।

আরও অনেকে দল বেঁধে এলেন। আমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলেন।

ওঁরা চলে গেলে ওদের দেওয়া সবটুকু কৃতজ্ঞতা আমি ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করে দিলাম।

আমার জাহাজের যাত্রীরা এখন বুক ভরে শান্ত বাতাস টেনে নিচ্ছে। রোদ্দুরে স্নান করছে। আর নীল সমুদ্রের ঢেউ নিঃশঙ্ক মনে উপভোগ করছে।

খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬২, ১৭ই জুলাই।

বন্দরে আজ তিনদিন আমার জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে ছিল। যাত্রীরা ওঠানামা করেছে। যারা নেমে গেল এ বন্দরে, তাদের প্রিয়জনেরা জাহাজঘাটে খুশীতে জড়িয়ে ধরেছে তাদের। যারা নতুন যাত্রী তাদের বিদায় দেবার জন্য এসেছে অনেকে। জাহাজ ছাড়ার বাঁশী বাজলে ওদের অনেকেই রুমাল নাড়ছে, কেউ কেউ ঐ রুমালে মুছছে উদগত চোখের জল।

আমার বন্দরের বাঁধন খুলল। জাহাজ এগিয়ে চলেছে। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে বন্দরের ছবি। মাছ ধরার নৌকোগুলো পালে বাতাস ভরে নিয়ে সমুদ্র চষে বেড়াচ্ছে।

জাহাজ এখন চলেছে কূলহারা সমুদ্রে। কিন্তু ঠিক এই সময়টিতে যখন সমুদ্রের ঢেউ-এর সঙ্গে আকাশের আলো হীরে-ছড়ানো খেলা খেলছে, তখন আমার মনে হচ্ছে, কেউ নেমে যায় না অথবা কেউ উঠে আসে না। যাত্রীদের এই ওঠা নামা, হাসি কান্না একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একটি আর একটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এই সমুদ্রের অগাধ কান্না আর আকাশের অফুরন্ত হাসির মিলনের মত।

যাত্রীরা বসে বসে দেখছে, হাঙর ঝাঁক বেঁধে চলেছে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তারা চলেছে। যাত্রীদের মনে ঐ হিংস্র হাঙরগুলো সম্বন্ধে কোন ভয় নেই। দূরত্ব তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছে।

ভয় অথবা অন্যায় যা কিছু আমার মনকে আঘাত করে এমন বস্তু থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখতে পারলে আর কিছু ভাবনার থাকে না।

আমার এই জাহাজে অনেক অনেক যাত্রী রয়েছে। এদের কেউ ডাক্তার, কেউ শিক্ষক, কেউ চাকুরে,

কেউ বা আবার ব্যবসায়ী। এদের বৃত্তি, মনের গঠন সবই আমরা আলাদা আলাদা বলে জানি। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ওরা আলাদা নয়, ওরা যাত্রী। ওরা ঝড়ের সংকেত পেলে একই সঙ্গে প্রাণভয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে থাকে। আবার দিনটি সুন্দর আর উজ্জ্বল হলে একই সঙ্গে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানায়।

আমরা যখন নিজের ঘরে বা গ্রামে শহরে থাকি তখন আমরা নিজেদের মনটাকে ছোট ছোট ভাগে বিচ্ছিন্ন বিভক্ত করে কাজে লাগাই। কিন্তু যখন এই সমুদ্রের মত অনেক বড় জায়গায় এসে পড়ি তখন আমাদের ঐ টুকরো টুকরো মনগুলো এক হয়ে যায়।

তাই এই সমুদ্র, এই আকাশ, এই আলো-হাওয়ার খেলায় আমি মেতে আছি। এখানে আমি প্রতিদিন ঈশ্বরের দেখা পাই। সব বিচ্ছিন্নতাকে তিনি এক করে দেন।

পর পর ডায়েরীর পাতা থেকে এ দুটি অংশ পড়ে বৃদ্ধ যাজক নীরব হলেন।

এক সময় মাথা তুলে বললেন, এমনি অজস্র অনুভূতিতে ভরা এই বই-এর পাতাগুলি। কেবল প্রকৃতির বিরাট রূপের কথাই যে এর ভেতর বলে গেছেন ক্যাপটেন তা নয়, ছোট ছোট অনেক ঘটনার ভেতর দিয়ে জীবনের বিচিত্র উপলব্ধির কথা নানাভাবে বলেছেন। একটি খ্রীষ্টান মিশন তার কর্মীদের, জীবন বা ঈশ্বর সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিতে পারে না, এই ভেসে চলা জীবনের নাবিক তার এই সামান্য ডায়েরীতে তার চেয়ে অনেক মূল্যবান অনুভূতির কথা জানিয়েছেন। বাইবেলের পরেই আমার মনে এই বইখানি স্থান জুড়ে আছে।

আমরা একসময় ফাদারের কাছে বিদায় নিয়ে নীচে নেমে এলাম। নামতে নামতেই সুজন সিংয়ের জিপের আওয়াজ পেয়েছিলাম। হর্নটা পাহাড় আর বন কাঁপিয়ে বেজে উঠেছিল।

জিপের কাছে এগিয়ে যেতেই সুজন সিং সকৌতুকে বলল, তোমরা আমাকে ভাবনায় ফেলে দিয়েছিলে বহুরানী। আঁধারে তোমাদের না দেখে ভাবলাম, রেঞ্জার সাহেব এসে হয়তো তোমাদের লিয়ে চলে গিয়ে থাকবে।

সেঁজুতি বলল, এসেছি তোমার সঙ্গে আর নিয়ে যাবে রেঞ্জার, এ কথা তুমি ভাবলে কি করে? এত মেহনত তোমাদের রেঞ্জার সাহেবের কি পোষাবে?

সুজন সিং বলল, আবার ভাবলাম বহুরানীকে বাঘে লিয়ে যায় নাই তো?

সেঁজুতি হেসে বলল, আমাদের এই আর্টিস্ট বন্ধুটি বাঘ বশ করার মন্ত্র জানে। তাই ভয়ে বাঘ আর কাছে ঘেঁষবার সাহস পায় নি। কিন্তু লিজাকে যে বাঘটা ঘিরে ধরেছিল, তার হাত থেকে মেয়েটা ছাড়া পেয়েছে তো?

সুজন সিং বলল, সে বাঘটা বহুৎ লোভী না আছে বহুরানী। সে মানুষ খায় না, মানুষ লিয়ে খেলা করে।

সেঁজুতি আর আমি সুজন সিংয়ের গাড়িতে উঠে পড়লাম। গাড়ি গর্জন করতে করতে বন-পাহাড় কাঁপিয়ে ছুটে চলল।

কত দূর পথ পার হয়ে এলাম তা বোঝার উপায় নেই। যেখানে আলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেখানে বনের নিবিড় গাছপালার ছবি ফুটে উঠছে। পেছনে তাকিয়ে থাকলে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

অনেক পথ পেরিয়ে, হাজার বাঁকের মুখে টাল সামলে আমরা একটা নদীর ধারে নেমে এলাম। শীতের নদী শীর্ণা। অগাধ নুড়ি বিছানো নদী। ঝির ঝির করে জলস্রোত বয়ে চলেছে। সুজন সিং নদীটার ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল।

বলল, কালভার্টের ওপর দিয়ে যেতে হলে অনেক ঘুরে যেতে হবে, তাই নদীর ওপর দিয়ে শর্টকাট করে লিচ্ছি। বর্ষার দিন হলে উসুরিয়া নদী শের কা মাফিক লাফ মেরে চলত। শীতে একদম কাহিল, তোমার এ বান্দার চেয়েও কাহিল বহুরানী।

সেঁজুতি ফোঁস করে উঠল, সুজন সিং কাহিল, তাহলে সারান্দা বনের সবগুলো বাঘ বেড়াল হয়ে গেছে।

হা হা হা হা করে হাওয়া ফাটিয়ে হাসল সুজন সিং।

কিন্তু এ কি হল! সুজন সিংয়ের হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

গাড়ি আর নড়ছে না। নদীর মাঝ বরাবর এসে একদম দাঁড়িয়ে গেল।

লাফ দিয়ে নেমে পড়ল সুজন সিং। হাত দিয়ে স্রোতের বেগ ঠাহর করে বলে উঠল, না ড্ডর করবার কিছু নাই। কিন্তু বহুরানী বিপদ ঘটল।

আমরা ভয় পেলাম। সেঁজুতি বলল, কি বিপদ? গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল কেন?

নীচ থেকে সুজন সিং বলল, পেট্রোল খতম হইয়ে গেছে, গাড়ি আর চলবে নাই।

আতঙ্কে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সেঁজুতি, কি বলছ সিং, এখন উপায়?

সুজন সিং যা বলল তার মর্মার্থ হল, সে দরকার মত পেট্রোল নিয়েই বেরিয়েছিল। কিন্তু লাইটার জ্বালাবার জন্যে লিজার ঘরে সে পেট্রোলের টিনটা একবার নামিয়েছিল, গাড়িতে ওঠাবার কথা বেমালুম ভুলে গেছে।

এখন উপায়! সারারাত এই নির্জন জায়গায় অন্ধকারে অচল গাড়িখানা আগলে বসে থাকা! জন্তু জানোয়ারের কথা ভাবলে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে বরফের মত।

সুজন সিং হেঁকে উঠল, কুছ ডর নেই বহুরানী। থলকোবাদের বাংলো ইখান থেকে দো মাইলটাক পথ আছে। ওখানে ভট্চায সাহেবের গাড়ির পেট্রোল আছে। আমি পাহাড় ডিঙায়ে যাবে আর আসবে ব্যস্। চৌধুরীবাবু আছেন মাৎ ডরো বহুরানী।

জলের ওপর দিয়ে ছপ্ ছপ্ আওয়াজ করতে করতে সুজন সিং একটা বুনো জন্তুর মত উসুরিয়া নদীটা পার হয়ে গেল।

সুজন সিং আমাকে মহা সাহসী পুরুষ মনে করে সেঁজুতি রক্ষার ভার দিয়ে গেলেও আমি এ মহারণ্যে বহমান নদীর ওপর অসহায়ের মত বসে রইলাম।

দুজনের কারো মুখে কথা নেই। সেঁজুতি আমার গা ঘেঁষে বসে আছে।

এতক্ষণ গাড়ি চলছিল, কথা হচ্ছিল, তাই নদীর শব্দটাও তত স্পষ্ট ছিল না, এখন জলপ্রবাহের আওয়াজটা বেশ জোরাল হয়েই কানে বাজতে লাগল।

সেঁজুতি প্রথম কথা বলল, কি দুর্ভোগেই না পড়া গেল!

বললাম, দুর্ভোগ বলেই বা ভাবছ কেন, এটা একটা দারুণ রকম অ্যাডভেঞ্চার।

ও আর কোন কথা বলল না। আমার আরও কাছে ঘেঁষে বসল।

আমার মানসিক অবস্থা যে সেঁজুতির চেয়ে ভাল ছিল তা নয়, কিন্তু ওকে সাহস দেবার জন্যেই কথাগুলো বললাম।

আমার দৈহিক শক্তি কিংবা মানসিক শক্তি কোনটারই ঘাটতি ছিল না, কিন্তু নৈশ প্রকৃতির এই ভয়াল আয়োজনের কাছে আমাদের সব আস্ফালনই নিষ্ফল।

ছপ্ ছপ্ আওয়াজ করতে করতে কারা সব যেন নদী পার হয়ে চলেছে। আমরা দুটিতে রুদ্ধশ্বাসে বসে আছি। বেশ খানিকক্ষণ ঐ শব্দটা শোনা গেল। বোধহয় কোনো জানোয়ারের একটি দল অন্ধকার এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলেছে। পায়ের শব্দে বোঝা গেল খুব ছোটখাট কোন জন্তু নয়, ভারী কোন জানোয়ার।

সেঁজুতির সমস্ত দেহখানা প্রায় আঠার মত জড়িয়ে আছে আমার দেহের সঙ্গে। ও যে বেশ ভয় পেয়েছে তা ওর নিশ্বাস থেকে আর আমাকে এমন করে জড়িয়ে ধরার ভঙ্গিটা থেকেই বুঝতে পারছি।

ওদের চলে যাবার পর আবার নদীটার কল কল ছল ছল শব্দ শোনা গেল।

সেঁজুতি শুকিয়ে আসা গলার আওয়াজে বলল, কি সব পার হয়ে গেল অনির্বাণদা!

বললাম, এমন কিছু নয়, এই বাইসন টাইসন কিছু একটা হবে আর কি।

যেন বাইসন আমার ঘরের গোয়ালে বাঁধা পোষমানা শান্তশিষ্ট গরু, বড় বড় ডাগর চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। গলকম্বলে হাত দিলে গলাটা তুলে ধরে আরও আদরের আশায়।

ওকে সাহস দিতে গিয়ে আমি নিজেই যেন সাহসী হয়ে উঠলাম।

আবার বললাম, জন্তু-জানোয়ার থেকে ভয়ের কিছু নেই। ওদের না ঘাঁটালে ওরাও তোমাকে কিছু

বলবে না। বাঘের বেলাতেও ঠিক তাই, তবে ম্যানইটার হলে আলাদা কথা।

মানুষখেকো বাঘের প্রসঙ্গে সেঁজুতি যে একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে তা বোঝা গেল ওর হাতের চাপ দেখে।

আমি বললাম, দেখ সেঁজুতি, ভাগ্যিস আমাদের গাড়িখানা গভীর বনের ভেতর থেমে যায় নি, তাহলে বুনো জানোয়ারের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করাই দায় হত। এখানে ফাঁকা জায়গা, তার ওপর নদীর মাঝামাঝি রয়েছি। ভয় বলতে যা বুঝি, ভেবে দেখতে গেলে তার কিছুই প্রায় এখানে নেই।

সেঁজুতি মনে হল একটু আশ্বস্ত হয়েছে। ও বলল, জলে যে ঠাণ্ডা, পা পড়লেই কাহিল। মনে হয় প্রয়োজনে নদী পার হলেও খুঁজে-পেতে কোন জানোয়ার আমাদের গাড়ির কাছে আসবে না।

বললাম, পাগল হয়েছ, শীতের ভয়টা কার নেই শুনি। আমরা দিব্যি নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারি।

ঠিক এমনি সময় একদল শেয়াল বিচ্ছিরি রকম হেঁকে হেঁকে ডাকতে লাগল। রাত্রির নিঝুম নৈঃশব্দ্যের ভেতর ওদের ডাক বড় সাংঘাতিক রকম বুকে এসে বাজতে লাগল। দুপুরে নদী পেরোবার সময় নদীর ধারে অজস্র বনঝাউ আর সাবাই ঘাসের জঙ্গল দেখেছিলাম। ওরা নিশ্চয়ই ঐসব ঝোপঝাড়ের ভেতরে অথবা নদীর ধারের বড় বড় পাথরের গর্তে থাকে। ওরা বনেই থাক আর লোকালয়েই থাক, ওদের প্রহরে প্রহরে ডাক বাঁধা বরাদ্দ।

আমরা কতক্ষণ এমনি আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম।

একঝাঁক জোনাকি একটু দূর দিয়ে ওপরে নীচে নাচের খেলা দেখাতে দেখাতে চলে গেল।

ওদের আজ কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হতে লাগল।

অনেক দূরে কি একটা জানোয়ার হঠাৎ ডেকে উঠল। তারপর আর কতকগুলো আর্ত চীৎকার শোনা যেতে লাগল। গায়ের রক্ত যেন জল হয়ে আসে।

সেঁজুতি এখন আমার একখানা হাতের ভেতর দিয়ে তার মাথাটা গলিয়ে নিয়ে ঐ হাতখানাই বুকে চেপে ধরে বসে আছে।

আমি এখন নির্বাক। একটু পরেই আবার ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনে কান খাড়া করে রইলাম। বুকের ভেতর কে যেন দুর্মুশ করছে।

মনে হল এই ছপ্ ছপ্ আওয়াজটা এক একবার শোনা যাচ্ছে আবার থেমে যাচ্ছে। কখনও বা শব্দটা এলোমেলোভাবে কাছে দূরে বাজছে।

তাহলে কোন জানোয়ার কি গন্ধ পেয়েছে। মানুষের গায়ের বা রক্তের গন্ধ শুঁকে শুঁকে অনেক হিংস্র জন্তুকে শিকারীদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসতে শোনা যায়।

যে কোন রকম পরিণতির কাছে আত্মসমর্পণের আগে একবার আঘাত হানার জন্যে একটা কিছু হাতিয়ার পাওয়া যায় কিনা হাতড়াতে লাগলাম।

সুজন সিংয়ের সীটের পাশ থেকে লোহার হ্যান্ডেলটা বেরুল। আমি যেন দারুণ একটা শক্তির সন্ধান পেয়েছি, এমন মনে হল আমার। শক্ত হাতে লোহার হ্যান্ডেলখানা চেপে ধরলাম।

ছপ্ ছপ্ শব্দটা ক্রমে এগিয়ে এল আমাদের গাড়ির দিকে। আমি সেঁজুতিকে বললাম, কোন ভয় নেই, আমাকে জড়িয়ে ধোরো না, আমার পেছনে বসে থাক।

জিপের পেছনে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, একটা নয়, কালো কালো দুটো জানোয়ার এগিয়ে আসছে।

জিপে বসে হাত ঘুরিয়ে ওদের আঘাত করা অসম্ভব ভেবে নিয়ে আমি জিপ থেকে নীচে নুড়িপাথরের ওপর নেমে পড়লাম। মুহূর্তে জিপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

ফিস ফিস করে সেঁজুতিকে অভয় দিয়ে বললাম, চুপচাপ বসে থাক, কিছু ভেব না। ওরা ভেতরে থাবা অথবা মুখ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওদের প্রচণ্ড বেগে আঘাত করব।

এক একটি মুহূর্ত আমি গুনে চলেছি। আমার হাতে যেন অসুরের শক্তি নেমে এসেছে। মরবার আগে শেষ কামড় দিয়ে দেব।

ওরা গাড়ির সামনের দিকে এল। আমি মুহূর্তে লোহার ডাণ্ডা তুলে ঘুরে দাঁড়ালাম।

কথা বলে উঠল জানোয়ার দুটো, আর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল সেঁজুতি। আমি হকচকিয়ে গেলাম।

অনির্বাণদা মেরো না মেরো না, এরা এই বনের লোক। এরা আমাদের খোঁজে এসেছে।

আমি প্রায় লাফ দিয়ে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

অন্ধকারে এখন দেখা যাচ্ছে ওদের। দুজনের হাতেই তীর আর ধনুক। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। রাতের অন্ধকারে ভয়ানক কিছু একটা মনে হচ্ছে ওদের।

সেঁজুতি কলবলিয়ে কথা বলে চলল ওদের সঙ্গে। বলতে বলতে জিপ থেকে নীচে নেমে পড়ল।

আমি ওদের কথার একবর্ণ অর্থও উদ্ধার করতে পারলাম না।

ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সেঁজুতি এক সময় আমার দিকে ফিরে বলল, সুজন সিং থলকোবাদের বাংলোয় যাবার পথে এদের এখানে আমাদের দেখবার জন্য বলে দিয়ে গেছে।

বললাম, এরা কারা এবং কোথায় ছিল এত রাতে ?

সেঁজুতি বলল, এরা হো। সামনে যে ডুংরি আছে তার কোলে এরা দু'তিন ঘর ঝোপড়া তুলে বসবাস করছে।

বললাম, সুজন সিং এত রাতে একাই বাংলোতে গেল, না আর কাউকে সঙ্গে নিয়েছে?

সেঁজুতি আবার ওদের সঙ্গে ওদের ভাষাতেই কথাবার্তা বলতে লাগল।

আমাকে এক সময় বলল, ডুংরি পেরিয়ে একাই গেছে ওপারের বাংলোতে।

বললাম, ডুংরিটা কী?

সেঁজুতি বলল, ছোট পাহাড়। খুব বেশি উঁচু নয়। তাহলেও ও পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হিম্মতের দরকার। বিশেষ করে এই রাতের বেলা পাহাড়ী মানুষগুলোও দল বেঁধে বেরোতে পারে না।

হো-দের সঙ্গে সেঁজুতি আবার কথা বলল। বেশ কিছু সময় ধরে কথা চলল ওদের ভেতর।

এক সময় আমার দিকে ফিরল সেঁজুতি। বলল, এরা সুজনের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু সুজন নাকি এদের পাত্তাই দেয়নি। এখানে এদের আসতে বলে সে পাহাড় ডিঙিয়ে চলে গেছে।

ভয় নাকি ডুংরির এপারে বিশেষ নেই, ওপারে খানিক পথ জঙ্গল হাতড়ে যেতে হবে।

সেঁজুতি ওদের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলল, ওরা দু'একটা কথা বলে নদী পেরিয়ে বেশ খানিকটা চলে গেল।

আমি বললাম, ওদেব জিপের সামনে বসতে বললে না কেন?

সেঁজুতি আমার হাত ধরে বলল, ঠাণ্ডা জলে পা দুটো যেন অসাড় হয়ে গেছে, চল উঠে বসি।

আমি আর একটিও কথা না বলে জিপের ওপরে উঠে পড়লাম, সঙ্গে সঙ্গে সেঁজুতির হাত ধরে টেনে নিলাম।

জিপে উঠে বসে ও বলল, ওদের আমি বসতেই বলেছিলাম, কিন্তু রেঞ্জার সাহেবের বউয়ের পাশে ওরা বসবে কোন সাহসে। তাই একটু তফাতে থেকেই ওরা আমাদের পাহারা দেবে।

এখন আমরা নিশ্চিন্তে বসেছি, পরম নিশ্চিন্তে। ও আর এখন আমাকে জড়িয়ে বসে নেই, শুধু হাতটা তুলে নিয়েছে ওর হাতে।

এক সময় বলল, ভাগ্যিস চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, না হলে তোমার ঐ লোহার রড খানাতে ফেটে চৌচির হয়ে যেত ওদের মাথা।

হেসে বললাম, নিজের মাথা বাঁচাতে চিরদিন অন্যের মাথা ফাটাতে হয়। এটাই দুনিয়ার নিয়ম।

ও আমার হাতটা নাড়া দিতে দিতে বলল, খুব বীরপুরুষ হয়েছ যা হোক, খুব বীরপুরুষ হয়েছ।

বললাম, মরবার জন্যে আমি তৈরিই হয়েছিলাম সেঁজুতি। তবে মরার আগে যমদূতকে মারতে চেয়েছিলাম মোক্ষম ঘা।

সেঁজুতি বলল, খুব আফসোস থেকে গেল তো? একদিন কোন রাতের অন্ধকারে আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব তোমার খোলা দরজার সামনে, তখন আমাকে মেরেই না হয় আজকের

আক্ষেপটা মিটিও।

বললাম, তার আগে ঐ চেনা জন্তুটি আমাকে খেয়ে ফেলুক এই প্রার্থনাই জানাব বনের দেবতার কাছে।

ওর মুখে হাসির কলধ্বনি বেজে উঠল। উসুরিয়া নদীর জল-ছল-ছল শব্দের সঙ্গে তার কি অদ্ভুত মিল। আমার মনে হল, এ রাতের বুকে ও শুধু এক নারী নয়, একটি প্রবাহিনী নদী। দূরে তাকিয়ে দেখলাম নদীর তীরে লাল লাল দুটো চোখ দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। সেদিকে সেঁজুতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই ও একটুক্ষণ মুখটা বের করে দেখল। তারপর খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, ওখানে রয়েল বিহার টাইগার কটমট করে আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে।

আমি তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি, তবে তার যে বিশেষ গুরুত্ব নেই তা বুঝতে পারলাম।

সেঁজুতি আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল, সুজন সিংয়ের নিযুক্ত প্রহরীরা শীতের রাতে নদীর ধারে বসে শালপাতার চুট্টা টেনে গা গরম করছে।

রাতের ঘন অন্ধকারে ওদের ধূমপানের আগুন কোন অজ্ঞ মানুষকে যে বিভ্রান্ত করে দেবে তাতে সন্দেহ কি। সত্যি, লাল লাল দুটো চোখ দপ দপ করে জ্বলে জ্বলে উঠছে ঘোর অন্ধকারে।

বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল সুজন সিংয়ের ফিরে আসতে। আমরা গাড়িতে বসে বার বার তার কথাই বলছিলাম। মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম সুজন সিং যেন নিরাপদে ফিরে আসে।

ও এসেই প্রথমে ছুটি করে দিল ঐ দুটি প্রহরীর। সীটের নিভৃত স্থান থেকে একটি বোতল টেনে বের করে দিয়ে দিল ওদের পুরস্কার। ওরা খুশী হল কিনা অন্ধকারে মুখ দেখে বোঝা না গেলেও জলের ওপর দিয়ে যেভাবে দৌড়ে চলে গেল তাতে বুঝলাম, এ সুধা ওদের কাছে মহামূল্য ধন! প্রায় অপ্রাপনীয় বস্তুর শামিল।

সুজন সিং এবার গাড়িতে পেট্রল ঢেলে উঠে বসল। গর্জন করে গাড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে নদী পার হয়ে গেল।

আমরা এতক্ষণ প্রায় কোন কথাই বলতে পারিনি ওর সঙ্গে। এখন ও নিজের কথা বলল, আমার বেয়াকুবির ফলে আপনাদের বহুৎ তকলিফ পেতে হল চৌধুরীবাবু।

বললাম, এমন ভুল মানুষের হয়েই থাকে সিংজী। এ আর এমন কি ভুল, পরের বৌকে মানুষ ভুল করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে হরদম।

সুজন সিং হাসতে জানে যথাস্থানে। আবার সেই ঠা ঠা করে রাতের পশুপাখিদের ঘুম ভাঙানো হাসি।

সেঁজুতি বলল, অনির্বাণদার মুখে দেখছি কিছুই আটকায় না।

সুজন সিং বলল, গোসা করছ কেন বহুরানী! চৌধুরীবাবু সাচ্ বাতই বলছে।

সেঁজুতি অন্ধকারে আমার হাতে একটা চিমটি কাটল।

আমি বললাম, এতক্ষণে সিংসাহেবকে ঠিক মুডটিতে পাওয়া গেল।

সুজন সিং বলল, হরবখত আমার দিল সাফ আছে চৌধুরীবাবু। কুছ ডর, কুছ তকলিফ আমার নাই। হ্যাঁ, খালি এক ডর। লিজা হাত ছুট না হইয়ে যায়।

পুরো একটি মাস এ বনে আমার কেটে গেল। বেশ বুঝতে পারছি ধীরে ধীরে বন আমাকে গ্রাস করছে। এখন প্রায় প্রতিদিন ভোরের জলযোগের পর আমাদের বাংলোর সামনে এসে দাঁড়ায় সুজন সিংয়ের গাড়ি। আমি ঐ গাড়িতে উঠেই বেরিয়ে পড়ি বনের পথে। কখনো বা হাটে, কখনো বা নদীর ধারে।

সুজন সিং আমার খুশিমত জায়গায় আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। আমি আশ মিটিয়ে ছবি আঁকি। সেঁজুতি টিফিন কেরিয়ারে ভরে দেয় প্রচুর খাবার। একা একা, কোনদিন বা সুজন সিংকে সঙ্গে নিয়ে দুপুরে নদীর ধারে গাছতলায় বসে সে খাবারগুলো তারিয়ে তারিয়ে খাই। মাঝে-মধ্যে সেঁজুতি হয় আমাদের সঙ্গী। সেদিন দুজনেই ছবি আঁকি। সুজন সিং চোখ বড় বড় করে দেখে বহুরানীর কৃতিত্ব।

এক একদিন পিকনিক চলে আমাদের। রান্নাবান্নায় মেতে উঠি আমরা। পিকনিকের দিন খুশী হয়ে

সব খরচ দেয় সুজন সিং। প্রতিবাদ করতে গেলেই অনাসৃষ্টি। সুজন বলে, আজ থেকে তোমার আমার দোস্তি খতম চৌধুরী!

ইতিমধ্যে আমরা ঘনিষ্ঠ হয়েছি। 'আপনি'র পোশাকী সাজটা খুলে ফেলে এখন 'তুমি'র আটপৌরে সাজটা দুজনেই তুলে নিয়েছি। যত সুজনের সান্নিধ্যে আসছি ওর চরিত্রের অদ্ভুত কতকগুলো দিক ততই আমার কাছে আশ্চর্যভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ও মদ খায়, মাত্রা ছাড়িয়ে মদ খায়, কিন্তু মাতাল হতে দেখিনি ওকে। আবার নতুন ইজারা নেবার জন্যে ও অফিসারদের পার্টি দেয়, প্রচুর টাকা ছড়ায়। এদিকে কুলি-কামিনদের ও দেবতা। তাদের সুযোগ-সুবিধার দিকে সুজনের কড়া নজর। শুধু কাজের ব্যাপারেই নয়, কাজের বাইরে ঘর-সংসারের ঝগড়াঝাটি মেটাতেও সুজনকে হাজির থাকতে হয়।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটল। একটি হো-মেয়ে কাজের শেষে রাতে ঘরে ফিরল না। তার স্বামী কি একটা অসুখে মারা গিয়েছিল। একটিমাত্র মেয়ে ছিল তাদের। বছর দশেক বয়স তার। মেয়েটা কেঁদে কেটে হাঁটতে হাঁটতে সেই রাতেই সুজনের টেন্টে হাজির।

সুজন সেই ছোট মেয়েটাকে তার তাঁবুতে রেখে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। সারা রাত চুঁড়ল বন আর হো-ওঁরাওদের আস্তানা। মেয়েটি একেবারে বেপাত্তা। প্রথমে সুজন মনে করেছিল মেয়েটা কারো সঙ্গে পালিয়েছে। কিন্তু যতদিন ও সুজনের কাছে কাজ করেছিল ওর আচরণে তেমন কোন চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যায়নি। সারাদিন মুখ বুজেই ও কাজ করত। সঙ্গীদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করতে দেখা যায়নি ওকে। স্বামীটি মারা যাবার পর ও বড় বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। অন্যমনে পথ চলত। কোন পরবে যেত না। মেয়েটাকে নিয়েই পড়ে থাকত ঝোপ্ড়িতে।

সুজন ভোরে ফিরে এসে বাংলোতে জানাল মেয়েটির নিখোঁজ হবার সংবাদ। আজ সে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না তাই জানাতে এসেছিল।

আমি বললাম, তুমি এখন কি করবে সিং? কাজের কাছে ফিরে যাবে না আর একবার দিনের আলোয় মেয়েটির খোঁজে বেরুবে?

ও খুব বিষণ্ণ মুখেই বলল, ওকে খুঁজে বার করতেই হবে আমাকে। ওর বছর দশেকের মেয়েটা আমার তাঁবুতে রাতভোর রুদছে।

বললাম, আপত্তি না থাকলে আমি তোমার সঙ্গে ঘুরতে পারি সিং।

ও বলল, চলো, তোমার তকলিফ না হলে আমার আপত্তির কি আছে বল।

সেঁজুতি যেতে চেয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়ল মিঃ ভট্চায গুয়ার এক ডাক্তার বন্ধুকে আজ লাঞ্চের নেমন্তন্ন করেছে। তাই দারুণ ইচ্ছা থাকলেও তাকে বাংলোতে থেকে যেতে হল।

আমি আর সুজন সিং বেরোলাম বনের পথে। অনেক ঘুরে ফিরে আমরা বেলা প্রায় একটায় ঐ মেয়েটার ঝোপড়ির পথ ধরে ফিরছিলাম, হঠাৎ একটা সাবাই ঘাসের জঙ্গলের পাশে শালগাছের জটলার ভেতর থেকে এক টুকরো কাপড় দেখা গেল।

জিপ থামিয়ে ঝপ্ করে নেমে পড়ল সুজন। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ও পথের ধারে বড় ঝাঁকড়া পইসার গাছে উঠে গেল। আমি জিপ থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, সুজন অনেক ওপরের একটা ঝাঁকড়া ডালে বসে ঐ সাবাই ঘাসের জঙ্গলের দিকে চেয়ে আছে।

কিছু পরে ও তেমনি দ্রুত নেমে এল। গাড়ি চালিয়ে তাঁবুর দিকে ফিরে যেতে যেতে বলল, শালার বাঘ মেয়েটার হাফ বডি খেয়ে সাবাড় করে দিয়েছে চৌধুরী।

একটু থেমে বলল, আমিও শালাকে সাবাড় করব।

তাঁবুতে ফিরে এসেই সেদিনের কাজ বন্ধ করে দিলে সুজন সিং। কয়েকটা জোয়ান কুলিকে গাড়ি বোঝাই করে দু'ক্ষেপে নিয়ে গেল সেই জায়গাটার পাশে। ওরা হাঁক ডাক করে মেয়েটার কাছ অব্দি পৌঁছল। এত লোক আর হামলা শুনে বাঘটা নিশ্চয়ই দূরে সরে গিয়ে থাকবে। দূরে মানে, সাবাই ঘাসের জঙ্গলটা কিছুদূরে একটা পাহাড়ী ঝোরার কাছে এসে শেষ হয়ে গেছে। ওখানে একটা পাহাড়ী গুহার মত দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। হয়ত বাঘটা সেখানেই আশ্রয় নিয়েছে।

কয়েকটা লোক সুজনের নির্দেশে ঐ শালগাছের ওপর একটা মাচান তৈরি করে ফেলল। গাড়ি

থেকে শেকল বের করে ঐ হতভাগ্য মেয়েটার আধখাওয়া দেহটাকে জড়িয়ে বাঁধল শালগাছের সঙ্গে। কাজ শেষ হলে সুজন বলল, চৌধুরী ভাই, তুমি হেঁটে চলিয়ে যাও এই লোকগুলোর সাথে। আমি শয়তানটার খেল খতম করে তবে ফিরব। গাড়িখানা থাকল, কুছ ভাবনা নাই।

আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, আমি তোমার ঐ গাড়িতেই বসে থাকব সিং, তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে ফিরতে পারব না।

ও বলল, কেন দিগ্‌দারি করছ চৌধুরী, রাত ভী হইয়ে যেতে পারে। ও শালা ডাকুকে আমি ছাড়ব নাই। শালা মানুষখেকো আছে। এ তল্লাটের মানুষজনকে আস্ত রাখবে নাই।

বললাম, আমাকে কেন ভাগিয়ে দিচ্ছ সিং। আমি তোমার শিকারে একটুও বিঘ্ন ঘটাব না দেখো।

ও বলল, তাহলে ঐ নীচে জিপের ওপর বসে থাকা তোমার চলবে না। আমার সঙ্গে মাচানে উঠে আসতে হবে।

বললাম, রাজী আছি।

আমরা মাচানের ওপর উঠলাম। বেশ শক্ত করে মাচানটা তৈরি করা হয়েছে।

সুজন সিং প্রথমে চারদিক দেখে নিল, তারপর ইঙ্গিতে লোকগুলোকে চলে যেতে বলল।

ওরা চলে গেলে পাশে জোড়ানলী রাইফেলটা রেখে বসে পড়ল সুজন সিং। আমি আগেই বসে পড়েছিলাম। একটা কাছির মত মোটা চিহড় লতা আমাদের মাচানের ওপর প্রকাণ্ড শালগাছগুলোকে জড়িয়ে বেঁধে রেখেছিল। ওটা মাচান বাঁধার কাজে বেশ সহায়ক হয়েছিল।

সুজন সিং-এর পাঁচ ব্যাটারী টর্চখানা ঝক্ ঝক্ করছে। অন্ধকার রাতে দরকার হতে পারে তারই আয়োজন।

সুজন সিং বলল, এটা চিতা, বাঘ নয়।

বললাম, কি করে বুঝলে?

ও বলল, শিকার ধরার তফাত থেকে। বাঘ ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে সামনের পায়ের থাবার ঘায়ে ঘাড়টা মটকে ভেঙে দেয়, আর চিতা ঘাড় বা গলায় কামড় দিয়ে শিকারটাকে পাকড়ে রাখে। শিকার মরে মাটির উপর পড়ে গেলে তবে সেটাকে ছাড়ে। আমি দেখলাম, চিতাটা মেয়েটার টুঁটি ছিঁড়ে ফুটো করে দিয়েছে।

একটু থেমে বলল, বাঘের থেকে বহুৎ শয়তান আছে চৌধুরী। বিজ্‌লিকা মাফিক ওর চাল আছে। আমাদের বহুৎ হুঁসিয়ার থাকতে হবে। গাছে চড়তে এক নম্বর ওস্তাদ।

বললাম, আমার অনুমান চিতাটা ঐ সামনের পাহাড়ের কোন গুহায় গা ঢাকা দিয়ে আছে।

সুজন সিং বলল, সম্ভব। তবে ওরা আওয়াজ না তুলে চলতে পারে, দেখলে মনে হয় বিজলি চমক দিচ্ছে। ওদের শিকার করা সবসে কঠিন।

আমরা বসে বসে অতি ধীরে কথা বলছিলাম। রোদের রঙ পালটে গেল। ছায়া ঘনিয়ে উঠল বনের ভেতর। নীচে তাকিয়ে দেখলাম মেয়েটা আধখাওয়া মূর্তিতে গাছের সঙ্গে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কি বীভৎস সে দৃশ্য!

দেখতে দেখতে চারদিক থেকে সন্ধ্যার আয়োজন সম্পন্ন হল।

পাশের পাহাড়ের ওপর আরাবা গাছে উড়ে এসে বসল এক ঝাঁক টিয়া। ট্যা ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যা আওয়াজে কানে তালা লাগার জোগাড়।

ধীরে ধীরে সে শব্দটাও থেমে গেল। অমনি শুরু হল শেয়ালের ডাক। সমবেত গলায় রাতটাকে যেন কাঁপিয়ে দিলে। তারা থামলে ঝিঁঝিদের একটানা শব্দ উঠল। এ শব্দ উচ্চরোলে না হলেও রাতের বনকে যেন সূক্ষ্ম করাত চালিয়ে কেটে চলল।

কতক্ষণ এমনি বসেছিলাম, হঠাৎ সুজন সিং কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস্ ফিস করে বলল, এই নাও টর্চটা ধরে রাখ। আমি জিভে টোকা দিলেই তুমি ঐ টর্চটা মুর্দার উপর ফেলবে।

অতি ধীরে বললাম, এসেছে?

ও আমার চেয়েও আস্তে বলল, কান পাতলে শুনবে ও মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। যখন হাড়ডি

চিবায়ে খাবে তখন তোমাকে টোকা দিয়ে জানান দেব।

আমি উৎকর্ণ হয়ে চিতার মাংস টেনে ছিঁড়ে খাবার শব্দটা শুনতে লাগলাম

ও আবার ফিস্ ফিস্ করে বলল, অঙ্গার কী তর দুটো চোখ জ্বলতে আছে।

আমি দেখলাম, গাছের গোড়ায় দুটো আগুনের মার্বেল জ্বল্ জ্বল্ করছে।

দারুণ একটা টানাটানি হেঁচড়া হেঁচড়ি চলল কিছুক্ষণ। লোহার শেকলটা ঠক্ ঠক্ করে গাছের কাণ্ডে কয়েকবার বেজে উঠল।

একসময় টানাটানির শব্দটা থেমে গেল। কিছুক্ষণের ভেতরেই বুঝলাম, ও দেহ থেকে খানিকটা হাড় আর মাংস টেনে ছিঁড়ে নিয়েছে। এখন আরাম করে তাই চিবুচ্ছে।

ওপরে বসেই আমরা শব্দ পাচ্ছিলাম। কিন্তু ওর সেই আগুনজ্বালা চোখদুটো আর দেখতে পাচ্ছিলাম না।

হঠাৎ অনুভব করলাম সুজন রাইফেলটা তুলে নিয়েছে।

ও অতি ধীরে ধীরে বলল, টর্চ রেডি রাখ।

আমি টর্চটা হাতে ধরে রেখেই ছিলাম।

ও জিভ আর তালুতে একটা টোকা দিলেই আমি আলো ফেলব বাঘটার ওপর।

প্রতিটা মুহূর্ত আমার দারুণ উত্তেজনায় কেটে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কখন সংকেত আসে। ঠিক মত জায়গায় আলো ফেলতে পারব তো। মনকে শাসন করছিলাম, নার্ভাস হলে চলবে না।

সংকেত এল। সামান্য সংকেত আমার কানে যেন একটা লোহার পাতের ওপর হাতুড়ী পেটার মত মনে হল!

আমি গাছের গুঁড়ি লক্ষ্য করে আলো ফেললাম। গভীর অন্ধকারের বুক চিরে তীক্ষ্ণ একটা আলো ছড়িয়ে পড়ল খানিকটা জায়গা জুড়ে।

আমি স্পষ্ট দেখলাম চিতাটা দুই থাবায় একটা কিছু ধরে আছে। আলো পড়ামাত্র সে যেন কেমন চোখ ধাঁধানো একটা অবস্থায় পড়ে গেল। মুহূর্ত মাত্র। গর্জে উঠল সুজন সিং-এর রাইফেল।

একটা বিদ্যুৎ তীব্রবেগে লাফিয়ে শালগাছের ওপর খানিকটা উঠে এল। তারপর সেখান থেকে সম্পূর্ণ চারটে পা ছেড়ে দিয়ে পড়ে গেল মাটির ওপর মুখ থুবড়ে। আর মাথা তুলল না।

আমি বললাম, এক গুলিতেই শেষ হয়ে গেছে, চল নেমে যাই।

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, থামো চৌধুরী, খানিক সময় তো দেখ দোস্ত। শয়তানকে কুছ্ বিশোয়াস নাই।

আমি তেমনি টর্চ ধরে রইলাম। একটা ছবি চোখে ভেসে উঠল। মেয়েটা শেকলে বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে আর তার আধখাওয়া একটা পায়ের কাছে মাথা থুবড়ে পড়ে আছে চিতাটা।

আর একবার রাইফেলের আওয়াজ হল। বুলেট বিদ্ধ হল যে জায়গায় সেখানটা সামান্য নেচে উঠল। •

সুজন সিং বলল, এখন কোই ডর নাই, চল চৌধুরী নীচে নামি।

আমরা সেদিন গাড়িতে ফিরে এলাম সুজন সিং-এর ক্যাম্পে। ওর আস্তানায় গাড়িটা বাঁক নিচ্ছে হঠাৎ আলোর সামনে চকিতে দেখা গেল একটা ছোট মেয়ে বনের দিকে চলেছে। গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে নেমে গেল সুজন সিং।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটার হাত ধরে গাড়িতে এনে তুলল সুজন। মেয়েটা গাড়িতে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, আর সুজন তার সঙ্গে অনর্গল হো-দের ভাষায় কথা বলে চলেছিল।

তাঁবুতে মেয়েটাকে কারো জিম্মায় রেখে এসে সুজন সিং বলল, এত রাতে তোমাকে বাংলোতে দিয়ে আসবার ইচ্ছা আমার ছিল না চৌধুরী, কিন্তু সারারাতটা তোমার লেগে বহুরানী ভাবনা করবে সে আমি হতে দেব না। চল, তোমাকে পৌঁছায়ে আসি।

গাড়ি আবার বাংলোর দিকে চলল।

পথে যেতে যেতে ও বলল, ঐ মেয়েটার মাকে চিতায় মারল চৌধুরী।

বললাম, মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে এত রাতে বনের পথে যাচ্ছিল কোথায়?

সুজন সিং বলল, ওর ঝোপড়ীতে চলছিল মায়ের খোঁজ করে। যে লোকগুলো দেখে আসল ওর মাকে বাঘে খেয়েছে, তারা ওকে কথাটা বলতেই ও তো কেঁদে কেটে হাট বসালো। তখন ওরা ঝুট্ বাৎ বলল, তোর মা ঝোপড়ীতে আছে, কাঁদিস নাই।

ও অমনি সবাই নিদ গেলে তাঁবু থেকে একা একা ভাগ্‌ল।

বললাম, এখন কি করবে ওকে নিয়ে।

ও বলল, কি আর করব চৌধুরী, ও আমার কাছেই থাকবে। ওকে পড়া লিখা শিখলাব। নেহি তো লিজার পাশে ভেজিয়ে দিব।

আমরা বাংলোতে এসে নামলাম রাত প্রায় এগারোটায়। শীতের রাত কালো কফিনের ভেতর শবের মত শুয়ে আছে। ঝিঁঝিঁর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। কয়েকটা জোনাকী ইউক্যালিপটাসের মাথায় জড়ো হয়েছে। অদ্ভুত কোমল নীলাভ আলো জ্বলছে আর নিভছে। মনে হল প্রাণহীন দেহ থেকে বেরিয়ে কতকগুলি আত্মা অন্ধকারের বুকে এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বসার ঘরে তখনও আলো জ্বলছিল। আমাদের গাড়ির আওয়াজ শুনে কেউ বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল। আমি গাড়ি থেকে নেমে একটু এগিয়ে দেখলাম, সেঁজুতি। কালো একটা আলোয়ানে সারা গা ঢাকা। মাথায় ঐ আলোয়ানই ঘোমটার মত করে জড়িয়েছে।

বললাম, তুমি এখনও জেগে আছ সেঁজুতি। মিঃ ভট্‌চায কোথায়?

ও বলল, রেঞ্জার বনের বাইরে ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে গেছে। আজ রাতে ফিরবে না। দয়া করে তুমি যে এসেছ এতেই আমি খুশী।

বললাম, সে ভীষণ ব্যাপার, বলব এখন পরে।

ইতিমধ্যে গাড়ি থেকে নেমে এসেছে সুজন। সে বলল, দেখে নাও বহুরানী আপনার আদমীকে। বাজায়ে দেখ, সব কুছ্ ঠিক আছে কি নাই।

সেঁজুতি বলল, ভেতরে এসো সব! বাইরে দাঁড়িয়ে শীতের ভেতর জমে যাচ্ছি।

সুজন বলল, মাফ্ কিজিয়ে বহুরানী, আমি আর বসব নাই। কাল ব্রেক ফাস্ট তোমার কাছে খেতে আসব।

এগিয়ে গেল সেঁজুতি। এই প্রথম আমি ওকে সুজনের হাত ধরতে দেখলাম।

ও সুজনের হাত ধরে বাংলোর ভেতর টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, এত রাতে আবার তুমি যাবে ক্যাম্পে! আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়ব না। আমার অনেক রান্না আছে, রেঞ্জার ফরেস্ট গার্ডকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে সে আসবে না। কি হবে আমার এত রান্না।

সুজন সিং ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, তোমার রান্না লিয়ে ভাবনা বহুরানী। আমি তোমার সব খানা খেয়ে তারপর চলিয়ে যাব।

সেঁজুতি বলল, আমি তো রান্নার দুঃখে মরে যাচ্ছি আর কি। যদি না থাকবে তাহলে খেতে হবে না, চলে যাও।

সুজন সিং বলল, এ বহুরানী, গুস্‌সা করো মাৎ। আমি তোমাকে বুঝায়ে বলব কেন এ রাত তোমার কাছে কাটাতে পারব নাই।

সেঁজুতি বলল, এসো সব খাবার ঘরে। ঠাণ্ডা খাবারগুলো খেয়ে নাও।

আমরা খেতে বসলাম। দেখলাম সেঁজুতিও আমাদের সঙ্গে বসল খেতে। ও এত রাত না খেয়ে উদ্বেগে আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল জেনে আমি মনে মনে সংকোচ বোধ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য তৃপ্তি সারা মনটাকে ভরিয়ে তুলল। আমার জন্যেও কেউ প্রতীক্ষা করার আছে। আমার কথা ভেবে ভেবে সে অস্থির হয়।

সুজন সিং বলল, বহুরানী, একটা ছোট লেড়্কী রাতভোর রোয়েগী, আমি তোমার বাংলোতে নিদ যেতে পারব নাই।

ব্যাপারটা বুঝতে পারল সেঁজুতি। ছোট মেয়েটা যে সুজন সিং-এর তাঁবুতে আছে তা সে জানত। কিন্তু তার মাকে খুঁজে পাওয়া গেল কিনা সে খবর জানত না।

খাওয়া শেষ হলে এবার সেঁজুতিই তাড়া দিল সুজনকে, বারোটা বেজেছে, আর এক মিনিটও নয়। গাড়িতে উঠে পড় জলদি।

সুজন সিং বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে হেসে বলল, আমায় তাড়ায়ে দিলে বহুরানী। কাল কিন্তু ব্রেক ফাস্টের টেবিলে এ বান্দা হাজির থাকবে।

সেঁজুতি কথা না বলে শীতের রাতে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। সুজন সিং-এর গাড়ি অন্ধকার বনের পথে যতক্ষণ না মিলিয়ে গেল ততক্ষণ সে ঘরে ঢুকল না।

আমার কাছে এসে সেঁজুতি বলল, জানো অনির্বাণদা সারা বনে ও একটা দুর্ধর্ষ ডাকাত। জানোয়াররা ওকে ভয় করে। ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে কি নিয়ে একবার বিবাদ হয়েছিল, ও ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দুক কেড়ে নিয়ে দারুণ মার মেরেছিল। শেষে রেঞ্জার পরিস্থিতিটাকে সামলে নেয়। কুলি কামিনরা ওকে বাঘের মত ভয় করে, আবার প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। আশ্চর্য চরিত্র সুজনের।

দেখলে না, মেয়েটা রাতে হয়তো হারানো মায়ের জন্য কাঁদবে তাই এমন শীতের রাতে আরাম ফেলে দেড় দু'ঘণ্টার পথ চলে গেল।

বললাম, শুধু তুমি আমার জন্যে ভাববে বলে সুজন এত রাতে আমাকে তোমার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

সেঁজুতি বলল, সুজন সারান্দার সম্রাট। অসুরের মত শক্তি ওর, আর বিরাট একটা হৃদয় ওকে সবার থেকে আলাদা করে রেখেছে!

আমি সকালে বাংলো থেকে বেরিয়ে যাবার পর যা যা ঘটেছে তার একটা বিবরণ সেঁজুতিকে দিলাম।

শুনতে শুনতে ওর মুখের ছবি নানাভাবে পরিবর্তিত হতে লাগল।

কথা শেষ হলে ও বলল, আমাকে ছুঁয়ে বল কোনদিন আর এমন দুঃসাহসিক কাজে সুজন সিং এর সঙ্গে বেরোবে না।

আমি বললাম, একথা কেন বলছ সেঁজুতি, সুজন অনেক হুঁশিয়ার। অন্ততঃ আজকের ঘটনায় সে আমাকে তার সঙ্গে একেবারেই রাখতে চায়নি। আমি জোর করেই একরকম তার সঙ্গে থেকেছি। তাছাড়া বাঘটা প্রথম গুলিতে মারা গেছে মনে করে নামতে চাইলে ও আমাকে বরং বাধাই দেয়।

সেঁজুতি বলল. সেই উসুরিয়া নদীর ওপর জিপটা থেমে যাবার কথা তুমি ভুলে গেলে! সুজন সে রাতে পাহাড় ডিঙিয়ে বন চিরে বেরিয়ে যায়নি? এমন ডাকাতের সঙ্গী হওয়াও যে বিপদের।

হেসে বললাম, কলকাতায় থাকি ভয়ে ভয়ে, সবদিক সামলে। এখানে বনে এসেছি, মনের ভেতর একটু সাহস ভরে নিয়ে যেতে দেবে না?

ও বলল, তোমার ভেতরেও দেখছি সুজন সিং-এর রোগ ধরেছে।

বললাম, রোগে যদি ধরেও তুমি থাকলে রোগ সারতে কতক্ষণ।

একদিন সেঁজুতি বলল, আজ দুপুরে লাঞ্চের সময় তোমার খোঁজ করছিল রেঞ্জার।

বললাম, সত্যি আমার দারুণ অন্যায় হয়ে যাচ্ছে। ব্রেকফাস্টের পর রোজই বেরিয়ে যাচ্ছি। রেঞ্জার সাহেব অনেক রাতে এ বাংলোতে আসেন আবার এলেও সকালে ওঠেন অনেক বেলায়। তাই দেখা-সাক্ষাৎ বড় একটা ঘটে উঠছে না।

সেঁজুতি বলল, সুজন সিংয়ের সঙ্গে রেঞ্জারের দোস্তিতে মনে হয় কোথাও চিড় ধরেছে, তাই তোমার খোঁজ পড়ছিল।

বললাম, মিঃ ভট্‌চায কি পছন্দ করছেন না সুজনের সঙ্গে আমার রোজ বেরিয়ে যাওয়া?

সেঁজুতি বলল, সে রকম স্পষ্ট করে কোনদিন বলবে না ও। শুধু বলল, তোমার বন্ধুটি সুজন সিংয়ের প্রিয় হয়ে উঠেছে। সিং এখন কাজের কাছে যাচ্ছে কম, তোমার বন্ধুটিকে নিয়ে মেতে রয়েছে।

সেঁজুতির কথা শুনে নিজেকে কেমন যেন অপরাধী অপরাধী মনে হল।

বললাম, সামনের কয়েকটা দিন আর বাংলোর বাইরে যাব না সেঁজুতি।

ও বলল, তা কেন হবে, তুমি যেমন যাচ্ছ তেমনি যাবে। তুমি এসেছ এখানে আমার অতিথি হয়ে ছবি আঁকতে ! বাংলোতে রাতদিন বসে বসে রেঞ্জারের বউয়ের সঙ্গে গল্প করতে নয়।

হেসে বললাম, রেঞ্জারের বউ আমার ছবির প্রেরণা। যখন ছবি আঁকতে আঁকতে টায়ার্ড হয়ে পড়ব তখন নতুন করে প্রেরণা পাবার জন্যে রেঞ্জারের বউয়ের কাছে দিনের পর দিন বসে থাকতে হবে বইকি।

সেঁজুতি বলল, শোন অনির্বাণদা, আমি যে তোমাকে লিখেছিলাম 'সাগরিকা' সিরিজের ছবিগুলো আনতে তা কি এনেছ?

বললাম, তোমার চিঠি পেয়ে ভাবছিলাম, আনব। কিন্তু আসার সময় ভাবলাম, ওগুলো তোমার ওখানে নিয়ে আসা ঠিক হবে না। কখন কোন ফাঁকে ছবিগুলো মিঃ ভট্চাযের হাতে গিয়ে পড়বে, তাহলে অনর্থের আর শেষ থাকবে না।

সেঁজুতি বলল, আমার সম্বন্ধে ওর মনে একটুখানি ঈর্ষা জাগলে আমি তো বর্তে যেতাম।

একটু থেমে বলল, রাতের পর রাত একটি পূর্বপরিচিত বন্ধুর সঙ্গে একই বাংলোয় কাটাচ্ছি। তবু স্বামীর চৈতন্য নেই। তিনি রাত কাটাচ্ছেন কাজের অছিলায় অন্য বাংলোবাড়িতে একাধিক মেয়ের উত্তপ্ত সঙ্গে।

বললাম, তোমার ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাসই এতে প্রমাণিত হচ্ছে। অনুরূপভাবে তুমিও তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখ, মনে মনে এটাই তিনি চান।

সেঁজুতি হেসে বলল, বলিহারি তোমার ব্যাখ্যা।

বললাম, আচ্ছা একটু আগে যে তুমি বলেছিলে সুজনের সঙ্গে আমাদের রেঞ্জারের কোথায় চিড় ধরেছে, এ কি তোমার অনুমান?

ও বলল, চিড় ধরার কারণ লিজা। কিন্তু আগে একদিন তোমাকে বলেছিলাম, বন ইজারার ব্যাপারে ওদের একটা কমন স্বার্থ আছে। সেজন্যে মনে ফাটল ধরলেও বাইরে তার প্রকাশ কম।

বললাম, এ তো অনেকদিন ধরেই চলছে, নতুন ভাঙন অনুমান করলে কি করে?

সেঁজুতি বলল, ইতিমধ্যে নতুন একটি মুখের আবির্ভাব হয়েছিল। তার সঙ্গে ওর কথাবার্তা আড়াল থেকে শুনে যতটুকু বুঝলাম, সুজনকে সরিয়ে তাকে নতুন ইজারা দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। টেন্ডারের কিছু কারচুপি চলছে!

বললাম, এতদিনের বাঁধন তাহলে ছিঁড়ে যেতে বসেছে বল?

ও বলল, এর ভেতর রেঞ্জারের অনেক খেলা আছে। ও অনেকদিন থেকে সুজন সিংকে সরাতে চাইছিল, কিন্তু মনের মত দ্বিতীয় লোক পায়নি বলে এতদিন ধরে রেখেছিল। এখন নতুন ইজারাদারের সঙ্গে একটি শর্ত করে নিয়েছে।

বললাম, কি রকম?

সেঁজুতি বলল, আমার যতদূর অনুমান লিজার বাবাকে কুলির কন্ট্রাক্ট দেবার সর্তটা ও মৌখিকভাবে করিয়ে নিয়েছে।

বললাম, এ কথার অর্থটা আমার কাছে খুব পরিষ্কার হল না।

ও বলল, সুজন সিং লিজাকে ভালবাসে ঠিক কিন্তু কতকগুলো নীতি ও মেনে চলে। পুরনো যে দলটি কাজ করছে তাদের ছাড়িয়ে ও লিজার বাবাকে কন্ট্রাক্ট দিতে একেবারেই নারাজ। রেঞ্জার একবার অনুরোধও করেছিল কিন্তু কাজ হয়নি।

এদিকে আবার হো-দের ঐ দুটো দলে বিবাদ। লিজার বাবার দলের সঙ্গে সুজন সিংয়ের দলের লোকের মাঝে মাঝে দারুণ রকম মারামারিও হয়ে যায়।

বললাম, তাহলে সুজন সিংকে লিজার বাবা সহ্য করে কি করে?

সেঁজুতি বলল, দূর ভবিষ্যতে কন্ট্রাক্ট পাবার আশা সে ছাড়েনি। তাছাড়া লিজা আর সুজন সিংয়ের দেখা-সাক্ষাৎ ঘরের চেয়ে বনেই বেশি হয়।

বললাম, লিজা কন্ট্রাক্টের ব্যাপারে সুজনকে কিছু বলে না?

সেঁজুতি বলল, ওটা আমার অজানা। তবে এটুকু বলতে পারি, লিজা সুজনকে তার বাবার হয়ে কিছু যদি বলে তাহলে তা সহজে মেনে নেবে না সুজন। আর আমার মনে হয় লিজা ওকথা বললে বড় ছোট হয়ে যাবে সুজনের কাছে।

বললাম, আচ্ছা তুমি বলেছিলে রেঞ্জারও ভালবাসার অংশীদার, সেটা কিরকম? ভালবাসা তো এক তরফের হয় না, সেখানে লিজারও সম্মতি চাই।

সেঁজুতি বলল, এটা আমার কাছে রহস্য। এক এক সময় মনে হয় বাবার দিকে চেয়ে ও দু' তরফের মন জুগিয়ে চলছে। আবার মনে হয় মেয়েটা রেঞ্জারের সঙ্গে হেসে গড়িয়ে আলাপ চালালেও সুজনকেই দিয়েছে তার সবকিছুর অধিকার।

বললাম, থাক ওসব কথা। মাথাটা কেমন গুলিয়ে ওঠে।

সেঁজুতি বলল, কিন্তু একটা কাজ তোমাকে করতে হবে।

বললাম, বল কি কাজ?

ও বলল, নতুন ইজারাদারের যে আবির্ভাব ঘটতে চলেছে এ বনে, সে খবরটুকু ওকে জানিয়ে দেওয়া। বলা বাহুল্য, আমাদের নাম সব সময়েই গোপন থাকবে।

বললাম, তাতে কাজ হবে কি ? টেন্ডারের কাগজ তো রেঞ্জারের হাতে। সুজন যত কম রেট দেবে, তার চেয়েও কমে নতুন ইজারাদারকে দিয়ে করিয়ে নেবে রেঞ্জার।

ও বলল, টেন্ডারগুলো রেঞ্জারের হাতে এলেও শেষ পর্যন্ত ফাইনাল ডিসিসান নেবেন কনজারভেটর।

বললাম, তাতেও বিশেষ কোন সুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না।

ও বলল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা কিছু একটা করলাম এই তৃপ্তি, আর কিছু নয়। একটা লোককে কৌশল করে হটানোর চেষ্টা কি সংগত ?

বললাম, এ ব্যাপারে আমাকে জড়িয়ে পড়তে হল, এই যা।

ও বলল, থাক্, আমি না হয় ইঙ্গিতে বলব।

আমি ওকে বাধা দিয়ে বললাম, তুমি সুজন সিং-এর কাছে পরোক্ষে পতিনিন্দা করবে এটা আমি নিশ্চয়ই হতে দিতে পারি না। আমিই বলব ওকে।

ও হেসে বলল, তোমার আসার আগে থেকেই সুজন সিং জানে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি। সুতরাং কথাটা তুমি বললেও তার বুঝতে একটুও দেরী হবে না যে কোন উৎস থেকে কথাটা এসেছে।

বললাম, তবু আমিই বলব ওকে।

সেঁজুতি হেসে বলল, বেশ তাই বল।

পরের দিন ব্রেকফাস্টে সুজন সিং হাজির। চার চারটে ডিমের পুরু অমলেট খেতে খেতে ও বলল, বড় ভুক্ষড়কী তর আমার খাবার অভ্যাস আছে চৌধুরী। বহুরানীকে এত করে বলি, আমাকে কুছ সহবৎ শিখলাও, তা বহুরানী বলে কি জানো?

সেঁজুতি বলল, কি বলি আমি বল?

সুজন সিং একটা চোখ বুজে মিঠি মিঠি হাসতে হাসতে বলল, আগে যে বনে রাক্ষস থাকত তা তোমাকে দেখলেই মালুম। আর মানুষের মত চালচলন রাক্ষস-খোক্ষসদের মানাবে নাই।

সেঁজুতি খানিকটা পরিজ ওকে পরিবেশন করতে করতে বলল, ঠিকই তো বলেছি। মানুষের রাক্ষস হওয়া যেমন সাজে না, তেমনি রাক্ষসদেরও নিজেদের অরিজিনালিটি বিসর্জন দিয়ে মানুষ হবার চেষ্টা করা ঠিক নয়।

আবার সেই ঠা ঠা হাসি সুজন সিংয়ের। কারো পেরিয়ে একেবারে ওপারের বনে গিয়ে বাজল।

আমি আর সুজন সিং সেদিন বেরিয়ে গেলাম। বেশ কয়েকদিন যে ওর সঙ্গে থাকতে পারব না সে কথাটা জানাতে হবে। তাছাড়া টেন্ডারের রহস্যটাও ফাঁস করে দিতে হবে ওর কাছে।

বাংলো থেকে বেরিয়ে সুজন সিং বলল, আজ কোনদিকে তোমাকে লিয়ে যাব বল চৌধুরী?

বললাম, দিক তো ঠাহর করতে পারব না সিং, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই আঁকতে বসে যাব।

ও বলল, একটা মেয়ের ছবি আঁকিয়ে দিবে, খুবসুরৎ জেনানা?

বললাম, তোমারটি বুঝি ?

ও হা হা করে হেসে অমার পিঠে একটা থাবা মেরে বলল, তুমি বহুৎ চালাক আছ চৌধুরী।

বললাম, এতে বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। যে ভালবাসায় পড়ে সে তার ভালবাসার পাত্রীকে বিশ্বসুন্দরী মনে করে।

সুজন সিং বলল, আগে দেখ তো দোস্ত, তারপর বলো বাৎ।

বললাম, ঐ যে চার্চে যেদিন বেড়াতে গেলাম, সেদিনই তো দেখলাম লিজাকে। হ্যাঁ, তোমার নজর আছে বলতে হবে।

সুজন সিং বলল, বহুৎ রোজ আমার মন বলছে কি, চৌধুরীকে দিয়ে একটা ছবি আঁকাব লিজার।

বললাম, একটা কেন, দশখানা ছবি এঁকে দেব তোমাকে।

ও বলল, দশঠো, আরে ব্বাপ!

আমি বললাম, কিন্তু ও রাজী হবে তো?

সুজন সিং বলল, রাজী হবে না, কি বলছ চৌধুরী। ওর গর্দান পাকড়ে লিয়ে আসব।

আমার ভীষণ হাসি পেয়ে গেল। দৃশ্যটি মনে মনে কল্পনা করার মতই বটে। অনিচ্ছুক প্রেমিকার ঘাড়ে ধরে তার প্রেমিক এক শিল্পীর কাছে ছবি আঁকতে নিয়ে আসছে।

বললাম, তার আর দরকার হবে না, এমনি হাত ধরে দুচারটে-প্রেমের কথা বলতে বলতে নিয়ে এলেই চলবে।

ও বলল, তাহলে বলি চৌধুরী আসলী বাৎ, লিজা আমাকে বলছে, তোমাকে দিয়ে একটা ছবি আঁকিয়ে দেবার কথা।

বললাম, লিজাকে বুঝি তুমি বলেছ, চৌধুরী একটা মস্তবড় আঁকনেওয়ালা।

ও বলল, আলবৎ বলেছি, শালা গলা ফাটায়ে বলব। সাচ বাৎ বলতে ডর কাহেকা বোলো দোস্ত।

বললাম, সাসাংদায় যাবে?

ও বলল, ওখানে যাবে না। আজ ফ্রাইডে আছে না চৌধুরী। লিজা ছোট নাগরার চার্চের কোঠিতে বাচ্চালোককে লিখাপড়া শিখলাবে।

বললাম, ওখান থেকে বের করে আনতে পারবে ওকে ?

সুজন সিং বলল, পারবে না কেন, আঁখ ইশারায় পাখি উড়ে আসবে।

এবার আমি অন্য কথা পাড়লাম, সিং, হয়তো তোমার সঙ্গে বেশ কিছুদিন আর ছবি আঁকার কাজে বেরোতে পারব না।

ও স্টীয়ারিং চেপে ধরে আমার দিকে তাকাল।

কেন চৌধুরী, গুস্সা হল কিসে?

বললাম, না না, রাগের ব্যাপার নয়। আমার সঙ্গে রোজ বেরিয়ে তোমার কাজের অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।

ও একটু থেমে কি ভাবল। তারপর বলল, বহুরানী বলেছে বুঝি ?

বললাম, না না, সেঁজুতি কেন বলতে যাবে। এই আমিই তো দেখছি।

ও একটা খাদের মুখের সংকীর্ণ বাঁক থেকে গাড়িখানাকে কসরৎ করে ঘুরিয়ে নিতে নিতে বলল, গোলি মার কামকো। আপ্‌সেহি কাম হইয়ে যাবে, বিশ রোজ বাদ হবে, কিন্তু চৌধুরী চলিয়ে গেলে আর ফিরবে নাই।

বললাম, সিং, তোমাকে বন্ধু হিসেবে একটা কথা বলব। কোথেকে কথাটা জানলাম সে প্রশ্ন কোর না।

ও আমার দিকে চেয়ে বলল, লিজাকে লিয়ে কোন কথা বলবে চৌধুরী?

বললাম, না, তোমার কারবারের সম্বন্ধে একটা গোপন খবর দিতে চাই। জানি না তাতে তোমার কিছু সুবিধে হবে কি না!

ও অবাক হয়ে বলল, কারবার লিয়ে কতদিন তুমি মাথা ঘামাচ্ছ চৌধুরী?

বললাম, মাথা টাথা বড় একটা ঘামাই না। তবে যা শুনেছি তাই বলছি।

ও চুপচাপ সামনের পথের দিকে চেয়ে গাড়ি চালাতে লাগল।

আমি বললাম, এক নয়া আদমী এবার ইজারার ব্যাপারে টেন্ডার দিয়েছে।

ও বলল, সে তো বহুৎ আদমী দিয়ে থাকে চৌধুরী।

বললাম, না, এর সঙ্গে, তাদের তফাত আছে। মনে হচ্ছে এই নতুন আদমী রেঞ্জারের প্যারের লোক।

মুহূর্তে দেখলাম, মুখখানা রেখায় রেখায় ভরে উঠল সুজন সিংয়ের।

বললাম, লিজার বাবাকে ঐ নতুন লোকটা কুলির কন্ট্রাক্ট দেবে এমন কথাও হয়েছে।

গ্রে-হাউন্ডের মত একটা গলা বেজে উঠল, রেঞ্জার যদি বহুরানীর হাজব্যান্ড না হত চৌধুরী, তাহলে এ শালা শয়তানটার টুঁটি ছিঁড়ে লিতাম। বহুরানীরকে বলেছি চৌধুরী সাগা বহিন, তাই শালা পার পাইয়ে গেল।

বললাম, উত্তেজিত হয়ো না সিং, উপায় বের কর।

ও বলল, শালা রেঞ্জার যদি কারচুপি করে চৌধুরী, তাহলে কন্ট্রাক্ট পাওয়া যে মুশকিল হইয়ে যাবে।

বললাম, ভাবনার কথা সিং। তবু চেষ্টা কর যদি কোন উপায় বের করতে পার।

গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবতে লাগল সুজন সিং।

একসময় বলল, রেঞ্জার লিজার বাপকে কব্জা করতে চায়। আমাকে বলেছিল, লিজার বাপের দলটাকে কাম দিতে, আমি দি নাই। তুমি বল চৌধুরী, পুরানা দলকে খারিজ করি কোন কানুনে? গরীব আদমী ভুখায় মরবে। আমি অন্যায় কাম করব নাই। তুমি কি বল চৌধুরী?

বললাম, তোমার বহুরানীর মুখে এসব কথা শুনেছি।

ও বলল, বহুরানী কি বলে?

আমি গলায় জোর এনে বললাম, বহুরানী তোমার বহিন তো, তাই ভাইয়ের যা কিছু সবই তার চোখে ভাল মনে হয়।

ও বলল, বহুরানী আমাকে ভালবাসে, আপনার সাগা ভাইয়ের মত।

গাড়ি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে গেলে চার্চটা আমার চোখে পড়ল। গাড়ি থামিয়ে সুজন সিং বলল, তুমি অপেক্ষা কর চৌধুরী, আমি লিজাকে লিয়ে আসছি।

ও প্রায় লাফাতে লাফাতে পাহাড়ের পাকদণ্ডীর পথটা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি কিছুটা দূর থেকে দেখতে পেলাম সাদারঙের চার্চটা ঠিক যেন তরল গলিত সোনার জলে স্নান করছে।

আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে ভ্যালিটা পুরো দেখা যাচ্ছে না, নদীর কিছুটা অংশ দেখতে পাচ্ছি। সেখানে স্রোতের ওপর সূর্যের আলো পড়ে ভাঙা আয়নার ঝিকিমিকি টুকরোর মত মনে হচ্ছে।

কতক্ষণ পরে একটা চাপা হাসির আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি সুজন আর লিজা আমার একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমাকে তাকাতে দেখেই সুজন বলল, তুমি তো কবি আছ চৌধুরী খালি আর্টিস্ট নেহি। আর আমার বাৎ শোন :

চোর কা নেশা চোরি
কবি কা নেশা নারী।

তোমার লিয়ে এই নারীটিকে আনলাম চৌধুরী, দেখ, এর একটা ছবি বানাতে পার কি না?

গাড়ি থেকে নেমে হেসে বললাম, এমন কথা বললে কিন্তু ছবি আঁকতে পারব না সিং।

সুজন সিং-এর মেজাজ শরিফ। বলল, খুবসুরৎ জেনানা আঁখের সামনে হাজির থাকলে ছবি আপসে হইয়ে যাবে।

মেয়েটি ভাঙা ভাঙা দেহাতি হিন্দীর সঙ্গে টুকরো টুকরো ইংরেজি মিশিয়ে বলল, আপনাকে একদিন সন্ধ্যায় চার্চের সামনের লনে দেখেছিলাম। সেদিন আপনার সঙ্গে ছিলেন রেঞ্জার সাহেবের বউ।

বললাম, আপনার কথাও আমার বেশ মনে আছে। আপনি আমার বন্ধুর গাড়িতে সেই যে গেলেন আর ফিরলেন না। একা বন্ধু অনেক রাত করে ফিরে এল।

সুজন সিং বলল, তোমরা দুজনে বাতচিত করবার বহুৎ টাইম পাবে চৌধুরী, চল তোমাদের স্পটে রাখিয়ে আসি।

আমরা গাড়িতে উঠতেই সুজন সিং পাহাড় থেকে গাড়ি নিয়ে নীচে নামতে লাগল। ঘুরে ঘুরে সে এল ঐ উপত্যকার কাছে।

গাড়ি থামিয়ে সে বলল, এসো আমার সঙ্গে ঐ পড়ো দুর্গটার পাশে।

আমরা তিনজনে এগিয়ে গিয়ে সেদিনের দেখা দুর্গটার পুব প্রান্তে হাজির হলাম। বন থেকে, চার্চের ওপর থেকে এ জায়গাটা একেবারে দেখা যায় না, কিন্তু এর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য আমাকে অবাক করে দিল।

গোলাপী আর সাদা কাঞ্চন ফুলের গাছে রাশি রাশি ফুল ফুটে জায়গাটাকে নিভৃত প্রকৃতির লীলাকুঞ্জ করে রেখেছে। একটা শাল আর একটা শিমুলের গাছ নীল শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আর কোথাও কিছু নেই। কয়েকটা পাথরের অমসৃণ স্তূপ কারা যেন সাজিয়ে রেখে গেছে। উত্তর আর পুব দিক জুড়ে বিরাট শ্যামশোভাহীন প্রান্তর। শুধু নদীর জলপ্রবাহ আর ছোট-বড় নুড়ির ছড়িয়ে পড়ে থাকার ছবিটুকু চোখে পড়ে এখান থেকে।

সুজন সিং বলল, চৌধুরী আজ তোমাকে ছোটনাগরার দুর্গেশ্বর করে রেখে গেলাম। এ জায়গাটায় আগে ছিল কোন হো-রাজার রাজধানী।

বললাম, ভগ্নদুর্গের অধীশ্বর।

ও বলল, তুমি খুশীসে আমার প্যারীর ছবি আঁক। খানা খাও। বহুরানীর হাতের বানানো বহুৎ বঢ়িয়া খানা।

বললাম, তুমি যাবে কোথা?

ও বলল, শয়তানির মোকাবিলা করতে।

বললাম, সর্বনাশ, এখুনি সব জানাজানি হয়ে যাবে। আমার যা হয় হোক্, তোমার বহুরানীর বিপদের আর শেষ থাকবে না।

সুজন সিং বলল, তুমি চৌধুরী আমাকে বুড়বক ভাবছ কেন? আমার বহুরানী আর তোমাকে বিপদে ফেলে আমি কি পালিয়ে যাব। আমার মোকাবিলা দোসরা কিসিমের। ডরো মাৎ দোস্ত্।

ও হাতখানা শূন্যে তুলে চলে গেল। গাড়ির কাছে পৌঁছে ও বলল, আমি চার বাজে আসবে, তখন ছবি দেখবে।

আমি হেসে ওর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লাম। ও গাড়িখানা বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

এখন আমি আর লিজা। ও আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসছে।

বললাম, এই নির্জন উপত্যকার পরিত্যক্ত দুর্গে যে এমন ফুলের মেলা দেখতে পাব তা একেবারেই ভাবিনি।

ও বলল, আর ক'দিন পরে এই শিমুলগাছে ফুল ফুটবে, তখন আপনাকে নিয়ে আসব।

বললাম, তোমাদের দেশ যত দেখছি ততই নতুন করে আবিষ্কার করছি।

ও মুখখানা নীচু করে বলল, অনেক দেখার আছে বাবুজী। বনকে যেমন দেখছেন, বনের মানুষগুলোকে তেমনি দেখুন। বড় গরীব আছে আমার দেশের মানুষগুলো।

হঠাৎ বললাম, তুমি ওদের কথা ভাব লিজা?

বলেই বললাম, সুজন আমার বন্ধু, তাই তোমার নাম ধরেই ডাকছি, কিছু মনে করলে না তো?

ও তেমনি মিষ্টি হেসে বলল, আমি আপনার চেয়ে সবদিক থেকেই ছোট। নাম না ধরে ডাকলে মনে মনে দুঃখই পেতাম।

একটু থেমে আবার বলল, আমি ওদের কথা ভাবি কিনা জিজ্ঞেস করছিলেন না? ভাবি, অনেক সময় বসে বসে ভাবি। কিন্তু কোন কূলকিনারা পাই না। ওদের কষ্ট দেখলে আপনার চোখে জল আসবে।

বললাম, ওরা কোন কাজ পায় না?

ও বলল, কত লোক, আর কতটুকুই বা কাজ। সরকারী কাজের জন্যে কন্ট্রাক্টর সাহেবরা আছেন। তাঁদের কাজে এরা নিযুক্ত থাকে। কিন্তু সবাইকে তো আর কাজ দেওয়া যায় না। তাছাড়া যারা কুলির কন্ট্রাক্ট নেয় তারা ওদের হপ্তার পাওনা থেকেও অনেকটা কেড়ে নেয়। দুঃখ ওদের ঘোচে না বাবুজী।

বললাম, এরা আর কোথাও কাজ করতে যায় না?

লিজা বলল, যায়, তবে খুব কম। এরা সুখ-দুঃখ একসঙ্গে কাটানোটাই পছন্দ করে।

বললাম, তোমার দেশের লোকেরা বড় বেশি মদ খায় লিজা।

ও বলল, মহুয়া এখানে সহজেই মেলে। ছেলে-বুড়ো সবাই সকাল থেকে মহুয়ার ফুল কুড়িয়ে বেড়ায়। মহুয়া দিয়ে মদ তৈরি করে খায়। কাজ না পাবার দুঃখ ভোলে, কম পয়সা পাবার দুঃখ ভোলে, আর ভোলে ছেলেমেয়েদের না-খেতে দেবার দুঃখ। এত সহজে বাবুজী এতগুলো দুঃখ কে ভোলাতে পারে মহুয়া ছাড়া!

বললাম, সে কথা সত্যি। আচ্ছা লিজা, ওরা কি চাষবাস করে না?

লিজা বলল, আজকাল কিছু কিছু করছে। মকাইয়ের চাষ চলছে কোন কোন অঞ্চলে। যারা মেটে আলু ছাড়া আর কোন খাবারের নাম জানত না তারা এখন মাঝে মধ্যে মকাই খাচ্ছে।

বললাম, হাটে-বাজারে মুর্গীর লড়াইয়ের ছবি আঁকতে গিয়ে দেখেছি, ছোট ছোট ছেলেরা নাচ দেখিয়ে খাবার চায়। মুর্গীগুলো যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে যুদ্ধ করে, ঠিক তেমনি ছেলেগুলোও তাদের মত লাফিয়ে মারামারির অভিনয় করে। খেলা দেখিয়ে ওরা কিছু খেতে চায়। কতক্ষণ নাচে, কিন্তু এতটুকু খাবার পেলেই খুশী।

ও বলল, ওরা একটু বড় হলে নদীতে সারাদিন ঘুরে ঘুরে মাছ ধরবে। ঐ মাছগুলোকে শুঁটকি বানাবে। তাছাড়া দুপুরবেলা বনের এক একটা জায়গায় দেখবেন বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা জোঁদার সন্ধান করছে। এক ধরনের পিঁপড়ের ডিম ওগুলো।

বললাম, তোমাদের ছেলেদের কাঁধে তীর-ধনুক দেখতে পাই, ওরা কি শিকার করে?

বলল, পাখ-পাখালি মেরে বেড়ায়। তাছাড়া লুকিয়ে চুরিয়ে বনের গাছ-গাছালিও কাটে। টাঙ্গির আওয়াজ জোরে বেজে উঠলেই ফরেস্ট গার্ডরা ছুটে আসে। ধরে নিয়ে যায়। বিনা মাহিনায় ক'দিনভোর খাটিয়ে নেয়। পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়লে রক্ষে নেই। বেতের মার পড়তে থাকে পিঠে।

এবার বললাম, সুজন সিং কুলিদের ঠিকমত মাহিনা মিটিয়ে দেয় নিশ্চয়ই?

ও বলল, যতটুকু জানি, ও কাউকে এক পয়সা ঠকাবে না। তবে ও কুলি-কামিনদের হপ্তা থেকে কিছু পয়সা কেটে রাখে। তার থেকে দরকারমত ওদের ঝোপড়িগুলো মেরামত করে দেয়। ও বলে, একটু ভাল থাকতে না পেলে কাজ করবে কি করে।

বললাম, সিং সাহেবের একটা নাকি কুলির দল আছে, তাদের দিয়েই সব কাজ করায়? অন্যদলের লোক বড় একটা নিতে চায় না?

ও বলল, কথাটা ঠিক। ও চায় না, কুলি আর কন্ট্রাক্টরের মাঝখানে আর কেউ থাকে। তাই ও ঘুরে ঘুরে ওর পছন্দমত লোক বেছে নিয়েছে।

ওর লোকদের বড় বড় সংসার, বাচ্চা-কাচ্চা মেলা। ওদের কাজ দিয়ে ও যতদূর সম্ভব ওদের সংসারের কিছু সুরাহা করে দিতে চায়। ওর দল বলতে আলাদা কিছু নেই বাবুজী।

বললাম, তুমি সুজনকে খুব ভালবাস, তাই না লিজা?

ও ঠোঁটের দুটো প্রান্তে হাসির রেখা ফোটাল। চোখ দুটো ছোট হয়ে এল। মুখটা নামিয়ে নিল ও।

বললাম, বড় বেশি ড্রিঙ্ক করে সুজন। তুমি কিছু বলতে পার না? অবশ্য মাতলামি করতে ওকে কোনদিনই দেখিনি।

ও বড় বড় চোখ তুলে আমাব দিকে তাকাল। বলল, অনেকদিন বলতে গিয়েছি বাবুজি, ও আমার মুখ হাত দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। অমার চোখ দিয়ে জল গড়ালে ও বলেছে, লিজা চারিদিকে বহুৎ দুখ আছে, আমি দুখ ভুলবার লেগে মদ খাই। আমি বলি. তোমার কি দুখ আছে বল? ও অমনি বলে, আমার প্যারকে আভিতক্ পেলাম নাই। ইস্‌সে বড় দুখ কিছু আছে নাই।

লিজার কথা শুনে বললাম, যদিও লিজা আজই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ তবু দু'একটা কথা তোমার কাছে জানতে চাই।

ও অসংকোচে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বললাম, তোমার সুজনের বিয়েতে বাধা কোথায়?

ও বলল, বাধা আমার বাবা। তিনি রাজপুত। এ বনে আমার ঠাকুরদাদা ফরেস্ট গার্ডের কাজ নিয়ে আসেন। বাবা তাঁর সঙ্গেই এসেছিলেন। এখানে থাকতে থাকতে আমার বাবা একটি হো-মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেন। আমি তাঁদেরই একমাত্র মেয়ে। ঠাকুরদাদা বাবার ওপর প্রচণ্ড রেগে কাজ ছেড়ে চলে যান। বাবা মাকে নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়েন। কোন কাজ জোটাতে পারেন না। শেষে মা ঐ চার্চের ফাদারের কাছে ঘরদোর পরিষ্কার করার একটা কাজ পেয়ে যান। আমি তখন খুব ছোট।

এই চার্চের লনেই খেলা করে বেড়িয়েছি। ফাদার আমাকে ছোট থেকে বড় হতে দেখেছেন। শুধু দেখেন নি, তিনি বড় হয়ে উঠতে নানা দিক থেকে সাহায্য করেছেন। আমি ওঁর কাছে থেকেই সামান্য যা কিছু লেখাপড়াও শিখেছি।

আমার মা অনেক আগেই মারা যান। আমি চার্চের প্রার্থনা ঘরটি সাজিয়ে রাখার কাজ পেয়ে যাই।

বাবা যখন দেখলেন, আমি লেখাপড়া শিখে বড় হয়েছি তখন তিনি আমাকে আর চার্চে রাখতে চাইলেন না। আমি দুঃখ পেয়েছিলাম, কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি বাবার আসল পরিকল্পনার কথা।

বাবা আমাকে কাছে নিয়ে গেলেন। বাবাকে দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখে আমার মন কেঁদে উঠল। আমি তাঁকে সহানুভূতির সঙ্গে সেবা-যত্ন করতে লাগলাম।

কিন্তু দিনের পর দিন দেখলাম বাবা আত্মসম্মান হারিয়ে সামান্য কাজ পাবার জন্যে আমাকে বড় বড় অফিসারের কাছে পাঠাচ্ছেন।

প্রথম প্রথম এ ব্যাপারে গুরুত্ব না দিয়েই গিয়েছি, কিন্তু দিনের পর দিন দেখেছি ওদের বীভৎস চেহারাগুলো।

শুধু ব্যতিক্রম ছিল একটি মানুষ। সে আপনার বন্ধু সুজন। তার কাছে বাবা আমাকে অনেকবার পাঠিয়েছেন। কয়েকবার যাতায়াতের পর আমাকে ওর ভাল লেগে যায়। আমিও ওকে দেখে মনের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকি।

একদিন আমরা দুজনে একটা নদীর ধারে বসে পরস্পরকে ভালবাসার কথা জানাই।

উঠে যাবার সময় ও আমাকে বলল, লিজা তোমাকে আমি ভালবাসি, আর ঐ ভালবাসার জোরে একঠো বাৎ বলব, তোমার বাপকে আমি কুলিকামিনের কন্ট্রাক্ট দিতে পারব নাই।

বললাম, সে তোমার মর্জি। আমার ভালবাসার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

বাবাকে একসময় বললাম, সুজন, কুলি আর কন্ট্রাক্টরের ভেতরে আর কাউকে রাখতে নারাজ।

কথাটা শোনার পর থেকে বাবা মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু সুজনের সঙ্গে দেখা হলে কিছু বলতেন না। আজও কিছু বলেন না। আমার মনে হয় এখনও বাবা আশা ছাড়েন নি একেবারে।

লিজার কথা শুনে বললাম, কিন্তু কিছু যদি মনে না কর তাহলে আর একটা প্রশ্ন তোমাকে করব।

লিজা বলল, সে প্রশ্নটা কি রেঞ্জার সাহেবকে নিয়ে?

আমি বললাম, তুমি কি মুখ দেখে বুঝতে পার নাকি লিজা?

ও বলল, বলুন না আমার অনুমান ঠিক কিনা?

বললাম, ঠিকই ধরেছ, এখন উত্তরটা তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

ও বলল, আজ আপনাকে যে কথাটা বলব তার সবটুকু সুজনকেও বলিনি আমি কোনদিন। শুধু অনুরোধ, এ বিষয়ে কোন কথা আপনি আপনার বন্ধুকে বলবেন না।

বললাম, কথা দিচ্ছি লিজা।

ও বলল, বাবা যখন দেখলেন সুজনকে সহজে হাত করা যাবে না, তখন রেঞ্জারকে ঘরে আমন্ত্রণ করে আনলেন। বাবার অনুরোধে রেঞ্জারকে আমি আতিথ্য দিলাম। সেদিন থেকে আমার ঘরে শুরু হল ওঁর ঘন ঘন যাতায়াত। আমি ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলতে পারলাম না। এখন তো ওঁর আচরণ দেখে আর কথাবার্তা শুনে মনে হয় উনি মিসেস ভট্চাযকে ভুলতে বসেছেন।

বললাম, এতটা পতনের সুযোগ তুমি ওঁকে নাও দিতে পারতে লিজা।

ও বলল, সে অনেক কথা বাবুজী। ইতিমধ্যে আমার বুড়ো বাবাকে রেঞ্জারসাহেব সামান্য একটা পিয়নের কাজ দিয়েছেন। আমি ওঁকে এখুনি অনাদর করলে উনি আমার বাবাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করে দিতে পারেন।

তাছাড়া বাবা যাই করুন না কেন আমার মাকে বড় ভালবাসতেন। আমি আমার বুড়ো বাবাকে নিয়ে বাইরে কোথাও চলে যেতে পারতাম, কিন্তু মায়ের স্মৃতিটুকু আগলে এখানেই পড়ে থাকতে চান বাবা। তাই আমার হয়েছে দুদিকের সংকট।

এদিকে আর একটি কথা। ড্রিঙ্ক করে যেদিন রেঞ্জার আসেন আমার ঘরে, সেদিন ওঁর মুখ থেকে সুজনের বিরুদ্ধে এমন সব পরিকল্পনার কথা জানতে পারি, যা সুজনকে সাবধান করার ব্যাপারে আমার কাজে লাগে।

বললাম, তুমি যে সুজনের এ রকম উপকার করছ তা কি ও জানে?

লিজা বলল, ওর হিতের জন্য যদি কিছু করেও থাকি তাহলে সে কথা কোনদিন আমার বুকের ভেতর থেকে বের হবে না বাবুজী।

বললাম, তোমার ঘরে যে রেঞ্জারের যাতায়াত আছে তা কি সুজন জানে না? যদি জানে তাহলে সে কি তোমাকে কিছু বলে না?

লিজা বলল, খুব জানে। তবে আমাকে কোন কথা বলে না। একদিন শুধু এই পলাশগাছটার পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল, লিজা, মানুষ যাকে ভালবাসে তাকে সন্দেহ করতে নাই। সন্দেহ করলে সে আপনি জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যায়।

আমি সেদিন শুধু ওর দিকে তাকিয়েছিলাম বাবুজী। কোন কথা বলতে পারিনি। রাতে ঘরে শুয়ে যীশুর কাছে বলেছিলাম, আমি হয়তো অনেক পাপ করেছি প্রভু, তবে ওকে যে ভালবাসা দিয়েছি তাতে খাদ নেই এক ফোঁটা।

বললাম, সুজন তোমার পাশের ঐ শালগাছটার মতই সরল আর বলিষ্ঠ। তোমার মাথার ওপরের ঐ আকাশের মত ওর মনটা রোদ-ঝলমল। আবার হু হু করে ছুটে আসা ক্ষ্যাপা হাওয়ায় ফুটে ওঠে ওর রাগের ছবি।

লিজা বলল, আপনি ওর চরিত্রটা সুন্দর একটি কবিতা করে বললেন। কিন্তু আমিও জানি, এটাই ওর ঠিক ঠিক পরিচয়।

বললাম, সবচেয়ে যে জিনিসটা ওর আমাকে আকর্ষণ করে তা হল ওর মনের সোজাসুজি প্রকাশ। কথাগুলো সুজনের কখনো পাহাড়ী পথের মত এঁকে-বেঁকে অথবা উঁচু-নীচু হয়ে চলে না।

লিজা বলল, ইতিমধ্যে ও এক কাণ্ড করে বসেছে ভাইসাহেব।

লিজা হঠাৎ করে আমাকে ভাইসাহেব বলায় একটা খুশীর কদম ফুল ফুটে উঠল আমার মনে।

বললাম, তুমি আমাকে আজ ভাই বলে ডাকলে, এমন মন ভরানো ডাক শোনার সৌভাগ্য আমার আর কোনদিন হয়নি লিজা।

ও হেসে বলল, সৌভাগ্যটা আপনার চেয়ে আমার একটুও কম নয় ভাইসাহেব।

বললাম, এখন যা বলতে চাইছিলে বল। কি কাণ্ড আবার করে বসল সুজন?

লিজা বলল, একদিন আমাকে টুঁড়তে এসে ও কোথাও না পেয়ে একেবারে উঠে গেল ঐ ওপরে ফাদারের ঘরে।

ফাদার ওকে কোনদিন দেখেননি। কিন্তু তাতে কি আসে যায়। ও কিছুক্ষণের ভেতরই কথা বলে ফাদারের মন এমন জয় করে নিল যে ফাদার আমাকে চার্চের ঘর থেকে ডেকে পাঠালেন।

আমি ফাদারের কাছে গিয়ে ওকে দেখে তো অবাক। বিশ্বাস নেই, কথায় কথায় কি বলতে কি বলে ফেলেছে।

ঠিক তাই, ও যে আমাকে ভালবাসে তা বৃদ্ধ ফাদারকে ইতিমধ্যেই বলে বসে আছে।

আমাকে দেখেই ফাদার আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাতটি তুলে বললেন,

The Lovers are timeless, eternal.
The Lovers are young and beautiful.
The Lovers are as free and natural
as the sunlight, sand and sea.

আমি দারুণ লজ্জিত হলাম, কিন্তু মনে মনে খুশী হয়ে উঠলাম। ফাদারের ঐ কথাগুলো আয়নার ওপর ফুটে ওঠা আমাদের প্রতিবিম্ব বলে মনে হল।

ফাদার আমাদের জলযোগ করিয়ে বললেন, লিজা, তোমার এই বন্ধু নির্বাচনে আমি খুব খুশী হয়েছি। ক'দিন তোমরা ঘুরে বেড়াও। কাজ থেকে এ ক'দিন তোমার ছুটি।

আমি লিজাকে বললাম, তুমি কিংবা আর কেউ হলে ফাদারকে এত সহজে ভালবাসার কথা বলতে পারতে না। সুজন বলেই পেরেছে। ওর মনের ভেতর যে ঘর তার জানলা-দরজাগুলো সব সময় খোলা। সেখানে সারাক্ষণ আলো-হাওয়ার আমন্ত্রণ। ওর মনের মহলগুলোতে একটাও চোরাকুঠুরী নেই।

লিজা শালগাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনছিল। তার মন কিন্তু ঘুরছিল ঐ মানুষটার চারদিকে। আমি লিজার চোখের চাহনি থেকেই বুঝলাম, ও অন্য জগতে হারিয়ে গেছে।

খুব ভাল লাগল ওর হারিয়ে যাবার এই ছবিখানা।

আমি ক্যানভাসে স্কেচ করতে লেগে গেলাম।

মুখের মিষ্টি আদল আর ভাসা ভাসা চোখের হারানো ছবিটা ক্যানভাসে ফুটে উঠতেই আমি বললাম, তুমি যার কথা ভাবছিলে সে তোমার এ ছবি দেখে নিশ্চয়ই খুশী হবে।

লিজা বলল, আপনি কিন্তু আমাকে একটুও প্রস্তুত হতে দিলেন না।

বললাম, প্রস্তুত হতে গেলেই ছবি হয়ে থাকতে, ছবিতে লাইফ আসত না।

ওকে এবার বললাম, তুমি ঐ পিঙ্ক রঙের কাঞ্চনফুল খোঁপায় গুঁজে দাঁড়াও তো দেখি।

ও সামনের বনে চলে গেল।

আমি ওর সুন্দর দেহভঙ্গিমার স্কেচ করতে লাগলাম।

লিজা কাঞ্চন ফুলের বন থেকে চেঁচিয়ে বলল, ভাইসাহেব ফুল তো তুললাম, কিন্তু কেমন করে খোঁপায় দেব একটু বলে দেবে?

ছবি থেকে মুখ না তুলেই বললাম, তুমি ঠিক যেমন করে ফুল দাও খোঁপায় তেমনি করেই দেবে।

ও এসে দাঁড়াল সেই শালগাছের পাশে। আমার স্কেচ দেখতে লাগল।

স্কেচ শেষ হলে আমি মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। ভারী সুন্দর মানিয়েছে ওকে। একপাশ করে বাঁধা বাঁকা খোঁপায় গোলাপী রঙের কাঞ্চনফুল দুটি ছোট ছোট সবুজ পাতা নিয়ে জেগে আছে।

হেসে বললাম, আমি চেষ্টা করলেও লিজা তোমার মত ঠিক জায়গায় ঠিকভাবে ফুলটি লাগাতে পারতাম না।

ও বলল, এমন করে বলবেন না ভাইসাব, আপনি হলেন আর্টিস্ট।

বললাম, তোমরা হলে সবসেরা আর্টিস্ট। সুন্দর করে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে তোমাদের স্বাভাবিক দক্ষতা। সেখানে অনেক বড় আর্টিস্টও হার মেনে যায়।

ও এবার পাথরের একটা স্তূপে বসে পড়ল। আমি স্কেচের ওপর রঙ-তুলির কাজ করে চললাম। ও নিবিষ্ট আগ্রহে দু-চোখ পেতে দেখতে লাগল আমার কাজ।

বেশ বেলা অবধি ছবি আঁকলাম। সামান্য কাজ বাকী রেখেই উঠে পড়লাম। খাবার বেলা পেরিয়ে যাচ্ছিল। একটানা রঙের কাজ করতে করতে কাজের ঔজ্জ্বল্য চোখের ওপর অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। ছবি আঁকতে গেলে এমনি হয় অনেক সময়। কিছুক্ষণ বিরতির পর নতুন রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে ছবি।

লিজা আমার টিফিন ক্যারিয়ার থেকে খাবার বের করতে গিয়ে বলল, বহুরানী অনেক খাবার দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু। আমরা তিনজন খেলেও শেষ করতে পারতাম না।

হেসে বললাম, সুজনের জন্যে নিশ্চয়ই তোমার মন কেমন করছে, তাই না?

ও বলল, তা কেন। ও নিজের মর্জিতেই চলে। খাবার জন্যে সাধলেও খায় না। আবার যেদিন ইচ্ছে হয় লোভীর মত এটা ওটা চেয়ে-চিন্তে খেয়ে যায়।

আমরা খাবার পরে ঐ পড়ো দুর্গটার ভেতর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। মাঝে মাঝে নানা ধরনের ছোট ছোট ঝোপঝাড় দেখা গেল। অসংখ্য প্রজাপতির যেন মেলা বসে গেছে। পাহাড়ী ফুলের মধু খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা।

ওদিকে পরিত্যক্ত দুর্গের প্রকার ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার মনে হল, আমি যেন সম্ভ্রান্ত অতিথির মত বিচরণ করছি অতীতের কোন প্রাসাদের অভ্যন্তরে। অজস্র সুবেশা তরুণী প্রজাপতির মত নাচতে নাচতে আমাকে নিয়ে চলেছে রাজপুরীর গোপন অন্তঃপুরে।

আমার বুক কি এক আনন্দ আর উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। শৈলপুরীর নৃপতি হয়তো এখুনি তাঁর কন্যার হাত ধরে উপস্থিত হবেন আমার সামনে। বলবেন, শিল্পী, তুমি আজ আমার এ প্রাসাদপুরীর সবচেয়ে সম্মানীয় অতিথি। আমার এ কন্যাকে দিলাম তোমার হাতে সামান্য সম্মান-দক্ষিণারূপে। তুমি একে গ্রহণ করে আমার এ শৈলসাম্রাজ্যকে ধন্য কর।

আমি যেন হাত ধরলাম নতমুখী কম্পিত কন্যার।

সহসা কেঁপে উঠল পায়ের তলার প্রস্তর। হঠাৎ সমস্ত প্রসাদ, দুর্গ, নগরী ধীরে ধীরে নেমে গেল কোন অতলে।

আমি চীৎকার করে উঠতে গেলাম। গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুল না।

স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতেই দেখলাম, আমি একটা উঁচু পাথরের স্তম্ভের মত কিছু ধরে রয়েছি। প্রজাপতিগুলো উড়ছে।

আমার মুখের হয়তো কিছু অস্বাভাবিক ছবি লিজার চোখে পড়ে থাকবে। ও আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, ভাইসাহেব. আপনি কি কোন রকম অস্বস্তি বোধ করছেন?

আমি হেসে উঠে বললাম, না না, একটুও না। শুধু মনে হচ্ছে এই বিচিত্র রঙের প্রজাপতিগুলো হয়তো লুপ্ত শৈলনগরীর রাজনর্তকী ছিল।

লিজা হেসে বলল, আপনি সত্যিই কবি, ভাইসাহেব।

এবার ফিরে এলাম আমার ছবির সামনে। এ কে দাঁড়িয়ে আছে! একটা মগ্ন মাধুরীর আশ্চর্য সুন্দর ছবি। মনে হল, শকুন্তলা কি এমনি করে তাকিয়েছিল নিজের মনের গভীরে প্রিয়তমের সন্ধানে! ক্রুদ্ধ দুর্বাশার অভিশাপও তার মগ্ন চেতনাকে জাগ্রত করতে পারেনি।

বললাম, লিজা, এ তোমার জীবনের এক অক্ষয় মুহূর্ত। আমার কথা শুনতে শুনতে তুমি যখন সুজনের চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলে, তোমার তখনকার সেই সুন্দর মগ্নতাটুকু ধরে রাখার চেষ্টা করেছি এই ছবিতে।

লিজা বলল, আপনার তুলিতে সব কিছু সুন্দর হয়ে ওঠে।

বললাম, তুমি সুন্দর না হলে সাধ্য কি আমার তুলির তোমাকে সুন্দর করে তোলা। দেখ লিজা,

তোমার বহুরানী কিন্তু তোমার রূপের অনেক তারিফ করেছিল আমার কাছে।

লিজা বলল, বহুরানী আমাকে ভালবাসেন নিশ্চয়ই, তাই আমার খারাপ কিছু তিনি দেখতে পান না। তাছাড়া আমাদের বহুরানী নিজে সুন্দর তাই তিনি সবাইকে সুন্দর দেখেন।

বললাম, তোমার বহুরানী আমার ছবির প্রেরণা লিজা।

ও মিষ্টি হেসে ভ্যালির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, আমি জানি, বহুরানী আপনাকে খু-উ-ব ভালবাসেন।

আমি এর কোন উত্তর দিলাম না। সুজনের কাছ থেকে লিজা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে।

বললাম, এবার তোমার ছবির কাজটুকু তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে হবে, না হলে সুজন এলে কি কৈফিয়ৎ দেব তার কাছে।

আমি সামান্য যা বাকী ছিল তাই করার কাজে লেগে গেলাম।

আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ও দেখতে লাগল নিজের ছবি।

আমরা দুজনেই অল্প সময়ের ভেতরে মগ্ন হয়ে গেলাম। একজন আঁকার কাজে, আর অন্যজন দেখার কাজে।

ছবিতে শেষ তুলির টান দিয়ে চোখ তুলতেই সামনে একটা দীর্ঘ ছায়া দেখতে পেলাম। ছায়া অনুসরণ করে গিয়ে যাকে ধরলাম সে কতক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে আছে তা জানতে না পেরে বললাম, তুমি এমন নিঃশব্দে এলে যে, মনে হচ্ছে এই দুর্গ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছ।

আমার কথা শুনে চমকে তাকাল লিজা। তার চোখে-মুখে বিস্ময়। সে এতক্ষণ ছবির ভেতর ডুবে গিয়েছিল।

সুজন সিং বলল, বহুৎ তারিফ করবার মত ছবি এঁকেছ তুমি চৌধুরী।

আমি অমনি বললাম, এতদূরে দাঁড়িয়ে থেকে কিই বা দেখলে ছবির যে এমন করে তারিফ করছ?

সুজন বলল, যার ছবি তাকেই আমি দেখতে আছি এতক্ষণ। লিজা তো একদম মশগুল হইয়ে আছে। পানি 'পর আপনা ছায়া দেখতে আছে কমল। ইস্‌সে বড়া সার্টিফিকেট কোথাও মিলবে নাই চৌধুরী।

বললাম, ভাল মন্দ বুঝি না, তোমার পছন্দ হলেই আমি খুশী।

সুজন এবার এগিয়ে এসে আমার আঁকা ছবিখানা তুলে ধরে দেখতে লাগল। তার চোখে-মুখে তারিফ যেন উপচে পড়ছিল।

এক সময় ছবিখানা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, একটু সিধা করিয়ে ছবিখানা পাকড়ায়ে রাখ তো চৌধুরী।

আমি তাই করলাম।

হঠাৎ সুজন এক কাণ্ড করে বসল। দুহাতে লিজাকে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল আমার পাশে।

তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে পিছু হটতে হটতে বলল, এখন মিলিয়ে দেখতে আছি কোন জন সেরা আছে। ছবির লিজা, না আসলি লিজা।

আমি হেসে বললাম, চিরদিন তোমার আসল লিজাই তোমার চোখে সেরা হয়ে থাক এই কামনাই করব।

লিজা অমনি আমার হাত থেকে ছবিখানা কেড়ে নিয়ে বলল, এ ছবি আমি কাউকে দেব না ভাইসাহেব। এ ছবি কাছে পেলে তোমার দোস্ত বিলকুল আমাকে ভুলে যাবে।

সুজন সিং আবার সেই হা হা হা হা হাসিতে ভ্যালির বাতাসে ঢেউ তুলতে লাগল।

সেদিন আমরা আর বেশী সময় থাকি নি সেখানে। গাড়িতে ওঠার আগে সুজন একহাতে আমার ছবি আর অন্যহাতে লিজাকে ধরে নিয়ে এল। লিজার মুক্তির জন্যে ক্ষীণ প্রতিবাদ সুজনের বলিষ্ঠ বাহুর বাঁধনে চাপা পড়ে গেল।

গাড়িতে আসতে আসতে সুজন বলল, কাল রাঁচী যাচ্ছি চৌধুরী।

বললাম, হঠাৎ রাঁচী, কি ব্যাপার?

ও বলল, ফিরে এসে বলব।

প্রায় দু'সপ্তাহ কেটে গেছে, সুজন সিংয়ের দেখা নেই। আমি আর সেঁজুতি মাঝে মাঝে কাছে পিঠে ঘুরে বেড়াই। কখনো মর্জি হলে রেঞ্জারসাহেব আমাকে তাঁর গাড়িতে নিয়ে যান এদিক ওদিক।

একদিন আমি আর মিঃ ভট্‌চায জিপে করে গেলাম পোসাং। সেখানে এক টিম্বার মার্চেন্টের অফিস। টিনের ছাউনি দেওয়া অফিস ঘরটি এবং তার সংলগ্ন বাগান দেখে খুব ভাল লাগল। চেষ্টা করলেও বোধহয় এমন সুন্দর একটি ছবি তুলি দিয়ে আঁকা সম্ভব হবে না। প্রকৃতি সেখানে শুধু রূপ ঢেলেই চুপ করে বসে নেই, পাখিদের পাঠিয়েছে সুর-বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য।

হলুদ রঙের থোকা থোকা টেকোমা ফুল ফুটে আছে। তিলাই গাছে ফুটেছে ছোট ছোট সাদা ফুল। তেউড়ির লতা ঝুলছে বারম গাছের থেকে। নীলে সাদায় মেশা ফুল ফুটেছে লতায়।

কেলাউন্দার ঝোপ থেকে দুটো ফুটফুটে হলুদ পাখি বেরিয়ে এল। টিউ টিউ কিচ্ কিচ্ গান আর লাফিয়ে লাফিয়ে নাচ। বাংলো বাড়ির পেছনে ছোট্ট পাহাড়। হেসেল, বীজা আর শিমুলের বন। সাংকারলা লতায় সাদা সাদা ফুল ফুটিয়ে বনের হো-মেয়েরা যেন হাসছে; হলুদ রঙের কেশর দুলছে হাওয়ায়।

এক ঝাঁক টিয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করতে করতে সবুজ পাতার মত আকাশ থেকে ঝরে পড়ল কৃষ্ণচূড়া গাছের ওপর।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম নির্জন প্রকৃতিলোকের এই আনন্দ আয়োজন। দুখানা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। পাশে কাঠ চেরাইয়ের ঘর। ট্রাকের ওপর তিনটি কুলি ঘুমোচ্ছে। একটু পরে কাঠ বোঝাই হবে। সারারাত বন পেরিয়ে গাঁ গঞ্জ পেরিয়ে ট্রাক বোঝাই কাঠ যাবে কোন দূর স্টেশানে। ওয়াগন বোঝাই হয়ে সে কাঠ গিয়ে পৌঁছবে বড় বড় শহর নগরের ব্যবসা কেন্দ্রে।

রাতের বন পাহাড় পেরিয়ে যখন ট্রাক চলবে তখন পাশের বন আলোয় ফুটে উঠে মুহূর্তে পিছলে যাবে অন্ধকারের সমুদ্রে! বাঁকের মুখে হর্ন বাজলে ঘুম ভেঙে পাখা ঝাপটাবে বনের পাখি।

ট্রাকে বসে ঘুম তাড়ানি গান গাইবে কুলির দল। ক্বচিৎ কখনো গরুর গাড়ি পথে পড়লে ড্রাইভার থেকে সবকটি কুলি চুটিয়ে গাল পাড়বে। যে গালমন্দের ভাষা সভ্যসমাজে একেবারে অশ্রুত। একান্ত ওদেরই নিজস্ব শব্দ আর ভাষায় শ্রীমণ্ডিত। মহুয়ার মদ খেয়ে যাবে ওরা। ক্লান্তিহারা উত্তেজনায় কাটিয়ে দেবে এই পথচলার দীর্ঘ রাত।

আমি ঘুরে ঘুরে দেখছি বাংলোর চারদিক, আর আমার হাতে মুখে জামাকাপড়ে গড়িয়ে পড়ছে অপরাহ্নের সোনালী মধু-রঙের রোদ। আমি ছোট ছোট ছবি দেখছি আর তার এক একটিকে ধরে মনে মনে রঙে রসে জাল বুনে চলেছি।

মিঃ ভট্‌চায এতক্ষণ অফিস ঘরের ভেতর টিম্বার মার্চেন্টের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ভেতর থেকে যে দু'এক টুকরো কথা ভেসে আসছিল তাতে গোপন কাঠ লেনদেনের কিছু গন্ধ ছিল।

এক সময় কথা শেষ করে বেরিয়ে এলেন রেঞ্জারসাহেব।

আমাকে সামনে দেখেই বললেন, চলুন, কইনা নদীটার কাছ থেকে আপনাকে একটু ঘুরিয়ে আনি।

বললাম, দারুণ সুন্দর জায়গায় আজ আপনার সঙ্গে এসে পড়লাম।

মিঃ ভট্‌চায গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়েই বললেন, বন হল রত্নের আকর মিঃ চৌধুরী। কেউ বা ফলের শোভায় মশগুল হয়, আবার কেউ বা ফল সংগ্রহের কাজেই ব্যস্ত থাকে। কবিরা কাব্য লিখেই আনন্দ পায়, আর আপনাদের প্রকাশকেরা তাই বেচে দু'পয়সা ঘরে তোলে।

হেসে বললাম, মিঃ ভট্‌চায দু'একজন ভাগ্যবান কবি ছাড়া প্রকাশকের নেক নজরে বড় একটা কেউ পড়ে না।

এবার আমি অন্য কথা পাড়লাম, আচ্ছা মিঃ ভট্‌চায, আপনি যে এত বনে বনে ঘুরে বেড়ান, বন ছেড়ে যেদিন চলে যাবেন সেদিন মন কেমন করবে না?

মিঃ ভট্‌চায বললেন, নিশ্চয়ই করবে। তবে আপনাদের মত বনের শোভা না দেখতে পেয়ে আমার

মন এতটুকুও কেমন করবে না, তার রসটুকু আর নিঙড়ে নিতে পারব না বলেই মন মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে।

আমরা টুকরো টুকরো কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেছিলাম। রেঞ্জারসাহেব আজ একেবারে দিল দরিয়া। একটু আগেই টিম্বার মার্চেন্ট ওর গলাটা হয়ত ভিজিয়ে দিয়েছে। তাই কথাবার্তা পিছল পথে বাধাহীন হয়ে আসছে।

নদীর ধারে গাড়ি থামিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন দেখলেন রেঞ্জার।

একসময় বললেন, এখান থেকে ছ'সাত মাইল সারান্দার দূরত্ব। এটাকে বলতে পারেন নো ম্যানস্ল্যান্ড। এখানকার চাল চলনে খবরদারি করবার কোন এক্তিয়ার আমাদের নেই। ফরেস্টের মূল্যবান জিনিস পাচার হয় এই পথে।

বললাম, ফরেস্ট গার্ডরা রয়েছে বনের সম্পত্তি রক্ষার জন্যে।

রেঞ্জারসাহেব বললেন, গার্ডদের রক্ষার জন্যে আবার আছে ওইসব চোরাচালানকারীরা।

বললাম, এটা দারুণ অন্যায়। যাদের হাতে রক্ষণের ভার তারাই করছে ভক্ষণ।

রেঞ্জারসাহেব হেসে উঠলেন। বললেন, আপনি তো দেখছি মশায় ভীষণ নীতিবাগীশ। কষ্ট আছে আপনার কপালে।

বললাম, নীতির কথা নয়, আমার ওপর দেওয়া কর্তব্যটুকু আমি করব না!

মিঃ ভট্চায বললেন, বলুন, আমার দেশের কোন্ মানুষটা তার কর্তব্য ঠিক ঠিক পালন করে চলেছে। স্বামী স্ত্রীর কর্তব্য, ছাত্র শিক্ষকের কর্তব্য, দেশ আর দেশসেবকের কর্তব্য কি পালিত হচ্ছে? কর্মীরা কি কাজে ফাঁকি দিচ্ছে না? মালিক কি বঞ্চিত করছে না তাদের? মন্ত্রীরা কি ভদ্রলোকের কথা দিয়ে হামেশা কথার খেলাপ করছেন না? বলুন মিঃ চৌধুরী, তাহলে আমরা এই কটা বনের প্রাণী সততার সঙ্গে কর্তব্য করে গেলে ধরায় কোন্ স্বর্গ নেমে আসবে?

আমি শুধু মাথা নাড়লাম। এখানে প্রতিবাদ করা বৃথা। রেঞ্জারের প্রতিটি কথাই সত্য। কিন্তু তার চেয়েও সত্য আছে, সে সত্য হল, প্রতিটি মানুষ সততার সঙ্গে কাজ করলে দেশের এই হাল একদিন পাল্টাবেই।

আমার বিশ্বাসের কথা রেঞ্জারকে আর কিছু বললাম না।

রেঞ্জার বললেন, এই মেয়ে পুরুষের কথাই ধরুন না। স্বামী অথবা স্ত্রী মনে মনে ব্যভিচার করলে দোষ হয় না, কেবল প্রকাশ্যে করলেই যত অপরাধ। আচ্ছা, মিঃ চৌধুরী আপনি কাউকে কাছে পেতে চাইলে সেটা অন্যায় হবে কেন? খিদে পেলে যদি আমরা সবার সামনে খেতে পারি তাহলে দেহ বা মনের ক্ষুধায় লুকিয়ে খাব কেন? এইজন্যে আমি পশুদের যথেচ্ছ মেলামেশা পছন্দ করি। তাদের ভেতর লুকোচুরির ব্যাপারটা নেই।

হেসে বললাম, তাদেরও কিন্তু সংসার আছে। তারাও মেয়ে-পুরুষ সন্তান-সন্ততি নিয়েই বাস করে। তাদের মেয়ে-পুরুষের ভেতর ভালবাসা কম নয়।

রেঞ্জার বললেন, বহু পশুই তাদের নিজস্ব সংসার জীবন থাকলেও একাধিক পশুতে স্বাভাবিকভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে। আমাদের বেলায় তাহলে এত অকারণ আবরণ কেন?

বললাম, এ রুচি আর পছন্দের ব্যাপার মিঃ ভট্চায। অনেকে মনে করেন আবরণটা সৌন্দর্যেরই একটা অঙ্গ।

মিঃ ভট্চায বললেন, আপনারা আর্টিস্ট মানুষ মশাই, আপনাদের সঙ্গে এখানেই আমাদের গরমিল।

বাহা পরবের সময় হো-মেয়েরা যখন নাচে তখন আমরা যে নাচ দেখে মেতে যাই সেটা ওদের সঙ্গ লাভের ইচ্ছায়। আপনারাই তো বলেন মশাই, বসন্ত নাকি মিলনের ঋতু। এই বসন্তে ওরা যখন দেহে ঢেউ তুলে নাচে তখন তার ভেতর পুরুষকে ডেকে নেবারই ইঙ্গিত থাকে। এরপর মহুয়া খাবার পালা। দেখবেন, সারা পূর্ণিমার রাত ওরা মহুয়া খেয়ে বনের ভেতর মেয়ে পুরুষে লুটোপুটি করছে।

হঠাৎ মিঃ ভট্চায কথা থামিয়ে গাড়ির পাশে দৌড়ে গিয়ে ব্যাগ থেকে বাইনাকুলারটা টেনে নিয়ে

চোখে লাগিয়ে দূরে কি যেন দেখতে লাগলেন।

আমাকে কাছে ডেকে বাইনাকুলারটা হাতে দিয়ে বললেন, দেখুন মিঃ চৌধুরী কাঠ পাচার হচ্ছে কি রেটে।

আমি চোখে বস্তুটি লাগাতেই কয়েকখানা কাঠ বোঝাই সারিবদ্ধ ট্রাককে আমার একেবারে সামনে দিয়ে নদী পার হয়ে যেতে দেখলাম।

বাইনাকুলার নামিয়ে মিঃ ভট্চাযের হাতে দিতেই, সেটিকে ব্যাগে রাখতে রাখতে বললেন, উঠুন তাড়াতাড়ি, দেখি একবার শালাদের।

জিপ নিয়ে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছবার আগেই দেখি কয়েকখানা গাড়ি প্রাণফাটা আর্তনাদ তুলে কইনা নদী পার হয়ে গেছে।

শেষের দুটি গাড়ির সামনে আমাদের জিপ দাঁড়িয়ে গেল। আমার মনে হল, ইচ্ছে করলে ঐ বিরাট আকারের মজবুত শক্ত লরিটা এক ধাক্কায় আমাদের দেশলাই বাক্সের মত জিপটাকে কইনা নদীতে উল্টে ঠেলে ফেলে দিতে পারে।

কিন্তু তা করল না। আমি দেখলাম, রেঞ্জারও নামলেন না গাড়ি থেকে। যার গরজ সেই আসবে আগে।

শেষে একখানা বোঝাই লরি থেকে নেমে এল একটি লোক। পাক্কা ব্যবসাদারের মত মাথাটি হেঁট করে একফালি হেসে নমস্কার, জানাল।

রেঞ্জার হাত বাড়িয়ে বললেন, দেখি কখানা বোঝাই।

লোকটা পকেট থেকে কাগজ বের করে রেঞ্জারের হাতে দিয়ে বলল, আজ্ঞে চার লরি স্যার।

চার লরি!

খিঁচিয়ে উঠলেন রেঞ্জার।

লোকটা থতমত খেয়ে বলল, দুটো পার হয়ে গেছে স্যার, আর আপনার পেছনে দুটো।

আবার ঝুট বলছো। আমার আসার আগে কখনা গেছে মালুম নেই। আমি দূর থেকে সাতখানা গুনে দেখেছি।

দেখলাম লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত। সে সঙ্গে সঙ্গে হেসে রেঞ্জারকে বলল, ন'খানা স্যার, ধর্মসাক্ষী করে বলছি।

আমি জানি এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবুও রেঞ্জার কি ভেবে গাড়ি দুটো ছেড়ে দিলেন।

লোকটা তার গাড়িতে উঠে আবার নেমে এল। আমাদের কাছে এসে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে মিঃ ভট্চাযের হাতে এক তাড়া নোট গুঁজে দিলে।

আমাদের জিপ আবার ফিবে এল সেই টিম্বার মার্চেন্টের বাংলোতে।

পথে শুধু একটি কথা শুনলাম রেঞ্জারের মুখে, অনেস্টি কোথাও নেই মিঃ চৌধুরী। আমার লোকেরাও আমাকে ঠকাচ্ছে। আমি অফিসে গেলেই ওরা বলবে, স্যার আজ এই চারখানা লরির টাকা পেয়েছি। আমাকে ঐ চারখানার ওপরেই ভাগ করে দিতে হবে সবাইকে। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিয়ে মারল ওরা আরও পাঁচ-সাতখানা লরির টাকা।

একটু থেমে বললেন, আজকাল নিজেব লোকের ওপরেও ভরসা রাখা দায় মিঃ চৌধুরী। শালারা ভাগের ওপরেও ভাগ বসায়।

আমরা পোসাং-এর বাংলোতে সে রাতে থেকে গেলাম।

সারা রাত প্রায় কইনা নদীর ঢেউ বইল বাংলোর সামনের লনে। জনা চারেক মানুষ প্রায় ডজনখানেক দামী বোতল ওড়াল।

আমাকে রেঞ্জার খুব টানাটানি করেছিলেন, আমি অক্ষমতা জানিয়ে ওদের পাশে বসে একটি কোল্ড ড্রিঙ্ক খেয়েছিলাম।

রেঞ্জার সাহেব হলাহল মুখে ঢেলে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন, মেয়েমানুষেও এমন অনাসক্তি নাকি মশাই? না ঐ কোল্ড ড্রিঙ্কের মত কোল্ড মেয়েতেই আপনার আসক্তি?

আমি হেসে বললাম, মেয়েদের সম্বন্ধে আমি উদাস না হলেও আসক্তি আমার ছবিতেই বেশি। বলতে পারেন মেয়েরা আমার কাছে প্রেরণা।

কয়েক পেগ গলায় ঢেলে দিয়ে রেঞ্জার আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে এক সময় বললেন, থাকেন কি করে মশাই। ঐসব নিরামিষ প্রেরণা ফ্রেরণার কথা শুনলে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মনে হয় কেউ যেন হাত পা বেঁধে বরফের চাঁই-এর ওপর ফেলে দিয়েছে।

আমি আর কোন কথা না বলে হাসতে লাগলাম।

এরপর সারান্দা বনের ইতিহাসের পাতা মাতাল চৈতী হাওয়ায় দ্রুত উড়ে চলল।

শিমুল তার শাখায় শুধু লাল ফুলের জমাট রক্তবেদনার ছবি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পলাশ সারি সারি প্রদীপ জ্বালাল তার ডালে ডালে। কৃষ্ণচূড়ার সবুজ পাতা দক্ষিণ থেকে বয়ে আসা হাওয়ায় চামরের মত দুলতে লাগল। ডালে ডালে, লালে হলুদে, ফোটা আর অফোটা কুঁড়িতে শ্রীকৃষ্ণের মাথার শত শত মুকুট তৈরী হতে লাগল। আরাবা গাছে উঁকি দিচ্ছে লাল লাল ফল। হালকা বেগুনী আভার জীরহুল ফুল ঝোপের ভেতর ফুটি ফুটি করছে। শালগাছে এসেছে মাখন রঙের ফুল।

ময়ূর দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বনের পথে যেতে যেতে হঠাৎ শোনা যাচ্ছে বনমোরগের ডাক। তিতিরগুলো ঝাঁক বেঁধে সোজা নীচু হয়ে তির্ তির্ করে উড়ে চলেছে। আকাশে চাঁদ, মহুয়ায় মদ, আর সারান্দার তামাম মেয়ে পুরুষের গলায় বাহা পরবের গান। কাজ করতে করতে গান বেজে উঠছে, হঠাৎ হঠাৎ উছলে ওঠা ভেঙে পড়া ঢেউয়ের মত।

শুধু বসন্ত আসেনি ফরেস্ট বাংলোয়। একটা জমাট বাঁধা শোক-সন্ধ্যার মত মন্থর নিঃশ্বাসে কেটে যাচ্ছে এখানকার দিন।

আমি কলকাতায় ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, পাশে এসে দাঁড়াল সেঁজুতি।

বলল, তোমার চলে যাওয়াটাই হবে আমার সবচেয়ে বড় অপমান।

বললাম, এ কথা কেন সেঁজুতি ?

ও কান্নার সঙ্গে উত্তেজনার সুর মিশিয়ে বলল, রেঞ্জার তোমাকে এখানে আমন্ত্রণ করে আনেনি, সুতরাং তার কথায় তুমি চলে যেতে পার না।

হেসে বললাম, এ বাংলো সরকার বাহাদুর রেঞ্জারের নামেই অ্যালট করেছে, সুতরাং এখানে তোমার অধিকার থাকলেও আমার নেই।

ও বলল, তুমি অমন করে হেসে ব্যাপারটাকে লঘু করে দিও না অনির্বাণদা।

বললাম, ঠিক কথাই তো রেঞ্জার বলেছেন, এ বনে মেয়েদের ছবি আঁকা বারণ। তাদের সম্ভ্রমহানি হয়। নিশ্চয়ই আমার আঁকা লিজার ছবি ওঁর চোখে পড়ে থাকবে, তাই আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছেন।

ও ধমকে উঠল, থামো তুমি, আর সাফাই গাইতে হবে না রেঞ্জারের। ও নিজে যখন রাতের অন্ধকারে শেয়ালের মত হাঁসগুলো ধরবার জন্য ঝোপড়িতে ঝোপড়িতে ঘুরে বেড়ায় তখন মেয়েদের ইজ্জত খুব বজায় থাকে, তাই না?

বললাম, এটা রেঞ্জারের রাজ্য। নিজের রাজ্যে নৃপতির যা খুশি করার অধিকার আছে। তাবলে আমার মত একটা উটকো লোকের রাজ-আচরণ শোভা পায় না।

ও বলল, রাখো, তোমার রসিকতা, রেঞ্জার এখন ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে গেছে। সুজন ওর হাত থেকে যেই ছিনিয়ে নিয়েছে কন্ট্রাক্ট অমনি ঘা খাওয়া সাপের মত ও ক্রমাগত ফুঁসছে আর বৃথা আক্রোশে চারদিকের মাটিতে ছোবল মারছে।

ও একটু থেমে বলল, তোমাকে বারণ করেছে সুজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে, তুমি আর বাংলোর বাইরে যেও না, ব্যস্। বাহা পরব চুকে যাক, আমি নিজে তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব। সে যাওয়া হবে তোমার আমার দুজনেরই সম্মানের। এখন চলে গেলে আমি রেঞ্জারের কাছে হেরে যাব অনির্বাণদা, তুমি আমার মুখ রাখতে এইটুকু দয়া কর। ক'টা দিন থেকে যাও।

ওকে কথা দিলাম আমি থাকব।

বাংলোয় বসে থাকি। বাইরে যাই না আজকাল। খরা প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। দিনের বেলা দূরের পাহাড়ের দিকে তাকানো যায় না। ন্যাড়া পাহাড়ের খাঁজগুলো থেকে যেন আগুনে হাওয়ার হলকা বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

শুকনো পাতা রাশি রাশি ঝরে পড়ে অছে গাছের তলায়। হাওয়ার ঘূর্ণি পাহাড় থেকে বনে ঢুকে পড়েই ওড়াতে থাকে পাতা-পত্তর। অনেক সময় মনে হয় যেন একটা পাগলী মেয়ে বনের ভেতর বোঁ বোঁ আওয়াজ তুলে শুকনো পাতার ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় পরে ছুটে বেড়াচ্ছে।

রাতটা কষ্ট দেয়। হাওয়ায় দারুণ একটা মন কেমনের ভাব থাকে। চাঁদটা দিনের পর দিন আশ্চর্য রকমের মাদক হয়ে উঠছে।

রেঞ্জার প্রায় রাতেই থাকেন না আজকাল বাংলোতে। এখন তাঁর গতিবিধি ক্রিয়াকলাপের ভেতর কেমন যেন অস্বাভাবিকতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

সেঁজুতি এসে বলল, এবার বাহা পরব খুব জমজমাট হয়ে উঠল।

বললাম, ভালই তো।

ও রাগ করে বলল, তুমি কিছু না বুঝেই অমনি ভাল বলে দিলে।

আমি নিজের বুদ্ধিহীন মন্তব্যের জন্যে লজ্জিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ও বলল, এই সারান্দা বনের হো-রা দু'দলে ভাগ হয়ে গেছে। লিজার বাবা এক দলের লিডার, তাকে মদৎ যোগাচ্ছে রেঞ্জার। তাই ঘটা করে উৎসব আর খানাপিনার আয়োজন।

বললাম, অন্য দলের লিডারটি কে ?

ও বলল, তোমার সুজন বন্ধু, আবার কে ? সে তার দলের কুলি-কামিনদের প্রচুর সাজপোশাক আর টাকা পয়সা দিয়েছে।

বললাম, সেঁজুতি, বেশ বোঝা যাচ্ছে নতুন কন্ট্রাক্ট ছিনিয়ে নিয়েছে সুজন, কিন্তু কেমন করে রেঞ্জারের হাত এড়িয়ে এটা সম্ভব হল বল তো? এবার যে জোর লড়াই লাগবে। বনের অধিকার নিয়ে আপাততঃ লড়াই জিতল সুজন সিং, কিন্তু লিজার দখল নিয়ে এবার লড়াই দারুণ জমবে বলে মনে হচ্ছে। কারণ ইতিমধ্যেই রেঞ্জার লিজার বাড়িতে বাহা পরবের আলোচনা বৈঠক বসিয়ে দিয়েছেন।

সেঁজুতি বলল, আমার এসব ভাবনা নেই অনির্বাণদা। শুধু তুমি চলে যাবে এ খবরটা দুপুরের হু হু করে বয়ে আসা গরম ঘূর্ণির মত আমার বুকের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমাকে যদি দেখাতে পারতাম তাহলে দেখতে ঐ হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে জ্বলে জ্বলে পুড়ছে আমার মন। সেই আমাদের বাউল বলেছে না, 'বন পোড়ে তা সবাই দেখে, আমার মন পোড়ে হায় কেউ দেখে না'।

বললাম, দুঃখ কোর না সেঁজুতি, আমার এ জীবনে যদি কোন নারী এসে থাকে, তাহলে সে তুমি। ঘর না বাঁধার দুঃখটা তোলা থাক আমাদের দুজনের জন্যে। সেই দুঃখটুকুই হবে আমাদের নিঃসঙ্গ দিনের ভাবনার সবচেয়ে বড় সম্বল।

দু'চার দিন পরের খবর। বসেছিলাম, দুপুরের খাবার পরে ড্রইংরুমে। অনেকদিনের আঁকা অনেকগুলো ছবি সেঁজুতি মেঝের কার্পেটে মেলে দিয়ে দেখছিল। আমি কোন ছবি সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করলে ও প্রতিবাদ করে উঠছিল, হোক খারাপ, এ সব ছবি আমার।

আমি ওর প্রতিবাদের ভঙ্গি দেখে মনে মনে হাসছিলাম।

হঠাৎ বাইরে নজর পড়তেই একটি মেয়েকে সরে যেতে দেখলাম। আর তাকে জানালা দিয়ে দেখা গেল না।

সেঁজুতিকে বলতেই ও বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে একটি বছর দশ-বারো বয়েসের হো-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল ও।

বলল, চিঠি পাঠিয়েছে সুজন।

বললাম, এইটি তার দূত বুঝি ?

সেঁজুতি বলল, হ্যাঁ সেই মা-মরা মেয়েটি, যে এখন সুজন সিংয়ের তাঁবুতে থাকে।

বললাম, চিঠি তোমার না আমার?

ও বলল, দুজনের।

চিঠিখানা পড়তে বলতেই সোঁজুতি জোরে জোরে পড়তে লাগল।

বহুরানী, সারান্দা বনের এডমিনিস্ট্রেটার বাহাদুরের হুকুম নেই বাংলোতে যাবার, তাই এ বান্দা এতনা রোজ গরহাজির। আগামী পূর্ণিমার চাঁদনি রাতে তোমাদের দুজনার আসা চাই আমার ডেরায়। এখানে বাহা পরবের গান আউর নাচা হবে। রেঞ্জার সাহাব কোঠীতে থাকলে তোমাদের আসা চলবে না জানি। কিন্তু যতদূর খবর আছে বাহা পরবের দু'রোজ আগাড়ী রেঞ্জার সাহাব রাঁচীতে বড়াসাহেবের কাছে চলিয়ে যাবে। তোমাদের আসা চাই।

হাঁ, আউর এক বাৎ। এই লেড়কির সাথে চৌধুরীসাবকে একবার বাহার আনে বল। আমি মোলাকাৎ করব! কুছ বাৎ আছে। রেঞ্জার সাহাব এখন ছোটনাগরায় আছে। কুছ্ ডর নেই। —সুজন সিং।

সোঁজুতি বলল, একটু বস আমি আসছি।

ও বেরিয়ে গেল ড্রইংরুম থেকে। আমি মেয়েটিকে কাছে পেয়ে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে দু'একটা কথা বলার চেষ্টা করলাম। মেয়েটি আমার কথা শুনে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আবার হিন্দীতে চেষ্টা চালাতে যাচ্ছি দেখে মেয়েটি কি ভাবল কি জানি, জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বাইরে বনের দিকে ইঙ্গিত করল।

ইতিমধ্যে সোঁজুতি একটা ডায়েরী হাতে নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ঘরে ঢুকল।

মুখ না তুলেই বলল, আশ্চর্য, ঠিক খবরটা কোত্থেকে পেল সুজন! ডায়েরীতে রেঞ্জারের রাঁচী যাবার স্থির আছে বাহা পরবের দুদিন আগেই। ফেরার সম্ভাব্য তারিখ পরব মিটে যাবার তিন-চারদিন পর।

ও ডায়েরীটা হাতে নিয়ে ভাবতে লাগল।

বললাম, এতে এত চিন্তার কি আছে সোঁজুতি ? অফিসের কাজে কাকে কখন কোথায় থাকতে হয় তার কি কোন ঠিক আছে?

ও বলল, সে কথা সকলেই জানে। কিন্তু নিজে যে বাহা উৎসব করে বাহাদুরী নেবার প্ল্যান করেছে, সে হঠাৎ সরে যাচ্ছে উৎসবের মঞ্চ থেকে, এইটিই ভাবনার কথা।

বললাম, যাক্ গে, যার ভাবনা তাকে ভাবতে দাও। এখন বল তো দেখি, সুজনের ডাকে আমি বাইরে যাব কিনা?

সোঁজুতি অমনি বলে উঠল, এ তোমার ভাবনা, তুমিই ভেবে নাও।

বললাম, নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়ে হার মানছি সোঁজুতি। এখন দয়া করে যাব কিনা বলে দাও।

ও বলল, নিশ্চয়ই যাবে, এতে ভাবনার আর কি আছে। মানুষটা এতদিন অমাদের দেখতে না পেয়ে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে।

আমি ঐ ছোট মেয়েটির সঙ্গে বাংলো থেকে বেরিয়ে এলাম। খানিক পথ এসে একটা পাহাড়ী বাঁক ঘুরতেই দেখলাম সুজন সিংয়ের জিপখানা দাঁড়িয়ে আছে। কাছে এগিয়ে দেখলাম, দুপুরের দারুণ আগুনের ঝলকে সুজন স্টিয়ারিংয়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওর পাশে গিয়ে ডাকলাম, সুজন ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?

ও আস্তে আস্তে স্টিয়ারিংয়ের ওপর থেকে মাথা তুলে তাকাল। চোখ দুটো ওর গরমে আর ঘুমের দরুণ লাল হয়ে উঠেছে।

এক মুহূর্ত পরেই ও স্বাভাবিক হয়ে গেল। লাফ দিয়ে নেমে এল গাড়ি থেকে। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, দোস্ত্ তুমি তাহলে এলে!

বললাম, তুমি ডাকলে আমি আসব না, এ কি করে হতে পারে সিং?

সুজন বলল, এখানে বহুৎ ধূপ, ওঠ জিপে, চল আমার ক্যাম্পে।

বললাম, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে, যাব সেখানে।

ও জিপ চালিয়ে দিল পাহাড়ী পথে।

এ পথে আমি সুজনের গাড়িতে কতবার যাতায়াত করেছি, সুন্দর কোন স্পট্‌ পেলেই ওকে বলেছি গাড়ি থামাতে। কোন সন্ধ্যায় ফেরার পথে দূরের দুটি পাহাড়ের ফাঁকে চাঁদ উঠেছে। আমি কতক্ষণ জিপে বসে সেই চাঁদকে দেখেছি। এ-পারের গাছের মাথায় আলো এসে পড়েছে। আমি না বলা পর্যন্ত সুজন চুপচাপ স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে। সুজন কবি নয়, শিল্পী নয়, সুজন এই আদিম অরণ্য প্রকৃতির একটি অংশ। ও আশ্চর্য সহজাত ক্ষমতার বলে একেবারে প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে মিশে গেছে। যেখানে আমরা পৃথক হয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছি, সেখানে ও প্রকৃতির আলো-অন্ধকার, ঋতুপর্বের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গিয়ে তাকে অনুভব করছে।

সুজনের ক্যাম্পে এসে গাড়ি থামল। এ ছাউনি নতুন ফেলা হচ্ছে। বনের নতুন জায়গায় শুরু হয়েছে কাজ। অনেকগুলো ট্রাক বোঝাই হয়েছে কাঠে। মেয়েরা ডাল-পালা পাতাপত্তর একদিকে সাজিয়ে রাখছে। পুরুষ কুলিরা টাঙ্গী চালাচ্ছে গাছে। ঠক্‌ ঠক্‌ আওয়াজ উঠছে চারদিকে। কড়্‌ কড়্‌ মড়্‌ মড়্‌ শব্দে ভেঙে পড়ছে গাছ। অমনি হুঁশিয়ারীর আওয়াজ তুলছে কুলিরা।

দূরে পথের ধারে গাছের ছায়ায় বসে আছে দুটি খাঁকি পোশাক পরা লোক। মনে হল তারা ঝিমুচ্ছে।

সুজনকে ওদের দেখিয়ে বললাম, ওরা কারা সুজন?

সুজন বলল, রেঞ্জার সাহেবের আদমী আছে। ফরেস্ট গার্ড। আগে থাকত নাই। হালফিল বহুৎ চেকিং হচ্ছে।

বললাম, কিসের ওপর নজর রাখছে ওরা?

সুজন বলল, ছোটা ছোটা পেড় কাটতে মানা। সরকারী কন্ট্রাক্ট মাফিক কাম হতে আছে কি নেহি, এ সব তদারকী লিয়ে দু'আদমী হাজির আছে।

হেসে বললাম, ভাল ব্যবস্থা করেছেন রেঞ্জার সাহেব। তোমার ফাঁকি আর চলবে না সিং।

ও বলল, ঘুষ ভি নেহি। এ কাম আচ্ছা। দেনা-লেনা কো কই বাৎ নেহি।

আমরা ক্যাম্পের ভেতর বসলাম। অনেকগুলো বড় বড় গাছের জটলায় সুজন সিংয়ের তাঁবু। ঘন ছায়ার জন্যে গরম কম।

সুজন বলল, লস্যি পিও। তোমার লেগে লস্যি বানালাম চৌধুরী।

মেয়েটি সুজন সিংয়ের ইঙ্গিতে দু'গ্লাস লস্যি দুজনের হাতে দিয়ে গেল।

লস্যিতে চুমুক দিয়ে কথা হচ্ছিল আমাদের।

সুজন বলল, বহুৎ রোজ দেখি নাই, দিলটা ফাঁকা ফাঁকা লাগল চৌধুরী।

বললাম, আমি, তোমার বহুরানী রোজ তোমার কথা বলি।

ও গ্লাস সমেত হাতখানা মাথায় ঠেকিয়ে বলল, তোমাদের ভুলতে পারব নাই চৌধুরী। আমার রক্তের সাথে তোমরা এক হইয়ে আছ।

বললাম, একটা কথা বলবে সিং, কেমন করে রেঞ্জারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি কন্ট্রাক্টটা ছিনিয়ে নিলে?

ও বলল, হাজার বার বলব। তোমাকে বলব না তো কাকে বলব দোস্ত। তবে শোন বাৎ। তোমার কাছে কথাটা শুনে আমি ছুটলাম রাঁচী। ওখানে দেখা করলাম কনজারভেটর সাহেবের সাথে। বললাম সব কুছ বাৎ, একদম দিল সাফ্‌ করে। সাহেবকে কানুন-মাফিক ঘুষ সাধলাম।

কনজারভেটর সাহেব গুস্‌সা করলেন নাই। তিনি খালি বললেন, আমি জানি সরকারী কামে বহুৎ আদমী ঘুষ খায়। কিন্তু আমার মাতাজীকি বাৎ থী, ঘুষ খানা তো মাকো খুন পিনা। ব্যস্‌, জীবনভোর ঘুষ নেহী লিয়া। তুম যদি ঘুষ কা বাৎ একদম ছোড়্‌ দো তব্‌ জরুর কাম মিলে গা।

ব্যস্‌ কসম লিয়ে নিলাম। কোভি ঘুষের কারবার সুজন সিং করবে নাই।

বললাম, জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ লাগালে সিং।

ও বলল, চোরাই কাম করবে নাই, ঘুষ দিবে নাই, ব্যস্, সুজন সিং কোই শালাকো পরোয়া ভি করবে নাই।

বললাম, লিজার খবর কি ?

ও বলল, বহুৎ গড়বড় হইয়ে গেছে চৌধুরী, ওর বাপ হারামী, লেড়কী কো বহুৎ দুখ দিতে আছে। ঘর সে বাহার যানে মানা। খালি দিন রাত ভোর বাৎ চালাও রেঞ্জার কো সাথ।

বললাম, এত কথা জানলে কি করে?

বলল সুজন, ফ্রাইডে চার্চে ওর সাথে লুকায়ে দেখা করি। ও বহুৎ কষ্টে আছে চৌধুরী। আমি কাম না করলে লিজাকে লিয়ে ভাগতাম বহুৎ আগাড়ী। ও রুদছে আর আমার ছাতি টুটাফুটা হইয়ে গেল।

এই আমি প্রথম সুজন সিংয়ের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম।

সেদিন সুজন সিংয়ের সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ কথা হল। লিজার প্রসঙ্গই ছিল বেশি সময় জুড়ে। ওর পরিকল্পনা শুনলাম, এই কাজের পর এ বনে ও আর কাজ করবে না। লিজাকে চার্চে বিয়ে করে ও সঙ্গে নিয়ে বন ছেড়ে চলে যাবে।

বললাম, তোমার জেদও বজায় রইল, এদিকে লিজাও রইল এই শয়তানের ঘাঁটির বাইরে। বেশ সুষ্ঠু পরিকল্পনা তোমার সিং।

সুজন বলল, তোমার আর বহুরানীর শুভ কামনা চাই চৌধুরী।

তুমি আর লিজা থাকবে আমার এই বুকের মধ্যে সিং। সারাক্ষণ জানাব আমাদের ভালবাসা আর শুভ কামনা।

বেলা শেষের আগে সুজন আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল বাংলোর সামনে।

ফিরে যাবার সময় বলল, আমি জানতে পেরেছি চৌধুরী, রেঞ্জার বাহা পরবে থাকবে নাই। ওদের ক্লার্ক আমাকে গোপন খবর জানায়েছে। তুমি বহুরানীকে বলবে আমার সব বাত। আমি আপনি গিয়ে লিয়ে আসব তোমাদের আমার এ গরীবখানায়।

বললাম, ঠিকই আসব সিং, তোমার ডাকে না এসে পারব না।

আজকাল প্রায়ই রেঞ্জার লাঞ্চ অথবা ডিনারে হাজির থাকেন। রান্না খারাপ হোক আর না হোক কুকের ওপর এক পশলা শিলাবৃষ্টি বর্ষিত হয়। সে সময় চুপ করে থাকে সেঁজুতি।

কোন কোন দিন রান্নার কদর্যতা সম্বন্ধে আমার মতামত আহ্বান করলেই বিপদে পড়ে যাই। নিশ্চয়ই আরও ভাল হতে পারত, এমনি ধরনের একটা উত্তর দিয়ে আত্মরক্ষা করি।

যে রাতে রেঞ্জার বাংলোতে থাকেন, সে রাত আমাদের কাছে হয়ে ওঠে নিদ্রাহারা। প্রথমে কুক আর বেয়ারার ভাগ্যে জোটে অশ্রাব্য গালি। পরে শয্যাগৃহে চলে স্ত্রীর ওপর কটুবাক্যে বিক্রম প্রকাশ। এ যুগে সতীত্ব নামক বস্তুটি যে একেবারে বদ্ধ জলাশয়ের মত অপেয়, ব্যবহারের অযোগ্য, এ তথ্য অত্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রচার করতে থাকেন।

কবে কোন দিন ওপরওয়ালাকে সামান্য একটু সঙ্গ দিলেই কার্যোদ্ধার হয়ে যেত অথচ সেদিন রূঢ় ব্যবহার করে আখের মাটি করেছে সেঁজুতি তার হিসেব স্থান কাল পাত্র উল্লেখ করে বলে যান রেঞ্জার।

এরপর শুরু হয় দীর্ঘ কারণবারি পান। সে সময় দামী বিলিতি অনেকগুলি পানপাত্র ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়। এ সময় যার উদ্দেশে গালি বর্ষিত হয় সে হয়তো অরণ্য বৃক্ষের তলায় পাথরের ওপর বসে কল্পনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তার প্রেমিকার সঙ্গে।

কখনও বা রেঞ্জার চীৎকার করে ওঠেন—

লিজা লিজা সুইট ডারলিং
কাম অ্যান্ড এমব্রেস দ্য ফরেস্ট-কিং

সেঁজুতির গলা শোনা যায়, শান্ত অথচ দৃঢ়, দয়া করে দু'একটা রাত এখানে না এলেও তো পার।

যারা বনের রাজার গান শুনতে চায় তারা প্রাণভরে শোনার সুযোগ পাবে।

· ইউ শাট্ আপ্।

পায়ের দাপাদাপি, দু'একটা কাচের বস্তু ভাঙার শব্দ ওঠে।

শেষে সেঁজুতির সাহায্যে শয্যায় এলিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা। আর সে নিদ্রা ভাঙাতে সূর্যদেবতাকে অনেক কড়া হতে হয়।

রেঞ্জার বেরিয়ে গেলে সেঁজুতি এসে বসে আমার পাশটিতে। কোন কোনদিন দাঁড়িয়ে থাকে আমার পেছনে চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়ে।

চুপচাপ বসে বা দাঁড়িয়ে থাকে কতক্ষণ। নিজের মনে মনে সে সময়টুকুতে কতকিছু ভাবতে থাকে।

কোন এক সময় কথা বলে ওঠে, অনির্বাণদা তোমাকে এখানে আসতে না লিখলেই বুঝি ভাল হত।

ও বলে, এটা আনন্দের রাজ্য যে নয় তা তুমি হয়তো এতদিনে ভাল করেই বুঝেছ।

বলি, তোমার সঙ্গে কিছু কিছু দুঃখ অনুভব করলাম, এর চেয়ে সুখ আমার নেই সেঁজুতি।

ও আর বেশি কথা বলে না। কখনো বা শুধু চেয়ে থাকে আমার মুখের দিকে। চোখ দুটো ভিজে উঠলেই উঠে যায় ঘরের ভেতর।

আমি বসে বসে ভাবি, কোন সমাধান কি নেই সেঁজুতির জীবনে? ও কি এমন করে ব্যবহার না করা রঙের মত পড়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে একদিন জমে কঠিন হয়ে যাবে। যাকে নিয়ে আর কোনদিন কোন রঙীন ছবি আঁকা যাবে না!

এক এক সময় মনে হয়, আমি কি ওকে এই বিরাট আকাশের তলায় বিশ্বভুবনের মাঝখানে কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারি না। আবার মনে হয়, লুকিয়ে কেন রাখব, যাকে ভালবাসি তাকে সবার চোখের সামনে তুলে ধরতে লজ্জা বা ভয় কিসের?

মনে মনেই ভাবি। মনের এ খবর ওকে দিতে পারি না।

ও হয়তো আমার মতই কল্পনা করে, কিন্তু মুখে ওর বেজে ওঠে না মনের ভাষা।

কোন কোনদিন বরং বলে, তুমি জাত-শিল্পী অনির্বাণদা, বিয়ে করা তোমার চলবে না।

হেসে বলি কেন? নিজেও তো শিল্পী, তবু বিয়ে করতে তো আটকায়নি।

ও বলে, বিয়ে করে ছবি ছেড়েছি, বিয়ে করলে তোমারও সে দশা ঘটতে পারে।

বলি, আগে তো বিয়ে করি তারপর ছবি ছাড়ার কথা ভেবে দেখব।

ও বলে, তুমি যদি সত্যি বিয়ে করতে চাও অনির্বাণদা তাহলে আমি তোমার মেয়ে নির্বাচন করে দেব।

অমনি বলে উঠি, তুমি করবে আমার মেয়ে নির্বাচন, তাহলে আর বিয়ে হয়েছে আমার।

ও বলে, কথা দাও, তুমি বিয়ে করবে অনির্বাণদা, তাহলে ঠিক খুঁজে দেব তোমার মেয়ে।

বলি, কথা ঠিকই দেব, তবে একটি শর্তে।

ও তাকিয়ে থাকে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দুটি চোখ মেলে।

বলি, মেয়েটির চোখ-মুখ দেহের গঠন সারান্দার রেঞ্জার সাহেবের বউয়ের মত অবিকল হওয়া চাই! আর তার থাকা চাই ছবি আঁকার প্রতিভা, ঠিক প্রিন্সিপাল চক্রবর্তীর মেয়ের মত।

ও বলে, পাগল, তুমি একটা পাগল। শুধু নিজে পাগল নয়, অন্যকেও পাগল করে দেবার জাদু আছে তোমার।

আবার কোনদিন ওঠে লিজা আর সুজনের কথা। এখন সেঁজুতি বিশ্বাস করে লিজা একমাত্র সুজনকেই ভালবাসে। রেঞ্জার যত চেষ্টাই করুক লিজা তার কাছে দিগন্তছোঁয়া আকাশ হয়ে থাকবে। সারা জীবন তাকে ধরার চেষ্টা করলেও সে থাকবে সমান দূরত্বে।

কিন্তু আমি ভাবি, এ কথা সেঁজুতি জানতে পারলেও তার লাভ কোথায়। রেঞ্জার লিজাকে না পেলে স্ত্রী হিসাবে সেঁজুতির মনের ভারটা লঘু হয়ে যাবার কথা, কিন্তু যে পুরুষ সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই, তার ভাল-মন্দের খবরে সেঁজুতির কি যায়-আসে।

বলি, সেঁজুতি, ঐ দুর্ধর্ষ শালগাছের কাণ্ডের মত সুজন সিং লিজাকে ভালবেসে একেবারে কবি হয়ে গেছে।

সেঁজুতি হেসে বলে, সুজনের কবিতা নিশ্চয়ই অসাধারণ।

বলি, অসাধারণ বইকি, শুনবে ওর কাব্য?

সেঁজুতি থুতনীর ওপর হাতের তেলো চেপে ধরে মিষ্টি হেসে আমার মুখের দিকে তাকায়।

বলি, একদিন ঘুরছিলুম সুজনের সঙ্গে বনের পথে। হঠাৎ চাঁদ উঠল পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটা শালগাছের মাথায়।

সুজন তার গাড়ি থামিয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে। বলল, ঐ পাহাড়ের তলায় গাঁ-টা হল লিজাদের। জানো চৌধুরী, ঐ মহল্লার হো-দের বিশোয়াস, ঐ পাহাড়টার ওপর যে পেঁড় আছে, ওখানে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখলে আর কোই আদমি ফিরবে নাই। ইসি লিয়ে ঐ পাহাড় 'পর কভ্‌ভি আদমী নেহি চড়্‌তা।

বললাম, এটা পাহাড়ীদের একটা বিশ্বাস।

ও বলল, আমি ও বিশোয়াস ভাঙবে। আমি সাদি হইয়ে গেলে লিজাকে ঐ পাহাড় পর লিয়ে যাবে। পেঁড়কো নীচে বসবে। আর চাঁদ দেখবে। চাঁদকা রোশনীমে নাহানা শুরু করবে। আর ঐ আশমান 'পর চাঁদিয়া, মেরা বুক 'পর লিজা।

সেঁজুতি বলে, ও লিজার ভালবাসায় পাগল হয়ে গেছে।

মেতে উঠল বন-বনান্ত। বসন্ত-উৎসব বাহা পরব। আমি আর সেঁজুতি কাছে-পিঠে বেড়াতে গেলেই শুনতে পাই গানের কলি বাতাসে ভাসছে। কাজের শেষে যে-সব মেয়ে পুরুষ ঘরে ফিরছে তাদের মুখের হাসি যেন আর থামতেই চায় না। গড়িয়ে পড়ছে এ ওর গায়ে।

বন, শিমুল পলাশ কৃষ্ণচূড়ার মাথায় মাথায় রঙের আগুন জ্বেলেছে। সারা সারান্দা বনে গাছে গাছে, মনে মনে চৈতি আগুন লেগেছে।

ফিরে আসতে আসতে সেঁজুতি দাঁড়ায় বাংলোর কোণে কারো নদীর তীরে, পলাশ গাছটার তলায়।

বলে, ঠিক যেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'রুথ' কবিতার ছবি :

> Flowers that with one scarlet gleam
> Cover a hundred leagues, and seem
> To set the hills on fire.

আর আঙুলে গোনা চারটে দিন বাকী উৎসবের। চৈত্র দিনে মাতাল কালবোশেখীর একটা হাওয়া প্রায় রোজ ছুটে আসছে সারান্দা বনে। আজকাল শেষ রাতের দিকে, যখন পাহাড় থেকে সারাদিনের অসহ্য গরম হাওয়াগুলো ঝলকে ঝলকে বেরুতে থাকে তখন শুরু হয়ে যায় ঝড়। মুহূর্তে একটা দিগন্তজোড়া আওয়াজ ওঠে। বনের গাছ-গাছালির মাথার জটা ধরে বেশ কিছুক্ষণ কে যেন নেড়ে দিয়ে যায়। কিন্তু ভোরের মুহূর্তটিতে সব থেমে আসে। বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি, শুকনো পাতা, ভাঙা ডালপালার ওপর ছড়িয়ে পড়ে আছে অগুনতি শিমুল ফুলের শব।

এক রাত শেষে ঝড়ের এলোমেলো দাপটে ঘুম ভেঙে গেল আমার। হঠাৎ পাশের ঘরে একটা ক্রুদ্ধ গলার আওয়াজ পেলাম। রেঞ্জারের গলা।

না, ঐ শয়তানের বাচ্চার ওখানে বাহা পরব দেখতে তুমি যাবে না।

সেঁজুতির গলা বেজে উঠল, তোমার অনেক কথা আমি শুনেছি, কিন্তু আর নয়। আদেশ যে করে তার অধিকার থাকা চাই।

কি বললে, আমার বারণ করার অধিকার নেই?

সেঁজুতি অমনি বলে উঠল, তোমার বারণ তখনই আমি শুনব যখন দেখব আমার বারণও তুমি শুনছ।

খিঁচিয়ে উঠলেন রেঞ্জার, তোমার বারণ! কি বারণ শুনি?

সেঁজুতি বলল, কেন যাও সাসাংদায়? কেন লিজার পায়ে জোঁকের মত লেগে আছ? বন্ধ করতে পার না ওখানে যাওয়া?

রেঞ্জারের ক্রোধ চরমে উঠেছে বলে মনে হল, কৈফিয়ৎ দিতে হবে তোমাকে, এতখানি বেড়ে উঠেছ তুমি! পাখা গজিয়েছে তোমার! এ পাখা দুটো পুড়ে ঝলসে যাবে একদিন।

রেঞ্জার উঠে চলে গেলে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। ইউক্যালিপটাস্ গাছগুলোর তলায় অশান্তভাবে ঘুরতে লাগলাম।

বেশ কিছু সময় পরে এসে দাঁড়াল সেঁজুতি। তখনও ঝড় ঠিকমত থামেনি। ওর শ্যাম্পু করা চুলগুলো বড় বেশি রকম উড়ছিল। ওর মুখখানা থমথমে।

বললাম, কেন এমন করে নিজেকে ক্রোধের শিকার করে তুলছ লক্ষ্মী? নাই বা হল সুজন সিংয়ের ওখানে যাওয়া।

ও ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

এক সময় বলে উঠল, তুমিও একথা বললে আমাকে! আমি কি চোর যে চুরি করে যাব সুজন সিংয়ের ওখানে। যেখানে কোন অন্যায় নেই সেখানে যেতে আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। মানব না আমি কারও কথা। এতকাল খাঁচায় বন্দী হয়ে আছি আমি একটা বাতে-ধরা পাখির মত। কয়েকটা দানা ফেলে দিলেই তোমরা মনে কর চুকে গেল সব কর্তব্য। আমি আর থাকব না এই খাঁচাটায়, হয় মরব মাথা খুঁড়ে, নয় উড়ে চলে যাব যেখানে খুশি।

ও আমাকে কিছু বলতে দিল না। দুহাতে মুখ ঢেকে দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেল।

আমি অবাক হয়ে অসহায়ের মত শুধু চেয়ে রইলাম ওর চলে যাওয়া পথটার দিকে।

পরের তিনদিন রেঞ্জার আর আসেন নি বাংলোতে। দারোয়ানের কাছে শুনলাম, তিনি রাঁচী চলে গেছেন জরুরী কাজে।

কথায় কথায় আরও জানতে পারলাম বাহা পরবের দিন বেয়ারা, কুক, দরোয়ান, ফরেস্ট গার্ড সকলেই যাবে সাসাংদায়। সেখানেই হবে খানাপিনা। এ বাংলোতে ওরা সেদিন কেউ থাকবে না। রেঞ্জার সাহেব নাকি এ হুকুম জারি করে গেছেন।

উৎসবের দিন কিন্তু ঘটলো সম্পূর্ণ উল্টো। সবাই চলে গেল বাংলো ছেড়ে সাসাংদায়। সন্ধ্যার একটু আগে সুজন সিংয়ের গাড়ি এসে দাঁড়াল বাংলোর সামনে। কিন্তু সুজন আর আমার বহু অনুরোধেও বাংলো থেকে এক পা নড়ানো গেল না সেঁজুতিকে।

সে বলল, তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। শুধু আমাকে মাপ কর। অন্ততঃ আজ আমার যাওয়া কোন মতেই হয়ে উঠবে না।

শেষে আমাকে উৎসবে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করল কিছুক্ষণ সেঁজুতি।

আমি বললাম, সে কি করে হয়? অসম্ভব। তোমাকে একা ফেলে যাওয়া কোনমতেই আমার চলবে না।

ও বলল, আমি একা ঠিক থাকতে পারব। আর সারা জীবন তো এমনি করে একাই থাকতে হবে আমাকে অনির্বাণদা। কেউ আগলাবে না।

সুজন বলল, আমার কিছু গুস্‌স্বা নেই বহুরানী। তোমাদের পেলে দিল্‌টা খুশ হত। ঠিক আছে। জরুরৎ পড়লে ডাক দেবে এ বান্দাকে। হাজির থাকবে বহুরানীর হুকুম তামিল করতে।

জিপটা নিয়ে যেন আর্তনাদ করতে করতে ছুটে চলে গেল সুজন সিং।

কিন্তু সুজনকে ফিরে আসতে হয়েছিল শেষ-রাতে। বন জুড়ে তখন শুরু হয়েছিল সে এক ঝড়ের তাণ্ডব!

সুজন চলে গেলে দরজা ভেজিয়ে কতক্ষণ নিজের ঘরে বন্দী হয়ে রইল সেঁজুতি। আমি বাইরে বসে রাতের আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম। কয়েকদিন ধরে যে গানের কলিগুলো টুকরো টুকরো কানে এসে বাজছিল, সেগুলো যেন মিছিল করে আসতে লাগল।

'হেসামাতা মাতালেনা
বাড়িমাতা মাতালেনা
হেসামাতা চবজনা
বাড়িমাতা চবজনা
সমাগেজা তুইম বন্দলেকানা।'

চাঁদ উঠেছে আকাশে। গানের কথা বাজছে বাতাসে। পূর্ণিমার চাঁদ রাতটাকে দিন করে দিয়েছে।

কতক্ষণ বাইরে বসেছিলাম জানি না। হয়তো কিছুক্ষণ নয়তো অনেক প্রহর পার করে দিয়েছি। বাঁশি আর মাদলের আওয়াজ গানের সুরের সঙ্গে মিশে চাঁদনী রাতটাকে মহুয়া-মাতাল করে তুলেছিল।

একসময় ভেতরে আমার ঘরে ঢুকে দেখি রাতের খাবার কখন সেঁজুতি এসে নিঃশব্দে সাজিয়ে রেখে গেছে টেবিলের ওপর।

আমি ফিরে গিয়ে ওর ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। হাত দিলাম দরজায়। ভেতর থেকে বন্ধ। ফিরে এলাম আমার ঘরে। খাবার যেমন ঢাকা ছিল তেমনি রইল। আমি বিছানায় আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইরে পূর্ণিমার রাত জেগে রইল, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

অনির্বাণদা! অনির্বাণদা!

আমার ঘরের দরজা যেন আছড়ে দুপাশে ঠেলে দিয়ে ঢুকে পড়ল সেঁজুতি। আমি চমকে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতেই ও আমার বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কি একটা আতঙ্ক যেন ওকে গ্রাস করে ফেলেছিল। ও কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারল না।

কয়েকটা মুহূর্তমাত্র। তারপর আমাকে টানতে টানতে ও বাইরে নিয়ে এল।

ঝড় শুরু হয়ে গেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় নদী বন কাঁপিয়ে কারা যেন ছুটে চলেছে।

ঘুমের ঘোর তখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সারা শরীর। সেঁজুতির চীৎকারে সংবিত ফিরে পেলাম।

আগুন! আগুন!

তাকিয়ে দেখি ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে লাল বেনারসীর আঁচল উড়ছে আকাশে। আমাদের বাংলোর পেছনের পাহাড় আগুনের আভায় লাল হয়ে উঠেছে। কারো নদীর তীর ছুঁয়ে রাস্তাটা চলে গেছে চিরিবুরুর দিকে। তার ওপর দিয়ে কোটি কোটি খুরের শব্দ বেজে চলেছে। ধাক্কা খেয়ে কতকগুলো জানোয়ার ছিটকে পড়ে যাচ্ছে জলে। হাতি ডেকে উঠছে। একটা জানোয়ার ডাকলেই লক্ষ জানোয়ারের আর্ত চীৎকার বেজে উঠছে। কিন্তু পরমুহূর্তে স্থির হয়ে যাচ্ছে সকল শব্দ। শুধু বাজছে দ্রুত পলায়নপর পায়ের ধ্বনি।

ওদিকে চাঁদের আলো ঢেকে দিয়েছে হাজার হাজার পাখি। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ ভয়ে উড়ে চলেছে আকাশ আঁধার করে।

বাংলোতে আগুনের এসে পড়তে আর বেশি বাকি নেই। বিহ্বলতা আমাদের সমস্ত শক্তিকে গ্রাস করে নিল। আমরা অগ্নি মুখে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

সেঁজুতি এক মুহূর্তে আমার কাছে তার পরম নির্ভরতা খুঁজে পেল। সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আমাকে নিবিড়ভাবে তার দুটো হাতের বাঁধনে জড়িয়ে ফেলল। নিশ্চিত মৃত্যুর সেই মুহূর্তে সে কি তার সব ভয় দূরে সরিয়ে ফেলে আমাকে জন্মান্তরের সঙ্গী হিসেবে পেতে চাইল।

তার নিবিড় বাঁধন থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করে নিতে চাইলাম না। আমাদের পেছনের পাহাড়ে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে দাউ দাউ করে। যেন একটা আগুনের ঘোড়া লাফ দিতে দিতে ছুটে আসছে সামনের দিকে। তার গরম নিশ্বাসগুলো গায়ে এসে লাগছে।

সামনে অতি তীব্র একটা আলো জ্বলে উঠল।

বহুরানী, চৌধুরী!

জিপ থেকে লাফিয়ে পড়ল সুজন সিং।

ছুটে এসে আমাদের অসাড় দুটো দেহকে টেনে নিয়ে তুলল জিপে। তারপর একটা বুলেটের মত নিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আগুন আসছে আমাদের পেছন পেছন ধাওয়া করে। আগুন থেকে কখনও একটু দূরে সরে যাচ্ছি, আবার কখনও পাহাড়ী বাঁক ঘুরে একেবারে মুখোমুখি হচ্ছি আগুনের। গাছের ডাল-পাতাগুলো যেন এক গ্রাসে কড় মড় করে চিবিয়ে খেয়ে নিচ্ছে একটা অগ্নি-রাক্ষস।

সেই ভয়াবহ মৃত্যুর বেড়াজালের ভেতর হঠাৎ বেজে উঠল সুজন সিংয়ের গলা, বহুরানী, সারা বন জুড়ে আগ জ্বালায়েছে রেঞ্জার। সাসাংদা থেকে লিজা রাতভর পায়দলে আসছে আমার তাঁবুতে। সে-ই খবর লিয়ে আসছে, কুম্‌ডির বাংলো রেঞ্জার জ্বালায়ে দিবে বাহা পরবের দিন। আমার তাঁবুতে পড়িয়ে আছে, কোই চেতনা নেই। ছোটা লেড়কীটাকে ওর পাশে বসায়ে তোমাদের লেগে আইলাম বহুরানী।

আমাদের দুজনের কারো মুখে কোন কথা নেই। শুধু মন বলল, কি ভীষণ হিংস্র প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে রেঞ্জার!

আবার বেজে উঠল সুজন সিংয়ের গলা, বাহা পরবে খানাপিনা নাচ গানা শেষ করিয়ে চলিয়ে গেল কুলি-কামিনরা আপনা ঘর, আর তার থোড়ি বাদ আসল লিজা। আছাড় খাইয়ে জমীন'পর পড়ল বহুরানী। খালি তোমাদের বাংলোর কথাটা বলিয়ে দিল।

কারো নদীটা পেরিয়ে এসে দাঁড়াল আমাদের গাড়ি। আমরা নেমে পড়লাম। এক্ষুনি যে বিরাট পাহাড়ের আঁকা বাঁকা পাকদণ্ডীর পথে গাড়িটা ছুটে এল সে পাহাড়ের পায়ে এখন সোনালী আগুনের আঁচল দুলছে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সুজন সিং, বুক-ফাটা একটা আর্তনাদ!

ঐ দেখ, চিরিবুরের পাহাড়ে আগুন জ্বলছে বহুরানী। লিজা আর ছোট লেড়কীটা আছে ঐ পাহাড়খানার উপর আমার ক্যাম্পে। হা ভগবান!

গাড়িখানা পাশের জ্বলন্ত পাহাড়ের দিকে ঘুরিয়ে নিল সুজন সিং।

আমি লাফিয়ে উঠতে গেলাম গাড়িতে। ও পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে আমাকে পাথরের ওপর ফেলে বেরিয়ে চলে গেল। শুধু চেঁচিয়ে বলল, লিজাকে লিয়ে যদি ফিরতে পারি চৌধুরী তাহলে এই আশমানের তলায় যেখানেই থাক সুজন সিংয়ের সাথে তোমাদের দেখা হবেই।

আমি আর সেঁজুতি পাশাপাশি মোহগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

দেখলাম, সুজনের জিপটা পাহাড় ঘুরে উঠে যাচ্ছে। পাহাড়ের চারদিকে ঘিরে যেন সৃষ্টি হয়েছে একটা অগ্নিবলয়। জিপটা পাহাড়ের ওপরে কিছুক্ষণের জন্যে ঢাকা পড়ে গেল। হঠাৎ চীৎকার করে কেঁদে উঠল সেঁজুতি, দেখ, দেখ, কি রকম জ্বলে উঠেছে সুজনের জিপটা।

মুহূর্তে আমার চোখের ওপর ফুটে উঠল একটা জ্বলন্ত আগুনের গোলা। সেটা গড়াতে গড়াতে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর কোনদিন সুজন সিংকে এ আকাশের তলায় আমাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে দেখিনি।

থামলেন অনির্বাণ চৌধুরী। পরমুহূর্তে দূরে চোখ মেলে বললেন, জান মালবী, এখন কোন কোন রাতে যখন চাঁদকে কোনকিছুর আড়াল থেকে উঠে আসতে দেখি, তখন একটা ছবি চোখের ওপর ভেসে ওঠে।

সাসাংদার পাহাড়ের ওপর আবছা আলোয় একটা বলিষ্ঠ মানুষ এক নারীর হাত ধরে টেনে টেনে তুলছে! হঠাৎ অন্ধকার সরিয়ে চাঁদ উঠে এল। একটা শিমুল গাছের তলায় মেয়েটিকে এক হাতে

জড়িয়ে ধরে আর একটি হাত চাঁদের দিকে প্রসারিত করে বলছে মানুষটি, আশমান পর চাঁদিয়া, মেরা বুক পর লিজা।

এর পর স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন অনির্বাণ চৌধুরী। সামনের সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ল বালির জমিনে।

শঙ্খ আর মালবী একবার শুধু তাকাল রত্নমঞ্জুলা দেবীর দিকে, সেঁজুতির কোন চিহ্ন কি খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর মধ্যে!

অনেক রাত অবধি ঝাউবীথির তলায় বালির জমিনে বসেছিল শঙ্খ আর মালবী। ওপরের আকাশে চাঁদ ঝাউয়ের ডালে আটকা পড়ে সোনার একটা বীণার মত মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ শঙ্খের গলায় বেজে উঠল বৃদ্ধ ফাদারের সেই কথা :

The lovers are timeless, eternal.
They are as free and natural.
As the sunlight, sand and sea.

●

আলোর প্রজাপতি

শেষ বিকেলের আলোয় তখন পালাই পালাই সুর, গাড়ি এসে দাঁড়াল স্টেশানে। বেডিং আর সুটকেস নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল জয়দীপ। একটা পোর্টার চাই তার। সে তাড়াহুড়ো করল না। আগে গাড়িখানা স্টেশান ছেড়ে চলে যাক, তারপর সব ব্যবস্থা হবে। ছোট পাহাড়ী স্টেশান, দু'একটি ভুটিয়া ছাড়া ওঠানামা করল না কেউ।

গাড়ির বাঁশি বেজেছে তখন, দুটি মেয়ে চঞ্চল পায়ে এল প্ল্যাটফর্মে। নানের রোব আর ভেইল পরা তরুণীটি উঠে গেল গাড়িতে। গাউন পরা মেয়েটি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে সী-অফ করল। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। দরজার সামনের রডখানা ধরে দাঁড়িয়েছিল তরুণী নানটি। জয়দীপ দেখল, শ্রেষ্ঠ ভাস্করের হাতের তৈরি এক নিখুঁত গ্রীক মূর্তি। আশ্চর্য কমনীয়তা তার মুখখানাকে বড় বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। কোন রকম ভদ্রতার বাধা জয়দীপকে বিরত করল না। সে ঐ চলে যাওয়ার মুহূর্তটুকু দুটো চোখ ভরে ধরে রাখার চেষ্টা করল।

তরুণী নানের চোখ ছিল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির ওপর। সেও ধীরে ধীরে হাত নাড়ছিল। মুখে ভোরের আলোর মত একটা অমলিন হাসি ফুটে উঠেছিল। জয়দীপকে পেরিয়ে যাবার সময় একটি বার তার চোখ এসে পড়েছিল অচেনা যাত্রীটির ওপর। কিছু বিস্ময়, কিছু জিজ্ঞাসা মিলেমিশে মুখখানা অদ্ভুত সুন্দর হয়ে উঠেছিল। অল্প ক'টি মুহূর্তের দেখাশোনা বোঝাপড়া ঔৎসুক্যের ওপর ছেদ টেনে দিয়ে গাড়িখানা চলে গেল শেষ স্টেশান দার্জিলিং-এর দিকে। এখন জয়দীপ নিজের ভাবনায় ফিরে এল। এখুনি পোর্টার ডেকে মালপত্র তার পিঠে চাপিয়ে যেতে হবে ফারগ্রোভ মিশন স্কুল হাউসে। পোর্টারই হবে তার পথপ্রদর্শক।

জয়দীপের মনে হল যেন তার দিকেই এগিয়ে আসছে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি। ও কাছে আসছে আর ওর সোনালী হলুদ রঙের গাউনের ওপর বড় বড় সিঁদুর রঙের ফুলগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

জয়দীপের মনে হল, মেয়েরা যেন অফুরন্ত হাসির স্টক রেখেছে মুখের ভেতর।

মেয়েটির মুখে মিষ্টি হাসি। ও জয়দীপের অনেক কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।

বলল, আপনি কি প্রফেসার বোস, কলকাতা থেকে আসছেন?

জয়দীপ একটু অবাক্ হল বৈকি। এমন বিভূঁয়ে তাকে নির্ভুলভাবে চিনে ফেলেছে মেয়েটি। আর তা ছাড়া খোদ বিদেশিনীর মুখে বাংলা উচ্চারণটা প্রায় নির্ভুল। হেসে বলল জয়দীপ, অনুমান আপনার ঠিক, কিন্তু—

হাসি দিয়ে হাসি ফেরাল মেয়েটি, আমি ব্যাপটিস্ট মিশনে কাজ করি। ল্যাংগুয়েজ স্কুল ফর মিশনারীজের ছাত্রী। ফ্লসি বলেই ডাকবেন আমাকে।

জয়দীপ সদ্য পাস করা বেকার। স্টেট্সম্যানে অ্যাডভারটাইজমেন্ট দেখে অ্যাপ্লাই করেছিল দার্জিলিং-এর এই মিশনারী ল্যাংগুয়েজ স্কুলে। পোস্ট টেম্পোরারী। দু'বছরের জন্যে কোন প্রফেসার বাইরে গিয়েছেন, তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করতে হবে। তা হোক, বেকারের কাছে এ হল বাদশাহী তখ্‌ত্-এর শামিল। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আর তার সঙ্গে এক টুকরো পথ-নির্দেশিকা পেয়ে সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে।

জয়দীপ হেসে বলল, আমার লাকটা কিন্তু দারুণ রকমের ভাল। স্কুলে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ছাত্রীর দেখা পেয়ে গেলাম।

ফ্লসি জলতরঙ্গের মত বেজে উঠল, নো, নো স্যার, লাক আমারই। স্কুলের বাইরে আমিই প্রথম আপনার দেখা পেলাম।

জয়দীপের মনে হল, ফ্লসি মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ, হাসিখুশী। এতটুকু আড়ষ্টতা নেই তার ভেতর। বয়েসে তার চেয়ে দু'এক বছরের ছোটই হবে।

জয়দীপ ফ্লসিকে একটু খুশী করার জন্য বলল, নতুন জায়গা, পথ চিনি না, তুমি কেমন গড সেন্টের মত এসে পড়লে।

ফ্লসি বলল, প্রিন্সিপ্যাল মিস রোল্যান্ড আপনার আসার সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন, কিন্তু আপনি কোন্ গাড়িতে আসবেন তা জানা ছিল না। তাই স্টেশানে উনি কোন লোকের ব্যবস্থা রাখেন নি। আমি সিস্টার লিডিয়াকে ট্রেনে তুলে দিতে এসে আপনাকে পেয়ে গেলাম।

কৌতূহলী হয়ে উঠল জয়দীপ। মনের উচ্ছ্বাসকে বাইরে প্রকাশ না করেই বলল, লিডিয়া কে ?

ফ্লসি বলল, একটু আগে যে মেয়েটিকে আপনি ট্রেনে চলে যেতে দেখলেন।

জয়দীপ মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হল। সে ভাবল, মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোন কিছু করা প্রায় অসম্ভব! দুর্গার তিনটে চোখের পরিকল্পনার ভেতর নিশ্চয় কিছু সত্য আছে। মেয়েরা বিশ্বকর্মার ভাণ্ডার থেকে বোধহয় এক্সট্রা একটা করে চোখ পেয়ে থাকে।

জয়দীপ নিরাসক্ত গলায় বলল, ও, ঐ নান মেয়েটি।

ফ্লসি কলকলিয়ে উঠল, লিডিয়াও কিন্তু আপনার বাংলা ক্লাসের ছাত্রী। ও আসে কনভেন্ট থেকে ল্যাংগুয়েজ স্কুলে পড়তে। প্রচারের কাজে সুবিধে হবে বলে মাদার অ্যান ওকে আমাদের মিশন স্কুলে পাঠিয়ে বাংলাটা শিখিয়ে নিচ্ছেন। এক বছরের হায়ার কোর্সে ভর্তি হয়েছে। মিঃ ব্যাভিংটন মিশনের কাজে লন্ডনে গেছেন, আপনি ওঁরই জায়গায় কাজ করবেন, মানে আমাদের হায়ার ক্লাসে বাংলা পড়াবেন।

হঠাৎ করে কথা থামিয়ে ফ্লসি হাত ইশারায় একটা পাহাড়ী কুলিকে ডেকে নিয়ে তার পিঠে মাল চাপাল। তাকে ফারগ্রোভ মিশনের নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দিল। কুলিটা চোখের সামনে থেকে মুহূর্তে পাহাড়ী খাঁজে খোঁজে পা চালাতে চালাতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফ্লসি বলল, আমরা একটু ঘুরে অকল্যান্ড রোড ধরে এগোব।

ফ্লসির চোখে মুখে অবাক্ চাউনি ফুটে উঠল। সে বলল, আমাদের আগেই ও কিন্তু মিশনে পৌঁছে যাবে।

জয়দীপ বুঝল, তার অবিশ্বাসের সুরটা ফ্লসির কানে বাজে নি। সে তাই তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, আমাদের পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে, ও কি ততক্ষণ বসে থাকবে আমাদের জন্যে?

ফ্লসি বলল, মালগুলো পৌঁছে দিয়ে চলে আসতে পারে।

জয়দীপের এবার অবাক্ হবার পালা। বলল, পয়সা দিতে হয় না বুঝি এখানকার কুলিদের?

ফ্লসির হাসি যেন থামতেই চায় না। বলল, তা কেন হবে, ও পুরো ভাড়া নিয়েই ফিরবে মিশন অফিস থেকে। এ ভাড়া মিশনই দেয়। সব প্রফেসার আর মিশন-কর্মীদের বেলায় ঐ এক নিয়ম।

ওরা কথা বলতে বলতে বাঁক ঘুরে অকল্যান্ড রোডে এসে পড়ল।

পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে-বেঁকে চলেছে পথ। কোথাও ফার কোথাও বা দেওদারের ঘন জটলা। পাহাড়ের কোল জুড়ে বাড়ি। সামনে মরশুমী ফুলের বেড রঙে রঙে ঝলমলিয়ে উঠছে।

বর্ষা শেষ হয়ে সবে শরতের নীল উঁকি দিচ্ছে আকাশ জুড়ে। দূর পাহাড়ের মাথায় জেগে থাকা মেঘগুলো জলের সঞ্চয় হারিয়ে রাশ রাশ শিমুলের সাদা তুলোর মত জেগে আছে। দু'একটা মেঘ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে দুষ্টু ছেলের মত। পথচারীকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পালাচ্ছে। এমনি একটা হালকা হাওয়াই মেঘ ওদের কাছে এল। একটুখানি হিমেল হাওয়া লাগল চোখে মুখে। সজল একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব জয়দীপের ক্লান্ত শরীরটাকে বেশ তাজা করে তুলল।

ফ্লসি একটা বাঁক পেরিয়ে আসতে আসতে বলল, আমরা জলাপাহাড়ের নীচে এসে গেছি। আমাদের ফারগ্রোভ আর বেশী দূরে নেই।

জয়দীপ হঠাৎ চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল। পাহাড়ের গায়ে একটা অতি সাধারণ রকমের বাড়ি। খাদের দিকে লম্বা সরু পাঁচিল। তার ওপর বসে আছে মাটির পুতুলের মত দুটো বাচ্চা। নড়ন-চড়ন নেই।

জয়দীপ ভয় পেয়ে গেছে। যে কোন মুহূর্তে বাচ্চা দুটো খাদে গড়িয়ে পড়তে পারে। সে তার আশঙ্কার কথাটা ইশারা করে ফ্লসিকে জানাতেই ফ্লসি বলল, ওদের কথা বলছেন। আশ্চর্য ব্যালেন্স ওদের। বাচ্চাগুলোকে যেখানে বসিয়ে দেবেন সেখানেই বসে থাকবে ঘন্টার পর ঘন্টা। একটু বড় হলে ওরা দৌড়বে ঐ পাঁচিলের ওপর দিয়ে। খাদের দিকে তাকালে আমাদের তো মাথা ঝিমঝিম করে, কিন্তু কি শক্ত ওদের নার্ভ। দেখুন, কোন দিন শুনবেন না কোন পাহাড়ী পা পিছলে খাদে পড়ে গেছে।

জয়দীপ আশ্বস্ত হয়ে এগিয়ে চলল। ঐ পথেই ফিরে আসছিল ওদের পোর্টার। থেমে গেল কয়েক সেকেন্ড। তারপর অচেনা লোকের পাশ কাটিয়ে যেমন আমরা চলে যাই, ও তেমনি করে হনহনিয়ে চলে গেল।

ফ্লসি বলল, দেখলেন তো, পয়সার জন্যে ও আপনার পথ আগলালো না।

জয়দীপ বলল, আমাদের সমতলের কুলি হলে কিন্তু অনেক কথা বলত। সে যে যথাস্থানে মালগুলো পৌঁছে দিয়ে এসেছে সে ফিরিস্তি দিতে ভুলত না।

চলতে চলতে ফ্লসি বলল, পাহাড়ীরা শুধু কথা কম বলে না, প্রয়োজনেও তাদের বেশী কথা বলতে শোনা যায় না। আভাস ইঙ্গিত থেকে ওদের মনের কথা বুঝে নিতে হয়।

ওরা এখন একটা চড়াই ভেঙে পথ শর্টকাট্ করে নিল। ঢালুতে ফার দেওদার গাছের জটলার ভেতর একখানা ছোট বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। তার পাশে এসে দাঁড়াল ফ্লসি আর জয়দীপ।

ফ্লসি বলল, আপনাকে চড়াই ভেঙে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নিয়ে এলাম, আপনার খুব কষ্ট হল নিশ্চয়ই। আচ্ছা, কেন এ পথে এলাম বলুন তো?

প্রথমটা এতখানি চড়াই ভেঙে এসে হাঁপাচ্ছিল জয়দীপ। কিন্তু অল্প সময়ের ভেতরেই তাজা হয়ে উঠল। পাহাড়ী হাওয়ায় সহজেই ক্লান্তি দূর হয়।

জয়দীপ বলল, এখানে তুমি তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চাইছ, তাই না?

মোটেই তা নয়, বলল ফ্লসি।

তবে?

ফ্লসি যেন কেউ না শোনে এমন গলায় বলল, এটা মিঃ ব্যাভিংটনের কটেজ। এখানে বছর দুয়েক আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। অ্যালটমেন্টের খাতাখানা আমি দেখেছি। কিন্তু আপনি যে আগে-ভাগে এ বাড়ি দেখেছেন, তা কাউকে যেন বলে বসবেন না।

জয়দীপ হেসে বলল, প্রথমে মিশনে এসে ভাল মানুষের অভিনয়ের এই যে সুযোগ দিলে, এজন্যে ধন্যবাদ।

ফ্লসি বলল, জায়গাটা বড় নির্জন, তাই না?

জয়দীপ হেসে বলল, অনেকদিন সঙ্গী নিয়ে কাটিয়েছি, এখন নিঃসঙ্গ জীবন কেমন লাগে পরখ করে দেখা যাবে। আমার কিন্তু দারুণ ভাল লাগছে জায়গাটা।

আসুন, বেশি ভাল লাগা ভাল নয়। প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ড আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

জয়দীপ ফ্লসিকে অনুসরণ করে এসে পৌঁছল ফারগ্রোভ মিশন স্কুল হাউসে।

প্রিন্সিপ্যাল মিস রোল্যান্ড উত্তপ্ত আন্তরিকতায় স্বাগত জানালেন জয়দীপকে। তরুণ জয়দীপের চেহারার ভেতর একটা বলিষ্ঠ আভিজাত্য ছিল। দীর্ঘ আকার আর আকর্ষণীয় আকৃতির জন্য সে নিশ্চয়ই ঋণ স্বীকার করত তার মৃত বাবা-মার কাছে। মিস রোল্যান্ড জয়দীপকে দেখে যে খুশী হয়েছেন, তা প্রকাশ পাচ্ছিল তাঁর সারা মুখের অভিব্যক্তিতে।

মিস রোল্যান্ডের দেহে বয়সের চিহ্ন আঁকা। কিন্তু তাঁর আচরণ, অঙ্গ সঞ্চালন থেকে বয়সের

অনুমান করতে গেলে ভুল হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

এক সময় মিস রোল্যান্ড বাংলা শেখার জন্যে আগ্রহী হন। তাঁর আগ্রহ আর নিষ্ঠার ফলে তিনি ভারতের একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ.-তে বাংলায় প্রথম হবার গৌরব লাভ করেন। সেই থেকে রোল্যান্ড বাংলা ভাষার ওপর আগ্রহী। তিনি তাঁর ল্যাংগুয়েজ স্কুলে তাই বাংলা শেখানোর ব্যাপারে এতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন। আর তাছাড়া বাংলা শেখা থাকলে সমতলে প্রচারের কাজে অনেক সুবিধে। ভিন্ন পথাবলম্বী মিশনের ফাদার, নানেরাও যোগ দিয়েছেন এই ল্যাংগুয়েজ ক্লাসে। তাঁরাও বুঝেছেন এর গুরুত্ব।

প্রিন্সিপাল মিস রোল্যান্ড দার্জিলিং শহরের এক সুপ্রচলিত নাম। তাঁর আচরণে ভুটিয়া বস্তি থেকে অভিজাত মহল্লার অধিবাসীরা পর্যন্ত সকলেই শ্রদ্ধাবিগলিত। যে কোন উৎসব অথবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাঁকে বাদ দিয়ে করার ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে নিয়মের ঘোরতর ব্যতিক্রম।

মিস রোল্যান্ড বাঙালীদের উৎসব মঞ্চে যখন আরোহণ করেন তখন তাঁর সারা চেহারার ভেতর একটা পবিত্র সাত্বিকতার চিহ্ন ফুটে ওঠে। তিনি লাল পাড় গরদের শাড়ি পরেন তখন। চন্দনের টিপ পরেন কপালে। হাতে থাকে সাদা ফুলের ছোট্ট একটি মালা। অনেক সময় সভাগৃহে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রদ্ধাশীল শ্রোতারা তাঁকে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করেন। বাঙালী গৃহে বাণী অর্চনায় নিমন্ত্রিত হয়ে যান তিনি। বৌদ্ধ গোম্ফায় যেতেও তাঁর মুক্ত মনে এতটুকুও বাধে নি কোন দিন। তাই মিস রোল্যান্ড যখন খ্রিস্ট মাহাত্ম্য প্রচারে বের হন, তখন অতি অল্প প্রয়াসেই সব রকমের মানুষকে তিনি আকৃষ্ট করতে পারেন।

প্রিন্সিপ্যাল মিস রোল্যান্ড অন্যান্য অধ্যাপকদের ডেকে আনলেন তাঁর ঘরে। একে একে মিঃ গিলিংস, ফাদার ডিবি, মিসেস বেক্‌লেদের সঙ্গে জয়দীপের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মিঃ লী খেলার মাঠ থেকে ফিরছিলেন। তাঁকে ডেকে আগ্রহের সঙ্গে সেদিনের টেনিস ট্যুরনামেন্টের খবর জানতে চাইলেন।

জয়দীপ দেখল সব ব্যাপারেই মিস রোল্যান্ডের সমান আগ্রহ, অদম্য উৎসাহ।

একে একে অধ্যাপক ও মিশনের সিস্টাররা জয়দীপের সঙ্গে পরিচিত হয়ে চলে গেলে প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ড বললেন, জয়দীপ, আমার ছেলে থাকলে তোমার বয়সীই হত, আজ থেকে অন্ততঃ দুটো বছরের জন্য তোমার সুবিধে অসুবিধে, শুভাশুভের ব্যাপারগুলো আমার ওপর ছেড়ে দাও। কাজকে ব্রত করে নাও, জীবনে সুখী হবে।

জয়দীপের মাথা আপনিই নত হয়ে এল এই বিদেশিনী মহিলার সামনে। সে বলল, আপনার কথা সব সময় আমার মনে থাকবে।

প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ড হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঘন্টি বাজাতেই একটি পাহাড়ী ছেলে ঘরে ঢুকল। তিনি জয়দীপকে দেখিয়ে বললেন, মিঃ বোসকে মিঃ ব্যাভিংটনের কটেজে নিয়ে যাও। আজ থেকে এখানে তোমার স্কুলের সময় ছাড়া কোন কাজ থাকবে না। তুমি ওঁর রান্নাবান্না থেকে সব কাজ করবে।

ছেলেটি আজ্ঞাবাহীর মত মাথা নেড়ে জানাল যে প্রিন্সিপালের কথা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।

এবার মিস রোল্যান্ড ফিরলেন জয়দীপের দিকে। বললেন, আসবার সময় অনেক কষ্ট পেয়েছ পথে, এখন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম কর। আজ মিশন থেকে তোমার রাতের খাবার দিয়ে আসবে। কাল থেকে তোমার নতুন সংসার শুরু হবে মিঃ ব্যাভিংটনের কটেজে।

জয়দীপ কিছুই না জানার ভান করে বলল, মিঃ ব্যাভিংটনকে নিশ্চয়ই ওখানে পাওয়া যাবে?

প্রিন্সিপ্যাল হেসে বললেন, তুমি মিঃ ব্যাভিংটনের জায়গায় এসেছ জয়দীপ। দু'বছরের জন্যে মিশনের কাজে কর্তৃপক্ষ ওঁকে বাইরে পাঠিয়েছেন। মিশনের মস্ত উৎসাহী কর্মী আমাদের ব্যাভিংটন। এখন থেকে ওঁর ওখানেই তোমার থাকার ব্যবস্থা। তারপর একটু থেমে বললেন, মিশনের ভেতর ব্যাচিলার্স কোয়ার্টারে তোমাকে রাখলে হয়তো তুমি সঙ্গী পেয়ে খুশী হতে, কিন্তু আপাততঃ সে সুযোগ নেই। কোন সীট খালি নেই।

ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, মেজাজ ভাল, কাজের ছেলে, একে নিয়ে তোমার কোন অসুবিধা হবে না জয়দীপ।

জয়দীপ বলল, একা থাকতে একটুও অসুবিধে হবে না আমার। সারাদিন স্কুলে কাজ করার পর নির্জন জায়গায় বিশ্রাম আর পড়াশোনা ভালই হবে মনে হচ্ছে।

পাহাড়ী ছেলেটির সঙ্গে জয়দীপ চলে গেল মিঃ ব্যাভিংটনের কটেজে।

বাড়ির চাবি খোলা হল। সামনে ফুলের বাগান, পিছনে ফলের। বড় বড় দেওদার ফার গাছের বন। তার মাঝ দিয়ে মোরাম বিছানো পথ।

বাড়ির ভেতর ডাইনিং রুম বাদ দিয়ে বসার আর শোবার দু'খানা ঘর ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে।

জয়দীপ ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, কি নাম তোমার?

ফুৎসো ওয়াংদি।

দারুণ হাসি পেয়ে গেল জয়দীপের। হাসির কারণটা তেমন কিছু ছিল না। অনেক সময় অনভ্যস্ত কিছু কানে বাজলেই হাসি পেয়ে যায়।

জয়দীপ বলল, তোমার নাম আজ থেকে রইল বৎস। বৎস বলে আমি তোমায় ডাকব আর তুমি ঐ ডাকেই সাড়া দেবে, কেমন?

ফুৎসো কি বুঝল সে-ই জানে। সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে একটু হাসল। আর হাসির সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের পাতা দুটো সরু হয়ে বুজে এল।

সে রাতে ফুৎসোর কাছ থেকে মিঃ ব্যাভিংটন সম্বন্ধে ছোট্ট একটু ইতিহাস সংগ্রহ করল জয়দীপ।

মিঃ ব্যাভিংটনের বাবা ছিলেন দার্জিলিং-এর অনেক ক'টি টি-গার্ডেনের মালিক। তাঁর স্ত্রী মারা গেলে তিনি ব্যাপটিস্ট মিশনকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করেন। নিজে শিশু পুত্র টমাস ব্যাভিংটনকে নিয়ে এই নিরালা কটেজে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে দেন। টমাস ব্যাভিংটন সবে চোদ্দ বছরে পড়েছে, বাবা মারা গেলেন। তখন মিশনই ভার নিল ওকে বড় করে তোলার। মিস রোল্যান্ডই প্রকৃতপক্ষে মানুষ করেছেন ওঁকে নিজের কাছে কাছে রেখে। বড় হলে ওঁকে করে নিয়েছেন মিশনেরই একজন। তবে পৈতৃক সূত্রে পাওয়া এই নির্জন নিবাসটি এখনও আছে মিঃ ব্যাভিংটনের হেফাজতে। এর সংরক্ষণের ভার নিয়েছে ব্যাপটিস্ট মিশন।

জয়দীপ সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখেছে। একটা সুন্দর রুচির ছাপ সব জায়গাতেই ছড়ানো।

জয়দীপ সুন্দরকে ভালবাসে কিন্তু সে নিজে বড় অগোছাল। পোশাক-পরিচ্ছদের ওপর মমতা তার নেই বললেই চলে। নিজের দেহ সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি উদাসীন। বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসার দারুণ একটা ইচ্ছে হচ্ছিল জয়দীপের। কিন্তু সদ্য গরম জলে গা হাত পরিষ্কার করে গরম পোশাক-পরিচ্ছদ পরলেও বাইরের শীত তখন কটেজের চারদিকে হিংস্র হায়েনার মত ঘোরাফেরা করছে।

ফুৎসো প্রতিবারই জয়দীপের বাইরে যাবার প্রবল ইচ্ছাকে তাই সবিনয়ে বাধা দিতে লাগল। তখন জয়দীপ বসার ঘরে আলো জ্বেলে মিঃ ব্যাভিংটনের বুক-শেল্‌ফ থেকে একটা বই টেনে নিয়ে পড়তে বসল। বইখানা কিন্তু উপন্যাস অথবা ধর্মবিষয়ক ছিল না। জাপানি কতকগুলো হাইকুর ইংরেজী অনুবাদ।

টুকরো টুকরো কবিতাগুলো পড়তে পড়তে যেন নেশা ধরে যায়। জয়দীপ প্যাড আর কলমটা হাতড়ে হাতড়ে বের করল। তারপর হাইকুর দু'চারটে অনুবাদ করতে লেগে গেল।

একটি মেয়ে কিছুতেই চুল বাঁধবে না, কারণ গত রাতে তার প্রিয়তম সোহাগে সোহাগে ভরে দেবার সময় তার খোঁপার বাঁধন খুলে চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে গেছে। সেই স্মৃতিটুকু নিয়ে সে থাকতে চায়।

বাঁধব না আজ
স্মৃতি সকরুণ
খোঁপা খোলা চুলগুলি,

কাল রাতে প্রিয়
সোহাগে আদরে
দিয়েছিল তারে খুলি।

আর একটি কবিতায় প্রেমিকা তার প্রেমিকের কাছে গোলাপ নিয়ে এসেছে উপহার দেবে বলে। প্রেমিক বলছে, কি হবে আমার গাছের ঐ গোলাপ নিয়ে। আমার প্রিয় ফুল একটি চুম্বন।

কথাটা শুনেই প্রেমিকার মুখ লজ্জায় রাঙা গোলাপের মত ফুটে উঠল।

চাইনে চাইনে
তোমার হাতের
গোলাপ কলিকা প্রিয়া!
সেরা উপহারে
ভরে দাও মোরে
চুম্বন কুঁড়ি দিয়া।

শুনে সেই কথা
লাজের ছোঁয়ায়
রাঙা হয়ে গেল মুখ,
নিতে সেই ফুল
লজ্জা আকুল
প্রিয়তম উৎসুক।

দু'টি হৃদয়ের বিচ্ছেদ করুণ ছবি একটি কবিতায় রয়েছে। ফুজিয়ামা পর্বত, চাঁদ আর চেরীফুল নিয়ে কবিতাটির রচনা।

ফুজির আড়ালে—চাঁদ ডুবে ডুবে যায়
আঁধারে আকুল—চেরী করে হায় হায়।

অনেক রাত অব্দি জয়দীপকে কবিতায় পেয়ে বসল। মুহূর্তে ভাল লাগার বিষয়ে মগ্ন হয়ে যাবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে তার। কিন্তু কোন কিছুতে মগ্ন হলে সময়ের স্বাভাবিক হিসেব থাকে না। তখন টেনে তুলতে না পারলেই বিপদ। হোস্টেলে থেকে পরীক্ষার পড়া পড়তে পড়তে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল একবার যে, পরীক্ষার হলে ঢুকতে প্রায় এক ঘণ্টা দেরি করে ফেলেছিল। বন্ধুদের সঙ্গে একবার ময়দানে এমন আড্ডা জমিয়েছিল যে রাত একটা নাগাদ পুলিস এসে ঘরে পাঠিয়ে না দিলে আড্ডাধারীদের চৈতন্য হত না। মগ্নতা অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে গভীর ভাবনার জগতে নিয়ে যায় ঠিক, কিন্তু তার ঝকমারিও আছে মেলা। কলেজ ইউনিভার্সিটির মাঠে জয়দীপের পায়ে যখন বল এসে পড়ত, তখন মাঠের দর্শকেরা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে ম্যাজিক দেখার দুর্লভ আনন্দ লাভ করত। ক্ষিপ্রতায় বোধ করি জয়দীপের সমতুল্য মাঠে কেউ ছিল না। অব্যর্থ লক্ষ্যে বলকে পাঠিয়ে দিয়ে বহুদিন মাঠ ভরা দর্শকের করতালি কুড়িয়েছে জয়দীপ। কিন্তু বল নিয়ে সে এমনি মগ্ন হয়ে যেত যে, পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই পড়ে থাকত পদধৃত বলের ওপর। তখন যদি অফসাইডের বাঁশি বাজত, রেফারীর মুখে, তাহলে আর সবার কানে পৌঁছলেও জয়দীপের কান দু'টিকে তা ভেদ করতে পারত না। সে সবার হাসি কৌতুক উপেক্ষা করে জালের ভেতর বলটিকে গচ্ছিত রেখে তবে ফিরে আসত।

জয়দীপের ভাল লেগেছিল হাইকুগুলো, সে ঐ নিয়েই হয়তো রাত কাবার করে দিত, কিন্তু ঘরে এসে ঢুকল ফুৎসো। বলল, মিশনের ডিনারের ঘণ্টা পড়ে যেতেই সে গিয়েছিল খাবার আনতে। এখন রাতের খাবার রেডি, বসলেই হয়।

অন্য সময় হলে জয়দীপ হয়তো ওকে হটিয়েই দিত, কিন্তু নতুন জায়গার কানুন মেনে চলা দরকার মনে হতেই সে উঠে পড়ল।

এর পর রাতের খাবার খেয়ে পাহাড়ী রাত কাটাল নিশ্ছিদ্র ঘুমে কম্বলের তলায়।

ভোরবেলাটা ভোলার নয়। বেড্-টি নিয়ে এসে ওর ঘুম ভাঙাল ফুৎসো। মুখ ধুয়ে এসে গায়ে কম্বল টেনে জুৎ করে বসল জয়দীপ। চায়ের ধোঁয়ায় চাঙ্গা হয়ে উঠল মেজাজটা। চুমুক দিতেই বিলকুল মেজাজ শরিফ।

কিন্তু অভাবনীয় লুকিয়েছিল ওপারে, সামান্য একটা পরদার আড়ালে। ফুৎসো পরদাখানা টেনে

সরিয়ে দিতেই লম্বা কাচের ওপর একটা ছবি ফুটে উঠল। কোথা থেকে এসে পড়ল এ ছবি। সামনের উঠোনে ফারের জটলার ফাঁকে ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি। সাদা বরফের চুড়োয় চুড়োয় লেগেছে তখন তপ্ত সোনার রঙ। গতকাল বেলাশেষের কাঞ্চনজঙ্ঘা ঢাকা পড়েছিল মেঘের আড়ালে। আজ সব আড়াল ভেঙে স্ব-মহিমায় প্রকাশ পেয়েছে।

হাতে ধরা রইল চায়ের কাপ। সেই মুহূর্তে জয়দীপের মন আশ্চর্য সুন্দর এক ল্যান্ডস্কেপ হয়ে গেল। কতক্ষণ ও বসে দেখল সে ছবি। আশা যেন আর মেটে না। এবার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ছবি। পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল বাইরে। সামনের বাগানে শ্বেতপাথরের লম্বা টবগুলো কাল চোখে পড়ে নি তেমন করে; আজ ভোরের আলোয় তার থেকে লতার মত ঝুলে পড়া সাদা, গোলাপী, হালকা বেগুনী পিটুনিয়াগুলো একরাশ শোভা ছড়িয়ে দিয়েছে। গোল টবের মাঝখান থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে হরেক রঙের অ্যাস্টার। যত সমৃদ্ধি তত শোভা।

সব মিলিয়ে এ যেন এক অচেনা জগৎ জয়দীপের চোখে। সে সুন্দর ইটালিয়ান মার্বেলে বাঁধানো বেদীর ওপর বসে পড়ল। এমন নির্মল ঝকঝকে সকাল সে কোথাও কোন দিন দেখেছে বলে মনে করতে পারল না।

ফুৎসো ছেলেটা যেন দেহের সঙ্গে সারাক্ষণ লেগে থাকা একটা ছায়া।

সে বলে গেল, ব্রেকফাস্টে ডিম আর টোস্টের ব্যবস্থা হবে। লাঞ্চে সব্‌জি, ডাল, মাছ অথবা মাংস। এখন বাজারে যেতে হবে, পয়সা চাই।

অগত্যা সৌন্দর্যসাগর থেকে ঝটপট ঘরের ভেতর উঠে আসতে হল জয়দীপকে। ব্যাগ থেকে পয়সা বের করে দিতেই ফুৎসো একটা বেড়ালের মত বাঁধা রাস্তার বাইরে বড় বড় পাথরের চাঁইয়ে পা ফেলে অবলীলায় নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এখন জয়দীপ মনোযোগী হল টুকটাক কতকগুলো কাজে। অনেক ক'টা কাজ সেরে সে বাইরে এসে বসল দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম নিয়ে। মিঠে রোদ্দুর পিঠে মেখে দাড়িতে সাবানের ফেনা সবে তুলেছে সে, হঠাৎ পিছনে কার যেন পায়ের সাড়া পেল। পিছন ফিরে দেখে, ফ্লসি ঢুকছে বাগানে। হুড়মুড়িয়ে তোয়ালেখানা মুখে তুলে নিয়ে মুছে ফেলল সাবানের ফেনাগুলো। তাড়া খেয়ে গড়িয়ে পড়ল সাবান ব্রাস জলের পট।

হাসি হাসি মুখে ফ্লসি দৌড়ে এসে সেগুলো একটি একটি করে যথাস্থানে তুলে রাখল। তারপর একটা স্লিপ অপ্রস্তুত জয়দীপের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, যদি কিছু বলার থাকে আমাকে বলতে পারেন।

স্লিপ পাঠিয়েছেন প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ড। জানতে চেয়েছেন, জয়দীপের কাল রাত কেটেছে কেমন, আর সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানতে চেয়েছেন, আজ লাঞ্চের পর একটার ক্লাশে যোগ দিতে পারবে কিনা?

জয়দীপ বলল, প্রিন্সিপ্যাল মিস রোল্যান্ডকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে বল, যতটা ভাল কাটবে মনে করেছিলাম তার চেয়েও ভাল কেটেছে আমার রাত। আর একটার ক্লাসে আমি নিশ্চয়ই হাজির থাকব।

ফ্লসি বলল, প্রিন্সিপ্যালকে আমি অবশ্যই আপনার কথাগুলো জানাব। এখন বলুন দেখি, কাল রাতটা কি ধরনের অসুবিধায় কাটালেন?

জয়দীপ মুচকি হেসে বলল, অন্ততঃ ডজনখানেক অসুবিধায় কেটেছে।

ফ্লসির চোখে মেঘছায়া ঘনাল, গলায় উদ্বেগের সুর। সত্যি, বলুন কি অসুবিধে?

জয়দীপ বলল, প্রথম অসুবিধে, মন খুলে কথা বলার কোন লোক নেই। যে মেয়েটি স্টেশান থেকে সঙ্গে এল, মিশনে পৌঁছে দিয়েই সে দিল গা ঢাকা। তারপর থেকে ফুৎসোর হাতে বন্দী হয়ে আছি।

ফ্লসি হাসল না। বলল, খুব দুঃখিত আমি, আসতে পারি নি বলে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, কোন উপায় ছিল না। আমাদের সব কাজ রুটিনে বাঁধা। এখন চলেছি বাজারে, তাই প্রিন্সিপ্যাল স্লিপ পাঠালেন আমার হাতে, আর তাই দেখা হয়ে যাওয়া সম্ভব হল।

জয়দীপ বলল, কাল শেষবেলায় বান্ধবীটিকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসার সুযোগ পেলে কি করে?

ফ্লসি বলল, তিনটের পর ক্লাস না থাকলে দু'তিন ঘন্টা ছুটি পাই। তখন যেখানে খুশী বেড়াতে যাবার মানা নেই।

জয়দীপ বলল, আমার সবচেয়ে বড় অসুবিধে এই বাড়ি। এত আরামে থাকার অভ্যেস আমার নেই। বছর দু'এক পরে কিংবা তার আগেই যখন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে তখন মনে হবে, প্রাসাদ থেকে বস্তিতে এসে পড়লাম।

ফ্লসি এর কোন উত্তর দিল না। তার মনে হল, বাড়িখানা খুশী করতে পেরেছে প্রফেসর বোসকে। সে এবার তার ব্যাগের ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে জয়দীপের হাতে এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনার আজকের রুটিন আমি তুলে এনেছি। আপনি আজ ক্লাস নিতে গেলে অফিস থেকে আপনাকে সারা সপ্তাহের রুটিন দিয়ে দেবে। হ্যাঁ, আর এক কথা। আপনার দরকারী সব বই মিঃ ব্যাভিংটনের শেল্‌ফে পাবেন। ওঁর ক্লাসগুলোই আপনাকে নিতে হবে।

জয়দীপ বলল, আর তোমাকে আটকে রেখে আমি তোমার দেরি করিয়ে দেব না। শুধু একটা কথা বলে যাও, মিঃ ব্যাভিংটনের ক্লাস কেমন লাগত তোমার?

ফ্লসি একটুখানি কি ভেবে নিয়ে বলল, ভাল।

জয়দীপ আবার বলল, খুব ভাল নিশ্চয়ই।

ফ্লসি একটু হেসে বলল, ভালই তো বললাম।

জয়দীপ বলল, এখন আর আটকাব না, ক্লাসে দেখা হবে। হ্যাঁ, শোন, কাল পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।

ফ্লসি চলে যেতে যেতে বলল, আপনার সঙ্গে কাল আসতে পেরে আমি গর্বিত।

ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ড, যিনি আজ থেকে আপনাদের বাংলা ক্লাস নেবেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। কৃতিত্ব কেবল তাঁর পঠন-পাঠনে নয়, খেলাধুলোতেও। আমাদের এই প্রতিভাদীপ্ত তরুণ বন্ধুটি যে অল্প সময়ের ভেতরেই আপনাদের মন জয় করে নিতে পারবেন, সে সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

ক্লাস ছেড়ে যাবার আগে জয়দীপের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, জয় ঘোষণা রয়েছে তোমার নামের ভেতর, জয়ী তুমি হবেই।

মিস রোল্যান্ড ক্লাস ছেড়ে যেতেই জয়দীপ দেখল, চার্চের কয়েকজন ফাদার একদিকে বসেছে, অন্যদিকে ব্যাপটিস্ট মিশনের সিস্টার আর কনভেন্টের নানেরা।

মুহূর্তে চোখ গিয়ে পড়ল গতকাল বেলাশেষে দেখা সেই তরুণী গ্রীক-মূর্তির ওপর। শিক্ষার্থীর চোখ দু'টি মেলে তাকিয়ে আছে সে। বড় শান্ত, বড় গভীর। তার পাশে বসে আছে ফ্লসি। কথা বলছে না সে, তবু হাজার ভাবনার ছবি ক্ষণে ক্ষণে ফুটে উঠছে তার চোখে-মুখে।

জয়দীপ শুরু করল কথা। যেন কোন বিশেষ একটি মেয়ে তদগত হয়ে বসে আছে তার পড়া শুনবে বলে, তাকেই সে শোনাচ্ছে আপন মনের কথাগুলো।

জয়দীপ বলল, শকুন্তলার কাহিনী শুরু করে গেছেন আপনাদের কৃতী অধ্যাপক মিঃ ব্যাভিংটন। মূল গল্পটি নিশ্চয়ই আপনাদের শোনা হয়ে গেছে অধ্যাপক ব্যাভিংটনের মুখ থেকে। আমি আজ আর কাহিনীর পুনরুক্তি করে আপনাদের সময় নেব না। আজ শুধু বলব, এই রচনাটিতে কালিদাস কি বলতে চেয়েছেন। আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছেন, এই নাটকেব কাহিনী-ভাগের ভেতর প্রেমই প্রধান। কিন্তু এ কি ধরনের প্রেম তা আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

কণ্বের পবিত্র তপোবনের ভেতর আমরা দুষ্মন্ত শকুন্তলার উচ্ছল ভালবাসার একটা ছবি দেখতে পাই। কিন্তু আমরা নাট্যকারকে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারি, পবিত্র তপোবনের শুদ্ধ সংযমের বাঁধকে তিনি কেন ভেঙে দিলেন? সামাজিক জীবনের প্রলোভনকে কেন নিয়ে এলেন তিনি সংযত তপস্যার ক্ষেত্রে?

কালিদাসের অন্তর কোন্ ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে নাটকের এ ধরনের দৃশ্য রচনা করেছিল তা

আমাদের জানা নেই, তবে তাঁর নাটকের দৃশ্যাবলীকে বিশ্লেষণ করে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

(আমার মনে হয়, এই নাটকটি লিখতে গিয়ে তিনি জীবনের ধর্মের দিকে তাকিয়েছিলেন। জীবনকে যেমন বল্গাহীন অশ্বের মত ছেড়ে দিতে নেই অসংযমের প্রান্তরে, ঠিক তেমনি আবার বাঁধতে নেই কঠোর সংযমের শাসনে। নদীর থাকে দু'টি কূলের বাঁধন, কিন্তু সে চলে আপন লীলায় এঁকে -বেঁকে। তাই নদীর আছে নিত্য জোয়ার-ভাঁটার লীলাখেলা।)

কণ্বের তপোবনে বেড়ে উঠেছিল তিনটি কন্যা। স্বাভাবিক জীবনের ধর্মে তারা লাভ করেছিল তারুণ্য। কিন্তু সে তারুণ্যের সার্থকতা কই? নিত্য তারা দেখছে ফুল ফুটছে আশ্রমে, উড়ে আসছে প্রজাপতি। পাখিরা নীড় রচনা করছে আশ্রমের তরুশাখায়। বৃদ্ধি করে চলেছে বিহগ বংশ। কিন্তু তাদের জীবনে যে চেতনা আসছে দক্ষিণ বাতাসের সঙ্গে, ভ্রমরের গুঞ্জন আর পাখির কূজনধ্বনির ভেতর দিয়ে, তাকে তারা ঢেকে রাখবে কি দিয়ে? প্রতিদিন দেহের দ্বারে অচেনা অতিথি দিয়ে যাচ্ছে চিঠি। কঠিন সংযমের বাঁধ ভেঙে জীবনকে তার স্বাভাবিক ধর্মে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার আহ্বান আছে সে চিঠিতে। চিঠির এমন আন্তরিক আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করবে কোন্ পরম শক্তি দিয়ে নাটকের নায়িকা শকুন্তলা? তাই কৃত্রিম সংযমের বাঁধ গেল ভেঙে। জীবনের ধর্মকে স্বীকার করে নিয়ে শকুন্তলা ভেসে গেল যৌবনের উচ্ছল আবর্তসংকুল স্রোতধারায়।

সেদিন নাটকটির ওপর প্রাণ খুলে আলোচনা করেছিল জয়দীপ। কেন শকুন্তলাকে ফিরে আসতে হয়েছিল দুষ্মন্তের রাজসভা থেকে, কেনই বা বিচ্ছেদের পরে দুষ্মন্ত শকুন্তলার পুনর্মিলন ঘটেছিল মারীচের দিব্য তপোবনে।

ক্লাসে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল তাকে। সব ক'টিই প্রায় এসেছিল মিশন কর্মী ফাদারদের কাছ থেকে। তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন, নদীর গভীরতা যদি তলদেশে পলি সঞ্চয়ের ফলে হ্রাস পায়, তাহলে প্রবল স্রোত কূলের বাধা না মেনে দুই তীরে জলপ্লাবনের সৃষ্টি করতে পারে। তখন উপায়?

জয়দীপ বলেছিল, জীবনের কঠোর শাসন যেমন জীবনবিকাশের পথে বাধা, তেমনি অসংযমও আনে জীবনের বিকৃতি। এ দুটো শিক্ষাই আমরা পেয়েছি শকুন্তলা নাটক থেকে। তারপর মৃদু হেসে বলেছিল, জীবনস্রোতে চলতে গেলে কূল ছাপাবে না কোনদিন, এ কথা বলা চলে না। এক-আধটু প্লাবিত হোক না কৃষিক্ষেত্র। তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। অভিজ্ঞতার লাভ। পলির সঞ্চয় চিরদিনই উৎকৃষ্ট ফসলের জন্ম দেয়।

আরও অজস্র কথায় জমে উঠেছিল সেদিনের ক্লাস। শিক্ষক ছাত্র উভয়েই সেদিন ছিল মগ্ন। কারোরই খেয়াল ছিল না ক্লাস শেষের ঘণ্টা বেজে গেছে কখন।

পায়ে পায়ে এসে মিস রোল্যান্ড যদি জয়দীপের পাশে না দাঁড়াতেন, তাহলে সময়ের হিসেব ভুলে ওরা সেদিন আরও অনেকক্ষণ ক্লাস চালিয়ে যেত।

প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ডকে দেখে জয়দীপ ছেদ টেনে দিয়েছিল তার আলোচনায়।

মিস রোল্যান্ড হেসে বলেছিলেন, আলেকজান্ডারের মত অধ্যাপক বোস ক্লাসে এলেন আর ছাত্রছাত্রীদের জয় করে নিলেন। আমার যদি মুখের ভাষা পড়ার সামান্য ক্ষমতাও থাকে তাহলে বলতে পারি, জয়দীপ প্রথম দিনেই জয়ী হয়েছেন। জয়দীপ আমার ঈর্ষার আবার পরম স্নেহেরও পাত্র।

ছাত্রছাত্রীরা সেদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে অভিনন্দিত করেছিল প্রিন্সিপ্যালের প্রশস্তি। জয়দীপ বেরিয়ে এসেছিল মিস রোল্যান্ডের সঙ্গে গভীর তৃপ্তি বুকে নিয়ে।

মিস্টার আর মিসেস বেক্‌লে থাকেন মিশনের নির্দিষ্ট কোয়ার্টারে। ম্যারেড কর্মীদের জন্য একদিকে কয়েকটি ঘর নির্দিষ্ট করা আছে। ব্যাচিলাররা থাকেন একটু দূরে। একঘরে একাধিক শিক্ষার্থীর ব্যবস্থা। মেয়েদের আর পুরুষদের আলাদা আলাদা কোয়ার্টার হলেও খুব দূরে নয়। ব্যাপটিস্ট মিশন ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জীবনধর্মকেও স্বীকার করে নিয়েছে। তাই বিয়েতে নেই বাধা। অবাধে স্বামী-স্ত্রী

কাজ করতে পারেন মিশনের।

জয়দীপ ছুটির পর মিস্টার আর মিসেস বেক্‌লের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ পেল। বেক্‌লে দম্পতি খুবই সজ্জন। অতিথি আপ্যায়নের ব্যাপারে কোন ত্রুটিই রাখলেন না। নানা বিষয়ে আলাপ হল। শেষে মাঝে মাঝে চায়ের আসরে যোগ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেদিনের মত ছাড়া পেল জয়দীপ।

বাসায় ফিরে আসছিল, পথে দেখা ফ্লসির সঙ্গে।

ফ্লসি বলল, খুব চায়ের নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াচ্ছেন।

জয়দীপ অমনি বলল, তুমিও তো দেখছি ছুটির পরে খুব হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছ।

ফ্লসি মাথা নেড়ে মুখের একটা বিশেষ ভঙ্গি করে বলল, একেবারেই না।

তবে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

আপনার কোয়ার্টারে।

বিস্মিত হয়ে বলল জয়দীপ, কি রকম!

ফ্লসি বলল, আমি একা নই, সাক্ষী ছিল আর একজন।

জয়দীপ আরও বিস্মিত। বলল, কে সে?

লিডিয়া।

জয়দীপের মনে হল, নামটার ভেতর অনেক বিস্ময় জমা হয়ে আছে।

সে বলল, হঠাৎ লিডিয়াকে নিয়ে আমার কোয়ার্টারে হানা দিলে, কি ব্যাপার?

ফ্লসি বলল, আপনার কোয়ার্টারে যাওয়া বারণ নাকি?

তা কেন হবে। আমার ঘরে চিরদিন সকলের অবাধ এবং অসংকোচ বিচরণ।

একটু থেমে বলল, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলে নিশ্চয়, দেখা হল না তো?

ফ্লসি বলল, না, না, তা কেন হবে। এমনিতে আমরা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলাম।

জয়দীপ বলল, তাহলে চল, গল্প করা যাক।

ফ্লসি বলল, লিডিয়াকে ফেরার পথে ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম। আপনি নেই। বেচারা বাগানে কিছু সময় ঘুরে বেড়াল। তারপর ট্রেনের সময় হয়ে গেছে জেনে ওকে স্টেশানে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলাম।

জয়দীপ বলল, বেশ করেছ, এখন সময় থাকে তো আমার ওখানে যেতে পারো।

যেতে পারি, তবে দশ মিনিটও বসার সময় পাব না। এখুনি মিশনে প্রার্থনার ঘণ্টা পড়বে।

তাহলে আজ আর এসে কাজ নেই। সময় সুযোগ পেলে এসো আমার কোয়ার্টারে, খুশী হব।

ওরা চলতে আরম্ভ করল। ফ্লসি কিন্তু মিশনের পথ ধরল না, ও গল্প করতে করতে জয়দীপের কোয়ার্টারের দিকেই উঠতে লাগল।

জয়দীপ বলল, দেরি হয়ে যাবে না তোমার?

একটা শর্টকাট্ পথ আছে, ফিরব সে পথে। খুব কম সময়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে মিশনে।

জয়দীপ বলল, তোমাদের যাতায়াতের পথের অন্ধিসন্ধিগুলো আমারও জেনে রাখা দরকার।

সে বুনো জংলী পথ, সে পথে স্যারেদের যেতে নেই।

জয়দীপ হাসল, ভালুক বেরোয় বুঝি?

ফ্লসি চোখমুখের বিশেষ ভঙ্গি করে বলল, অসম্ভব নয়।

ওরা অনেকখানি উঁচুতে উঠে এল। এর পর নিবিড় দেওদারের দীর্ঘ গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে রোমান্টিক শিল্পীর আঁকা ছবির মত হাঁটতে লাগল। শেষ সূর্যের ভাঙাচোরা রশ্মিগুলো তখনও দেওদারের চুড়োর ডালপাতার ভেতর খেলা করছিল। নীচে ঘনিয়ে উঠছিল ছায়া। ওরা এসে ঢুকল মিঃ ব্যাভিংটনের কটেজে।

জয়দীপের খুব ইচ্ছে করছিল, আজকের ক্লাসটা ওদের কেমন লেগেছে তা জেনে নিতে। কিন্তু মনে এলেও মুখ ফুটে বলল না। শুধু বলল, তোমার দশ মিনিট সময়ের প্রায় আদ্দেক ফুরিয়ে গেল।

ফ্লসি কোন উত্তর না দিয়ে জয়দীপের সঙ্গে বাঁধানো বেদীর এক প্রান্তে বসে পড়ল।

কি যেন ভাবল। এক সময় বলল, জানেন, সময়গুলো বেশ ছোট-বড় হয়।

জয়দীপ হেসে বলল, তার মানে? সময়ের কমবেশী তো আছেই।

ফ্লসি হাসল না। সে আগের মতই দার্শনিক গলায় বলল, দেখুন, যাকে মানুষ পছন্দ করে না, তার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কাটালে মনে হয় যেন দীর্ঘ সময় অযথা খরচ হয়ে গেল। আর যার সঙ্গ মানুষ চায় তার সঙ্গে অনেকখানি সময় কাটালেও মনে হয়, সময়টা কোথা দিয়ে যেন পালিয়ে গেল।

জয়দীপ বলল, হঠাৎ একথা তোমার কেন মনে এল ফ্লসি?

ফ্লসির গলায় সেই তদগত সুর, আপনি আজ যখন ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন তখন কেন জানি না, এ কথাটাই মনে হচ্ছিল।

জয়দীপেরও মনে পড়ছিল বৈষ্ণব কবিতার এমনি কয়েকটি বিশেষ ছত্র। প্রেমিকা আসছে না, তখন তার জন্যে প্রতীক্ষার সময়গুলোকে কত দীর্ঘ মনে হয়। আবার লীলাবিলাসে সুদীর্ঘ সময় কাটিয়ে বিদায় লগ্নে মনে হয়, কোথা দিয়ে পলকে চলে গেল সময়।

জয়দীপ শুধু বলল, ক্লাসে বসে মিস ফ্লসি আর লিডিয়ার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছিল, ঘণ্টা যে আর বাজেই না।

ফ্লসি বলল, ঠিক উলটো। ঘণ্টা কখন বেজে গেছে আমরা একটুও টের পাই নি।

জয়দীপ বলল, আমার একটা বড় দোষ আছে ফ্লসি। পড়াতে গেলে সময়ের হিসেব থাকে না।

ফ্লসি হাসল। বলল, ওটাতে আমাদের লাভ।

জয়দীপ বলল, কিন্তু সব মিলিয়ে ওতে ল্যাংগুয়েজ ক্লাসের লোকসান।

ইতিমধ্যে ফুৎসো দু' কাপ চা আর এক প্লেট স্ন্যাক্স্ এনে হাজির করল।

জয়দীপ বলল, আমাদের এই শ্রীবৎসটি খুবই কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন।

ফ্লসি চোখ বড় বড় করে বলল, শ্রীবৎস!

জয়দীপ বলল, পাহাড়ী ফুৎসোকে আমি বাঙালী বৎস করে নিয়েছি।

ফ্লসি অমনি হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। ভাগ্যিস চায়ের কাপটা পাশে বসিয়ে রাখতে পেরেছিল, না হলে সারা কাপের চা চলকে পড়ত বাগানে।

ফ্লসি মেয়েটি দারুণ হাসিখুশীতে ভরা, এদিকে বুদ্ধিতে ঝলমল করছে।

এবার চা-টুকু নিঃশেষ করে উঠে দাঁড়াল ফ্লসি।

জয়দীপ বলল, কই, স্ন্যাক্স্গুলোর সদ্ব্যবহার করলে না তো?

ফ্লসি একটা স্ন্যাক্স্ হাতে তুলে নিয়ে চলতে শুরু করল।

বাগান পেরিয়ে ঢুকে পড়ল অন্ধকার ছাওয়া বনের ভেতর।

দূর থেকে ভেসে এল—একদিন এসে আপনার সব খাবার খেয়ে যাব।

জয়দীপ চেঁচিয়ে বলল, এসো।

ফ্লসির গলা অনেক দূর থেকে আবার ভেসে এল, আসব।

বনে পাহাড়ে সামান্য কথার কি অসমান্য প্রতিধ্বনি ওঠে। মনে হয়, কথাগুলো পাহাড়ের গুহা কন্দরে, বনের গভীর গোপনে লুকোচুরি খেলছে। লোকালয়ে যে কথার মূল্য বোঝা যায় না, নিভৃত নিরালায় বোঝা যায় তার শক্তি, তার মূল্য কতখানি।

সারা সন্ধ্যা জয়দীপ ফুৎসোকে নিয়ে রইল। রান্নাঘরে গিয়ে লাগল তার পেছনে। বলল, লোকজনকে নেমন্তন্ন করলে কি রান্না করে খাওয়াবে বৎস?

ফুৎসো বলল, অনেক রকম রান্না জানি আমি। আমার বাবা স্নো-ভিউ হোটেলে রসুইখানায় কাম করে।

জয়দীপ বলল, তাহলে বৎস, তুমি লিভার কাবাব আলবৎ বানাতে পারবে?

একটু থেমে ফুৎসো বলল, ওটা বানানো কিছু শক্ত না, তবে আমার জানা নেই।

জয়দীপ বলল, বেশ, বেশ, আর একটা বলি তাহলে, ওটাও তেমন কিছু শক্ত রান্না নয়। নারগিসি কোপ্তাকারি তোমার জানা আছে নিশ্চয়?

জবাব দিতে মুহূর্তকাল দেরি হল না ফুৎসোর। বলল, পিতাজী কি আর না জানে, শিখে নেব।

জয়দীপ বলল, ঠিক, একজন কেউ জানলেই হল। তারপর ওর কাছ থেকে সবাই জেনে নেবে, কি বল?

ফুৎসো প্রবল বেগে মাথা নাড়তে লাগল।

জয়দীপ বলল, সব ক'টা রান্নার ব্যবস্থা মোটামুটি হয়ে রইল, এখন আর একটাই শুধু বাকী। বল তো ফুৎসো, তুমি ডিম দিয়ে কেমন করে ডালনা বানাবে?

ফুৎসো বলল, ও আমি বানাতে জানি। ডিমের কারি বানাতে জানি, ডাল তো রোজ বানাই। দো চিজ মিলায়ে দিলে ডালনা হয়ে যাবে।

কালকের পড়াটায় চোখ বোলানো দরকার ভেবে রান্নাঘর থেকে স্টাডিতে ঢুকল জয়দীপ। মিঃ ব্যাভিংটনের শেল্‌ফ থেকে রামায়ণখানা টেনে বের করল। বনবাস পর্ব থেকে পড়াতে হবে। বইখানা হাতে নিয়ে প্রথমে যে মুখখানা ভেসে উঠল সে মুখ সীতার নয়, ফ্লসিরও নয়, লিডিয়ার।

লিডিয়া আজ এ ঘরে এসেছিল, এই অনুভূতিটুকু কেমন যেন রোমাঞ্চকর মনে হল। আচ্ছা, কি কথা হত তার সঙ্গে, কি বলত সে! নিশ্চয় কথায় কথায় আজকের বাংলা ক্লাসের প্রসঙ্গ উঠত। জয়দীপ ভাবল, লিডিয়ার মনে শকুন্তলা কি কোন ছায়া ফেলতে পেরেছে? না, নিছক পড়ার জন্যেই পড়া! ভাল লাগাটা শিক্ষকের কথা বলার সুন্দর কৌশল ছাড়া বোধ করি আর কিছু নয়।

লিডিয়ার মুখখানা বার বার চোখের ওপর ফুটে উঠছিল জয়দীপের। সে মুখে সুদূর অতীত গ্রীসের আশ্চর্য শ্বেতপ্রস্তর কমনীয়তা।

এক একটি মুখ হাজার বার দেখেও মনে ধরে রাখা যায় না, আবার একটি মুখ শুধু একবার চোখের সামনে এসে চিরদিনের ছবি হয়ে যায়।

সে রাতে ঝড় উঠেছিল। কাচের সার্সির ওপারে কে যেন এসে নাড়া দিয়ে তার আগমনের কথাটা জানিয়ে দিল। কনভেন্টের শোবার ঘরে কম্বলের তলায় তখন নানেরা গভীর ঘুমে অচেতন। ঘুম আসে নি শুধু একজনের চোখে। সে বিছানায় শুয়ে তাকিয়েছিল জানালার দিকে। প্রথম রাতে চাঁদ উঠেছিল। সামনের উপত্যকার কোল ঘেঁষে যে গাছের সারি নেমে গেছে, তাদের মাথায় ছুঁয়েছিল এক ধূসর রহস্যময় আলো। সেদিকে তাকিয়ে লিডিয়ার মনে আসছিল পাপপুণ্যের কথা। সংযত জীবনে কোথা থেকে এসে উদয় হল যত এলোমেলো সব চিন্তা। দুষ্মন্তের ডাকে কেন সাড়া দিল শকুন্তলা? সে তো শুদ্ধাচারিণী আশ্রমকন্যা! আশ্রমের কাজে অন্য দু'টি সখী আর মা গৌতমীর সঙ্গে সে তো আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারত তার জীবনটুকু। কেন তাহলে সে নিতে গেল সংসার বন্ধনের দুঃখ?

তার মনে হল, এ দুঃখ বইতে কি কোন সুখ আছে? সংসারীরা কি সমস্ত দুঃখের মাঝেও সুখ বোধ করে? সে ঐ সুখের স্বাদ জানে না। অকাশে মেঘে ঢাকা চাঁদের রহস্যময় আলোর মত সংসারের সুখের ছবি তার কাছে অস্পষ্ট।

মা-বাবার বিশৃঙ্খল সংসারের ছবিটা তার অনেকদিন পরে মনে পড়ল। মা অপেরায় গান গাইতেন। ফিরে এলে মাতাল হয়ে বাবা তাঁকে সামান্য কথায় প্রচণ্ডভাবে মারধর করতেন।

একদিন তাকে তার মা রেখে এসেছিলেন কনভেন্টে। সেই থেকে সে কনভেন্টে মানুষ। আদর্শ জীবনের নিয়ম-শৃঙ্খলায় বাঁধা। দু'একবার মায়ের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। বিবাহ বিচ্ছেদের পর তিনি নতুন জীবন শুরু করেছিলেন।

কৈশোরের এসব স্মৃতি সংসার জীবন সম্বন্ধে তাকে বিমুখ করে তুলেছিল।

কিন্তু আজ তার চব্বিশটি বছরের একান্ত সংযত জীবনে কেন এমন করে এসে আছড়ে পড়ল নতুন ভাবনার ঢেউ?

যখন ঝড় শুরু হয়ে গেল বাইরে, তখন ভাবনার ঝড় উঠেছে তার মনের আনাচে-কানাচে। ঝড় যখন ঘনিয়ে উঠল তখন কাচের সার্সিতে কার যেন হাতের সাড়া পেল সে। মনে হল, এই প্রবল ঝড়ের পথ পেরিয়ে কে যেন এসে তাকে ডাক দিচ্ছে। একটা চাপা গলার স্বরে যেন তার নাম বেজে উঠল, লিডিয়া, লিডিয়া।

এ স্বর যেন তার অচেনা নয়, অস্পষ্ট স্বরটা যেন অনেক স্পষ্ট হয়ে তার বুকের ভেতরে প্রতিধ্বনি তুলছে। তাকে যেন বলছে, লিডিয়া, তুমি বেরিয়ে এস। দেখ, সারা উপত্যকা জুড়ে কি আশ্চর্য ঝড়ের খেলা শুরু হয়ে গেছে। এ খেলা একা একা দেখে তৃপ্তি নেই লিডিয়া। দু'জনে হাতে হাত বেঁধে বনের ভেতর ছুটতে ছুটতে, পাহাড়ের বিপজ্জনক খাঁজে লাফাতে লাফাতে, তিস্তা, রঙ্গীত নদীর সঙ্গমে লুটোপুটি করতে করতে দেখব। তুমি চলে এস, চলে এস লিডিয়া পুরাতন পাথরের দুর্গটাকে পেছনে ফেলে।

লিডিয়া অঝোরে কাঁদতে লাগল। বাইরের আকাশের সমস্ত কান্না তার চোখের জলে ঝরে পড়ল। সে এই প্রথম অনুভব করল, চোখের জল ঝরানোতে কত সুখ। সারা রাত ঝড় চলল। সারা রাত লিডিয়া শুনল বাইরের জানালায় ঝড়ের অতিথির আকুল দীর্ঘশ্বাস আর করাঘাত। কিন্তু লিডিয়া বুকে সেটুকু শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারল না, যাতে সাহস করে বন্ধ সার্সিটা খুলে দেওয়া যায়।

পরদিন অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন একটা ভোরে লিডিয়া জেগে উঠল। যেন একটা বিষণ্ণ ছায়ার মণ্ডলে থেকে সে তার অভ্যস্ত কাজগুলো করে গেল। তারপর সময় হলে বেরিয়ে পড়ল ল্যাংগুয়েজ ক্লাসে। কনভেন্ট থেকে বেরিয়ে পথ চলতে চলতে সে দেখতে পেল রাতের ঝড়ে অজস্র পাহাড়ী গোলাপ লুটিয়ে পড়ে আছে। পথ দিয়ে ল্যাংগুয়েজ ক্লাসের দিকে উঠে আসছিল লিডিয়া, জয়দীপ স্টাডির জানালা দিয়ে তাকে দেখতে পেল। সেও তৈরি হচ্ছিল ক্লাসে যাবার জন্যে। লিডিয়াকে দেখে মনটা তার খুশী হয়ে উঠল। মনে হল, ওপর থেকে ওকে ডাক দেয়, কিন্তু সে ডাকতে পারল না। একবার শুধু স্বরহীন গলায় ডাক দিল। তারপর নিজের ছেলেমানুষির জন্য নিজেকে শাসন করল।

জয়দীপ চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল লিডিয়ার চলার ছন্দ। কেমন স্বচ্ছন্দ আর সুবিন্যস্ত ভঙ্গিতে চলেছে সে। তার হঠাৎ মনে হল, লিডিয়া কি একবারটিও তার কোয়ার্টারের দিকে তাকাবে না! নিজের মনকে আবার সান্ত্বনা দিল সে এই ভেবে যে আপন মনে পথ চলতেই নানেরা অভ্যস্ত। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তারা এগিয়ে যায়, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় এমন কাজ তারা করে না।

জয়দীপের ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা আজ উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় প্রতিটি প্রহর গুনছে। কখন শুরু হবে তরুণ অধ্যাপকের বাংলা ক্লাসটি। প্রথম দু'টি পিরিয়ড ব্যাকরণের ক্লাস নিয়েছেন প্রিন্সিপাল রোল্যান্ড স্বয়ং। অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর। কিন্তু ব্যাকরণের দুরূহ তত্ত্বে আর মন বসছে না শিখার্থীদের। শুধু প্রতীক্ষা, কখন দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজবে, শুরু হবে তৃতীয় পিরিয়ডে রামায়ণের ক্লাস। নতুন অধ্যাপক কথা বলবেন, আর তারা ভেসে যাবে সেই ভাবনার স্রোতে।

জয়দীপ ক্লাসে ঢুকল। সুদর্শন তরুণ। উজ্জ্বল দীপ্ত দু'টি চোখ। এক পলকে দেখে নিল, লিডিয়া আর ফ্লসি বসে আছে পাশাপাশি। লিডিয়া শান্ত দু'টি চোখ মেলে তারই দিকে তাকিয়ে আছে। সমস্ত মুখে চোখে ফুটে উঠেছে একাগ্রতা।

জয়দীপ বলল, জীবনে কেউ পায় সুখের সন্ধান আবার কেউ বা হয় অনন্ত দুঃখ পথের যাত্রী। কিন্তু রামায়ণের সীতা সুখ-দুঃখ সমানভাবে আস্বাদন করেছিলেন। রাজকন্যা, রাজ কুলবধূ বনবাসিনী হলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাহাকারে ভরে গেল অযোধ্যা আর মিথিলা নগরী। এ দুঃখ অসহনীয়। জনকের গৃহে যিনি কাটিয়েছেন কন্যার আনন্দলীলায়, বধূ হয়ে যিনি এসেছেন অযোধ্যার অন্তঃপুরকে উজ্জ্বল করতে, সহসা তাঁকে সব আনন্দ আভরণ খুলে ফেলে চলে যেতে হল স্বামীর সঙ্গে বনবাসে। রাজগৃহে প্রতিপালিতার কাছে অরণ্য সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক। সেখানে নতুন করে শুরু করতে হবে জীবন, গড়ে তুলতে হবে আশ্রয়।

কিন্তু আমার মনে হয়, রামায়ণকার এই বনবাস পর্বেই সীতাকে দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি সুখের সন্ধান।

রাজগৃহের সুখে আছে ভোগবিলাসের পরিতৃপ্তি, দাসদাসীর সেবাযত্ন আর যুবরাজবধূর মনে প্রচ্ছন্ন গৌরববোধ। কিন্তু বনবাসে বাইরের আড়ম্বর অদৃশ্য হল। রাম তাঁর রাজপোশাক খুলে ফেলে সাধারণ এক মানুষে রূপান্তরিত হলেন। তাঁর দু'টি বলিষ্ঠ বাহু সংসারের সকল কাজে নিযুক্ত হল। তিনি লক্ষ্মণের সঙ্গে মিলিত হয়ে পর্ণকুটীর নির্মাণ করলেন, পম্পা সরোবর থেকে পানীয় সংগ্রহ করলেন,

আহরণ করলেন বৃক্ষ থেকে আহার্য ফলসামগ্রী।

স্বামীর পরিশ্রমের অমৃত ফল পেলেন সীতা। রাজগৃহের রন্ধনশালায় শত শত পাচকের প্রস্তুত সুখাদ্য কি এর সমতুল্য আনন্দ দিতে পারত সীতাকে ?

অরণ্যের প্রভাত সন্ধ্যা কি মনোরম ঐশ্বর্যে পূর্ণ! বন বিহঙ্গের কাকলিধ্বনিতে রামসীতার নিশি প্রভাত হয়। পর্ণকুটীরের চারিদিকে ময়ূর-ময়ূরী বিচরণ করে নিঃশঙ্ক চরণে। হরিণ-হরিণী আসে শিশু শাবক সঙ্গে নিয়ে। এদের সবার সঙ্গে সীতার সখ্যতা। এখানে হিংসা কুটিল রাজগৃহের জটিল ষড়যন্ত্রের কোন চিহ্ন নেই। কি নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ততায় সীতা যান পদ্ম-ভরা পম্পা সরোবরে স্নান করতে। অপরাহ্ণে শ্রীরাম বনকুসুমে সাজিয়ে দেন সীতাকে। একান্ত সান্নিধ্যে বসে শ্রুত অধীত কত কথা কত কাহিনী বলতে থাকেন প্রিয়তমা পত্নীর কাছে।

স্বামীর পরিপূর্ণ সান্নিধ্যে সীতার চোখে নেমে আসে বনবাসের রাত্রিগুলি, কখনও ঘন অন্ধকারে অবলুপ্ত, কখনও জ্যোৎস্নার আলোয় উজ্জ্বল। অযোধ্যার রাজগৃহে সমস্যাজর্জর রামচন্দ্রের রাত্রিবাস কি এর চেয়ে মধুর হতে পারত ? সীতা কি পেতেন ভাবনামুক্ত একটি বলিষ্ঠ পুরুষের এমন নিবিড় বাহুবন্ধন ?

তাই বলছিলাম, সীতা বনবাসে এসে সুখের সহজ আর সত্য রূপটিকে দেখেছিলেন। আকণ্ঠ পান করেছিলেন জীবনের আনন্দরূপ অমৃতকে।

এর পর শুরু হল তাঁর দুঃখ। রামায়ণকার সুখকে চেনালেন, এবার দুঃখের দ্বারটি খুলে দিলেন। জীবন শুধু সুখকে নিয়ে নয়, সেখানে আছে দুঃখের বিরাট এক ভূমিকা। ভালবাসার বাঁধনে দু'টি প্রাণকে জড়িয়ে বিচ্ছেদের দহনে ছিন্ন করলেন সে বাঁধন। শুরু হল সীতার সত্যিকারের পরীক্ষা। আগুনে সোনার অলঙ্কার ফেলে দিলে তার খাদ চলে যায়, তখন যা পাওয়া যায় তা একেবারে শুদ্ধ সোনা। জানকী এবার জীবনের সেই অগ্নিপরীক্ষায় নামলেন।

ঘণ্টা পড়ল। কোন চোখের দৃষ্টি আজ চঞ্চল নয়। সব চোখ অপলক হয়ে থেমে আছে জয়দীপের মুখে।

ক্লাস ছেড়ে চলে গেল জয়দীপ। যেন পঞ্চবটীর এক মনোরম অরণ্য চোখের সামনে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেল সে। পরের ক্লাসগুলিতেও সে ছবি মুছে গেল না। আজ আর ক্লাস শেষে কোথাও আলাপের মাঝে আটকে পড়ল না জয়দীপ। সোজা কোয়ার্টারে চলে এল। এসেই ফুৎসোকে বলল, তিন-চার কাপ চায়ের জল চড়াও বৎস।

ফুৎসো একবার প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন পড়ে নেবার চেষ্টা করল। তারপর বলল, বাজার থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসব কি ?

জয়দীপ বলল, বাড়িতে কিছু নেই?

ফুৎসো চোখ দুটো বন্ধ করল হাসতে গিয়ে। বলল, তিন-চার জনের স্টক নেই বাবুজী। বলেই পয়সা নিয়ে ফুৎসো ছুটল বাজারের পথে।

জয়দীপ পোশাক বদলে বসল বাগানের মাঝখানে। চোখ দুটো পেতে রাখল নীচের রাস্তার ওপর। ওর কেন জানি না মনে হল, আজ লিডিয়া ফেরার পথে ফ্লসির সঙ্গে অন্ততঃ কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার কোয়ার্টারে আসবে।

কিছুক্ষণ অধীর অপেক্ষার পর ওদের দু'টি বান্ধবীকে দেখা গেল অকল্যান্ড রোডের ওপর। চোখাচোখি হবার আশঙ্কায় জয়দীপ সরে দাঁড়াল ওদের চোখের আড়ালে। তারপর আড়াল থেকে দেখতে থাকল ওদের। প্রতিটি মুহূর্তে দু'টি বান্ধবীর দিক পরিবর্তনের আশায় সে প্রহর গুনছিল।

ওরা পথের ওপর থমকে দাঁড়াল। ফ্লসি একবার তাকাল ওপরের কোয়ার্টারের দিকে। কি যেন কথা হল ওদের ভেতর। তারপর যেমন চলছিল, তেমনি হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল স্টেশানের দিকে।

আশাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে গভীর অভিমানবোধ জাগল জয়দীপের মনে। নিজের চাঞ্চল্যের জন্য দারুণভাবে শাসন করল নিজেকে। মনে মনে বলল, যতই ভাল লাগুক, নিজের আত্মসম্মানকে এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া চলবে না তার।

বেশ কিছু সময় সে কাটাল শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে। কত এলোমেলো ভাবনা এল তার মনে। বিছানায় দেহখানা এলিয়ে দিলেই জয়দীপ দেখেছে রাজ্যের ভাবনা এসে জড়ো হয় তার মগজে।

কিছু সময় পরে সদরের গেট খোলার আওয়াজ এল তার কানে। ফুৎসো আসছে খাবার নিয়ে। হাসি পেল জয়দীপের। মানুষ পাগলের মত কি যা তা সব ভেবে বসে। কোথায় অতিথি তার দেখা নেই, হয়ে গেল অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা।

ঘরে অনেকক্ষণ কেউ ঢুকল না। হঠাৎ দরজার কাছে ফ্লসির গলা বেজে উঠল, শরীর ভাল আছে তো আপনার?

জয়দীপ লক্ষ্য করল ফ্লসির গলায় উদ্বেগের সুর। অসময়ে বিছানা নেবার জন্য বোধ করি সে উদ্বিগ্ন হয়েছে।

জয়দীপ ফ্লসির অকারণ শঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়ে হেসে উঠল। বলল, আমি বিছানা নিয়েছি বলে তুমি মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলে, তাই না?

ফ্লসি বলল, ঠিক তাই।

বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ঘরে এসে বস।

ফ্লসি ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে বসল।

জয়দীপ বলল, যে কোন কারণেই হোক, প্রিয়জনেরা উদ্বিগ্ন হলে এক ধরনের তৃপ্তি পাওয়া যায়।

ফ্লসি বলল, তা জ্বরজারি ডেকে এনে আমাদের উদ্বিগ্ন করে আশা করি তৃপ্তি পাবার চেষ্টা করবেন না।

হাসল জয়দীপ। বলল, তৃপ্তি কোন্ পথে আসে তা কি বলা যায়।

ফ্লসি বলল, জানেন আজ লিডিয়াকে এত ডাকলাম, কিন্তু কি যে হয়েছে ওর এল না। কাল নিজেই এসেছিল, কিন্তু আপনার দেখা পাওয়া যায় নি।

জয়দীপ বলল, কনভেন্টে ফেরার তাড়া থাকে, তাই ওর পক্ষে বোধহয় কোথাও বসে যাওয়া সম্ভব হয় না।

ফ্লসি বলল, ব্যাপারটা তা নয়। আজ ক্লাসে ঢোকা অব্দি প্রায়ই ও চোখ মুছছে। ওর এই ভাবান্তর আর কারো চোখে না পড়ুক আমার চোখ এড়ায় নি।

জয়দীপ বলল, চোখের কোন ডাক্তারকে দেখানো দরকার।

ফ্লসি হেসে বলল, যতদূর মনে হয় ওটা মনের রোগ, চোখের ডাক্তারের এক্তিয়ারের বাইরে।

জয়দীপ আর কিছু মন্তব্য করল না দেখে ফ্লসি আবার বলল, জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বলতে চায় না কিছু। খুব ভাল মেয়ে ও, বানিয়ে ও বলতে পারে না।

জয়দীপ বলল, বানিয়ে বলতে ফ্লসি কি নিজেকে খুব নিপুণ বলে মনে করে?

ফ্লসি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এ রকম আক্রমণ করলে এখান থেকে পালানো ছাড়া আমার পথ নেই।

আরে বস, বস, অমন রাগ করছ কেন? বলেই ফুৎসোকে হেঁকে বলল, চা নিয়ে এস বৎস, কিছু খাবার তার সঙ্গে। সিস্টার ক্লাস করে এসেছে, কিছু খায় নি।

ফ্লসি চেয়ারে বসতে বসতে বলল, কি বানিয়েই না আপনি কথা বলতে পারেন। বলুন, নিজের খুব ক্ষিদে পেয়ে গেছে। আমি মিশন থেকে না খেয়ে এক পা-ও নড়ি না কোথাও।

জয়দীপ বলল, তা হোক, এসো, সামান্য জলযোগ করা যাক্। একা একা খেতে কি ভাল লাগে। এতকাল বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে খেয়ে-খেয়ে বেড়িয়েছি। বিশেষ করে খাবার বেলা বড্ড মনে হয় ওদের কথা। কেমন যেন একা একা লাগে।

ফ্লসি বলল, এমন করে লোভ দেখালে রোজ ক্লাসের পর পালিয়ে আসতে হবে আপনার এখানে। ভাগ বসবে আপনার রোজকার জলখাবারে।

জয়দীপ বলল, তাতে ক্ষতি নেই, বরং লাভ। প্রথম লাভটা আমার, কারণ অতিথির সঙ্গে বসে খাবার আনন্দটা পাওয়া যাবে। আর দ্বিতীয় লাভ দোকানদারের। খাবার সাপ্লাই করে সে দু'পয়সা লাভ

করবে।

ফ্লসি বলল, দারুণ হিসেবী তো আপনি। এত সব ভেবেচিন্তে কাজ করেন?

একা মানুষ আমার জন্যে ভাবনার তো কেউ নেই। পাছে কেউ ঠকিয়ে নেয়, সেই ভয়ে আগে ভাগে ভেবে সব দিক বেঁধে রাখি।

ফ্লসি বলল, আপনার বাড়িতে কেউ নেই?

কাছের মানুষ, মানে আপনজন বলতে তেমন কেউ নেই।

ফ্লসি কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর একেবারে অন্য প্রসঙ্গ তুলে বলল, একটা সুখবর আছে।

জয়দীপকে উৎসুক চোখে তাকাতে দেখে ফ্লসি বলল, এত সহজে সুখবরগুলো পাওয়া যাবে না, তাতে খবরের মূল্য কমে যায়।

জয়দীপ বলল, না বললে আমি কেমন করে জানব খবরটা 'সু' কিনা?

ফ্লসি বলল, এ জন্যে কিছু উপহার কবুল করুন।

আমার ক্ষমতার বাইরে না হলে দেব।

সত্যি হিসেবী আপনি। উপহার দেবার বেলাতেও কেমন ঘাটঘুট বেঁধে নিচ্ছেন।

জয়দীপ হাসল।

ফ্লসি বলল, শুধু হাসিতে হবে না, একটা কিছু ভাল জিনিস দিতে হবে।

তোমার না আমার চয়েস?

উপহার নির্বাচনের ভার আপনারই থাক।

জয়দীপ বলল, এবার কথাটা শুনতে পারি কি?

ফ্লসি মুখখানা অনেকটা এগিয়ে নিয়ে এসে বলল, আপনি দারুণ পড়ান!

ও, এই খবর।

ফ্লসি বলল, তার মানে এটা সামান্য খবর হল! সারা মিশনে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন আপনি। প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ড খবর পেয়ে গেছেন। তিনি আমাকে আর লিডিয়াকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছেন ব্যাপারটা।

কি বললে তোমরা?

ফ্লসি বলল, লিডিয়ার মন্তব্য হল, ওঁর পড়া শোনার সময় আমরা পুরোপুরি অন্য জগতের মানুষ হয়ে যাই।

জয়দীপ আশ্চর্য এক অনুভূতির ছোঁয়ায় ডুবে রইল।

ফ্লসি এবার বলল, কই, আমার মন্তব্যের কথা তো জিজ্ঞেস করলেন না?

জয়দীপ অমনি বলল, তোমার মন্তব্য শোনার জনোই তো আমি কান পেতে আছি।

থামুন, মিছে কথা আর বলতে হবে না। এখন শুনুন, আমি বলেছি, ওঁর পড়ানো একটুও ভাল লাগে না।

জয়দীপ বলল, মিছে কথা শুধু আমিই বলি না, আরও কেউ কেউ বলে থাকে।

কি করে বুঝলেন মিছে কথা? এত আত্মবিশ্বাস নিজের ওপর? আপনি নিজে জানেন, কতখানি ভাল আপনি পড়ান?

জয়দীপ বলল, কাল তুমি কথায় কথায় নতুন মাস্টারমশায়ের পড়ানোর সুখ্যাতি করে গেছ। আজ কথা প্রত্যাহার করে নিলে চলবে কেন?

আপনার কাছে হেরে গেলাম। উপহার পাওয়ারও আর কোন আশা রইল না আমার।

জয়দীপ বলল, যারা হার মেনে নেয়, তাদের আমি উপহার দিতে ভালবাসি।

ফ্লসি অমনি হাত পেতে বলল, দিন।

জয়দীপ মিঃ ব্যাভিংটনের পড়ার ঘরে উঠে গেল। কিছুক্ষণ পরে নিয়ে এল কয়েক টুকরো কাগজ। প্রথম রাতে যে হাইকুগুলো অনুবাদ করেছিল তার কয়েকটা ফ্লসির হাতে তুলে দিয়ে বলল, অনুবাদগুলো যদি পছন্দ হয়, ওর থেকে যে কোন একটা নিতে পারো।

ফ্লসি কাগজগুলো প্রায় লুফে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগল।

জয়দীপ ফ্লসির মুখের ছবির দিকে চেয়ে রইল।

পড়া হলে বলল, যে কোন একটা নিতে পারি বলছিলেন কেন? এর সব ক'টাই আমার।

জয়দীপ বলল, এখন সবে কাজের শুরু, মাইনে পেতে এখনও পুরো একটি মাস দেরি। এ সময় কাউকে কোন উপহার দিতে হলে গিফ্‌ট হাউসে যাবার সামর্থ্য আমার নেই। তাই দু'চারটে কবিতা অনুবাদ করে রেখেছি। দরকার মত উপহার দেওয়া যাবে।

ফ্লসি বলল, বেশ, আমি একটা রেখে বাকীগুলো দিতে পারি, কিন্তু তার আগে বলতে হবে, এ ধরনের উপহার আপনি আর কাকে দেবেন বলে ভেবেছেন।

এই দেখ বিপদ, আমি কি উপহারের পাত্রপাত্রীদের আগাম বেছে রেখেছি নাকি?

ফ্লসি নিজের ব্যাগে তিনটে অনুবাদই ভরে নিতে নিতে বলল, তাহলে সব ক'টাই এখন রইল আমার জিম্মায়। দরকার মত আমার কাছে চাইলেই পাবেন।

বলেই উঠে পড়ল ফ্লসি।

জয়দীপ বলল, কেমন লাগল অনুবাদগুলো, বললে না তো?

বাছাই ছাড়া আমি কোন জিনিসই ব্যাগে ভরি না।

একটু থেমে বলল, এই হাইকুগুলো আমার পড়া। কিন্তু আপনার অনুবাদ মুখস্থ করে রাখার মত।

আজ এসো, আর বেশী প্রশংসা কর না, নিরেট মাথাটা খারাপ হয়ে যেতে কতক্ষণ।

সে রাতে লিডিয়া খুব সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখল।

কোথায় যেন সে চলেছে। তার সামনে যে মানুষটি রয়েছে, তার মুখখানা সে দেখতে পাচ্ছে না। তবে চেহারাটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

অনেক পথ পেরিয়ে তারা একটা বনের ভেতর এসে পড়ল। কত ছায়া, কত ফুল, কত পাখির গান। এক জায়গায় বন পাতলা হয়ে এল। সামনে একটা ছোট্ট সরোবর। পদ্ম ফুটে আছে। হাঁসেরা ঢেউ তুলছে। দুটো হরিণ বাচ্চা নিয়ে জল খেতে এল সরোবরে। চারদিকে যেন খুশীর হাওয়া বইছে।

সামনের মানুষটি হঠাৎ তার দিকে ফিরে বলল, লিডিয়া, এখানে আমরা ঘর বাঁধতে পারি। লিডিয়া তাকাল মানুষটার মুখের দিকে। হঠাৎ একটা চমক লেগে তার ঘুমটা ভেঙে গেল।

শেষ রাতে ঘুম এলো না লিডিয়ার চোখে। স্বপ্নের কথা ভাবতে গিয়ে তার দু'চোখ ভরে জল এল। মাথার বালিশ ভিজে গেল চোখের জলে। কেন প্রভু যীশু তাকে এমন দুঃসহ পরীক্ষায় ফেললেন। সে ধীরে ধীরে উঠে গেল প্রেয়ার হলে। যীশুর মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে বসল।

'I am Wearied with groaning ;
All night long my pillow is wet with tears,
I soak my bed with weeping,
Grief dims my eyes ;
They are worn out with all my woes.
Be merciful to me, O Lord, for I am weak ;
Heal me, my very bones are shaken ;
My soul quivers in dismay.'

পরের দিন ক্লাস শেষ হলে ছাত্রছাত্রী আর প্রফেসারেরা মিলে টেনিস গ্রাউন্ডে চলল। শুরু হবে ট্যুরনামেন্ট। ওরা সবাই টানাটানি করতে লাগল জয়দীপকে। অ্যাপ্লিকেশানে জয়দীপ লিখেছিল, খেলাধুলোতে তার আগ্রহ আছে। যথাসময়ে প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ড প্রচার করে দিলেন সে কথা।

জয়দীপ বোঝানোর চেষ্টা করল তার র‍্যাকেট, জুতো কিছুই নেই, সে খেলবে কি করে?

ফ্লসির উৎসাহ এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি। সে বলল, র‍্যাকেট আর জুতো কোন সমস্যাই নয়। ট্যুরনামেন্ট শুরু হবে পরশু, সুতরাং হাতে আজ কাল দু'দিন সময় আছে। শহরের বাজারে গিয়ে জুতো

কিনে আনা যাবে। খেলার ঘরে র‍্যাকেট মজুত আছে। যদি দরকার পড়ে তাহলে একখানা কিনে আনতেও কোন অসুবিধে হবে না। আজ আর কাল প্র্যাকটিস গেম, এক-আধটু খেলে নিলেই চলবে।

প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ডের সমান আগ্রহ জয়দীপকে খেলাবার। দু'তিন বছর তারা হেরেছে সেন্ট জোসেফস্ কলেজ আর সেন্ট পলস্ স্কুলের ছাত্র-অধ্যাপকদের কাছে। এবার নতুন মানুষ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে চান প্রিন্সিপ্যাল।

ফ্লসি মিস রোল্যান্ডের পারমিশান যোগাড় করল। বলল, আজ প্রফেসার বোসের কাজ নেই প্র্যাকটিস গেম খেলে। আমি ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি টাউনে। যা দরকার আজই সব কিনে আনব। কাল পুরোদমে প্র্যাকটিস চলবে।

ফ্লসির ওপর অগাধ ভরসা মিস রোল্যান্ডের। কারণ ফ্লসিই ড্রামা, খেলাধুলো, সব উৎসাহের উৎস।

চলে গেল ফ্লসি জয়দীপকে সঙ্গে নিয়ে। বলে গেল, ফিরতে দেরি হতে পারে।

কিছু পথ এসেই কিন্তু ওরা ধরে ফেলল লিডিয়াকে। আজ ক্লাস শেষে ও একাই ফিরছিল।

ফ্লসি ওর হাত দুটো নিজের দুটো হাতের ভেতর ধরে নিয়ে বলল, দেখলে তো তোমাকে কত ভালবাসি, খেলা ফেলে ছুটে এলাম।

জয়দীপ ফ্লসির এই মিথ্যা অভিনয়টুকু মৃদু হেসে উপভোগ করল।

লজ্জা পেয়ে গেল লিডিয়া। ওকে জয়দীপের সামনে যেভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে ভালবাসার কথা বলছে ফ্লসি, তাতে লজ্জা পাবারই কথা।

ওর এই সলজ্জ মিষ্টি হাসিটুকু জয়দীপের মনে দোলা দিয়ে গেল।

জয়দীপ বলল, আজ মনে হচ্ছে গাড়ি পেতে তোমার অসুবিধে হবে লিডিয়া।

সেই প্রথম কথা লিডিয়ার সঙ্গে জয়দীপের।

লিডিয়া তাকাল জয়দীপের দিকে। দু'চোখে সম্ভ্রমের দৃষ্টি। বলল, স্টেশানে ফোন করে জেনেছি, গাড়ি দেড় ঘণ্টা লেটে রান করছে।

ফ্লসি বলল, আমাদের সঙ্গে যদি হেঁটে যেতে চাও তাহলে গাড়ির আগেই তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।

লিডিয়াকে অবাক্ হয়ে তাকাতে দেখে ফ্লসি বলল, সব কথা জানতে চেও না, একটু বিশ্বাস রেখো বন্ধুর ওপর। তা ছাড়া প্রফেসার বোস রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। আমার ওপর না রাখলেও তাঁর ওপর ভরসা রাখতে পারো।

আবার মিষ্টি করে হেসে ফ্লসির হাতে মৃদু চাপ দিল লিডিয়া।

জয়দীপ বলল, তোমরা আমার একটা কথা শোন। আমার কোয়ার্টার এখনও বেশি দূর ছাড়িয়ে আসি নি। ওখানে ফিরে গিয়ে সবাই মিলে একটু টিফিন করে নিই। তারপর পুরোদমে হেঁটে পৌঁছে যাব টাউনে।

লিডিয়া তাকাল ফ্লসির মুখের দিকে।

জয়দীপ বলল, তোমার কি খুব দেরি হয়ে যাবে লিডিয়া?

লিডিয়া আবার নীল দুটো চোখের তারা জয়দীপের মুখের ওপর ফেলল। তারপর কোন কথা না বলে মাথা নেড়ে জানাল, তার দেরি হয়ে যাবে না।

ওরা ওপরের পথ ধরল। একটা ঝর্নার ওপর দিয়ে সাবধানে পার হয়ে যেতে হবে। এ পথে আগে কিন্তু যাওয়া-আসা করে নি জয়দীপ। এটি ফ্লসির আবিষ্কৃত নতুন পথ। ঝর্না পার হবার সময় ক্ষিপ্র পায়ে পার হয়ে গেল ফ্লসি। লিডিয়া অতি সাবধানে তার পোশাক সামলে পার হচ্ছিল। টলছিল তার পা। কাছে এগিয়ে গিয়ে জয়দীপ বলল, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি লিডিয়া?

লিডিয়া ঐ অবস্থায় একটা টুকরো পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে তাকাল জয়দীপের দিকে। তারপর জয়দীপের প্রসারিত হাতখানা ধরল ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে। ততক্ষণে ওপারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ফ্লসি। সে হঠাৎ হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল ওদের, গুড্ লাক্।

ঝর্না পেরিয়ে এসে জয়দীপ ছেড়ে দিল লিডিয়ার হাত। বোধ হয় আর ধরে রাখা যায় না বলেই

হাতটা ছাড়তে হল তাকে। কিন্তু হাত ছেড়ে দিয়েও তার মনে হল, তার হাতের মুঠোয় তখনও লিডিয়ার হাত ধরা আছে।

ওদিকে ফ্লসি লিডিয়ার একখানা হাত পাকড়ে নিয়ে চলতে শুরু করেছে। পিছনে চলেছে জয়দীপ। লিডিয়ার কানের কাছে ফিসফিস করে কি যেন বলল ফ্লসি। এক টুকরো কথা ভেসে এল, হাউ ডু ইউ ডু ফিল?

হাসি ছড়াচ্ছে ফ্লসি। মাথা নেড়ে লিডিয়া যেন বলছে, নো, নো, ও নো।

ওরা এসে পৌঁছল জয়দীপের কোয়ার্টারে। ফ্লসি আগে-ভাগে দৌড়তে দৌড়তে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। ঘর থেকেই চেঁচিয়ে বলল, বাগানে বসুন আপনারা, আমি চটপট চায়ের ব্যবস্থা করে নিয়ে আসছি।

লিডিয়া আর জয়দীপ এসে বসল বাগানের বাঁধানো চাতালে।

জয়দীপ বলল, আগে একদিন তুমি এসে ফিরে গেছ লিডিয়া, আমার খুব খারাপ লাগে সে-কথা ভেবে।

লিডিয়া ব্যস্ত হয়ে পড়ল। না, না, আমারই দোষ, আমরা আপনাকে খবর না দিয়েই চলে এসেছিলাম।

জয়দীপ বলল, কেন এসেছিলে সেদিন তা কিন্তু আজও আমার জানা হয় নি।

লিডিয়া প্রথমে কোন কথা বলতে পারল না। তারপর এক সময় বলল, কেন জানি না, সেদিন আপনার কাছে বসে অনেক কথা শুনতে ইচ্ছে করছিল।

আমার ক্লাস তোমার কেমন লেগেছে লিডিয়া?

কোন কথা না বলে খুব মিষ্টি করে হেসে জয়দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল লিডিয়া। ঠিক পরক্ষণেই মুখখানাকে এমনভাবে নাড়ল, যাতে তার অনেক ভাল লাগার কথা অনেক বেশি করে প্রকাশ পেল।

জয়দীপ বলল, আর একটা কথা, কাল যখন আমার কোয়ার্টারে আসার জন্য ফ্লসি তোমাকে বলছিল, তখন তুমি না এসে চলে গেলে কেন?

লিডিয়া বলল, কেন জানি না, একেবারে আসতে পারলাম না।

তোমার ঐ নিজের ভেতর ডুবে থাকা স্বভাবটুকুর জন্যেই তোমাকে ভালবাসি লিডিয়া।

ভালবাসা কথাটা উচ্চারণ করে হঠাৎ মনে মনে সংকোচ বোধ করল জয়দীপ। মনের আবেগে যে কথাটুকু বলে ফেলল তা অন্য পক্ষ কি ভাবে নেবে বুঝতে না পেরে বিব্রত বোধ করল সে।

লিডিয়ার মুখখানা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তারপর হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে সামনের ফার গাছটার আড়ালে চলে গেল।

জয়দীপ দেখল, লিডিয়া আড়ালে গিয়ে চোখের জল মুছছে।

একটু পরেই আবার সে ফিরে এল। মুখখানা তার থমথম করছে।

জয়দীপ বলল, আমি হয়তো এমন কিছু বলেছি, যাতে তুমি কষ্ট পেলে লিডিয়া।

লিডিয়া মাথা নেড়ে জানাল, জয়দীপ তাকে কোন কষ্ট দেয় নি।

ওরা কেউ আর কোন কথা বলল না।

যতক্ষণ কথা বলল না ততক্ষণ দু'জনকে নিয়ে দুজনে কত কথাই ভেবে চলল।

লিডিয়াই নীরবতা ভাঙল প্রথম। বলল, ঝড় যখন বয় তখন সমস্ত প্রকৃতি ঝড়ের অধিকারে, আপনি ঠিক তেমনি। ঝড়ের মত এসে সব কিছু ছিঁড়ে-খুঁড়ে উড়িয়ে দিলেন।

জয়দীপ বলল, এ কথা কেন লিডিয়া?

এ দু'দিন আমি আশ্চর্যভাবে এই সত্যটুকু উপলব্ধি করেছি।

জয়দীপ বলল, এখন বুঝতে পারছি, পাহাড়ের টানে চাকরি নিয়ে এখানে চলে আসা আমার ঠিক হয়নি।

আসা না আসা কারো ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে বলে মনে হয় না। প্রভুর ইচ্ছাই সব কিছু ওপর

জয়ী হয়।

জয়দীপ বলল, আমার অজ্ঞাতে আমি হয়তো তোমাদের কষ্টের কারণ হয়েছি। নিজেকে তাই বড় অপরাধী বলে মনে হচ্ছে লিডিয়া।

আপনি এমন করে কথা বলছেন কেন? অন্যায় যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে সে আমাদের দিক থেকে, আপনার নয়।

জয়দীপ বলল, কোন কিছু ভাল লাগা বড় একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। হঠাৎ কোথা থেকে মনের কোণে ভালবাসা জন্ম নেয় এক টুকরো ঝড়ের মেঘের মত। তারপর সারা আকাশে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে। তখন মন জুড়ে চলতে থাকে ঝড়ের লীলা। এক সময় সব স্থির হয়ে আসে। ঝড়ের মেঘ কেটে গিয়ে নামে আলোর ঝর্না। বড় সুন্দর তার রূপ। জানো লিডিয়া, সব পাওয়ার রূপই এই। প্রথমে ঝড়, পরে প্রশান্তি।

লিডিয়া বলল, আপনার কথাগুলোই যে কোন মনে ঝড় তুলতে পারে।

ওদের কথার ভেতর অমলেটের প্লেট ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে হাজির হল ফ্লসি। পিছনে চায়ের কেটলি হাতে ফুৎসো।

ফ্লসি লিডিয়ার হাতে প্লেট দিয়ে চাপা গলায় বলল, ডিসটার্ব করলাম না তো?

লিডিয়া ফ্লসির দিকে সুন্দর দু'টি চোখ তুলে তাকিয়ে হাসল।

ততক্ষণে ফ্লসি দাঁড়িয়ে জয়দীপকে সার্ভ করছে।

প্লেট দিতে দিতে ফ্লসি বলল, একজোড়া জুতো আর একটা র‍্যাকেট থাকলে কি আর বাজারে যেতাম। বাজারে যাবার নামে এখানেই আড্ডা জমাতাম।

জয়দীপ বলল, কিন্তু তোমার বান্ধবীটিকে তো বেশিক্ষণ ধরে রাখা যেত না।

ফ্লসি নিজের প্লেট থেকে অমলেট তুলে নিয়ে খেতে খেতে বলল, এই যা মুশকিল। ওকে কনভেন্টে না পাঠিয়ে আপনার এই কোয়ার্টারে ধরে রাখলে অনন্তকাল ধরে আড্ডা দেওয়া যেত।

জয়দীপ কোন কথা না বলে খেয়ে চলল। সে এই দু'-তিনটে দিনেই বুঝে নিয়েছে, ফ্লসির মুখে কোন কিছু আটকায় না। এ সময় তার কথার জবাব দিতে গেলেই আরও অপ্রস্তুত অবস্থার ভেতর পড়ে যেতে হবে।

লিডিয়া হঠাৎ বলে উঠল, আমরা এখন হেঁটে যেতে পারি, কিন্তু ফেরার সময় হয়তো আর তোমাদের হাঁটার উৎসাহ থাকবে না। তখন শেষ গাড়িতে ফিরতে পারো।

ফ্লসি বলল, ভারি মজা আর কি, গল্প করতে করতে তুমি যাবে দীর্ঘ পথ, আর ফেরার পথে ফ্লসি গাড়িতে চেপে হুস করে ফিরে আসবে! আমি স্যারের সঙ্গে ম্যাল ঘুরে ক্যালকাটা রোড ধরে ঘুরে আসব। তারপর সেখান থেকে অকল্যান্ড রোড ধরে নাসিকা বেষ্টন করে, যে গল্পের শেষ নেই সে গল্প করতে করতে মিশন হোস্টেলে ফিরব। তুমি ভেবেছ কি বন্ধু ? অত সহজে স্যারকে ছেড়ে দেব না। বিলম্ব হলেও ক্ষমা পাব, এই প্রতিশ্রুতি আগে-ভাগে আদায় করে এনেছি প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ডের কাছ থেকে।

লিডিয়া বলল, আমি কিন্তু কোন কিছু না ভেবেই ও কথা বলেছি। তুমি নিশ্চয়ই স্যারের সঙ্গে ফিরবে, আর অনেক সুন্দর সুন্দর কথা শুনতে শুনতে আসবে। তোমার পথ চলার কোন কষ্টই আর তাহলে থাকবে না।

ফ্লসি বলল, এতক্ষণে ভাল ভাল কথাগুলো কি আর স্যার উজাড় না করে ফ্লসির জন্যে জমিয়ে রেখেছেন!

লিডিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, আজ বড় দুষ্টুমিতে পেয়ে বসেছে তোমায় ফ্লসি।

আমি যে দুষ্টু সেটা আমার চিরদিনের অপবাদ।

জয়দীপ এতক্ষণে কথা বলল, ছিটেফোঁটা কলঙ্ক না থাকলে শুধু ঝকঝকে চাঁদটাকেও মোটে সুন্দর লাগত না।

ওরা অকল্যান্ড রোড বরাবর হেঁটে চলল দার্জিলিং বাজারের উদ্দেশে। টুকরো টুকরো কথায় ভরে উঠল ওদের চলার মুহূর্তগুলো। ওরা পাহাড়ে পাহাড়ে শেষ সূর্যের সোনালী পাড় বোনা চাদরে দেখল শরৎ মেঘের অলস মন্থর আনাগোনা।

জয়দীপ বলল, দার্জিলিং সত্যিই শৈল-সাম্রাজ্ঞী।

ফ্লসি হেসে বলল, আমরা আছি তাই।

জয়দীপ হেসে উত্তর দিল, একশা বার, কিন্তু তোমাদের নিজস্ব গৌরব আল্পস্।

লিডিয়া বলল, আমাদের নিজস্ব বলে তো কিছু নেই। এশিয়া ইউরোপ আমাদের কাছে এক হয়ে গেছে। আল্পস্ আর দার্জিলিং দুটোই আমাদের কাছে সমান প্রিয়।

ফ্লসি বলল, থাম লিডিয়া, স্যারের সঙ্গে একটু ঝগড়া করে নেওয়া যাক। তারপর জয়দীপের দিকে ফিরে বলল, পাহাড় পর্বত আছে বটে এশিয়াতে, কিন্তু পাশ্চাত্যের লোকেরাই পাহাড় বেশি ভালবাসে।

জয়দীপ প্রতিবাদের সুরে বলল, পাহাড় কে না ভালবাসে?

ফ্লসি বলল, মরণের মুখোমুখি হয়ে পাহাড়কে ভালবাসতে শিখিয়েছে কিন্তু আমাদের দেশের মানুষেরাই। দেখুন, এভারেস্টকে ভালবেসে তারা কি ভাবে প্রাণ দিয়েছে।

হার মানছি আমি ফ্লসি, তোমার কথাই ঠিক।

লিডিয়া ব্যস্ত হয়ে উঠল। সে ভাবল, জয়দীপ বুঝি মনে মনে পরাজয়ের দুঃখ পেয়েছে। সে অমনি বলল, চিরদিন পশ্চিমের লোকেরা পুবের দেশকে ভালবেসে এখানে এসেছে।

জয়দীপ বলল, যে জন্যেই আসুক, এশিয়াও কম ভালবাসে নি পশ্চিমকে।

বলতে বলতে পথের ধারের একটি সুন্দর ফ্লাওয়ার বেড থেকে একটি সাদা টিউলিপ তুলে নিল। সেটি লিডিয়ার হাতে দিয়ে বলল, এটি আসলে এশিয়ার ফুল। বহু শতাব্দী আগে তুরস্কের মাধ্যমে ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে সারা দুনিয়ায়। একটু আগে তুমি এশিয়া আর ইউরোপের মিলনের কথা বলছিলে না? এই ফুল হল সেই মিলনের প্রতীক। বড় ভীরু কোমল অথচ বড় শোভন সম্ভ্রান্ত এই ফুল।

সুন্দর উষ্ণীষের মত ঋজু বৃন্তের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা টিউলিপ ফুলটি হাতে নিয়ে একবার জয়দীপের উদ্দেশে মাথা নোয়াল লিডিয়া। চোখে তার আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার ছায়া।

ফ্লসি বলল, ঝগড়া করলাম বলে আমি কি বঞ্চিত হলাম ফুলের উপহার থেকে?

জয়দীপ বলল, আমি তো তোমাকে আমার প্রথম উপহার দিয়েছি। হাইকুর অনুবাদ হাতে তুলে দিয়েছি তোমার।

ফ্লসি পথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে ওর ব্যাগ খুলে দুটো কবিতা বের করল। সেগুলো লিডিয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এ দুটো তোমার। স্যার আমাকে একটি দিতে চেয়েছিলেন, আমি জোর করে আরও তিনটে নিয়েছিলাম। আমার কবিতা আমি রেখে দিয়েছি।

সরল বিশ্বাসে লিডিয়া দু'টি কবিতা হাতে নিয়ে পড়তে লাগল—

কিন্তু যেখানে রয়েছে—

'সেরা উপহারে
ভরে দাও মোরে
চুম্বন কুঁড়ি দিয়া।'

ঠিক সেখানটায় পড়তে পড়তে লজ্জায় সংকোচে রাঙা হয়ে উঠল তার মুখ।

জয়দীপ ফ্লসির হঠাৎ এই কাণ্ড দেখে বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়েছিল, শেষে লিডিয়ার রাঙা মুখ লক্ষ্য করে দারুণ সংকুচিত হয়ে পড়ল।

লিডিয়া কিন্তু কবিতা দুটো ফ্লসিকে ফিরিয়ে দিল না। সে তার ব্যাগ খুলে তার ভেতর রাখল সে কবিতা।

জয়দীপ কথা বলল, আমি আমার বুদ্ধি আর হৃদয়ের ক্ষমতা মিলিয়ে যে কবিতা রচনা করেছি তাই দিয়েছি ফ্লসিকে। আমি যদি ঈশ্বর হতাম তাহলে টিউলিপই সৃষ্টি করতাম। আমার অক্ষম হাতের দান

দিয়ে তাই খুশী করতে পারি নি ফ্লসিকে।

লিডিয়ার চোখে-মুখে অসহায় ভাব ফুটে উঠল। তার মনে হল, সে-ই ফ্লসির মনোব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সব পরিস্থিতির সমাধান করে দিল ফ্লসি। বলল, দুটো দুটো ভাগ হোক। লিডিয়া, তুমি আমাকে ফিরিয়ে দাও ও দুটো কবিতা, আর আমি তোমাকে দিচ্ছি আমার চেরী আর চাঁদের কবিতাটা।

লিডিয়া বাধ্য মেয়ের মত তাই করল। এবার সে ফ্লসির হাত থেকে পাওয়া কবিতাটি না পড়েই ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। আগের দুটো কবিতা ফিরিয়ে দিতে পেরে সে যেন দারুণ লজ্জা আর অস্বস্তির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেল।

ফ্লসি তার ভাগের কবিতা দুটো ব্যাগে রাখতে রাখতে বলল, টিউলিপ তোমার, ওটা স্যারের ভালবাসার দান। ওটাতে আমি আর ভাগ বসাব না।

জয়দীপ পথ চলতে চলতে বলল, তোমার ফুল টিউলিপ নয় ফ্লসি, কাঁটা ভরা গোলাপ তোমার শ্রেষ্ঠ উপহার। গন্ধ রঙ সবই আছে, আর তার সঙ্গে অতিরিক্ত আছে কাঁটা। যে তার শোভায় সৌরভে আকর্ষণ করে, কিন্তু ছুঁতে গেলেই কাঁটার আঘাত হানে।

ফ্লসি জলতরঙ্গের মত হেসে উঠল। সামনের বাঁকে একটা ঝর্না ঠিক তেমনি ওদের চলার পথে বেজে উঠল।

ফেরার পথে ফ্লসি বলল, আমি কিন্তু আপনার পার্টনার, মনে থাকে যেন।

হঠাৎ চমকে উঠল জয়দীপ। ফ্লসিকে সে পছন্দ করে, কিন্তু ফ্লসি যে এমনভাবে কথাটা অনাবৃত করে বলবে তা সে ভাবতেই পারে নি।

ফ্লসি আবার বলল, ঐ মিসেস বেক্‌লে আপনাকে পার্টনার করতে চাইবেন, কিন্তু খেলায় একটুও হাত পাকে নি ওঁর। ঠিক মত সার্ভিস করতেই শিখলেন না এতদিন।

এবার ভুল ভাঙল জয়দীপের। তাহলে ফ্লসি জীবনের পার্টনারের কথা বলছে না, বলছে খেলার পার্টনারের কথা।

আবছা অন্ধকার করে চড়বড়িয়ে আকাশ থেকে অকল্যান্ড রোডের ওপর নেমে এল এক পশলা বৃষ্টি।

ফ্লসি তাড়াতাড়ি তার রেইনকোটটা জয়দীপের গায়ে চাপিয়ে দিতে দিতে বলল, ভাল করে জড়িয়ে নিন, এখুনি ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

জয়দীপ গা থেকে ওটা তুলে নিয়ে ফ্লসির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমি কি ভিজবে নাকি?

ফ্লসি যেন অভিভাবিকার মত চেঁচিয়ে উঠল, অবাধ্য ছেলের মত কাজ করছেন কেন, তাড়াতাড়ি চাপান, আমার ছাতা আছে।

অগত্যা ফ্লসির রেইনকোট পরে নিল জয়দীপ। সে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচল। ফ্লসি কিন্তু এতটুকু ছাতার আড়ালে নিজেকে বাঁচাতে পারল না।

ওরা পথের ধারে একটা ফার গাছের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

ফ্লসি জয়দীপের আড়ালে থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে দেখে জয়দীপ তাকে কাছে টেনে নিল। বলল, তুমি আমাকে ধরে থাক, আমি যেদিক থেকে ছাট আসছে সেদিকে ছাতাটা ধরে রাখি।

ফ্লসি তাই করল। সেই বৃষ্টির ভেতরেও ফ্লসি বলল, আমাদের এ রকম অবস্থায় দেখলে প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ড আর আস্ত রাখতেন না। তারপর হঠাৎ বলল, লিডিয়া আমাদের এ ছবিটা দেখলে কি বলত বলুন তো?

জয়দীপ বলল, আর যাই বলুক, হাততালি দিতে দিতে তোমার মত গুড্ লাক বলত না।

ফ্লসি চেঁচিয়ে উঠে বলল, ও দারুণ ভাল মেয়ে।

আর ঠিক সেই সময় কড়াৎ করে একটা বাজ পড়ল। ভয় পেয়ে ফ্লসি শক্ত করে জড়িয়ে ধরল জয়দীপের কোমর।

জয়দীপ বলল, চল ফ্লসি, আমরা এখান থেকে পালাই।

ফ্লসি খানিকটা ভিজে গিয়েছিল। সে কাঁপতে কাঁপতে বলল, এখন গাছের আড়ালটুকু ছেড়ে বাইরে গেলে সবটা ভিজে যেতে হবে।

জয়দীপ বলল, আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, এ সময় গাছের তলায় দাঁড়ানো বিপজ্জনক। তার চেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলাই ভাল।

তেমনি জয়দীপকে জড়িয়ে ধরেই চলতে লাগল ফ্লসি। ওরা সেই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে যখন জয়দীপের কোয়ার্টারে এসে পৌঁছল, তখন ফ্লসি পুরোপুরি আর জয়দীপ অল্প-স্বল্প ভিজে গেছে।

কোয়ার্টারে ঢুকেই জয়দীপ ভাবনায় পড়ল। ফ্লসি যদি এ অবস্থায় মিশন হোস্টেলে যায়, তাহলে নানা কথা উঠবে। জয়দীপও জড়িয়ে পড়বে সে কথাব ভেতর। কিন্তু ভেজা পোশাক শুকিয়ে নেবার সুযোগ কোথায় এখন? তাছাড়া যেভাবে ভিজেছে ও, জ্বরে-টরে না পড়ে যায়।

বাইরের ঘরে রেইনকোট রেখে জয়দীপ শোবার ঘরে গিয়ে পোশাক ছেড়ে নিল। বিছানায় বসে ভেবে পেল না ফ্লসিকে কিভাবে এসব পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা করবে সে।

ফ্লসি সেই যে পাশের ঘরে ঢুকেছে, সেও আর বেরোয় না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফ্লসি দিব্যি সুন্দর শুকনো একখানা গাউন পরে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, এই ওষুধটা খেয়ে নিন। হাঁ করুন, আমি মুখে ফেলে দিচ্ছি গ্লোবিউলগুলো। এতে বুকে আর কফ বসে যাবার ভয় থাকবে না।

বাধ্য ছেলের মত জয়দীপ হাঁ করল, আর তার মুখে ওষুধ ঢেলে দিল ফ্লসি।

জয়দীপ ওষুধ খাওয়া শেষ করেই বলল, তুমি কি ম্যাজিক জানো?

কেন?

এই যে চমৎকার শুকনো পোশাক পরে ফেললে ব্যাচিলার্স কোয়ার্টারে এসে।

কিছু কিছু ম্যাজিক জেনে রাখতে হয়।

জয়দীপ বলল, সত্যি, এখনও আমি তোমার পোশাক রহস্যের কোন কিনারা করতে পারছি না।

ফ্লসি বলল, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের শিক্ষা দরকার। দার্জিলিঙের ঠাণ্ডা ভেজা ডিটেকটিভ বিদ্যায় কুলোবে না।

জয়দীপ বলল, রহস্য দুর্ভেদ্য থাক, ঘনীভূত হোক, তারপর একদিন আপনিই উদ্‌ঘাটিত হবে।

ফ্লসি সুন্দর মুখভঙ্গি করে বলল, সেই আশাতেই থাকুন।

চা খেয়ে একটু সুস্থ হল দু'জনে। অকালবর্ষণ থেমে গিয়ে চাঁদ উঠল আকাশে।

ফ্লসি বলল, এই বেলা পালাই। নইলে হোস্টেলের সবাই ভাববে, নতুন প্রফেসারের সঙ্গে বেরিয়ে ল্যান্ডস্লাইডে কোথায় তলিয়ে গেছি।

জয়দীপ হাসি চেপে বলল, মুখে তোমার যা আসে তাই বলে যাও ফ্লসি, মাস্টার-মশায়দের একটুও ভয় কর না তুমি।

ফ্লসি বাগান পেরিয়ে চলে যেতে যেতে বলল, পরীক্ষার ব্যাপারে স্যারেরা সব সময় অভয় দিতে দিতে আমাদের নির্ভীক করে তুলেছেন, তাই ভয় কাকে বলে জানি না।

বনের ভেতর হারিয়ে গেল ফ্লসি আর ফ্লসির সহজ স্বচ্ছন্দ আচরণগুলোর কথা বিছানায় বসে ভাবতে লাগল জয়দীপ।

কয়েক মুহূর্ত পরেই দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এল ফ্লসি। সে তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতেই সে ঢুকল পাশের ঘরে। সেখান থেকে ভেজা পোশাকগুলো টেনে এনে বান্ডিল করে ঢুকিয়ে দিল জয়দীপের খাটের তলায়। তারপর নন স্টপ বলে গেল, মিস রোল্যান্ড আমাদের খোঁজে আসছেন এদিকে। টর্চের জোরালো আলো দেখেই বুঝতে পেরেছি, উনি প্রিন্সিপ্যাল ছাড়া কেউ নন। ভেজা পোশাকগুলো যাতে না দেখতে পান তাই এখানে রেখে গেলাম। আপনি বলবেন, বৃষ্টি হলে আমরা পথে এক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রয় নিই। তারপর আকাশ পরিষ্কার হলে ঐ ভদ্রলোক তাঁর দারোয়ানকে আমাদের সঙ্গে টর্চ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। ফ্লসি মিশনের দিকেই চলে গেছে।

কথা কটা বলে দিয়েই সে আর দাঁড়াল না। পিছনের দরজা খুলে ফুৎসোকে কি উপদেশ দিয়ে দেওদার বনের অন্ধকারে ডুব দিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামনের দরজায় করাঘাত। ফ্লসি ঘরে ঢুকেই বোধ করি সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে থাকবে।

জয়দীপ লাফ দিয়ে উঠে গেল দরজার সামনে। খুলে ফেলল দরজাটা।

মিঃ আর মিসেস বেক্‌লেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন স্বয়ং প্রিন্সিপাল রোল্যান্ড।

জয়দীপ 'আসুন আসুন' বলে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের স্টাডি রুমে এনে বসাল।

প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ড বললেন, তোমরা গেছ বাজারে, এদিকে ঝড় উঠল খুব জোর, তাই আমরা সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এখনও ফ্লসি ফেরেনি দেখে তোমাদের খোঁজে চলে এলাম এখানে।

ফ্লসির শেখানো বুলিগুলো একদমে বলে গেল জয়দীপ।

প্রিন্সিপ্যাল মিসেস বেক্‌লের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন বুঝলে তো ঘটনাটা কি। ফ্লসি বড় হুঁশিয়ার মেয়ে, সে কোন অবিবেচনার কাজ করতেই পারে না। আর তা ছাড়া প্রফেসার বোস রয়েছে সঙ্গে। বিপদে বুঝে-সুঝে কাজ করতে পারবে।

মিসেস বেক্‌লে নিশ্চয়ই এদের বিরুদ্ধে কোন সন্দেহজনক ইংগিত করে থাকবেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হল, তিনি নিরাশ হয়েছেন। সেদিন জয়দীপকে বেক্‌লে দম্পতি খুবই আদর-যত্ন করেছিলেন। পরীক্ষার মুখোমুখি না দাঁড়ালে মানুষকে চেনা যায় না।

জয়দীপ ভেতরে উঠে গিয়ে ফুৎসোকে বলল, সিস্টার ফ্লসি যে এখানে এসেছিল সে-কথা কাউকে বল না যেন। আর চা বসাও, স্ন্যাক্‌স্ কিছু থাকলে দাও।

মিসেস বেক্‌লে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে উঠে এলেন। আশেপাশে চোখ চালিয়ে কারো অস্তিত্ব সম্বন্ধে আঁচ পাওয়ার চেষ্টা করলেন। জয়দীপের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বললেন, বেশ কোয়ার্টারটি পেয়েছেন কিন্তু আপনি।

জয়দীপ বলল, মিঃ ব্যাভিংটনের কৃতিত্ব, আর প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ডের অনুগ্রহ।

জয়দীপ বাইরের ঘরে চলে এলেও মিসেস বেক্‌লে ভেতরে থেকে গেলেন।

প্রিন্সিপ্যাল মিঃ বেক্‌লের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের এই ইয়াং বন্ধুটি দু'দিন মাত্র পড়িয়ে যে সুনাম পেয়েছে তা আমাদের মত অনেকদিনের অভিজ্ঞ শিক্ষকদেরও ঈর্ষার বস্তু।

মিঃ বেকলে একটুখানি মনরক্ষার হাসি হাসলেন।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, জয়দীপ, আমাদের লাইব্রেরিটাকে একটু ভাল করে গড়ে তুলতে চাই। আধুনিক অথারদের সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তুমি ওঁদের বইয়ের আপ-টু-ডেট একটা তালিকা কর।

জয়দীপ বলল, আমি ইতিমধ্যে একদিন লাইব্রেরির বুক লিস্টটা দেখে নেব। তারপর নতুন যা দরকার, তার একটা তালিকা তৈরি করে আপনাকে দেব।

হঠাৎ ঝড়ের মত স্টাডির দরজাটা ঠেলে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন মিসেস বেক্‌লে। ফ্লসির ফেলে যাওয়া ছাতাখানা তুলে ধরলেন প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ডের চোখের সামনে। তাঁর চোখে-মুখে তখন সফল এক ডিটেকটিভের চাপা হাসি।

মুহূর্তে জয়দীপ পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হবার অভিনয় করে বলল, ফ্লসিকে ছাতাটা ফেরত দিতে একেবারে ভুল হয়ে গেছে। রেইনকোটখানা হাতে ছিল ওর, ছাতাটা তাই আমিই রেখেছিলাম। মিশনে চলে গেল ও দরোয়ানটির সঙ্গে, আমি ভুলে হাতে নিয়ে চলে এলাম ওর ছাতা। মিসেস বেক্‌লে যদি কিছু মনে না করেন, ছাতাটা নিয়ে যান, ফ্লসিকে দিয়ে দেবেন।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, ঠিক আছে, এসব ছোটখাট ভুল হয়েই থাকে।

তারপর জয়দীপের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার জুতো আর র‍্যাকেট মিলেছে তো?

জয়দীপ হেসে বলল, দুটোই মিলেছে। তবে আমাদের ছাত্রীটি একটু বেশি হুঁশিয়ার। জুতোটা আমাকে দিয়ে দিয়েছে আর র‍্যাকেটটা ল্যাংগুয়েজ স্কুলের সম্পত্তি বলে সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে।

হেসে উঠে প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ড বললেন, ফ্লসি খুবই হিসেবী মেয়ে, ওর কাজকর্ম একেবারে

নিখুঁত। কি বলেন মিঃ বেকলে?

স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আসামীর মত কথা না বলে শুধু সামান্য মাথা নেড়ে সায় দিলেন মিঃ বেক্‌লে।

মিসেস বেক্‌লে মুখ গোমড়া করে বসে ছিলেন। যে ছাতার সূত্র ধরে তিনি একটি গোপন রসচক্রের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করেছিলেন, তা ভূমিকাতেই ভেস্তে গেল দেখে তিনি মনে মনে মর্মান্তিক যাতনা পাচ্ছিলেন। তার ওপর তাঁকেই বয়ে নিয়ে যেতে হবে ছাতাখানা. এর চেয়ে নিদারুণ পরিহাস আর কি হতে পারে। হঠাৎ মগজে একটা কথার উদয় হল। তিনি বললেন, ট্যুরনামেন্টের ডাবল্‌সে পার্টনার থাকবে কে কে?

প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ড বললেন, জয়দীপকে খেলার আসরে এবার নামাতে চাই। সিঙ্গলসের খেলায় ওকে আর মিঃ লীকে নামালে ভাল হয়। ডাবল্‌সে ফ্লসি আর জয়দীপ জুটি হলে কেমন হয়?

মিসেস বেক্‌লে বললেন, শিক্ষকরা জুটিতে থাকলেই ভাল দেখায় না কি?

মিসেস বেক্‌লে এতকাল মিঃ লীর পার্টনার হয়ে ডাবল্‌সে খেলে এসেছেন। এবার মিঃ লীর পরিবর্তে তিনি ইয়াং ব্লাড জয়দীপের পার্টনার হতে চান।

প্রিন্সিপ্যাল অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বললেন, এমন ব্যাকডেটেড আইডিয়া থাকা উচিত নয় মিসেস বেক্‌লে। খেলুক না ওরা একসঙ্গে। ছাত্র শিক্ষক সব সময় একযোগে কাজ করলে উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়ে, কাজটা ভাল হয়।

দ্বিতীয় পরাজয়ের পর মিসেস বেক্‌লে মুখখানা ব্যাজার করে বসে রইলেন।

চা আর খাবার এলে জয়দীপ চায়ের কাপ অতিথিদের কাছে এগিয়ে দিল। খাবারের প্লেট এগিয়ে দিয়ে বলল, নিন মিসেস বেক্‌লে, যৎসামান্যই আছে।

মিসেস বেক্‌লে কোন কথা না বলে গরম চায়ে অনবরত চুমুক দিয়ে রাগ হজম করতে লাগলেন।

সাত সাতটা দিন মিশনারী ল্যাংগুয়েজ স্কুল গ্রাউন্ড যেন প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। সেন্ট পল্‌স্-এর বাছাইয়ের সঙ্গে একদিনেই ফয়সালা করে ফেলল জয়দীপ ৪-৬, ৬-৭ সেটে গেম জিতে। শেষে খেলা জমল সেন্ট জোসেফস্-এর বাছাইয়ের সঙ্গে। দীর্ঘ সময় ধরে চলল লড়াই। দু'পক্ষের করতালি আর উত্তেজনার ধ্বনিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল খেলার মাঠ। জয়দীপ এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু বিধি হল বাম। পায়ের পেশীতে টান পড়ায় বসে পড়তে হল জয়দীপকে। ছাত্র-শিক্ষকদের কাঁধে ভর রেখে তাকে ছাড়তে হল খেলার মাঠ। জয়ী বলে ঘোষণা করা হল সেন্ট জোসেফের কার্ল মেইলারকে।

রুমালে ঘন ঘন চোখ মুখ মুছছিল ফ্লসি। লিডিয়া দাঁড়িয়ে ছিল তার পাশে। সে বলছিল, তুমি এত ভেঙে পড়ছ কেন? প্রফেসার বোস সিঙ্গল্‌সের খেলায় সবচেয়ে ভাল খেলেছেন। দেখ, প্রতিটি দর্শক ওঁকে এ বছরের সেরা খেলোয়াড় বলে ঘোষণা করছে। এ হার তুমি হার বলে মেনে নিচ্ছ কেন!

পরদিন প্রিন্সিপ্যাল জয়দীপের কাছে গিয়ে মাথায় হাত রেখে বললেন, খুব খুশী হয়েছি জয়দীপ তোমার খেলায়। আমি একেবারেই এতটা আশা করি নি তোমার কাছ থেকে। আমি মনে করি, সিঙ্গল্‌সে আইনত না হলেও দর্শকদের চোখে তুমিই জয়ী হয়েছ।

জয়দীপ বলল, যিনি আমার সঙ্গে খেলেছিলেন তিনি খুবই দক্ষ খেলোয়াড়। তাঁর সার্ভিসে ও মারে জোর আর কৌশল দুই-ই ছিল। আমি ওঁর বিরুদ্ধে খেলে খুব তৃপ্তি পেয়েছি।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, এখন কেমন বোধ করছ?

আমার তো মনে হয়, ডাবল্‌সে নিশ্চিত আমি খেলতে পারব। ডাক্তার সেনও আমাকে সে-রকম আশ্বাসই দিয়েছেন।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, ফ্লসি মনে হল খুব মুষড়ে পড়েছে।

জয়দীপ বলল, কিছু আগে ওরা সবাই এসেছিল আমার এখানে। আমি ওকে একটু ধমকের সুরেই বলেছি, খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব না থাকলে খেলা যায় না। খেলায় হারজিত তো আছেই। ভাল খেলতে পারলে হেরে গিয়েও জাত খেলোয়াড়ের মনে কোন গ্লানি থাকে না।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, মেয়েটাকে আমি খুবই ভালবাসি। যেমন হাসিখুশী আর কাজের তেমনি ডানপিটে।

জয়দীপ হেসে মাথা নাড়ল।

নির্দিষ্ট দিনে জয়দীপ নামবে কিনা এ নিয়ে সব মহলেই জল্পনা হয়েছে। কিন্তু সব সংশয়ের অবসান করে যখন জয়দীপ আর ফ্লসি মাঠে নামল, তখন আনন্দ অভিনন্দনের যেন একটা জোয়ার বয়ে গেল। কেবল মিসেস বেক্‌লে নামের জনৈক মহিলা দূরে দাঁড়িয়ে মরা মাছের চোখের মত চেয়ে রইল।

প্রথম থেকেই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খেলতে লাগল জয়দীপ আর ফ্লসি। কিন্তু দু'জনের বোঝাপড়া তখনও নিবিড় হয় নি, তাই প্রথম সেটটি খোয়াতে হল। দ্বিতীয় সেটে মেজাজ ফিরে এল জয়দীপের। ফ্লসিও খুব সুন্দর বুঝে খেলতে লাগল। ধীরে ধীরে দু'জনে গড়ে তুলল ক্ষুরধার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অতর্কিত আক্রমণে বিপক্ষ দলকে বার বার করে দিল কোণঠাসা। দু'জন যেন দু'জনকে যোগাচ্ছে প্রেরণা। ওরা যেন হারবে না বলে মনে মনে শপথ নিয়েছে।

বেশ কয়েকটি সেটে অজস্র গেম খেলে দু'দিনে ফয়সালা হল ফাইনাল খেলার।

জয়ী হয়েছে জয়দীপ আর ফ্লসি। আনন্দ উল্লাসে জলাপাহাড় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সবাই ছুটে এসে প্রায় জড়িয়ে ধরল ওদের দু'জনকে।

প্রিন্সিপ্যালের চোখ দুটো আনন্দে ছলছল করতে লাগল। তিনি ওদের দু'জনকে সেদিন রাতের ডিনারে তাঁর কোয়ার্টারে খাবার নেমন্তন্ন জানালেন।

যথাসময়ে ফ্লসি এল। জয়দীপের আসতেও দেরি হল না।

কিন্তু অবাক্ হবার পালা জয়দীপের। সে এসেই দেখল, ফ্লসি একখানা রঙীন শাড়ি পরে বসে আছে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

কি ব্যাপার! জয়দীপ একটা কিছু মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, এমন সময় দু'হাতে দু'টি ফুলের তোড়া নিয়ে ঘরে ঢুকলেন প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ড।

জয়দীপের বিস্ময় চরমে উঠল। মিস রোল্যান্ডের পরনে একটি লাল পাড় গরদের শাড়ি। তিনি দু'জনের হাতে দু'টি ফুলের তোড়া দিয়ে বললেন, এর চেয়ে দামী আর কোন উপহারের কথা ভাবতে পারলাম না তোমাদের জন্যে।

জয়দীপ বলল, ফুলের চেয়ে প্রিয় আমার কাছে আর কিছু নেই।

মিস রোল্যান্ড না শুনতে পান এমনি চাপা গলায় বলল ফ্লসি, বিশেষ করে টিউলিপ ফুল।

জয়দীপ ওর দুষ্টুমিটা উপভোগ করল। তারপর প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কিন্তু আপনাদের কাছে আজ হেরে গেলাম।

ওরা দু'জনেই তাকিয়ে রইল জয়দীপের মুখের দিকে।

জয়দীপ বলল, আমারই উচিত ছিল ধুতি পাঞ্জাবি পরে আসা. তার বদলে স্যুট পরে এসেছি, আর আপনারা পরেছেন পুরোদস্তুর বাঙালী পোশাক।

রোল্যান্ড বললেন, আমি এখানে বাঙালীদের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে গেলেই শাড়ি পরে যাই। ফ্লসিকেও আমি শাড়ি পরতে শিখিয়েছি।

ফ্লসি বলল, এ শাড়িখানা উনিই আমাকে দিয়েছেন।

রোল্যান্ড বললেন, বাঙলাদেশে আছি, বাংলা ভাষা শিখছি, সুতরাং বাঙালী পোশাক পরব, বাঙালী খাবার খাব, এই ছিল আমার আদর্শ। এখানে চেষ্টা করেছিলাম ব্যাপারটা চালু করতে, কিন্তু জোরালো সমর্থন পাই নি।

একটু থামলেন, আশা ছাড়ি নি। তুমি এসেছ, আমার জোর বাড়ল। ব্রাদারদের হয়তো ধুতি পরাতে পারব। কিন্তু মেয়েদের বেলা একটু মুশকিল। ফ্লসি একা একা শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াবে, সেটা ঠিক মানানসই হবে না। অবশ্য আসছে মাস থেকে লিডিয়ার হোস্টেলে এসে থাকার কথা। রোজ পড়ার শেষে ওকে ফিরতে হয় টাউনেই একটা নির্দিষ্ট জায়গায়। সেখানে সন্ধে সাতটায় কাজ সেরে ফেরে

ওদেরই কনভেন্টের একটা ল্যান্ডরোভার। তাতে করে ওকে ফিরতে হয় কার্শিয়াং। আবার সকাল ন'টা না বাজতেই দার্জিলিং আসার জন্যে তৈরি হতে হয়।

জয়দীপ বলল, সত্যি, এতখানি কষ্ট করে পড়াশোনা করা—

রোল্যান্ড বললেন, অত্যন্ত সিরিয়াস মেয়ে লিডিয়া।

ফিস ফিস করে বলল ফ্লসি, আমার মত নয়।

রোল্যান্ড বলে চললেন, প্রাইমারী সব কটা পরীক্ষায় ছেলেমেয়েদের ভেতর ও প্রথম হয়েছে। আমি ওদের মাদারকে লিখেছিলাম এই অ্যাডভান্স কোর্সের দুটো বছর লিডিয়াকে হোস্টেলে রাখতে। রাজী হয়েছেন মাদার অ্যান।

ফ্লসি বলল, দারুণ খুশীর ব্যাপার। আমরা দু'জনে কিন্তু এক রুমে থাকব।

মিস রোল্যান্ড বললেন, তাহলে কথা দাও, তোমরা দু'জনেই শাড়ি পরবে?

ফ্লসি বলল, আমি তো পরবই, ওকেও নানের পোশাক ছাড়িয়ে শাড়ি পরাব।

জয়দীপ বলল, খুব লজ্জার ব্যাপার, যদিও আমার সুটকেসে ধুতি পাঞ্জাবি আছে, তবু ধুতি পরার ব্যাপারে আমি একেবারে আনাড়ী। অবশ্য দু'চার-দিনের ভেতরেই শিখে নিতে পারব।

প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ড বললেন, তাহলে একটা দিন ঠিক করা যাক্, যেদিন ধুতি শাড়ি পরে সবাই সিঞ্চলে পিকনিক করতে যাব। সেদিন হবে আমাদের নতুন পোশাকের উদ্বোধন।

ফ্লসি চেঁচিয়ে উঠল, দারুণ আইডিয়া। আমরা হেঁটেই যাব কিন্তু। আপনার জন্যে থাকবে ঘোড়ার ব্যবস্থা।

রোল্যান্ড বললেন, বয়েস বেড়েছে বলে কি উৎসাহ নেই আমার। আমি তোমাদের সঙ্গে হেঁটেই যাব সিঞ্চলে।

শরতের জ্যোৎস্না রাত। আকাশের কোথাও মেঘ নেই। যদি থাকে, তাহলে তারা রাতের ঠাণ্ডা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকার অনেক গভীরে আশ্রয় নিয়েছে। বেলা বাড়বে আর তারা উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠে আসবে।

ছোট ছোট এক একটা দলে ভাগ হয়ে হাঁটছে ওরা। মিঃ ও মিসেস বেক্‌লে, মিঃ ডিবিদের সঙ্গে হাঁটছেন প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ড। নতুন প্রফেসার জয়দীপের সঙ্গে চলেছে লিডিয়া আর ফ্লসি। দু'জনেই শাড়ি পরেছে। এই উপলক্ষে দুটো শাল ওদের উপহার দিয়েছেন মিস রোল্যান্ড। জয়দীপ ধুতি পরেছে, গায়ে জড়িয়েছে কাশ্মীরী কাজ করা পুরোনো দিনের একখানা শাল। অন্যেরা কেউ কেউ ধুতি শাড়ি যোগাড় করতে পারলেও শাল যোগাড় করে উঠতে পারেন নি। তাঁরা ধুতি শাড়ির ওপর কোট চাপিয়েই চলেছেন। মিশনারী ল্যাংগুয়েজ স্কুলের এ এক অভিনব উম্মাদনা।

পথেই পরিকল্পনার পরিবর্তন করা হল। ওরা সিঞ্চলে রান্নার সরঞ্জাম, রাঁধুনী আর কাজের লোকদের রেখে চলে যাবে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে। ততক্ষণে রান্নার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে থাকবে। ওরা ফিরে এসে সিঞ্চলের ডাকবাংলোয় বিশ্রাম করবে। খাওয়া দাওয়া হৈ-হুল্লোড় করে ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধে।

ঘুম থেকে শুরু হয়েছে চড়াই। ধীরে ধীরে উঠছেন প্রিন্সিপাল রোল্যান্ড আর তাঁর সঙ্গীরা। ফ্লসি এসে মিস রোল্যান্ডের কানে কানে বলল, আমরা কি জোর কদমে এগিয়ে যেতে পারি?

মিস রোল্যান্ড বললেন, নিশ্চয়ই, তোমরা ইয়াং, তোমরা এখন লাফিয়ে দৌড়ে চলবে। আর তাছাড়া এক জায়গাতেই তো আমরা মিলব।

কথাটা কানে যেতেই মিসেস বেক্‌লে বললেন, এটা কিন্তু খুব বিবেচনার কাজ বলে মনে হচ্ছে না। আমিও কি আর দৌড়ঝাঁপ করে যেতে পারি না।

প্রিন্সিপাল বললেন, এতে অবিবেচনার কি আছে, তুমিও যাও না ওদের সঙ্গে। বয়সের ধর্ম এখন ওদের দৌড় করিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রিন্সিপ্যালের অনুমতি পেয়েও মিসেস বেক্‌লে ছেলেমানুষ সাজতে পারলেন না। তিনি হাঁটুর

চিরস্থায়ী ব্যথাটার কথা চিন্তা করে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ায় উৎসাহ পেলেন না। মনে মনে ফ্লসি-মেয়েটার মুণ্ডপাত করতে করতে চললেন। প্রিয়দর্শন জয়দীপের খেলার জুটি হবার সৌভাগ্যটুকু এই মেয়েটাই ছিনিয়ে নিয়েছে, এ কথা মনে আসায় অক্ষম ক্রোধে তিনি দাঁতে দাঁত চেপে ধরলেন। তার ওপর আর একটা মেয়েকেও সঙ্গী জুটিয়েছে। সে মেয়েটার তো মাথা ঘুরিয়ে দেখার মত চেহারা। জয়দীপ বোসের কি আর চোখে পড়বে না। কনকনে ঠাণ্ডার ভেতরেও হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এল মিসেস বেক্‌লের। প্রথম দিনেই ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিলেন জয়দীপের সঙ্গে, তাই নেমন্তন্নও করেছিলেন চায়ে। কিন্তু ধরে রাখা গেল না নতুন পাখিটাকে। উড়ে পালাল। আর এখন তো তাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ঐ উড়ুক্কু মেয়েটা। সঙ্গে আবার জুটেছে এখন একটা ডাগর চিকণ পাখি।

হঠাৎ মিসেস বেক্‌লে মিঃ বেক্‌লের কাছাকাছি গিয়ে ফোঁস করে উঠলেন, জোরে হাঁটতে পারো না, বাতে ধরা পাখির মত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছ। সারাটা জীবন জ্বালিয়ে খেলে।

ছ্যাকড়া গাড়ির হাড় জিরজিরে ঘোড়া যেমন সপাসপ চাবুক খেলে পড়ি-কি-মরি করে দু'-চার কদম ধুঁকতে ধুঁকতে ছুটে চলে, ঠিক তেমনি করে খানিকটা পথ জোর কদমে চলার চেষ্টা করলেন মিঃ বেক্‌লে। তারপর আশ্রয় নিলেন মিস রোল্যান্ডের কাছে। তাঁর সঙ্গে ধীর লয়ে হেঁটে ফুরিয়ে যাওয়া দমটুকু ফিরে পাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

গভীর নিবিড় বনপথ জ্যোৎস্নার আলোয় মায়াময়। ওরা যেন থ্রি কমরেডস চলেছে উদ্দেশ্যহীন অভিযানে। অনেক চড়াই ভাঙতে হলে মাঝে মাঝে ফ্লসি ধরেছে জয়দীপের হাত। লিডিয়া কিন্তু স্টেডি উঠে চলেছে। ফ্লসি আর জয়দীপ বাঁক ঘুরেই গাছের আড়ালে লুকিয়ে ফেলছে নিজেদের। লিডিয়া কাছে এসে তাকাচ্ছে চারদিকে। অমনি একটা ভয়ের আওয়াজ তুলে সামনে লাফিয়ে পড়ছে ফ্লসি। লাফাতে গিয়ে শাড়িতে পা জড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে। জয়দীপ হাত ধরে টেনে তুলছে। আঘাত পাচ্ছে মেয়েটা, তবু উৎসাহের শেষ নেই।

লিডিয়াকে নানা দিক থেকে দেখছে আজ জয়দীপ। শাড়ি পরেও যেন ইন্দ্রানীর মহিমা পেয়েছে। আজ লিডিয়া কিন্তু প্রতিদিনের মত গভীর গম্ভীর নয়। সেও দুষ্টুমিতে পেয়ে বসা ফ্লসিকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরছে। ফ্লসি অনুনয় জানাচ্ছে, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। তোমাকে খুব দামী একটা জিনিস দেব।

লিডিয়া বলছে, আগে দাও, তবে ছাড়ব।

ফ্লসি অমনি মুখে হাসি ফুটিয়ে দুষ্টু চোখের চাউনি হেনে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা জয়দীপকে দেখিয়ে বলছে, ঐ নাও।

লিডিয়া অমনি ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে তাকে।

ফ্লসি বলছে, উপহারটি নিশ্চয়ই দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে তোমার, নইলে এত সহজে আমাকে ছেড়ে দিলে কেন বল?

লিডিয়া ওকে আবার ধরবার জন্যে পা বাড়িয়েছে। খলখল খুশীতে ভেঙে পড়ে জয়দীপের দিকে হাত বাড়িয়ে চড়াই ভেঙে ছুটেছে ফ্লসি। উদ্দেশ্য, এ পরিস্থিতি থেকে জয়দীপ তাকে উদ্ধার করুক।

জয়দীপ হাসতে হাসতে ওর হাত ধরছে। মেয়েটার যেন কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। লিডিয়া কাছে এসে তাকে ধরার জন্যে হাত বাড়াতেই সে জড়িয়ে ধরছে জয়দীপকে মিথ্যে ভয়ে।

জয়দীপ আর লিডিয়া ওর কাণ্ড দেখে দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

ওরা হাত ধরাধরি করে চলেছে তিন জনে। দু'পাশে দু'জন, মাঝে জয়দীপ। বাঁ হাতখানা বেশি করে দোলাচ্ছে ফ্লসি। বনের বড় একটা গাছের মাথা ছুঁয়ে ওদের কাণ্ড দেখে হাসছে চাঁদটা।

সিঞ্চলের কাছাকাছি একটা জায়গায় এসে মস্ত বড় একটা পাথরের স্তূপের ওপর ওরা তিনজনে উঠে দাঁড়াল। পাশেই তিনটে ফার গাছ সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে। একটা ছোট মত ঝোরা ঐ তিনটে গাছের ফাঁক দিয়ে এঁকে-বেঁকে নেমে গেছে উপত্যকার দিকে। এখনও উপত্যকা রহস্যময় অন্ধকারে ঢাকা। পূর্ণ চাঁদের আলো সবটুকু শক্তি দিয়েও ভেদ করতে পারছে না তার কুয়াশার আবরণ। রাত্রির এই নিস্তব্ধ তপস্যাটুকু ওরা দেখতে লাগল তন্ময় হয়ে।

লিডিয়ার মনে হল, রাত্রি যেন এক নারী, সে তপস্যা করে চলেছে জ্যোতির্ময় এক পুরুষের জন্য। তার মনে হল, সে যেন এই রাত্রিরই আর এক রূপান্তর। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে যে পুরুষ, সে অজস্র আলোর কণিকা ধরে রেখেছে তার দেহে। হঠাৎ লিডিয়া থরথর করে কাঁপতে লাগল। তার সমস্ত চেতনাকে যেন ঐ পুরুষ আলোর অবয়ব দিয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছে। আর সেই ছোঁয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে তার সব কিছু।

লিডিয়া প্রবল শক্তিতে নিজের চেতনাটুকুকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, তার দুটো চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। পা বুঝি আর ধরে রাখতে পারছে না দেহের ভার। সে একটা হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল জয়দীপের চাদরখানা। অবচেতন মনে আত্মরক্ষার একটা চেষ্টা।

ব্যাপারটা ফ্লসির চোখে পড়তেই ও চেঁচিয়ে উঠল, ওকে ধরে ফেলুন।

জয়দীপের চাদরে পড়েছিল টান। সে ইতিমধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। এখন দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল অবসন্ন-প্রায় লিডিয়াকে।

কতক্ষণ এমনি মোহাচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইল ওরা। এ অবস্থায় লিডিয়াকে নিয়ে নীচে নামা যায় না। ফ্লসি নেমে পড়েছে। সে অসহায়ের মত তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। তার কেবল মনে হচ্ছে, এখুনি যদি এসে পড়ে পেছনের দল, তাহলে বিশ্রী একটা অঘটন ঘটে যাবে।

লিডিয়ার দেহে পুরুষের অনভ্যস্ত বলিষ্ঠ স্পর্শ লেগেছে। তার সচেতন সত্তা তাকে ফিরিয়ে আনছে লৌকিক জগতে। ধীরে ধীরে সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। পুরুষের সান্নিধ্য এখন লিডিয়াকে লজ্জা দিচ্ছে। সে ব্যাকুল হয়ে বলল জয়দীপকে, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি এখন বল ফিরে পেয়েছি, একাই নেমে যেতে পারব।

জয়দীপ ধীরে ধীরে শিথিল করে দিল তার আলিঙ্গন। তবু শক্ত করে ধরে রইল লিডিয়ার হাত।

জয়দীপ বলল, সুস্থ বোধ করছ?

জয়দীপের মুখের দিকে দু'টি চোখের দৃষ্টি মেলে মাথা কাত করল লিডিয়া।

জয়দীপের হাত ধরে নীচে নামল লিডিয়া আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নীচের পথে পেছনের যাত্রীদের অস্পষ্ট কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল। ঝর্না থেকে খানিকটা জল এনে লিডিয়ার মুখে চোখে ছিটিয়ে দিল ফ্লসি।

লিডিয়া বলল, এখন আমার আর কোন অসুবিধে নেই। হঠাৎ কেমন যেন মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল।

ওরা পাথরের স্তূপটাকে পেছনে রেখে রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল।

পেছনের লোকেদের এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওদের দেখে দূর থেকে ফ্লসি চেঁচিয়ে হাত নাড়তে শুরু করে দিল—এই যে আমরা, আসুন, আসুন, আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে আছি।

লিডিয়া অনুচ্চ গলায় জয়দীপকে বলল, দেখুন, আমার জন্যে ওকে মিথ্যে অভিনয় করতে হচ্ছে, খুব খারাপ লাগছে আমার।

জয়দীপ বলল, তুমি এত সিরিয়াসলি সব কিছু দেখ কেন লিডিয়া? জীবনে আনন্দের দেখা পেতে গেলে অনেক সময় ছোট ছোট মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়। এসব মিথ্যে কারো কোন ক্ষতি করে না, শুধু টুকরো টুকরো আনন্দ আসার পথ খুলে দেয়।

লিডিয়ার খুব ভাল লাগল কথাগুলো। সে কোন দিন শোনে নি এ ধরনের কথা। মিথ্যাকে চিরদিন মিথ্যা বলেই পরিহার করে এসেছে। কিন্তু এমন মিথ্যাও আছে যা উপভোগ্য, তা এই প্রথম সে জয়দীপের মুখ থেকে জানতে পারল।

ওরা সবাই মিলে যখন টাইগার হিলে এসে পৌঁছল, তখন ভোরের আয়োজন চলেছে। চারদিকের পর্বত উপত্যকা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

দলের অভিজ্ঞ লোক মিঃ টেলর। তিনি তরুণ বয়সে কয়েকবার আল্পস্ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পৃথিবীর পার্বত্য মানচিত্র তাঁর চোখের সামনে আঁকা। একাধিক বার তিনি দার্জিলিং-এর পার্বত্য উপত্যকাগুলি চষে বেড়িয়েছেন।

তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল সকলে। তিনি তাঁর হাতের স্টিকটা তুলে বললেন, ওদিকে দক্ষিণে কার্শিয়াং পাহাড়। সমতল আর তরাই অঞ্চলের ভেতর দিয়ে পারদের রেখার মত বয়ে যাচ্ছে তিস্তা, মহানদী, বলাসন আর মেকী নদী। সূর্য যখন মাথার ওপর উঠবে, তখন ঝকঝকে রুপোর মত চোখের সামনে ফুটে উঠবে ঐ সব নদীর ছবি।

এবার আমরা যেদিক থেকে এলাম সেদিকে ফিরে তাকান। উত্তরে সিঞ্চলের ঠিক সাতহাজার ফিট নীচে রঙ্গীত নদীর গভীর উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। রঙ্গীত গিয়ে মিশেছে তিস্তায়। তিস্তার ওপারে ঐ যে দেখা যাচ্ছে সিকিম নেপাল আর ভুটানের পর্বতশ্রেণী। দেখুন শিখরের পর শিখর তুষারে ঢাকা। ঐ যে কাঞ্চনজঙঘা, কাব্রু, পান্‌দিম্ শৃঙ্গগুলো এখান থেকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে।

মিস রোল্যান্ড বললেন, এভারেস্ট দেখা যাবে না?

মিঃ টেলর মিস রোল্যান্ডের কাছে দেহটাকে একটু নীচু করে এনে স্টিকখানা তুলে দেখাতে লাগলেন, ঐ যে ধূসর রঙের পর্বতশ্রেণী দেখছেন, ওটা সিঙ্গলীলা মাউন্টেন রেঞ্জ। ওর ওপর দিয়ে তাকান। দেখতে পাচ্ছেন তিনটি স্নো পিক?

মিস রোল্যান্ড বললেন, ঐ যে দেখতে পাচ্ছি। আর্মচেয়ারের মত ঐ সবচেয়ে উঁচু পিকটা নিশ্চয়ই এভারেস্ট।

মিঃ টেলর হেসে বললেন, ওটা মাকালু, এভারেস্ট নয়। অনেক কাছে আছে বলে ওকে এভারেস্টের চেয়েও উঁচু দেখায়। দুটো স্নো পিকের মাঝে ঐ যে তুষার শীর্ষটুকু দেখা যাচ্ছে, ওটিই জগতের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট।

ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে সূর্যোদয়ের রঙের খেলা। সাদা তুষারে লাগল হালকা লালের ছোঁয়া। ধীরে ধীরে ফুটে উঠল সে লাল। আবার ফিকে হয়ে গেল লালের রেশ। এ সময় বরফের ওপর যেন কয়েকটা রঙ খেলা করে গেল। তারপর শুরু হল সোনা রঙের প্রবাহ।

স্তব্ধ হয়ে সকলে দেখতে লাগল রঙের খেলা। এ রূপ চোখ থেকে ফিরে যাবার নয়, মনে চিরদিনের ছবি হয়ে থাকবার।

টাইগার হিল থেকে সিঞ্চলের অরণ্য ঘেরা লেকের কূলে নেমে আসার সময় একটি কাণ্ড করে বসলেন মিসেস বেক্‌লে। পথের ওপর বসে পড়ে বললেন, হাঁটুর ব্যথাটা তাঁর দারুণ চাড়া দিয়ে উঠেছে, তাঁর সঙ্গে যদি লিডিয়া কিংবা ফ্লসি থাকে তাহলে ভাল হয়। আর সবাই পিকনিক স্পটে এগিয়ে যেতে পারেন।

অগত্যা সবাই এগিয়ে গেল মিসেস বেক্‌লের কাছে রইল ফ্লসি আর লিডিয়া। লিডিয়াকে একা ছেড়ে ফ্লসি এগিয়ে যেতে চাইল না। নিরুপায় জয়দীপ ওদের সঙ্গে থাকার কোন অজুহাতই খুঁজে পেল না। সে ওদের ছেড়ে এগিয়ে চলল দলের সঙ্গে। মিসেস বেক্‌লে মনে মনে হেসে তাঁর চাপা ক্ষোভটা মেটালেন।

সারাদিন সিঞ্চলে পিকনিকের আনন্দে মেতে রইল ওরা। পাহাড় আর বনের মাঝে সুন্দর জলাধার। এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কত রকম দুষ্টুমির খেলা খেলল ওরা তিনজনে। সবার সামনে এলেই ভাল মানুষের অভিনয়। ফ্লসি অভিনয়ের নায়িকা। নায়ক জয়দীপ। কিন্তু একেবারে অপটু অনভিজ্ঞ এ ব্যাপারে লিডিয়া। সে ওদের কলাকৌশলগুলো যতটুকু পারল উপভোগ করতে লাগল।

চলে আসার আগে কাঠের তৈরি ক্যানোপির তলায় দাঁড়িয়ে ফ্লসি বলল, ঐ যে ওখানে একটা লগবুক রাখা আছে। কেউ দেখে নি ওটা। আমি আর প্রফেসার বোস আলাদা আলাদা গিয়ে ওতে রিমার্ক লিখে রেখে এসেছি, তুমি চলে যাও লিডিয়া, যা খুশী লিখে দিয়ে এস। খবরদার নিজের নাম লিখবে না। ইচ্ছে করলে বরং ফিকটিশাস নাম লিখে আসতে পারো।

লিডিয়া বলল, এ কথা কেন বলছ? তুমি তো জানো, আমি মিছে কথা লিখতে পারব না।

ফ্লসি ধমকের সুরে বলল, দয়া করে তাহলে ঐ বুড়োদের দলে ভিড়ে যাও, তোমাকে আর লগবুকে রিমার্ক লিখতে হবে না।

অগত্যা কি ভেবে পায়ে পায়ে এগোল লিডিয়া। ও গিয়ে লগবুক খুলে দেখল বাংলা হাতের লেখায় পর পর দু'টি রিমার্ক লেখা আছে।

'সিঞ্চলের লেক যেন পাহাড় অরণ্যের গভীরে একটি হৃদয়।

সে হৃদয়ে আকাশ আর ভেসে চলা মেঘের ছায়া পড়ে।'

লিডিয়া লিখল, 'সে আকাশ আর সে সুন্দর ভাসমান মেঘ—ফ্লসি।'

ওরা লেক পিছনে ফেলে চলতে লাগল ঘুমের পথ ধরে। সামান্য কিছু পথ উঠে গিয়ে ফ্লসি লিডিয়ার কানে কানে বলল, কি লিখলে?

বলব না।

ফ্লসি পীড়াপীড়ি করল না। সে মিস রোল্যান্ডের কাছে গিয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, মানিব্যাগটা ফেলে এসেছি ক্যানোপির তলায়। আপনারা এগোন, আমি এখুনি আসছি।

ও ছুটল নীচে, লগবুকের কাছে। গিয়ে দেখে চিত্তির। সে তার নামটার আগে বসাল লিডিয়া, আর সে হৃদয়, জয়দীপ।

শেষের ক'টা লাইন দাঁড়াল, 'সে আকাশ আর সে সুন্দর ভাসমান মেঘ—লিডিয়া, ফ্লসি। আর সে হৃদয়, জয়দীপ।

লিখেই ফিরে এল ও। মানিব্যাগ পাওয়া গেছে জেনে সবাই আশ্বস্ত হল।

ফ্লসি পথ চলতে চলতে লিডিয়ার কানে কানে বলল, ষোলকলা পূর্ণ করে এসেছি। লিখে দিয়ে এসেছি তিনজনের নাম। এখন যে যা ভাবে ভাবুক। ভেবে বুক ফেটে মরুক।

ক্লাস শেষে কমন রুমের ব্ল্যাক বোর্ডে লেখা থাকে প্রফেসারের নাম। যে ছাত্র-ছাত্রী যে প্রফেসারের স্পেশাল টিউটোরিয়াল ক্লাস চায়, সে সন্ধ্যায় তাঁর নাম লিখে রাখে ব্ল্যাক বোর্ডে। সেদিন আর কোন ছাত্র-ছাত্রী সে প্রফেসারকে পাবে না, এই নিয়ম।

ফ্লসির জ্বালায় আর কোন ছাত্র-ছাত্রীর জয়দীপকে পাবার উপায় নেই। ক্লাস করতে করতে কোন ফাঁকে পালিয়ে এসে সে ব্লাক বোর্ডে লিখে রেখে যায় নাম। প্রফেসর জয়দীপ বোস, ফ্লোরেন্স মরিস (ফ্লসি)।

কেবল এক একটা দিন সে ছেড়ে দেয় লিডিয়াকে তার জায়গাটা। লিডিয়া শান্ত, সে সইতে পারবে না সমালোচনা, তাই সে এ ব্যাপারে লিডিয়াকে বেশি জড়াতে চায় না। আর তাকে তো সবাই জানে। একটু কিছু বিরূপ বললেই প্রকাণ্ড ফণা তুলবে। তাই সবাই তার সঙ্গে সাবধানে কথা বলার চেষ্টা করে। কাজ পেতে চাইলে, অসুস্থ হয়ে সেবা পেতে চাইলে, কোন বিপদ থেকে মুক্তি পেতে চাইলে ফ্লসিকে একটু ভাল মুখে কথা বললেই হল। উপকার করার আন্তরিক ইচ্ছায় সে ঝাঁপিয়ে পড়বে, বাড়িয়ে দেবে দুটো হাত।

একদিন ফ্লসি এল জয়দীপের কোয়ার্টারে। সে আর লিডিয়া প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছে তারা কোন্ কোন্ সন্ধ্যায় স্পেশাল টিউটোরিয়াল ক্লাস করবে জয়দীপের কোয়ার্টারে গিয়ে। মিস রোল্যান্ড সম্মতি দিয়েছেন, সুতরাং ফ্লসি তোয়াক্কা করে না আর কারো সমালোচনার।

ফ্লসিকে একা আসতে দেখে জয়দীপ বলল, আজ যে দেখি একা, বান্ধবীটি কই?

ফ্লসি অমনি ফিরে চলতে শুরু করল।

এই, যাচ্ছ কোথায়? জিজ্ঞেস করল জয়দীপ।

ফ্লসি তখন জোরে পা চালাতে শুরু করেছে। পিছন না ফিরে চেঁচিয়ে বলল, পাঠিয়ে দিচ্ছি লিডিয়াকে।

জয়দীপ উঠল। সে তাকে অনুসরণ করে যেতে যেতে বলল, এই শোন, যেও না, যেও না, শোন।

ততক্ষণে ফ্লসি প্রায় দৌড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। জয়দীপ আরও জোরে পা চালিয়ে তাকে ধরতে চেষ্টা করল। ফ্লসি ঢুকে পড়েছে দেওদার বনের ভেতর। বনের বাইরে কুয়াশায় ছাওয়া চাঁদের আলোয়

মোটামুটি সব কিছু দেখা গেলেও বনের ভেতর সবই অস্পষ্ট।

এখানে-ওখানে সামান্য দু'একটা জায়গায় গাছের ডালপাতা আর কুয়াশা ভেদ করে এক-আধ চিলতে আলো এসে পড়েছে। এ পথে যাওয়া-আসার অভ্যেস নেই জয়দীপের। এ পথ শুধু ফ্লসির। অন্ধকারে সে একটুও পথ না হারিয়ে বড় বড় গাছের কাণ্ডের ফাঁক দিয়ে অবলীলায় যাতায়াত করতে পারে।

জয়দীপ ঢুকল দেওদার বনে। বনের শেষে ঝর্নার আওয়াজ পাচ্ছিল সে। অন্ধকারে সেই শব্দ সামনে রেখে চলতে লাগল জয়দীপ। ফ্লসির নাম ধরে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে চলল সে। কিন্তু সাড়া এল না কোন দিক থেকে। হঠাৎ জয়দীপের গলায় বেজে উঠল আহত একটা আওয়াজ।

কোথা থেকে বনের গাছ পাতা সরিয়ে পাথর ডিঙিয়ে জয়দীপের কাছে ছুটে এল ফ্লসি। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় বনের যে জায়গাটা রহস্যময়, সেখানে কপালে দুটো হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল জয়দীপ। ফ্লসি এসে তার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, দেখি, দেখি, কি হয়েছে তোমার!

জয়দীপ কোন কথা না বলে দুটো দীর্ঘ বলিষ্ঠ হাতে ফ্লসিকে জড়িয়ে ধরে হাসতে লাগল। মুহূর্তে ফ্লসি তার ভুল বুঝতে পারল। জয়দীপ মিথ্যা আঘাত পাওয়ার অভিনয় করেছে। কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে ফ্লসির। জয়দীপ তাকে অজস্র চুমুতে ভরে দিল।

ফ্লসি কান্না ভেজা গলায় বলতে লাগল, দুষ্টুমি কর না, দোহাই তোমার জয়দীপ, ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে দুর্বল করে দিও না।

জয়দীপ হাতের বাঁধন খুলে দিল, কিন্তু ফ্লসি মুক্তি পেয়েও জয়দীপকে ছেড়ে গেল না। সে হাত বাড়িয়ে জয়দীপের একখানা হাত ধরে তাকিয়ে রইল জয়দীপের মুখের দিকে।

জয়দীপ বলল, আমার জীবনের হঠাৎ এ উত্তেজনাটুকু ক্ষমা কর ফ্লসি।

ফ্লসি বলল, তোমাকে প্রথম দিনটি থেকে আমি ভালবাসতে বাধ্য হয়েছিলাম জয়দীপ। তারপর থেকে প্রতিটি মুহূর্তে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে গেছি। তোমার কাছে থাকব অথচ তোমাকে মনের থেকে দূরে রাখব বলে আমার দুঃখগুলোকে আনন্দ, হাসি, গান দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিলাম।

জয়দীপ বলল, কেন তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন ফ্লসি?

ফ্লসি একটু হেসে বলল, আমার মন বুঝতে পেরেছিল, তোমার চোখের চাহনি কোন নীলনয়নাকে খুঁজে ফিরছে।

জয়দীপ বলল, এই বনের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে তোমাকে আমি মিথ্যে বলব না, লিডিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তবে এ কথাও সত্য যে, ভুলতে চাইলেই তোমাকে ভোলা যায় না।

সবই আমি জানি জয়দীপ, লিডিয়া আর আমি দু'জনই তোমার মনের কোণে ঠাঁই করে নিয়েছি। কিন্তু—

কিন্তু কি ফ্লসি?

ফ্লসি যেন অনেক দূরের থেকে কথা বলল, আমি বাগদত্তা জয়দীপ।

জয়দীপের মনে হল, কথাটা যেন দূরে কাছে সব ক'টি পাহাড়ে বেজে উঠল—আমি বাগদত্তা, আমি বাগদত্তা, আমি বাগদত্তা।

জয়দীপ মাথা নীচু করে বলল, আমি জানি না সে কোন্ ভাগ্যবান, যার কাছে তুমি বাগদত্তা। তবে আজ সেই অপরিচিত মানুষটির কাছেও আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইছি ফ্লসি।

ফ্লসি বলল, তুমি কেন এত দেরি করে এলে জয়দীপ? জীবনে যা কিছু পেতে চাই আমরা, সব পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে তবে তা আসে। বন্ধ দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে সে শুধু হাতছানি দেয়, সে শুধু কাঁদায়।

জয়দীপ কোন উত্তর দিতে পারল না এ-কথার।

একটু থেমে ফ্লসি আবার বলল, তুমি শুধু আমার মনেই ঝড় তোল নি, ঝড় তুলেছ লিডিয়ার মনেও। সে তোমাকে ভালবাসে। সে ভীরু, তাই হৃদয়টা মেলে ধরতে পারে না।

জয়দীপ বলল, ও কোন দিন আমাকে ওর মনের খবর দেয় নি ফ্লসি।

ফ্লসি বলল, মেয়েরা কখনও স্পষ্ট করে নিজের গভীর গোপন মনের দরজা খুলে দেয় না। সে

অপেক্ষা করে থাকে সেই পুরুষের জন্য যে নিজে এসে দুটো বলিষ্ঠ হাত দিয়ে খুলে দেবে তার গোপন মনের দরজা, লুঠ করে নেবে তার সব ঐশ্বর্য। মেয়েরা লুণ্ঠিত হতে ভালবাসে জয়দীপ।

কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় গলার স্বর কেঁপে যাচ্ছিল তার।

জয়দীপ বলল, চল ফ্লসি, আমরা ঘরের ভেতর বসে কথা বলি। তোমার কষ্ট হচ্ছে?

ফ্লসি বলল, না, ঘরে গেলে সব কথা আমার হারিয়ে যাবে। আজ এই রাতের বনে আমার মনের সব কথা উজাড় করে বলে যাব তোমাকে। আমার পাপপুণ্যের সব কথা এখনও শেষ হয় নি।

ফ্লসি কয়েক মুহূর্তের জন্যে থেমে দাঁড়াল। তারপর একসময় বলল, তুমি আজ আমাকে অজস্র আদরে ভরে দিতে গিয়ে অনুতপ্ত হয়েছ। কিন্তু জয়দীপ, আমি কি কোন পাপ করি নি? আমি কি বাগদত্তা হয়েও আমার রাতের বিছানায় একান্তে ভাবি নি তোমার কথা? তুমি চুম্বন এঁকে দিয়েছ, আমি কি মনে মনে সেই চুম্বন কোনদিন তোমাকে ফিরিয়ে দিই নি! সব মানুষই বাইরে মস্ত বড় অভিনেতা জয়দীপ। প্রায় প্রত্যেক নারী-পুরুষের মনেই স্বেচ্ছাচারী আর একটি নারী বা পুরুষ বাস করে। সে গোপন মনে ইচ্ছে মত অতিথিকে আমন্ত্রণ জানায়, তার সঙ্গে মেতে ওঠে খেলায়।

জয়দীপ বলল, তোমার কথায় দারুণ জ্বালা আছে, কিন্তু এসব কথা আগুনের মত সত্য ফ্লসি।

ফ্লসি বলল, যে মানুষটি আমাদের পথ দেখিয়েছেন, সেই প্রভু যীশুর অভিজ্ঞতার ভেতরেও এই সত্য রয়েছে।

জয়দীপ কথাটা বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল ফ্লসির দিকে।

ফ্লসি বলল, এক সময় কতকগুলো মানুষ প্রভু যীশুর সামনে ধরে নিয়ে এসেছিল একটি স্ত্রীলোককে। তার অপরাধ, সে ব্যভিচার করেছে অর্থাৎ পাপী। আর সেজন্যে দেশের আইন অনুসারে তার শাস্তি লোষ্ট্র নিক্ষেপে মৃত্যু।

প্রভুকে লোকগুলো জিজ্ঞেস করল, একে হত্যা করা হবে কিনা?

প্রভু যীশু বললেন, নিশ্চয়ই, লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে ওকে হত্যা করা হবে। কিন্তু প্রথম লোষ্ট্র সে-ই নিক্ষেপ করবে যে আজ পর্যন্ত মনে মনেও কোন পাপ করে নি। ফলে সকলে মাথা নীচু করে চলে গেল।

প্রভু যীশু জানতেন, যেহেতু মনে মনে কামনা করা তো দূরের কথা, কোন নারীর দিকে কামভাবে দৃষ্টিপাত করাও পাপ, সেহেতু প্রতিটি মানুষ কোন না কোন সময়ে মনে মনেও পাপ করেছে। দেহ থাকলেই দেহ-চিন্তা আসবে। প্রভু যীশু তাই সেই স্ত্রীলোককে ক্ষমা করেছিলেন।

জয়দীপ বলল, ফ্লসি, তোমার মনে যে কোন সংস্কার নেই, এ কথা জেনে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। সত্যকে তুমি যেভাবে প্রকাশ করলে, আমাদের কারো পক্ষেই বোধ করি সেভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

ফ্লসি বলল, অনেক রাত হয়েছে, এখন চল, তোমাকে কোয়ার্টারে এগিয়ে দি।

ওরা ফিরে এল জয়দীপের কোয়ার্টারে। ঘরের আলোয় প্রথমে কেউ কারো দিকে তাকাতে পারছিল না। অন্ধকার যে লজ্জা ঢেকে দেয়, আলোতে সে লজ্জা বড় বেশি করে প্রকাশ পায়।

জয়দীপ দেখল, টেবিলের ওপর পড়ে আছে ফ্লসি আর লিডিয়ার গত সন্ধ্যায় ফেলে যাওয়া খাতা পেন্সিল বইপত্র। টেবিলের ওপারে দুটো চেয়ার তেমনি সাজানো রয়েছে। ফ্লসি ভেতরের ঘরে ঢুকেছে। জয়দীপ বসে রইল তার চেয়ারে। জয়দীপের বসে থাকতে থাকতে মনে হল, ঐ দুটো খালি চেয়ার আর খালি নেই। সেখানে এসে বসে আছে ফ্লসি আর লিডিয়া—তারা পলক ফেলছে না, অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে জয়দীপের দিকে।

জয়দীপের অপরাধবোধ তাকে, কেন জানি না, বড় বেশি পীড়া দিতে লাগল। সে ওদের দিকে তাকাতে পারল না।

ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ফ্লসি। সে এসে বসল জয়দীপের পাশে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে। একটা ফটো সামনে রেখে বলল, দেখ তো মেয়েটাকে, চিনতে পারো কিনা।

জয়দীপ দেখল সুন্দর একখানা রঙীন ছবি। একটা গ্রোভের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে

আর একটি পুরুষ। ফ্লসি হাসছে। পুরুষটি, মনে হল, প্রকৃতির দিক থেকে একটু গম্ভীর। চিন্তাশীল মানুষের ছাপ আছে তার চোখে মুখে।

ফ্লসির গলায় আবার সেই দুষ্টুমির সুর। সে এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। বলল, বল তো ঐ মানুষটি কে?

জয়দীপ ছবির দিকে তাকিয়ে বলল, অনুমানে মনে হচ্ছে, ইনি মিঃ ব্যাভিংটন।

ফ্লসি উচ্ছ্বসিত, বল কি করে জানলে তুমি?

জয়দীপ বলল, এমন সুন্দর একটি মানুষ মিঃ ব্যাভিংটন না হয়ে যায় না।

ফ্লসি এবার বলল, তোমার চেয়েও সুন্দর? মিছে বোল না।

ফটোতে ওঁকে বেশ চিন্তাশীল মানুষ বলে মনে হচ্ছে, সেদিক থেকে সুন্দর বইকি।

ফ্লসি ফটোখানা জয়দীপের হাত থেকে টেনে নিয়ে বলল, কথা ঘুরিও না। তোমার চেয়ে সুন্দর কোন দিক থেকেই নয়। তোমার চেয়ে ওর পড়ানোর ধারাও সুন্দর নয়। তবে মানুষটার মন খুব ভাল। স্বভাবে একেবারে আমার উলটো, কিন্তু ভালবাসা ওর একেবারে খাঁটি।

তারপর ব্যাগে ফটোখানা রাখতে রাখতে বলল, একবার ভেজা পোশাক ছেড়ে শুকনো পোশাক পরে ম্যাজিক দেখিয়ে ছিলাম না? এ ঘরের একটা ওয়ার্ডরোবে আমার অনেক পোশাক রাখা আছে।

ব্যাগে ফটোখানা ঢুকিয়ে একটা চিঠি বের করল ফ্লসি। তারপর সেখানা ঢুকিয়ে রেখে হাতড়ে হাতড়ে আর একখানা বের করে জয়দীপের হাতে দিয়ে বলল, এটা লেটেস্ট চিঠি। গত পরশু হাতে এসেছে, পড়ে দেখ।

জয়দীপ পড়বে কি পড়বে না ভাবছিল, ফ্লসি বুঝতে পেরে বলল, পড়ই না, সম্পত্তিটা আমার, আর আমি যখন পড়ার অনুমতি দিচ্ছি তখন বাধা কোথায়?

জয়দীপ চিঠিতে চোখ বুলিয়ে গেল। চিঠিখানাতে সুন্দর একটা মন ধরা পড়েছে। চিঠিতে মিঃ ব্যাভিংটনের কাজের ফিরিস্তি দেওয়া আছে, কিন্তু প্রতিটি কাজের ভেতর একটি প্রেমিক কিভাবে তার ভালবাসার পাত্রীটিকে মনে করছে, তার চমৎকার একটি ছবি ফুটে উঠেছে। চিঠি পড়া শেষ করে জয়দীপ বলল, মিঃ ব্যাভিংটনকে পেলে তুমি খুব সুখী হবে ফ্লসি।

ফ্লসি মুখ নীচু করে কি ভাবল। এক সময় বলল, এত দূরে থেকে যে মানুষটা আমার কথা ভাবছে, তার যত ত্রুটি, যত অসম্পূর্ণতা থাক, আমি তাকে ভুলে যাই কেমন করে বল। এই চিঠির ভেতর দিয়ে সে আমাকে তার কথা ভাবতে শেখাচ্ছে জয়দীপ।

পরের দিন একা পড়তে এল লিডিয়া। ওর দিকে তাকিয়ে মনে হল, সুন্দর সাদা ক্রীসেনথিমাম যেন ফুটে আছে টেবিলের ওপারে।

জয়দীপ বলল, ফ্লসিকে আজ ক্লাসে দেখলাম না, তোমার সঙ্গেও এল না, কি ব্যাপার বলতো?

লিডিয়ার স্থির চোখে মুখে একটুখানি চাঞ্চল্য দেখা দিল। সে বলল, কেন জানি না, কাল রাতে আপনার কোয়ার্টার থেকে ফিরে যাবার পর ও সেই যে বিছানা নিয়েছে আর ওঠে নি।

উদ্বিগ্ন জয়দীপ বলল, কোন রকম টেম্পারেচার নেই তো?

লিডিয়া মাথা নেড়ে বলল, মনে হল না।

জয়দীপ আবার বলল, তবে?

প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করল লিডিয়া। তারপর সংকোচ কাটিয়ে বলল, ও শুধু কাঁদছে।

কাঁদছে!

হ্যাঁ, অনেক পীড়াপীড়িতে একটুখানি খেয়েছে বটে, কিন্তু ওকে অনেক বলেও ক্লাসে নিয়ে যেতে পারলাম না। বলল, আগামী দিন যাব, আজ আর যাব না। ক্লাস থেকে ফিরে এসে দেখি ওর চোখে জল। টিউটোরিয়াল ক্লাসে ডাকলাম। ও প্রথমে উঠল, তারপর আবার বিছানা নিয়ে বলল, আজ থাক। ভাল লাগছে না কিছু, অন্য দিন যাব।

জয়দীপ মনে মনে ভাবল, যত উচ্ছল হোক ফ্লসি; ওর কোমল মনের কোথাও আঘাত লেগেছে,

যাকে সহজে ভুলতে পারছে না ও।

জয়দীপ কিছুক্ষণ পড়াল লিডিয়াকে। গভীর মনযোগ দিয়ে পড়ল লিডিয়া আর নোট করল। জীবনে এতটুকু যেন অবকাশ নেই মেয়েটির। সব ফাঁক নিশ্ছিদ্র কাজ দিয়ে ভরা তার।

পড়া শেষ হলে প্রতিদিনের মত সে কিন্তু আজ উঠে দাঁড়াল না। দু'একবার জয়দীপের দিকে চেয়ে কিছু যেন বলতে চাইল।

জয়দীপ বলল, কিছু বলবে লিডিয়া?

লিডিয়া এবার ব্যাগ থেকে একটা মাফলার বের করে বলল, এটা আপনার জন্যে বুনেছি।

জয়দীপ লিডিয়ার হাত থেকে মাফলারটা হাতে নিয়ে বলল, ভারি সুন্দর রঙ। বর্ডারের কাজ অতি চমৎকার হয়েছে। তুমি এত ভাল বোনা শিখলে কি করে?

লিডিয়া খুশী হয়ে বলল, আমাদের কনভেন্টে সব কিছু শেখানো হয়। আমরা ঐসব নিজেরা শিখে ডেসটিচিউট মেয়েদের শেখাই।

জয়দীপ বলল, তোমার উপহারের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে লিডিয়া।

লিডিয়া কৃতজ্ঞতায় মাথা নোয়াল।

যাবার সময় ইতস্ততঃ করে একখানা খামে ভরা চিঠি জয়দীপের দিকে বাড়িয়ে ধরল। মুখে কিছু বলল না।

জয়দীপ চিঠিখানা হাতে নিয়ে লিডিয়াকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসতে গেল।

কিছু পথ যাওয়ার পর লিডিয়া জয়দীপকে বলল, আপনার কষ্ট করে আর আসতে হবে না। ঠাণ্ডা পড়েছে। পাহাড়ে থাকার অভ্যেস নেই আপনার। একটু সাবধানে থাকবেন।

জয়দীপ বলল, ভবঘুরে মানুষ, কোন দিন সাবধানে থাকাব অভ্যেস নেই। তুমি যখন বলছ, চেষ্টা করে দেখব।

অকল্যান্ড রোডের ওপর নেমে গিয়ে জয়দীপ বলল, তোমাকে এই নীল পাড় শাড়ি আর কাজ করা ঘি রঙের শালখানায় অসাধারণ মানিয়েছে।

লিডিয়া অকল্যান্ড রোড ধরে যেতে যেতে ফিরে তাকাল। মিষ্টি করে হেসে হাত নাড়ল। জয়দীপও হাত নাড়ল। পথের বাঁকে চলে যাবার আগে আবার একবার ফিরে তাকাল লিডিয়া। জয়দীপ হাত তুলল। সুন্দর আর একখানা হাত পতাকার মত নাড়তে নাড়তে চোখের আড়ালে চলে গেল লিডিয়া।

জয়দীপ ফিরে এল। পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে তার ওপর বাংলা হাতের লেখায় ওর নামটা পড়ল। কিন্তু চিঠির ভেতরটা খুলে পড়তে ইচ্ছে করলেও পড়ল না। অজানা যতক্ষণ অজানা থাকে ততক্ষণই তার রোমাঞ্চ।

এ-বই ও-বই টেনে পড়ার চেষ্টা করেও পড়তে পারল না। শেষে এক সময় খুলতে হল চিঠিখানা। ছোট্ট চিঠি।

"শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখছি। জীবনের একটা সুন্দর মানে যেন দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমার মনের মধ্যে। আজকাল পরিচ্ছন্ন আকাশে কাঞ্চনজঙঘার রূপ বড় সুন্দর হয়ে ফোটে। দেখে দেখে যেন আর শেষ হয় না। আলো এত সোনালী যে আমি সারা গায়ে মেখে মেখেও ফুরিয়ে ফেলতে পারি না। এ সময়গুলোতে, কেন জানি না, আপনার কথা মনে হয়। আপনার কোয়ার্টার থেকে আসার পথে যে ঝোরাটা পেরিয়ে আসি, সেটার কাছে সেদিন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওর ঝিরঝির শব্দটা, মনে হচ্ছিল, আমার বুকের ভেতর বাজছে। হঠাৎ বুক থেকে একটা কষ্টের ঢেউ উঠে এল। চোখ উপচে জল ঝরল। কেন এমন হল জানি না। আমি এও জানি না, এসব কথা আপনাকে কেন লিখতে ইচ্ছে করছে।

আপনার দেওয়া টিউলিপ ফুলটা শুকিয়ে গেছে। আমি সেটিকে অতি যত্নে আমার বাংলা খাতার ভেতর রেখে দিয়েছি। কিন্তু চোখ বুজলে আমি দেখতে পাই ঐ শুকনো টিউলিপ তাজা টাটকা হয়ে আমার চোখ ছুঁয়ে আছে।

—আপনার লিডিয়া।

জয়দীপ দেখল চিঠিখানার ভেতর স্পষ্ট কোন আহ্বান নেই তার কাছে, কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা আগমনীর সুর বাজছে। একটা আলোয় ভরা ভালবাসা ঐ মিশন স্কুলের পথ ধরে, ঝির্‌ঝির্ ঝরে পড়া ঝর্নাটা পেরিয়ে, দেওদার বনের শিলা বিছানো পথ পার হয়ে উঠে আসছে ওপরে। এ ভালবাসার আলোটুকু বড় লাজুক। দরজা জানালা খুলে দিয়ে একে ঘরের ভেতর অভ্যর্থনা করে নিতে হয়। বন্ধ দরজার বাইরে ও অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে। না ডাকলে আসে না।

ক্রীসমাসের আগেই কিন্তু লন্ডনের উদ্দেশে পাড়ি দিল ফ্লসি। প্রিন্সিপ্যালের পারমিশান মিলেছে। পরের বছরের ক্লাসে আবার সে ভর্তি হবে। একেবারে ফিরবে মিঃ ব্যাভিংটনের সঙ্গে। ওখানকার চার্চেই হবে ওদের বিয়ে।

ফ্লসি দেখা করতে এল একদিন জয়দীপের সঙ্গে। একাই এল। এসেই বলল, চলে যাচ্ছি, হয়তো এসে আর তোমাকে দেখতে পাব না।

জয়দীপ বলল, সবচেয়ে বড় দুঃখ আমি তোমার চলে যাওয়ার কারণ হলাম।

ফ্লসি তার স্বভাব কৌতুকে বলল, তোমার জ্বালাতেই তো চলে যেতে হচ্ছে। লিডিয়ার সঙ্গে লড়াই করব সে অস্ত্র আমার কই।

জয়দীপ করুণ হেসে বলল, সব কিছুকে হাল্‌কা করে দেবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে তোমার। কিন্তু যাবার আগে আমাকে ক্ষমা করে যেতে হবে ফ্লসি।

ফ্লসি বলল, তোমাকে ক্ষমা করব আমি! তাহলে আমার রইল কি। একজন আমার কাছ থেকে শাস্তি পাবে, এ আমার কত বড় অহংকার।

জয়দীপ বলল, শাস্তি নিজের কাছ থেকেই পাচ্ছি ফ্লসি। মানুষের অন্যায়গুলো একদিন ভীষণভাবে তাকে শাস্তি দেয়।

কৌতুকময়ী ফ্লসির চোখ দুটো হঠাৎ ছলছলিয়ে উঠল। সে জয়দীপের পিছনে গিয়ে তার মাথাটা নিজের বুকের ওপর চেপে ধরল। এমনি শক্ত করে ধরে থেকে সে তার মনের আবেগটাকে চোখের জলে গলিয়ে দিল।

জয়দীপ বলল, কি হল তোমার ফ্লসি, এমন করে পিছনে লুকোলে যে। ক'টা দিনই বা আছ, একটুখানি দেখতে দাও তোমাকে।

ফ্লসি নিজের দেহের সঙ্গে ওর মাথাটা আরও জোরে চেপে ধরে বলল, বল, কেন তুমি অন্যায়ের কথা তুললে? কি অন্যায় করেছ তুমি?

জয়দীপ ওকে শান্ত করার জন্য বলল, এই এমনি মনে এল, তাই বললাম।

ফ্লসি বলে চলল, একটা মানুষ আমার ওপর অন্যায় করেছে ভেবে রাতদিন কষ্ট পাবে আর আমি লন্ডনে গিয়ে মহা খুশীতে বেড়িয়ে বেড়াব, কি মনে কর তুমি আমাকে—আমার কি মন বলে কোন কিছু নেই নাকি?

জয়দীপ ঘুরে দাঁড়িয়ে ফ্লসিকে টেনে এনে নিজের মুখোমুখি বসাল। তারপর মজা করে বলল, আমি একটি মেয়েকে এক সন্ধ্যায় দেওদার বনের ভেতর একান্তে পেয়ে একশো একটা চুমু খেয়েছিলাম। আমি মনে করি তাতে আমার একটুও অন্যায় হয় নি। এবার হল তো?

ফ্লসি এখন নিজের মুড ফিরে পেয়েছে। সে হৈ-হৈ করে উঠল, অন্যায় হয় নি মানে, একশো বার অন্যায় হয়েছে। পরের বাগদত্তার ওপর তুমি হামলা....।

ফ্লসিকে কথা শেষ করতে না দিয়ে জয়দীপ বলল, একেবারেই না। তখনও আমি জানি না যে ফ্লসি নামের মেয়েটি বাগদত্তা। তা ছাড়া তুমিই তো ছুটে এসেছিলে আমার কাছে।

ফ্লসি বলল, অ্যাই, আবার মিথ্যে। তুমি না মিথ্যে অভিনয় করলে আঘাত পাবার, তাই তো আমি ছুটে গেলাম তোমার কাছে।

নিজেকে সেজন্যেই তো আমি অপরাধী মনে করি ফ্লসি।

ফ্লসি অমনি বলল, না, তুমি কোন অপরাধ কর নি। যা স্বাভাবিক, তাই হয়েছে। আর সেজন্যে

কারো কিছু মনে করার নেই।

জয়দীপ এবার অন্য কথা পাড়ল, লন্ডনে গিয়ে তুমি চিঠি দেবে তো?

দেব, তবে তোমাকে নয়, প্রিন্সিপ্যাল মিস রোল্যান্ডকে।

জয়দীপ বলল, এই যে একটু আগে বললে, আমি কোন অপরাধ করি নি, তাহলে আমাকে চিঠি দেবে না কেন?

ফ্লসি বলল, তোমার দাঁতগুলো যদি পড়ে যেত আর চুলে ধরত পাক, তাহলে তোমাকে ডজন ডজন চিঠি লিখতাম। কিন্তু মিঃ ব্যাভিংটনের তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে অর বাগদত্তা কোন কারণেই চিঠি লিখতে পারে না।

জয়দীপ বলল, আমি কিন্তু মিঃ ব্যাভিংটনকে শ্রদ্ধা করি।

সে তোমার মহত্ত্ব, কিন্তু মিঃ ব্যাভিংটন যে তোমাকে সন্দেহ করে বসবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে।

জয়দীপ বলল, বেশ, আমাকে না দাও, লিডিয়াকে তো চিঠি দেবে?

তাকে দিই বা না দিই সে খোঁজে তোমার কাজ কি? আর তা ছাড়া লিডিয়াকে চিঠি লেখা অত সহজ নয়। ওদের কনভেন্ট ওকে আমার চিঠি নাও দিতে পারে। আর তা ছাড়া চিঠিপত্র লিখে কারো সঙ্গে ওর পক্ষে যোগাযোগ রাখাও নিয়ম বিরুদ্ধ।

জয়দীপ বলল, যাতে তোমার কোন রকম খবরই আমি না পাই, সে ব্যাপারে একেবারে পাকাপাকি ব্যবস্থা করে যাচ্ছ, কি বল?

ফ্লসি বলল, যদি কোন দিন মনে হয় একটা মেয়ে তোমাকে এক সময় খুব জ্বালিয়েছিল, তাহলেই আমি বেঁচে আছি বলে মনে করো জয়দীপ। আর যখন আমার কথা একবারটিও মনে পড়বে না, তখন মনে করো এ দুনিয়ায় ফ্লসি বলে কোন মেয়ে কখনোই ছিল না।

একটানা কথা বলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ফ্লসি। তারপর আবার তার চঞ্চল স্বভাবটা ফিরে এল। সে বলল, আমি চলে যাচ্ছি। এখন তোমার পোশাকগুলো ইস্ত্রি করে দেবার ভার রইল লিডিয়ার ওপর, ওকে বলেও দিয়েছি।

জয়দীপ বলল, আমার কাজ এবার থেকে আমিই করব।

ফ্লসি বলল, নিজের কাজ নিজে করার ছেলেই নও তুমি। তাদের চেহারা ধরনধারণই আলাদা। তোমাকে যে খুব শীগগির সংসার পাততে হবে, তার পরিচয় তোমার অগোছালো কাজের ভেতরই ছড়িয়ে আছে।

জয়দীপ কৌতুক করে বলল, দেখ, আমার বউকে আমি একটুও কষ্ট দেব না। নিজের কাজগুলো তার ঘাড়ে কখ্খনো চাপাব না।

চলে যাচ্ছি, একটু কফি খাওয়াবে না?

জয়দীপ উঠতে যাচ্ছিল, ফ্লসি তাকে টেনে বসিয়ে নিজেই উঠে গেল ভেতরে।

কিছুক্ষণ পরে কফি তৈরি করে আনল। ওরা কফি খেতে খেতে টুকরো টুকরো গল্প করল। অতি সাধারণ কথায় ওদের মনের গুরুভারটা কমে এল। বিদায়ের মুহূর্তটাকে ওরা আর ভারী করতে চাইল না। ফ্লসি যাবার সময় বলল, আমাকে কষ্ট দিলে দিলে, কিন্তু দোহাই তোমার, ঐ মেয়েটাকে আর কষ্ট দিও না। ভালবাসার ঠিক পাওনাটা যেন ও পায়।

আনন্দের একটা রঙীন প্রজাপতির মত জয়দীপের চোখের সামনে দুদিন ওড়ার খেলা দেখিয়ে ফ্লসি গেল সাগরপারে।

এ বছর প্রচণ্ড শীত পড়েছে। সবাই অপেক্ষা করছে ক্রীসমাসের। ক্রীসমাসের উৎসব শেষ হলেই নেমে যাবে নীচের মিশনগুলোতে। বন্ধ থাকবে পুরো দু'টি মাস ল্যাংগুয়েজ স্কুল।

প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ড কোথাও যান না, তিনি তাঁর কোয়ার্টারেই পুরো শীতটা কাটিয়ে দেন। এবার প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টারে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে লিডিয়ার। সে পুরো ছুটিটা একা জয়দীপের কাছে

পড়বে। জয়দীপ শীতে এখানেই থাকবে, কারণ তার আর কোথাও যাবার নির্দিষ্ট জায়গা নেই।

ক্রীসমাসের আনুষ্ঠানিক উৎসবের দিন সাজানো হল ল্যাংগুয়েজ স্কুল, হোস্টেল। নীচ থেকে জলাপাহাড়ের ওপর অব্দি উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। পথে পথে হরিণ টানা রথে চলেছে সান্তা ক্লজ। ওপরের চার্চে ঘণ্টা বাজছে ঘনঘন। পাহাড়ী ছেলেমেয়েদের খাবার আর গরম পোশাক বিতরণ করলেন প্রিন্সিপ্যাল।

সন্ধ্যার আলোকসজ্জার ভেতর সমবেত প্রার্থনা শেষ হল। লিডিয়া এক ফাঁকে চলে এল জয়দীপের কোয়ার্টারে। উপহারের একটা প্যাকেট রেখে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ জয়দীপের ফেরার জন্যে।

জয়দীপ যখন ফিরল, তখন অপেক্ষা করে চলে গেছে লিডিয়া।

জয়দীপ প্যাকেট খুলে দেখল, তার গায়ের মাপে তৈরি একটা সোয়েটার। কবে কখন গোপনে এসে লিডিয়া মাপ নিয়ে গেছে তার পুরনো সোয়েটারের। কিছুই জানতে পারে নি সে। সামনে একটা কার্ড। যীশুর ছবি আঁকা। তার নীচে লেখা আশ্চর্য কয়েকটি কথা :

ONE SOLITARY LIFE

He was born in an obscure village. He worked in a carpenter shop until He was thirty. He then became an itinerant preacher. He never held an office. He never had a family or owned a house. He didn't go to college. He had no credentials but Himself. He was only thirty-three when the public turned against him. His friends ran away. He was turned over to His enemies and went through the mockery of a trial. He was nailed to a cross between two thieves. While He was dying, His executioners gambled for His clothing, the only property He had on earth. He was laid in a borrowed grave. Nineteen centuries have come and gone, and today He is the central figure of the human race. All the armies that ever marched, all the navies that sailed, all the parliaments that ever sat, and all the kings that ever reigned have not affected the life of man on this earth as much as that ONE SOLITARY LIFE.

সারাটা রাত এই লেখার কথাগুলো জয়দীপকে তাড়া করে ফিরল। ঘুমের ভেতর সে স্বপ্নে দেখল, একটি তিরিশ বছরের যুবক অতি সামান্য একটা পোশাক পরে পথে পথে ঘুরছে। মানুষের কাছে তার নিজস্ব অনুভূতির কথাগুলো গল্পের ছলে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। সবাই পথে ঘাটে হাটে বাজারে ভীড় করে দাঁড়িয়ে শুনছে তার কথা। ... হঠাৎ কতকগুলো মানুষ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে দুটো চোরের সঙ্গে। সে মানুষটির কাঁধে একটি ক্রশ। বার বার পড়ে যাচ্ছে মাটিতে, আবার উঠে বইছে ক্রশের ভার। .... তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। তার সামান্য পোশাকটুকু কে নেবে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। .... তারপর টুকরো টুকরো কতগুলো ছবি মিছিল করে এলো স্বপ্নের ভেতর। সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পাল তুলে চলেছে অগুনতি যুদ্ধ জাহাজ। লক্ষ লক্ষ সৈন্য চলেছে মার্চ করে। কোথায় যেন বসেছে পার্লামেন্ট। .... কিন্তু দেখা যাচ্ছে, একটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে হাত তুলে আর তার চারদিকে মিছিল করে আসছে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ।

শীতের দিনগুলো পাহাড়ী দেশে সত্যি অসহনীয়। দুপুরের একটু পরেই প্রচণ্ড একটা হাওয়া বয়ে আসতে থাকে উত্তরের তুষার পাহাড় ছুঁয়ে। লিডিয়া আর জয়দীপ পড়া শেষ করে তারই ভেতর বেড়াতে বের হয়। গাছের পাতাগুলো বিবর্ণ দেখায়। দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝক্‌ঝক্ করতে থাকে। ছোট ছোট পাহাড়ী বাংলোর সামনের লনে মরশুমী ফুলের রঙ-মিছিল দেখতে দেখতে ওরা পথ চলে। কোন কোন দিন প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ড ওদের সঙ্গে বেড়াতে বের হন। তিনি তাঁর জীবনের কত অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তাঁর তরুণ জীবনের ব্যর্থ ভালবাসার কথা বলতেও সঙ্কোচ বোধ করেন না এই দু'টি তরুণ-তরুণীব কাছে।

কিন্তু মিস রোল্যান্ডের পক্ষে প্রতিদিন ওদের সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়ানো সম্ভব হয় না। বয়সের ধর্ম তাঁকে মেনে চলতে হয়।

জয়দীপ আর লিডিয়া একদিন বসেছিল একটি শিলাখণ্ডের ওপর। পিছনে দেওদারের পাতা শীতের হাওয়ায় কি যেন কথা বলছিল। সামনে উপত্যকা। দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার মহিমা। কোথায় যেন একটা ঝর্না বয়ে যাচ্ছে। দেওদার বনের ফাঁকে এক টুকরো সোনালী রোদ হঠাৎ এসে খেলা করতে লাগল লিডিয়ার অনাবৃত মুখের ওপর।

জয়দীপ কথা বলে যাচ্ছিল। টুকরো টুকরো কথা। সে কথায় অর্থের ধারাবাহিকতা ছিল না, কিন্তু একটা ভাল লাগার সুর বেজে উঠছিল।

হঠাৎ কথা বন্ধ করে জয়দীপ তাকিয়ে রইল লিডিয়ার মুখের দিকে। চোখের নীল তারা মেলে লিডিয়াও তাকিয়ে রইল। এ চাওয়ার যেন শেষ নেই।

জয়দীপ লক্ষ্য করল, অন্য দিনের মত লিডিয়া তার চোখ নামিয়ে নিল না। তখন জয়দীপ লিডিয়ার কোলের ওপর পেতে রাখা হাত দু'খানার ওপর যেখানে সোনালী আলো খেলা করছিল, সেখানে ধীরে ধীরে হাত রাখল। বলল, তোমার ঐ হাত দু'টি নিয়ে শুধু কি সোনালী আলোরই খেলা করার অধিকার!

এতক্ষণে মাথা নেড়ে চোখ নামাল লিডিয়া। সে অনুভব করল, গ্রীষ্মের ছুটে চলা ঝর্নার জল যেন তার আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করছে। লিডিয়ার মনে হল সম্পূর্ণ এক অজানা রাগিণী কে যেন তার সারা দেহ জুড়ে বাজাচ্ছে। লিডিয়া থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

জয়দীপ শ্বেত চন্দ্রমল্লিকাটিকে দু'টি অঞ্জলিবদ্ধ হাতে তুলে ধরে চেয়ে রইল সেদিকে। লিডিয়ার নীল চোখের তারা অবাক্ বিস্ময়ে জয়দীপের মুখের ওপর স্থির।

জয়দীপ অস্ফুট গলায় বলল, তোমার ঐ শ্বেত চন্দ্রমল্লিকার মত মুখখানাতে শুধু কি নীল ভোমরার মত দুটো তারা খেলা করবে লিডিয়া?

ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল লিডিয়ার চোখ। এখন অদৃশ্য হয়ে গেছে নীল নীল দুটো ভ্রমর। চন্দ্রমল্লিকার সাদা রঙে হঠাৎ কি জাদুতে লেগেছে গোলাপী লালের ছোঁয়া। জয়দীপ চুমু খেল। লিডিয়ার মনে হল, একটা গোলাপের পাপড়ি কে যেন ছুঁইয়ে দিল তার ঠোঁটের ওপর।

ওদের ফিরে আসার আগে কেউ যদি তাকিয়ে দেখত ওদের, তাহলে একটা আশ্চর্য ছবি তাদের চোখের ওপর ফুটে উঠত।

জয়দীপ ভাস্কর্য মূর্তির মত দাঁড়িয়ে নীচু হয়ে ধরে রয়েছে লিডিয়াকে। নতজানু লিডিয়া জয়দীপের জানুতে মাথা ছুঁইয়ে রেখেছে প্রার্থনা ভঙ্গিতে। তার দু'টি হাত পাতার মত মুখখানাকে ঢেকে রয়েছে। একটু আগে যে অশান্ত আলোড়ন দুটি দেহকে ভেঙে চূর্ণ করে দিয়ে গেছে, সে লজ্জাকে যেন লিডিয়া ভাষাহীন প্রকৃতির দৃষ্টি থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করছে আড়াল করে ফেলবার।

সাত সকালে লিডিয়া এসে বলল, দার্জিলিং থেকে তোমারও বাজবে ছুটির ঘণ্টা আর আমারও শেষ হবে লেখাপড়ার কাজ। তখন দু'জনেরই ছুটি।

বিছানায় লেপের তলা থেকে মুখ বের করে অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করল জয়দীপ। বলল, ছুটি তোমায় দিচ্ছে কে? এখান থেকে বেরিয়ে যখন ছোট্ট একখানা ঘরে ঢুকব আমরা দু'জনে তখন শুধু কি তুমি সংসার গড়তেই সারা সময়টা কাটিয়ে দেবে?

লিডিয়া শান্ত গলায় বলল, বল, কি করব আমি?

উত্তেজিত হয়ে বিছানায় উঠে বসল জয়দীপ।

পড়াব তোমাকে। এত সুন্দর বাংলা শিখেছ তুমি। তোমাকে শেষ পর্যন্ত পড়িয়ে নেব ইউনিভার্সিটির আঙিনায়।

লিডিয়া মেঝেতে বসে জয়দীপের চৌকিটা ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে বলল, তুমি যে ঘর ভাড়া করবে তাতে আমার জন্যে একটা প্রার্থনার জায়গা থাকবে তো?

জয়দীপ বলল, নিশ্চয়ই থাকবে। আর সেটা হবে আমাদের সবচেয়ে সেরা ঘর।

আর দেখ, লিডিয়া বলল, আমাকে সারাদিনের ভেতর যে কোন একটা সময়ে একটু বাইরে

বেরোতে দিও। আমি ছোট ছোট দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের সেবা করব, পড়াব, প্রভু ভালবাসতেন তাদের। বলতেন, শিশুদের মাঝেই স্বর্গরাজ্য।

জয়দীপ লিডিয়ার হাত মুঠোর ভেতর নিয়ে বলল, একটি একটি করে গুনে গুনে তোমার সব ইচ্ছাই পূর্ণ করব লিডিয়া।

লিডিয়া ঘরেব ভেতর চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফুৎসো এল বেড-টি নিয়ে।

জয়দীপ চায়ে চুমুক দিয়েই শুনতে পেল একটা আওয়াজ।

ফুৎসোর দিকে প্রশ্নবোধক চোখ তুলতেই সে জানাল যে লিডিয়া কলতলায় জয়দীপের পোশাক পরিষ্কার করছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে লিডিয়া জয়দীপের শোবার ঘরের ভেতর দিয়ে চলে গেল বাইরেব বাগানে। হাতে কাচা কয়েকখানা জামা প্যান্ট। সেগুলো মেলে দিয়ে এসে বসল বাইরের পড়ার ঘরে। কিছু লেখার কাজ করবে এখন সে। তারপর ফুৎসো ব্রেকফাস্ট নিয়ে এলে জয়দীপ আর সে একসঙ্গে বসে খাবে। খাবার পর শুরু হবে পড়াশোনা।

এটা তার ছুটির দিনের বাঁধা রুটিন।

আজ পড়াতে ঢুকেই জয়দীপ বলল, তুমি শীতের দিনে এত অল্প পোশাকে থাক কি করে লিডিয়া? আর তা ছাড়া কলের ঠাণ্ডা জলে তুমি পোশাকগুলো কাচলেই বা কি করে?

লিডিয়া একটু হেসে বলল, তুমি বড় শীতকাতুরে জয়। আমাকে শীত একেবারেই কাবু করতে পারে না। বরং শীতকালটাতেই আমাব কাজের শক্তি বেড়ে যায়। কনভেন্টে শীতের দিনে বাইরে যাবার ভার আমার ওপরেই পড়ে। মাদার অ্যান ইচ্ছে করেই আমাকে সে কাজ দেন।

জয়দীপের পৌরুষে লাগল লিডিয়ার কথাগুলো। সে বলল, এমন কোন ঋতু নেই যাকে আমি জয় করতে পাবি না। বল তো, এই শীতেও আমি সন্দকফু ঘুরে আসতে পারি।

লিডিয়া হেসে বলল, তা তুমি পারবে না। প্রায় বারো হাজার ফুট উঁচু সে জায়গা। শীতে অসাড় করে দেবে তোমাকে।

তুমি পারবে?

লিডিয়া বলল, আমি ওখানে গেছি জিপে করে। তবে জানুয়ারিতে যাই নি। আমার কাছে শীত কোন সমস্যা নয়। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে আলাদা। তুমি এসেছ সমতল থেকে। পাহাড়ের চরিত্র সম্বন্ধে তোমার ধারণা স্পষ্ট নয়।

জয়দীপ বলল, আমি তৈরি, তোমার চ্যালেঞ্জ আমি নেব।

কিসে যাবে? জিপে না পায়ে হেঁটে?

পায়ে হেঁটে গেলে দারুণ রকম অ্যাডভেঞ্চার হবে।

লিডিয়া বলল, সবই তো হবে, কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের পারমিশান পাবে কি করে?

জয়দীপের উচ্ছ্বাস নিভে এল। হঠাৎ কি ভেবে নিয়ে বলল, চেষ্টা করে দেখব। আমার মনে হয়, প্রিন্সিপ্যাল যেমন লিবারেল তাতে আমাদের পারমিশান দিয়ে দিতেও পারেন।

হলও তাই, জয়দীপের বিশেষ কোন ভনিতা করতে হল না। এক কথায় মিস রোল্যান্ড রাজী হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, এ সব বয়েসে অ্যাডভেঞ্চারের স্পিরিট জাগাই স্বাভাবিক। আমি শরীরের দিক থেকে অক্ষম না হলে তোমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তাম। হ্যাঁ, এক কাজ কর, ফুৎসো খুব শক্ত ছেলে, ওকে সঙ্গে রাখ। বিপদে-আপদে কাজে লাগবে।

যাওয়ার সময় উনি লিডিয়াকে ডেকে কয়েকটা ওষুধ ওর হাতে দিয়ে বললেন, এগুলো রেখে দাও, হঠাৎ বুকে কফ জমলে কাজে লাগবে। তা ছাড়া গায়ের ব্যথার ওসুধও রইল। সবগুলো ওষুধের ব্যবহার বিধি লিখে দেওয়া আছে কাগজে। তুমি নার্সিং জানো, তোমাকে বেশি বলার দরকার নেই। এখন বেরিয়ে পড়, শুভেচ্ছা রইল তোমাদের যাত্রায়।

লিডিয়া আর জয়দীপ ফুৎসোকে সঙ্গে নিয়ে ঘুম থেকে যখন পশ্চিমে সীমানা বস্তির রাস্তা ধরে

এগোতে লাগল, তখন সবে নীল একটা উষা ফুটে উঠেছে। প্রবল শীতের হাওয়া ওদের উৎসাহের আগুনকে নেভাতে পারল না। ওরা মাইল চারেক হেঁটে এসে এক জায়গায় দাঁড়াল। স্থানটা নির্জন। শীতের মিষ্টি রোদটুকু বড় উপভোগ্য হয়ে উঠছিল। সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় একশো ফুট উঁচু একটা প্রকাণ্ড শিলাস্তূপ। সেদিকে আঙুল তুলে ফুৎসো বলল, ঐ উঁচু পাথরের ওপর থেকে আগে দুশমনদের নীচে ফেলে মারা হত।

লিডিয়া কথাটা শুনে বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকল। সে মনে মনে ঐ সব হতভাগাদের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানাল।

এর পর ওরা পথের ধারে বসে ওদের দিনের খাবার সেরে নিয়ে যখন সুকিয়াপোখরী গ্রামে এল, তখন বেলা প্রায় তিনটে। শীতের রোদে ঝিম ধরেছে। গাছে পাতায় লেগে আছে গাঢ় হলুদ আলো। শুক্রবার গাঁয়ের বাজার সরগরম। নেপালী আর ভুটিয়া মেয়ে-পুরুষের হাতে হরেক রঙের সোয়েটার। শীতের ফসল ওগুলো। কেনাবেচার দরদস্তুর চলেছে।

সুকিয়াপোখরী গ্রাম ছেড়ে ওরা ঢুকল একটা জঙ্গলের ভেতর। ঐ বনের পথটা ওদের কাছে স্মরণীয় হয়ে রইল। পাহাড়ী গাছগাছালির ভেতর দিয়ে কখনও উঁচু আবার কখনও নীচুতে ওঠা-নামা করে চলতে লাগল ওরা।

প্রায় এক মাইল চড়াই উতরাই ভেঙে ওরা এসে পৌঁছল রাতের আশ্রয় জোড়াপোখরী ডাকবাংলোয়।

তখন পাহাড়ের আড়ালে সূর্য লুকিয়েছে। আকাশে বিদ্ধ এক ঝাঁক তলোয়ার কে যেন ধীরে ধীরে ঢেকে ফেলেছে অন্ধকারের খাপে। ওরা বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সে ছবি। পাহাড়, বন, সূর্যাস্ত ওদের জীবনে বয়ে আনল এক নতুন আমন্ত্রণ।

সেই জোড়াপোখরীর রাতের ক্লান্ত অথচ উত্তাপ-মধুর স্মৃতি নিয়ে পরের দিন ওরা পথ চলা শুরু করল। কথায় কথায় কোথা দিয়ে ফুরিয়ে গেল এগারো মাইল পাহাড়ী পথ। প্রথম তিন মাইল এসে ওরা পেয়েছিল সীমানাবস্তি গ্রাম। সেখানে কিছু দরকারী জিনিস কিনেছিল ওরা। সেগুলো কাজে লাগল তংলু ডাকবাংলোতে। ফুৎসো ছেলেটা যেন দেহের ক্লান্তি কাকে বলে জানে না। সারাটা পথ সে ওদের বোঝাগুলো নিয়ে হেঁটেছে। কারো কথা শোনে নি।

রাতে বাংলোর একটা ভাঙা জানালা দিয়ে ঢুকছিল প্রচণ্ড শীতের হাওয়া। জয়দীপ ঘুমোতে না পেরে জেগে বসল বিছানার ওপর। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল তার আর ভেতর থেকে বারবার একটা কাঁপুনি উঠে আসছিল। একটু তফাতে অন্য একটা খাটিয়াতে শুয়েছিল লিডিয়া। মেঝেতে হোল্ডল ইত্যাদি পেতে তার ওপর অচেতন হয়ে পড়ে আছে ফুৎসো।

চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছিল ঘরের ভেতরের ছবিটা।

হঠাৎ ম্লান আলোয় একটা মূর্তি নড়ে উঠল। গা থেকে কম্বল সরিয়ে সে উঠে বসল। চোখ দুটো মুছে নিয়ে সে তাকাল জয়দীপের মুখের দিকে। তারপর সে উঠে এল জয়দীপের কাছে। ওর অবস্থা দেখে ফিরে গিয়ে নিজের দুটো কম্বল টেনে এনে জড়িয়ে দিল জয়দীপের গায়ে। তারপর শুধু সোয়েটার পরেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। বেশ খানিক পরে সে ফিরে এল এক কেটলী গরম জল নিয়ে। জয়দীপকে বলল, আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে খাও, কাঁপুনি বন্ধ হয়ে যাবে। লিডিয়ার কথায় কাজ হল। কিছু পরে সুস্থ হয়ে উঠল জয়দীপ। সে লিডিয়াকে তার কম্বল ফিরিয়ে দিতে চাইলে লিডিয়া তা নিল না। বলল, আরাম করে শুয়ে পড়, আমার কোন কষ্ট নেই।

লিডিয়ার কথার ভেতর এমন একটা জোর ছিল যে জয়দীপ বাধ্য ছেলের মত শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়েও পড়ল।

ঘুম ভাঙল একেবারে ভোরে। সে বিছানার ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, ঐ ভাঙা জানালায় পিঠ দিয়ে তার বিছানার দিকে চেয়ে আছে লিডিয়া।

জয়দীপের মনে হল, শেষের রাতটুকু লিডিয়া বোধ হয় হাওয়ার পথ আগলে রেখে জেগে কাটিয়ে দিয়েছে।

ভোরে আবার যাত্রা শুরু। আরো চোদ্দ মাইল পাহাড়ী পথ পার হলে তবে পৌঁছতে পারা যাবে সন্দ্‌কফুতে। ওরা চলতে চলতে দেখছিল কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ। দূরে দেখা যাচ্ছিল চুমুলহারি পর্বতের অতি উচ্চ শৃঙ্গ। উপত্যকার দিকে হাত তুলে দেখাল লিডিয়া। বলল, দেখতে পাচ্ছ রুপোলী তিস্তা কি সুন্দর ভঙ্গিতে এঁকে বেঁকে চলে যাচ্ছে—

জয়দীপ বলল, উঁচুতে উঠে এলেই সব কিছু ছবির মত মনে হয়।

ওরা কথা না বলে হাঁটার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। কয়েক মাইল পথ পেরিয়ে এসে কোথাও গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে। তখন টুকরো টুকরো অনুভূতির কথা বলতে থাকে দু'জনে।

জয়দীপ বলে, এই পাহাড়ে ছোট্ট একখানা বাড়ি থাকলে কেমন হত লিডিয়া?

লিডিয়া বলে, একটা ঝর্না আর এক চিলতে গম আর সব্‌জির ক্ষেত।

জয়দীপ যোগ করলে, আর কয়েকটা পোষা জীবজন্তু।

লিডিয়া বলে, আমি আর তুমি দিনভোর ক্ষেতির কাজ করব, ঝর্না থেকে জল ভরে আনব। আর সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকাব কাঞ্চনজঙ্ঘার ঐ তুষার চুড়োর দিকে। সকাল আর সন্ধ্যায় প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানাব আমাদের এই সুখী জীবনের জন্য।

জয়দীপ লিডিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে এই পবিত্র মনের মেয়েটির চোখে দেখে অপার্থিব এক সংসার জীবনের ছবি।

সন্দ্‌কফুতে এসে পৌঁছতে ওদের একটু রাতই হয়ে গেল। কিন্তু তংলুর বাংলোতে আসতে জয়দীপ যে ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, সে শ্রান্তি এই শেষ যাত্রাপথে তার ছিল না। কি এক উন্মাদনায় সে এই দীর্ঘ পাহাড়ী পথ পার হয়ে এল। সারারাত নিশ্ছিদ্র ঘুমে কাটল তার। ভোর হতে না হতেই তাকে জাগিয়ে তুলল লিডিয়া। বলল, এই ট্যাবলেটটা খেয়ে নাও। শরীর অনেক হাল্‌কা হয়ে যাবে।

জয়দীপ কোন কথা না বলে ট্যাবলেটটা খেয়ে ফেলল।

লিডিয়া বলল, বাংলোর বারান্দায় এস। শীতকে ভয় করলে চলবে না।

জয়দীপ বলল, কম্বল ছাড়তে পারব না।

হাসল লিডিয়া। বলল, আগেই তো বলেছি তুমি শীতকাতুরে।

জয়দীপ বিছানার ওপর কম্বলখানা ছুঁড়ে ফেলে দিতেই লিডিয়া এসে কম্বল তুলে ওর গায়ে জড়িয়ে দিতে দিতে বলল, ছেলেদের একটুতেই রাগ হয়ে যায়, তাই না জয়?

জয়দীপ লিডিয়াকে ঐ অবস্থায় জড়িয়ে ধরে বলল, আর ছেলেরা যে দারুণ রকম ভালবাসতে পারে, সে কথা তো একবারও বললে না?

লিডিয়া বলল, যেমন বলিষ্ঠ তোমার দেহ তেমনি বলিষ্ঠ তোমার ভালবাসা। কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধিগুলো ঠিক চোদ্দ বছর বয়সের কিশোরের মত।

জয়দীপ লিডিয়াকে ছেড়ে দিয়ে বলল, এ কথা কেন লিডিয়া?

লিডিয়া হেসে বলল, আর একটি লোক যে আমাদের সঙ্গে আছে, এ কথাটুকু দেখছি বেমালুম ভুলে আছ তুমি। এখুনি সে এখানে এসে পড়তে পারে।

জয়দীপ তার হাতের ঠাণ্ডা আঙুলগুলো লিডিয়ার মুখে চাপা দিয়ে বলল, কোন কথা নয়, তোমাকে আদর করার অধিকার আমার আছে।

লিডিয়া ওর মুখের ওপর রাখা হাতখানা নিজের হাতের ভেতর নিয়ে বলল, চল, দুষ্টুমি করে না। এখানে ভোরবেলাটা এমন করে কাটিয়ে দিলে শেষে আফসোস করতে হবে।

ওরা বাইরে এসে দেখল, এক আশ্চর্য জগৎ ওদের অভ্যর্থনা করার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ভূটান সিকিম আর নেপালের প্রায় দুশো মাইল দীর্ঘ পর্বতশ্রেণী তুষারে মণ্ডিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঝলমল করে উঠল মণিমুক্তাখচিত মুকুট।

অপার সৌন্দর্যের জগতে ওদের চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল কতক্ষণ। পরে জয়দীপ লিডিয়ার দিকে তাকিয়ে ওর হাত ধরে বলল, আর বাধা দিও না লিডিয়া, আমার একেবারে পাশে এসে দাঁড়াও। ভুলে যাও ফেলে আসা মানুষের সংসারের কথা। কে আমাদের দেখে ফেলবে না ফেলবে তাতে কতটুকু

এসে যায়। এসো আমার বুকের কাছে। এক হয়ে দাঁড়িয়ে আমরা আজ প্রার্থনা জানাই এই মৌন পুরুষোত্তমের কাছে, যেন ভালবাসা আমাদের তুষারের বুকে ফুটে ওঠা ভোরের আলোর মত পবিত্র আর অম্লান থাকে। কোন দুঃখ, কোন অন্ধকার কোন দিন যেন একে আচ্ছন্ন করতে না পারে।

লিডিয়াকে সামনে দুটো বাহুর বাঁধনে বেঁধে কি এক আবেগের তাড়নায় স্তবের মত কথাগুলো উচ্চারণ করে গেল জয়দীপ।

কতক্ষণ পরে মুখোমুখি ফিরে দাঁড়াল লিডিয়া। তার চোখ ভরে উঠেছে জলে। টলমল করছে নীল পদ্মের দুটো পাপড়ি। সে বলল, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না জয়। তুমি মুছে দাও আমার চোখের জল। আমি নতুন করে আজ তোমাকে দেখব।

অনেক আদরে জয়দীপ মুছে দিল লিডিয়ার চোখের জল। বলল, তুমি আমাকে জয় বলে ডেকেছ, আজ থেকে তোমাকে আমি ডাকব দীপা বলে। তোমার কপালে আমি এঁকে দিলাম ভালবাসার জয়তিলক। তুমি আজ থেকে আমার মনের সকল অজানা কোণ তোমার আলোয় উজ্জ্বল করে তুলবে দীপা।

আসা-যাওয়ার ছ'টি দিন ওদের শৈলবাসরে কাটল। ওরা ফিরে এলে মিস রোল্যান্ড ওদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন। ওদের মুখে শুনলেন উনি সন্দক্‌ফু ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা। একান্ত গোপন দু'টি হৃদয়ের সংবাদ ছাড়া সব খবরই ওরা দিয়ে গেল মরমী মহিলাটির কাছে।

এর পর উত্তুরে হাওয়ায় উড়ে গেল ছুটির রঙীন দিনগুলো। আবার শুরু হল ক্লাস। ক্লাসে গিয়েই জয়দীপ দেখত দুটো চোখ নিষ্পলকে তাকিয়ে আছে তার দিকে। পড়াতে পড়াতে সে রচনা করত আশ্চর্য এক স্বপ্নের জগৎ। কোন কোন দিন হঠাৎ মনে পড়ে যেত ফ্লসির কথা। একটা উজ্জ্বল চঞ্চল অনুপস্থিতি তাকে কেমন যেন বিষণ্ণ করে তুলত।

ওকে বিষণ্ণ দেখলেই ভয় পেত লিডিয়া। সে কোন কথা না বলে জয়দীপের কোয়ার্টারে গিয়ে মুখ বুজে কাজ করে যেত। এক সময় জয়দীপই ওর মৌনতা ভেঙে বলত, কি হল দীপা, আজ তুমি এমন নীরব হয়ে রইলে কেন?

লিডিয়া ওর কাছে এসে ওর চোখে চোখ রেখে সাহস করে বলত, আজকাল মাঝে মাঝে তুমি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাও জয়। পড়াতে পড়াতে এমন তো তুমি করতে না কখনো।

জয়দীপ হেসে বলত, ছুটির ঘণ্টা বাজতে তো আর দেরি নেই, তাই মনটা আর কাজে বসছে না। তারপর আছে একটা বড় বিপ্লবের ভেতর দিয়ে তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া।

লিডিয়া বলত, তুমি অত ভাব কেন? প্রভুর হাতে ছেড়ে দাও সব ভাবনার ভার। তিনি আমাদের সকল কাজের, প্রতিটি পদক্ষেপের পরিচালক। তিনিই আমাদের সবকিছু সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

জয়দীপ চেয়ে থাকত ঈশ্বর বিশ্বাসী এই মেয়েটির দিকে। তার মনে হত, কত সহজে এ মুক্তি পেয়ে যায় জটিল ভাবনার হাত থেকে। কোন সমস্যাই যেন এর কাছে সমস্যা নয়।

ক'টি ঋতুচক্র দ্রুত ঘুরে গিয়ে আকাশ জুড়ে দাঁড়াল শরৎ। নীলে সোনায় কি চোখ জুড়ানো মিল। জয়দীপ আর লিডিয়ার মিলনের ছবিটি যেন আঁকা হয়ে আছে ঐ আকাশ আর আলোর মিলনের মাঝে। সাদা সাদা মেঘগুলো জয়দীপের কাছে বয়ে আনল ছুটির চিঠি। এবার সত্যিই তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে অনেক আনন্দ বেদনায় মেশা মিশনারী স্কুল।

তখনও জয়দীপের দার্জিলিং ছেড়ে যেতে মাসখানেক বাকী। মিঃ ব্যাভিংটন আর ফ্লসির সত্বর আগমন ঘোষণা করে লন্ডন থেকে চিঠি এসেছে।

এক সন্ধ্যায় লিডিয়া ছুটতে ছুটতে এসে জানাল, মাদার অ্যান বিশেষ প্রয়োজনে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। জরুরী খবর বয়ে এনেছেন ফাদার হ্যারিংটন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ড তাকে বলেছেন শিগগির চলে আসতে।

জয়দীপ বলল, এবার একেবারে বিদায় নিয়ে চলে এস।

লিডিয়া চিন্তিত মুখে বলল, বুঝতে পারছি না এত জরুরী দরকার পড়ল কিসে!

জয়দীপ বলল যে কাজেই হোক নিশ্চয় তা শেষ করতে এক মাস সময় লাগবে না। আমাদের হাতে এখনও এক মাস রয়েছে।

লিডিয়া একটা ব্যাগ জয়দীপের হাতে দিয়ে বলল, এটা হাবিও না যেন! এতে আমাদের অনেকগুলো চিঠি, তোমার দেওয়া টিউলিপ ফুল, প্রিন্সিপ্যালের দেওয়া শাড়ি আর শাল রয়েছে।

যাবার সময় আবার বলল, দেখ, তোমার যেমন ভুলো মন, কোথাও আবার না হারিয়ে বস। আমি এসে একটি একটি করে আমার জিনিস গুনে নেব কিন্তু।

জয়দীপ বলল, ফিরে এস, আমিও তোমার জিনিসগুলো গচ্ছিত রাখবার জন্য সুদে আসলে এক একটি করে দাম চুকিয়ে নেব।

লিডিয়া বলল, তুমি একটা শাইলক, তুমি ভী-ষ-ণ লোভী।

জয়দীপ খপ করে ওর হাত ধরে ফেলে বলল, যদি যেতে না দিই?

লিডিয়া বলল, লক্ষ্মীটি, দুষ্টুমি করে না। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আমি দৌড়ে চলে এসেছি তোমার কাছে।

ওর কপালে মিষ্টি একটা চুমু এঁকে জয়দীপ ওকে ছেড়ে দিয়ে বলল, তোমাকে একদিন না দেখলে মনে হয় কত যুগ দেখি নি। আজ রাতটুকু কাটিয়ে কাল ভোরবেলা চলে এস কিন্তু।

লিডিয়া যেতে গিয়েও জয়দীপের দিকে তাকিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার যেন একটুও ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না জয়দীপকে। এখন তার কাছেও একক জীবন সত্যিই অসহনীয় বলে মনে হচ্ছে। তবু চলে যেতে হবে। বাগান পেরিয়ে দ্রুত পায়ে চলে যাবার সময় লিডিয়া চেঁচিয়ে বলল, জয়, মন খারাপ কোর না। সব সময় ভাববে আমি তোমার কাছে আছি।

প্রায় একটি সপ্তাহ কেটে গেল, লিডিয়া ফিরে এল না। জয়দীপের দিনগুলো মনে হল সীমাহীন, আর রাত নিয়ে এল নিদারুণ দুঃখ আর বিভীষিকা। ক্লাসে যেতে হত যথা নিয়মে, কিন্তু পড়ানোয় প্রাণ থাকত না। জয়দীপ যেন অন্যমনস্ক ভাবে মুখস্থ পড়াগুলো বলে যেত। ক্লাস থেকে বেরিয়েই অকল্যান্ড রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেত সে দার্জিলিংয়ের ম্যালে। সেখান থেকে নামত আরও নীচে। তাকিয়ে থাকত মিশনারীদের গাড়ির সন্ধানে। হঠাৎ কোন গাড়ি দূর থেকে দেখতে পেলে প্রতীক্ষা করত অধীর আগ্রহে। গাড়ি পাশ দিয়ে চলে যেত, আর একটা অন্ধকার কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে যেত জয়দীপের মন। সে উদ্‌ভ্রান্তের মত ফিরে আসত কোয়ার্টারে। কাউকে প্রাণের কথা খুলে বলতে না পেরে একটা চাপা যন্ত্রণায় নিজের ভেতর ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল জয়দীপ।

একদিন ক্লাস শেষ হলে প্রিন্সিপ্যাল রোল্যান্ড তাকে ডেকে পাঠালেন। জয়দীপ মুখোমুখি হলে বললেন, আজ বিকেলে আমি তোমার সঙ্গে একটু বেড়াতে বেরোব জয়দীপ। তুমি তোমার কোয়ার্টারে থেক, আমি তোমাকে ডেকে নেব।

জয়দীপ মাথা নেড়ে জানাল, প্রিন্সিপ্যালের ইচ্ছেমতই সে কাজ করবে।

যথাসময়ে মিস রোল্যান্ড এলেন। জয়দীপ বেরিয়ে গেল পথে। তারা চলল অকল্যান্ড রোড ধরে ঘুমের দিকে। কিছু পথ একথা-সেকথা বলতে বলতে এগোতে লাগলেন মিস রোল্যান্ড। এক সময় পথের ধারে গাছের তলায় একটা মসৃণ পাথরের স্তূপ দেখিয়ে বললেন, এস, এখানে বসা যাক।

দু'জনে পাশাপাশি বসলে কোন রকম ভণিতা না করেই বললেন মিস রোল্যান্ড, তুমি কাউকে ভালবেসেছ জয়দীপ?

প্রিন্সিপ্যালের কথা শুনে চমকে উঠল জয়দীপ। মিস রোল্যান্ড কি তাহলে অনুমান করেছেন লিডিয়ার সঙ্গে সে ভালবাসায় আবদ্ধ!

জয়দীপ মাথা নিচু করে রইল।

প্রিন্সিপ্যালের গলায় অত্যন্ত কোমল সুর বেজে উঠল, জয়দীপ, ভালবাসার মত পবিত্র বিষয় আর কিছু নেই। যারা ভালবাসে আমি তাদের ভালবাসি।

জয়দীপের প্রাণ খুলে কথা বলতে এখন আর কোন বাধা নেই। সে বলল, আপনার অনুমান মিথ্যে

নয়। আমি ভালবেসে অন্যায় করেছি কিনা জানি না, তবে আপনার কাছে সবকিছু গোপন রেখে যে অন্যায় করেছি, তা আজ স্বীকার করছি অন্তর থেকে।

চুপচাপ কতক্ষণ বসে বসে কি যেন ভাবলেন মিস রোল্যান্ড। তারপর এক সময় বললেন, ভালবেসে তুমি ভুল কর নি জয়দীপ, ভুল হয়েছে তোমার নির্বাচনে।

চমকে উঠল জয়দীপ! লিডিয়াকে নির্বাচন করে সে ভুল করেছে, কি করে এ কথা বললেন মিস রোল্যান্ড, আর কেনই বা বললেন? একটা অনিবার্য বিপদের আশঙ্কায় মানুষ যেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি বিহ্বলতা নিয়ে প্রিন্সিপ্যালের মুখের দিকে চেয়ে রইল জয়দীপ।

মিস রোল্যান্ড বললেন, আজ মাদার অ্যানের একটা দীর্ঘ চিঠি আমি পেয়েছি। তাতে তিনি লিখেছেন তোমাদের ভালবাসার কথা। আমাদের এখান থেকে যিনি তোমাদের গোপন ভালবাসার খবর তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর চিঠিও তিনি সেই সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন। চিঠির তলায় মিথ্যে নামের স্বাক্ষর থাকলেও মিসেস বেক্‌লের হাতের লেখা আমার অচেনা নয়। কিন্তু সে কথা নয় জয়দীপ, মাদার অ্যান লিডিযাকে জিজ্ঞেস করে সব কথা জেনে নিয়েছেন।

জয়দীপ মরিয়া হয়ে বলল, লিডিয়া কি আমাদের ভালবাসাকে এখন অস্বীকার করতে চায়?

মিস রোল্যান্ড বললেন, চিঠিতে তার উল্লেখ নেই, তবে আমার অনুমান লিডিয়া যে ধাতুতে গড়া তাতে ভালবাসাকে সে যে মর্যাদা দেবে তাতে সন্দেহ নেই।

দুঃখের মাঝেও জয়দীপের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মিস রোল্যান্ড বললেন, কিন্তু ভুল তুমি গোড়াতেই করে ফেলেছ জয়দীপ। আমাদের মত ব্যাপটিস্ট মিশনে যারা কাজ করে তাদের বিয়েতে কোন বাধা না থাকলেও ওদের মিশনে বিয়ে ভালবাসা একেবারে নিষিদ্ধ। তুমি সেই নিষিদ্ধ জগতে প্রবেশ করেছ জয়দীপ।

জয়দীপ বলল, ভালবাসা কোন ধর্ম মেনে চলে না, শুধু জীবনের ধর্ম ছাড়া।

মিস রোল্যান্ড বললেন, তুমি আমার মনের কথা বলেছ জয়দীপ, কিন্তু মাদার অ্যান এবং তাঁর সম্প্রদায়ের মনের মত কথা ওটা নয়। তাঁরা জানিয়েছেন, লিডিয়ার মনের পরিবর্তনের জন্য তাকে অনেক দূরে কোথাও পাঠানো হয়েছে। সেখানে কয়েকটা বছর নিরবচ্ছিন্ন কাজের ভেতর থাকলে সে আবার মনের দিক থেকে সুস্থ হয়ে উঠবে।

জয়দীপের মাথাটা যেন সেই মুহূর্তে শূন্য বলে মনে হল। সে নিজের দেহের ভারসাম্য অতি কষ্টে ঠিক রাখার চেষ্টা করছিল।

মিস রোল্যান্ড তার পিঠে হাত রেখে বললেন, বাবা, ভালবাসায় ব্যর্থতা যে কি আঘাত বয়ে আনে, তা আমার নিজের জীবন দিয়ে একদিন উপলব্ধি করেছিলাম। সেদিন মনে হয়েছিল, আর কোন দিন দাঁড়াতে পারব না। কিন্তু আজ সে দুঃখকে একটা মহৎ কাজের মাঝে থেকে ভুলতে শিখেছি। তোমার মনের ভেতর থেকেও এ দুঃখের ভার একদিন সময় নিজেই তুলে নিয়ে যাবে।

একটু থেমে আবার বললেন, মিঃ ব্যাভিংটন যদিও কাজে যোগ দেবার জন্যে ফিরে আসছেন, তাহলেও আমি তোমার অসামান্য যোগ্যতার কথা মিশন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আমার বিশ্বাস. তাঁরা তোমার চাকরির পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে শীগগিরই চিঠি পাঠাবেন।

জয়দীপ বলল, আমি আশাতীত স্নেহ পেয়েছি আপনার কাছ থেকে। আজ আর একটু ভিক্ষা চেয়ে নেব। দয়া করে আমাকে কালই দার্জিলিং ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি দিন। আমি চিরদিন আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকব।

কতক্ষণ বসে রইলেন মিস রোল্যান্ড। তারপর এক সময় বললেন, তুমি যাতে শান্তি পাও জয়দীপ, তাই হবে।

পরের দিন ভোরবেলা দেখা গেল ফুৎসো ক্রমাগত চোখ মুছে চলেছে। জয়দীপ জিনিসপত্র গোছগাছ করতে করতে তাকে বলছে, সিস্টার ফ্লসিকে লিখে দিয়ে যাব যাতে সে তার কাজে তোমাকে বহাল করে।

তারপর এক টুকরো কাগজ টেনে নিয়ে লিখল :

'প্রিয় ফ্লসি, চলে যাবার সময় দেখা হল না, এ দুঃখ আমার চিরদিনের হয়ে রইল। লিডিয়ার সম্বন্ধে অনেক কথা বলার ছিল তোমাকে, কিন্তু কিছুই বলা হল না। শুধু জেনো, যন্ত্রণাময় এক ব্যথার স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে আমি দার্জিলিং ছেড়ে যাচ্ছি। লিডিয়া তার কয়েকটা জিনিস আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল, কিন্তু যতদূর জানি সে আর ফিরে আসবে না। তার মধ্যে থেকে তার শাড়ি আর শালখানা তোমার কাছে রেখে গেলাম। সে যদি ফিরে আসে তাকে দিও আর না হলে বন্ধুর স্মৃতি হিসেবে ওগুলো তুমি ব্যবহার কোরো।

ফুৎসো ছেলেটি তার নির্লোভ সেবা দিয়ে আমাকে প্রায় তার ভক্ত করে তুলেছে। সে মিশনের রুটিন বাঁধা কাজের চেয়ে তোমার কাছে কাজ করতেই বেশি পছন্দ করবে। ছেলেটি একটু প্রাণের উত্তাপ চায়, তুমি তাকে কাছে রেখো।

তোমার আর লিডিয়ার কাছে যা পেলাম, সে আমার জীবনের সব সেরা ধন, তাকে মনের মধ্যে ভরে নিয়ে গেলাম। তোমার সুখী দাম্পত্য জীবনের ছবিটুকু দেখে যেতে পেলাম না, এ দুঃখ আমার সঙ্গী হয়ে রইল।'

জয়দীপ।

ফুৎসোকে একশো টাকার একখানা নোট দিয়ে বলল, এ টাকাটা রেখে দাও, শীতে তুমি আর তোমার বাবা দু'খানা ভাল র‍্যাগ কিনে নিও।

জয়দীপ আজ শেষ ক্লাস নেবে। ছাত্রছাত্রীদের ভেতর খবরটা রটে গেছে। তারা ছুটির আগেই আবেদন জানিয়েছিল প্রিন্সিপ্যালের কাছে, যাতে তারা জয়দীপকে ল্যাংগুয়েজ স্কুলে চিরস্থায়ী অধ্যাপকরূপে পায়। কিন্তু জয়দীপ স্বেচ্ছায় ছেড়ে যাচ্ছে জেনে তারা হতাশায় ভেঙে পড়েছে।

ক্লাস শেষ হলে একটি ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাদের কাছে আপনি রইলেন না, এ দুঃখ আমরা ভুলতে পারব না, কিন্তু আমাদের আপনি ফেয়ারওয়েল দেওয়ার সুযোগও দিলেন না, এ দুঃখ মন থেকে কোন দিনই মুছে যাবে না।

জয়দীপ হেসে বলল, আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিয়ে যাব না। চলে গিয়েও যদি তোমাদের স্মৃতিতে সামান্য ঠাঁই করে নিতে পারি, তাহলে জানব আমি বেঁচে আছি। আমার কাছে সেটাই হবে বিদায় দিনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

মিঃ আর মিসেস বেক্‌লের কোয়ার্টারে গিয়ে দেখা করল জয়দীপ। মিসেস বেক্‌লের দিকে চেয়ে বলল, আপনারাই দু'টি বছর আগে আমাকে প্রথম চায়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কৃতজ্ঞ চিত্তে আমি তা স্মরণে রাখব চিরদিন।

প্রিন্সিপ্যালকে নত হয়ে নমস্কার জানাতেই তিনি তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমাকে প্রথম দিন থেকেই আমার ছেলে বলে মনে মনে গ্রহণ করেছিলাম. অধ্যাপক বলে ভাবিনি। আজ চলে যাবার সময় মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে যাও। কোন দিন যদি কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, মাকে জানাতে সংকোচ কোর না।

বেলা শেষের ট্রেনে যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। জয়দীপ কোয়ার্টার থেকে কি ভেবে বাইরে বেরোল। সে হাঁটতে লাগল অকল্যান্ড রোড ধরে। কিছু পথ এসেই সে পেল সেই ঝর্নাটা, যেখানে প্রথম লিডিয়ার হাত ধরে সে পার করে নিয়ে গিয়েছিল। ঝর্নার দ্রুত বয়ে যাওয়া জলের ধারায় সে ভাসিয়ে দিল তাদের চিঠিগুলো। তারপর ওপরে উঠে কিছু পথ এসেই সে পেল সেই টিউলিপ ফুলের বেড, যেখান থেকে ফুল তুলে সে লিডিয়ার হাতে দিয়েছিল, আর তাই নিয়ে অভিমানের পালা চলেছিল ফ্লসির সঙ্গে। জয়দীপ তার কাছে গচ্ছিত রাখা লিডিয়ার শুকনো টিউলিপ ফুলটি ছড়িয়ে দিল তাজা ফুলগুলোর মাঝখানে।

ফিরে এল আবার কোয়ার্টারে। স্টেশানে বেরোবার একটু আগে সে এসে ঢুকল দেওদার বনে। দাঁড়াল একটা শিলাস্তূপের ওপর। জীবনের সেরা অনুভূতি জন্ম নিয়েছিল এইখানে। তার পঁচিশটি বছরের বসন্তের কাছে একটি মেয়ে উজাড় করে দিয়েছিল আত্মনিবেদনের অর্ঘ্য।

জয়দীপ আশ্চর্য হয়ে দেখল, সেদিনের মত শিলাখণ্ডটির ওপর আজও এসে পড়েছে একফালি আলো। আর একটা প্রজাপতির আকারে দুটো পাখা মেলে দিয়ে সেই আলোর টুকরোটুকু থর থর করে কাঁপছে।

জয়দীপ নীচু হয়ে হাত বাড়াতেই আলোর সেই প্রজাপতি ওর হাতের ওপর উড়ে এল। তারপর হঠাৎ তার হাত থেকে হারিয়ে গেল বনের আড়ালে।

বনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জয়দীপের মনে হল, আলোর প্রজাপতি জীবনে শুধু মিলনের আভাসই বয়ে আনে, তাকে চিরদিনের করে ধরে রাখতে চাইলেই সে বিশ্বভুবনের নিবিড় অরণ্যে হারিয়ে যায়।

এই ঘটনার চার বছর পরে কলকাতার একটি কলেজে প্রফেসার জয়দীপ বোসের নামে একখানা চিঠি এল। জয়দীপ ক্লাস থেকে এসে খামখানা খুলল। খামের ভেতর দু'খানা চিঠি। একখানা ফ্লসিকে লেখা লিডিয়ার চিঠি, অন্যটি জয়দীপকে সরাসরি লিখেছে ফ্লসি।

ফ্লসির চিঠিখানার ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল জয়দীপ।

ফ্লসি লিখেছে : 'প্রিয় জয়দীপ, দার্জিলিং-এর বুক স্টলে একটা পত্রিকার পাতা ওলটাতে গিয়ে তোমার একটা গল্প পেলাম। পড়ে নিশ্চিত হলাম, এ তুমি ছাড়া কেউ নয়, কারণ তাতে আমাদের ল্যাংগুয়েজ স্কুলের কিছু ঘটনা রয়েছে। আমি ঐ পত্রিকা অফিসে চিঠি লিখে তোমার কলেজের ঠিকানা সংগ্রহ করেছি। প্রায় এক বছর আগে লিডিয়ার এ চিঠিখানা আমার হাতে আসে। তোমার ঠিকানায় পাঠালাম। জানি না তোমার হাতে পৌঁছবে কিনা। আমরা এক রকম আছি।' ভালবাসা নিও—ফ্লসি।

লিডিয়ার চিঠিখানা পড়তে গিয়ে সারা শরীর কেঁপে উঠল জয়দীপের। একটা হারানো মূল্যবান পাণ্ডুলিপি যেন অভাবিত ভাবে ফিরে এল তার হাতে।

লিডিয়া লিখেছে : 'প্রিয় বান্ধবী, জীবনের অনেক কথা তোমাকে জানাব মনে করেছিলাম, কিন্তু সে সুযোগ আর পেলাম না। যাবার আগে শুধু একটা কথা জানিয়ে যাই, আমি জয়দীপকে ভালবেসেছিলাম, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার কথাই ভেবে যাব। তাকে আমি সুখ দিতে পারি নি, তাই দুঃখ ছিল আমার নিত্য সঙ্গী। আমি মানুষের সেবার ভেতর নিজেকে সঁপে দিয়ে আমার ভালবাসার মানুষকে ভুলে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে ধারণা আমার ভুল প্রমাণিত হয়েছে। জীবনের শেষে এসে বুঝতে পেরেছি, মনকে উপবাসী রেখে মানুষের সেবা করা যায় না।

যদি কোন দিন দেখা পাও তার তাহলে তাকে বোলো, একমাত্র সে-ই আমাকে জীবনে সুধার সন্ধান দিয়েছে। আমার প্রভুর কাছে নিত্য নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাতে গিয়ে তাকেই আমি বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। যদিও জানি তোমাদের কাছে এটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।'

চিঠির নীচে একটি নোট লিখে পাঠিয়েছেন কোন স্যানাটোরিয়ামের সুপারিনটেন্ডেন্ট—সিস্টার লিডিয়া দুরারোগ্য টি বি-তে আক্রান্ত হয়ে প্রভুর কাছে চলে গেছেন। তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী এ চিঠি আপনার কাছে পাঠানো হল।

●

নসীম

এক

প্রাচীন ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হবার খবর নিয়ে যেদিন চাচাজীর কাছে ফিরেছিলাম সেদিনও প্রতিদিনের মত তাঁর স্টাডিতেই তিনি বসেছিলেন। রোজ সন্ধ্যায় পিঠওয়ালা একটি মোড়ায় সিধে হয়ে বসে তিনি বই পড়তেন। সারা ঘরের সিলিং থেকে মেঝে অব্দি চার দেয়াল জুড়ে প্রায় হাজার দশেক বই তাঁর দিকে চেয়ে থাকত। তিনি কখন কাকে যে কাছে টেনে নিয়ে নয়নের মণি করবেন তা কেউ জানে না। বইকে এমন ভালবাসতে, বইতে এমন মগ্ন হয়ে থাকতে আমি দ্বিতীয় আর কাউকে দেখিনি।

ইউনিভারসিটির ক্লাশ শেষ হয়ে গেলেই তিনি কাল বিলম্ব না করে চলে আসতেন নিজের ডেরায়। সামান্য টিফিন সেরেই ঢুকতেন পড়ার ঘরে। বন্ধু, আত্মীয়, একান্ত আপনজন বলতে একজনকেও আমি চাচাজীর কাছে আসতে দেখিনি আমার পঁচিশ বছরের জীবনে। দিনরাত বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতেন তিনি।

ছেলেবেলা থেকেই আমি চাচাজীকে দেখেছি। আমাদের কোয়ার্টারে রোজই তাঁর আসা চাই। সে সময় আব্বাই ছিলেন চাচাজীর একমাত্র বন্ধু। আমার আম্মা ছিলেন কাশ্মীরের মেয়ে। আমাদের পূর্বপুরুষের ভিটে নাকি ছিল লক্ষ্ণৌ। এ সব পরে আমি আমার চাচাজীর মুখে শুনেছি। পরে শোনার কারণ, আব্বা আর আম্মা যখন মারা যান তখন আমি মাত্র সাত বছরের মেয়ে। সে বয়সে বংশলতিকা ঘেঁটে দেখার কথা নয় আমার।

পশ্চিম বাংলার বাইরে একটি ইউনিভারসিটিতে চাচাজী আর আব্বা কাজ করতেন। লক্ষ্ণৌতে ছেলেবেলা থেকেই তাঁরা ছিলেন সহপাঠী।

ইউনিভারসিটির কাজ শেষ হলে দু'বন্ধুতে আমাদের কোয়ার্টারেই ফিরতেন। চাচাজী সিঁড়ি থেকেই হাঁকতেন, ভাবীজী, আজ জোর ক্ষিদে পেয়ে গেছে।

আম্মা হেসে বলত, এসো ভাইসাব, তোমার জন্যে আজ 'রোগন জুস' বানিয়ে রেখেছি।

মসলাদার কাশ্মীরী মাংসের এই প্রিপারেশানটি আব্বার খুব প্রিয় ছিল। খাবার সময় আম্মা কিন্তু আব্বাকেই শুধু রোগন জুস দিত অর চাচাজীকে দেওয়া হত কোন দিন ডালের বড়া চা, কোন দিন বা আলু পরটা চা।

আমি টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েই চেঁচাতাম, আম্মা, তুমি চাচাজীকে রোগন জুস দিচ্ছ না কেন?

চাচাজী হেসে বলতেন, দেখ তো বেটি, তোর মা কেমন একচোখো। সবটুকু আব্বার প্লেটে ঢেলে দিলে।

খুব রাগ হত আম্মার ওপর। আম্মা আমার দিকে চেয়ে যত হাসত আমি আম্মার অবিবেচনায় তত ক্ষেপে যেতাম।

কোন দিন চাচাজী আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যেতেন নদীর ধারে। সেখানে বসে আমি তাঁর মুখে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ আর জাতকের গল্প শুনতাম। উনি হাত মুখ নেড়ে এমন অভিনয় করে বলতেন যে গল্পগুলো সেই বয়সেই আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল।

আমি আর চাচাজী সেদিনও বেড়াতে বেরিয়েছিলাম নদীর ধারে। গল্প শেষে ফিরে আসতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। একটা পথ ধরে আসছিলাম, হঠাৎ দুটো ছেলে ছুটে এলো সামনের দিক থেকে। তারা হাত-মুখ নেড়ে চাচাজীকে উত্তেজিত গলায় কি সব বলে ছুটে বেরিয়ে গেল।

চাচাজী মুহূর্তে আমাকে বুকে তুলে নিয়ে ছুটতে লাগলেন। বিরাট শক্তিমান পুরুষ ছিলেন চাচাজী। একেবারে তাঁর নিজের কোয়ার্টারে না পৌঁছনো পর্যন্ত থামলেন না।

কোয়ার্টারে একটি ছেলে চাচাজীর ফাই-ফরমাস খাটত। তার জিম্মায় আমাকে রেখে চাচাজী আবার ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

...কত রাত হল, আমি কেঁদে কেঁদে শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিনও চাচাজীকে কাছে পেলাম না।

পরে জেনেছিলাম, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার একটা স্ফুলিঙ্গ হঠাৎ জ্বলে ওঠে। সংখ্যালঘুদের পল্লী দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। খবর পেয়ে আব্বা আর আম্মা সেই পল্লীতে ছুটে গিয়ে আটকে পড়া মানুষদের বের করে আনার চেষ্টা করতে থাকেন। কোন কোন ঘরে, বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে আগুন ধরানো হয়েছিল। আব্বা নাকি শেকল খুলতে খুলতে চেঁচাচ্ছিলেন, মানুষ পুড়ছে! তাঁর কথায় মনে হচ্ছিল সারা মনুষ্য জাতিটাই পুড়ছে!

চাচাজী পুলিশ আর ফায়ারব্রিগেডে ফোন করেই ছুটেছিলেন সেই পল্লীতে। গিয়ে দেখেন দমকলের গাড়ি এসে গেছে। কিন্তু ততক্ষণে আব্বা আর আম্মা একটি জ্বলন্ত চালার তলায় পড়ে অর্ধদগ্ধ হয়ে গেছেন।

সেই ভয়াবহ দিনরাত্রির দুঃখ আল্লার অনুগ্রহে সইতে হয়নি আমাকে। চাচাজী আমাকে শিশুর মত বুকে আগলে রেখে সব দুঃখ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেলে দেখতাম চাচাজী বিছানায় নেই, পায়চারী করছেন। পরে বুঝেছিলাম আম্মা আর আব্বার কথা ভেবে উত্তেজনায় চাচাজী ঘুমোতে পারতেন না।

চাচাজী তাঁর দেশে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। পাছে ভিন্ন জাতের এই মেয়েটিকে নিয়ে পরিবার পরিজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়, সেজন্যে দেশমুখো হতেন না তিনি—নিয়মিত বুড়ো মায়ের কাছে টাকা পাঠাতেন, চিঠি পাঠাতেন কিন্তু নিজে যেতেন না। একবার শুধু গিয়েছিলেন—অসুস্থ মায়ের প্রায় শেষ সময়ে। আমি তখন কলেজে পড়ি, জোর করে চাচাজীকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসেছিলাম। বলেছিলাম, তোমার বয়েস হয়েছে, একদিন যখন তুমি থাকবে না তখন কে আমাকে রক্ষা করবে, কে আমাকে সারাক্ষণ মায়েব মত চোখে রাখবে? নিজেকেই তো নিজের বিশ্বাস আর মনের জোরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে চাচাজী।

আমার মাথায় হাত রেখে চাচাজী বলেছিলেন, তুই নিজেই নিজের ভার নিতে পারবি বেটি। আমি তোর একটা ভাল সাদি দিয়ে দিতে পারলে মনের দিকে থেকে মুক্তি পাই।

দেশ থেকে ফিরে এসে আমাকে অনেক আদর করেছিলেন চাচজী। তাঁর চোখ দুটো দেখে মনে হয়েছিল তিনি যেন কত যুগ আমাকে দেখেননি।

আমি বড় হয়ে বুঝেছিলাম চাচাজী আমার জন্যই জীবনে সংসারী হতে পারেননি। তাতে তাঁর দুঃখ ছিল বলে আমার মনে হয় না। শিশুরা একটা পুতুল নিয়ে যেমন খেলায় মেতে ওঠে তেমনি আমাকে নিয়েও তিনি খেলায় মেতে উঠেছিলেন। আমার নাওয়া খাওয়া, আমার পড়াশোনা, আমার আনন্দ, আমার ধর্ম-কর্ম যাতে একটুও বাধা না পায় সেদিকে তাঁর সারাক্ষণ দৃষ্টি ছিল। তিনি মৌলভীর সঙ্গে পরামর্শ করে আমার ধর্মাচরণের নির্দেশগুলি জেনে নিয়েছিলেন। আমাকে দিয়ে সেগুলি তিনি করিয়েও নিতেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি আমার কাছে ঈদ, মহরম, শবেবরাত প্রভৃতি মুসলিম পার্বণগুলির ব্যাখ্যা করতেন। হাসান হোসেনের কাহিনী আমাকে এমনভাবে শুনিয়েছিলেন যে আমি কেঁদে কেটে আকুল হয়েছিলাম।

সবকিছুর ভেতেরে শুধু একটি কথা বলতেন—মনুষ্যত্ব, বিবেক মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম। নিজের ধর্মের সব অনুষ্ঠানই তুমি করবে, কিন্তু কতকগুলো অর্থহীন আচার আর সংস্কারের কাছে নিজের

বিবেককে বিকিয়ে দেবে না।

এই কথা বলেই আবার বলতেন, মানুষের কাছে মানুষের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। সব ভাবনা সব চেষ্টা ঐ মানুষের মধ্যেই আছে। যখনই যে কাজ করবে নিজে একটু ভেবে করবে। আমার মতে সেটাই হবে যথার্থ ধর্মসম্মত কাজ।

যেদিন ফার্স্ট ক্লাশ পাবার খবর নিয়ে ওঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম, উনি বললেন—এখন কি করবে ভাবছ?

আমি ক্ষোভের গলায় বললাম, তুমি তো কই আমার রেজাল্ট কেমন হল জিজ্ঞেস করলে না?

উনি হেসে বললেন, বুড়ো হয়েছি বলে কি নারায়ণ দাস মেহ্‌রা চোখেও দেখতে পায় না ভেবেছিস? তুই ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তোর মুখখানা দেখে নিয়েছি।

তুমি মুখ দেখে বুঝি সব বুঝতে পারো চাচাজী?

অন্তত তোর মুখ দেখে সব বলে দিতে পারি।

বেশ, এখন তুমিই বল আমি কি করব—

চাচাজী বললেন, রিসার্চ তো তোমাকে করতেই হবে, তার ওপর বিভিন্ন জায়গায় চাকরির অ্যাপ্লাই করে যাও। নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড়াতে হবে, আমি আর ক' দিন—

চাচাজীর পাকা চুলে ভরা মাথায় মুখ ঠেকিয়ে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললাম, তুমি এখনও অনেক কাল বাঁচবে চাচাজী। আমার চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে তোমার ছুটি। তুমি তখন শুধু বসে বসে বই পড়বে আর আমি আমার রোজগারে তোমাকে খাওয়াব, পরাব, সাজাব।

আমাকে কি সাজাবি রে পাগলী?

আম্মার উপহার দেওয়া জামদানীটা গায়ে দিয়ে তুমি যখন শীতকালে ইউনিভারসিটি যেতে তখন কত সুন্দর দেখাত তোমাকে। আমি তোমাকে ঘি রঙের গলাবন্ধ একটা শেরোয়ানী বানিয়ে দেব। ভারী চমৎকার মানাবে।

তোর বলাতেই আমার পরা হয়ে গেছে রে বেটি। এমন বুড়ো মানুষের গায়ে কি আর ওটা মানাবে।

খুব মানাবে। কে বলে আমার চাচাজী বুড়ো হয়েছে। যে বলে সে নিজেই একটা থুত্থুরে বুড়ো।

প্রসন্ন নির্মল হাসি হাসতে লাগলেন চাচাজী।

পি. এইচ. ডি. পাবার আগে অনেকগুলো জায়গায় অ্যাপ্লাই করে চাকরি পেয়েছিলাম, কিন্তু চাচাজী আমাকে চাকরি করতে দেননি। মুখে বলতেন, চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, কিন্তু পি. এইচ. ডি. পাবার আগে সবকটা চাকরি নাকচ করে দিয়েছিলেন। এখন নিজেই উদ্যোগী হয়ে আমাকে দিয়ে অ্যাপ্লিকেশান করাতে লাগলেন।

কিছুদিন পর একসঙ্গে দুটো জায়গা থেকে ডাক এলো—একটি সরকারী শিক্ষাবিভাগ, অন্যটি মিউজিয়াম।

চাচাজী আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নির্বাচন কোন্‌টি?

আমি শিক্ষাবিভাগের চাকরির কথাটি বললাম। উনি আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

আমি জানতে চাইলাম, শিক্ষা বিভাগের কাজ তোমার পছন্দ নয়?

বললেন, একটিমাত্র কাজ হাতে এলে বলতাম, ওটাই নাও, কিন্তু এখন যে-দুটো কাজ হাতের মুঠোয়। বিচার করে একটাকে ছাড়তে হবে তো।

কাঁদো কাঁদো গলায় বললাম, আমি কিন্তু মিউজিয়ামের চাকরি নেব না চাচাজী। ওটা তো যত মরা জিনিসের কবর-ঘর।

হেসে বললেন চাচাজী, আমি জানি বেটি। এ যাদুঘরটির প্রথম পত্তন হয়েছিল পার্ক স্ট্রীটের কোণায় এসিয়াটিক সোসাইটির নীচের তলায়। মরা জীবজন্তু, পাথরের মূর্তি ইত্যাদি দেখে মিউজিয়ামকে সেদিনের লোকে বলত, 'মরা সোসাইটি'। তুইও যে দেখছি তাদের দলে ভিড়লি।

আমি জানি, চাচাজী চলন্ত বিশ্বকোষ। যে কোন একটা বিষয় শুরু হলেই তাঁর জ্ঞানের পরিধিটা

জানা যায়। বললাম, আচ্ছা বেশ, তোমার মরা জন্তুরা না হয় খুব ভাল। ওরা ফোঁসফাঁস করে না, কামড়ায় না, কাটে না। কিন্তু আগে বল মিউজিয়ামের ভূতটা কার মাথায় প্রথম চেপেছিল?

চাচাজী হেসে বললেন, তুই জানতে চাস প্ল্যানটা কার মাথায় এলো?

শ্রীরামপুরে এক ডেনিস ডাক্তার ছিলেন। নামটা ন্যাথানিয়েল ওয়ালিচ। তিনি সার্জারীতে দক্ষ ছিলেন কিন্তু তাঁর প্রধান সখ ছিল গাছগাছালি সংগ্রহের। তিনি এক সময় এসিয়াটিক সোসাইটির কাছে একটি চিঠি দেন। সেই চিঠিতে তাঁর পরিকল্পনা ছিল একটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার। তিনি তাঁর দুষ্প্রাপ্য গাছগাছালি মিউজিয়ামকে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। তাছাড়া ঐ মিউজিয়ামের অবৈতনিক কিউরেটার হয়ে কাজ করার প্রস্তাবও পেশ করেন। সোসাইটির মিটিং-এ ডাক্তার ওয়ালিচের মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়।

সেটা কত খৃষ্টাব্দে চাচাজী?

আঠারোশো চোদ্দ খৃস্টাব্দের দোসরা ফেব্রুয়ারী।

তুমি এতও জানো!

এতে জানাজানির কি আছে। গবেষকরা ঘেঁটেঘুটে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন আমরা তা পড়েই জেনেছি।

তখন আমার কৌতূহল বেড়ে গেছে। বললাম, চাচাজী, এসিয়াটিক সোসাইটির বাড়ি থেকে আজকের পেল্লাই বাড়িতে মিউজিয়াম কবে উঠে এলো?

তার মাঝখানে আর একটা ধাপ আছে বেটি। মিউজিয়াম প্রথমে সোসাইটির বাড়ি ছেড়ে সদর স্ট্রীটের একটা বাড়িতে আশ্রয় নিল। আজকের যাদুঘরের ঠিক পেছনে। তখন বর্তমান মিউজিয়ামের সামনে একখণ্ড সবুজ ঘাসের জমি রোদে পুড়ছে, বর্ষায় ভাসছে, শিশিরে সিক্ত হচ্ছে। খাঁ খাঁ মাঠ জুড়ে ভঁইস তরতাজা ঘাস খাচ্ছে আর গোয়ালারা একটুখানি দূরে বর্তমান গোয়ালটুলি লেনে আখড়া জমিয়ে বসেছে।

বললাম, দারুণ ইতিহাস।

চাচাজী বললেন, এবার তোমার কথায় আসছি। আঠারোশ সাতষট্টি খৃস্টাব্দে এখনকার যাদুঘর তৈরির কাজ শুরু হয়। এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল এই পেল্লাই বাড়িখানা তুলতে।

বললাম, মাত্র এক লাখ চল্লিশ হাজারে এত বড় একটা বাড়ি হয়ে গেল!

একশো চোদ্দ পনেরো বছর আগের কথা। তখন একটা লোকের এক, দেড় টাকায় সারা মাসের বাজার হয়ে যেত। তারপর শোন, বাড়িটা শেষ হতে লেগেছিল পুরো আট বছর। আঠারোশ পঁচাত্তরে শেষ হল বাড়ি! আর জনসাধারণের জন্যে খুলে দেওয়া হল আঠারোশ আটাত্তরের পয়লা এপ্রিল।

বললাম, ঐ প্রাসাদপুরীটা এমন ভাবে তৈরি যাতে মনের মধ্যে এক ধরণের সম্ভ্রম জাগায়।

চাচাজী বললেন, বাড়িব প্ল্যানটা কে তৈরি করেছিল জানো? ডবলিউ. এন. গ্রানভিল সাহেব। জেনারল পোস্ট অফিস, হাইকোর্ট আর মিউজিয়াম—দর্শনীয় এই সৌধ তিনটি তাঁর প্ল্যানেই তৈরি হয়েছিল।

আমি খুব উৎসাহিত হয়ে বললাম, আমি তাহলে ওখানেই কাজটা নেব চাচাজী।

চাচাজী খুশী হয়ে বললেন, বেটি, যাদুঘরটা মৃতদের অস্তানা নয়, সত্যিকারের জীবন যদি কোথাও দেখতে চাস তাহলে ওখানেই কেবল দেখতে পাবি। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তুই ডিগ্রি পেলি, আমি চাকরি করলাম, সত্যিকারের শিক্ষার সঙ্গে তার কানাকড়ি যোগ নেই। শিক্ষার অনেক কিছুই দেখতে পাবি ঐ যাদুঘরে। ওটা আমাদের দেশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও সেরা শিক্ষা নিকেতন। পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে ঢুকে পড়, কয়েক ঘন্টার ভেতর যা শিখবি জীবনভোর কেতাব উল্টে-পাল্টেও তা জানতে পারবি না।

একটু থেমে চাচাজী আবার শুরু করলেন, প্রতিদিন শত শত লোক আসছে। বিদ্বান, মূর্খ বাদ-বিচার নেই। শুক্রবার দক্ষিণা ছাড়াই সবার নিমন্ত্রণ। মহাভোজ। জ্ঞানের এত বড় ভোজসভা আর কোথাও নেই। সিনেমায় চার-পাঁচ ঘন্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা টিকিট যোগড় করে মারদাঙ্গার বই

দেখে সত্যি কি কিছু দেখলাম? চল যাদুঘরে, যেখান দিয়ে হাঁটবে সেখানে একটু তাকিয়ে দেখলেই তাজ্জব বনে যাবে। কুড়ি কোটি বছর আগেকার পাথর হয়ে যাওয়া প্রায় আস্ত একটা গাছের কাণ্ড পড়ে আছে। ভাবুক হলেই দেখতে পাবে গাছটা ডালপালা মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাল তাল মেঘ উড়ে চলেছে তার মাথার ওপর দিয়ে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা ঝরাতে ঝরাতে। একটিও পাখি নেই তার শাখার আশ্রয়ে। দুটি অমেরুদণ্ডী প্রাণী শুয়ে আছে তার নীচে কাদার বিছানায়।

একলক্ষ বছর আগে যে জলহস্তী তোলপাড় করে তুলেছিল কোন জলাশয়, বিপুল মুখখানা হাই তোলার ভঙ্গীতে ফাঁক করে তার বিরাট চোয়ালখানা মেলে ধরেছিল, সে কবে তার ভবলীলা শেষ করে চলে গেছে। কিন্তু সংগ্রাহকের সন্ধানী চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি। লক্ষ বছর আগেকার পরিত্যক্ত চোয়াল জলে ঝড়ে ধুয়ে, রোদে পুড়ে এখন নিশ্চিন্ত আশ্রয়লাভ করেছে কলকাতার এই মিউজিয়ামে।

চাচাজী থামলেন। হেসে বললেন, অধ্যাপক ছিলাম তো, লম্বা বক্তৃতা দেবার অভ্যেসটা যায়নি।

আমি বললাম, তুমি এত কথা কি বই পড়ে জেনেছ?

শুধু বই কেন, চোখে দেখিনি বুঝি। ইউনিভারসিটি তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেলে কত দিন ছুটে গেছি মিউজিয়ামে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখার চেষ্টা করেছি। কত শত বছরের প্রাচীন মুদ্রা, কত রাজার প্রতিকৃতি বুকে নিয়ে পড়ে ছিল মাটির গভীরে অথবা কোন গুপ্ত কুঠুরির মধ্যে, তাকে তুলে আনা হয়েছে। কত বালুচরী শাড়ি, কত অপূর্ব নক্সাকাটা আলোয়ান, কত গৃহস্থালীর জিনিস থরে থরে সাজানো আছে—বিলাসী মানুষের ঘরে একদিন এ সব শোভা পেত। এই সব মূল্যবান শাড়ি পরে ঘুরে ফিরেছে কত সম্ভ্রান্ত বধূ—আজ সেই শিল্প-সামগ্রীগুলি মিউজিয়ামের সম্পদ।

সব কথা বলা যাবে না নসীম। শুধু শিল্পকলা, পুরাতত্ত্ব আর নৃতত্ত্ব বিভাগেই একলক্ষ দর্শনীয় জিনিস রয়েছে।

চোখ কান খোলা রেখ, তার চেয়ে বড় কথা অনুভূতিটাকে সেতারে বাঁধা তারের মত সূক্ষ্ম আর স্পর্শকাতর করে রেখ, তাহলে বহু অজানা তথ্য যাদুঘরের ঐ মৃতকল্প বস্তুগুলোর ভেতর থেকে সংগ্রহ করতে পারবে।

আমি মিউজিয়ামে অ্যাসিস্ট্যান্ট কীপারের চাকরিতে বহাল হলাম। কিছু দিন ঘুরে ঘুরে দেখে বুঝে নিলাম সবকিছু।

নতুন কোন শিল্প বস্তু সংগৃহীত হলে আমি চাচাজীকে টেনে আনি। তিনি দেখে ভারী খুশি হন। শিশুর মত কৌতূহলী হয়ে ওঠেন।

এডুকেশান অফিসার মিঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে করিডোরে দেখা। বললাম, মিউজিয়ামে ভূতের ওপর আপনার লেখা খুব জমেছে। পাঞ্জাবী যুবকটির কাহিনীটি একেবারে রহস্যে ভরা।

হেসে বললেন, ইতিহাসের বাইরে যাবার উপায় তো আমার নেই। তারই ভেতর যতটুকু প্রকাশের কারিকুরি।

মিঃ চক্রবর্তী মাথা নেড়ে তাঁর ওপরের অফিস ঘরে চলে গেলেন। আমি ভাবতে লাগলাম। সত্যি পাঞ্জাবী যুবকটির কি কথা ছিল পিটার স্পেক্স্ সাহেবের সঙ্গে।

ঘটনাটা এই, একটি শিখ যুবক এক সময় পিটার স্পেক্স্-এর সঙ্গে যাদুঘরের ওপরতলায় তাঁর কোয়ার্টারে দেখা করতে চায়। কিন্তু সে বাধা পেল সাহেবের দুজন আরদালীর কাছ থেকে। আর যায় কোথা, টগবগ করে ফুটতে লাগল শিখ রক্ত। মুহূর্তে ঝল্সে উঠল তার হাতের কৃপাণ। দুটি আরদালীই দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। ক্রুদ্ধ শিখ যুবকটি সিঁড়ি ভেঙে দ্রুত পায়ে উঠে গেল ওপরে। তাকে তার কথা সাহেবের কাছে বলতেই হবে। কিন্তু ততক্ষণে হত্যার সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। গোরা রক্ষী ছুটে আসছে আততায়ীকে ধরতে। বাইরের বারান্দা দিয়ে শিখ যুবকটিও ছুটে চলেছে সাহেবের ঘরের দিকে। অব্যর্থ

নিশানায় রক্ষীর বন্দুকের গুলি ছুটে এলো। ১৮৯৭ সালের মে মাসের রৌদ্রদগ্ধ এক দুপুরে সুদর্শন এক শিক যুবকের রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল যাদুঘরের ওপরতলার বারান্দায়। তার জরুরী কথাটি সাহেবকে আর এ জন্মে বলা হল না।

আজও ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে, কিংবা সন্ধ্যার আবছা আলো-আঁধারি পরিবেশে একটা গুমোট হাওয়া ঘূর্ণির মত নীচ থেকে ওপরে উঠে আসে। তারপর হু হু করে বারান্দা দিয়ে ছুটে এসে হঠাৎ থেমে যায়। এ কি সেই শিখ যুবকের অতৃপ্ত আত্মার অভিযান?

মনে নানা রকম প্রশ্ন জাগে। কোন চাকরির উমেদার হয়ে কি এসেছিল যুবকটি? মনে হয় না। তাহলে অন্তত প্রার্থীর বিনয় তার কাছ থেকে আশা করা যেত।

মনে হয় তার বৃত্তি ছিল সৈনিকের। সে হয়তো অশ্বারোহী সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত ছিল। কোন কোন দিন অতি প্রত্যূষে হয়তো সে তার তেজী কালো ঘোড়াতে চেপে ময়দানের দিকে ছুটে আসত। তারপর উন্মুক্ত ময়দানে ছুটে ছুটে অশ্ব ও অশ্বারোহী দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়ত।

একদিন প্রথম ফাল্গুনের হাওয়ায় উতলা হয়ে উঠেছিল ময়দান। গাছে গাছে শীত শেষে দেখা দিয়েছিল সবুজ কচিপাতা। পুবদিকের সীমান্তে কৃষ্ণচূড়া, পলাশ আর গুলমোরের ডালে ডালে লেগেছিল উৎসব।

ঘোড়া নিয়ে এক চক্কর পাক দিয়ে এসে লাগাম ধরে পুবমুখে স্থির হয়ে দাঁড়াতেই একটি দৃশ্য চোখে পড়ল তার। ওই ফুলের আগুন ধরা গাছগুলোর ভেতর থেকে দুধ সাদা একটি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসছে গোলাপী পোশাকে মনে আগুন ধরিয়ে দেবার মত রমণীয় একটি তরুণী।

কাছে এসে ঘোড়া থামাল তরুণী। বিস্ময় দুজনেরই চোখে। পরিচয় হতে দেরী হল না। একই সময়ে তিনটি দিন একই সঙ্গে অশ্বারোহণে মিলিত হবার পর দুজনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ল।. মন বিনিময় হল।

পিটার স্পেক্স্-এর মেয়ে সিসিলিয়া অন্ধ ভালবাসায় জড়িয়ে পড়ল সুদর্শন শিখ যুবক রণজিৎ সিং-এর সঙ্গে।

এনগেজমেন্ট রিং পরিয়ে দিল রণজিৎ সিং সিসিলিয়ার অনামিকায়। আংটিতে ডালিমের দানার মত একটি চুনি। প্রথম দিন ওই চুনির কাছাকাছি রঙের একটি পোশাক পরেছিল সিসিলিয়া। সেই স্মৃতি মনে রেখেই রণজিতের এই চুনিটি নির্বাচন। চুনির একপ্রান্তে 'আর' এবং অন্য প্রান্তে 'এস' অক্ষর দুটি সোনার মধ্যে খোদাই করা। অক্ষর দুটি রণজিৎ সিং বোঝাতে পারে আবার দুটি নামের আদ্যাক্ষরও বোঝায়।

কিন্তু কাল হল ঐ আংটিই। এক রাতে সিসিলিয়ার মা ক্যারোলিন ঘুমন্ত মেয়ের আঙুলে আংটিটি দেখে ফেললেন। তিনি জানতেন বড় স্বাধীনচেতা মেয়ে তাঁর।

ক্যারোলিন মেয়েকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন না। স্বামীকে সব কথা খুলে জানালেন। পিটার স্পেক্স্ বিচলিত হলেন, কে এই 'আর এস?'

গোপন সন্ধানে সবকিছুই ধরা পড়ল। শিখ যুবকের সঙ্গে মেলামেশা লক্ষ্য করলেন পিটার স্পেক্স্। খোঁজ নিয়ে জানলেন যুবকটির নাম আর পরিচয়।

নেটিভের এতখানি বুকের পাটা! মুহূর্তে তিনি চূর্ণ করে দিতে পারতেন যুবকটিকে। কিন্তু তাঁর অতি প্রিয় মেয়ে জড়িয়ে আছে এই অপ্রিয় ঘটনার সঙ্গে। জানাজানি হলে নিজেদের সমাজেই ছি ছি পড়ে যাবে। একটা নেটিভের সঙ্গে সিসিলিয়ার প্রেম! সমাজের চোখে কোথায় নেমে যাবে তারা।

স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ হল। অচিরে ক্যারোলিন দেশে ফিরে যাবে। এস্টেটের একটা জরুরী ব্যবস্থার জন্য দেশে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। এদিকে বোম্বেতে কিছু দিনের ট্যুরে যাবেন পিটার স্পেক্স্।

আকস্মিক ভাবেই যেন ঠিক হয়ে গেল সবকিছু। সব ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার আগেই সিসিলিয়াকে গিয়ে উঠতে হল স্বদেশগামী জাহাজে।

সিসিলিয়ার কাছে বোম্বে যাবার কথা বললেও স্পেক্স্ কিন্তু বোম্বে গেলেন না।

এদিকে সিসিলিয়াকে ক'দিন দেখতে না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠল রণজিৎ সিং। তার মনে নানা প্রশ্নঃ, সিসিলিয়া কি অসুস্থ? অথবা তার মনের কি কোন পরিবর্তন ঘটেছে? শেষের ভাবনাটা যদিও

তাকে অস্থির করে তুলল তবুও তার মনে হল, এ অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব। সিসিলিয়া নিজের মুখে বলেছে, যদি চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি অবিশ্রান্ত বর্ষণের ফলে মহাপ্লাবনে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায় তাহলেও সে রণজিতের হাত ধরে নোয়ার জাহাজে উঠবেই।

চতুর্থ দিন দুপুরে প্রচণ্ড রোদের তাপে দগ্ধ হতে হতে সে চলে এলো যাদুঘরের সামনে। ওপরের জানালার দিকে চেয়ে দেখল রণজিৎ, না, কেউ নেই জানালার ধারে বসে, সব ক'টিই বন্ধ। যাদুঘরের ভেতরে ঢুকতেই তার দেখা হল সাহেবের দুটি আরদালীর সঙ্গে। তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে রণজিৎ জানতে পারল, এ সময় সাহেব কারো সঙ্গে দেখা করবেন না। এবার আসল প্রশ্নটি পাড়ল রণজিৎ, সাহেবের মেয়ে সিসিলিয়াকে চেনো?

একজন বলল, চিনব না কেন।

অন্যজন বলল, চিনি না চিনি তাতে তোমার দরকার কি?

রণজিৎ তখন কিছুটা অশান্ত হয়ে উঠেছে। সে মিলিটারী মেজাজে ধমক দিয়ে বলল, জলদি সিসিলিয়াকে গিয়ে খবর দাও বেকুব। বল, রণজিৎ সিং এসেছে।

খোদ সাহেবের আরদালী তারা। রণজিতের কথায় ভয় না পেয়ে ক্ষেপে গেল, উল্লু, ভাগো হিয়াঁসে—বলে তাদেরই একজন আচমকা ধাক্কা মারল রণজিতকে। অপরজন বলল, ছোট মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করবি তো বেটা এখানে এসেছিস কেন, সমুন্দুর সাঁতরে বিলেত চলে যা।

কি বলছে ওরা! ভাবল রণজিৎ তাহলে সত্যি কি সিসিলিয়া দেশে চলে গেছে।

রণজিৎ যেন উন্মাদ হয়ে গেল। সিসিলিয়া সম্বন্ধে সত্য সংবাদটুকু তাকে এখুনি সংগ্রহ করতেই হবে। ওদের পাশ কাটিয়ে সে ক্ষিপ্র পায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

আরদালী দুজন দ্রুত দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলল তাকে। তারপর হিঁচড়ে কিছুটা টেনে আনল পিছন দিকে।

এবার সত্যি ক্ষিপ্ত হয়ে গেল রণজিৎ। মুহূর্তে কৃপাণটাকে টেনে নিয়ে আমূল বিদ্ধ করে দিল পর পর দুটো দেহ।

সিসিলিয়া, সিসিলিয়া—! চিৎকার করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে চলল রণজিৎ। কিন্তু মিঃ স্পেক্সের কোয়ার্টারে আর পৌঁছান হল না। বন্দুকের গুলিতে বুকের মাঝে একটি রক্ত গোলাপ ফুটিয়ে বিদায় নিল ইহজগৎ থেকে।

একমাস পরে রণজিতের ঠিকানায় আসা একটি চিঠি রি-ডাইরেক্টেড হয়ে গিয়েছিল তার দেশের ঠিকানায়। চিঠিখানা খোলা হয়েছিল। তারপর সেটিকে আর একটি খামে পুরে পিটার স্পেক্সের এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চিঠিটিতে সিসিলিয়া রণজিতকে লিখেছে—সমুদ্র আমার কাছে কোন বাধা নয় রণজিৎ। একদিন আমি ঠিক তোমার কাছে সোয়ালো পাখির মত উড়ে চলে যাব।

দুই

গত রাতে মিউজিয়ামে এক কাণ্ড। ক'দিন হল একটি বিহারী ছেলেকে পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়েছে, সে বেচারা সবে দেশ থেকে এসেছে। যাদুঘরের হালচাল জানে না। অন্য সব দারোয়ান তাকে ক'দিন ধরে যাদুঘরের ভূত সম্বন্ধে নানা রকম গল্প করেছে। ব্যস, আর যায় কোথা। ডিউটি সেরে ঘুমুতে গিয়েই ভূতের স্বপ্ন! স্বপ্ন ভেঙে গেলেও ভূত তাকে ছাড়েনি। সে ছুটছে দক্ষিণ থেকে পূবের বারান্দা দিয়ে উত্তরমুখো। সিকিউরিটি অফিসারের কোয়ার্টারের দিকে পালাচ্ছে। সাহেব যদি বন্দুক ছুড়ে ভূতটাকে মারতে পারেন তবেই রক্ষে। এ যে সে ভূত নয়, চার হাজার বছর আগেকার এক ম্যমি—মোটা বেঁটে একখানা লাঠি উঁচিয়ে তার পিছনে তাড়া করে আসছে। বেশী দূর এগোতে হয়নি। পদচিহ্ন খোদাই করা একটা পাথরে পা বেধে পড়ে গিয়ে সম্ভবত কনুইয়ের হাড় ভেঙেছে। তাকে দিয়ে আসা হয়েছে হাসপাতালে।

ভূতের গল্প বেশ চালু আছে মিউজিয়ামে। এই তিন হাজার আটশো বাইশ বছরের পুরোনো

ম্যমিকে নিয়েই তো কত কথা ভাবা যেতে পারে।

কাচের শো-কেসের ভেতর যে ম্যমিটি শুয়ে আছে, সেটি মিশর থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। লেফটেন্যান্ট আর্চবোল্ড গুরবের রাজাদের সমাধি খুঁড়ে এটিকে বের করে এনেছিলেন।

সহজে ম্যমিটি আসতে চায়নি, আর আসতে চাইবেই বা কেন। নিজের দেশ ছেড়ে—কে কবে দূর দেশে চিরদিনের মত পাড়ি জমাতে চায়!

মরবার আগে সে বহুবার শুনেছে যে মৃতরা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে—প্রাচীন মিশরে এই ধারণাই তো ছিল বদ্ধমূল। মৃত্যুর পরে ওর কাষ্ঠাধার ঘিরে পুরোহিতরা অনেক রকম পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্ম করেছিল। সে যে আবার বেঁচে উঠবে সে প্রতিশ্রুতি তার মৃতদেহকে দেওয়া হয়েছিল মন্ত্র উচ্চারণ করে।

মিশরীয়দের বিশ্বাস, মৃত্যুর দেবতা 'অসিরিস' ম্যমির ভিতরের দেহটিকে নিয়ে প্রবেশ করে নবজীবনের উদীয়মান সূর্য বা 'রে'র মধ্যে। তাই তারা মৃতদেহটিকে নষ্ট না করে মৃত্যুর পরে আশ্চর্য সব ভেষজ প্রয়োগে প্রায়-অবিকৃত রেখে দিত। জড়িয়ে দিত তাকে বস্ত্রখণ্ডে। তারপর খোদিত ও চিত্রিত কাষ্ঠাধারে তাকে আবদ্ধ করে সেই আধারটি পিরামিড অথবা সমাধিগুহার মধ্যে রাখা হত।

কলকাতার ম্যমিটিও তার অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে দীর্ঘ প্রায় চার হাজার বছর অপেক্ষা করেছিল অসিরিসের জন্য। অসিরিস এলেন না, এলেন আর্চবোল্ড তাকে উদ্ধার করতে।

কবর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সে চিৎকার করে বলল, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে চললে? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তোমরাই তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে আমি নতুন ভাবে বেঁচে উঠব, কিন্তু এ কেমন অন্ধকারের রাজ্যে বাঁচা আমার?

আর্চবোলড কোন কথাই শুনতে পেলেন না। সেই বিক্ষুব্ধ আত্মাকে তিনি বয়ে নিয়ে এলেন।

ম্যমিটিকে বয়ে নিয়ে আসা অবশ্য খুব সহজ হয়নি। ম্যমির আধারটিকে জাহাজে তুলে মোকা (mocha) থেকে নিয়ে আসা হচ্ছিল, হঠাৎ নাবিকরা বেঁকে বসল—তারা ম্যমিকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। আধারটিকে তারা নামিয়ে দিল কাছেপিঠে এক বন্দরে।

ম্যমিটি কি নাবিকদের স্বপ্নে দেখা দিয়েছিল? সে কি বলেছিল, কেন তোমরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছ? তোমরা আমাকে দেশছাড়া করলে আমিও তোমাদের দেশছাড়া করব। নাকি অকালে সমুদ্রে তুফান উঠেছিল? টালমাটাল জাহাজ ডোবে ডোবে! নাবিকদের ভেতর ঘনিয়ে উঠল অসন্তোষ। কি অপরাধে শুরু হল এই মরণ-নাগিণীদের আক্রমণ? অবশেষে সন্দেহ করা হল, সমস্ত উপদ্রবের মূল তাহলে এই ম্যমি। একদল বলল, ঐ আপদকে ফেলে দাও সমুদ্রে। অন্য দল বলল, না, এই দূষিত আত্মাকে সমুদ্রও গ্রহণ করবে না। আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। অবশেষে তারা হয়তো প্রার্থনা জানিয়েছিল জলাধিপতির কাছে—তুমি শান্ত হও, আমরা কথা দিচ্ছি, এ আপদকে অবিলম্বে বিদায় করব। তাই হয়তো নিকটবর্তী কোন বন্দরে তারা একে পরিত্যাগ করেছিল।

কিন্তু তার নশ্বর জীবনে সে কি ভালবাসা পেয়েছিল? এ কি পুরুষ না নারী? এর মৃত্যুর কারণই বা কি?

বিজ্ঞান এর উত্তর দিয়েছে। পরীক্ষায় জানা গিয়েছে এই ম্যমিটি পঞ্চাশের অধিক বয়স্ক এক পুরুষের, মেরুদন্ডের হাড়ে স্পণ্ডিলাইটিসের লক্ষণ। হাঁটুতে বাত। মানুষটিকে হত্যা করাই হয়েছিল, কারণ বুক ও পিঠের পাঁজরে ভোঁতা হাতিয়ার দিয়ে আঘাতের চিহ্ন। কণ্ঠনালীতেও ক্ষত।

কে এই নেগ্রোইড বৈশিষ্ট্যযুক্ত মানুষটি?

কয়েকদিন মাথায় কেবল ঐ ম্যমিই ঘুরতে লাগল।

আমার লেখার বাতিক সম্বন্ধে জানতেন এডুকেশান অফিসার মিঃ চক্রবর্তী। আমি সপ্তাহে দু-তিন দিন ডায়েরী লিখতাম। ডায়েরী লিখতে গিয়ে বাস্তবকে ভিত্তি করে কল্পনার প্রাসাদ তৈরি করতাম।

ম্যমি পরীক্ষা করে ডাক্তার সুভাষ বসুর এক্স-রে রিপোর্ট বেরুবার পর আমি ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। মিঃ চক্রবর্তী বিভিন্ন পত্রিকায় কলকাতার যাদুঘরের ওপর একাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখলেন। সেই সত্যনিষ্ঠ লেখাগুলো নিরস প্রবন্ধমাত্র ছিল না। রচনার মুন্সীয়ানায় সেগুলো দারুণ

উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। আমি মিঃ চক্রবর্তীকে ম্যমি সম্বন্ধে তাঁর লেখাটির প্রশংসা করতে গেলে তিনি বললেন, সবই তো বুঝলাম নসীম, কিন্তু মানুষটি কে? কেনই বা তাকে হত্যা করা হল? সে কি কোন ক্রীতদাস ছিল, আর কাজে অক্ষমতার জন্যই এই পুরস্কার, নাকি ঘটনাচক্রে নিহত রাজসভার কোন কবি?

উত্তর পাইনি কিছু, কারণ উত্তর কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয়। কিন্তু নিজের ঘরে এসে প্রায় চার হাজার বছর বয়সের এই মানুষটার জন্য মনের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করতে লাগলাম। প্রতিদিন মানুষটি যেন আমাকে তাড়া করে ফিরতে লাগল—লেখ, লেখ, আমার কথা লেখ।

ডায়েরীর পাতায় একদিন ম্যমির জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখে ফেললাম—

সারাদিন আগুনে ঝলক্ দিয়ে দিয়ে জ্বলছিল বালির প্রসারিত প্রান্তর। গায়ের চামড়া ঝলসে গেলেও রাজাদের সমাধি-গৃহ তৈরির কাজ বন্ধ হয়নি। নীল নদের প্লাবনে যে জলস্ফীতি ঘটেছে তাকে কাজে লাগানো হচ্ছিল। ঐ জল এখন কৃষির ক্ষেত অতিক্রম করে বালুভূমি পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। দূর থেকে সমাধি-গৃহ নির্মাণের জন্য নৌকোয় যে পাথর আনা হচ্ছিল তা এখন কাজের জায়গার অনেক কাছে এগিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে। এখন তাই কেবলমাত্র নীল নদেই জোয়ার আসেনি কাজেও জোয়ার এসেছে। বৃদ্ধ রাজা হোথেপের যোয়ান সেনাপতিকে দেখলেই পাহারাদাররা চাবুক চালাচ্ছে নির্মম হাতে। সেনাপতি এসে দাঁড়ালেই বেড়ে যাচ্ছে চাবুকের মাত্রা। রাজা হোথেপের ইচ্ছা, তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি দেখে যাবেন তাঁর সমাধি-গৃহটি। অতি সুন্দর আর সূক্ষ্ম কাজে ভরিয়ে তুলবেন সমাধি সংলগ্ন ভজনাগারটি। তাঁর এলাকার সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কর্ম-জীবনের ছবি আঁকা থাকবে ঐ ভজনাগারের সব ক'টি দেওয়ালে।

হোথেপ সামন্ত রাজা হলে কি হয়, তিনি মহা প্রতিপত্তিশালী। তখন মিশরে দ্বাদশ রাজবংশের রাজত্ব চলেছে। এ সময় ফারাওরাই লিখিতভাবে মিশরের সম্রাট হলেও শিথিল হয়ে গেছে তাদের শাসনের হাত। সারা মিশর জুড়ে তখন রাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রায় স্বাধীন নরপতির মত আপন এলাকা শাসন করে চলেছে তারা।

কালো গ্র্যানাইট পাথর খোদাই করে তৈরি হচ্ছে তৃতীয় আমেন এমেথের স্ফিংস-মূর্তি। দ্বাদশ রাজবংশের শেষে, ফারাও আঠারোশো চল্লিশ খৃস্ট পূর্বাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেছেন। ঠিক সেই লগ্নে মিশরের দক্ষিণে নীল নদের উৎসের দিকে একটি অখ্যাত স্থানে ভূমিষ্ঠ হয়েছে একটি শিশু। তারপর পঁয়ত্রিশটি বছর কেটে গেছে। ঐ শিশু ফুরিস এখন পরিণত একটি মানুষ। বিয়ের অব্যবহিত পরেই ক্রীতদাস রূপে ধৃত হয়ে এসেছিল রাজা হোথেপের রাজ্যে। প্রথমে কষ্টসাধ্য পাথর বয়ে আনার কাজ করেছে। এখন সে নিযুক্ত আছে পাথর মসৃণ করার কাজে। যে সব দক্ষ মিশরীয় শিল্পীরা পাথর খোদাইয়ের কাজ করছে তারা হঠাৎ খেয়ালের বশে তৈরি করা ফুরিসের হাতের কাজ দেখে তাজ্জব বনে যাচ্ছে। পাথর মসৃণ করা যার কাজ সে কি করে শিখল এমন খোদাইয়ের কাজ!

সারাদিন রোদে পুড়ে পাথর মসৃণ করেছে ফুরিস। ঈষৎ ঝুঁকে যারা দড়ির সাহায্যে পাথর টেনে আনছে তাদের শ্রম হচ্ছে অকল্পনীয়। একটু থেমে দাঁড়ালেই পিঠ জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে চাবুকের ঘায়ে। কিন্তু যারা সারাদিন হাঁটু ভেঙে মেরুদণ্ড ধনুকের মত বাঁকিয়ে পাথর পালিশ করছে তারা পঙ্গু হয়ে যাচ্চে ধীরে ধীরে। পা ও মেরুদন্ডের ব্যথায়।

ফুরিস কাজের শেষে শরীরটাকে টান টান করে দাঁড়াল। পশ্চিমের ধূ ধূ মরুদিগন্তে সূর্যাস্তের আয়োজন। চাবুকের ঘায়ে বিক্ষত মানুষগুলোর জমাট বাঁধা রক্ত যেন ছড়িয়ে আছে পশ্চিম আকাশের গায়ে। সূর্যটা ক্রীতদাসদের রক্তাক্ত হৃৎপিন্ডের মত দিগন্তের শেষ রেখায় দাঁড়িয়ে আছে।

ফুরিস নিজের আস্তানায় গিয়ে রাতের খাবার খেয়ে নিল। খেয়েই কিন্তু সে বিশ্রাম করে না। অন্য সব ক্রীতদাস যখন সারাদিনের ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে শয্যায় তখন ফুরিস হেঁটে চলে যায় নীল নদের তীর ধরে বেশ খানিক দূরে। রাজার প্রাসাদ আর তার কর্মক্ষেত্র যেখানে নদীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায় সেখানে সে নদীর জলে নেমে দাঁড়ায়। দু'-হাতে জল স্পর্শ করে রোমাঞ্চিত হয়। তার মনে হয়, সে যে জল স্পর্শ করছে, তা বয়ে আসছে তারই কুটির সংলগ্ন নীল নদ থেকে। এই জলেই তো তার স্ত্রী স্নান

করে, হয়তো তার দু'ফোঁটা কান্নাও এই স্রোতের সঙ্গে মিশে আছে। ইতিমধ্যে কি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে তার তা সে জানে না, শুধু সে জেনে এসেছিল তার স্ত্রী মা হতে চলেছে! হায় ভাগ্য, কোথায় তারা আর কোথায় সে। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া দু'ফোঁটা চোখের জল সে নদীর শীতল জলে ধুয়ে নিল। এবার হাতের পাতায় চোখ মুছে উঠে দাঁড়াতেই সে এক অভাবনীয় দৃশ্যের মুখোমুখি হল।

পুবদিকে পূর্ণ চাঁদ উঠে এসেছে আকাশে। তার কিরণে স্নান করে পশ্চিম থেকে নদীর দিকে নেমে আসছে একটি মেয়ে। ফুরিসের কাছাকাছি এসে সে থমকে দাঁড়াল।

প্রথমে মেয়েটির দিক থেকেই প্রশ্ন এলো, কে তুমি?

আমি ক্রীতদাস, ফুরিস আমার নাম।

এ তো রাজা হোথেপের রাজ্যের এলাকা, তুমি কি—

আমি তাঁরই গোলাম। সমাধি-গৃহের পাথর পালিশের কাজ করি।

আমি তাঁরই প্রাসাদের দাসী। রাজা হোথেপের একমাত্র কন্যা সিসুই নীল নদের তীরে রাজার মৃগয়া-গৃহে সপ্তাহ যাপন করে ফিরছেন। তিনি শিবিকা থেকে তোমাকে দেখতে পেয়েছেন। তুমি তাঁর কাছে চল, তোমাকে তাঁর বিশেষ প্রয়োজন।

মেয়েটি আগে আগে চলল, ফুরিস চলল তার পেছন পেছন। মনে তার নানান্ প্রশ্ন ভীড় করে এলো।

শিবিকা বাহিকারা সম্ভবত রাজকুমারী সিসুইয়ের আদেশে সরে গিয়েছিল। ফুরিস শিবিকার কাছে পৌঁছে নত হয়ে অভিবাদন করল। শিবিকার একটি প্রান্তে সূক্ষ্ম বস্ত্রের আবরণ সরে গেল। দেখা দিল আশ্চর্য সুন্দর এক তরুণীর মুখ।

রাজকন্যা প্রথমে তার পরিচয় নিল। তারপর বলল, তুমি আমার একটা কাজ করে দিতে পারবে?

আমি আপনার আজ্ঞাপালক ক্রীতদাস, আদেশ করুন।

না, এই মুহূর্তে তুমি ক্রীতদাস নও, তুমি আমার পরম উপকারী বন্ধু। আমি তোমাকে যা বলব তা খুবই গোপনীয়। আগে প্রতিজ্ঞা কর, এ কথা কোন দিন প্রকাশ করবে না।

মাথা নত করে ফুরিস বলল, প্রভু 'আমোন-রা' এর নামে শপথ করছি, প্রাণ গেলেও আপনার কথা কেউ এ মুখ থেকে শুনতে পাবে না।

রাজকুমারী বলল, আমার সময় অত্যন্ত কম, চারদিকে সন্ধানী চোখ, তবু তোমাকে আমার সব কথা সংক্ষেপে না বললে তুমি আমার কাজ করতে পারবে না।

ফুরিস রাজকুমারীর কথা শোনবার আগ্রহে চেয়ে রইল।

সিসুই বলল, আমার বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন, যদিও এখুনি তাঁর মৃত্যুর কোন আশঙ্কা নেই তবু তিনি সমাধি-গৃহ নির্মাণ করে চলেছেন। আমার ভাই নেই, আমিই হব তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। আমি যাকে বিয়ে করব বাবার মৃত্যুর পর সে-ই এ রাজ্যের রাজা হবে। তারপর একটু থেমে সিসুই প্রশ্ন করল, এ রাজ্যের সেনাপতি জারেককে তুমি চেনো?

তিনি আজও আমাদের তদারকিতে এসেছিলেন।

বড় নিষ্ঠুর আর বড় কৌশলী এই জারেক। আমার বাবাকে বৃদ্ধ দেখে রাজ্যের প্রায় সমস্ত ক্ষমতা নিজের মুঠোয় পুরে রেখেছে। প্রজারা ওকে পছন্দ করে না, কিন্তু সৈন্যসামন্তর বেশীর ভাগকে উৎকোচ আর পদোন্নতির প্রলোভন দেখিয়ে ও হাত করেছে। ও কিন্তু প্রজাদের দিকে তাকিয়ে বাবাকে এখুনি ক্ষমতা থেকে সরাতে চায় না। ওর উদ্দেশ্য আরও গভীর। বাবার মৃত্যুর পর ও আমাকে বিয়ে করে সমস্ত রাজ্যের অধিকার পেতে চায়। যদি বাবা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন তাহলে জারেক বাবাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সোজাসুজি আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবে।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সিসুই বলল, এই নদী তীর ধরে কিছু পথ গেলেই একটি জলা আর জঙ্গলে ঘেরা জায়গা দেখবে। ওর ভেতর আমাদের সুন্দর একটা বাড়ি আছে। ওখানে আমি কয়েকদিন কাটিয়েছিলাম। ওগুলো রাজাদের শিকারের বাড়ি। আমি এখন সেখান থেকেই আসছি।

এবার তোমাকে যা করতে হবে তা শোন। আমার শিকার ঘরের পাশেই দেখবে নীল নদের একটি শাখা বয়ে যাচ্ছে। ওখানে পেপাইরাসের তৈরি একটা নৌকো বাঁধা আছে। সেই নৌকোয় চেপে তুমি ওপারে চলে যাবে। ওপারে কারমারের রাজার শিকার ঘর। কারমারের রাজকুমার শিকারে এসেছেন। নদীর উভয় তীরে দাঁড়িয়ে আমরা দুজনকে দেখেছি। কিন্তু আমাদের ভেতর কোন কথা হয়নি। তোমাকে আমি একটি চিঠি দিচ্ছি, তুমি এই চিঠিটা তাঁর হাতে পৌছে দেবে।

ফুরিস বলল, আমি আপনার কাজ করে দেবার জন্যে এখুনি প্রস্তুত, কিন্তু নৌকোয় পারাপার করতে গেলে রক্ষক যদি বাধা দেয়?

কোন ভয় নেই তোমার, সন্ধ্যার পর ও উত্তেজক পানীয় পান করে অর্ধ অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকে। তুমি ওখানে গিয়ে নদীর ধারে সবচেয়ে উঁচু একটি গাছ দেখতে পাবে, তারই ছায়ার অন্ধকারে নৌকোটি বাঁধা আছে। ঐ রক্ষীটিকে আমি বিশ্বাস করি না, কারণ ও জারেকের নিযুক্ত লোক। আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে রাজবাড়ি থেকে কারমারের রাজার কাছে তার ছেলের পাণি প্রার্থনা করে একজন দূতকে পাঠানো হয়েছিল। মাঝপথে সে আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছে। আমি জানি এ জারেকেরই কাজ।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন রাজকুমারী, আমি নিশ্চয়ই আপনার কাজ করে আসব।

তোমার কথাও আমার মনে থাকবে ফুরিস। এখুনি কিছু করতে গেলে ধরা পড়ে যেতে হবে। তোমর প্রাণ নিয়েও টানাটানি পড়তে পারে। আমি কথা দিচ্ছি, সুযোগ বুঝে তোমার জন্য অবশ্যই আমি কিছু করব।

রাজ্যের সমস্ত পরিস্থিতি জানিয়ে সিসুই কারমারের রাজকুমারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে চিঠি পাঠিয়ে দিল। কিছু কাল আগে তাদের প্রেরিত বিশেষ দূত যে আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিল সে কথাও জানাতে ভুলল না।

ইতিমধ্যে ফারাও আমেনএমেথের ডাকে সামন্ত রাজারা সমবেত হয়েছিল থিব্‌স্‌-এ। সেখানে কারমারের রাজকুমারের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় রাজা হোথেপের। রাজকুমার গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে হোথেপের কন্যা সিসুই-এর পাণি প্রার্থনা করে। রাজা সানন্দে সম্মতি দেন। ঠিক হল হোথেপের রাজা কন্যার বিবাহের কথা প্রচার করবেন না। কারমার থেকে সশস্ত্র বাহিনী বরযাত্রীর সাজে সজ্জিত হয়ে আকস্মিক ভাবে হোথেপের রাজ্যে উপস্থিত হবে। সেখানে পৌছে বিবাহ সম্পন্ন হবে অনাড়ম্বরে। সেনাপতি জারেক যাতে আগে থেকে কোন রকম পরিকল্পনা করতে না পারে সেজন্যে দু'রাজ্যে এই ব্যবস্থা পাকা হয়ে রইল।

সেইমতই একদিন জারেককে হতভম্ব করে দিয়ে কারমারের রাজকুমার এসে সিসুইকে বিয়ে করে নিয়ে গেল।

কারমারে চলে যাবার আগে সিসুই ক্রীতদাস ফুরিসেব মুক্তির জন্য তার বাবাকে বলে গেল। কিন্তু এখানে বাদ সাধল জারেক। সে রাজা হোথেপকে বোঝাল এমন একজন প্রতিভাবান কর্মী রাজার সুচারু সমাধি-গৃহটি তৈরির জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। সে কেবল পাথরই মসৃণ করে না খোদাই ও চিত্রকর্মে সে রীতিমত দক্ষ।

রাজা হোথেপ তখন ফুরিসকে মুক্তি না দিয়ে রাজপ্রাসাদে তার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেখান থেকে সে খোদাইয়ের কাজের জন্য প্রতিদিন সমাধি স্থানে যেত। এবং রাজার আদেশে সে পেল গুণী শিল্পীর সম্মান।

ফুরিসের ওপর রাজা এবং রাজকন্যার এই পক্ষপাতিত্বই জারেকের সন্দেহের কারণ হয়ে উঠল। যে রাতে রাজকন্যা শিকার-গৃহ থেকে প্রাসাদে ফিরে আসে সে রাতে দীর্ঘ সময় ফুরিস অনুপস্থিত ছিল, এ খবর তখন জারেকের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক না করলেও পরে কার্যকারণ বিচার করতে গিয়ে এর গুরুত্ব ধরা পড়ে। কিন্তু তখন সিসুই -পাখিটি ডানা মেলে উড়ে গেছে কারমারে। শিকার-গৃহের রক্ষী বলেছিল, রাজকন্যা যে রাতে প্রাসাদে ফিরে যায় সেদিন প্রভাতে কারমারের রাজকুমারকে সে

ওপারে দেখেছে, এবং পরের দিন পারাপারের নৌকোটিকে সে যথাস্থানে বাঁধা থাকতে দেখেনি।

সব মিলিয়ে ফুরিসের ওপর ক্রোধ বাড়তে থাকে জারেকের। কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল সে কিন্তু ফুরিসের কাছ থেকে কোন রকম স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি।

এমনি করে কেটে গেল আরও পনেরোটি বছর। শেষ হয়ে গেছে সমাধি-গৃহ তৈরির কাজ। সমাধির সামনে ভজনাগারটি হয়েছে দর্শনীয়। তার প্রতিটি দেওয়ালই আশ্চর্য সব রঙ ও রেখায় চিত্রিত। এ চিত্রকর্মগুলি রাজার নির্দেশে ফুরিসই সম্পন্ন করেছে। প্রথা অনুযায়ী ভজনাগারের গাত্রচিত্রগুলির বিষয়বস্তু নির্বাচিত হয় জনজীবন থেকে। ফুরিস তেমনি বিষয়ই নির্বাচন করেছিল। কেবল একটি দেওয়ালে সে চিত্রিত করেছিল এক যুবতীর নিত্যকর্মের বিভিন্ন ছবি। সে প্রভাতে হাঁসগুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে জলাশয়ের দিকে। দুগ্ধ দোহন করছে। শস্যের ভূষি উড়িয়ে চলেছে কুলোর বাতাস দিয়ে। আবার একটি শিশুকে শূন্যে তুলে ধরে আদর জানাচ্ছে।

এমনি অজস্র গৃহকর্মের ছবি। ফুরিস পঁচিশটি বছর আগে যে মেয়েটিকে অনাগত·একটি শিশুসহ পরিত্যাগ করে এসেছিল তাকেই অক্ষয় কবে রাখল তার সৃষ্টির মধ্যে।

রাজা হোথেপ মারা গেলেন। যথারীতি খবর গেল কারমার রাজপ্রাসাদে। সিসুই দ্রুতগামী দূতের মুখে করণীয় অনুষ্ঠানগুলির আয়োজন সম্পূর্ণ করে রাখতে আদেশ পাঠাল। সে স্বামীসহ এলেই সমাধি-গৃহে ম্যমি প্রবেশ করবে। সিসুই এখন তার পিতাব সিংহাসনের অধিকারী। সে ফুরিসকে মুক্ত করতে পারেনি বলে এতকাল লজ্জিত ছিল। এখন প্রথমেই সে দূতের মুখে ফুরিসের মুক্তির নির্দেশ পাঠাল। প্রথা অনুযায়ী রাজার সঙ্গে তার একান্ত প্রিয় পরিচারক ও রাণীদের কবরের মধ্যে সমাধিস্থ হতে হয়। এক্ষেত্রে রাজা হোথেপের দুই রাণী আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। একজন অতি প্রিয় পরিচারক ছিল রাজার! সারাক্ষণ সে ছায়ার মত রাজাকে অনুসরণ করত। রাজার মৃত্যুর পর অন্তিম কাল ঘনিয়ে এলো তার।

সিসুইয়ের আদেশ শুনে জারেক ক্রুর হাসি হাসল। এত দিনে সে নিশ্চিত হল ফুরিসই তার ভাগ্য বিপর্যয়ে অন্যতম সাহায্যকারী।

সবার সামনে ফুরিসের মুক্তি ঘোষণা করল জারেক। তখন সন্ধ্যা আসন্ন। সামনেই শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্র। ফুরিসের বিলম্ব সইছিল না আর। দীর্ঘকাল ক্রীতদাসের জীবন কাটিয়ে একটি পরিণত প্রৌঢ় মানুষ এবার ফিরে যাবে তার ঘরে। এমন অভাবনীয় ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না ফুরিস। সে মুক্তি লাভ করেই যাত্রা করল দক্ষিণ দেশের উদ্দেশ্যে।

এদিকে রাজার প্রিয় পরিচারককে নিভৃতে ডেকে জারেক বলল, তুমি তো জানো তোমার মৃত্যু আসন্ন, কিন্তু আমিই একমাত্র তোমাকে বাঁচাতে পারি।

রাজার মৃত্যুর পর থেকেই পরিচারকটি ভয়ে অর্ধমৃত হয়ে ছিল। সে বলল, প্রভু আপনিই আমার রক্ষাকর্তা।

জারেক বলল, এখুনি রাতের অন্ধকারে তোমাকে পালাবার সুযোগ করে দেবো, কিন্তু প্রতিজ্ঞা কব, এ জীবনে আর মিশরে প্রবেশ করবে না।

আমি 'আমোন-রা'র শপথ নিয়ে বলছি প্রভু, এ জন্মে আর মিশরের মুখ দেখব না।

আমার সঙ্গে দ্রুত পা চালিয়ে চলে এসো।

কবর-গৃহের অঙ্গনে তখন ভেষজ ও শল্যবিদ্যা বিশারদ দুই ব্যক্তি রাজার ম্যমি তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিল। রাজা হোথেপের পরিচারক পৃষ্ঠে বহন করে আনল একটি মৃতদেহ, পেছনে সেনাপতি জারেক।

জারেক বলল, আপনারা আমার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সংগোপনে একে ম্যমি করে যাতে চিত্রিত আধারে মধ্যে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করুন। ভৃত্যদের আধারেই এর স্থান করে দেবেন।

শল্য ও ভেষজবিদ বললেন, আপনার আদেশ পালিত হবে সেনাপতি জারেক।

রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে গা ঢাকা দিল রাজা হোথেপের পরিচারক আর হতভাগ্য ফুরিস মুক্তি

পেয়েও নিহত হল প্রস্তরের অতর্কিত আঘাতে! রাজার খাস পরিচারকের পরিচয়ে একসময় সে মামি হয়ে প্রবেশ করল চিত্রিত কাষ্ঠাধারের মধ্যে।

তিন

রবীন্দ্রসদন মঞ্চের শেষ আলোটা নিভে গেল। ভারী পর্দাটা সরে যেতেই সুসজ্জিত মঞ্চটিকে দৃষ্টির উৎসব বলে মনে হল। মঞ্চে বসে রয়েছেন নজরুল সংগীতের কিন্নরকণ্ঠি শিল্পী ফিরোজা বেগম।

প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ, নিস্তব্ধ। একের পর এক সংগীত নিবেদন করে চলেছেন ফিরোজা। পরিবেশনে অন্তরের অনুরাগ আর ভক্তি যুক্ত হলেই হয় নিবেদন। ফিরোজা সত্যিই নজরুল সংগীতে নিবেদিত-প্রাণা।

কি অনায়াস ভঙ্গীতে বিচরণ করছেন গানে। সম্রাজ্ঞী যেন লীলা চঞ্চল হয়ে প্রাসাদের পক্ষীনিবাসে ঢুকছেন। কবুতরদের সোনালী সূর্যের দিকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। তারা সারা গায়ে সূর্যের আলো মেখে ঘুরে ঘুরে ওড়ার খেলা দেখাচ্ছে। আবার দু'হাত শূন্যে বাড়িয়ে আয় আয় করে ডাকতেই কবুতররা ফিরে আসছে তাঁর বদ্ধ অঞ্জলিতে।

সেই বিখ্যাত গানটি শুরু হল, আমার অনুভবে যে গানটি তাঁর মত করে আর কেউ গাইতে পারেন না—

'ভুলি কেমনে/আজো যে মনে/বেদনা সনে
রহিল আঁকা,
আজো সজনী/দিন রজনী/সে বিনে গণি
সকলি ফাঁকা।'

গান শেষ হলে মনে হল যেন সুরের সুরধুনী বয়ে গেল।

পর পর এলো বিরহের গান। কখনো শিল্পী বেদনার জোয়ারে গুমরে গুমরে প্লাবিত হচ্ছেন, কখনো বা ভাটার টানে ভেসে যাচ্ছেন দূর থেকে দূরে—

'জানি জানি প্রিয়, এ জীবনে মিটিবে না সাধ।'

সাধ অসমাপ্তই থেকে যায়। কামনার কান্না ঘুরে ঘুরে বাজতে থাকে বুকে।

আমি প্যাসেজের পাশের সীটটাতে বসেছি। আমার ডানদিকে বসেছেন এক যুবক। দশ মিনিট বিরতির সময় চোখাচোখি হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। ধুতি পাঞ্জাবী পরে এসেছেন। সার্জের ঘি রঙের পাঞ্জাবী। আগেকার দিনের বড় কল্‌কা তোলা একটি আলোয়ান গায়ে জড়িয়েছেন। বয়েস হবে আটাশ-উনত্রিশ। বেশ সম্ভ্রান্ত বাড়ির ছেলে বলেই মনে হল।

আমি কিনলাম একটি আইসক্রিম, যুবকটি পপকর্ণ। এখানেই কথা শুরু। উনি বললেন, কিছু মনে করবেন না, শীতে আপনার আইসক্রিম ভাল লাগে?

ভী-ষ-ণ। শীতে শীতক্ষয়।

উনি হেসে উঠলেন, যেমন...

অমনি আমি বললাম, বিষে বিষক্ষয়। দুজনেই হেসে উঠলাম।

আলো নিভল, গান শুরু হল। ভদ্রলোকটিকে আর পপকর্ণ নিয়ে খস্ খস্ আওয়াজ তুলতে শুনলাম না।

গানের পর গান, একটির পর একটি গন্ধরাজ, চাঁপা, গোলাপ, বকুল ফুটিয়ে চলেছেন শিল্পী। একটি ফুটছে, একটি ঝরছে, কিন্তু গন্ধটুকু থেকে যাচ্ছে।

কমল দাশগুপ্তের সুরে অবিস্মরণীয় কয়েকটি গান গাইবার পর শেষে ধরলেন,

'গানগুলি মোর আহত পাখির সম
লুটাইয়া পড়ে তব পায়ে প্রিয়তম।'

শেষ গানটির সঙ্গে সঙ্গে কেন জানি না চোখ দুটো আমার জলে ভরে গিয়েছিল। আমি নিজেকে একটুখানি সামলে নেব বলে আলো জ্বলে ওঠার পূর্বমুহূর্তেই বেরিয়ে এলাম। করতালি ধ্বনিতে তখন সারা প্রেক্ষাগৃহ আলোড়িত হচ্ছে।

শেষ সিঁড়িটি পেরিয়ে সবে ফোয়ারার সমতলে এসে দাঁড়িয়েছি, পেছন থেকে ডাক শুনতে পেলাম, শুনছেন— ?

পেছন ফিরে দেখি সেই ভদ্রলোক সিঁড়ির মাঝামাঝি নেমে এসে আমাকে ডাকছেন। বেরুবার সময় গায়ে দোব ভেবে সঙ্গে আনা চাদরটি পাশে ভাঁজ করে রেখেছিলাম—আমার ভাঁজ করা সেই চাদরটি ওঁর হাতে!

আমি হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়িতে উঠতে যাচ্ছি, উনি নেমে এলেন। আমার দিকে আলোয়ানটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ভাগ্যিস গাড়িতে উঠে পড়েননি।

উনি এমন ভাবে কথাটা বললেন, যাতে মনে হল, চাদরটা মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে উনি যেন দায়মুক্ত হলেন।

আমি বললাম, আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব—

ধন্যবাদ দেবার কি আছে, এ ভুল তো হয়েই থাকে।

আমরা কথা বলতে বলতে সদনের প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তর মূর্তির নীচে এসে দাঁড়ালাম। আলো আঁধারিতে ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়া গাছটিকে বড় মনোরম দেখাচ্ছিল। শীতের হাওয়ায় ঝরিয়ে দেওয়া হলুদ পাতা দুষ্টু ছেলের মত খুশীতে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।

বললাম, গায়ে ছিল কার্ডিগান, তাই চাদরের কথা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু এটি হারালে আমি অনেক কিছুই হারাতাম।

উনি বললেন, যতটুকু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে আপনার আলোয়ানের কাজ অতি সূক্ষ্ম।

বললাম, সচরাচর এ কাজ কোথাও চোখে পড়বে না, এটি আমার মায়ের জিনিস।

ভদ্রলোক হেসে কৌতুকের গলায় বললেন, তাহলে তো চাদরটা হারালে মা আপনাকে আজ পুজো দিতেন।

বললাম, সে সম্ভাবনা এ জীবনে আর নেই।

আমার ভারী গলার স্বরে উনি বিচলিত হয়ে গাঢ় গলায় বললেন, আমি না জেনে আপনাকে কষ্ট দিলাম—

বললাম, না না, ও কথা বলছেন কেন, এ কষ্ট তো আমার রোজকার সঙ্গী।

হঠাৎ ভদ্রলোক বললেন, যদি কিছু মনে না করেন, চাদরটা একটু খুলে দেখাবেন?

আমি আলোয়ানটা পুরো খুলে গায়ে চাপালাম। ভদ্রলোক নিবিষ্ট হয়ে দেখলেন, তারপর মাথা নেড়ে ছোট্ট মন্তব্য করলেন, বাঃ বাঃ!

এরপর দুজনের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বেশীক্ষণ কথা বলা অশোভন মনে হওয়াতে উনি বললেন, যাচ্ছেন কোন্ দিকে?

উত্তরে। আপনি?

একেবারে উল্টো। দক্ষিণে গোলপার্কের কাছাকাছি। এবার দুজনে বাস স্টপের দিকে এগোলাম।

ভদ্রলোক পাশাপাশি আসতে আসতে প্রশ্ন করলেন, পড়াশোনার ভেতরে আছেন নিশ্চয়ই?

বললাম, পড়াশোনার ভেতরে তো মানুষকে আমৃত্যু থাকতেই হবে। অবশ্য আপনি যে পড়াশোনার কথা জানতে চাইছেন তা আপাতত শেষ করে ফেলেছি। এখন চাকুরিজীবী।

আপনাকে দেখে কিন্তু তা মনে হয় না।

বললাম, বিশ্বাস না হয় একদিন মিউজিয়ামে নেমে পড়বেন। ওটাই আমার কর্মস্থল।

অবশ্যই যাব একদিন। কিন্তু, কিন্তু আপনার নামটা তো জানা হয়নি। আমি সুনন্দ আচার্য। কম্পারেটিভ লিটারেচার আমার নেশা এবং পেশা।

আমি নসীম।

নসীম! ভদ্রলোক অবাক হলেন।

ভেবেছিলেন আমি হিন্দু, তাই না?

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, না না, তা না, একদিন যাব নিশ্চয়ই। শুক্রবার আমার অফ ডে।

দক্ষিণের মিনিবাস এসে গিয়েছিল। উঠে পড়ুন, আমাকে তো রাস্তার ওপাসের গিয়ে দাঁড়াতে হবে, বলেই আমি রাস্তা পার হয়ে এলাম। ওঁর বাসটা চলে গেল।

*

প্রায় পক্ষকাল পরে হঠাৎ দেখা। দেখি ভদ্রলোক লাইব্রেরীর সামনে দাঁড়িয়ে। অসীমাদি বললেন, ভদ্রলোক তোমাকে খুঁজছেন। আমি নীচে তোমাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম।

এগিয়ে গিয়ে বললাম, খুঁজে না পেয়ে ভাবছিলেন তো আমি আপনাকে বোকা বানিয়েছি।

সুনন্দ হেসে বললেন, না, তা কেন, আনি নীচে আপনার ঘরেই ঢুকেছিলাম। সেখানে আপনার ফাইলপত্র, পেপারওয়েট সবই আছে। কেবল আপনিই নেই। তাই ভাবলাম লাইব্রেরীতে খোঁজ করে যাই।

ভদ্রলোককে নীচে আমার কাজের ঘরে এনে বসালাম। তারপর চা আর কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে বলে এলাম। খাবার আসতে উনি বললেন, আপনি কি অমাকে একজন পেটুক ভেবেছেন?

বললাম, তা কেন, এখন তিনটে। আপনি নিশ্চয় সোজা কাজের জায়গা থেকে আসছেন। কিছু তো ক্ষিদে পেয়েছেই। আর আমিও কিছু খাব।

সুনন্দ বললেন, আমার স্মরণশক্তি কিন্তু আপনার চেয়ে প্রখর। আপনি সেদিন যে কথাগুলো বলেছিলেন সেগুলো আমার স্মৃতিতে একেবারে টেপ করা আছে। কিন্তু আমার কথা আপনি বেমালুম ভুলে গেছেন।

কি বলুন তো?

বলেছিলাম, শুক্রবার আমার অফ ডে। সুতরাং কাজের জায়গা নয়, সোজা বাড়ি থেকেই এসেছি।

সত্যি, আমার বড় ভুলো মন। অবশ্য আমি যে ভুলো তার বড় প্রমাণ তো সেদিনই পেয়েছেন।

আলোয়ান হারানোর কথা বলছেন তো?

আমি হেসে মাথা নাড়লাম। সুনন্দ বললেন, আপনার চাদর হারানোর গল্প আমি মায়ের কাছে করেছি।

একটা ভুল না হয় হয়েই গেছে, তা বলে সবাইকে সে-কথা বলে বেড়াবেন ! তিনি কি ভাবলেন বলুন তো!

তিনি কি ভেবেছেন তা আমাকে বলেননি। তবে মা আপনাকে একদিন নিয়ে যেতে বলেছেন।

তাই নাকি! সে তো খুব আনন্দের কথা।

হ্যাঁ, এবং ওই আলোয়ানটা গায়ে দিয়ে যেতে বলেছেন।

অবশ্যই যাব। আর চাদরটা ভুলে ফেলে আসার জন্য বকুনিও খেয়ে আসব। সে যাই হোক, অগে খাওয়াটা শেষ করুন। তারপর আপনার বাড়ি পৌঁছবার মানচিত্রটা এঁকে দিন।

টিফিন শেষ হলে আমি আমার লেটার-হেডটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, এতেই ম্যাপ এঁকে ঠিকানা লিখে দিন।

সুনন্দ প্যাডের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিজের বাড়ির ঠিকানাটা লিখতে লিখতে মুখ না তুলেই বললেন, কিসের ওপর পি-এইচ-ডি করলেন?

বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্ম।

পালি শিখেছেন নিশ্চয়ই?

হেসে বললাম, আপনার মত না হলেও পালি আমার অজানা নয়।

আবার আমাকে ধরে টান দেওয়া কেন, আমি আর কতটুকু জানি। বলতে পারেন দুনিয়ার তাবৎ লিটারেচার নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। এত বিশাল সাবজেক্ট, তাকে পুরোপুরি আয়ত্ত করা একটা জন্মে অসম্ভব।

ঠিকানা ও পথ-নির্দেশ দিয়ে সুনন্দ বললেন, কবে কখন আসছেন দয়া করে নীচের ফোন নাম্বারে একটু জানিয়ে দেবেন। বাড়িতে মা আর একটি কাজের মেয়ে, ব্যস। আমি না থাকলে ওদের জানিয়ে দিলেই চলবে।

হেসে বললাম, আপনাদের ফোন বুঝি খুব কথা শোনে?

না শুনলে রাগ করে খবর না দিয়েই চলে যাবেন। যিনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছেন তিনি সব সময়ে বাড়িতেই থাকেন।

বললাম, আদুরে ছেলের পথ চেয়েই বসে থাকেন আর কি।

তা যা বলেছেন। বাবা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, একমেবাদ্বিতীয়ম্।

সামনের লন ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকায় আলো হয়ে আছে। মালি গাছে জল দিচ্ছে। শুক্রবারে মিউজিয়ামে ঢুকতে টিকিট লাগে না, তাই গাঁ গঞ্জের মানুষদের বেশ ভীড় হয়। ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি সব দল বেঁধে আসে।

শেষ দলটি বোধ হয় বেরিয়ে যাচ্ছে। অতি সাধারণ পোশাক আর চেহারার মানুষগুলি, কিন্তু মুখে চোখে আনন্দ কৌতূহল যেন উপচে পড়ছে। পরস্পর পরস্পরকে কিছু বোঝাতে বোঝাতে চলেছে। ছোটরা হাতি আর অনেকগুলো কুমীর একসঙ্গে দেখে খুশী। তাই নিয়ে হই হই করছে।

আমি আর সুনন্দ ওদের দেখছিলাম।

সুনন্দ বললে, এই একটিমাত্র জায়গা—যেখানে সব মানুষেরই শিক্ষা আর আনন্দের খোরাক আছে।

বললাম, আমি প্রতিদিন এই সাধারণ মানুষগুলির দিকে চেয়ে থাকি। আমার তো মনে হয় প্রতিটি জেলায় এক একটি যাদুঘর তৈরি করা উচিত। এতে মানুষ সত্যিকারের শিক্ষিত হয়ে উঠবে। যাদুঘরের পাশাপাশি অবশ্য একটি করে জীবজন্তু, পশুপক্ষীর সংগ্রহশালা থাকলে আরও ভাল হয়।

সুনন্দ রসিকতা করে বললেন, এমন একটি আঞ্চলিক যাদুঘরের ভার নিয়ে আপনি গ্রামে যেতে পারবেন?

আমি গভীর বিশ্বাস নিয়ে বললাম, এখুনি। মানুষের কৌতূহলই আমাকে চিরদিন এই যাদুঘরে বন্দী করে রাখবে। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের কৌতূহল।

আপনি সত্যি যাদুঘরটিকে ভালবেসে ফেলেছেন।

জানেন, আমি এক সময় এত নির্বোধ ছিলাম যে, এখানে চাকরি নিয়ে আসতেই চাইনি। তারপর চাচাজী যখন বললেন, যাদুঘরের বাইরে যারা রয়েছে তারা সকলেই মুখোশ এঁটে রয়েছে, আসলকে যদি দেখতে চাও তাহলে যাদুঘরে যাও, তখন অনিচ্ছা কেটে গেল। এখন তো যাদুঘরের প্রেমেই পড়ে গেছি।

আমি যখন স্কুলের ছাত্র তখন একবার যাদুঘর দেখে গেছি। আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল মহেঞ্জোদড়ো থেকে সংগৃহীত জিনিসগুলো। সমাধিক্ষেত্র থেকে তুলে আনা মাটির কলসী আর সরা দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সুন্দর গঠনের কলসীগুলো পোড়ানোর পর তার গায়ে ওই পোড়ামাটির মতই একটা রঙের প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ওপর কালো রঙের চিত্রকর্ম। বাহুল্য নেই, কিন্তু সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচয় আছে। এমন কি শিল্পী সরার পেছন দিকেও তাঁর শিল্পকর্মের স্বাক্ষর রেখে দিয়েছেন। ত্রিপত্রের আকারে অথবা ত্রিনয়নী দুর্গার চোখের মত মোটিফ আঁকা। দেখুন, মৃত বলে উপেক্ষা নেই। মাটির পাত্র হলেও সেটি উজ্জ্বল আর চিত্রিত। তার সারা দেহে, সামনে পেছনে সব জায়গায় শিল্পীর সযত্ন নিষ্ঠার ছাপ।

বললাম, চলুন, আর একবার দেখিয়ে আনি। ছাত্রজীবনের স্মৃতিটা ঝালিয়ে নেবেন।

সুনন্দ সানন্দে ঘাড় নেড়ে আমার সঙ্গে পূবদিকের হলে ঢুকলেন। কতক্ষণ আমরা হরপ্পা আর মহেঞ্জোদড়োর যুগের জিনিসগুলো দেখলাম। মহেঞ্জোদড়োর সেই শাল গায়ে জড়ানো বিশিষ্ট নাগরিকটি তেমনি বসে রয়েছেন। শালের জমিতে নক্সা। দক্ষিণ বাহুসন্ধির নীচ দিয়ে শালটিকে কেমন সুন্দর টেনে নেওয়া হয়েছে।

সুনন্দ বললেন, মহেঞ্জোদড়ো নগরীর নগরপালের মূর্তিরই ছোট সংস্করণ।

বললাম, পাশেই দেখুন না নর্তকী দাঁড়িয়ে রয়েছে। নগরপালের আদেশ হলেই যেন ওর নাচ শুরু হবে।

সুনন্দ বললেন, নর্তকীর অলংকার পরার বৈশিষ্ট্য দেখুন। কেবল বাম হাতেই বালা পরে আছে। প্রায় বাহুমূল থেকে মণিবন্ধ অব্দি বালা, বালা আর বালা।

বললাম, প্রাচীন যুগে ওটা বোধ হয় ভারতীয় নর্তকীদের একটি বিশেষ স্টাইল ছিল। কারণ পম্পেই নগরীর ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে যে সুরম্য প্রকোষ্ঠগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে তার একটিতে হাতির দাঁতের একটি নর্তকী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। ঐ নর্তকী মূর্তিটি প্রাচীন ভারতীয় বণিকদের পণ্য সম্ভারের মধ্যেই গিয়েছিল। তারও কেবল বাম বাহু জুড়েই বলয়। মূর্তিটি অত্যন্ত সুন্দর।

সুনন্দের মায়ের সঙ্গে একদিন দেখা করতে গেলাম। পূর্ণ দাস রোডের বাড়িটি চিনে নিতে একটুও দেরী হল না। ছিমছাম সুন্দর বাড়ি। দোতলায় একটুকরো বারান্দা। সামনে অন্তত কাঠা দেড়েক জমি ছেড়ে রাখা হয়েছে বাগানের জন্য। গন্ধরাজ, করবী, টগর ইত্যাদি বেশীর ভাগ দেশী ফুলেরই গাছ। বাগানের একপাশে মধুমালতীর একটি লতা বাড়ির দক্ষিণ পশ্চিম কোণ বেয়ে দোতলায় উঠে গেছে।

বাড়ির সামনের ফুটপাথে সুনন্দ দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে হেসে বললেন, ম্যাপ আঁকাটা আমার ভাল হয়নি?

নিখুঁত। হেসে জবাব দিলাম, চোখ বন্ধ করে চলে এসেছি।

ও কাজটি অন্তত কলকাতায় করবেন না। পায়ে পায়ে অ্যাকসিডেন্টের সম্ভাবনা।

সুনন্দ আমাকে নিয়ে চললেন বাড়ির ভেতর। আমি বললাম, আগে ট্রাঙ্ককল করে কেন্দ্রীয় টেলিফোন মন্ত্রীকে একটি অভিনন্দন বার্তা পাঠান। কলকাতার টেলিফোনে প্রথম চেষ্টাতেই নম্বর পেয়ে গেছি। এবং এটি আমার কাছে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

দোতলার দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সুনন্দের মা। সম্ভ্রান্ত বিধবা। পঞ্চাশ পঞ্চান্নর বেশী বয়স বলে মনে হয় না। অবিকল সুনন্দের আদল। যদিও সুনন্দ বেশ কিছুটা লম্বা ও সুঠাম দেহী।

এসো মা—

আমি প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই বললাম, আপনার কাছে বকুনি খেতে এসেছি মাসীমা।

বকব কেন মা। এমন সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে কি কেউ বকতে পারে।

আমি লজ্জিত হলাম। অনেকেই আমার চেহারার প্রশংসা করেন, আমি জানি সে প্রশংসা যাঁর প্রাপ্য তিনি ইহজগতে নেই। চাচাজী বলেন, আমি নাকি যত বড় হচ্ছি অবিকল মায়ের আকৃতি পাচ্ছি।

সুনন্দের মা অত্যন্ত সহজ ভাবে আমাকে গ্রহণ করলেন। আমিও স্বাভাবিক আচরণে তাঁর কাছে নিজেকে মেলে ধরলাম।

সেদিন অনেক কথা হল। ঘুরে ফিরে সুনন্দর কথা। তার ছেলেবেলা থেকে আজকের আচরণ পর্যন্ত। একবার কৈশোর ছুঁয়ে শৈশবে ফিরছেন, শৈশব থেকে আবার তারুণ্যের দিনগুলিতে। এ যেন হারমোনিয়ামের রীডে এগিয়ে পিছিয়ে আঙুলের খেলা চলেছে। সব মায়েরাই দেখেছি সমান। ছেলেদের কথা বলতে গিয়ে তাদের সাংসারিক জীবনের কিছু অনভিজ্ঞতা এবং মাতৃনির্ভরতার কথা এসে পড়বেই।

কথায় কথায় উনি বললেন, তুমি সেদিন গান শুনতে তোমার মায়ের চাদর নিয়ে গিয়েছিলে, আর সুনন্দ কার চাদর নিয়ে গিয়েছিল জানো?

সঙ্গে সঙ্গে বললাম, ওঁর বাবার।

তুমি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে নসীম।

এক ঝলক হেসে বললাম, এতে কি বুদ্ধির দরকার হয় মাসীমা। আলোয়ানে আগেকার দিনের চওড়া পাড়ে কারিকুরি আর সুন্দর কল্‌কা দেখেই বুঝেছি, ওটি মেসোমশায়ের সম্পত্তি।

তোমার আলোয়ানটা আমি দেখতে চেয়েছিলাম। 'বন্দী' খুব প্রশংসা করেছিল।

অবাক হয়ে বললাম, বন্দী! বন্দী কে?

হেসে বললেন মাসীমা, আর কে—ঐ তোমাদের সুনন্দ। ও ভীষণ দুষ্টুমি করলে তোমার মেসোমশায় বলতেন, ওকে ঘরে বন্দী করে রাখ। তারপর বাইরে থেকে ফিরে এসে বলতেন, বন্দী মুক্তি পেয়েছে? সেই থেকেই ওকে বাড়ির সবাই 'বন্দী' বলে ডাকত।

আমি সুনন্দের দিকে আড়চোখে চেয়ে হাসলাম।

মাসীমা সিঙাড়া আর সন্দেশ এনে দিলেন। সুনন্দ আর আমার দুজনের প্লেটই ভর্তি।

মাসীমা বললেন, বাইরের খাবার নয় মা, নিজের হাতে তৈরি করা। প্রতিদিন যে কোন একটি খাবার ওর জন্যে তৈরি করে রাখতে হয়। সেদিন তো মিউজিয়ামে গিয়ে তোমার ওখানে অনেক কিছু খেয়ে এসেছে।

অনেক কিছু ওখানে পাব কোথায় মাসীমা। আপনার তৈরি খাবার খেয়ে ওঁর আর কিছুতে কি মন ওঠে।

মাসীমা হঠাৎ বললেন, তোমরা আজকালকার ছেলেমেয়ে, দুজনেই যথেষ্ট শিক্ষিত। তোমরা অত আপনি আজ্ঞে করে কথা বলছ কেন? 'বন্দী' যদি তোমার আপন দাদা হত তাহলে কি ওকে 'আপনি'? করে কথা বলতে পারতে?

বললাম, ওঁর যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমারও আপত্তি নেই মাসীমা।

সুনন্দ বললেন, পাছে নসীম কিছু ভেবে বসে তাই আমি সাহস পাইনি।

মাসীমা বললেন, এখন থেকে তাহলে দুজন দুজনের কাছে সহজ হয়ে যাও।

সেই থেকে আমরা পরস্পরকে নাম ধরে ডাকতে লাগলাম।

সুনন্দের দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে আমি মাঝে মাঝেই যেতাম। মাসীমা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। তাঁর চিলেকোঠায় একটি ঠাকুরঘর ছিল। সেখানে তিনি পুজোয় বসলে আমি কখনো যেতাম না। তিনিও কোন দিন আমাকে ছাদে তাঁর ঠাকুরঘরের সামনে ডেকে কথা বলেননি। হয়তো আমি পৌত্তলিক নই বলে তিনি সংকোচ করে ডাকতেন না। অন্তত সে সময় আমার সেই ধারণাই হয়েছিল। মাসীমা জানতেন আমি প্রতিদিন নিয়মিত কোরাণ পাঠ করি। চাচাজী আমার এ অভ্যাসটি করিয়ে দিয়েছিলাম।

তিনি বলতেন, একজন মানুষ সবচেয়ে বড়, কারণ তার ভেতর যে সম্পদ আছে তা আর কোথাও নেই। সেই সম্পদ বা গুণগুলির যথাযথ বিকাশের জন্য ধর্মের দরকার। হিন্দু, খৃষ্টান, ইসলাম সব ধর্মেরই কাজ হল মানুষের অন্তরের সুপ্ত ঐশ্বর্যকে জাগ্রত করা। কোন্ পথে শ্রেয়লাভ হবে তা নির্দেশ করা। তাই প্রতিটি ধর্মের মূল উদ্দেশ্য আমার কাছে এক বলেই মনে হয়। তোমার মা বাবা মুসলিম ছিলেন। তাঁরা বেঁচে থাকলে তোমাকে দিয়ে যে সব ধর্মাচরণ করাতেন আমিও তোমাকে যদ্দুর সম্ভব সেই আচরণের ভেতর দিয়েই নিয়ে যেতে চাই। তবে আমার একটি কথা মনে রেখ, যদি কোন দিন ধর্মের কোন সংস্কার তোমার মনুষ্যত্বকে পীড়িত করে তাহলে সবার ওপরে তোমার বিবেককে বিচারকের আসনে বসাবে। তার নির্দেশের ওপরে আর কোন নির্দেশ নেই। তাই আমি চাচাজীর মতই মানুষ আর তার ধর্মকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম।

ইতিমধ্যে সুনন্দর আমার বাসায় ঘন ঘন আসার একটা কারণ ঘটল। চাচাজী উর্দুতে পণ্ডিত ছিলেন। সুনন্দ ওঁর কাছ থেকে সপ্তাহে দুদিন উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ নিতে লাগল। এতে দারুণ খুশি চাচাজী। চাকরি থেকে রিটায়ার্ড করেও চাকরি পেয়ে গেলেন। তাও আবার যে সে ছাত্র নয়, তরুণ অধ্যাপক।

সুনন্দ শুক্র আর শনিবার আমার কাছে যাদুঘরে চলে আসত। কিছুক্ষণ নিজের খেয়াল মত এ ঘর

ও ঘর ঘুরে দেখত। আমি কখনো সঙ্গ দিতাম, কখনো ও একাই ঘুরত। আমার কাজ শেষ হলে দুজনে বেরিয়ে পড়তাম। বাসায় এসে আমি হাত মুখ ধুয়ে সংসারের কাজে লেগে যেতাম, ততক্ষণে পাশের ঘর থেকে গুরু-শিষ্যের পঠন পাঠনের আওয়াজ ভেসে আসত।

চা আর খাবার তৈরি করে ওদের খাওয়াতাম। সুনন্দ মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে খেয়ে আসার অজুহাত দিত কিন্তু পরে সংকোচটা ওর কেটে গিয়েছিল।

একদিন অ্যানথ্রোপলজি বিভাগটি আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। আর আদিম মানুষেরা তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য কত সাধারণ সব উপকরণ ব্যবহার করত তাই দেখে সত্যিকারের সুখী জীবন সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছিলাম।

বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, ফ্রিজ, টি. ভি., রেকর্ড প্লেয়ার প্রভৃতি অজস্র বৈজ্ঞানিক উপকরণে ঠাসা আমাদের ঘর। প্রতিদিনই যত যান্ত্রিক উৎপাদন বাড়ছে তত যন্ত্রণাও বাড়ছে। বিদ্যুৎ নেই, অমনি হাহাকার, গলদঘর্ম! ফ্রিজ চলছে না, ছোট মিস্ত্রীর খোঁজে। পথে গাড়ি বিগড়েছে, পা-ও খোঁড়া।

সুনন্দ বলল, যাযাবরদের কথাই ভাব না, মাথার ওপর চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র আর পায়ের তলায় ধরিত্রীকে নিয়ে ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে ইচ্ছে থামছে, যেখানে ইচ্ছে চলেছে। সংসারের জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সবই চলেছে সঙ্গে।

পৃথিবীকে তারা ভোগ করছে, কিন্তু মানুষের আইনে তাদের অধিকার নেই। ঈশ্বরের অধিকার নিয়েই তারা অনন্তকাল ধরে হেঁটে চলেছে।

হঠাৎ মাথায় কি খেয়াল চাপল। বললাম, সুনন্দ, আজ একটু হাঁটবে? গঙ্গা এত কাছে তবু কত দিন গঙ্গা দেখিনি।

ও বলল, রাজি, তবে একটি শর্তে। যেদিন চাচাজীর কাছে যাব সেদিনও দুজনে হেঁটেই যাব।

এ শর্তে আমার সানন্দ সম্মতি তোমাকে দিলাম।

সুনন্দ আর আমি মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। পথে যেতে যেতে কি বিস্ময়! কি বিস্ময়!

মাটির ঢিবির ওপর দেখ কত বড় একটা গাছ জন্মেছে। আগে এটা তো চোখে পড়েনি!

দেখ দেখ সুনন্দ, ছোট একটা ছেলে মাটির পাহাড়ের ওপর কেমন কুকুরছানাকে নিয়ে খেলায় মেতেছে।

সুনন্দ বলল, ওই তো ওর মা, ঝোপড়া থেকে বেরিয়ে ওপরে উঠছে। হাতের সানকিতে কিছু খাবার-টাবার হবে।

পশ্চিমে খোলা ময়দান, বাড়ি ঘর নেই। সূর্যাস্তের লাল আভা আকাশের গায়ে। মনে হচ্ছিল বিহারের টিলা অঞ্চলের কোন দেহাতি গাঁ।

গুরু নানক রোড ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ সুনন্দ একটা ক্লাব হাউসের বেড়ার গা থেকে একগুচ্ছ নীল রঙের ফুল তুলে আনল।

ফুলটা নেবার জন্যে হেসে হাত বাড়ালাম।

ও আমার হাতে ফুলটা দিয়ে বলল, তুমি কি করে জানলে যে ফুলটা তোমার জন্যেই তুলেছি?

আমি চুলের একপাশে ফুলের গুচ্ছটা গেঁথে নিতে নিতে বললাম, এটা মেয়েদের স্বাভাবিক অধিকার সুনন্দ। এটা কোন মেয়ের বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।

সুনন্দ বলল, ওই দেখ, এক ঝাঁক পাখি কেমন তীর চিহ্ন এঁকে উড়ে যাচ্ছে।

পাখির ওড়া দেখলাম দুজনে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। সুনন্দ দুষ্টুমি করে বলল, আমার পাওনা হয়ে গেল।

প্রশ্ন চিহ্ন চোখে এঁকে তাকালাম।

এই যে পাখির ছবি দেখালাম।

হেসে বললাম, তা ঠিক, আমি ঋণী রইলাম।

বাঁদিকের মাঠ দিয়ে একপাল কালো সাদা ছাগল সবুজ ছনছনে ঘাস খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে।

দুটি লোক কাঁধে লাঠি নিয়ে অলস পায়ে তাদের পিছন পিছন হাঁটছে। একটি দশ বারো বছরের বাচ্চা ছেলে ছুটে ছুটে দলছুটদের দলে ভেড়াবার কাজে ব্যস্ত।

আমি হৈ হৈ করে উঠলাম, দেখ সুনন্দ, আকাশের এই পটভূমিতে কি সুন্দর মানিয়েছে এই চলমান ছবিখানা।

ওঃ দারুণ ছবি! পশ্চিমে লালের ছোঁয়া লাগা সাদা দুটো মেঘের পাহাড়ের দিকেই যেন ওরা চলেছে।

বললাম, ঋণ শোধ কিন্তু।

কথা বলতে বলতে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসতেই এগিয়ে এলো চীনেবাদামওলা।

সুনন্দ চীনেবাদাম কিনল বড় এক ঠোঙায়। আমি বললাম, নুন-লঙ্কার প্যাকেট গোটা তিনেক চাই কিন্তু।

তাই দিল বাদামওলা।

বাদাম ছাড়িয়ে খাচ্ছি একই ঠোঙা থেকে। সুনন্দ আমার হাতেই ঠোঙাটা ধরিয়ে দিয়েছে। আমি মাঝে মাঝে ওর দিকে ঠোঙাটা বাড়িয়ে ধরছি। ওর হাতে এক পুরিয়া নুন-লঙ্কা, আমার হাতে দুটি। খেতে খেতে ও বলল, তোমার রসনাটি খুব ধারালো।

কেন?

দেখে মনে হচ্ছে খর নুন-লঙ্কায় সান দেবার অভ্যেস।

বললাম, নুন-লঙ্কা আমার জিভের আরাম, প্রাণের শান্তি।

গঙ্গায় একটা নৌকো দাঁড় টেনে চলেছে। পিছন থেকে এগিয়ে আসছে আর একটি নৌকো। চুপি চুপি পাশ কাটিয়ে ওকে পেরিয়ে যাবার মতলব ছিল বোধ হয়, কিন্তু সামনের নৌকোটা আন্দাজ করতে পেরেছে। আর যায় কোথা—টান টান দাঁড় টান। দু' নৌকোয় ছপাছপ চার চার আটখানা দাঁড় পড়ছে। কতক্ষণ দুটো নৌকো সমান তালে পাশাপাশি চলল। তারপর বেশ কিছু দূরে গিয়ে একটা আর একটাকে ছাড়িয়ে চলে গেল।

সুনন্দ বলল, এমনিই হয়।

কি এমনি হয়, সুনন্দ?

জীবনের স্রোতে একটি প্রাণ ভেসে চলে। তারপর কোথা থেকে তার পাশে এসে মিলিত হয় আর একটি। কিছুক্ষণ পাশাপাশি চলা, তারপর আবার সরে যাওয়া।

মনটা হঠাৎ কেন জানি খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। আমি হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে রইলাম।

সুনন্দ বলল, হঠাৎ এমন চুপ করে গেলে কেন নসীম?

বললাম, তোমার কথাগুলো ভীষণ সত্য সুনন্দ, তাই বুকে এসে বাজল।

আমি দুঃখিত নসীম, হঠাৎই কথাটা মনে এসে গেল।

সত্য এমনি করেই জেগে ওঠে সুনন্দ।

ও বলল, থাক নসীম, এই সময়টাকে আমরা ভারী করে দেব না—চল, গঙ্গার ধার দিয়ে ফোর্টের দিকে হাঁটি।

আমি উঠতে যেতেই আমার চুলে আটকানো ফুলের গুচ্ছটা পড়ে গেল। সুনন্দ তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে আমার হাতে দিল। বললাম, ইস, তোমার প্রথম উপহারটা এমন করে পড়ে গেল!

ও হেসে বলল, আমার দেওয়ায় কিন্তু অবহেলা ছিল না, ভালবেসেই দিয়েছি।

বললাম, বা রে আমি কি ইচ্ছে করে ফেলেছি নাকি, সত্যি খুব খারাপ লাগছে আমার। এবার আমার হাতেই থাকবে তোমার উপহারের ফুল—বলে আমি ফুলের গুচ্ছের বোঁটাটা ধরে লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখি একেবারে তরতাজা ফোটা দুটি ফুল, বাকী সব কুঁড়ি।

ফুলের গুচ্ছটা ওর দিকে এগিয়ে ধরে বললাম, দেখ, এতক্ষণ মাথায় ছিল তবু কেমন তাজা।

সুনন্দ হেসে বলল, ফুলটা কার মাথায় শোভা পাচ্ছিল সেটা দেখতে হবে তো!

আমি উৎসুক হয়ে বললাম, ফুলটা ভারী ভাল লেগেছে। বাড়ি গিয়ে ছোট্ট একটা সাদা ভাসে জল

দিয়ে রেখে দেব। আচ্ছা সুনন্দ, কুঁড়িগুলো ফুটবে না?

সেটা তোমার ওপরই নির্ভর করছে। তোমার একটু প্রাণের ছোঁয়া লাগলেই সবকটি কুঁড়ি ফুটবে। আর তুমি কুণ্ঠিত হলেই ওরা আর পাপড়ি মেলবে না।

তুমি বড্ডো হেঁয়ালি করে কথা বলছ সুনন্দ, তবু কিন্তু ভাবী সুন্দর লাগছে।

সুনন্দ বলল, ভুল হলে শুধরে দিও, আজ কিন্তু তোমার ওই ফুলের গুচ্ছটি দেখে আমার একটা 'শের' মনে পড়ে যাচ্ছে। অভয় দাও তো বলি।

অধীর হয়ে বললাম, বল না, আমি কান পেতে আছি।

'লো হম বতায়েঁ গুচাঁ-ও-গুল মে ফরক্ কেয়া,
এক বাৎ হ্যায় কহি হুই, এক বেকহি হুই।।'

শোন বলি ফুল আর কুঁড়ির ভেতর প্রভেদটা কি—ফোটা ফুল হল সেই কথা, যা বলা হয়ে গেছে, আর কুঁড়ি হল, যা এখনও বলা হয়নি।

বললাম, একজনের চেষ্টায় কুঁড়িকে ফোটানো যায় না সুনন্দ। না-বলা-কথার কুঁড়ি ফোটাতে আমাদের মিলিত চেষ্টা চাই। আমারও একটি 'শের' মনে আসছে, শোন—

'চমনমে ইখতলাতে রঙো বুঁ সে বাৎ বন্‌তি হ্যায়
হামই হাম হ্যায় তো কেয়া হাম হ্যায়
তুমহি তুম হো তো কেয়া তুম হো।'

গুলবাগিচায় যে ফুল ফোটে তার সার্থকতা রঙ আর গন্ধের মিলনে। আমি একা অসম্পূর্ণ আর তুমি একাও তাই। দুজনের মিলনেই তো পূর্ণতা।

সুনন্দের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ও বলল, Charles Sedley দুটি হৃদয়ের মিলিত প্রচেষ্টার কথা ভারী সুন্দর করে বলেছেন, Love is a burden, which two hearts, when equally they bear their parts, with pleasure carry : but no one, alas ! can bear it alone.'

ভালবাসার ভার দুটি হৃদয়কে বইতে হয়। একা কেউ বইতে পারে না।

বললাম, এই মুহূর্তে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না সুনন্দ। আজ সোজা এখান থেকেই আমাকে বাড়ি চলে যেতে দাও। যে আতরের নির্যাসটুকু এখুনি আমার আঁচলে এসে লাগল তাকে আমি বাইরের মাতাল হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চাই না।

সুনন্দ বলল, আমিও আজ আর চাচাজীর কাছে যাব না নসীম। তুমি যা হোক্ কিছু বলে দিও। আজ রাতটুকু একা একাই থাকতে চাই।

বললাম, বেশ, তাই হবে। তবে দু'একদিনের ভেতর মিউজিয়ামে তোমার আর দু-একটি 'শের' শোনবার আশায় লোভীর মত অপেক্ষা করব।

আমারও সেই প্রত্যাশা থাকবে নসীম—সন্ধ্যায় ডাকবাক্সের চাবি খুলে তোমার হাতের ঠিকানা লেখা একটি খাম যে কোন দিন পাব আমি।

পরের দিন মিউজিয়ামে ঢুকেই চলে গেলাম বাদ্যযন্ত্রের ঘরটিতে। সংগ্রহশালার এই ঘরটা আমার বড়ই প্রিয়। আমার মনের সুখ অসুখের সঙ্গে এর কোথায় যেন একটা যোগ আছে।

সবে ঘরটা খোলা হয়েছে। দর্শকরা তখনও এসে পৌঁছয়নি। আমি ডানদিক থেকে দেখতে লাগলাম। মনে হল কাঁসর, খঞ্জনী, ঝুমুর, করতাল বেজে উঠল একসঙ্গে। যেন আরতি হচ্ছে কোন মন্দিরে। এক সময় থেমে গেল আরতি। এবার বাজতে লাগল মহামৃদঙ্গ, শ্রীখোল। মনে হল, একদল মণিপুরী নর্তক মঞ্চে প্রবেশ করে নৃত্যের তালে তালে অপরূপ কৌশলে খোলে বোল তুলতে লাগল। কি দেহবিভঙ্গ, কি নৃত্যলীলা। কতক্ষণ মঞ্চ পরিক্রমা করতে করতে তারাও এক সময় যবনিকার অন্তরালে চলে গেল।

চোখের সামনে জেগে উঠল সুসজ্জিত এক নহবতখানা। মাথায় ফেজ, চুস্ত শেরোয়ানী পরে সানাইয়ে ফুঁ দিয়েছেন ওয়াহিদ খাঁ সাহেব। সানাইয়ের মর্মস্পর্শী সুরে মূর্ত হয়ে উঠেছে শিশির ভেজা

এক সকালের ছবি। সিক্ত অথচ রামধনুর রঙে ঝলমল। নিমন্ত্রিতের আনাগোনা চলেছে। কলরব করতে করতে প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে যাচ্ছে চিত্রিত কুমারীর দল।

সন্ধ্যায় আলো ঝলমল বিয়ের বাসরে বর বসেছে, মাথায় টোপর। পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে না বরের মুখের আদল।

এক সময় শুভদৃষ্টির আচ্ছাদন ফেলে দেওয়া হল বরবধূর ওপর। দুজন দুজনকে দেখবে। প্রথম দর্শনের রোমাঞ্চ, বধূর চোখে লজ্জাবরণ দৃষ্টি।

কে ও? সুনন্দ! মুগ্ধ আনন্দঘন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে নববধূর মুখের দিকে!

আমিও চেয়ে আছি নববধূর দিকে। চন্দনে চর্চিত, ফুলের অলংকারে সজ্জিত বধূ মূর্তি। কিন্তু এ কি! সামনের দর্পণে যে নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখছি! নসীম, তুমি নববধূ!

এবার দু'চোখ ভরে দেখছি সুনন্দকে। ও তো শুধু সুন্দর নয়—আনন্দ। সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ, আর আত্মাকে রোমাঞ্চিত করে যে আনন্দ।

জলসাঘরে বসেছেন কত গুণী শিল্পী, তাঁদের হাতে হাতে সেতার, এস্রাজ, বীণা। গজদন্তের অপূর্ব কারুকার্যময় দেহ 'তাম্বুরী'। একটি 'তাউস' দাঁড়িয়ে আছে ময়ূরের আকৃতি নিয়ে। ফুল-লতার কাজে চিত্রিত 'সেতার'। বীণকাররা বসে রয়েছেন মৌন স্তব্ধতায়। কারো হাতে 'কাত্যায়নী', কারো হাতে 'রুদ্র', কারো হাতে 'বিপঞ্চী' বীণা।

বেজে উঠল জলসাঘরের সুরযন্ত্রগুলি ঐকতানে। সে এক আশ্চর্য ঐকতান। নন্দনলোকে দাঁড়িয়ে আমি নসীম খাতুন সুরের ধারায় স্নান করতে লাগলাম।

পরের দিন মিউজিয়ামের কাজ সেরে বেরুবার সময় পেলাম সুনন্দের চিঠি। সেই মুহূর্তে চিঠিখানা খুলে পড়ার অদম্য ইচ্ছা জাগলেও আমি সে ইচ্ছা দমন করলাম। ভালবাসা অধীরতা চায় না, গভীরতা চায়। সুস্থির আস্বাদনেই ভালবাসার স্বাদ।

বাসায় গিয়ে স্নান সেরে রাতের খাবার তৈরি করে চাচাজীকে খেতে দিয়ে, নিজেও খেলাম।

চাচাজী কিছু সাংসারিক কথাবার্তার পর শুতে গেলেন। ক্রমশ রাত নিঝুম হয়ে এলে আমি বিছানায় এসে বেড ল্যাম্প জ্বেলে খামের মুখ খুলে চিঠি বের করলাম।

প্রথম সম্বোধনেই দুষ্টুমি করেছে সুনন্দ। 'নসীম' নামটাকে 'নসীব' বানিয়ে চিঠির শুরুতে লিখেছে ঃ আমার 'নসীব' কোথায় যে আমাকে নিয়ে যাবে তা আমি জানি না। ঘর থেকে কর্মক্ষেত্র আবার কর্মক্ষেত্র থেকে ঘর, এই পথটুকুতে অতি সন্তর্পণে গতকাল যাতায়াত করেছি। হাঁটা পথটুকু পার হতে কতবার যে হর্ণের চড়া আওয়াজ কানে এসে বেজেছে তার ঠিক নেই। আমি বধির কিনা এ প্রশ্ন জানবার জন্য অন্তত খান তিনেক গাড়ি আমার পাশ ঘেঁষে এসে ব্রেক কষে দাঁড়িয়েছে।

রাতে বিছানা নেবার আগে ভাবলাম, আমি আর আমার 'নসীবে'র কথা ভাবব না কিন্তু আমার স্বপ্নের ভেতর সে এসে দাঁড়াল।

ভোর হলে কবি ফৈজ তাঁর 'শের' নিয়ে হাজির। তোমাকে ফৈজ আহ্‌মদ ফৈজের শেরটি পাঠালাম। কেমন করে কবি যে আমার মনের কথাটি জানতে পারলেন তা কে জানে!

তেরা জমাল নিগাহোঁমে লেকে উঠা হুঁ
নিখর গয়ি হ্যায় ফঁজা তেরে পয়েরহান কিসি,
নাসিম তেরি শবিস্তান সে হোকে আই হ্যায়
মেরে সহেরমে মহেক হ্যায় তেরে বদনকিসি।'

রাতভোর স্বপ্ন দেখে প্রভাতে জেগে উঠলাম। তখনও চোখের তারায় তুমি ভরে রয়েছ। আমার দৃষ্টির সরোবর টলটল করছিল তোমার ভরা যৌবনের জলে। রোদ ঝলমল সকাল, সে তো তোমার পরিধেয় বসনের স্বচ্ছ শোভা। ভোরের হাওয়া তোমার দেহের মদির গন্ধে ভারাক্রান্ত। ও হাওয়া যে তোমার শয্যালগ্ন শিথিল তনুবল্লরী ছুঁয়ে এসেছে।

পাদটীকায় লিখেছে ঃ দৈবাৎ 'শের'টি অনুবাদ সহ্ চাচাজীর হাতে গিয়ে পড়লে আমার শিষ্যপদ খারিজ হতে বিলম্ব হবে না।

শেষে সুনন্দ লিখেছে ঃ প্রিয়ার তনুবল্লরী ছুঁয়ে যে হাওয়া বয়ে আসে সে হাওয়াটুকুর স্পর্শ পাবার জন্য প্রেমিকের লোভের অন্ত নেই। সব যুগের সব ভাষার কবিই জানেন, প্রিয়ার দেশের হাওয়া প্রিয়ার দেহ-সুবাসই বহন করে আনে। এই প্রসঙ্গে মেঘদূতের একটি শ্লোক মনে পড়ছে—

'ভিত্বা সদ্য কিসলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতি-সুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি।।'

উত্তরে অলকাপুরীতে বিরহব্যাকুলা প্রিয়া। দক্ষিণে রামগিরিতে নির্বাসিত যক্ষ। বিরহী যক্ষ বলছে, উত্তরে তুষারগিরি থেকে প্রবাহিত বায়ু দক্ষিণে ধাবিত হচ্ছে। ঐ বায়ুর আঘাতে ছিন্ন হচ্ছে দেবদারুর কিশলযপুট। অমনি নির্গত হচ্ছে ক্ষীর। ঐ ক্ষীরের সুবাসে সুরভিত বায়ু প্রিয়ার অঙ্গ স্পর্শ করে এসেছে, তাই আমি ঐ বায়ুকে আলিঙ্গন করি।

চিঠির শেষ কটি কথা ঃ স্রোতের টানে অনেক দূর ভেসে এসেছি, কূল পাব তো?

আমার দিন আমার রাতগুলোকে সুনন্দ উদভ্রান্ত করে দিল। মনে হল, আমাদের এই মন দেওয়া নেওয়ার সত্যি কি কোন সফল পরিণতি আছে, না এক মরুভূমিতে মিথ্যা মরুদ্যানের প্রতিচ্ছবি দেখে ছুটে চলা। আমাদের প্রথম আর প্রধান বাধা জাত। জাতকে অতিক্রম করে এগিয়ে আসা বড় কঠিন কাজ। এই মুহূর্তে সুনন্দের আন্দোলিত দেহ মন আমাকে চাইছে কিন্তু ওর প্রিয়জনদের কাছ থেকে যখন বাধা আসবে তখন কি সে সমান ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারবে?

মনে মনে ভাবলাম, সুনন্দকে সহসা কাছে টেনে নেব না। প্রদীপ উস্‌কে দিলেই উদ্দীপ্ত হয়। ও শুধু এখন আমার কথাই ভাবছে। ও তার চারদিকের পরিস্থিতির মাঝখানে আমাকে ফেলে ভাবুক। যদি কোন দিন আশাভঙ্গ হয় তাহলে লঘু হবে আঘাত।

'শের' দিয়েই আমি আমার প্রথম চিঠি পাঠালাম।

'সাহিলকা তলবগার এ পহেলেই সমঝলে
দরিয়াই মোহব্বৎকে কিনারে নেহি হোতা।'

তীরের নাগাল পাবার জন্যে যাদের প্রাণ আনচান করে তাদের আগেই জেনে নেওয়া দরকার, প্রেমের সাগরে কোন তীর নেই।

এরপর সুনন্দকে আমি স্থির হয়ে আমাদের ভালবাসাকে অনুভব করার জন্য অনুরোধ জানালাম। লিখলাম, আমাদের মিলনের পথ যে বন্ধুর তা তোমার অজানা নয়। সুতরাং পরিণতি যেখানে অনিশ্চিত, অধীরতা সেখানে বিচারের অপেক্ষা রাখে। তুমি শিক্ষিত, সমৃদ্ধ মনের অধিকারী, তুমি আমার প্রিয়, এই অনুভূতিটুকুই আজ আমার পথ চলার প্রেরণা। প্রিয়সখা, তুমি তোমার দক্ষিণ হাতখানি প্রসারিত কর, আমি একটু স্পর্শ করি। তোমার করস্পর্শের অনুভূতিই আমার সমস্ত অপ্রাপ্তির সান্ত্বনা।

পরের ডাকেই ওর উত্তর এলো। সব বিপর্যয়ের শেষে আমাদের মিলন ঘটবেই। সেদিন তোমার বাসায় চাচাজীর কাছে আমি একটি শের পড়ছিলাম, দরজার ওপার থেকে তুমি কান পেতে তা শুনছিলে আমি জানি। সেটিই আজ দ্বিতীয়বার তোমাকে শোনাচ্ছি।

'রাত যিতনী ভী সংগীন্ হোগী
সুবহ্ উৎনি হী রংগীন্ হোগী
গম্ না কর্ গর হ্যায় বাদল ঘনেরা
কিসকে রোকে রুকা হ্যায় সবেরা।'

রাত যত সঙ্গীন হবে প্রভাত তত রঙীন হবে। বাদলের মেঘ ঘনিয়ে এলেও ভয় পেও না, কারণ প্রভাতকে কেউ রুখতে পারবে না, পারে না।

মন্তব্য করেছে সুনন্দ ঃ আমরা কি এই আশ্বাস বুকে নিয়ে এগোতে পারি না?

উত্তর দিইনি। কারণ শুক্রবার ওর মিউজিয়ামে আসার দিন। আমার চিঠি, শনিবারের আগে ও পাবে না।

ও এলো। চারটের কাছাকাছি। আমরা 'কয়েন' গ্যালারীতে ঢুকলাম। কণিষ্কের একটি নতুন আবিষ্কৃত মুদ্রা মিউজিয়ামে এসেছে, তাকে দেখার জন্যে সুনন্দ উৎসুক। এক দিকে কণিষ্কের মূর্তি, অন্য দিকে বুদ্ধ। কাগজে সংবাদ দেখেই ও এসেছে। কিন্তু সেই মুদ্রাটি তখনও সংগ্রহশালায় প্রবেশের ছাড়পত্র পায়নি। তবু ওর আগ্রহে ঢুকলাম গ্যালারীতে।

আমরা নতুন সাজানো সংগ্রহশালাটি দেখতে লাগলাম। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক থেকে লিপিযুক্ত মুদ্রা দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন ও তাদের সামন্ত রাজারা সমসাময়িক লিপিসহ মুদ্রার প্রবর্তন করেন।

এ দেশে প্রথম সোনার মুদ্রার চলন হয় কুষাণ আমলে। খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতকে গুপ্তযুগে কেবল সোনার মুদ্রার প্রাচুর্যই ছিল না, মুদ্রার বৈচিত্রময় অপূর্ব সব নক্সাও দেখা যেত।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলের একটি মুদ্রা উৎসুক চোখে দেখতে দেখতে সুনন্দ বলল, দেখ, সিংহনিধনকারী ধনুর্ধারীর অবয়ব। গুপ্ত সম্রাটদের শক্তির প্রতীক।

হেসে বললাম, চমৎকার পৌরুষদীপ্ত চেহারা, ঠিক শ্রীল শ্রীযুক্ত সুনন্দ আচার্যর মত।

ও বলল, পরিহাস করছ?

বললাম, অকুণ্ঠ প্রশংসা।

ও কৌতুকের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, মত-টত না হয়ে সত্যিই যদি গুপ্তযুগের কোন রাজাধিরাজ হতে পারতাম!

বললাম, কে বলতে পারে তুমি তা নও। পূর্ব জন্মে হয়তো তুমি কোন রাজপুত্রই ছিলে।

রাজপুত্র কেন, স্বয়ং সম্রাটই ছিলাম।

রাজপুত্ররাই তো সাধারণত রাজা মহারাজা হত। ঐ যে বাঁদিকের শো-কেসটা পেরিয়ে এসেছ, ওখানে ব্যাকট্রিয়া আর ভারতের গ্রীক রাজাদের মুদ্রা রয়েছে। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক থেকে সব মুদ্রার সঞ্চয়। ডিওডোটস (২য়), ডিমিট্রিয়াস, আলেকজাণ্ডার।

হাতির ওপর চলেছেন গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার, পিছনে অশ্বারোহী। ওই মুদ্রাটি দেখিয়ে বললাম, জাতিস্মর হয়ে দেখ তো, তোমার মুদ্রাটি তুমি চিনতে পারো কিনা?

সুনন্দ বলল, দিগ্বিজয়ী সম্রাট হওয়া সত্যিই কঠিন কাজ, কিন্তু তার চেয়েও কঠিন—

ওকে থেমে যেতে দেখে বললাম, কি?

ও অবলীলায় বলল, তোমার মত নারীর হৃদয় জয় করা।

চাপা গলায় বললাম, কি হচ্ছে সুনন্দ! আশেপাশে লোক গিস্ গিস্ করছে।

ও গম্ভীর গলায় বলল, সম্রাট আলেকজাণ্ডার যে স্বয়ং তাঁর মুদ্রা দেখছেন, এ খবরটা জানাজানি হয়ে গেছে, তাই এত ভীড়।

এর পর প্রাচীন ভারতের জনপদ ও গণসমূহের প্রবর্তিত মুদ্রার সঞ্চয়। খৃঃ পূঃ ২য় শতক থেকে খৃস্টাব্দ ৩য় শতক পর্যন্ত। পাঞ্চাল, নাগ, ওদুম্বর, কৌশাম্বী, অযোধ্যার মুদ্রা। প্রাচীনতম ব্রাহ্মীলিপি আর খরোষ্ঠি লিপি উৎকীর্ণ মুদ্রার নিদর্শন। গন্ডোফারিস, আজিলিসিসের মুদ্রা রয়েছে। আনুমানিক খৃঃ পূঃ প্রথম শতক থেকে খৃস্টাব্দ প্রথম শতক পর্যন্ত। ভারতে শক পহ্লব রাজাগণের শাসনের নিদর্শন।

পেরিয়ে এলাম কুষাণ যুগের (খৃস্টীয় ১ম থেকে ৩য় শতক) প্রথম কদফিস, হুবিষ্ক, কণিষ্ককে।

এই তো সাসানীয় হূণ আর অন্যান্য বিদেশী শাসকদের চিহ্নবাহী সব মুদ্রা। (৩য় খৃঃ থেকে ৭ম খৃঃ)। আবদাশীর (১ম)। আরব শাসক খসরু (২য়), মিহিরকুল।

গুপ্তযুগের (৪র্থ খৃঃ থেকে ৬ষ্ঠ খৃস্টাব্দ) সাজানো রয়েছে। পল্লব চোল, গঙ্গো (উড়িষ্যা), পশ্চিম

চালুক্য, বিজয়নগর, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূরের রাজন্যবর্গের মুদ্রা।

উত্তর ভারতে শুরু হয়ে গেল দিল্লীর সুলতান যুগ (১২শ খৃঃ থেকে ১৬শ খৃস্টাব্দ)। বিখ্যাত সব সুলতানরা উপস্থিত। গজনীর সুলতান মামুদ, সুলতানা রিজিয়া. ইলতুৎমিস, শেরশাহ, ফিরোজশাহ, মহম্মদ বিন তুঘলক।

সুনন্দ বলল, এতগুলি সুলতানের ভেতর আমার সবচেয়ে ফেভারিট শেরশাহ।

বললাম, তোমার পছন্দের কারণ?

রাজস্ব ও শাসন-ব্যবস্থায় তিনি নিঃসন্দেহে সুদক্ষ সুলতান ছিলেন কিন্তু আমার পছন্দ অন্য কারণে। তাঁর প্রচলিত মুদ্রায় ফার্সী আর দেবনাগরী অক্ষর উৎকীর্ণ। হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের নিদর্শন। বাঙালী ব্রহ্মজিৎ গৌড়কে তিনি সেনানায়কের পদ দিতে কুণ্ঠিত হননি। ভারতের রাষ্ট্র গঠনের কাজে তিনিই প্রথম হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। আকবর পরবর্তীকালে শেরশাহের এই আদর্শটি বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া শেরশাহের ঐ পথ-পরিকল্পনাটি আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। বাংলাদেশের সোনার গাঁ থেকে সিন্ধু পর্যন্ত প্রসারিত একটা রাজপথ। কত বণিক, কত পথিক ঐ পথে চলেছে। দিনে-রাতে প্রয়োজনে বিশ্রাম নিচ্ছে তাঁরই পরিকল্পিত মুসলিম সরাইখানা আর হিন্দু পান্থশালায়। কূপ থেকে জল তুলে স্নান করে শ্রান্তি দূর করছে।

মানুষটি মাত্র পাঁচ বছরে যা করেছেন, শত শত বছরেও তা হতে দেখা যায় না। তাছাড়া মানুষ যাতে তাড়াতাড়ি খবরাখবর আদান প্রদান করতে পারে সেদিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। তিনি সেকালের সবচেয়ে দ্রুতগামী বাহন ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেছিলেন। তুমি ভেবে দেখ নসীম, তোমার চিঠি কত দ্রুত আমার হাতে আসে তাই নিয়ে আমি প্রতীক্ষায় থাকি—আমাদের হৃদয়ের এই উৎকণ্ঠাটুকু তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিলেন। হয়তো রাজকার্যের প্রয়োজনটা ছিল তাঁর কাছে প্রধান তবু এতে সাধারণ মানুষেরও নিশ্চয়ই উপকার হয়েছিল।

বললাম, আমি তোমার সঙ্গে একমত সুনন্দ। কিন্তু একটু অবাক হচ্ছি তোমার ইতিহাসের ধারণা দেখে।

সুনন্দ হেসে বলল, তোমার রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ তো?

একেবারেই না। উপযুক্ত অধিকারীর স্বচ্ছন্দ বিহার।

এবার মোগল সম্রাটদের মুদ্রার কাছে আসতেই ও জিজ্ঞেস করল, কোন্ সম্রাট তোমার বরণীয় বল?

হেসে বললাম, সম্রাটকে বরণ করবার ধৃষ্টতা বা অভিরুচি কোনটাই আমার নেই। আমি বরং তোমার কাছেই এ প্রশ্নটা রাখছি।

ও বলল, একজন নয়, দুই মোগল সম্রাটই আমার প্রিয়। শাহানশাহ আকবর হিন্দু মুসলমানকে শুধু এক দৃষ্টিতেই দেখেননি, বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে বহুকাল পোষিত একটা সংস্কারের মূলে আঘাতও করেছিলেন।

বললাম, দ্বিতীয়জনটিকে আমি অনুমান করতে পারি—নিশ্চয়ই তিনি পত্নী প্রেমিক শিল্পরসিক শাজাহান।

একেবারে যথার্থ। আচ্ছা নসীম, তোমার আমার ভাবনার এতখানি মিল হল কি করে বলতো?

বললাম, বোধ হয় আমি মুসলিম আর তুমি হিন্দু বলে।

আমরা মুদ্রা সংগ্রহশালা থেকে বেরিয়ে এলাম। সুনন্দ বলল, সারা ভারতের রাজন্যবর্গকে একটি কক্ষের মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে। মনে হচ্ছে বিভিন্ন যুগের সম্রাট মিলিত হয়েছেন যেন এক স্বয়ংবর সভায়।

বললাম, দারুণ বলেছ তো!

ও সঙ্গে সঙ্গে ধীর গলায় বলল, কার কণ্ঠে মালা দেবে?

বললাম, ফুল সবে ফুটেছে গাছে, এখনও সে ফুল তোলা হয়নি। ফুল তোলা, মালা গাঁথা সবই বাকি। তারপর তো স্বয়ংবর সভায় প্রবেশ আর মাল্যদান। এখনই সম্রাটরা অধীর হলে আমি নাচার।

মালা পেতে গেলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

ও বলল, মেয়েরা বড় নিষ্ঠুর।

বললাম, ছেলেরা ধৈর্যহীন।

বিভিন্ন গ্যালারীতে চাবি বন্ধ হচ্ছিল। সিকিউরিটি অফিসার দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলেন। সুনন্দ বলল, প্রতিদিন ওই ভদ্রলোককে এই সময় হাজির থাকতে হয়?

এইটাই তো নিয়ম।

বড় কড়াকড়ি দেখছি। মাছিটিও গলবার পথ পাবে না।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষ গলে গিয়েছিল একদিন। মনে নেই, ১৯৭৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর সব ক'টা প্রভাতী কাগজেই তো খবরটা বেরিয়েছিল।

সুনন্দ বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে। সেই যে মহিষমর্দিনী মূর্তি চুরি গিয়েছিল। ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে মথুরা আর সারনাথ থেকে ঐ মূর্তিগুলি পাওয়া গিয়েছিল।

কিন্তু তারা ঢুকল কি করে?

মিউজিয়ামের দক্ষিণে যে বিশাল কাঠের দবজাটা আছে, ১৩ই সেপ্টেম্বর ভোর রাতে চোরেরা তার তালা ভাঙার পর কোলাপসিব্‌ল্ গেটের তালাও ভেঙে চলে আসে পুরাতত্ত্ব বিভাগের গ্যালারীতে। আগেই দর্শক হিসেবে এসে দেখে গিয়েছিল নিশ্চয়ই কোন্ শো-কেসটি ভাঙতে হবে। তারপর গুপ্তযুগের শো-কেসের ডালা ভেঙে মূর্তিগুলো নিয়ে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথেই গা ঢাকা দেয়।

তারপর?

তারপর পুলিশের অশেষ কৃতিত্ব, বামাল ধরা পড়ে যায় পুরো দলটি।

সুনন্দ বলল, মহিষমর্দিনী না হয়ে অন্য কোন মূর্তি হলে পাওয়া শক্ত হত।

কেন?

আসলে মহিষমর্দিনী তো, তাই চোরেরা তাঁর রণরঙ্গিণী মূর্তিটিকে হজম করতে পারল না। দেবি নিজেই অসুর বিনাশ করলেন—পুলিশ উপলক্ষ মাত্র।

হেসে বললাম, তা যা বলেছ।

সুনন্দ শিক্ষিত, সুনন্দের পৌরুষদীপ্ত চেহারা, তবুও ওর ভেতর কোথায় যেন একটি জেদী বালক-সত্ত্বা বর্তমান।

কোন কোন দুপুরে ও হঠাৎ মিউজিয়ামে এসে পড়ে বলে, তোমার টিফিনে ভাগ বসাতে এলাম।

বলি, সামান্যই আমার আয়োজন, দাঁড়াও, কিছু আনাই।

ও বলে, ওতেই দুজনের চলে যাবে।

আবার কোন দিন হয়তো পার্ক স্ট্রীটের কোন রেস্টুরেন্টে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করে। টিফিনের পর আমার জরুরী মিটিং আছে বললেও সে-কথা কানে তোলে না।

কোন দিন আবার বায়না ধরে ইভনিং শোতে সিনেমা যাবার জন্যে। আমি যত বলি চাচাজীর কাছে এখনও আমাদের ব্যাপারটা পরিষ্কার নয়, সুতরাং রাত দশটা অব্দি বাইরে কাটানোর কোন অজুহাত নেই, ততই ও জেদ ধরে। ওর ধারণা, ভালবাসার জন্যে একটু মিথ্যের আশ্রয় নেওয়া, একটু গালমন্দ খাওয়া বেশ একটা উপভোগ্য ব্যাপার।

আমার স্বভাব আবার উল্টো। আমি যে ভালবাসাকে গভীর ভাবে গ্রহণ করেছি, তাকে কোন রকম লঘু আচরণের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চাই না। আমি তাকে সত্যের শক্তিতে প্রকাশ করতে চাই।

একদিন ম্যাটিনী শো-তে সিনেমার টিকিট কাটা হল। আগে থেকেই আমি সেদিন ছুটি নিয়েছিলাম, ওকেও বলে দিয়েছিলাম, দয়া করে ছুটি নিও ঐ দিনটায়। মনে উদ্বেগ আর অপরাধ বোধ নিয়ে আর যা-ই হোক আনন্দ উপভোগ করা যায় না।

ও বলেছিল, ছোট ছোট অপরাধ আর অমলিন মিথ্যা ভালবাসার ভেতর খেলার একটা আমেজ এনে দেয়। তবুও আমার কথা ও শুনেছিল।

ছবি শুরু হল। ও আমার হাতের পাঁচটা আঙুল নিয়ে খেলা করতে লাগল। এই প্রথম আমি ওকে আমার আঙুলগুলো স্পর্শ করতে দিলাম। মিথ্যা বলব না, সত্যিই রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম ওর প্রথম স্পর্শে।

ইন্টারভ্যালের সময় সবাই যখন সীট থেকে এদিক ওদিক বেরিয়ে গেলেন তখন ও আস্তে আস্তে বলল, অখ্যাত এক কবিবন্ধুর একটি কবিতার ক'টি ছত্র এই মুহূর্তে বড় বেশী করে মনে পড়ছে—

বললাম, শোনাও না কবিতাটা।

ও চাপা গলায় আবৃত্তি করল—

তোমার হাতের ঐ পাঁচটি অঙ্গুলি
সবে বলে চম্পকের কলি,
আমি কিন্তু বলি তারে
সিন্ধুর পাঁচটি শাখা নদী,
আমার দেহের সীমা ছুঁয়ে
অশান্ত প্রলাপ তার চলে নিরবধি।
আকাশের নীল দেহে
ছোঁয়া তার পঞ্চমুখী বিদ্যুতের শিখা,
অঙ্গুষ্ঠ তর্জনী আর মধ্যমা কনিষ্ঠা অনামিকা;
সে ছোঁয়ায় মেঘের সঞ্চয়
সে ছোঁয়ায় ভোরের উদয়
সে ছোঁয়ায় বৃষ্টি ঝরঝর
বনময় মনোময় শিহরিত কদম্ব কেশর।

বললাম, কবিতার বিচারে এটি কত নম্বর পাবে জানি না তবে এই মুহূর্তে আমার কাছে অসাধারণ।

ম্যাটিনী শোতে কি ছবি হল, কারা কেমন অভিনয় করল তা আর জানা হল না, শুধু হাতে হাত রেখে যেন 'হৃদয় দিয়ে হৃদি' অনুভব করতেই কেটে গেল সমস্ত দুপুর।

অন্য একদিন আলোচনায় স্থির হল, সুনন্দ সুযোগ সুবিধা মত তার মায়ের অনুমতি চেয়ে নেবে। আর আমিও সুযোগ মত আমার চাচাজীকে রাজী করাব।

বিয়ের ব্যাপারে আমি ভবিষ্যৎ কোন পরিকল্পনায় বিশ্বাসী ছিলাম না। কিন্তু সুনন্দ বিয়ের পরেই হানিমুনের জায়গাটা পর্যন্ত নির্বাচন করে রেখে দিয়েছিল।

এ আলোচনায় আমি শুধু ওর দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতাম।

ও বলত, জায়গাটার নাম জানতে চাও না?

হেসে বলতাম, আগে বিয়ে হোক।

আমি জানি, আমার উচ্ছ্বাসহীন আচরণে ও দুঃখ পেত। কিন্তু আমি ছেলেবেলা থেকেই চাচাজীর কাছে শিখেছিলাম সবকিছুতে নিরুদ্বিগ্ন থাকতে। এবং আমার সে শিক্ষা দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল।

কিছুদিন আগে পুরানো বই-পত্র ঝেড়ে-মুছে রাখতে গিয়ে চাচাজীর ধুলোভরা ডায়েরীর ভেতর থেকে দীর্ঘ চিঠি পাই। ঐ চিঠির হস্তাক্ষর আমার অপরিচিত হলেও, নীচে সই করা নামটা আমার অপরিচিত ছিল না। আব্বা আমার আম্মাকে 'শিরিণ' বলে ডাকতেন। নীচে সেই নামটিই ছিল। শিরিণ মানে—মিষ্টি, মধুর।

একটি লম্বা খামের ভেতর চিঠিখানা ছিল। খামের ওপরে নাম লেখা ছিল চাচাজীর। আশ্চর্য হলাম একটি বিষয়ে যে, বড় ডায়েরীর প্রতিটি পাতাই নানান তথ্যে ভরা। এবং আম্মার চিঠির সঙ্গে তার আশ্চর্য সংগতি।

এই একটিমাত্র পরিস্থিতিতে আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারিনি। আমার ভদ্র সংস্কার, সম্ভ্রান্ত মানসিকতার নিষেধ উপেক্ষা করে আমি চাচাজীর ডায়েরীর লেখা আর আম্মার চিঠি পড়তে লাগলাম।

পড়া শেষে দুটি মিলে একটি অনুদ্ঘাটিত কাহিনী আমার কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল।

চাচাজী সেবার একাই বেড়াতে গিয়েছিলেন কাশ্মীর। সেখানে আমার আম্মাকে দেখে তাঁর খুব ভাল লেগে যায়। যে হাউসবোটে চাচাজী ছিলেন সেটা ছিল আমার আম্মাদেরই। তরুণ চাচাজীকে আম্মারও খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। চাচাজী যে আম্মাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার প্রমাণ ডায়েরীতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, কোথাও উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার কোন ছায়াপাত নেই। প্রতিদিনের ভ্রমণসূচীতে দেখতে পাচ্ছি আম্মা আর তার ভাইজান প্রতিটি দর্শনীয় জায়গায় চাচাজীর সঙ্গী।

ডায়েরীর একটিমাত্র পাতায় চাচাজীর রূপমুগ্ধতার কিছু পরিচয় আছে, তাছাড়া প্রতি পাতায় আম্মার আন্তরিকতা আর শোভন সুন্দর আচরণের জন্য উচ্ছ্বাস।

কাশ্মীর ছেড়ে চলে আসার দিন আম্মাই চাচাজীকে হাউসবোট থেকে শিকারায় করে তীরে পৌঁছে দিয়ে যায়। সেদিন আম্মার কথা ছিল না, চোখ ভরা শুধু জল ছিল। এ সম্পর্কে চাচাজীর ডায়েরীর এক জায়গায় একটি ছোট্ট নোট ঃ 'শিরিণ'কে যে করেই হোক দেশে নিয়ে যেতে হবে।

এক বছর পরে চাচাজী আমার আব্বাজানকে সঙ্গী করে আবার কাশ্মীর গিয়েছিলেন। সেখানে চাচাজীর চেষ্টাতেই আব্বার সঙ্গে আম্মার সাদি হয়।

তারপর ডায়েরীর কয়েকটি পাতা কুয়াশাচ্ছন্ন। সম্ভবত সে-পর্বে চাচাজী নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলেন। ঘন ঘন যাতে আম্মার সঙ্গে দেখা না হয় সেরকম শাসনও চলছিল মনের ওপর।

ডায়েরীর একটি পর্বে আব্বার সামান্য সন্দেহের উল্লেখ আছে। তার পরের বেশ কয়েকটি পাতা জুড়ে আম্মাকে নিয়ে চাচাজী আর আব্বার কথোপকথন।

এ পর্বে দু'বন্ধুর সত্যকে সহজ ভাবে স্বীকার করে নেবার মনোবল লক্ষ্য করার মত। কথায় কথায় আম্মার স্বভাব চরিত্রের ওপর দুজনেরই গভীর আস্থার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। আব্বা চাচাজীকে হাতে ধরে অনুরোধ জানাচ্ছেন শিরিণের জন্য তাঁদের দুজনের আবাল্য বন্ধুত্বকে পরিত্যাগ না করতে।

এরপর আমার জন্ম! আমার শৈশবের অসুস্থতা। রাত জেগে আম্মা আব্বার সঙ্গে চাচাজীও আমার শিয়রে পালা করে বসে থাকতেন।

আমাকে কেন্দ্র করে আমার পরিবারের নিবিড়তার অনেক ছবি আঁকা আছে। এ সময় তিনজনেই উদার মুক্ত সহজ জীবনকে আশ্রয় করেছেন। চাচাজী বারবার গুমোট হাওয়াকে দক্ষিণ সাগর থেকে নিয়ে আসা এক ঝলক হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছেন।

এই পর্বেই সম্ভবত আম্মার চিঠিটা লেখা। আম্মা নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে চিঠির ভেতর। চাচাজীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের উন্মাদনার সামান্য উল্লেখ থাকলেও চাচাজী এখন যে আম্মার সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র, সবচেয়ে বড় শুভানুধ্যায়ী এ কথা স্বীকার করা হয়েছে। চাচাজীকে ছাড়া আব্বা আর আম্মার সংসার যে অচল এ সত্যের স্পষ্ট উল্লেখ আছে চিঠিতে। দার্শনিক আব্বাজানকে আম্মার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্য সকৌতুক তিরস্কার করা হয়েছে চাচাজীকে। আবার মাঝে মাঝে আব্বার নানা মহত্বেরও উল্লেখ আছে চিঠিতে। সবশেষে আম্মার অভিযোগ—চাচাজী সাদি না করে কেন বন্ধু আর বন্ধু পত্নীর সংসারের জন্য সারাটা জীবন বরবাদ করবে।

চাচাজী আম্মাকে এর কি উত্তর দিয়েছিলেন তা জানতে পারিনি। সকৌতুকে আম্মার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে, কারো সংসার গড়ে সুখ, কারো বা অন্যের সংসারের ছবি দেখে সুখ—এমন কথা বলেছিলেন কি না জানি না।

চিঠি আর ডায়েরী পড়ার পর থেকে চাচাজীর ওপর গভীর শ্রদ্ধায় মনটা ভরে উঠেছিল। চাচাজী আমাদের জাতের মানুষ ছিলেন না বলেই হয়তো আম্মার সঙ্গে তাঁর সাদি সম্ভব হয়নি, কিন্তু যাকে ভাল লেগেছে তাঁকে দৃষ্টির আড়ালে যেতে দিতে চাননি তিনি। তাই তাঁকে বন্ধুপত্নী করে এনেছিলেন নিজের দেশে। নিজের সংস্কৃত মার্জিত মনের জোরে তুচ্ছ ভোগবাসনার জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেননি। শুধু তাঁর অতি প্রিয় পাত্রীটির সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজের সমস্ত ইচ্ছা ও প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এ যুগের আধুনিকারা চাচাজীর কাহিনী শুনলে হয়তো বলবে, লোকটা মূর্খ,

আবেগপ্রবণ—কিন্তু চাচাজী এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু হারিয়ে ছিলেন বলে আমার মনে হয় না। হয়তো সংসারী মানুষের চেয়ে কিছু বেশি লাভের কড়িই তিনি তাঁর জীবনের ভান্ডারে সঞ্চয় করতে পেরেছেন।

পাঁচ

চাচাজীকে এইমাত্র চিতায় তুলে দিয়ে এলাম। আমাব চোখে জল নেই, বুকে একটা শ্বেত মর্মর পাথরের ভার। এতক্ষণ সুনন্দ আমার সঙ্গে ছিল। আমার বিশেষ অনুরোধে ও চাচাজীর মুখাগ্নি করেছে। শাস্ত্রে শিষ্য আর পুত্রকে একগোত্রে ফেলা হয়েছে। সুনন্দ কিছু দিনের জন্যে হলেও চাচাজীর শিষ্য হয়েছিল।

ঘরে আমি একা। সুনন্দকে কাজের শেষে জোর করে তার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি একা থাকতে চাই এ সময়। রাত এখন গভীর হয়েছে।

আমি আর সুনন্দ মিউজিয়াম থেকে প্রতি শুক্রবার যেমন পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরি তেমনি ফিরেছিলাম। দরজা ভেজানোই থাকে এ সময়, আমরা ঠেলে ভেতরে ঢুকে যাই। সামনেই চাচাজীর পড়ার ঘর। তার পেছনে অন্যান্য ঘর গৃহস্থালি।

দরজা খুলেই দেখি, চাচাজী পিঠওয়ালা মোড়ায় বসে নেই। পাশে সোফা-কাম-বেডের ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। গালিবের গজলের বইটা পাশেই কাচের টিপয়ের ওপর খোলা অবস্থায় উল্টে রাখা আর চাচাজীর একটা হাত কপালের ওপর।

আমি চাচাজীর কাছে যেতে যেতে বললাম, অবেলায় ঘুমিয়ে পড়লে কেন? শরীরটা কি খারাপ লাগছে?

চাচাজীর ঘুম অত্যন্ত পাতলা। একটু শব্দেই জেগে ওঠেন, আজ কিন্তু আমার কথা শুনতে পেলেন না। আমি দারুণ বিচলিত হয়ে তাঁর হাতে হাত দিলাম। হাতটা কপালের থেকে সরে গেল। চোখে মুখে কি প্রশান্তি! একটুও বিকৃতির ছাপ নেই। শুধু প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে।

পাশেই আমাদের ডাক্তারের চেম্বার। সুনন্দকে চাচাজীর কাছে রেখেই ছুটলাম। যদিও আমি প্রায় নিশ্চিত ছিলাম চাচাজী আর বেঁচে নেই তবুও অবোধ মন তো মানে না। ডাক্তার সবে তাঁর সান্ধ্য চেম্বারে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, আমার ডাকে চলে এলেন। না, চাচাজী নেই—সামান্য পরীক্ষা করেই রায় দিলেন তিনি—প্রথম সেরিব্রাল অ্যাটাকেই শেষ হয়ে গেছেন।

চাচাজী তাঁর আত্মীয়স্বজনের পাট অনেক দিনই তুলে দিয়েছিলেন, তাই তাঁদের খবর দেবার কোন প্রশ্ন ছিল না। আমি আর সুনন্দই ওঁর শেষ কাজটুকু করে এলাম।

মৃতদেহের সঙ্গে আমি দুটি জিনিস চিতায় তুলে দিয়েছিলাম। চাচাজীর সেই ডায়েরী আর মায়ের চিঠিটা। আমি জানি ও দুটিই ছিল ওঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয়বস্তু।

আমি ওঁর জন্য নতজানু হয়ে খোদার কাছে দোয়া মাগলাম। কতক্ষণ পরে আনি উঠে দাঁড়ালাম। টিপয়ের ওপর গালিবের গজলের বইটা তেমনি উল্টে রাখা আছে। বইয়ের খোলা পাতাটা সোজা করে ধরলাম। সুনন্দকে পড়াবার জন্য তিনি গালিবের বইটা নাড়াচাড়া করছিলেন। পাতাটার ওপর চোখ পড়ল। আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম—

'জাতা হুঁ দাগ্-এ হস্‌রৎ-এ হস্তী লিয়ে হুয়ে,
হুঁ শমা-এ কুশ্‌তহ্ দরখুর-এ মহ্‌ফিল্ নহীঁ রহা।'

জীবনের অপূর্ণ বাসনার ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে চলে যাচ্ছি ; আমি এক নির্বাপিত দীপ, মহফিলে রাখার যোগ্য নই আর।

আবার অশ্রুর ধারা নেমে এলো দুগাল বেয়ে।

আমার বিষণ্ণ দিনগুলোর মাঝে বৈচিত্র্য নিয়ে এলো সুনন্দের মা'র একটি পত্র। নিজের হাতে লিখেছেন তিনি—

কল্যাণীয়াসু,

'বন্দী'র জন্মদিন আগামী রোববার। আমি বাড়িতে ওইদিনে নিজের হাতে কিছু খাবার-দাবার তৈরি করি। ওর দু'-চারজন বন্ধু আসবে, তুমিও নিশ্চয়ই বিকেলে এসো।

স্নেহ ও শুভেচ্ছা জেনো।
মাসীমা

সুনন্দের যে জন্মদিন—ওর মুখ থেকে আমি অন্তত জানতে পারিনি। হয়তো আমাকে অত্যন্ত কাতর আর বিষণ্ণ দেখে ও কথাটা আমায় বলেনি। আমরা যতক্ষণ কাছাকাছি থেকেছি ততক্ষণ আমরা শুধু চাচাজীর কথাই বলে গেছি। নিজেদের সম্বন্ধে কোন কথা বলার সুযোগ হয়নি।

আজকাল সুনন্দ আর আমার বাসায় আসে না। আমিই ওকে বারণ করেছি। পাড়ার ছেলেগুলো ওকে আর আমাকে জড়িয়ে গুজব রটাক, এ আমি চাই না। তাছাড়া বাড়ির মালিক আমার ওপর প্রসন্ন নন। তিনি মৌখিকভাবে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার ফতোয়া জারি করেছেন। বাড়ি ছিল চাচজীর নামে। আমি যদি চাচাজীর নিজের মেয়ে হতাম তাহলে হয়তো আইনে ভাড়াটের অধিকার পেতে পারতাম। কিন্তু হৃদয়ের স্নেহ মমতার পরিমাপে তো আইন তৈরি হয় না।

সে যাই হোক মাসীমার আমন্ত্রণ আমার কাছে দক্ষিণের এক ঝলক হাওয়ার মত বয়ে এলো।

কি দেওয়া যায় সুনন্দকে তার জন্মদিনে? প্রথম যেদিন ম্যাটিনী শো-তে গিয়েছিলাম সেদিন ও আমার আঙুল নিয়ে খেলা করেছিল। বেরিয়ে এসে বলেছিল, আজ প্রথম তোমার হাত ছুঁয়ে যে আনন্দ পেয়েছি সে আনন্দটুকু আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার হয়ে রইল।

মনে মনে বললাম, সুনন্দ, তোমার হাতে আমার হাত তুলে দিতে পারলে বোধ হয় তোমার জন্মদিনের উপহারটা মনোমত হত, কিন্তু এই মুহূর্তে তার উপায় যখন নেই তখন চল্‌তি কিছু একটা নিয়েই তোমাকে তুষ্ট থাকতে হবে।

হঠাৎ আব্বাজানের পেনের কথা মনে পড়ল। আব্বার মৃত্যুর পর চাচাজী তাঁর যে সব জিনিস নিয়ে আসেন তার ভেতর নতুন দামী পার্কার পেন ছিল একটা। কলমটা ভারী বলে আমি ব্যবহার করতাম না। চাচাজী নিজের কলম ছাড়া লিখতে পারতেন না। তাই এতদিন ওই পেনটা আমার আলমারীতে যত্ন করে তোলা ছিল। ওই পেনটা নিয়েই আমি গেলাম ওর জন্মদিনে।

ওর পড়ার ঘরটা বেশ বড়। সাদা আর হলুদে ফুলতোলা একটা হাল্‌কা সবুজ রঙের গালিচা পাতা হয়েছে। ঝকঝকে মেহগিনি পালিশ করা বুক-কেসের ওপর সাদা পোর্সিলেনের ভাসে দুটি রক্তপদ্ম। একটি প্রস্ফুটিত অবস্থায়, অন্যটি কুঁড়ি। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ও কথা বলছিল। দুটি মেয়ের মধ্যে একজন সম্ভবত উপহার বইগুলো গুছিয়ে রাখছিল, অন্যজন কিছু রজনীগন্ধা আর গোলাপ নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

আমি ঢুকে ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম। ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওদের কাছে আমার পরিচয় দিল—নসীম, আমার বিশেষ পরিচিত বান্ধবী। প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে পি.এইচ.ডি. পেয়েছে। এখন মিউজিয়ামে বিশেষ একটি পদে কাজ করছে। ওর চাচাজী আমার উর্দু শেখার গুরু ছিলেন।

এরপর সুনন্দ আমাকে তার বন্ধুদের পরিচয় দিয়ে গেল। আমরা নমস্কার বিনিময় করলাম।

দুটি মেয়ের একজন আমার বয়সী, অন্যজন কিছু ছোট। একজন সুনন্দের ক্লাশের ছাত্রী, অন্যজন সম্প্রতি কলকাতার একটি কলেজে লেকচারার হয়ে ঢুকেছে। মেয়ে দুটি আমার দিকে কৌতূহলী চোখ মেলে তাকাতে লাগল।

পরিচয়পর্ব শেষ হলে ও আমাকে বসতে বলল। আমি বললাম, মাসীমার সঙ্গে একটু দেখা করে আসছি।

মাসীমা খাবার তৈরি করে গুছিয়েই রেখেছিলেন। আমি গিয়ে প্রণাম করতেই বললেন, তোমাকে আজ বড় বেশী করে মনে করছিলাম নসীম।

বললাম, আসতে একটা দেরী হয়ে গেল মাসীমা। আগে এলে আপনার কাজে কিছু সাহায্য করতে

পারতাম।

না না, সেজন্যে নয়। ও-সব খাবার-দাবার তৈরি করতে আমি ভালই বাসি। তোমার সঙ্গে আমার জরুরী একটা কথা আছে, তাই তোমাকে আজ বিশেষ ভাবে চাইছিলাম।

এখুনি বলবেন?

'বন্দী' কোথায় মা?

ওর পড়ার ঘরে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে, ডেকে আনব?

না না, এ কথা শুধু তোমার আমার ভেতর। একুট ছাদে যাবে আমার সঙ্গে?

নিশ্চয় যাব মাসীমা, কোন দিন তো আপনার ছাদে উঠিনি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে উনি বললেন, এখানে আমার ঠাকুরঘব।

আমরা ছাদে এসে দাঁড়াতেই মাসীমা হঠাৎ আমার একটা হাত চেপে ধরলেন। ওঁর হাত কাঁপছিল। আমি তাকিয়ে দেখি চোখ দুটো তাঁর ছলছল করছে।

আমি মাসীমার এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

উনি ঠাকুরঘরের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে। রোজ নারায়ণের সামনে পুজোয় বসি। পুজো থেকে উঠে জল তেষ্টা পেলে একগ্লাস জল গড়িয়ে দেবার কেউ নেই। আজ তোমার কাছে একটা ভিক্ষে চাইব মা।

এমন করে বলছেন কেন মাসীমা, আমার ভীষণ কষ্ট লাগছে—

মাসীমা আঁচলে চোখ মুছলেন। হঠাৎ আমার বুকটা কেঁপে উঠল কেন যেন। তিনি বললেন, তোমার কাছে আমি আমার ছেলেকে ভিক্ষে চাইছি মা—

ছেলেবেলা থেকে সব বিষয়ে অনুত্তেজিত থাকবার শিক্ষা দিতেন চাচাজী, সম্ভবত সেই অভ্যেসের জোরেই আমি মাথা নীচু করে নিজের আবেগকে সংযত করে নিলাম।

চোখ তুলে বললাম, ভিক্ষে কেন বলছেন মাসীমা। সুনন্দ তো আপনারই ছেলে। আপনার কাছ থেকে ওকে কেড়ে নেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ও আমাকে সব বলেছে নসীম। ও তোমাকে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করে এ বাড়িতে আনতে চায়।

এ কথার আমি কোন উত্তর দিলাম না দেখে উনি আবার বললেন, আমি ওকে আমার সম্মতি, অসম্মতি কিছুই জানাইনি। ও আমার বড় জেদী ছেলে। একবার যা ভাববে তার থেকে ওকে ফিরিয়ে আনা বড় কঠিন। ওকে কিছু না বলে তাই আমি তোমার শরণ নিয়েছি মা।

শান্ত গলায় বললাম, বলুন, আমাকে কি করতে হবে?

উনি বললেন, তোমাকে প্রথম দেখেই ভাল লেগে গিয়েছিল মা। আমার মেয়ে নেই, তোমাকে আমার মেয়ে বলেই মনে হয়েছিল। 'বন্দী' আর তুমি ভাইবোনের মত মেলামেশা করবে এটাই আমি চেয়েছিলাম। আমি ভাবতেই পারিনি তোমাদের মেলামেশা অন্য দিকে গড়াবে।

বলতে পারতাম আমি অনেক কিছুই। যদি সত্যিই আমাকে মেয়ে বলেই ভেবে থাকেন তাহলে শুধু জাতিতে মুসলিম বলেই আমার হাতের জল অশুদ্ধ হয়ে গেল!

এ সব যুক্তি-তর্কের অবতারণা ওঁর কাছে করে কোন লাভ নেই। ভালবাসা এমনই এক মর্যাদার জিনিস যাকে নিয়ে আর যাহোক বাদানুবাদ করা চলে না।

বললাম, মাসীমা, ভুল হোক্ ঠিক হোক্ আমরা পরস্পরকে ভালবেসেছি! ভালবাসা যদি দোকান থেকে নিয়ে আসা সওদা হত তাহলে সেটা বদলে অন্য একটা আনা যেত। কিন্তু তা যখন নয় তখন ও ভালবাসাকে বদলানোও যাবে না, আর ফেলে দেওয়াও যাবে না।

মুহূর্তে হতাশার একটা কালো ছায়া ওঁর মুখে নেমে আসতে দেখলাম। আমি ওঁর হাত ধরে ফেলে বললাম, আপনি বিচলিত হবেন না মাসীমা। আপনি অনেক বড় হয়েও যখন আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করেছেন তখন আমি আপনার মর্যাদা রাখব। এ বিয়ে হবে না—তবে এ কথাও ঠিক—ভালবাসা মরে না, সে মরবেও না।

উনি আবার আমার হাতটা ধরে বললেন, তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই মা।

তবে একটি অনুরোধ, তোমার সঙ্গে আমার যে এ বিষয়ে কথা হয়েছে, এটা যেন 'বন্দী' না জানে।

বললাম, কথা দিচ্ছি মাসীমা, আমি কিছুই বলব না।

উনি হঠাৎ সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে বললেন, চল মা, নীচে যাই, 'বন্দী' হয়তো ওপরে আসতে পারে।

তারপর নীচে নেমে যেতে যেতে বললেন, তুমি কিন্তু না খেয়ে যেতে পারবে না মা, আমি অনেক পরিশ্রম করে সারা দুপুর এগুলো তৈরি করেছি।

মুখে বললাম, খেয়ে যাব বৈকি। কিন্তু মনে মনে বললাম, কেউ যদি ব্রাহ্মণের সংস্কারে মুসলিমের জল গ্রহণ না করে তাহলে মুসলিমেরও ব্রাহ্মণের হাতের তৈরি খাবার গ্রহণ না করার অধিকার আছে।

কিন্তু আমার ভাবান্তর দেখলে সুনন্দ পুরো ব্যাপারটাই আন্দাজ করে নেবে। তাই মুখে কৃত্রিম হাসি টেনে সুনন্দের স্টাডি তে ঢুকলাম। কিন্তু ওর দিকে তাকাতে পারলাম না। অনেকেই অনুযোগের গলায় বললেন, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? হেসে বললাম, মাসীমার সঙ্গে গল্পে জমে গিয়েছিলাম।

সুনন্দ বলল, শুক্লা, বেতসী আর তৃণাঙ্কুর কবিতা আবৃত্তি শেষ করেছে, এবার তোমার পালা নসীম।

হেসে বললাম, ঢুকতে না ঢুকতেই।

সুনন্দ বলল, তোমাকে এতক্ষণ মাসীমার কাছে বসে গল্প করতে কেউ বলেনি।

মনে মনে বললাম, গল্পই করে এসেছি সুনন্দ, তবে সে গল্পের মত ট্র্যাজিক গল্প দুনিয়ায় খুব কমই আছে। মুখে বললাম, আবৃত্তি না করে যদি একটা গান করি আপত্তি হবে?

সবাই হৈ হৈ করে সমর্থন জানাল।

গান গাইবার আগে ব্যাগের ভেতর থেকে আমার উপহারের পেনটা বের করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, তোমার জন্মদিনকে স্মরণ করে এই কলমটা এনেছি।

সুনন্দ কলমটা চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, এ যে পার্কার! স্বপ্নের কলম। পেলে কোথায়?

বললাম, আমার সঞ্চয়ে বহু দিন থেকে রাখা ছিল। এত ভারী কলম আমার কাজে লাগবে না, তোমার কাজে লাগতে পারে তাই আনলাম।

সবাই কলমটা নিয়ে দেখতে লাগল। শুক্লা বলল, আমরা কিন্তু গানের কথা ভুলিনি।

কার্পেটের ওপর বসে আমি গান ধরলাম ঃ

'তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে গোপনে গো
ফুলের গন্ধে, বাঁশির গানে, মর্মর মুখরিত পবনে।
তুমি কিছু নিয়ে যাও বেদনা হতে বেদনে
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন, যে বাণী নীরব নয়নে।।'

ওরা গানের শেষে সম্ভবত কলরব করে তারিফ করছিল! কিন্তু আমার সমস্ত মন তখন বেদনার ভারে ভেঙে পড়েছে। ওরা কি বলছে আমার কানে যাচ্ছে না। বাইরের আগল বন্ধ করে ভাঙা মন অঝোরে অশ্রুপাত করে চলেছে।

মাসীমার গলা শুনে চমকে উঠলাম। শুক্লা আর বেতসীকে সম্ভবত তিনি ভেতরে ডাকছেন। আমি নিজের আবেগকে কঠিন শাসনে সংযত করলাম।

বেতসীরা ভেতর থেকে খাবারের প্লেট এনে বারান্দার গোল টেবিলের ওপর সাজাতে লাগল। সুনন্দ সবাইকে তাড়া দিল বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসার জন্যে।

আমরা সবাই এবার খাবার আসরে যোগ দিলাম। সুনন্দের মা অনেক কিছু তৈরি করেছেন। সবাই খেতে খেতে প্রশংসা করছিল। তিনি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের খাওয়া লক্ষ্য করছিলেন।

হঠাৎ এগিয়ে এসে দুটো ডালপুরী আর আলুর দম আমার প্লেটে দিয়ে বললেন, খাও তো। তুমি দেখছি কিছুই খাচ্ছ না, সবই প্লেট থেকে সরিয়ে রেখেছ।

ওঁর কাছে দুর্বলতা প্রকাশ করার মানেই হল আমার হার। আমি হেসে বললাম, আমার অনেক রাতে খাবার অভ্যেস মাসীমা, তাই সরিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু আপনার রান্না এত ভাল হয়েছে যে আপনি নিজে না দিলেও আমি আবার প্লেট থেকে তুলে নিতাম।

রাত আটটার কাছাকাছি পরস্পরকে বিদায় জানিয়ে আমরা উঠলাম। আমি জানতাম সুনন্দ আমাকে এগিয়ে দিতে চাইবে, তাই আগে ভাগেই বেতসীকে সঙ্গী করলাম। এক গাড়িতেই আমরা উত্তর কলকাতার যাত্রী।

সুনন্দ যে আমার এই মতলবে খুশী হল না তা বুঝলাম, বিদায়ের সময় ওর হাত নাড়া দেখে। ওর মুখে একটিও কথা ছিল না।

ছয়

সারাদিন মন বসল না মিউজিয়ামের কাজে। পাগলের মত শুধু এ ঘর ও ঘর পায়চারি করতে লাগলাম।

শেষবেলায় আর্ট গ্যালারীতে ঢুকলাম। বারবার দেখা মূর্তিগুলো আমার কাছে নতুন তাৎপর্য নিয়ে এলো।

ঐ তো সেনশৈলীর ভাস্কর্য-নিদর্শন—শিখিবাহন কার্তিকেয়। ময়ূরের ওপর আরোহনের কি অপূর্ব ভঙ্গিমা! কতক্ষণ চেয়ে রইলাম দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র পৌরুষদীপ্ত মূর্তির দিকে। আশ্চর্য! ভাস্কর বসে রয়েছে মূর্তির পাদদেশে। দেখছেন নিজের সৃষ্টিকে।

আমি এগিয়ে গেলাম। শিল্পীর কাছে প্রশ্ন করলাম, তোমার মনের কি ভাবনা দিয়ে তুমি গড়েছ এই অপূর্ব মূর্তি?

শিল্পী বলল, শক্তির ভাবনা দিয়ে।

ওদিকে অভয়মুদ্রায় বসে রয়েছেন—বুদ্ধ। গুপ্তযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য-নিদর্শন। সেখানেও বুদ্ধের পদতলে বসে রয়েছেন শিল্পী। ঠিক যেন ধ্যানাসনে তথাগত যোগী।

কাছে গিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি ভাবনায় তুমি এই তথাগত-মূর্তি নির্মাণ করেছ শিল্পী?

ভক্তির ভাবনায়।

আমি পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালাম খাজুরাহোর সেই জগৎ বিখ্যাত ভাস্কর্য 'পত্রলেখা' মূর্তিটির কাছে। ওষ্ঠের প্রান্তে প্রিয়-চিন্তার সুমিষ্ট হাসিটুকু লেগে আছে। বাম করে ধরে রেখেছে লিখনপত্র, দক্ষিণ করে লেখনী।

পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে শিল্পী। নিজেই যেন প্রস্তরে খোদিত। অপূর্ব যৌবনদীপ্ত মূর্তি। স্বপ্নময় দৃষ্টি। বললাম, ভাস্কর, কি প্রেরণায় তুমি এ অনিন্দ্য মূর্তি নির্মাণ করেছ?

ভালবাসার প্রেরণায়।

ধীরে ধীরে আমার চোখের সামনে অবিস্মরণীয় এক কাহিনী অভিনীত হতে লাগল।

কতক্ষণ আমি আর্ট গ্যালারীতে সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম মনে নেই, হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল, নসীম! নসীম!

আমি ফিরে দাঁড়ালাম। সুনন্দ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ঠিক যেন সেই শিল্পীর মূর্তি। বলল, তোমাকে তোমার ঘরে না পেয়ে এখানে এলাম। কতক্ষণ তোমার পেছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। কি দেখছিলে এমন তন্ময় হয়ে?

পত্রলেখার মূর্তির দিকে সুনন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। বললাম, এর একটা কাহিনী এইমাত্র জেনেছি। শুনবে?

অবশ্যই শুনব।

বললাম, একটু পাশাপাশি হাঁটতে ইচ্ছে করছে সুনন্দ। চল, গঙ্গার দিকে যাই।

আমরা মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে গঙ্গার দিকে হেঁটে চললাম। সেই প্রথম যেদিন দুজন বেরিয়েছিলাম, যে পথ দিয়ে হেঁটেছিলাম, ঠিক সেই পথ ধরে হেঁটে চললাম।

হাঁটতে হাঁটতে সুনন্দ বলল, আমার জন্মদিনে একটিও কথা না বলে চলে এলে কেন?

সবার সামনে কি তেমন করে বিদায় নেওয়া যায় সুনন্দ? তোমার আমার যা একান্ত কথা সে তো সবার সামনে বলার নয়।

তা আমি অস্বীকার করি না নসীম। কিন্তু এত বড় একটা অন্যায় আঘাতকে বুকে বয়ে নিয়ে তুমি হাসি মুখে কি করে চলে আসতে পারলে?

চমকে উঠলাম আমি! তাহলে কি জন্মদিনের সমস্ত ঘটনা সুনন্দের জানা হয়ে গেছে। কাতর গলায় বললাম, এ বিষয়ে এই মুহূর্তে আমাকে কোন প্রশ্ন কোরো না সুনন্দ।

আমরা চৌরঙ্গীর ভীড় কাটিয়ে গুরু নানক রোড ধরলাম। লক্ষ্য করলাম, জন্মদিনের প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ায় ও বিষণ্ণ মনে মুখ নীচু করে পথ হাঁটছে। আমি ওর হাত ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে ও-ও আমার হাত চেপে ধরে চলতে লাগল। আমার মনে হল ও যেন বলিষ্ঠ এক শিশু। আমার ওপর তার দাবীটুকু পুরোপুরি আদায় করে নিতে চায়।

কারো মুখে কোন কথা নেই। এক সময় বললাম, গল্পটা এখানেই শুরু করি?

আমি শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি নসীম।

খৃস্ট তখনও আবির্ভূত হননি। আনুমানিক খৃস্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে মধ্যাবারতে একটি মন্দির নির্মাণের কাজ চলছিল।

মন্দিরের কাজ চলছে, এমন সময় বৃদ্ধ প্রধান ভাস্করের মৃত্যু ঘটল। কিন্তু কাজ তো থেমে থাকতে পারে না, তাই মহারাজ আব পুরোহিতের পরামর্শে নিপুণ এক শিল্পী প্রধান ভাস্করের পদ লাভ করল। শিল্পী অনিন্দ্যসুন্দর এক যুবক। নাম দেবদীর্ণ।

মহারাজ দেবদীর্ণকে বললেন, তোমাব অবয়ব সুন্দর, তোমার কর্ম সুন্দর, তুমি দ্রুততার সঙ্গে নির্মাণ কার্য শেষ করতে পারলে পুরস্কৃত হবে।

দেবদীর্ণ মহারাজকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানিয়ে বলল, চেষ্টার ত্রুটি হবে না মহারাজ। তবে শিল্পসৃষ্টি সাধনার বস্তু। মন্দির প্রবেশের যে কাল আপনারা স্থির করেছেন তার ভেতর আমি সম্মুখভাগ সমাপ্ত করে দেব। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়ে যাক। ধীরে ধীরে আমি পার্শ্ব ও পশ্চাতের কাজগুলি করব।

রাজি হলেন মহারাজ। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই দর্শনীয় সৌন্দর্য নিয়ে গড়ে উঠল মন্দিরের সম্মুখভাগ এবং বিগ্রহও যথাকালে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার রাত্রে মন্দিরের নাটমন্ডপে উৎসবের আয়োজন ছিল। সে উৎসবে সাধারণের প্রবেশের অধিকার ছিল না। মহারাজ, রাজপুরোহিত এবং আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিল প্রধান ভাস্কর দেবদীর্ণ।

রীতি অনুযায়ী দেবদাসী নিযুক্ত হয়েছে নতুন মন্দিরে। বিগ্রহের আভরণ আর আবরণ রচনার ভার তার। মন্দির সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান থেকে পুষ্প সংগ্রহ করে মাল্যরচনা করা তার নিত্যব্রত। উৎসব রজনীতে সে অনন্যা।

নর্তকী বেশে সুসজ্জিতা দেবদাসী মঞ্চে প্রবেশ করে প্রদক্ষিণ করল মন্ডপের মাঝখানে রক্ষিত প্রদীপ। নৃত্যের ভঙ্গিমায় প্রদীপ হাতে তুলে নিয়ে আরতি শুরু করল। সমস্ত দেহ মন যেন একটি প্রণাম হয়ে নিবেদিত হচ্ছে দেবতার চরণে।

পূজা শেষে শুরু হল তার নৃত্যকলা প্রদর্শন। একছড়া মল্লিকার মালা যেন ভেসে চলেছে নর্মদার আঁকা-বাঁকা স্রোত-ধারায়। কত বিভঙ্গ সে মালার। সরল রেখায়, বক্র রেখায়, অর্ধবৃত্তাকারে, পূর্ণ বৃত্তে ভেসে চলেছে সে।

ক্ষণে ক্ষণে বাহবা দিচ্ছেন মহারাজ। রাজপুরোহিতও যোগ দিচ্ছেন সে সাধুবাদে! কিন্তু স্থির হয়ে বসে রয়েছে ভাস্কর দেবদীর্ণ। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। মনে হচ্ছে, এই অনন্যা নর্তকী তার ধ্যানের প্রতিমা। প্রতিটি মুদ্রা, হাসি অশ্রুর প্রতিটি অভিনয়, কম্পন, আলোড়িত করে দিয়ে যাচ্ছে তার চিত্ত।

দেবদাসী সুতনুকার দৃষ্টিও ক্ষণে ক্ষণে এসে আছড়ে পড়ছে দেবদীর্ণের যৌবনদীপ্ত দেহশ্রীর ওপর। এমন সৌষ্ঠব, এমন স্নিগ্ধ অথচ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সে তার এই অষ্টাদশ বসন্তে দেখেছে বলে মনে পড়ে না। সুতনুকার মনে হচ্ছে, এই সেই প্রার্থিত পুরুষ যাকে সে জন্মজন্মান্তরে প্রার্থনা করে এসেছে। মনে হচ্ছে তার দেহ মনের প্রস্ফুটিত কুসুমগুলি দিয়ে মাল্য রচনা করে সে পরিয়ে দিয়ে আসবে এই তরুণ

ভাস্করের গলায়। আবার যখন মনে পড়ছে সে দেবদাসী, দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত, সংসার বন্ধন তার জন্য নয় তখন ঝড়ের আঘাতে আহত কপোতীর মত মূর্ছিত হয়ে পড়ছে।

নৃত্যের আসর শেষ হল। সভাও ভঙ্গ হল। কিন্তু দুই শিল্পীর হৃদয় অলক্ষ্য এক বন্ধন সূত্রে বাঁধা পড়ে গেল।

দেবদীর্ণের সমস্ত চেতনা জুড়ে তখন সৃষ্টির প্রেরণা। তার নারী মূর্তিগুলি রূপান্তরিত হতে লাগল সুতনুকার দেহভঙ্গিমায়। কখনও দেবদীর্ণ মন্দিরের উচ্চ অবস্থানে বসে দেখতে পায় সুতনুকাকে। অদূরে বৃক্ষ-লতা-গুল্মে আচ্ছাদিত দেবতার জন্য সংরক্ষিত পুষ্করিণী থেকে স্নান শেষে ফিরে আসছে মূর্তিমতী ঊষার মত। কখনও মন্দির অভ্যন্তরে শোনা যায় তার অনুশীলন রত চঞ্চল চরণের নূপুর ধ্বনি।

কালযাত্রায় একদিন শেষ হল দেবদীর্ণের মন্দির রচনার কাজ। প্রতিশ্রুতি মত মহারাজ দেবদীর্ণকে ডেকে বললেন, শিল্পী, আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার অপূর্ব কর্মদক্ষতায়। আমার রাজকোষ উন্মুক্ত করে দিচ্ছি। তোমার যা ইচ্ছা গ্রহণ কর।

দেবদীর্ণ সবিনয়ে বলল, মহারাজ, অধিক সম্পদ শিল্পীর সৃষ্টির পক্ষে অন্তরায়। আমি কেবলমাত্র আমার পারিশ্রমিক লাভ করেই সন্তুষ্ট। বিদায় নিয়ে যাবার আগে অনুমতি দিলে আমি আর একবার দেবদাসীর নৃত্যানুষ্ঠান দেখে যেতে চাই।

মহারাজ দেবদীর্ণের ওপর অত্যন্ত তুষ্ট ছিলেন। তিনি শিল্পীর সম্মানে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন। সে নৃত্যবাসরে সুতনুকা নিবেদন করল তার সর্বশ্রেষ্ঠ নৃত্য।

দীর্ঘ নৃত্যানুষ্ঠানের শেষে আত্মনিবেদনের ভঙ্গীতে মঞ্চের ওপর ভেঙে পড়ল সুতনুকা। যেন দেবদীর্ণের বিদায় পথের ওপর লুটিয়ে পড়ল বিদীর্ণ-বক্ষ দেবদাসী।

ভগ্ন-হৃদয় দেবদীর্ণ মহারাজ ও পুরোহিত শ্রেষ্ঠের সঙ্গে বেরিয়ে এলো নাটমন্ডপ থেকে। আর মুহূর্তকাল সে অপেক্ষা করল না। সুতনুকার স্মৃতি বুকে নিয়ে সে চলে গেল রামগড়ে। পাহাড়ের ওপর বনস্থলী, লোকালয় থেকে দূরে। নির্জনতা সেখানে বিরাজ করছে চারদিকে শান্তি বিতরণ করে। সেখানে পর্বত সংলগ্ন যোগীমারা নামের গুহাটি পরম প্রার্থিত এক শান্তিনিকেতন।

অদূরে বিশীর্ণা নদী বর্ণাশা। এ নদী যাত্রাপথে স্রোতধারার মিলনে পরিপুষ্ট হয়ে বয়ে গেছে বহু দূরে অবস্থিত দেবদীর্ণের গ্রাম প্রান্ত দিয়ে। ঐ বর্ণাশার কূলে এক পর্ণকুটিরেই তো সে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। কৈশোরেই পিতামাতা গত হলে আপনার বলতে কেউ ছিল না তার। শুধু সঙ্গী ছিল স্পর্শকাতর একটি হৃদয় আর আশ্চর্য রূপদর্শী দুটি চোখ। অল্পকালের ভেতরেই সে প্রতিষ্ঠা লাভ করল রূপদক্ষ হিসেবে।

দেবদীর্ণ মনে মনে স্থির করল এ মরদেহে সে আর কোন মূর্তি নির্মাণ করবে না। যে হাতে সে রচনা করেছে তার অন্তরবাসিনীর মূর্তি সে হাতে অন্য কিছু রচনা করতে গেলেই সে ব্যর্থ হয়ে যাবে। দেবদীর্ণের ধ্যান জুড়ে তখন বিরাজ করছে সুতনুকা।

কিন্তু সুতনুকা কি তাকে ভালবাসে? যে উন্মাদনায় সুতনুকাকে সে গ্রহণ করেছে তার অন্তরে সে উন্মাদনার সামান্য উত্তাপও কি তার জন্যে দেবদাসী সঞ্চিত রেখেছে তার হৃদয়ের গভীর গোপনে?

দীর্ঘকাল সুতনুকার কথা ভাবতে ভাবতে কেটে গেল দেবদীর্ণের স্বেচ্ছা-নির্বাসিত জীবন। কিন্তু শিল্পী নিশ্চিত হতে পারল না সুতনুকা সত্যিই তাকে ভালবাসে কি না। শেষে যখন অসক্ত হয়ে এলো দেহ তখন দেবদীর্ণ খোদিত করল একটি শিলালিপি। মহাকালের বুকে সে উৎকীর্ণ করে রেখে যেতে চাইল তার সংগোপন-লালিত ভালবাসাকে। যা এতকাল তার নশ্বর দেহে ধরা ছিল তাকেই সে অমরত্ব দানের চেষ্টা করল।

যোগীমারা গুহায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে লেখা রইল ঃ

'সুতনুক নম দেবদশিক্যি
সুতনুক নম দেবদশিক্যি
তং কময়িথ বলনশেয়ে
দেবদিন নম লুপদখে'

বর্ণাশা নদীতীরের জাতক যুবশ্রেষ্ঠ কুশল রূপদক্ষ দেবদীর্ণ সুতনুকা নামে দেবদাসীকে ভালবাসে।

সুনন্দ বলল, কিন্তু নসীম, দেবদীর্ণ তো সুতনুকার হৃদয়ের কথা জানতে পারল না।

বললাম, তোমরা তো জন্মান্তরে গভীর বিশ্বাসী। এবার শোন ভাস্কর দেবদীর্ণের আর এক জন্মের কাহিনী, সেখানে হয়তো তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে পারো।

চন্দেল্ল রাজারা রাজধানী খাজুরাহ নগরে এক বিশাল কারুকার্যময় মন্দির নির্মাণ করছিলেন। শত শত কুশল ভাস্কর নিযুক্ত ছিল মন্দির গাত্রের মূর্তি রচনার কাজে।

রাজপ্রাসাদ থেকে মহারাজ ঘোষণা করলেন, যে মূর্তি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে সে মূর্তির ভাস্কর দেশের সর্বোত্তম রূপদক্ষের সম্মান পাবেন।

যৌবনদীপ্ত কুশল ভাস্কর দেবদীর্ণ সারাদিনের শ্রান্তির শেষে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছিল। জাগ্রত অবস্থায় সে ক্রমাগত ভেবেছিল, এমন এক মূর্তির পরিকল্পনা আর রূপায়ণ তাকে করতে হবে যে মূর্তি কেবল রাজগৃহেই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে না, মহাকালের বুকে শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের স্বাক্ষর রেখে যাবে।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখা দিল সুতনুকা।

আমাকে চিনতে পারো শিল্পী?

দেবদীর্ণ বলল, তোমার জন্য আমি দ্বাদশ শতবর্ষ অপেক্ষা করছি দেবদাসী। আমার বুকে তোমার জন্য আজও অক্ষয় হয়ে আছে ভালবাসা। কিন্তু আমি জানতে পারিনি...

হেসে বলল সুতনুকা, দেবদাসী তোমাকে ভালবাসে কিনা?

ঠিক তাই।

সুতনুকা উত্তর দিল, না বাসলে যুগ যুগান্তরের পথ সন্ধান করে সে আসত না। যোগীমারা গুহায় সে দেখে এসেছে শিল্পীর একনিষ্ঠ ভালবাসার উৎকীর্ণ শপথ। আজ সেও এসেছে তার হৃদয়ের একনিষ্ঠ ভালবাসা জানাতে।

দেবদীর্ণ আকুল হয়ে বলল, আজ আমার জীবন পূর্ণ হল। বহু যুগের ওপার থেকে আমার ভালবাসার ধন এসেছে আমার ঘরে। আমার সব হাহাকারের আজ অবসান হল।

ভাস্কর?

বল সুতনুকা।

তুমি আমাকে বন্দী কর তোমার সৃষ্টির মধ্যে। আমার নতুন নামকরণ হোক্ 'পত্রলেখা'। আমি নিত্যকালের প্রেমিকের ভালবাসার উত্তর দেব আমার পত্রে—

'হে প্রিয়, আমি তোমাকে ভালবাসি। জন্মজন্মান্তরেও আমি তোমাকে ভালবেসে যাব। কেবল অনুরোধ, তুমি ভালবাসাকে লৌকিক জীবনের বাঁধনে বাঁধতে চেও না। ভালবাসা শুধু স্বীকার করে হৃদয়ের বন্ধন। আমি যেমন করে তোমাকে ভালবাসি, হে প্রিয়, তুমি কি তেমনি করে আমাকে ভালবাসবে?'

কাহিনী শেষ করে সুনন্দকে বললাম, এ শুধু কাহিনী নয় সুনন্দ—সুতনুকা, পত্রলেখার মত এ আরও একটি মেয়ের কথা, যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুনন্দ। সামাজিক অনুশাসনে যে সংসার গড়তে পারল না বলে একটুও দুঃখিত নয়। দুজনের ভালবাসাকে গভীর মর্যাদা দিয়ে, সব ক্ষয়ক্ষতির ওপরে যে তাকে তুলে ধরে অসীম আগ্রহ আর মমতায়।

সুনন্দ ওর হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিবিড় ভালবাসায় আমার হাত চেপে ধরল। আমরা দেখতে লাগলাম, গঙ্গা সমুদ্রের টানে বয়ে চলেছে। আকাশে একখণ্ড মেঘ মেতে উঠেছে ভাঙা-গড়ার খেলায়। শেষ সূর্যের সোনা হঠাৎ তাকে ভালবাসার ছোঁয়ায় হিরন্ময় করে দিল।

আশ্চর্য নরম হলুদ একটা আলো চরাচরের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। পথ অফুরান। আমরা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে হাঁটতে লাগলাম।

কাজরী

এক

একটু আগে জোর একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ভাঙা মেঘের ফাঁকে হলুদ ছোপান একটা ওড়না কে যেন উড়িয়ে এনে ফেলল পাশের নারকেল গাছের ভেজা পাতার ওপর। ঝিলমিল করে কেঁপে উঠল জলধোয়া সবুজ পাতার সারি।

সেদিকে চোখ পড়তেই কেন যেন গান শোনায় পেয়ে বসল আমাকে। আমাব চোখে চোখ পেতে বসেছিল কাজরী। বললাম, একটা গান শোনাবে?

কাজরী গুরুমশায়ের গলায় বলল, চুপ করে বসে থাক। এখন আমার গান গাইবার মুড নেই।

দ্বিতীয়বার ওকে অনুরোধ করলাম না। জানতাম, ওতে কাজ হবে না। কাজরী নিজের খেয়ালে ভেসে চলে। কূলে ফিরে আসা ওর ইচ্ছাধীন।

কিছু পরে ও আমার মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে এদিক ওদিক দুটো কালো ভোমরা ওড়াতে লাগল।

বললাম, কি দেখছিলে এতক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে?

ও আবার চোখ দুটো আমার ওপর রাখল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কতটা বাঁদর হয়েছ তাই দেখছিলাম।

ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল কাজরী। আমিও আর বসলাম না। অনেকক্ষণ পরীক্ষার পড়া পড়েছি, তারপর চুপচাপ বসে থেকেছি কতক্ষণ। এখন বাইরে অন্ততঃ ঘন্টাখানেক বেড়িয়ে বেড়াবার অধিকার অর্জন করতে পারা গেছে বলে মনে হল।

ঘরের বাইরে এসে কাজরীকে আর দেখতে পেলাম না। মনে হল ও পাশের ঘরে কোন কাজে ঢুকে পড়েছে।

ঠিক তাই। আমি বাগান পেরিয়ে বড় রাস্তার দিকে পা বাড়িয়েছি, অমনি পেছন থেকে ও হেঁকে বলল, পনের মিনিটের বেশী থাকতে পারব না কিন্তু, তার ভেতর ফিরে আসা চাই।

বাইরে আর না গিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। মুখে কিছু বললাম না।

কিছুক্ষণ পরে ও দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। আমার নড়বড়ে টেবিলের ওপর একটা কাপ বসিয়ে রেখে ওর নিজের কাপে দু'তিনবার চুমুক দিয়ে বলল, অমনি রাগ হয়ে গেল বুঝি?

বললাম, বাঁদরদের রাগ হলেই আঁচড়-কামড় দেয়। সে রকম কিছু করেছি বলে কি মনে হচ্ছে?

ও ঝটপট জবাব দিলে, করনি, করতে কতক্ষণ। এই ডাক্তারি পড়ুয়া ছেলেগুলোর ওপর একতিল বিশ্বাস নেই।

বললাম, আর ডাক্তারী পড়ুয়া মেয়েগুলো সব গঙ্গা নেয়ে ক্লাসে ঢোকে, তাই না?

কাজরী চায়ের কাপে মুখ লাগিয়ে শেষটুকু গিলে ফেলে বলল, এখন ছেলে মেয়েদের নিয়ে ঝগড়া বাধাবার সময় নেই আমার। আদ্দেক ট্রেন আর আদ্দেক বাস ঠেঙিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। কে জানে ক'টায় পৌঁছে দেবে কৃপা করে।

কাজরী অ্যানাটমিখানা তুলে নিয়ে আবার বলল, না হয় ভাল ছেলেই হয়েছ, তা বলে প্রায় রোজ সেই বালিগঞ্জ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত একটা মেয়েকে দৌড় করাবে? আমার সংসার টংসার বলে কি

কিছু নেই?

বললাম, সংসারে তো তোমার থাকার মধ্যে একটিমাত্র প্রাণী। তাঁকে দেখাশোনা করছে আয়া। তোমার তো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ানোই কাজ।

কাজরী ধমকের সুরে বলল, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না পুষ্কর? মায়ের সেবায় মেয়ের হাত লাগে না, এটা মেয়ের পক্ষে কি খুব গৌরবের?

বললাম, তোমার মুখে যা শুনেছি তাই বললাম। একটি মেয়ের সব কথাকেই সত্যি বলে মেনে নিতে আমি অভ্যস্ত।

কাজরী অমনি বলল, আমার মুখে তো অনেক কথাই শুনেছিলে, কই সে সব কথা তো বেদবাক্য বলে মেনে নাওনি?

একটু অবাক হবার ভান করেই বললাম, কই কি কথা বল?

সঙ্গে সঙ্গে কাজরী বলল, কতদিন তো বলেছি, আমি তোমার চেয়ে দু'এক বছরের বড়ই হব, আমাকে দয়া করে ভালবেসো না। সত্যি বলে মেনে নিয়েছ কি আমার মুখের কথা?

বললাম, না।

ও বলল, কেন?

বললাম, তোমার 'না' বলায় তেমন জোর ছিল না বলে। যদি আমার ওপর তুমি রাগ করতে তাহলে এতবড় থান ইঁটের মত গ্রে সাহেবের অ্যানাটমিখানা বয়ে নিয়ে আসতে না এতদূর।

কাজরী বলল, ঠিক আছে, অনেক কিছু বুঝে ফেলেছ তুমি, এবার চলে যাচ্ছি। এরপর যখন দক্ষিণেশ্বরে আমাকে আর দেখবে না, তখন বুঝবে কথাটা মিথ্যে বলেনি তোমার সহপাঠিনী।

ও বাগান পেরিয়ে চলে যাচ্ছিল। চেঁচিয়ে বললাম, দোহাই কাজরী, পরীক্ষার সময় আমার সঙ্গে নন-কোঅপারেশন কোর না দয়া করে। মন খারাপ হলে মেজাজ বিগড়োবে, আর তার ফালে পরীক্ষার বারোটা বাজবে। আর তার ফলে........।

সঙ্গে সঙ্গে কাজরী যোগ করল, স্টাইপেন্ডটি কাটা যাবে।

একটু থেমে বলল কাজরী, তা বেশ হবে। তখন আমি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে এসে পুজো দিয়ে যাব।

বললাম, তোমার নিষ্ঠুরতার শেষ নেই কাজরী।

কাজরী চলে যেতে যেতে বলল, দেখা যাবে কে নিষ্ঠুর। এখনও দু'দুটো বছর ক্লাসরুমে একসঙ্গে কাটাতে হবে। ক্লাস পরীক্ষার বাইরেও অনেক পরীক্ষার সুযোগ রইল। তখন দেখব।

কাজরী চলে গেল। আমার আর বাইরে যেতে ইচ্ছে করল না। ভর সন্ধ্যেয় বিছানার ওপর চুপচাপ পড়ে রইলাম। জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, নারকেল গাছের পাতার ঝালর থেকে সেই সোনালী উত্তরীয়টা কখন কে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

কেউ আলো জ্বেলে দিয়ে গেল না আমার ঘরে। অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুধু ভাবতে লাগলাম কাজরীর কথা। শহর থেকে এতখানি দূরে একটা নির্জন বাগানাবাড়ীতে কেন আসে কাজরী? কেন সে প্রফেসারদের বাড়িতে পড়া বুঝে না নিতে গিয়ে আমার কাছে চলে আসে! কাজরীর ফিগার, তার চোখ মুখের এক্সপ্রেশান যে কোন পুরুষের কাছে দারুণ রকম একসাইটিং। প্রফেসাররা কাজরীর ওপর কিছু পক্ষপাতিত্ব দেখান। সেটা কাজরীর দিকে তাকিয়ে ছেলেরা স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু কাজরী ঐ সুযোগগুলো কাজে লাগায় না কেন? ডাক্তার তরফদার ওর বাড়ির দুটো গলির পরেই থাকেন। নামডাক আছে। আর কাজরীকেও যখন তখন ডেকে পাঠান ছোটখাট কাজে অকাজে। কাজরী কেন তাঁর কাছে পড়ার পুরোপুরি সুযোগটুকু আদায় করে না নিয়ে পালিয়ে আসে দক্ষিণেশ্বরে? আমার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এই শরীরটাই কি ওর একমাত্র আকর্ষণের বস্তু না আর কিছু? স্কলারশিপ হোল্ডার? সে তো দীপাংশু চৌধুরীও রয়েছে। দীপাংশু নানা ছলে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে কাজরীর সঙ্গে। তবু কেন কাজরী সবাইকে এড়িয়ে, বালিগঞ্জ থেকে দক্ষিণেশ্বরে এত ধকল সয়ে আসে আমার কাছে? সে কি শুধু অন্যাটমি পড়ার জন্যে?

ও কখনো ওর মনটাকে বাইরে মেলে ধরে না। ওকে ভালবাসার কথা বললেই ও স্পর্শকাতর শামুকের মত মুহূর্তে নিজের ভেতর নিজেকে গোপন করে ফেলে। ও কিছুতেই কারো কাছে সহজে

ধরা দিতে চায় না। ও কি সবার কাছে দুর্লভ হয়েই থাকতে চায়! এতেই কি ওর তৃপ্তি!

নিজের মনকেই বোধহয় ঠিক ঠিক চিনে উঠতে পারেনি কাজরী। প্রথম পরিচয়ের দিনটিতেও ঐ একই ছবি। কলেজ স্কোয়ারের পাশে বাস টার্মিনাসে দাঁড়িয়েছিল। রোববার। 'কি ছিল বিধাতার মনে'—দুজনের দেখা হয়ে গেল। কাজরী হাসল। আমিও। এক ক্লাসের পড়ুয়াদের হাসি বিনিময়ের অলিখিত অধিকার আছে। উল্টো দিকের ফুটপাথ থেকে রাস্তা ক্রস করে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কাজরী বলল, কোথায় যাচ্ছ?

একই ক্লাসে পড়ি, তবু কথা বলা হয়ে ওঠেনি কোনদিন। কাজরী কিন্তু প্রথমেই সম্মানসূচক ডাকগুলোকে সহজভাবেই ছাঁটাই করল।

আমিও ওর শেখান ভাষাতেই কথা বললাম, এই অকারণ ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুমি যাচ্ছ কোথা? রোববারের কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে নাকি?

কাজরী বলল, বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছিলাম। এলিটে 'ফ্রেন্ডস' চলছে। হাউসফুল। টিকিট পেলাম না। তাই ভাবলাম, এতদূর যখন এসে পড়েছি তখন কলেজটা একবার ঘুরে যাই। পেশেন্ট এসেছে, দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

বললাম, কাজ শেষ হয়েছে?

কাজরী মাথা নাড়ল।

বললাম, যাবে নাকি আর একবার এলিটে?

কাজরী চোখ বড় বড় করে বলল, আবার সেখানে কেন? সব টিকিট সোল্ড আউট।

জোর দিয়ে বললাম, আমি ট্রাই-ট্রাই-ট্রাই এগেনে বিশ্বাসী। উল্টো পথে তো যাচ্ছ না। না পেলে বালিগঞ্জের ট্রামে তুলে দেব।

ও বলল, ম্যাটিনী শো'র অনেক দেরী। চল, হেঁটেই যাই।

বললাম, সেনট্রাল অ্যাভিনিউ হয়ে চল।

ও বলল, না, সোজাই যাব।

একটু অবাক্ হয়েছি সেদিন। বৌবাজার, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, এস-এন-ব্যানার্জি রোড আর যাই হোক প্রথম পরিচিত দুটি যুবক-যুবতীর হাঁটার পক্ষে নিশ্চয় একটা বাঞ্ছিত রাস্তা নয়। তবু কাজরীর ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে ঐ পথেই হাঁটতে হল।

পথে চলতে চলতে আমরা গাড়ির মিছিল থেকে গা বাঁচাচ্ছিলাম। কখনও হর্নের আওয়াজে পেছনে তাকিয়ে, কখনও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওরই ভেতর কথা হচ্ছিল।

বললাম, আমাদের চলার পথে ঘন ঘন যারা হর্ন দিচ্ছে, তারা কিন্তু দারুণ রকম বিরক্ত হচ্ছে আনাড়ী দুজন পথচারীর ওপর।

কাজরী বলল, কাউকে রাগিয়ে দিতে পারলেই তো মজা। ভেবে দেখ, ঐ ড্রাইভার সারাটা দিন ইঞ্জিনের গরমে তেতে পুড়ে মেজাজ গরম করে বসে আছে। তার ফলে আমাদের মত বেয়াড়া পথচারী দেখলেই খিস্তির খই ফোটাচ্ছে। ওতেই কিন্তু ওর রাগ, আবার ওতেই ওর রাগের উপশম।

বললাম, দারুণ খেয়ালী তো তুমি।

ও অন্য কথা তুলল, কোথায় থাক পুষ্কর?

বললাম, শহর থেকে অনেকখানি দূরে, দক্ষিণেশ্বরের একটা বাগানবাড়িতে।

বাপঠাকুর্দার সম্পত্তি নিশ্চয়ই।

বললাম, না, এক বিজনেসম্যানের। কেরালায় আমাদের একটা কয়ার ইন্ডাস্ট্রি আছে। ওখান থেকে ওরা কলকাতার মার্কেটে কয়ার আমদানী করে। সেই সূত্রে আমি ওদের একটা নির্জন বাগানবাড়িতে থাকার সুযোগ পেয়েছি।

কাজরী বলল, এখানে তোমার নিজের কেউ নেই?

বললাম, না। আমি যখন সাত আট বছরের তখন মা মারা যান। বর্ধমানে মাসীর বাড়িতে কেটেছে স্কুল লাইফ। কলেজ লাইফ কাটছে দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়িতে।

কাজরী বলল, বাবা কি কেরালাতেই থাকেন?

বললাম, থাকতেন। কিন্তু বছর দুই হল মারা গেছেন।

কাজরী বলল, তাহলে ইণ্ডাস্ট্রির কি হল?

বললাম, আমাদের ম্যানেজার এখন পার্টনার হয়েছেন। অতি সৎ লোক। তিনিই দেখাশোনা করেন। প্রয়োজনীয় অর্থ পাঠান।

কাজরী চলতে চলতেই তার ব্যাগ খুলে দুটো টোপা কুলের মত গুলি বের করে আমার হাতে একটা দিলে, অন্যাটা মুখে পুরল।

বললাম, কি বস্তু?

কাজরী সিক্রেটটা ভাঙল না। বলল, মুখে ফেলে দেখই না। ভয় নেই, বিষটিস নয়।

মুখে ফেলে টকটক মিষ্টি মিষ্টি একটা স্বাদ পেলাম।

ও আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, কি—কেমন লাগছে?

বললাম, হজমি টজমি কিছু একটা হবে মনে হচ্ছে।

কাজরী খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, ঠিক ধরেছ। এখন বল তো এটা কিসের হজমি?

বললাম, আমি বড় একটা হজমি-বিশারদ নই।

কাজরী যেন এই প্রথম একটি মনুষ্যদেহধারীকে তার সামনে দেখল, যে হজমি সম্বন্ধে নিরাসক্ত।

সে এক ঝলক হাওয়া শরীরের ভেতর টেনে নিয়ে বিস্ময়সূচক একটি শব্দ করল। তারপর বলল, জান, একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান বেঁচে আছে এই হজমির দৌলতে।

বললাম, কি রকম?

ও সিরিয়াসলি বলল জৈন শিল্প মন্দিরের নাম শোননি? যে কোন মেলায় দেখতে পাবে ওদের স্টল। সারি সারি হজমির শিশি বসে আছে। হাজার হাজার শিশি বিক্রি হচ্ছে।

বললাম, দেখেছি। কিন্তু চেখে দেখার সুযোগ হয়নি।

কাজরী বলল, আমার মা হজমির উপকারিতায় বিশ্বাসী। জৈন শিল্পমন্দিরের হজমি গুলি আনিয়ে রাখেন ঘরে। খাবার পরে দু'একটা গুলি খান। আর আমি মুঠো মুঠো খেয়ে ফেলি। কত রকমের হজমি আছে জান? ছোট বড় হাজার রকমের গুলি।

হেসে বললাম, ডাক্তারি পাশ করার পর হজমির ওপর রিসার্চ করে পেপার তৈরী কোর। ঐ ধরনের বড় প্রতিষ্ঠানে সি. এম. ও. হয়ে যাবে।

কাজরী বলল, এ হজমিটা আনারের।

আমরা বৌবাজারের মোড় পেরিয়ে চলছিলাম। ডানদিকে ভীমনাগ দেখে বললাম, আগেভাগে তোমার হজমি খেয়ে খিদে পেয়ে গেছে। এখন এসো কিছু খাওয়া যাক্।

কাজরী বলল, মিষ্টি ফিষ্টি রাখ, পথে চৌরঙ্গী থেকে ডালমুট কিনে নেব। সিনেমার সঙ্গে একটু বেশী ঝালঝাল ডালমুট নইলে জমবেই না।

সিনেমা হলের কাছেপিঠে একটা পানের দোকানে সবচেয়ে বেশী দামের দুটো পান কিনলাম। কাজরীর হাতে একটা দিয়ে দোকানদারের দিকে পেছন ফিরে যাতে শুনতে পায় এমন গলায় বললাম, সারা কলকাতা চুঁড়ে অনেক পান তো খেয়েছ কাজরী, কিন্তু এ দোকানের পান খেলে আবার তোমাকে এখানে আসতে হবে।

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার পেছন থেকে পানওলার দুটো চোখ সুন্দর দেহের অধিকারিণী কাজরীর ওপর গিয়ে পড়েছে।

এবার কাজরীকে বললাম, চল যাই, হলে টিকিট পাওয়া যায় কিনা দেখি।

পানওলা সঙ্গে সঙ্গে বলল, হাউস ফুল। টিকিট পাবেন না কাউন্টারে।

বোঁ করে তার দিকে ফিরে দারুণ হতাশ গলায় বললাম, সে কি! টিকিট পাওয়া যাবে না?

পানওলা বলল, মারদাঙ্গা বই, অনেক আগেই টিকিট ফুরিয়ে গেছে।

হতাশায় ভেঙে পড়ে কাজরীর দিকে তাকিয়ে বললাম, চল এখন ফেরা যাক্। রোববার টিকিট পাওয়া যাবে না। কতবার করে বললাম, কথা তো শুনলে না।

কাজরীর চোখে মুখে আশাভঙ্গের ছবি ফুটল। সে তার নিটোল গালখানা একটা হাতের পাতায়

চেপে ধরল।

কাজ হল। পানওলা বলল, কিছু বেশী দিতে পারবেন? চেষ্টা করে দেখতে পারি।

চোখে কৃতজ্ঞতার ছবি ফুটিয়ে বললাম, দেখুন না ভাই চেষ্টা করে।

পানওলা সেদিন সামান্য চেষ্টাতেই আমাদের হাতে দুটো টিকিট ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, অসুবিধেয় পড়লে আসবেন, চেষ্টা করে দেখব।

আমি আর কাজরী বার বার সেদিন সেই পানওলাকে যুগ যুগ জিও বলে মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম।

হলের আলো নিভলে কাজরী প্রায়ান্ধকারে আমার হাতখানা ধরলে প্রথমটা আমি শিউরে উঠলাম। পরে ও হাতের মুঠোয় খানিকটা ডালমুট ভরে দিল।

কিছুক্ষণ বাদে বাদে ঐ একই আইটেম রিপিট করতে লাগল।

চুপি চুপি বললাম, তুমি খাও এবার, অনেক দিয়েছ।

ও শেষবার জোরে আমার হাতখানা চেপে ধরে ডালমুট খানিকটা ঢেলে দিয়ে বলল, এই শেষ, আর পাবে না।

তখন নিউজ রীলে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের একটা ছবি দেখাচ্ছিল। এক মহিলা ডাক্তার অনেকগুলি অজ্ঞ গ্রাম্য মেয়েকে প্রয়োজনীয় সদুপদেশ বিতরণ করে চলেছিলেন।

কাজরী ডালমুট চিবোতে চিবোতে থেমে গিয়ে বলল, পাশ করার পর আমারও দেখছি এই হালই হবে।

বললাম, ওটি কিন্তু আমাদের মহান দেশের মঙ্গলকর্ম। একে আমাদের ব্রত হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত।

হঠাৎ কাজরী আমার হাতের ওপর আলতো করে চাপড় মেরে বলল, থাম তো এখন দেশসেবক। ছবি দেখার মুডটা আর নষ্ট করে দিও না।

ছবির টাইটেল শুরু হয়ে গেছে। আমরা কথা বন্ধ করে ছবি দেখায় নিবিষ্ট হলাম।

'ফ্রেন্ডস্' দারুণ মিষ্টি ছবি। প্রথম থেকেই জমে গেছে। টিন্ এজের দুটো ছেলেমেয়ে একটা নির্জন খামার বাড়িতে পালিয়ে এসে সংসার পেতেছে। মজার ঘটনার ভেতর দিয়ে তাদের কিশোর দুটো মন জীবনের কতকগুলো বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হচ্ছে। শেষে চরম একটা সত্যের সঙ্গে পরিচয় হল তাদের। মেয়েটি মা হল। জনহীন খামারবাড়িতেই ভূমিষ্ঠ হল তাদের সন্তান। চারিদিকে প্রকৃতির আশ্চর্য সব ছবির মাঝে এ যেন জীবনের আর এক ছবি!

হঠাৎ এক সময় অনুভব করলাম, কাজরী আমার হাতখানা চেপে ধরেছে।

ওকে সেই আলো আঁধারের ভেতর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু একবারও সে আমার দিকে তার চোখ ফেরাল না। দেখলাম গভীর আগ্রহ নিয়ে কাজরী ছবির পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি টুকরো কোন কথা বলে ওর নিবিষ্টতাকে ভাঙলাম না। আমার আর একখানা হাত ওর ঐ হাতের ওপর রাখতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু তা আমি করলাম না।

ছবি শেষ হল। আলো জ্বলল। কাজরী তার হাতখানা সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। হল থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম কোন কথা না বলে।

আলোর জগৎ। গাড়ি চলছিল হর্ন বাজিয়ে। চৌরঙ্গীর দিকে যেতে যেতে দু'একবার তাকালাম কাজরীর দিকে। কাজরী কিন্তু অন্যমনস্ক। সামনের পথে চোখ রেখে বোধহয় ছবির কথা ভাবতে ভাবতেই চলছিল।

চৌরঙ্গীর রাস্তায় পৌছে বললাম, আকাশে আলো আছে কাজরী। ভিক্টোরিয়ায় একটু বসবে? গঙ্গার ধারে যাওয়া যায়।

ও অদ্ভুত চোখে আমার দিকে চেয়ে মুরুব্বি গলায় বলল, সন্ধ্যেটা আজেবাজে গল্পে মাথা গরম না করে ঠাণ্ডা মাথায় বই-এর পাতা খুলে বস, অনেক বেশী লাভ হবে।

খুব রাগ হল ওর কথায়, তবু কিছু বলতে পারলাম না।

ও দূরে একটা ট্রাম আসতে দেখে বলল, ঐ আমার ট্রাম আসছে, চললাম।

রাস্তা পার হয়ে গেল কাজরী। আমি মনে মনে কিছুটা বিষণ্ণ আর বেশ খানিক ক্ষুব্ধ হয়ে উত্তর মুখে ফুটপাথ ধরে হেঁটে চললাম।

পেছনে কাজরীর গলা বলে মনে হতেই ফিরে দাঁড়ালাম। ও আমার দিকে দ্রুত পা চালিয়ে আসছে।

কাছে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, বাব্বা, যেন দিগ্বিজয়ে চলেছ, একটু আস্তে চলতে পার না?

বললাম, ট্রাম ছেড়ে দিল যে? বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে না?

ও তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, যাক্‌গে যাক্। এখন বল দেখি তোমার বাগানবাড়ির নিশানাটা।

আমার সব ক্ষোভ মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। বললাম, তুমি কি কোনদিন সেখানে যাবে কাজরী?

ও বলল, তুমি কি আমার ট্রাম-বাস সব ক'টাই ফেল করাবে নাকি? চটপট ঠিকানাটা বল। পথের ডাইরেক্‌শনটাও দয়া করে দিয়ে দাও। যাবার কথা পরে ভাবা যাবে।

কাজরী যা চায় তাই করলাম। ঠিকানাটা নিয়ে ও পাশের স্টপেজে দাঁড়ান একটা ২বি বাসের দিকে দ্রুত পা চালাল। আমি ওর কথা ভাবতে ভাবতে ফুটপাথ ধরে আবার হাঁটতে লাগলাম। কাজরী সিনেমা দেখতে দেখতে আমার হাতটা যে চেপে ধরেছিল সেটা কি আমার ওপর ওর প্রচ্ছন্ন ভালবাসার প্রতিক্রিয়া? না, ছবির নায়িকার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওর এই সাময়িক ভাবান্তর?

সেদিন অনেক ভেবেও নিশ্চিত কোন সমাধানে আসতে পারলাম না। তবে ওর খামখেয়ালী আচরণ থেকে মনে হল, ও যা করে তা ওর গভীর কোন চিন্তার ফল নাও হতে পারে। হয়তো সবটুকুই ওর খেয়ালখুশির খেলা।

কাজরীর কথা যে মিছিল করে আসছে মনের ভেতর। সেই প্রথম দিনের দেখার পর সাত সাতটা দিন কলেজে ওর সঙ্গে ক্লাস করলাম, কিন্তু ও যে আমাকে চেনে, আভাস ইঙ্গিতে তা বোঝা গেল না।

আমি মনে মনে দমে গেলাম প্রথমটা। তারপর দারুণ রকম আত্মসচেতন হয়ে উঠলাম। কাজরীর সঙ্গে ঐ একটি ছুটির দিনে পথ হাঁটা আর সিনেমা দেখার ব্যাপারটা মনের থেকে জোর করে ঝেড়ে মুছে ফেললাম।

পরের রোববার বেড়িয়ে যখন বাগানবাড়িতে ফিরলাম তখন বাগানের দরোয়ান-কাম কুক মথুরাদা আমার ওপর রাগ করেই কয়েকটা বাণী শোনাল।

বাবুসাহেব, সারা দিনভর তুমি তো ঘুম্‌তে আছ। এদিকে একটা দিদিমণি আসিয়েছিল। হামার সাথ বহুত বাতচিত কোরিয়ে চলিয়ে গেলো।

অবাক্ হলাম। আমার এখানে চেনাজানা কোন আত্মীয়ার তো আসা যাওয়া নেই। ছুটিছাটা পড়লে আমিই ছুটি একমাত্র আত্মীয়া মাসীর বাড়ি বর্ধমান।

মথুরাদা এবার বলল, ঘরমে দেখো বাবুসাহেব, এক্‌ঠো চিঠ্‌ঠি ভি রাখিয়ে গেলো।

ঘরে ঢুকে দিনের আবছা আলোয় চিঠি ফিঠি কিছু নজরে পড়ল না।

আলো জ্বালালাম। বুক সেল্‌ফের ওর রাখা মেডিক্যাল কলেজ ম্যাগাজিনটা নজরে পড়ল। তার ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছিল একটুকরো কাগজ।

কাগজটা টেনে নিয়ে নীচের সইটাতে চোখ বুলিয়ে নিলাম।

কাজরীর লেখা। কোন সম্বোধন ছাড়াই সে লিখেছে :

খুব বেড়িয়ে বেড়ানো হচ্ছে একা একা। আমি যে বালিগঞ্জ থেকে এতটা পথ এসে ফিরে গেলাম, তার কি হবে মশাই? ভাগ্যিস মথুরাদা ছিল। তাই অন্ততঃ এক কাপ চা আর দুটো মিইয়ে যাওয়া ক্রিম ক্র্যাকার জুটল। নইলে এতটা পথ ফিরতেই পারতাম না। বেশ হত তাহলে। এখানেই রাতটা কাটিয়ে দিতাম। যাক্‌গে, এবারের মত ক্ষমা করে গেলাম। আর যেন এমন করে ফিরে যেতে না হয়।

—কাজরী।

খুব খারাপ লাগল। কাজরী এসে ফিরে গেছে। আমি যাকে মনের থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম, সে হঠাৎ কখন এসে আমার ঘরের দরজাখানা হাট করে খুলে দিয়ে গেল। বড় একটা আফশোস হল আমার। আবার এক সময় চিঠিটা পড়ে বেশ মজাও পেলাম। ও নিজের থেকেই এবারের মত আমাকে ক্ষমা করে গেছে। মনে মনে বললাম, গুরুজী, ক্ষমা করে আমাকে বাঁচিয়েছ। অন্ততঃ আর একটিবার

হলেও তুমি আসবে আমার ডেরায়।

কাজরী টুকরো চিঠির এক জায়গায় লিখেছে, এখানেই রাতটা কাটিয়ে দিতাম। মনে হল, সিরিয়াসলি কোন কিছু না ভেবে কথা ঝরানোর অভ্যেস আছে কাজরীর। একটি যুবকের নির্জন আস্তানায় রাত কাটানোর ঝুঁকিটা যে কি তা কাজরীর মত মেয়ের না বোঝার কথা নয়। হতে পারি আমি ওর ক্লাস-মেট। কিন্তু আমি যে একটা দীর্ঘ রাতের সুযোগ হাতে পেয়েও হারাব এ বিশ্বাস কাজরী পেল কোথা থেকে!

এই সব এলোমেলো ভেবে একটা সমাধানে আসা গেল। কাজরীর স্বভাবে মেয়েদের সাবধানতার চেয়ে ছেলেদের বেপরোয়া ভাবটা বেশী। তাই নির্ভাবনায় ও কথা বলে, নির্দ্বিধায় কাজ করে যায়।

পরের রোববার অব্দি অপেক্ষা করতে হল না। এক্স প্রিন্সিপাল্ ডক্টর গুপ্তর মারা যাবার খবরে কলেজ ছুটি হয়ে গেল থার্ড পিরিয়ডে।

কাজরী এক ফাঁকে আমার পাশে এসে বলল, কাজ নেই তো কিছু?

বললাম, না।

চল তাহলে, তোমার ডেরাতেই যাওয়া যাক্।

বললাম, সঙ্গে যাবে?

ক্ষেপেছ?—বলল কাজরী, তুমি চলে যাও শ্যামবাজার মোড়ে। নেতাজীর স্ট্যাচুর আশেপাশে থেকো, আমি খুঁজে নেব।

ও এক ট্রামে, আমি বাসে। দেখা হতেই বলল, চল আজ তোমাকে দ্বারিকে খাওয়াই। সেদিন আমাকে ভীমনাগে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে, আজ তাই আমার পালা।

বললাম, সেদিন খেলে কই?

কাজরী মাথা নেড়ে বলল, ঐ হল। খেতে বলা আর খাওয়ানোর ভেতর বড় একটা তফাৎ নেই, অবশ্য তা যদি আন্তরিক হয়।

আমরা দ্বারিকে ঢুকলাম। কাজরী নোনতা মিষ্টি কি যেন সব অর্ডার দিয়ে এল। পাশে এসে বলল, তোমার ওখানে তো শুধু ক্রিম ক্র্যাকার, তাও আবার কতদিনের স্টক তার ঠিক নেই। মিইয়ে গিয়ে সেতানির গন্ধ ছাড়ছে।

বললাম, মিইয়ে যাওয়ার হাত থেকে বিস্কুটগুলো জিইয়ে রাখবে যে তার পথ চেয়েই তো বসে আছি।

কাজরী বলল, চেয়ে চেয়ে আবার দেখো চোখের জল মরে না যায়।

উত্তর একটা দিতে যাচ্ছিলাম, খাবার এসে গেল।

খেতে খেতে কাজরী বলল, কি খেতে ভালবাস পুষ্কর?

হেসে বললাম, অতশত বুঝি না, কিছু খেলেই হল।

কাজরী বলল, তুমি, একটি সর্বভুক তাহলে।

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে হোটেল-রেস্তোরাঁয় ঘুরে ঘুরে লিভারটাকে দয়া করে যেন পচিও না।

হেসে বললাম, ডিগ্রি না পেতে পেতেই যে ডাক্তারী শুরু করে দিলে কাজরী?

ও বলল, আমি কি চেম্বার খুলে বসেছি নাকি? নিজের লোকদের ওপর সব সময় এ রকম ডাক্তারী চলে।

কথাটা বলেই কাজরী কি যেন ভাবল। মনে হল, আমাকে হঠাৎ নিজের লোকের দলে ফেলাটা ঠিক হয়েছে কিনা তাই তলিয়ে ভাবছে।

বললাম, তুমি কি খেতে ভালবাস কাজরী?

ও মাথা নেড়ে জানাল, কিছুই না।

বেশ বুঝতে পারছিলাম তখনও ওর ঘোর কাটেনি।

খাওয়া শেষে আমরা বেরিয়ে এলাম। কাজরী আকাশের দিকে এক পলক চেয়ে বলল, থাক্, আজ আর না পুষ্কর, অন্য একদিন যাব। বৃষ্টির মেঘ থমথম করছে।

বললাম, খুশি তোমার। তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব সে জোর আমার নেই। তাছাড়া মানুষের স্বাধীনভাবে পথ চলায়, কথা বলায় আমি বিশ্বাসী।

কাজরী বলল, দেখছিলাম তোমার ডাকের জোর কতটা।

বললাম, ডাক আমি দিইনি, তাই আমার দিক থেকে জোরের প্রশ্নও ওঠে না। তুমি খুশি হয়ে আসতে চেয়েছ, তাতেই আমি খুশি।

কাজরী বলল, ঠিক আছে। আমি যখন যেতে চেয়েছি তখন আকাশ ভেঙে পড়লেও যাব।

সেদিন কাজরী এল আমার ঘরে। তার আগে একবার এসেছিল কিন্তু আমাকে না পেয়ে কতক্ষণ একা বসে ফিরে গিয়েছিল। কাজরীর কাছে সেদিনকার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললাম, সত্যি সেদিন কতক্ষণ একা বসেছিলে, ভাবতেই আমার কেমন খারাপ লাগছে। আমি দুঃখিত।

কাজরী আমার বিছানার এক কোনায় বসে একখানা বই এর পাতায় চোখ বোলাচ্ছিল। আমার কথা কানে যেতেই বইখানা বিছানায় ফেলে রেখে সোজা আমার দিকে চেয়ে বলল, একা বসেছিলাম, তোমাকে কে এ কথা বললে?

বললাম, আর কেউ তো ছিল না।

খুব ছিল। মথুরাদা সারাক্ষণ কাছে বসেছিল। আমি আর মথুরাদা সেদিন দারুণ গল্প জুড়েছিলাম। একটুও খারাপ লাগেনি আমার!

বললাম, এতদিনে তাহলে একটা অপরাধবোধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল।

অমনি কাজরী বলে উঠল, তা বলে একটা মেয়েকে এতদূর টেনে এনে, তার সঙ্গে দেখা না করার অপরাধ থেকে তুমি কোনদিনও মুক্তি পাবে না।

হাসলাম মনে মনে। আমার বাগানবাড়ির ঠিকানাটা ওই নিয়েছিল। আর কোন নির্দিষ্ট তারিখ ছিল না ওর আসার। সুতরাং ও এসে ফিরে গেলে আমি কেন অপরাধী হতে যাব। তবু ভদ্রতার খাতিরে অপরাধটুকু স্বীকার করে নিয়েছিলাম।

ওকে বললাম, মাথা পেতে নিচ্ছি তোমার দণ্ড।

ও মনে মনে খুশি হয়ে উঠল। ফেলে দেওয়া বইখানা তুলে নিয়ে আবার চোখ বোলাতে লাগল।

চা খাবে নিশ্চয়?

চোখ না তুলে বলল, না। ঘন ঘন চা খাওয়া একটা বদভ্যাস। দু'চোখে দেখতে পারি না।

হেসে বললাম, একেবারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুগত শিষ্যা।

কাজরী বলল, আমি যা ভালবাসি না তা সোজাসুজি বলে ফেলি। ঢক ঢক করে সারাদিন আঠাশ কাপ চা গিলে তাই আবার বলে বেড়ানোর ভেতর আর যা থাক খুব একটা রুচি বা বুদ্ধির ছাপ আছে বলে আমার মনে হয় না।

যারা কফি হাউসে সারাদিন পড়ে থাকে?

কাজরী কপালে বইখানা ছুঁইয়ে বলল, গুরু! গুরু! ওরা গুরুদেব লোক। এক কাপ কফি, দশ পয়সা টিপস্ আর নির্ভেজাল ঘন্টা দু'য়েক আড্ডা। শিখতে হবে ওদের কাছে জীবনে সত্যিকারের বেঁচে থাকার ক্লু।

বললাম তোমার সার্টিফিকেটের কথা শুনলে ওরা তোমার মত সমঝদারকে লুফে নেবে।

থাম। আমি একটা ফুটবল নই যে গোলকিপার আমাকে লুফে নেবে। আমি নিজের পথ নিজে কেটে চলতে জানি। কারো লোফালুফির ভেতরে গিয়ে পড়ব, এমন আহাম্মক আমি নই।

কথাটার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করে বললাম, তোমার বাড়িটা ঠিক ঠিক কোথায় কাজরী?

জানই তো বালিগঞ্জে।

আমি জানতে চাইছি তোমার আদি বাসস্থান কোথায়?

সৌরমণ্ডলের কোথাও একটা হবে।

খুব যে রসিকতা করলে।

কাজরী বলল, একটুও মিথ্যে বলিনি। আর উত্তরটা এক কথায় হয়ে গেল।

বললাম, অরিজিনালিটি আছে তোমার উত্তরে।

ও বলল, আজেবাজে কথা না বলে একটা কাজের কথা শুনবে?

বল?

আমাকে অ্যানাটমিটা পড়িয়ে দেবে?

আমি ওঘর থেকে বইখানা আনবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

ও সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতখানা টেনে ধরে বসালে।

বাব্বা, এমন মহাপ্রাণ সতীর্থ আমার কপালে টিকলে হয়। কিন্তু আমি কি তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছি, এখুনি যেতে হবে? তুমি দয়া করে তোমার সুযোগ মত আমাকে একটু একটু করে পড়িয়ে দিলেই চলবে।

তুমি আমার কাছে আসবে, না আমি তোমার কাছে যাব কাজরী?

কাজরী বলল, গরজটা যখন আমার তখন আমিই আসব মশায়ের কাছে।

আমারও যেতে কোন অসুবিধে নেই। তবে তুমি যদি আসতে পার তাহলে এই নির্জন জায়গায় কনসেনট্রেশনটা ভাল হবে।

হঠাৎ কাজরী বলে বসল, ভাল হবে না ছাই। খালি ঐ বড় পুকুরটার চারদিকে ঘুরে বেড়াতে আর পায়রাদের মত বকম্ বকম্ করতে ইচ্ছে হবে।

বললাম, বেশ। আমিই না হয় যাব।

থাক, অত করুণাতে কাজ নেই। আমিই আসব। শুধু কতকগুলো ভ্যাজর ভ্যাজর না করে আমরা পড়াশোনা করব এমনি একটা প্যাক্ট থাকলেই হল।

বললাম, তথাস্তু। আমিও ওতে রাজী। শুধু দয়া করে বলে দিও কবে তোমার এখানে আসার ফুরসৎ হবে।

কাজরী বলল, শোন পুষ্কর, তোমার সঙ্গে যে আমার বেশ একটা চেনাশোনা আছে তা যেন ক্লাসের অন্য কেউ জানতে না পারে।

বললাম, বেশ, তবে এর কারণটা জানতে পারি কি?

বড্ড তিলকে তাল করে ওরা। একটা কিছু গন্ধ পেলেই হল, অমনি 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ' শুরু হয়ে গেল।

বললাম, কতটা পরিচয় প্রকাশ করব?

কাজরী বলল, মুখের দিকে চেয়ে থাকা আর পাশাপাশি চলাফেরাটা না হলেই হল।

আর তোমার আসার দিনের খবরটা পাব কি করে?

কাজরী একটু ভেবে বলল, সূর্যের ক'টা রঙ জানো?

বললাম, ন্যাশনাল ট্যালেন্ট স্কলারশিপটা আমি পেয়েছি কাজরী। ওটুকু না জানলে পড়ার পাট তুলে দেওয়া উচিত।

ঠিক বলেছ। এখন শোন, তোমার ঐ জানা সাতটা রঙের একটা বাদ দিয়ে আর একটা নেব।

বল কোন্‌টা বাদ দেবে?

কাজরী টেনে টেনে বলল, বেগুনী, গাঢ় নীল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা আর লাল। এই সাতটা রঙে দুটো নীল আছে। এখন ঐ দুটো নীলের একটা রেখে আর একটার জায়গায় সাদা রঙটাও নাও।

হেসে বললাম, এই রঙের খেলার মানেটা বুঝিয়ে দেবে?

কাজরী বিরক্তির সুর তুলে বলল, তুমি কি একটু ধৈর্য ধরে শুনবে আমার কথাটা?

আমি একটুখানি হেসে ওর মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলাম।

কাজরী বলল, আমার রঙগুলো পর পর এমনি করে সাজিয়ে নাও। বেগুনী, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা, সাদা আর লাল। এখন তুমি এই রঙগুলোর পাশে পাশে সাতটা দিন বসিয়ে নাও।

বললাম, বসান আমার হয়ে গেছে। রোববার ছুটির দিন, তাই বুঝি লাল রঙটাকে শেষে ফেলেছ?

কাজরী বলল, অতশত ভাবিনি, তবে তালেগোলে এক রকম হয়ে গেছে। এখন শোন, আমি যেদিন তোমার এখানে আসব, তার আগের দিন তুমি আমার হাতে ঐ বিশেষ দিনের চিহ্ন দেওয়া রঙীন রুমালটা দেখতে পাবে। রোববার এলে লাল, শনিবার এলে সাদা, এমনি আর কি।

বললাম, দারুণ পরিকল্পনা তোমার।

কাজরী বলল, এর জন্যে কিন্তু পরীক্ষায় এক নম্বরও বেশী পাওয়া যাবে না।

আমি হেসে বললাম, তোমার মুখের দিকে চেয়ে পরীক্ষকরা নম্বর না দিয়ে পারবেন না। বুকে নাড়া দেবার মত মুখখানা পেয়েছ বিধাতাপুরুষের কাছ থেকে।

কাজরী বলল, আয়নায় নিজের মুখখানা ভাল করে দেখেছ কি?

বললাম, দেখলেও কোন সুবিধে হবে না, আমি তো তোমার মত মেয়ে নই যে পরীক্ষকরা আমার মুখ দেখে নম্বর দেবেন।

কাজরী হঠাৎ সব কথা ফেলে রেখে উঠে গেল জানালার ধারে। এক ঝলক হাওয়া সেই মুহূর্তে হুড়দাঙ্গা করে বয়ে এল। গাছপালার বুক কাঁপিয়ে, ধুলোর আঁচল উড়িয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। কাজরীর আঁচলখানা এক ঝটকায় কাঁধের থেকে খসিয়ে লুটিয়ে ফেলে দিলে মেঝেতে। কাজরী দু'হাতে উড়ন্ত চুলগুলো চেপে ধরল। মুখে ডাক দিয়ে বলল, দেখে যাও, দেখে যাও পুষ্কর মেঘের খেলাটা।

আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আকাশে তখন ধোঁয়া রঙের মেঘ তাল পাকিয়ে গড়াতে গড়াতে এগিয়ে আসছে। কয়েকটা কি যেন পাখি ছেঁড়া পাতার মত হাওয়ায় উড়ে বেরিয়ে গেল।

কাজরী আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে হাতটা চালিয়ে মুখখানা তার দিকে টেনে নিয়ে বলল, ঐ যে পশ্চিমের দিকে চেয়ে দেখ কেমন আশ্চর্য একটা আলো বেরিয়েছে।

আমি ওর বাঁ হাতের আঙুল লক্ষ্য করে তাকালাম।

বেলাশেষের ঘন্টা বাজেনি তখনও তবু গোধূলির আকাশে ছড়িয়ে পড়া আলোর মত একটা জ্যোতি ফুটে উঠেছিল পশ্চিম আকাশে। সত্যিকারের চোখ ভরে দেখার মত ছবি।

আমরা অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম কতক্ষণ। দমকে দমকে হাওয়ায় আমাদের চুলগুলো এলোমেলো হয়ে উড়তে লাগল। ওর পরিপাটি পোশাকের আঁটসাট বাঁধন আর স্থির রইল না।

এরপর দারোয়ানদের টিনের চালে চড়বড়িয়ে এল বৃষ্টি। শব্দে দৃশ্যে স্পর্শে গন্ধে হঠাৎ ঘনিয়ে উঠল এক ব্যাকুল করা পরিবেশ। আমি সেই অকাল সন্ধ্যায় কাজরীর হাতখানা ধরে বললাম, তুমি আজ একটা অভাবনীয় মুহূর্তে এসেছ কাজরী। এই বিশেষ মুহূর্তটিকে আমরা কি অন্য কোনভাবে একটুখানি স্মরণীয় করে রাখতে পারি না?

কাজরী চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে আমার চোখের ওপর ওর বড় বড় দুটো চোখ পেতে বলল, হ্যাঁ তা পারি বই কি। মালমসলা থাকলে আমি এখুনি খিচুড়ি বসিয়ে দিতে পারি। সন্ধ্যের আগে খেয়েদেয়ে একেবারে বাড়ি ফেরা যাবে।

আমি একেবারে নিভে গেলাম। কখন নিজের অজান্তেই ছেড়ে দিলাম ওর হাতখানা।

ও এবার ছেলেমানুষের মত আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে বসাল বিছানায়। বলল, গান শুনবে?

দারুণ রাগ হয়ে গেল। মনে হল ও আমাকে নিয়ে একটা বলের মত ছুড়ে দিয়ে আবার লুফে নিতে চাইছে।

বললাম, আজেবাজে গান শুনতে আমার একটুও ভাল লাগে না।

ও আমার দিকে মিটিমিটি চেয়ে হাসতে লাগল। বলল, জীবনে অনেক ভাল গান শুনলে, এখন না হয় একটা খারাপ গানই শোন না।

আমি সেই মুহূর্তে আর কোন কথা বলতে পারলাম না। যে মানসিক উত্তেজনায় আমি ওর হাত ধরে কয়েকটা কথা বলেছিলাম সে উত্তেজনা হঠাৎ বাধা পেয়ে দারুণ একটা আত্মাভিমানের রূপ নিল।

ও আবার বলল, আচ্ছা থাক। বড় কোন গানের ফাংশান হলে আমি টিকিট কেটে এনে তোমাকে দেখাব।

বললাম, আমি নিজেই দেখতে পারব।

ও বলল, তুমি সারাক্ষণ আমার সঙ্গে আজ লড়াই চালাবে পুষ্কর?

ওর গলাটা কেমন যেন ভারী ভারী শোনাল। সঙ্গে সঙ্গে আমার রাগটা উবে গেল।

বললাম, তুমি আজ আমার অতিথি। তোমার মনে যদি কোন কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে ক্ষমা চেয়ে

নেব।

কাজরী খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, তুমি এমন ফর্মাল কেন পুষ্কর? এখানে ক্ষমা চাইবার কি আছে? তুমি তোমার মনের কথা জানিয়েছ, আর আমি আমার মুখের কথা শুনিয়েছি। বাস, চুকেবুকে গেল।

হেসে ফেলে বললাম, আমার কথার জবাবে তুমি আমাকে খিচুড়ি খাওয়াতে চাইলে, বল কার না রাগ হয়?

কাজরী বলল, আমি তোমার চেয়ে কিছু বড়ও হতে পারি। তাই আবেগে ভেসে যাওয়াটা ঠিক নয়।

তুমি বড় না ছাই।

কাজরী বলল, ছেলেবেলা অসুখ করে আমার এক বছর নষ্ট হয়েছিল স্কুলে।

বললাম, বল, কত সালে তোমার শুভ আবির্ভাব?

ও আমার থাই-এর ওপর চড়াৎ করে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বলল, খেপেছ, বুদ্ধিসুদ্ধি কি একটুও নেই!

আমিও অবাক হয়ে বললাম, কেন বল তো? কি অপরাধ করলাম?

মেয়েদের বয়েস কেউ কখনো জিজ্ঞেস করে, না কোন মেয়ে তা সঠিক বলতে চায়? এ প্রশ্ন সৌজন্যবহির্ভূত বিশ্বজনস্বীকৃত।

বললাম, অল্প ক' দিনে তোমার যতটুকু পরিচয় পেয়েছি কাজরী তাতে তুমি কথা চেপে যাবার মেয়ে বলে তো মনে হয় না।

কাজরী কথা ঘোরাল, ঐ দেখ জানলার বাইরে জলের চিক্ তৈরী হয়ে গেছে। কি সুন্দর কাচের তৈরী ঝালরের মত ঝুলছে।

বললাম, তুমি কথা ঘোরাবার একখানি।

কাজরী এবার আমার দিকে চেয়ে বলল, বয়েসটা তোমার চেয়ে কত কম হলে খুশি হও বল?

বললাম, থাক্ ওকথা। একটা গান শোনাও তবে।

কাজরী হেসে বলল, এই তো লক্ষ্মীছেলের মত কথা। আচ্ছা শোন, একটা খারাপ গান গাই।

বললাম কখন রাগ করে কি বলেছি, আর তাই ধরে বসে রইলে। তোমার স্মৃতিশক্তি তো দেখছি অসাধারণ!

কাজরী বলল, কি গান শুনবে বল?

তুমি কি সব রকম গানই জান?

আমাকে ছেলেবেলা থেকে দস্তুরমত ওস্তাদ রেখে গান শেখান হয়েছে। সাধা গলায় পরে শিখেছি, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদের গান। এখন বল কি গাইব?

বললাম, গাইয়ের ইচ্ছাতেই গান হোক্। ফরমায়েসী গানে পুরোপুরি প্রাণ থাকে না।

মাথাটা একটু নীচু করে থুত্নীটা বাম বাহুতে ঠেকিয়ে খানিক ভাবল কাজরী। এক সময় মুখখানা তুলে গাইতে লাগল।

আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে।
বনের ছায়ায় জল ছলছল সুরে
হৃদয় আমার কানায় কানায় পুরে।
ক্ষণে ক্ষণে ঐ গুরু গুরু তালে তালে
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ্গ বাজে।
কোন্ দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে,
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তার বিরহ ব্যথার মালা
গোপন—মিলন—অমৃতগন্ধ ঢালা।
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি—
হার মানি তার অজানা জনের সাজে।

গান থামলে কাজরীকে চিনতে পারলাম না। এ যেন অন্য একটি মেয়ে। কোথায় গেল তার চঞ্চলতা তীক্ষ্ণতা। কোথায় বা গেল তার কৌতুক শ্লেষ বিদ্রূপ। সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল জানালার বাইরে বাদলছাওয়া প্রকৃতির দিকে।

ধ্যান ভাঙলে কাজরী লজ্জা পেল। তার মুখে মৃদু হাসিতে, চোখের নিমীলিত রেখায় সে লজ্জার আভাস ফুটে উঠল।

এ ছবি দারুণ ভাল লাগল আমার।

কাজরী এক সময় বলল, রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার সময় আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি। গীতবিতানের গানগুলো কতদিন যে পড়ে পড়ে মুখস্ত করেছি তার লেখাজোখা নেই। কত গানের তো সুর জানি না, কি আসে যায় তাতে। শুধু পড়ে যাই। পড়ে গেলেও মন ভরে যায় কানায় কানায়।

বললাম, তুমি কয়েকটা মুহূর্তকে একেবারে নির্বাক করে ধরে রেখে দিলে।

কি রকম?

বললাম, বৃষ্টির শব্দ চলে গেল কানের বাইরে। বাদল দিনের ছবি মুছে গেল চোখের ওপর থেকে। শুধু গানের কথা আর সুর বাজতে লাগল কানে। মনে হল, চারিদিকে নিবিড় ব্যাকুল বাদল সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠেছে। সারা বুকখানা গানের সুরে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল।

কাজরী এবার নিজেকে ফিরে পেল। সে কৌতুকের সুর গলায় মিশিয়ে বলল, রবীন্দ্রনাথের গানকে তুমি ওষুধের মত ব্যবহার করতে পার পুষ্কর।

বললাম, তার মানে?

মানে খুব সোজা। যারা মনে মনে নানা দিক থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাদের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে রবীন্দ্র সংগীত প্রয়োগ করলে তারা সুস্থ হয়ে উঠবে। ভদ্র অনুভূতিশীল একটা মনের অধিকারী হবে তারা। রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ মহৌষধ।

বললাম, পেনিসিলিনের চেয়েও অবিস্মরণীয় আবিষ্কার তোমার এই মেডিসিন। তবে আমি এ চিকিৎসায় রাজী, যদি তোমার গানের মত ভেজালহীন ওষুধ সারাক্ষণ সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে পারি।

কাজরী বলল, অধিকাংশ নদী যেমন ঘুরে ফিরে শেষে সমুদ্রে এসে মিলছে, তোমার সব কথা তেমনি দেখছি কাজরীতে এসে শেষ হচ্ছে।

বললাম, এই শেষবারের মত একটি কাজরী-সংগীত গাইবার অনুমতি দাও।

বল কি বলবে?

আমার অসাধ্য না হলে তোমার পড়ার ব্যাপারে আমার সব সহযোগিতাই পাবে, শুধু যেদিন আসবে, সেদিন অন্তত একটি করে রবীন্দ্র সংগীত শোনানোর প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। আমি কোন বিশেষ গানের জন্যে পীড়াপীড়ি করব না। তোমার মনের খুশিতে গেয়ে উঠলেই আমি আমার দক্ষিণা পেয়ে যাব।

কাজরী বলল, মন তো সব দিন সমান সুরে বাঁধা থাকে না পুষ্কর। কোন দিন ইচ্ছে হলে স্টক উজাড় করে গাইব আবার কোনদিন হয়ত একখানাও গাইতে পারব না।

বেশ তাই সই। আজ থেকে এই অলিখিত প্রতিশ্রুতি রইল আমাদের।

বৃষ্টি ধরল সন্ধ্যার মুখোমুখি। কাজরীকে বাসে তুলে দিয়ে ফিরে এলাম।

ঘরে বসে চুপচাপ ভাবতে লাগলাম। আজ এই দিনটি আমার কাছে স্মরণীয়। কাল থেকে আমার দুটো চোখ সব কাজের ভেতরে থেকেও আর একজনকে খুঁজে ফিরবে। শুধু তার রুমালের রঙটুকু চেনার জন্যে নয়, তাকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্যে। কাজরী নিবিড়তার কোন আশ্বাসই দেয়নি, তবু যা দিয়েছে তাই বা কম কি। সবার ভেতরে থেকে এই যে লুকোচুরি খেলা দুজনের এতেই বুকের ভেতর কোথায় যেন একটা উত্তাপের ছোঁয়া লাগছে। বড় উপভোগ্য উত্তাপ।

তিন তিনটে দীর্ঘদিন চাতকের মত চেয়ে থেকে অবশেষে কাজরীর হাতে লাল নিশান উড়তে দেখা গেল। অমনি রঙীন বসন্তের একটা হাওয়া কাঁপিয়ে তুলল আমার বুক।

রোববার সেই যে ঘরে বসে রইলাম, সামনের রাস্তাতেও বেরুলাম না। টুকিটাকি যা কিছু প্রয়োজন সব সারলাম মথুরাদাকে দিয়ে। সকালে পেছনের বড় পুকুরে রোববার হলেই আমার পোশাকগুলো

কাচার ধুম পড়ে। নিজের হাতে নিজের কাজ করার বাতিক আছে আমার। জামা প্যান্ট গেঞ্জী আন্ডারওয়ার সার্ফে কেচে নিজের হাতে শুকোতে দিই। শুকিয়ে গেলে দায়িত্বটা পড়ে মথুরাদার ওপর। একরাশ পোশাক ইস্ত্রি করে নিয়ে এসে সুটকেশের ওপর ডাঁই করে রেখে দেয় মথুরাদা। আমি সময় মত ওগুলো সুটকেসে ভরে দিই।

তাছাড়া সকালে সাবান দেবার পরে আমি সানবাঁধানো ঘাটের পাটে ওগুলো রেখে ভালমন্দ বাজারটা করে আনি। অন্য ছ'টি দিনের বাজার সরকার মথুরাদা, রোববারটা তোলা থাকে আমার জন্যে।

এ রোববার মথুরাদা বাজার করে আনল। আমার গৃহগত প্রাণ দেখে একবার বলল, বাবুসাহেব, তবিয়ৎ ঠিক তো?

বললাম, বেঠিক কিছু নেই তবে আজ আর সাবান কাচতে বাজার যেতে মন চাইছে না। শোন মথুরাদা, আজ তুমি বেশ ঝাল ঝাল পকোড়া ভাজবে আর খানকতক বেগুনী।

মথুরাদা অমনি বলল, তোমাকে বলতে হোবে না বাবুসাহেব, আমি ধোঁকাভি বানাব। দিদিমণি খেয়ে খুশ হয়ে যাবে।

সেরেছে। আমি তো মথুরাদার কাছে কাজরীর আসার কথা বলিনি। বুড়ো পকোড়ার নাম শুনে ঠিক ধরে ফেলেছে। তাছাড়া বাগানের গাছ থেকে ভোরবেলা আমাকে পাতাসমেত দু'টি কদমফুল পেড়ে লম্বা বোতলে সাজিয়ে রাখতে দেখেছে। আর যায় কোথা। বুড়োর নাকে দূরের গন্ধ এসে লেগেছে। যাক মথুরাদার কাছে সংকোচ নেই আমার। এখানে ঐ বৃদ্ধই একাধারে আমার ফ্রেণ্ড ফিলজফার অ্যান্ড গাইড।

বললাম, মথুরাদা তুমি দিদিমণিকে খুব ভালবাস, তাই না?

বহুৎ আচ্ছা আছে আমাদের দিদিমণিটা। তুমি যে রোজ বাহার ছিলে সে রোজ আমার সাথে কত কথা বলল। আমার কাছে চা বিস্কুট চাইয়ে খেল। আমার বিমারের কথা ভি হল দিদিমণির সাথে। বলল, ডাগদরের কাছে তোমাকে লিয়ে গিয়ে আঁখ দেখায়ে আনব।

বললাম, এত সব কথা হয়েছে তোমার সঙ্গে মথুরাদা! দেখছি দু'দিন দেখেই দিদিমণিকে আমার চেয়েও ভালবেসে ফেলেছ।

মথুরাদা আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। এক সময় বলল, তুমি বড়া হিংসক আছ বাবুসাহেব।

বললাম, সে কথা থাক, এখন দিদিমণিকে খুব ভাল করে খাওয়াও যাতে তোমার চোখ দুটো সারিয়ে দিতে পারে।

বুড়ো মথুরাদা হাসতে হাসতে উঠে চলে গেল।

দুপুর পেরিয়ে ও যখন এল তখন বেশ খানিকটা জল ঝরিয়ে মেঘগুলো থমকে থেমে আছে আকাশের গায়। মেঘের কোল বেয়ে চুঁইয়ে পড়ছে খানিকটা করে সোনালী আলো।

ওকে লোহার গেটখানা ঠেলে ঢুকে এসে আবার বন্ধ করে দিতে দেখলাম। ও পায়ে পায়ে আসতে লাগল আমার ঘরের দিকে। জুঁইয়ের ঝাড়ে ধবধবে সাদা জুঁই ফুটে আছে। ওখানে একটু থমকে দাঁড়াল কাজরী। একটা ছোট জুঁইয়ের ডাল ভাঙতেই ঝিরঝির্ করে ক' ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। কাজরী পাতাসমেত তিন-চারটে ফুলওয়ালা সরু ডাল গেঁথে নিল কালো চুলের গভীরে। এবার কোনদিকে না তাকিয়ে পায়ের তলায় খোয়া পেটান সরু রাস্তায় সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি ওকে এতক্ষণ লক্ষ্য করছিলাম। ও কিন্তু একবার গেট দিয়ে ঢোকার সময় ছাড়া আর দ্বিতীয়বার ঘরের দিকে তাকায়নি। তাই ও যখন আমার ঘরের দাওয়ায় এসে পৌঁছল তখন আমি গ্রে সাহেবের বইখানা খুলে দারুণ একটি মনোযোগী ছাত্রের মত পড়ার ভান করতে লাগলাম। আমি বুঝতে পারলাম ও বাইরে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে আমার মগ্নতাটুকু লক্ষ করছে। আমি আরও নিবিড় মগ্নতার ভান করলাম। কাজরীর জন্যে আমি যে আদপেই চেয়ে বসে নেই, আমার আচরণে আমি তাই বোঝাতে চাইলাম।

কাজরী নিঃশব্দে পায়ের জুতো বাইরে খুলে রেখে দরজা দিয়ে আমার ঘরে ঢুকল। আমি বেশ

অনুভব করলাম ও আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তবু ধ্যান ভাঙল না ধূর্জটির। ও পেছন থেকে আমার চোখ দুটো চেপে ধরতেই আমি বলে উঠলাম, সংগীতা, নিশ্চিত সংগীতা।

ও মুহূর্তে ওর হাতখানা সরিয়ে নিল আমার চোখের ওপর থেকে। আমি এক পাক ঘুরে ওর দিকে চেয়ে বললাম, ও তুমি কাজরী?

ওর মুখে ম্লান একটা হাসি। বলল, নিরাশ হলে তো?

বললাম, আমার কাছে দুজনেই অভিন্ন। সংগীতা আর কাজরীতে কোন তফাৎ নেই।

কাজরী অমনি বলল, তোমার মত এতখানি সমদর্শী আমি নই পুষ্কর। আমার চোখে আজও প্রতিটি পুরুষই আলাদা।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, বাঁচালে তুমি কাজরী। আমার মত প্রতি পুরুষে তোমার সমদর্শিতা থাকলে গেছিলাম আর কি।

কাজরী বলল, সংগীতা কি তোমার আত্মীয়া?

বললাম, এখনও ঠিক সে আত্মীয়ার পর্যায়ে আসেনি। জানি না কোনদিন আসবে কিনা।

মেয়েটি নিশ্চয় খুবই আকর্ষণীয়া, না হলে পুষ্কর ব্যানার্জীর দৃষ্টি কেড়ে নিতে পারত না।

বললাম, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে সে অনন্যা। তবে বিশ্বাস কর কাজরী সতীর্থা বলে তোমাকে বলছি, ওর মনের হদিস এখনও পাইনি।

কাজরী হঠাৎ বলল, তোমার মানসীর কথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনব নাকি? এসো বসা যাক।

কাজরী বসে পড়ল আমার বিছানায়। একটু তফাতে আমিও ওর মুখোমুখি বসলাম।

কাজরী সত্যি কৌতূহলী হয়ে উঠল। বলল, কেমন দেখতে ভাল করে বল না বাবা?

বললাম, লম্বায় তোমাকে ছাড়িয়ে যাবে না, প্রস্থেও নয়। সত্যি করে বলি, দেখতে তোমার চেয়ে ভাল, এ কথা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারব না।

দাঁড়াও, আর তোষামোদ করতে হবে না আমাকে। সোজাসুজি সংগীতার কথাই আমি জানতে চাই।

বল, আর কি জানতে চাও?

কাজরী বলল, লেখাপড়ায় নির্ঘাৎ ভাল।

তা বলতে পার।

কি পড়ছে এখন?

বললাম, ডাক্তারী।

কাজরীর চোখে বিস্ময়, ডাক্তারী!

এবার আর আমি মুখের হাসি চেপে রাখতে পারলাম না।

সঙ্গে সঙ্গে কাজরী আমার কাছে এগিয়ে এসে এক ধাক্কায় আমাকে বিছানায় ঠেলে দিলে। আমি উঠে বসে বললাম, তুমি যে এত বোকা তা জানব কি করে। সংগীতার সঙ্গে গানের যোগ আর কাজরীর সঙ্গেও গানের যোগ। প্রথমেই ধরা পড়ে যাবার কথা। কিন্তু তুমি ও রাস্তাই মাড়ালে না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললে।

আমি সবাইকে বিশ্বাস করতেই অভ্যস্ত।

আমি অবিশ্বাসের কিছু কি করেছি কাজরী?

না তা করনি, কিন্তু তুমি একটা খেলার ফাঁদে জড়িয়ে ফেলেছিলে আমাকে।

বললাম, এটাকে খেলা ভাবছ কেন কাজরী? একে জীবনের একটা সত্য বলে কি মেনে নেওয়া যায় না?

কাজরী বলল, কেউ কেউ হয়ত এটাকে মেনে নিতে পারবে কিন্তু আবার কারু পক্ষে নানা কারণে সম্ভব নাও হতে পারে।

আমি আর কাজরীর মনের কঠিন বরফ গলাতে চাইলাম না।

কিছু সময় চুপচাপ বসে থেকে বললাম, এখন পড়াশোনার কাজটা শুরু করে দেওয়া যাক কি বল?

কাজরী সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল।

আমরা প্রায় দু'ঘন্টা একটানা পড়াশোনার পর যখন মাথা তুললাম তখন বৃষ্টির মেঘ থমথম

করছে।

বললাম, বস কাজরী, আমি আসছি।

কাজরী বলল, তুমি বরং বস, আমি চায়ের ব্যবস্থা দেখছি।

হেসে বললাম, মনে হচ্ছে বাড়িটা আমার নয়।

নয়ই তো। তুমি সংসারেব কি বোঝ।

কথা বলতে বলতে মথুরাদার ডেরায় দ্রুত পায়ে চলে গেল কাজরী। আমি বারান্দায় পায়চারি করতে করতে কাজরীর কথা ভাবতে লাগলাম।

কতক্ষণ পরে একটা বড় প্লেট ভরে তেলেভাজা এনে হাজির করল কাজরী। বলল, এত সব ভাজাভুজির অর্ডার তোমারই দেওয়া, তাই না?

বললাম, সবগুলো নয়।

কাজরী একটা গরম বেগুনী প্লেট থেকে তুলে নিয়ে আমার মুখের সামনে এগিয়ে ধরে বলল, খেয়ে দেখ নুনটুন আবার বেশী হল কিনা?

আমি গরম ভাজায় কামড় দিতেই জিভে ছ্যাঁকা লাগল। মাথা নেড়ে আউ হাউ আওয়াজ করতে করতে মুখের ভেতর বেগুনীর অংশটাকে ঠাণ্ডা করতে লাগলাম।

কাজরী, বড্ড লাগল, বড্ড লাগল, বলতে বলতে হাতের আদ্দেক বেগুনীটায় ফুঁ দিয়ে চলল।

বেগুনীটাকে জব্দ করে গিলে ফেলে বললাম, দারুণ হয়েছে তোমার বেগুনী।

ও অমনি বাকী আদ্দেকটা আমার মুখে ভরে দিয়ে বলল, এবার আর গরম লাগবে না।

আমি ভাজাটা মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে বললাম, তুমি খাচ্ছ না যে?

কাজরী একটা পকোড়া তুলে নিয়ে বলল, এই যে খাই। তুমি এবার নিজে গরম বুঝে তুলে খাও।

বললাম, বেশ তো দিচ্ছিলে বাবা খাইয়ে, তাই দাও না?

আহা বুড়ো খোকা, তাকে আবার খাইয়ে দিতে হবে।

বললাম, অগত্যা তুলে খাচ্ছি, কিন্তু তেমন স্বাদ আর পাব কি করে।

ও বলল, জিভটা পুড়ে গেছে তাই স্বাদ পাচ্ছ না। এই যে একটা ধোঁকা নাও।

কাজরী প্লেট থেকে বস্তুটা আমার দিকে এগিয়ে দিতেই আমি মুখ নেড়ে বললাম, দোহাই কাজরী আমাকে আর ধোঁকা দিও না।

ঝড়ের ধাক্কায় গাছ যেমন মাথা নুইয়ে লুটোতে থাকে কাজরী হেসে বিছানার ওপর তেমনি করে মাথা লুটোতে লাগল।

হাসি থামলে বলল, তুমিই তো আমাকে ধোঁকা দিতে চেয়েছিলে সাহেব। নাহলে ধোঁকার আয়োজন করলে কেন বল?

বিশ্বাস কর কাজরী, আমি এ কাজ করিনি, ঐ বৃদ্ধই এই পরিকল্পনাটি করেছে।

কাজরী বলল, ধোঁকাটা কিন্তু অপূর্ব হয়েছে, এসো দুজনে মিলে সাবাড় করি।

আমরা একই প্লেট থেকে ধোঁকার ডাল্‌না খেতে লাগলাম।

খেতে খেতে বললাম, দু'এক স্লাইস পাঁউরুটি হলে এর সঙ্গে বেশ জমত।

কাজরী বলল, এমনিতেই বেশ জমে গেছে, আর জমে কাজ নেই।

খাবার পরে আমরা পেছনের পুকুরটার চারদিকে চক্কর দিয়ে বেড়াতে লাগলাম। মাঝে মাঝে আমাদের সেদিনের পড়ার বিষয়টা আলোচনার মাধ্যমে ঝালিয়ে নিতে লাগলাম।

পুকুরের ওপারে পৌঁছেই এক সময় বৃষ্টি পেলাম।

তেড়ে ফুঁড়ে বড় বড় ফোঁটায় নামল বৃষ্টি। কি করি কি করি। পুরো পুকুরটা পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে গেলে কাপড়চোপড় গায়ে একদম লেপটে যাবে। আমার কোন অসুবিধে তাতে না হলেও ভিজে ন্যাতা হয়ে যাবে কাজরী। ওর ফেরার পথই যাবে বন্ধ হয়ে।

এ অবস্থায় পুকুরের এপারের একমাত্র আশ্রয় পায়রার ঘরখানা।

আমি ওর হাত ধরে টানতে টানতে ছুটলাম সেই ঘরের দিকে।

আমরা এসে ঢুকলাম পায়রাদের আশ্রয়ে। এটা কোন ঘর নয়। বাঁধান লাল সিমেন্টের চক্রাকার

চাতালের মাঝ থেকে উঠেছে একখানা কাঠের মোটা গুঁড়ি। তার ওপর খড়ের সুন্দর ছাউনিওয়ালা গোলাকার পায়রাদের ঘর; ছোট ছোট খুপ্‌রিতে ভাগ করা। পাশেই জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে দু'তিনটে নারকেল গাছ।

আমরা আশ্রয় পেলাম ঠিক কিন্তু পুরোপুরি পোশাক বাঁচান কষ্টকর হয়ে উঠল। কারণ জলের ঝাপ্‌টায় চাতালের ওপর গুঁড়ি গুঁড়ি সাদা পুঁতির দানা ছড়িয়ে পড়ছে।

হঠাৎ চোখে পড়ল, কাঠের মোটা গুঁড়ির ওদিকটাতে খাঁজ কাটা। পায়রাদের খাবার দেবার জন্যে ঐ খাঁজে পা রেখে ওপরে ওঠার ব্যবস্থা।

কাজরীর দিকে চেয়ে দেখলাম, ও শাড়িখানা পায়ের খানিক ওপর অব্দি তুলে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললাম, ঐ কাঠের গুঁড়ির খাঁজে খাঁজে পা রেখে খানিকটা ওপর উঠে যেতে পারবে?

কাজরী ব্যাপারটা ঘটাবার আগে ভাল করে চেয়ে দেখল। বলল, আমি তো ছেলেদের মত গাছ ধরে গাছে উঠতে পারব না।

বললাম, তুমি আমাকে ধরে ঐ কাঠের খাঁজে পা রেখে রেখে উঠে যাও। একটুখানি উঠতে পারলেই ঘরের গোলাকার কাঠ ধরে ফেলতে পারবে, তখন দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধা হবে না।

প্রথমটা উঠব কি উঠব না করে বৃষ্টির তাড়ায় উঠতে হল কাজরীকে। আমাকে ধরে ধরে সভয়ে উঠতে লাগল আর আমি সমানে ওকে উৎসাহ দিতে লাগলাম।

ও আমার কাঁধে মাথায় হাত দিয়ে শেষে একটা অবলম্বন পেল। কিন্তু ধরতিখানা যুৎসই ছিল না বলে ও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না।

আমি বললাম, কাজরী, অসংকোচে তুমি আমার ওপর ভর রেখে দাঁড়াতে পার। বলেই আমি নীচ থেকে ওর পায়ে দুটো চাপড় মারলাম।

ও ওপর থেকে বলল, অ্যাই কি হচ্ছে, যাঃ।

আমি আর এক বুদ্ধি দিলাম, যদি আমার কাঁধে পা রেখে দাঁড়াতে না চাও তাহলে আমি গুঁড়িটার গায়ে হাত বেঁধে দাঁড়াচ্ছি, তুমি আমার হাতের ওপর ভর রেখে একেবারে কাঠের পাটাতনের ওপর উঠে যাও।

অবশেষে ওকে তাই করতে হল, আর ঐভাবে ও একেবারে ওপরে উঠে গেল। নীচের থেকে আমি বললাম, সুন্দরী মেয়েদের না সাধলে তারা কথা কানেই তোলে না।

ওপর থেকে ও বলল, সুপুরুষ ছেলেদের মুখের কথা শুনতে কোন্ মেয়ের না ইচ্ছে করে বল?

কথা শেষ করতে না করতেই কাজরী উঃ বলে একটা চিৎকার দিয়ে উঠল।

আমি ভাল করে চেয়ে দেখি একটা পায়রা খুঁপরি থেকে মাথা বের করে অনাহূত অতিথিকে চঞ্চু তাড়নায় অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

ভয়ে পেছনের দিকে না তাকিয়ে মাথার দু'পাশে হাত চেপে বসে সমানে চেঁচাচ্ছিল কাজরী।

বললাম, মাভৈঃ। শত্রু নয়, নিরীহ্ পারাবত। কূজনের জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছে।

কাজরী হেসে উঠল। বলল, তোমার মুণ্ডু। বলেই ও ধীরে ধীরে মাথাটা পেছনে ঘুরিয়ে আসামীকে দেখবার চেষ্টা করল।

একটু পরে পায়রাদের খোপের দিকে সোজা হয়ে ফিরে বসে ও সোৎসাহে বলে উঠল, দেখে যাও পুষ্কর কি সুন্দর পায়রাগুলো বসে আছে। দারুণ দারুণ সব দেখতে। হাওয়ার মুখে অশথ পাতার মত হাতের পাতা কাঁপিয়ে আমাকে ওপরে ডাকতে লাগল কাজরী।

পায়রার অথবা কাজরীর (ঠিক বিশ্লেষণ করে বলতে পারব না) একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে আমি কাঠের পিলার বেয়ে ওপরে উঠলাম। কাজরী আমার হাত ধরে ওপরে টেনে নিল, যদিও আমার সাহায্যের কোন দরকারই ছিল না।

আমরা ওপরে পাশাপাশি বসে পায়রা দেখতে লাগলাম। আমাদের মাথা তুলে দাঁড়াবার জায়গা ছিল না। আমরা বসে বসে ঐ পায়রা-ঘরের চারিদিকে ঘুরতে লাগলাম। আমি নিজেই জানতাম না যে এত রকমের পায়রা আছে এখানে।

জোড়ায় জোড়ায় পায়রাগুলো বসেছিল। কেউ কারু পিঠের পালকে মুখ গুঁজে, কেউবা ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে মুখোমুখি।

ওদিকের একটা খোপ থেকে একটা পায়রা সমানে তার সঙ্গিনীকে গদগদ ভাষায় প্রেম নিবেদন করে চলেছিল। আমরা মুখোমুখি হতেই সে যেন লজ্জা পেয়ে থেমে গেল। পাশের একটা খোপ থেকে ঝটাপটির শব্দ উঠল। হয়ত মিথুন মুহূর্ত, স্থান সংকোচের জন্যে পাখার ঝাপট।

আমরা দু'জনেই ওদের সুখী সংসার-জীবন লক্ষ্য করছিলাম আর নিজেদের ভেতর রসাল মন্তব্য করে চলেছিলাম।

কখন বৃষ্টি থেমে গেছে। শেষ বেলার রোদ সোনার রঙ মাখিয়ে দিয়েছে বৃষ্টি ধোয়া পাতায় পাতায়। ঠিক সে খবর পৌঁছে গেছে পায়রাদের অন্দরমহলে। অমনি একটি একটি করে খোপের বাইরে বেরিয়ে এসে পাখা পটপটিয়ে উড়ে চলল গাছের ডালে রোদ্দুর মাখতে।

কাজরী বলল, এবার আমারও যাবার পালা। আবার কখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে।

ওর হাতটা ধরে বললাম, একেবারে কি না গেলেই নয়। যদি থেকে যাও এখানে?

কাজরী চোখ বড় বড় করে কপট ধমকের সুরে বলল, আবার পুষ্কর, মাথায় পোকা নড়তে শুরু করে দিয়েছে।

একটু পরেই করুণ চোখে গলা নামিয়ে বলল, এখন থেকে এসব পাগলামী শুরু করলে ওপরে ওঠার সব পথই যাবে বন্ধ হয়ে। তখন সারা জীবনটা আফসোস করে বেড়াতে হবে।

আমি দুম্ করে পায়রা-ঘরের চাতালে লাফিয়ে পড়লাম।

ওপর থেকে কাজরী চেঁচিয়ে উঠে বলল, ওমা, কি করছ পুষ্কর।

নীচের থেকে হেঁকে বললাম, আত্মহত্যা।

তারপর চাতালের বাইরে চলে যাবার অভিনয় করতেই ও ওপর থেকে হাঁইমাই করে উঠল।

অ্যায় পুষ্কর, প্লিজ আমাকে একটু নামিয়ে দাও। প্লিজ প্লিজ। লক্ষ্মী ভাই।

আমি ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, উইথড্র।

কি?

তোমার ঐ কথাটা।

কোন্ কথা?

বললাম, ভাই ফাই বললে সারা রাত ঐ পায়রার খাঁচায় বন্দী থাকতে হবে।

কি বলব বলে দাও?

বললাম, প্রভু বল, নয় প্রিয়তম।

ও বলল, গান শুনবে পুষ্কর?

আমি ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

ও আবার বলল, বিশ্বাস কর আমি ভাল গান শোনাব।

বললাম, বেশ শোনাও।

এখানে বসে গান হয় পুষ্কর?

আমি বললাম, রাখ আমার কাঁধে পা আমি তোমাকে নামিয়ে নিচ্ছি।

কাজরী বলল, অসম্ভব। বরং তুমি যেমনভাবে দুটো হাত মুঠো করে পিলারে রেখেছিলে তেমনি করে ধরে রাখ, আমি নেমে যাব।

তাই করলাম। ও অনেক কসরৎ করে নামতে লাগল আর আমি সমানে উৎসাহ দিতে লাগলাম। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। ও পা স্লিপ করে আমার বুকেই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, এখন যদি তোমাকে আর না ছাড়ি?

ও আমার বুকে দুম্ দুম্ করে ক'টা কিল বসিয়ে আবার সোহাগে আদরে ঘষে দিতে লাগল।

আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে বললাম, কি অদ্ভুত সংস্কার তোমার কাজরী! আমার হাতের মুঠোয় পা রাখলে কিন্তু কাঁধে পা ঠেকাতে চাইলে না। তাহলে অন্ততঃ সতীর্থের বুকে আত্মসমর্পণ করতে হত না।

ও বাইরের দিকে চেয়ে থেকেই বলল, কোনদিন আবার না কোন সম্মানীয় লোককে বলে বস,

গুরুদেব, আপনি সিধে হয়ে বসুন, আমি আপনার কাঁধে উঠে সিলিং ফ্যানটা মেরামত করে দি।

আমি হেসে ফেলে বললাম, হার মানছি কাজরী। এখন গানটা শোনাবে কিনা সেটা তোমার মর্জির ওপরই ছেড়ে দিলাম।

ও মৃদু একটা হাসি হেসে আমার হাতখানা ধরল। তারপর আমরা পায়রাদের ঘর ছেড়ে পুকুরের বাঁধান পাড় ধরে এগোতে লাগলাম। জংলী কি একটা লতাগাছ তার পাতায় ভরা ডালে ডালে লালের ছিটে দেওয়া হলুদ ফুল ফুটিয়েছে। ঐ গাছের পাতার শেষ প্রান্তে জলের বিন্দু মুক্তার নোলকের মত দুলে আছে। শেষ সূর্যের সোনা রামধনুর ঝিলিক তুলেছে ঐ মুক্তাবিন্দুগুলিতে।

ঐ দিকে তাকিয়ে আমরা দুজনেই থমকে থেমে দাঁড়ালাম। সত্যি, বিধাতার রূপের ভাণ্ডার কত বিচিত্র কত অফুরন্ত!

আবার কথা না বলে আমরা তেমনি হাত ধরাধরি করে চলতে লাগলাম।

কাজরী এক সময় বলল, তুমি আমাকে প্রভু আর প্রিয়তম বলে ডাকতে বলেছিলে, তাই না?

কখন কি বলেছি কৌতুক করে তাই তুমি মনে করে রেখে দিয়েছ কাজরী।

কাজরী যেন একেবারে অন্য একটি মেয়েতে রূপান্তরিতে হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে তার গলায় গান বেজে উঠল।

'প্রভু আমার প্রিয় আমার
পরম ধন হে।
চির পথের সঙ্গী আমার
চির জীবন হে।।
তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর,
মুক্তি আমার, বন্ধন ডোর,
দুঃখ সুখের চরম আমার
জীবন মরণ হে।'

সমস্ত গানের কলিগুলো সুরের সুধারস ঢেলে গাইতে লাগল কাজরী। আমি ওর মুখে সেই মুহূর্তে একটি আত্মনিবেদনের ভাব দেখতে পেলাম। আমার মন তখন গানের কথায় আর সুরে এমনি আবিষ্ট হয়ে গেছে যে আমি কয়েক মুহূর্ত আগের তুচ্ছ কথাগুলো একেবারে ভুলে গেলাম।

গান থামল। ও দাঁড়িয়ে রইল পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে। সেখানে তখন বিরাট একটা মেঘের ফাঁক দিয়ে অনেকগুলো আলোর রশ্মি পৃথিবীর বর্ষণসিক্ত গাছপালাকে স্পর্শ করার জন্য ছুটে আসছিল।

ভরতের চায়ের দোকানে গুলতানি বেশ জমে উঠেছিল। সভাপতি আমাদের গোপালদা। বছর পাঁচেক ফেল করছেন। এখন আমাদের এক ক্লাস ওপরে স্থিতি। নিজের দলে সঙ্গীসাথীদের ফেলে উনি শিং ভেঙে আমাদের দলে এসে ভিড়েছেন। গোপালদাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে উনি বলেন, বয়েস কমাচ্ছি। কেউ কি বুড়ো হতে চায় এ দুনিয়ায়। দেখিস না যৌবন চলে যাচ্ছে বলে লোকে বোতল বোতল যৌবন-রস-সালসা খাচ্ছে। পৃথিবীর প্রতিভাবান বুড়োরা সৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে অল্পবয়েসী মেয়েদের বিয়ে করে ঘরে তুলছে। সঙ্গে সঙ্গে উৎসারিত হয়ে উঠছে সৃষ্টির ফোয়ারা। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে সহস্র ধারায়।

অনুপ ফোড়ন কাটল, বিয়ে না করেও।

গোপালদা এক ধমক হাঁকড়ালেন, তুই থাম্ ডেঁপো। বিয়ে না করে ভোগবাসনা মেটাবার অনেক রাস্তা খোলা পড়ে আছে। কিন্তু এক প্রতিভাবান বৃদ্ধ পার্টিতে তার কচিকাঁচা ভার্যাটিকে নিয়ে ঢুকছে, এর ইজ্জৎই আলাদা। তুই বুড়ো হলে এসব বুঝবি।

সোমেন বলল, এই অনুপটার জন্যে তালেগোলে আসল কথাটা গুবলেট হয়ে গেল।

গোপালদা ওপরের দিকে চোখ তুলে শিবনেত্র হয়ে বললেন, তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় নাকো কভু।

চোখ নামিয়ে বললেন, সব ঠিক আছে। কথা হচ্ছিল যৌবন নিয়ে। আমার মতে যৌবনরক্ষার যত দাওয়াই থাক নিউ জেনারেশানের সঙ্গে সংযোগ রাখাই সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াই। বুড়োদের সঙ্গে আড্ডা মারলে বুড়িয়ে যেতে হবে, আর কচিকাঁচাদের মাথা খেলে চির তরুণ থেকে যাবে।

কৌশিক বলল, আমাদের তাহলে কি গতি হবে গোপালদা?

কেন রে?

এই যে তোমার সঙ্গে আড্ডা মারছি।

গোপালদা বললেন, তোরা পুরুর বংশধর। বৃদ্ধদের যৌবনদানের জন্যে যুগে যুগে তোদের আত্মবলিদান। এ মহিমা ক'জনে পায় রে!

ভরত ডবল হাফ চা পরিবেশন করে গেল। গোপালদাকে সে গুরুর অধিক মান্য করে। নতুন দোকান। গোপালদা বহু খদ্দের এনে আসর জমিয়ে দিয়েছেন। গোপালদার পরিকল্পনা মত ভরতের দোকানের দেয়ালে একটি ছবি শোভা পাচ্ছে। খদ্দের ঢুকলে প্রথমেই সে ছবিতে চোখ পড়বে। হাতজোড় করে বসে আছে ভরত। তার সামনের সিংহাসনে শ্রীরামের একজোড়া পাদুকা।

গোপালদা বলেন, প্রতিটি খদ্দের শ্রীরামচন্দ্রের ঐ পাদুকা। আর দোকানদার ভক্ত ভরত। বিনয়ের সঙ্গে খদ্দেরদের পুজো করতে না পারলে অভীষ্ট লাভ হয় না।

ভরত অক্ষরে অক্ষরে গোপালদার এ উপদেশ গুরুবাক্যের মত পালন করে চলেছে।

গোপা বলল, গোপালদা সেদিন আমাদের যে গল্পটা শুনিয়েছিলে এরা কিন্তু কেউ শোনেনি। তুমি আর একবার বল।

কৌশিক বলল, আচ্ছা গোপালদা আপনাকে এই গোপাটা তুমি, তুমি বলে কথা বলে কেন বলুন, তো? খুড়োর বয়েসী বড় ভাইকে সম্মান দিতে জানে না!

গোপালদার চোখ মুখ বাৎসল্যরসে আপ্লুত হয়ে গেল। গোপালদা চোখ ছোট করে মৃদু হেসে বললেন, ও আমার আত্মজার মত। আমি 'ল' পর্যন্ত লম্বা হয়ে গেছি, আর ও 'পা' থেকেই খসে পড়েছে। গোপালের ভেতরেই তো গোপা রে।

আমি বললাম, কিন্তু গোপার সেই গল্পটা যে মাঠে মারা যাচ্ছে।

গোপালদা বললেন, ওটা গোপার শোনা, ওটা আর বলব না। তবে ঐ ডাক্তার সাহার আর একটা গল্প বলছি শোন্।

বললাম, আগে নতুনটা শুনি, তারপর পুরোনোটার কথা ভাবা যাবে।

গোপালদা বললেন, তখন সেন্ট টমাস চার্চ লেনে দাঁতের চেম্বার খুলেছেন ডাক্তার সাহা।

গল্পের মাঝে ঢেউ তুলল সেই কৌশিকটা। বলল, ঐ বিশেষ লেনে উনি চেম্বার খুলতে গেলেন কেন, এত ভাল ভাল জায়গা থাকতে ?

তুই একটা আস্ত পাঁঠা। ঘটে কি এক তিলও ঘিলু নেই। আরে যারা নিষিদ্ধ মাংসাদি ভোজন করে অথচ উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন অথবা দন্তধাবন করে না তাদের দাঁত অকালে বিনষ্ট হয়। ঐ ধরনের রোগী ঐ বিশেষ জায়গার অধিবাসী। সেজন্যে ব্যাবসাবুদ্ধিসম্পন্ন ডাক্তার সাহা ঐ বিশেষ জায়গাটিকে তাঁর চেম্বার পত্তনের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করেছেন।

সোমেন বিরক্ত হয়ে বলল, যা ব্বাবা, সাত নকলে যে আসল মাল খাস্তা হতে বসল।

গোপালদা বললেন, শোন তাহলে, ডাক্তার সাহা বসে রয়েছেন চেম্বারে, একজন ভদ্রগোছের লোক একটা ব্যাগ নিয়ে ঢুকলেন। হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। মানে একখানা ঘুষি ঝাড়লে দু'পাটি দাঁতই নেমে যাবে।

ভদ্রলোক বসলে ডাক্তার সাহা বললেন, আবার কি হল আপনার? দাঁত ক'টা তো তুলে বসিয়ে দিয়েছি।

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, লুজ হয়ে গেছে।

ডাক্তার সাহা বললেন, আজ আমি আপনার মুখে যে দাঁতের পাটি বসিয়ে দেব তা আর খুলে আসবে না। একটু বড় আর এক পাটি তো তৈরী করিয়ে রেখেছি। বেশি সাদা বলে এটাকে আপনি সে সময় বাতিল করেছিলেন।

বসান হয়ে গেলে ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, আর খুলবে না তো?

না।

অমনি ভদ্রলোক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ডাক্তার সাহা হকচকিয়ে গেলেন।

ভদ্রলোক পাশের কম্পাউন্ডারকে কনুই-এর গুঁতোয় হটিয়ে দিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন, উল্লম্ফন, কুজ্ঝটিকা, ধূর্জটী, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

থামলেন ভদ্রলোক। তখন চেম্বারের সব ক'টি প্রাণী যথার্থই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক এবার ডাক্তার সাহার দিকে ফিরে নকল হাসি হেসে বললেন, এবার চলবে।

সাহস পেয়ে ডাক্তার সাহা বললেন, এমন করে চেঁচিয়ে ঐ শব্দগুলো উচ্চারণ করছিলেন কেন মশাই?

এবার বিনয়ের হাসি হেসে মাথা নেড়ে বললেন ভদ্রলোক, যাচাই করে নিচ্ছিলাম। মাস্টার মানুষ কিনা, পড়াবার সময় শক্ত শক্ত শব্দ উচ্চারণ করতে হয়। যাতে উচ্চারণের তোড়ে পাটিটা বেরিয়ে না যায়, তাই পরীক্ষা করে নিচ্ছিলাম।

আমাদের হাসি থামলে কৌশিক বলল, গোপালদা ও মালটি কোথা থেকে গেঁড়িয়েছ?

গোপালদা বললেন, এসব হল বে-ওয়ারিশ মাল। শুনবি. হাসবি, ভুলবি। শুধু কোনরকম প্রশ্ন করবি না। এর একজন স্রষ্টা আদিতে হয়ত ছিল, কিন্তু সে তার নাম গল্পটার কোথাও খোদাই করে যায়নি। তাই যে যার দরকার মত ওটাকে মেজে ঘষে নিজের বলে চালিয়ে দেয়।

বললাম, গোপার দুটো শোনা হয়ে গেছে গোপালদা। আমরা দ্বিতীয় চুটকিটা না শুনে ছাড়ছি না।

গোপালদা বললেন, ভরত ছাড় তো একখানা বিড়ি।

গোপালদা খাঁটী দিশী জিনিসেরই পক্ষপাতি। সিগারেটের বদলে বিড়ির ধূমপান করেন।

ভরত বিড়ি দিয়ে গেল। গোপালদা সেটা ধরিয়ে টানতে লাগলেন।

বললেন, এটাও দন্তঘটিত।

বলুন, বলুন,—এদিক ওদিক থেকে সবাই বলে উঠল।

ডাক্তার সোম চলেছেন ডেন্টাল আউটডোরে। সঙ্গে আমরা সবাই রয়েছি।

অনুপ বলে উঠল, এটা কত পার্সেন্ট?

গোপালদা অনুপটার মাথায় একটা বোম্বে চাঁট মেরে বললেন, থাম্ হতভাগা। কথার মাঝে খালি ডিসটার্ব করা।

আমরা সবাই হৈ হৈ করে উঠতে অনুপটা চুপ করে গেল।

গোপালদা বলতে লাগলেন, আউটডোরে পৌঁছলে রোগীকে ডাকা হল। গাঁয়ের মানুষ। চেহারাখানা আগের রোগীর ঠিক উল্টো। শুট্‌কো, দড়ি পাকান। তার ওপর একখানা ছেঁড়া ফতুয়া চড়িয়েছে।

ডাক্তার সোম বললেন, বলুন, কি কষ্ট আপনার?

রোগী বলল, বিরি খাইতে পারি না।

সে কি? হাঁ করুন।

রোগী হাঁ করলে দেখা গেল, দু'পাটিতে একটি দাঁত মাত্র বর্তমান। তাও আবার নড়ছে। বিড়িতে টান দিতে গেলে সেই নড়া দাঁতের গোড়া কনকন করে ওঠে।

ডাক্তার সোম দেবেশের দিকে চেয়ে বললেন, দাও হে ওঁর বিড়ি খাবার ব্যবস্থাটা করে দাও।

দেবেশ যেই দাঁত তুলবে বলে ফরসেপটা হাতে নিয়ে এগিয়েছে অমনি লোকটি মুখ বন্ধ করে হাতজোড় করে রইল।

কি হল আবার?—ডাক্তার সোম বলে উঠলেন।

এঁজ্ঞে, অধীনের একটা নেবেদন ছ্যালো।

কি নেবেদন?

খাতায় অধীনের নামডা লেখা হয়েছে কিন্তু ঠেকানাটা লেখা হয় নাই।

ডাক্তার সোম বিরক্ত হয়ে বললেন, ঠেকানা লিখে কি করব?

এঁজ্ঞে, এটা তো হাসপাতাল। আমাদের পাড়ার দু-একটা রোগী এসেছিল আর ফেরে নাই। দাঁত

তুলতে গিয়ে যদি একেবারে স্যার সগ্‌গে তুলে দ্যান তাহলে আমার পাঁচির মাকে খবরটা দ্যাবেন কি করে।

আমরা সমস্বরে বললাম, আর একটা ছাড়ুন গোপালদা।

গোপালদা বজ্র হুঙ্কার দিয়ে বললেন, আমার কি অফুরন্ত স্টক বলে ভেবেছিস নাকি?

গোপালদা প্লীজ! কৌশিকটা পায়েই ধরে ফেললে।

গোপালদা বললেন, এবার দেখছি নতুন ব্যাচ নিয়ে ভরতের দোকানে ঢুকতে হবে।

অনুপ বলল, মরে যাব গোপালদা।

মর, হাড় জুড়োবে আমার।

মরেও কি তোমাকে ছাড়ব ভেবেছ? প্রেত হয়ে তোমাকে জ্বালাব, একটা গল্প বলো গোপালদা, একটা গল্প বলো।

গোপালদা অমনি বললেন, তখন আমি কি করব জানিস, তোকে হিড় হিড় করে ই-এন-টিতে টেনে নিয়ে গিয়ে ভরতি করে দিয়ে আসব। ডাক্তার ত্রিপাঠী তোর নাকের ভূতটা নামিয়ে দেবে।

সভা ভেঙে সেদিনের মত উঠে দাঁড়ালেন গোপালদা।

আমরা সবাই ডাক্তার ব্যানার্জীর ক্লাস করতে চললাম। গোপালদা পা চালালেন হোস্টেলের দিকে।

যেতে যেতে ভাবছিলাম, গোপালদার মত এমন মহাপ্রাণ মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। রোগে শোকে আর কেউ না আসুক, গোপালদা খবর পেলেই পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কলকাতার সব বড় বড় ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। দরকার পড়লে যত রাতই হোক ঘুম ভাঙিয়ে তুলে নিয়ে আসবেন তাঁদের।

আর ছেলে কি মেয়ে সব্বাইকার গোপন কথার স্টক আছে গোপালদার কাছে। একেবারে সেফ ডিপোজিট ভল্ট। কারু কথা অন্য কারু কাছে ফাঁস হবার উপায় নেই। ব্যর্থ প্রেমের দীর্ঘশ্বাস নিয়ে যে মেয়েটি গোপালদার কাছে এসেছে সে পেয়েছে সত্যিকারের সান্ত্বনা। যে ছেলেটি প্রতারণা করেছে সে পেয়েছে ধিক্কার।

সুখে দুঃখে, আনন্দে দীর্ঘশ্বাসে গোপালদা রয়েছেন আমাদের পাশে, এই তৃপ্তি আমাদের সকলেরই মনে। আশ্চর্য, আমরা কিন্তু গোপালদার ডাক্তারী পরীক্ষায় কৃতকার্যতার জন্যে আদপেই উৎসুক নই। আমরা স্বার্থপরের মত শুধু চেয়ে আসছি, আমাদের গোপালদা আমাদের কাছেই থাকুন।

সেদিন শনিবার। কি যেন একটা কারণে কলেজ বন্ধ। তার আগের দিন সাদা রুমালখানা ফুলের মত ভাঁজ করে সুন্দর আঙুলে ধরে কয়েকবার নেড়েছে কাজরী। আমি চোখের কোণে লক্ষ্য করছিলাম। মনে হচ্ছিল একটা গন্ধরাজ ফুল ও ধরে রেখেছে ওর আঙুলে। আমি অনেক দূরে বসেও তার গন্ধ পাচ্ছি।

পরের দিন সকাল থেকেই সে যে আসে, সে যে আসে, এমনি একটা গানের কলি গুনগুনিয়ে উঠছে মনের ভেতর। আমি জানি, ওর আসতে সেই দুপুর গড়াবে। তবু ওর জন্যে এই দীর্ঘ সময়ের প্রতীক্ষাটুকু কত সুন্দর। কোন কিছু পাবার চেয়ে কোন কিছুর জন্যে প্রতীক্ষা মনে হয় মনের কাছে অনেক বেশী রোমাঞ্চকর।

আমার সকাল কাটল ওর ভাবনায়, কাজ হল না কিছু। অলস অন্যমনে ঘুরে বেড়ালাম। আকাশের দিকে চেয়ে বারে বারে মেঘের মতিগতি লক্ষ করতে লাগলাম। মেঘকে সম্বোধন করে বললাম, বাপু হে এখন অঘোরে নিদ্রা যাও অন্তত দুটো অব্দি। তারপর দলবল নিয়ে সারা আকাশের মাঠখানা জুড়ে ঘোড়দৌড় করে বেড়াও, আমার আপত্তি নেই। সন্ধ্যের মুখে শুধু ঘন্টা দুয়েকের জন্যে ক্ষান্তি দিলেই চলবে।

আমার সঙ্গে দেখলাম আর যাই থাক্ বন্ধুত্বের ব্যাপারে মেঘের খুব একটা উৎসাহ নেই। ন'টা-দশটার পর থেকে একগুঁয়ের মত মুখ গোমড়া করে আকাশের একপ্রান্তে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল। খেতে বসেছি, এমন সময় জানালা দিয়ে দেখলাম একগুঁয়ে মেঘের পিঠে কে যেন কষাচ্ছে বিদ্যুতের চাবুক। গোঁ গোঁ গর্জন করতে করতে সেই গোঁয়ারটা আকাশের এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে।

আমার খাওয়া মাথায় উঠল। নাকে মুখে কোন রকম দুটো গুঁজে উঠে পড়লাম। মনের ভেতরেও তখন আমার মেঘ ঘনিয়ে উঠছিল।

এবার মনে করলাম, মেঘের দিকে আর চাইব না। যত ওকে গুরুত্ব দেব ততই ও পেয়ে বসবে। তার চেয়ে ওর খেয়ালেই ওকে চলতে দেওয়া ভাল। এক সময় হয়ত খেয়ালের খেলা ওর সহজেই শেষ হয়ে যাবে।

আমি মেঘের দিকে না তাকিয়ে ইচ্ছে করেই বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ চোখ বুজে হিজিবিজি ভাবতে লাগলাম। কিন্তু সব হিজিবিজির ভেতরে এসে দাঁড়াল কাজরী।

এবার কাজরীর কথা ভুলতে হল। আকাশে দারুণ রকম তর্জন-গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল অঝোর কান্না। বিছানায় উঠে বসে দেখলাম, যেন মুহূর্তে প্লাবন শুরু হয়ে গেল।

মনে মনে ভাবলাম, আদিকাল থেকে কবিরা যে তাঁদের কাব্যে বর্ষা ঋতুর বিরহের কথা লিখে গেছেন তার কারণ কি?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেলাম, বর্ষায় প্রেমিক প্রেমিকাব মিলনের পক্ষে অনেক প্রাকৃতিক বাধা আছে। তাই না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে বর্ষাঋতুর কাব্যগুলি এমনভাবে পরিপূর্ণ।

নানা ধরনের ভাবনার ভেতর আসল দুঃখটুকু ভুলে থাকতে চাইলাম কিন্তু বারে বারে ফিরে ফিরে ঐ একই ভাবনা মনেব মধ্যে গুমরে উঠতে লাগল।

'তুমি যদি না দেখা দাও
কর আমায় হেলা
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল-বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায়
দুরন্ত বাতাসে।।'

ও এল। যখন ওর আসার আশা একেবারে ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। মনে পাষাণের ভার। বৃষ্টির ছেদহীন বিলাপ। লাইট না জ্বেলেই বসেছিলাম ঘরে। অন্ধকারে মনে হল কে যেন উঠে এল দাওয়ায়। ভাবলাম মথুরাদা। বললামও, বাইরের লাইটটা জ্বালো মথুরাদা। ঘরের আলোটা চোখে লাগবে।

বাইরে আলো জ্বলল না। ঘরে এসে কেউ ঢুকল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। খানিক দূরে গেটের মাথার ওপর জ্বলে থাকা হলুদ আলোটা বৃষ্টির প্রবাহে স্নান করছে। বাগানের গাছপালাগুলো তার সামনে ঝড়ের ঝাপটায় লুটোচ্ছে। আলোটা গাছের ডালপাতার অন্তরাল থেকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে, আবার কখন হারিয়ে যাচ্ছে। যেন একটা অলৌকিক সংকেত।

কে?

আমি, পুষ্কর।

কাজবী! আমাব বিস্ময় তখন অসীমকে স্পর্শ করেছে।

তুমি এই ঝড়েব ভেতর এলে! দাঁড়াও, আলোটা জ্বালছি।

কাজরী অতি শান্ত আর মৃদু গলায় বলল, থাক, আলো জ্বালতে হবে না।

ও মেঝের ওপর কি যেন একটা ফেলল। খস্ খস্ আওয়াজে মনে হল গায়ের থেকে ওয়াটারপ্রুফখানা খুলে ফেলে দিয়েছে।

ও এবার পায়ে পায়ে আমার বিছানার কাছে এগিয়ে এল। আমি অনড়, মন্ত্রমুগ্ধ।

বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সামান্য আলোর ঝলক এসে পড়ছে ঘরের ভেতর। ওটুকু ক্ষণিক আলোয় কাজরীকে চেনা যাচ্ছে না।

কাজরী কিন্তু আমার কাছে এসে আমার গা ছুঁয়ে দাঁড়াল।

আমি প্রায় অস্ফুট গলায় বললাম, কাজরী, এ দুর্যোগে তুমি সত্যি এলে, আমি যে ভাবতেও পারছি না।

ও কোন কথা না বলে আমার গায়ে শুধু হেলান দিয়ে দাঁড়াল আর আমার মাথার চুলগুলো নেড়ে নেড়ে খেলা করতে লাগল।

আমি হাত দিয়ে ওকে ছুঁতেই ও স্থির হয়ে গেল।

বললাম, এ অভাবনীয় কেমন করে ঘটল কাজরী?

ও এবার আমার গায়ে হেলান দিয়ে বিছানায় আমার পাশে বসে পড়ল।

এক সময় বলল, কি করে যে এসেছি সে আমিই জানি। বোধহয় না এসে পারলাম না বলে।

বললাম, এ দুর্যোগে এমন দুঃসাহসের কাজ না করলেই ভাল হত কাজরী।

আমি তোমাকে কথা দিয়েছি আসব বলে, আমার কথার কি কোন দাম নেই পুষ্কর?

তোমার মায়ের দুশ্চিন্তা হতে পারে তো। তিনি অসুস্থ, তাঁকে অকারণে ভাবনায় ফেলবে।

কাজরীর গলার স্বর যেন অন্য রকম হয়ে গেল। বলল, আমার মাকে তুমি চেন না পুষ্কর। মা আলাদা ধাতুতে তৈরী। আমাকে তিনি দিয়ে রেখেছেন অবাধ স্বাধীনতা। কত রাতে ফিরলাম, সারাদিন কি করলাম কোন প্রশ্ন নয়। শুধু মুখোমুখি হলে বলেন, নিয়ম মত খেও, বিশ্রাম নিও, নইলে শরীর থাকে না। আমি জীবনে অন্যায়, অত্যাচার, অনিয়ম করেছি তাই আমার আজ এ অবস্থা।

বললাম, তোমার মাকে আমার দেখতে বড় ইচ্ছে করে কাজরী, কিন্তু তুমি তো কোনদিন আমাকে ডাকলে না।

আমি মার কাছে কাউকে নিয়ে যেতে চাই না বলেই বাড়িতে কোনদিন কাউকে ডাকি না।

বললাম, একটা প্রশ্ন করব? অবশ্য উত্তর না দিলে দুঃখ পাব না।

বল।

তোমাদের আত্মীয়স্বজনরা বাড়িতে আসেন না?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল কাজরী। এক সময় বলল, আমাদের কোন আত্মীয় এ কলকাতায় নেই পুষ্কর।

সে কি! তোমার বাবা কি প্রবাসী বাঙালী ছিলেন?

না, আমার বাবা (যদি জন্মদাতাকেই বাবা বলে বলতে হয়) কলকাতারই মানুষ। তিনি আইন জগতের একজন অতি প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। উচ্চ সমাজের প্রায় সকলেই তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করেন।

তোমার বাবা জীবিত?

হ্যাঁ, আমি কাল রাতে প্রথম তাঁকে দেখলাম আর বোধহয় তাঁর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে বললাম, সে কি কাজরী, তোমার বাবাকে তুমি কালই প্রথম দেখলে!

কাজরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না দেখলেই ভাল হত পুষ্কর। আমি এতদিন মার মুখ থেকে শুনে এসেছিলাম, আমার বাবা মৃত। তিনি প্রবাসেই মারা যান। কিন্তু কাল আমার বাবাকে চাক্ষুষ দেখলাম। আর বাবা চলে যাবার পর জানতে পারলাম আমার এতদিনের অজানা সব ঘটনা। মা একের পর এক সব সত্যই খুলে বলে গেলেন।

বললাম, বিস্ময়কর। কিন্তু এর পর আমার কৌতূহলী হওয়া ঠিক নয় কাজরী। এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

কাজরী আমার একটি হাত চেপে ধরল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম ওর হাতখানা কাঁপছে। ও বলল, একা কাল রাত থেকে একটা অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করছি পুষ্কর। আজ তোমার কাছে বলার জন্যেই ছুটে এসেছি। নইলে একটুও শান্তি পাব না।

অন্ধকারের ভেতর ওর মাথাটা দু'হাতের পাতায় চেপে ধরে বললাম, তুমি আমাকে এত বড় বন্ধু বলে ভাব কাজরী!

কাজরী হঠাৎ আমার দুটো হাতের ভেতর তার মুখ ঢেকে বলল, একটুও না। কে বললে তুমি আমার বন্ধু। আমার কেউ নেই পুষ্কর। মা বাবা ভাই বোন কোথাও কেউ নেই।

হঠাৎ অনুভব করলাম, আমার দুটো হাত ভিজে উঠেছে। কাজরীর চোখের জল আমার হাতের পাতায়, আমি ভাবতেও পারলাম না। কাজরীকে আমি শুধু মনের দিক থেকে অসাধারণ শক্তির

অধিকারী বলেই ভাবতাম না, তার সামান্যতম কোন দুর্বলতাও ছিল আমার চিন্তার বাইরে।

আমি কাজরীর চুলে ভরা মাথাটা আমার বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললাম, কাজরী, তোমার ওপর দিয়ে যত ঝড়ই বয়ে যাক না কেন, তোমাকে আমি ভেঙে পড়তে দেখব, এ আমার কল্পনারও বাইরে। তোমার দারুণ শক্ত মনটাকে দেখতেই আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

কাজরী মুখখানা তুলে বলল, সকলকেই আমার স্পষ্ট আর রূঢ় কথায় আঘাত দিয়েছি পুষ্কর, তাই সব আঘাতই আজ আমার কাছে ফিরে এল।

আমি সেই মুহূর্তে আর কোন কথা বললাম না।

কাজরী একটুখানি শান্ত হয়ে বলল, জান পুষ্কর, ছেলেবেলা থেকেই আমি লক্ষ্ণৌতে মায়ের সঙ্গে কাটিয়েছি। শুধু দেখতাম মা আমার দিনের পর দিন গানের ফাংশান করতেন। তবলচী সারেঙ্গীবাদক থেকে অনেকেই রোজ আসতেন আমাদের ভাড়া বাড়িতে। মা রেয়াজ করতেন, গান করতেন, আর বাইরে অনুষ্ঠান থাকলে আয়ার কাছে আমাকে রেখে দিয়ে চলে যেতেন। যখন রাতে ফিরতেন তখন আমি থাকতাম ঘুমে অচেতন। কোন কোনদিন মায়ের আদরে আমার ঘুম ভেঙে যেত। আমি মায়ের বুকের উত্তাপে দারুণ তৃপ্তি পেতাম।

একটু বড় হলে একদিন মা আমাকে তাঁর ভারতবিখ্যাত সংগীত গুরুর কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন, আমিও করলাম।

দাদু বলে আমি ছেলেবেলা থেকেই তাঁকে ডাকতে অভ্যস্ত ছিলাম। তিনি আমাকে অনেক আদর করে সেদিন প্রথম গলা সাধতে শেখালেন।

তারপর থেকে মা আর দাদুর তালিমে আমার গলা তৈরি হতে লাগল। আমি স্কুলে যেতাম আর স্কুলের ফাংশানে গান গেয়ে প্রাইজ আনতাম।

আমার মনে তখন কিন্তু বাবা সম্বন্ধে কোন কৌতূহল ছিল না। আমি শুধু শুনেছিলাম, আমার বাবা নেই। সেজন্যে কোনদিন কোন অভাব আমি অনুভব করিনি। কোন রকম জিজ্ঞাসাও আমার মনে জাগেনি।

তারপর এক সময় কলকাতার এক অনুষ্ঠানে দাদু আর মা নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে এলাম। সেই আমার প্রথম কলকাতায় আসা।

বিরাট প্যান্ডেল। আলোর মালায় আশ্চর্য সুন্দর করে সাজান। স্টেজের তলায় বহুদূর পর্যন্ত শুধু মানুষের ভিড়। আমি উইংসের পাশে বসে উঁকি দিয়ে দিয়ে সব দেখছি।

এক সময় মায়ের গান শুরু হল। একটা গান শেষ হলে হাততালিতে ভেঙে পড়ল প্রেক্ষাগৃহ। সাত সাতটা গান শেষ করেও মা শ্রোতাদের তৃপ্ত করতে পারলেন না। তারপর দাদুর গান শুরু হল। দাদুও খুব বাহবা পেলেন। দাদুর গানের ফাঁকে ফাঁকে মাকে আরও কয়েকখানা গান গাইতে হল।

গান শেষ হলে মা দর্শকদের হাত জোড় করে বললেন, আপনাদের গান শোনাতে এসে কতটুকু তৃপ্তি দিতে পেরেছি জানি না তবে আমরা ধন্য হয়েছি। আমি যদি আপনাদের এতটুকুও আনন্দ দিয়ে থাকি তাহলে তার সব কৃতিত্বই আমার পিতৃতুল্য গুরুদেবের, যিনি আমার পাশে বসে সারাক্ষণ উৎসাহ দিয়ে গেছেন আমাকে।

মায়ের সেদিনের প্রতিটি কথা এখনও আমার কানে বাজছে। আমি শ্রুতিধরের মত স্মৃতি পেয়েছিলাম প্রায় শৈশব থেকে।

কিন্তু জান পুষ্কর, মা মঞ্চ থেকে নেমে আসার পর কার যেন একখানা চিঠি পেলেন। আর সেই রাতেই মার স্ট্রোক হল।

আমি ছোট। তখন কিছু বুঝিনা শুধু কেঁদেছি। মাকে হাসপাতাল থেকে বেশ কিছুদিন পরে নিয়ে আসা হল আমাদের বালিগঞ্জের নতুন বাসায়। দাদু রইলেন কাছে। আমি ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলাম। সব শিক্ষাই আমার একসঙ্গে চলল। এক সময় দাদু লক্ষ্ণৌ গিয়ে দেহ রাখলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী কেউ ছিল না। তিনি তাঁর সঞ্চিত সব টাকাই মাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের নিজেরও উপার্জিত যথেষ্ট অর্থ ছিল। মা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। তাই দিন রাত্তির আয়া নিযুক্ত হল তাঁর সেবার জন্যে।

এতখানি কথা বলে থামল কাজরী। বোধহয় সে পরবর্তী ঘটনাটুকু বলার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল।

আমি বললাম, কাজরী কলকাতার সংগীত অনুষ্ঠানের শেষে তোমার মা যে চিঠি পেয়েছিলেন, সেটার সঙ্গে তাঁর স্ট্রোকের কি কোন যোগাযোগ ছিল?

ঠিক ধরেছ তুমি পুষ্কর। কালই আমি সে চিঠির ব্যাপারটা জানতে পেরেছি। জেনেছি মায়ের কাছ থেকেই।

কৌতূহলী হয়ে বললাম, কি ব্যাপার কাজরী?

আমার বাবা লক্ষ্ণৌতে বেড়াতে গিয়েছিলেন তাঁর বন্ধুর বাড়ি। সেখানে কোন এক ফাংশানে মায়ের গান শুনে প্রলুব্ধ হন। তারপর মাকে দেবমন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিয়ের ছলনাও করেন।

বললাম, ছলনা বলছ কেন কাজরী। তিনি তো বিয়েই করেছিলেন।

না, ওকে বিয়ে বলে না। শুধু দেহভোগের বাসনা থেকেই উনি মাকে মিথ্যা বিয়ের একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর মাস তিনেক একসঙ্গে বসবাসও করেন। সেই সময় আমি মায়ের গর্ভে আসি।

হঠাৎ মায়ের মুখে বাবা খবরটা জানতে পেরেই বিচলিত হন। কিন্তু মনের ভাব গোপন করে রাখেন।

কিছুদিন পরে উনি বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে যান প্রয়াগে। আর তার কয়েকদিনের মধ্যেই দাদুর কাছে টেলিগ্রাম পাঠান ওঁর বন্ধু বাবার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে।

মায়ের অবস্থা বুঝতেই পার পুষ্কর। মায়ের সামাজিক স্বীকৃতি ছিল না গান বাজনা আর খুশি মত ঘুরে বেড়ানর জন্যে। মা ছেলেবেলা থেকেই কারুর কথা শুনতেন না। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন, তাই তিনি ঠাঁই পাননি তাঁর সংসার আর সমাজের মধ্যে। মাথা উঁচু করে বেরিয়ে এসেছেন। তোয়াক্কা করেন নি কোন সমালোচনার। এ অবস্থায় আমি আসছি তাঁর কোলে, বাবার সদ্য মৃত্যুর খবর, সব মিলিয়ে মা বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। সে সময় দাদু তাঁকে সাহায্য আর সাহস না দিলে মাকে একেবারেই ভেঙে পড়তে হত।

এর পরের ঘটনাটা ঘটল কলকাতায়। সে কথা তোমাকে আগেই বলেছি। কিন্তু চিঠিখানা কার তা বলিনি। চিঠি আমার বাবাই লিখেছিলেন। সেদিনের আসরে তিনি শ্রোতার আসরে বসে মায়ের জনপ্রিয়তা দেখে স্থির থাকতে পারেন নি। সংক্ষেপে তাঁর মৃত্যুর মিথ্যা রটনা খণ্ডন করে মার সঙ্গে আবার মিলিত হতে চেয়েছিলেন।

প্রেক্ষাগৃহের উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে নতুন উত্তেজনা মিশে মাকে বিহ্বল করে দেয়। যার ফলে সেই রাতেই মা অস্বাভাবিক মানসিক দ্বন্দ্বে পড়ে যান এবং শেষে স্ট্রোকে তিনি শয্যাশায়ী হন।

মাকে দাদু হাসপাতাল থেকে এনে তোলেন বালিগঞ্জের বাসায়। বাবাকে কোন রকমেই এ খবর আর দেওয়া হয়নি।

কাজরী থামতেই আমি বললাম, কিন্তু তোমার মা কি তোমার বাবাকে একবারও দেখতে চান নি?

না। মায়ের দারুণ আত্মসম্মানবোধ পুষ্কর। যে মানুষ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মৃত বলে নিজেকে প্রমাণ করতে চায় তার ওপর মায়ের কোন টানই থাকার কথা নয়।

আমার দাদু নাকি গোপনে খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছিলেন, বাবা শুধু সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিই নন, তিনি ঘোরতর সংসারীও বটে। ছেলেমেয়ে নিয়ে সম্পন্ন বৃহৎ পরিবার।

কাজরী থামলে আমি বললাম, তোমার বাবার সঙ্গে কাল কোন কথা হয়নি?

কাজরী বলল, না। মা শেষ পর্যন্ত বাবাকে অনুরোধ করে বললেন, তুমি আমার এখানে এসো না। আমাকে একটু শান্তিতে মরতে দাও। আমার মেয়ে আজও জানে, তার বাবা নেই। সে ভুল তার আমি ভাঙতে চাই না।

বাবা চলে গেলে আমি মায়ের ঘরে ঢুকলাম। বুঝতেই পারছ আমার চোখ তখন জলে ভরে উঠেছে। মা আমাকে দেখে বুঝতে পারলেন, আড়াল থেকে আমার সব শোনা হয়ে গেছে।

মা পাশে ডেকে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। একে একে আমার অজানা সব কথাই বলে

গেলেন।

সেদিন অনেক রাত অব্দি নিরালোক ঘরের ভেতর আমরা চুপচাপ বসে বৃষ্টির গান আর মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি শুনেছিলাম।

যাবার সময় স্বগতোক্তির মত কাজরী একটি কথা বলেছিল, বোধহয় আমার আর সংসার করা হবে না পুষ্কর।

বলেছিলাম, এ কথা কেন কাজরী?

কাজরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, আমার জন্যে কেউ মনে মনে দুঃখ পাক এটা আমি চাই না বলে।

বাইরে আর বৃষ্টি ছিল না। কিন্তু একটা আহত হৃদয়ের মত দিগন্তে নিষ্প্রভ বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে ধক্ ধক্ করে উঠছিল।

অন্য একদিন এলো কাজরী; সেদিন চোখে মুখে স্বাভাবিক আলোর ছোঁয়া। নীল আকাশে সাদা ডানা মেলা পায়রাটির মত, উজ্জ্বল সুন্দর।

প্রথম কথা কাজরীর, আমার মন বলছিল, আজ ঠিকই তোমাকে পেয়ে যাব।

বললাম, আশ্চর্য। আমার কিন্তু এখন দক্ষিণ কলকাতায় থাকার কথা। হঠাৎ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল হল।

বিস্ময়ের সুর লাগল কাজরীর গলায়, কেন?

সে কারণ শুনে কাজ নেই। তাতে এই অভাগা ছাড়া জগতে কারো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

তবু শোনা যাক্ বন্ধুর গোপন কথাটা।

বেরুবার সময় দেখি একমাত্র ইস্ত্রি করা জামা কাঁধের কাছে ফেঁসে আছে।

অনেকদিন পরে কাজরী গলা ছেড়ে জলতরংগের হাসি হাসল।

দাও আমি রীপু করে দিচ্ছি।

বললাম, যাত্রার সময় পার হয়ে গেছে। লগ্নভ্রষ্ট হল।

কাজরী তার বড় বড় চোখ মেলে বলল, লগ্নভ্রষ্ট হল কে? তোমার ভাবী বধূ?

বললাম, সে লগ্ন অনন্ত কালের বুকে চিহ্নিত হয়ে আছে। থাক সে সকল ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

অপূর্ব শান্তিময় অপরাহ্নের আলো খেলা করছিল কাজরীর মুখে। ও যখন হাসছিল তখন মনে হচ্ছিল টলটলে দীঘিতে ভোরের একরাশ শাপলা জেগে উঠেছে।

দু'চারটে হাল্কা আলাপের পর কাজরী হঠাৎ গম্ভীর হল। বলল, সেদিন দুর্যোগের সন্ধ্যায় তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম, আজ আমাকে বলতেই হবে পুষ্কর।

বললাম, এ আবার একটা কথা হল। তুমি বলবে, আমি শুনব, এতে এত সংকোচের কি থাকতে পারে?

কাজরী হঠাৎ আমার হাতখানা ধরে ফেলে বলল, আমি কোন অন্যায় করছি না তো পুষ্কর?

বললাম, আমার কাছে তোমার কথার সবটুকুই অন্ধকারে ঢাকা। তবু বলি, অন্যায় তুমি করতে পার, এ রকম ভুল ধারণা কখনও যেন আমার মনের মধ্যে না জাগে।

কাজরী বলল, আমার পারিবারিক জীবন নিয়ে বিশেষ কোন কথাই আমি বন্ধুদের কাছে বলিনি, এমনকি তোমার কাছেও নয়।

বললাম, ও বিষয়ে কোনদিন কোন কৌতূহলই আমি তোমার কাছে প্রকাশ করিনি।

সে আমি জানি পুষ্কর। তুমি আমার সব থেকে ঘনিষ্ঠ, সবচেয়ে প্রিয়, তাই তোমাকে আমার সব কথা উজাড় করে বলতে না পারলে একটুও শান্তি পাব না মনে।

বললাম, অসংকোচে বল কাজরী।

আমার মা পক্ষাঘাতে পঙ্গু তুমি জান।

শুনেছি।

মায়ের দেহ ভেঙেছে, কিন্তু মনের শক্তি অসাধারণ।

বললাম, তোমাকে দেখে কিছু অনুমান করা সম্ভব।

না পুষ্কর, মায়ের এককণা শক্তি যদি আমার থাকত তাহলে অনেক মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে

আমি রক্ষা পেতে পারতাম।

এখন আমি চুপ করে বসে রইলাম।

কাজরী একটু থেমে বলল, মাঝে কয়েকদিন আমার মা দারুণ রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ খবর আমি তোমাদের কাউকেই দিইনি। তুমি জান, নিজের সাংসারিক ব্যাপারে অন্যকে জড়িয়ে ফেলে বিব্রত করা আমার স্বভাবের বাইরে।

বললাম, তা ঠিক। সে সময় কয়েকদিন তুমি ক্লাসে অ্যাবসেন্ট ছিলে। তবে তুমি মনে কর না যে ক'দিন আমি খুব নিশ্চিন্তে ছিলাম। যতই উদ্বেগ হোক আমিও কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করি না। অনেক যন্ত্রণা মনে নিয়েও।

কাজরী বলে চলল, সে সময় তোমাদের প্রিয় ডাক্তার চৌধুরীকে নিয়ে গোপালদা আমার বাসায় ক'দিন আসা যাওয়া করেছিল। শেষ দুটো রাত ডাক্তার চৌধুরী মায়ের বিছানা ছেড়ে বাইরে বড় একটা কোথাও যান নি। বলতে পার ওঁর তত্ত্বাবধানেই মা ক্রাইসিস কাটিয়ে উঠল।

বললাম, এখন নিশ্চয়ই বুঝেছ কাজরী আমরা কেন ঐ নবাগত লেকচারারটির এত ভক্ত। ও রকম মিশুকে মানুষই হয় না। ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুর মত মেশেন।

কাজরী গালে হাত দিয়ে কিছুটা অন্যমনস্কভাবে আমার মন্তব্য শুনছিল। এক সময় সচেতন হয়ে বলল, মা তখন অনেকটাই সুস্থ। ডাক্তার চৌধুরী একদিন মাকে দেখতে এসে অনেকক্ষণ মায়ের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। আমি ওঁর অনুমতি নিয়ে বাইরে একটু শপিং-এ বেরুলাম।

ফিরে এসে দেখি ডাক্তার চৌধুরী সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। আমাকে উঠতে দেখে একমুখ হেসে আমার দিকে তাকালেন। আমি কাছে গিয়ে বিনীতভাবে বললাম, আপনার ঋণ কোনদিনও শোধ করতে পারব না।

উনি বললেন, ঋণ শোধের প্রশ্নই ওঠে না। আর একান্তই যদি নিজেকে ঋণী ভেবে থাক তাহলে সে ঋণ শোধের সময় হয়ত একদিন আসতে পারে।

উনি হাসিমুখে আমাকে বিদায় জানিয়ে নেমে গেলেন।

আমি হাতের জিনিসগুলো যথাস্থানে রেখে মায়ের ঘরে ঢুকলাম। মা হঠাৎ আমার পায়ের সাড়া পেয়ে দুটো চোখ মুছে আমার দিকে তাকাল।

আমি কিছুটা অবাক হলাম। মাকে কোন অবস্থাতেই ভাবাবেগে বিহ্বল হতে দেখিনি।

আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে মা বলল, আমার কাছে আয় তো মা। আমার বুকটাতে একটু হাত বুলিয়ে দে।

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মায়ের কাছে বসে বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। উদ্বেগে তখন আমার গলার স্বর বন্ধ হয়ে এসেছে। তবু আমি বলতে লাগলাম, কি হয়েছে মা, কি হয়েছে?

মা আমার হাতখানা চেপে ধরে বলল, কিছু হয়নি মা। তুই একটু আমার পাশে শুয়ে থাক। যেমন করে ছোটবেলা আমাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতিস।

আমি মায়ের পাশে শুয়ে মায়ের বুকে হাত রাখলাম।

এবার মায়ের গলা আবেগে কেঁপে উঠল, তুই ছাড়া আমার কেউ নেই মা।

আমি মায়ের বুকখানা আরও নিবিড় করে চেপে ধরলাম।

মা এবার স্বগতোক্তির মত বলে উঠল, অনেক সময় মৃত্যুটা বড় বেশী কাম্য বলে মনে হয় রে।

বললাম, এ কথা কেন মা? আমি কি তোমার সেবার কোন ত্রুটি করেছি?

মা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, তুই না থাকলে আমি কি এতদিন এ দেহটাকে টানতে পারতাম মা। তবে শুধু সেবা দিয়ে তো কাউকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না, যদি তার মনের ভেতর না শান্তি বা আনন্দ থাকে।

বললাম, বল মা, আমি তোমাকে শান্তিতে রাখার জন্যে কি করতে পারি?

আবার মায়ের চোখ উপছে জল গড়াল।

উদ্বেগের সঙ্গে বললাম, আজ কি হয়েছে তোমার মা?

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আজ একজনের কাছে অকপটে আমার সমস্ত কথা উজাড় করে

বলেছি। বলার প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম বলেই বলেছি।

বললাম, কার কাছে তুমি বলেছ?

মা অমনি বলল, ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গে কি তোর পথে দেখা হয়েছিল?

বললাম, হয়েছিল। কিন্তু তিনি আমাকে এসব কথার কোন আভাসই দেন নি।

মা চুপ করে রইল। আমার মুখেও কোন কথা ছিল না।

এরপর কাজরী কথা থামিয়ে চুপচাপ বসে রইল কতক্ষণ।

আমি বললাম, মথুরাদাকে দু'কাপ চায়ের অর্ডার করা যাক।

কাজরী বলল, তোমাকে বলতে হবে না, ঠিক সময়েই এসে যাবে। ঢোকার মুখে ও আমাকে দেখে বলেছে, আজ তোমাকে চায়ের সঙ্গে কুমড়ী খাওয়াব।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কুমড়ী আবার কি বস্তু?

বুঝলে না, বেসনে ডুবিয়ে কুমড়ো ফুলের ভাজা।

দারুণ মুখরোচক। তুমি এলেই দেখি মথুরাদার নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট শুরু হয়ে যায়।

কাজরী বলল, তোমার এখানে যখন আমার আসাযাওয়ার পালা চুকবে তখন বুড়ো মথুরাদার জন্যে ভারী কষ্ট হবে।

বললাম, আর কারু জন্যে নয়?

কাজরী এ কথার সোজাসুজি কোন উত্তর না দিয়ে হঠাৎ আমার হাতখানা তার দু'হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বসে রইল।

বললাম আসাযাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে কেন কাজরী?

ও কোন কথা বলল না। আমার হাতে জোর একটা চাপ অনুভব করলাম। বুঝলাম, কাজরী মনের গভীর একটা আবেগ প্রাণপণে চাপার চেষ্টা করছে।

আমি ওর দিকে তাকাতেই ও মুখখানা ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু দু'ফোঁটা গড়িয়ে পড়া চোখের জল লুকোতে পারল না।

বললাম, কি হল কাজরী! এত চমৎকার একটা দিনে হঠাৎ বাদল ডেকে আনলে?

কাজরী লজ্জিত হয়ে চোখ মুছল। ধীরে ধীরে বলল, সেদিন সন্ধ্যায় তোমাকে যে কথাটি জানাতে এসে জানাতে পারিনি, তাই আজ আমাকে শোনাতেই হবে। একা আমি কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারছি না পুষ্কর।

বললাম, আজ তোমার বাঁশীতে আনন্দের রাগিণী দিয়ে শুরু করলে, এখন হঠাৎ বিষাদের একটা সুর বাজিয়ে দিলে কেন? এখন বল কি তোমার সমস্যা?

কাজরী শান্ত গলায় বলল, এবার শোন মায়ের আসল কথা।

ডাক্তার তাপস চৌধুরী গল্পের ফাঁকে মায়ের কাছে তাঁর কন্যার পাণি-গ্রহণের প্রস্তাবটি রাখেন। মা এই প্রস্তাবে দারুণ অভিভূত হয়ে পড়ে। শেষে তার মনে হয়, আমার জন্মবৃত্তান্তটি তাপস চৌধুরীকে জানান একান্ত প্রয়োজন। কোনদিকে কোন খুঁত থেকে যায় এটা কোনকালেই মায়ের পছন্দ ছিল না।

তাপস চৌধুরী সব শুনেও নাকি তাঁর সম্মতি সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয় তিনি আমার বাবার নামের সঙ্গে নাকি পরিচিত। পাবলিশিং ওয়ার্ল্ডে আমার বাবা নাকি সর্বজন পরিচিত। তাঁর বড় ছেলে যে এখন প্রকাশন সংস্থাটির দেখাশোনা করছে সে কথাও তিনি জানালেন।

মা তাপস চৌধুরীকে বলেছে, আমার মেয়ের এ বিয়েতে অসম্মত না হবারই কথা, তবে তাকে গ্রহণ করতে হবে তার পিতৃপরিচয় ছাড়াই।

ডাক্তার চৌধুরী নাকি মাকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন।

হেসে বললাম, সব সমস্যারই তো সমাধান হয়ে গেছে, এখন তাহলে তোমার প্রবলেমটা কোথায়?

কাজরী এবার আমার দিকে তার গভীর অর্থবহ চোখ দুটো তুলে বলল, তুমি এ-কথাটা বলতে পারলে পুষ্কর?

সত্যি কাজরী, আমি এখনও তোমার সমস্যাটা বুঝতে পারছি না।

কাজরী এবার সোজাসুজি বলল, এই দীর্ঘ সময়গুলো আমরা যে এক সঙ্গে কাটালাম, তার কি কোন

মূল্য নেই? আমাদের হৃদয়, আমাদেব সুখ দুঃখ বলেও কি কিছুই নেই?

থাকবে না কেন কাজরী। এখনও আছে, হয়ত ভবিষ্যতেও থাকবে। এমন নিবিড় বন্ধুত্ব কি এত সহজে ছিঁড়ে যাবার।

কাজবী অন্যমনে কতক্ষণ বসে রইল। এক সময় আমার দিকে ফিরে বলল, তুমি আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু, এ পরিস্থিতিতে আমি কি করব বলে দাও।

আমি বিজ্ঞের মত বললাম, তোমার মনেব অবস্থা আমি বুঝেছি কাজরী। তবু বলি, সংসারে সকলের চেয়ে আপনজন তোমার মা। জীবনে তিনি বড় বেশী বঞ্চিত আর অপমানিত হয়েছেন। তাঁর এই যন্ত্রণাময় জীবনের সান্ত্বনা, তুমি। এ অবস্থায়, তাঁর ইচ্ছার কথাই তোমাকে বেশী করে ভাবতে হবে।

কাজরী বলল, বুঝেছি। তাহলে তোমাদের সকলের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হোক।

আমি কিন্তু কাজরীর কথায় তার সত্যিকারের মনের ভাবটা বুঝতে পারলাম না।

কিছু সময় দুজনে চুপচাপ বসে রইলাম। এক সময় কাজরী বলল, সন্ধ্যার বেশী বাকী নেই, পথও অনেকখানি দূর, আমাকে উঠতে হবে।

বললাম, মথুরাদা কষ্ট পাবে। তার হাতের তৈবী খাবারটা অন্তত খেয়ে যাও।

ম্লান একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল কাজবীর মুখে। সে বলল, বুড়ো মথুরাদার হাতে আইবুড়ো-ভাতটা খেয়ে যাই, কি বল?

আমি অসহায় নির্বোধের মত ওর হাসিতে যোগ দিলাম।

আমার ভাঙা বাংলোবাড়ী থেকে চলে যাবার সময়ও আমার দুটো হাত শক্ত করে ধরেছিল। অর্ধস্ফুট স্বরে বলেছিল, আমার বিয়েতে আর যারা আসে আসুক, তুমি কিন্তু এসো না পুষ্কর।

বললাম, এতবড় একটা শাস্তি আমাকে দিতে পারলে কাজবী।

ও পাগলের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, তোমার উপস্থিতি আমি সইতে পারব না পুষ্কর। কোন রকমেই না।

নির্দিষ্ট দিনে কাজরীর বিয়ে হল। তিন মাস পরে রেজাল্ট বেরুল। কাজরী পাশ করেছে। প্রথম পাঁচজনের ভেতর আমার একটা স্থান ছিল। গোপালদাকে নাকি কাজরী বলেছিল, পুষ্কর ফার্স্ট হলেও আমি আশ্চর্য হতাম না।

বিয়ের একটি বছর পূর্ণ হতে না হতেই কাজরীর মা গত হলেন। খবরটা আমি গোপালদার মুখে শুনলাম। আমার মনে হল, কাজরীর মা তাঁর বঞ্চিত জীবনেব কিছু সান্ত্বনা নিশ্চয়ই মেয়ে জামাতার মিলনের মধ্যে লাভ করে গেছেন।

এর পরের খবর, উচ্চতর বিদ্যালাভের জন্য ডাক্তার তাপস চৌধুরীর সস্ত্রীক দেশত্যাগ।

কি বিচিত্র মন মানুষের। যে কাজরীর বিয়ের খবর শুনে আমি সেই মুহূর্তে সমস্ত ক্ষোভ আব বেদনা ভুলে তাকে সমর্থন জানিয়েছিলাম আজ তার দেশত্যাগের কথা ভেবে নিজেকে বড় বঞ্চিত মনে হল। হঠাৎ আঘাত লেগে একটা পুরনো ক্ষত থেকে কিছুটা রক্তক্ষরণ হয়ে গেল। কাজরীর শূন্যতা কল্লোলিনী কলকাতার এত সমারোহ দিয়েও আমি পূর্ণ করতে পারলাম না। আমার হৃদয় এবং এই মহানগরী আমার কাছে তখন মরুভূমি মাত্র। আমি আর এক মুহূর্তও কলকাতায় থাকতে পারলাম না। বিহারের নেতারহাটে একটা চাকরীর সন্ধান পেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে চলে এলাম। আমার এই চাকরীর খবরটুকু একমাত্র গোপালদাই জানলেন।

দু'দিনেই বড় ভাল লেগে গেছে জায়গাটা। বিরাট বিশাল তুষার পর্বতের মহিমা নেই এখানে কিন্তু ছোট ছোট পাহাড়ের আশ্চর্য শ্যামশ্রী আছে। উঁচু-নীচু ঢেউ খেলান পাহাড়, সবুজ ঘাসে ছাওয়া। তার মাঝে মাঝে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে পিয়াশাল, মহুল, করম আর কুসুম গাছ। বসন্তে গাছে গাছে যৌবন জেগেছে। পথ চলতে থমকে দাঁড়াতে হয়। কোথাও একরাশ হলুদ ফুল কার্পেট পেতে রেখেছে গাছের তলায়। কোথাও পলাশের ডালে ডালে প্রদীপ জ্বলছে। মাখন রঙের ফুল এসেছে পিয়াল গাছে। মহুল গাছের তলা দিয়ে গেলেই হাওয়ায় ভেসে আসে গন্ধ। আঙুরের আকারে রসে টই-টম্বুর কচড়া ফল ধরতে শুরু করেছে। আশপাশের ডুংরি থেকে পাল পাল ছেলেমেয়ে আসে। মহুল ফুল কুড়িয়ে নিয়ে যায়। ছেলেগুলো গাছে উঠে কচড়া পেড়ে কোঁচড় ভর্তি করে। ফুলের থেকে হয় মদ আর কচড়া

থেকে হয় তেল। লাল সাদা, লাল হলুদ কুটুস্ ফুল ফুটে আছে পথের ধারে ঝোপেঝাড়ে। এখন পথ হাঁটলেই হাওয়ায় নেশা ধরিয়ে দেয়। পথের ওপর থেকে চোখকে টেনে নেয় গাছের ডালে ডালে রঙের উৎসব।

পাহাড়গুলো ধাপে ধাপে নেমে গেছে একটা ভ্যালির দিকে। ভ্যালির ওদিকে তিনটে পাহাড় অনেক দূর থেকে দৌড়ে এসে হঠাৎ যেন থমকে থেমে গেছে। নীল নীল পাহাড়। ধোঁয়া ধোঁয়া দু'চারটে মেঘ তাদের কাঁধে চেপে বসে থাকে কখনো সখনো। ঐ ভ্যালির মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে গেরুয়া রঙের কোয়েল নদীটা। জোরি আর ঝিঙাসুই নদী দুটো আশপাশে কোথায় যেন রয়েছে। নাম শুনেছি, দেখিনি তাদের এখনও। ভ্যালির ভেতরে খেতিগুলো যেন শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি। হলুদ, বাদামী, সবুজ। তাই কি এক রকমের সবুজ? ফিকে, গাঢ়, কাল্‌চে, কত রকমের সবুজের চোখ জুড়োনো রঙবাহার। মেঘগুলো যখন পাহাড়ের ঘাড় থেকে নেমে ভারী ভারী মোষের মত হেলতে দুলতে বাতাসে ভর করে এগোয় তখন নীচের উপত্যকায় তাদের ছায়া পড়ে। অমনি খেতিগুলোর রঙ মুছে যায়। মেঘ সরে গেলে আবার রঙ, আবার ঝলমলানি।

ভ্যালির ভেতর কত গাঁ। ঘরের চালের থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় আলাদীনের গল্পের দৈত্যটা ঐ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে এই আশ্চর্য ভ্যালিটাকে গড়ে দিয়ে আবার ধোঁয়ায় মিশে গেছে।

বেড়াতে বেরোই সাইকেলে চেপে। রোগী দেখতে গেলেও তাই। উৎরাই-এর বাঁধা পথে সাইকেলটা গড়িয়ে চলে। আবার চড়াই ভাঙার সময় সাইকেল নিয়ে উঠতে গেলে বুক চড় চড় করে ওঠে। সে সময় রোগীর বাড়ির লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে থাকে। আমি আসল পথে চলি আর ওরা পায়দলের সোজা পথে ওঠানামা করে। ওরাই চড়াই বুঝে আমার সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে যায়। বড় সহজ সরল মানুষ এরা। ডাক্তারকে ভাবে দেব্‌তা।

কত গ্রাম ছড়িয়ে আছে সামনের ভ্যালিতে। কি মিষ্টি নাম তাদের। জোরী, মারোই, বেতি, চিলমপোখের, পিপ্‌রাটোলি, আরও কত নাম। সব গ্রাম মিলে ঐ সারা উপত্যকাকে ওরা বলে, 'ছেছারি'।

আমার স্কুলের চাকরি বেশি সময়ের জন্যে নয়। আটকেও থাকতে হয় না। বিহার প্রদেশের বাছাই করা ছেলেরা এখানে এই প্রাকৃতিক পরিবেশে থেকে লেখাপড়া করে। ওদের অসুখবিসুখ করলে আমাকে দেখতে হয়। এখানে বড় একটা কারু অসুখ করে না। পড়ে গিয়ে ছড়ে কেটে যাওয়া কিংবা শীত ঋতুতে বুকে কফ বসে যাওয়া। মোটামুটি এই ধরনের দু'চারটে রোগ।

সেদিন গাঁ থেকে এল একদল লোক। বললে, বটুয়াটোলি থেকে আসছি। মাথায় বেশ বড় সাদা ফেটা বেঁধে এসেছে। পরণে খাটো ধোতি আর গায়ে কামিজ। কারু কারু গায়ে মোটা কাপড়ের একখানা করে লুগা। তখন পশ্চিমের পাহাড়টায় রিন্‌রিন্ করছে শেষ সূর্যের আলো।

ওদের আর্জি, যেতে হবে ওদের গাঁয়ে। ওদের গাঁয়ের মুখিয়া মঘনু বিরজিয়া ভাইলের থাবার ঘায়ে রক্তাক্ত আর অচৈতন্য হয়ে গেছে। ঘুট্‌লিকে ডেকে দাওয়াইও খাওয়ান হয়েছিল, কিন্তু কিছুতে কিছু হয়নি।

বললাম, সন্ধ্যে নামবে এখুনি, যাব কি করে?

ওদের ভেতর থেকে চার চারটে জোয়ান লোক এগিয়ে এসে যা বলল তার অর্থ হল, ওরা আমাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাবে আবার ঠিক এমনি করেই ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।

একজন আমার ওষুধের বাক্স নিলে অন্যজন আমার কোন বাধা না শুনে আমাকে একবারে কাঁধে তুলে নিল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। আমি লজ্জার মাথা খেয়ে লোকটির কাঁধে চেপে বসে রইলাম। গভর্নমেন্ট বাংলোগুলো পেরিয়ে যখন পাহাড়ী পথে নামতে লাগলাম তখনই কেবল মাথাটা তুলে চারদিকে নজর ফেললাম।

কি অনায়াস দক্ষতায় কাঁধ পালটে পালটে লোকগুলো আমাকে দুর্গম পাহাড়ী রাস্তায় বয়ে নিয়ে এল ওদের গাঁয়ে।

লোকটা জখম হয়েছিল বেশ গুরুতর রকমের। ভালুকটা সজোরে থাবা বসিয়ে তুলে নিয়েছিল

বুকের থেকে এক খাবলা মাংস। দগদগ করছিল আহত অংশটা। মঘনু বিরজিয়া টাঙির এক কোপ বসিয়েছিল ভালুকটার দেহে। কিন্তু এক বস্তা লোম ভেদ করে কতটা ঢুকতে পেরেছিল ফলাটা তা বলা শক্ত। তবে বেশ খানিকটা আহত না হলে বনের ভেতব ফিবে পালিয়ে যেত না ঐ ডাকু ভাইল।

প্রয়োজনীয় ইন্‌জেকশান দিয়ে, স্টিচ করে, ওষুধপত্র খাইয়ে জ্ঞান ফিরে এলে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

এরা সবাই মিলে আমাকে মিনতি করে বসাল। মহলাইনের পাতা পেতে চিঁড়ে দহি লাড্ডু আর জিলাবি ক'খানা দিয়ে ফলারের জন্যে পীড়াপীড়ি করল।

আমি ওদের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। ফলাব শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম।

হাত মুখ ধুয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি ইতিমধ্যে কখন চাঁদ উঠে গেছে। কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথির চাঁদ। বেশ বড় আকারের আলোয ভরা।

ওরা আমাকে গুনে গুনে দশটা টাকা দিলে। এক বোতল খাঁটি ঘিউ দিলে। আমি টাকা দশটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, মহল্লার বাচ্চাদের মেঠাই কিনে খাইও।

তারপর আবার সেই কাঁধে চেপে আশ্চর্য অরণ্য জ্যোৎস্নায় গাছেদের স্নানলীলা দেখতে দেখতে ফিরে এলাম।

মাঝে মাঝে গোপালদাব চিঠি পাই। বাংলাদেশের সঙ্গে এই চিঠির মাধ্যমে সামান্য যোগসূত্রটুকু এখনও বজায় আছে। গোপালদা ক্রমাগত ফেল করে এখন ক্ষান্তি দিয়েছেন। একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, 'একেবারে হাঁটুর বয়েসী ছেলেদের সঙ্গে আর কতকাল বিদ্যাদেবীর পুজো করি বল্? তাই এ বছর থেকে ছেদ টানলাম। এখন ভরতের দোকানটাই ভরসা। ভাবছি, দেশের কিছু ধানি জমি বিক্রিসিক্রি করে টাকা এনে ফেলব ঐ দোকানে।

তুই ভাবছিস তেলেভাজার দোকান করব? না রে গাধা, ভরতকে পার্টনার করে ওষুধের দোকান করব।'

আমি জানি গোপালদাকে কাজরী কোনদিন আমাদের নিবিড় যোগাযোগের কথাটা বলেনি। তাহলে আর যে যাই করুক, গোপালদা অন্তত ডাক্তার চৌধুরীর বিয়ের ব্যাপার নিয়ে এগিয়ে যেত না।

আমি গোপালদাকে চিঠি দিয়ে জানাই, দিব্যি আছি। এই শান্ত পাহাড়ী পরিবেশে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পেরে নিজেকে বড় সুখী মনে করছি। আমার ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধু ছিল না ওখানে, আত্মীয়তাও দূরে দূরে, তাই এখানে চলে আসায় কোন দিক থেকেই কোন ব্যথার সুব বাজেনি। শুধু যে মানুষটি কারু একার না হয়েও সকলের সেই গোপালদাকে ভুলতে পারিনি। তাই বহুদূরে থেকেও শুধু তাঁর সঙ্গেই যোগসূত্রটা রক্ষা করে চলেছি।

'চলে আসুন না গোপালদা এ অধমের আস্তানায় কোন এক অবসরে, যদ্দিন খুশি কাটিয়ে যান। একবার এলে দেশে ফিরতে আর ইচ্ছে করবে না আপনার।'

গোপালদার সংক্ষিপ্ত উত্তর আসে। 'তুই হতভাগা আমাকে বেশ একটা গাড্ডার সংবাদ দিলি যাহোক্। আমি কি অকালে বানপ্রস্থ নিয়েছি তোর মত যে কলকাতার এমন আড্ডা ছেড়ে ওখানে যাব। এখানে কচিকাঁচাদের মাথা চিবিয়ে খেতে বড় আরাম রে। তুই লিখেছিস, ওখানে গেলে আর ফিরতে ইচ্ছে করবে না দেশে। রাম রাম, এমন নির্বাসনেও কেউ যায়। বেঁচে থাক আমার চিরপচা সুন্দরী কলকাতা। আমি সারা জীবন বসে বসে তার অঙ্গে মলম লাগিয়ে যাব, তবু একপাও তাকে ছেড়ে নড়ব না।'

তিন তিনটি বছর পার হয়ে গেছে। আমি এই পাহাড়ী জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত এই সরল মানুষগুলির সেবার ভেতরে থেকে ভুলতে চেয়েছি।

কোন একটি বিশেষ ঋতুতে যখন দূরের পাহাড় বন আর উপত্যকার ছবি মুছতে মুছতে বৃষ্টি এগিয়ে আসে, আর আমার ছোট্ট কোয়ার্টারের সামনে পিয়াশাল গাছটা ডালপাতা নেড়ে তাকে আলিঙ্গন করবার জন্যে উতলা হয়ে ওঠে তখন আমি কেন জানি না বাইরের লোহার গেটটা বন্ধ করতে পারি না। আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে বসে থাকি। আমার কেমন যেন মনে হয়, এই বৃষ্টির পরিবেশের সঙ্গে

আর একটা বৃষ্টির পরিবেশের হুবহু মিল আছে। আমি তন্ময় হয়ে কান পাতলে গান শুনতে পাই। রবীন্দ্রনাথের বৃষ্টির দিনের গান। কে যেন বহু দূরের ওপার থেকে পাঠাচ্ছে। আমি তার প্রতিটি শব্দ, প্রত্যেকটি সুরের কম্পন বৃষ্টির মধ্যেও স্পষ্ট শুনতে পাই। আমার সারা অনুভূতি প্লাবিত হয়ে যায় সেই সুরের ধারায়।

বৃষ্টির দিনগুলো তখনও পেরিয়ে যায়নি। তবে মাঝে মাঝে আকাশের নীল আর রোদ্দুরের সোনার ঝলকানি দেখা যাচ্ছে। দূরে কাছে পাহাড় বন দীর্ঘ বৃষ্টির দিনগুলিতে স্নান করে শুদ্ধ শ্যামল হয়ে উঠেছে। নতুন করে যেন জেগে উঠেছে পাহাড়ের ঘুমিয়ে থাকা মানুষজন। সদ্য জেগে ওঠা মকাই-এর মুক্তোর মত সাদা দানাগুলো ঠুক্‌রে খেতে এসেছে ফিক্‌ড়ো পাখি। ছোট্ট কালো কালো পাখিগুলো ফর্‌ ফর্‌ করে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে আর সুন্দর মিষ্টি ফিক্‌ ফিক্‌ কিড়ো, ফিক্‌ ফিক্‌ কিড়ো শব্দ করে মাতিয়ে তুলছে মকাই বন।

আমি দুপুরে খাবার পরে বিছানায় বালিসে ঠেস দিয়ে বসে বসে এই ছবি দেখছিলাম, বাইরে হঠাৎ গেট খোলার শব্দ হল। কেউ যেন ভেতরে ঢুকে এল। পরক্ষণেই আমার ঘরের দরজায় কড়া বেজে উঠল।

আমি বিছানা থেকে নেমে গিয়ে দরজা খুলেই বিস্ময়ে উল্লাসে ফেটে পড়লাম, গোপালদা! বলতে বলতে জড়িয়ে ধরলাম বুকে।

গোপালদা কিন্তু স্থির নিরুত্তাপ। গোপালদার দিকে ভাল করে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। সেই সদা প্রসন্ন গোপালদার ছবি তাঁর এই থমথমে করুণ মুখখানার ভেতর ছিল না।

এ কি পথশ্রম? মানসিক ক্লান্তি? না আর কিছু? বললাম, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন গোপালদা, আসুন ঘরের ভেতর।

আমি ওঁর হাত ধরতেই উনি জোরে আমার হাতখানা চেপে ধরে বললেন, হতভাগা একেবারে মেয়েটাকে মেরে ফেললি?

বোধহয় এমন স্তম্ভিত ও বিস্মিত আমি আর কখনও হইনি।

বললাম, কি বলছেন গোপালদা, আমি মেরে ফেলেছি? একটা মেয়েকে?

তুই মারিসনি তো কি আমি মেরেছি। হতভাগা ব্যাপারটা আমাকে বলতে কি হয়েছিল?

আমি তখন রীতিমত কাঁপছি। আমি বুঝতে পেরেছি গোপালদা যে কোন রকমেই হোক কাজরীর কথা জানতে পেরেছেন। কিন্তু কাজরীকে আমি মেরে ফেললাম, এ কথার তাৎপর্য কি। তাহলে কি কাজরী আর নেই!

আমি গোপালদার দুটো হাত ধরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, সত্যি করে বলুন গোপালদা, কাজরী কি নেই?

গোপালদা হঠাৎ আমার মুখে তাঁর হাতখানা চেপে ধরে বললেন, ঐ পথটার বাঁকে কাজরী গাড়িতে বসে আছে। সে একেবারেই জানে না যে তুই এখানে আছিস, কিংবা আমি তাকে তোর কাছে নিয়ে এসেছি। কাজরী জানে, সে আমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। আর এই মুহূর্তে আমি তাকে গাড়িতে বসিয়ে বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছি।

আমার বুক থেকে যেন একটা পাষাণ ভার নেমে গেল। তাহলে কাজরীর কোন অমঙ্গল হয়নি।

বললাম, আপনি যেভাবে ভয় দেখালেন গোপালদা, আমি একেবারে কথা বলতে পারছিলাম না। আমার সারা শরীর কাঁপছিল। আচ্ছা গোপালদা ডাক্তার চৌধুরী আসেন নি?

গোপালদা গলার স্বরটাকে নীচু করে বললেন, অত তাড়াতাড়ি সব কথা বলা যাবে না। সংক্ষেপে বলি শোন্‌, ডাক্তার চৌধুরী মারা গেছেন। ও লন্ডন থেকে চলে এসেছে। কিন্তু.....।

বলতে গিয়েই গলাটা ভেঙে গেল গোপালদার। অতি কষ্টে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, সে আর নেই। হার ডেজ্‌ আর নাম্বার্ড।

আবার বললাম, আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন গোপালদা?

যেন একটা অন্ধকার পাতালপুরী থেকে গোপালদার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ক্যানসার, বোন ক্যানসার।

আমি কতক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। আমার চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে আসছিল। গোপালদা আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে না ধরলে আমি হয়ত নিজেকে স্থির রাখতে পারতাম না।

গোপালদা আমাকে নাড়া দিয়ে বললেন, কিরে, তুই এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকবি? মেয়েটাকে কতক্ষণ বাইরে বসিয়ে রাখব?

সম্বিত ফিরে এল। বললাম, আমার ভেঙে পড়া উচিত হয়নি গোপালদা, চলুন ওকে নিয়ে আসি।

গোপালদা বললেন, না, এখন তুই ওর সামনে যাসনে। আমাকে তোর ঘরের সব কিছু দেখিয়ে দে। তারপর তুই হতভাগা ঘণ্টা তিনেকের জন্যে কেটে পড় এ-ঘর থেকে। আমি ওকে নিয়ে যখন বেড়াতে বেরোব তোর স্কুলের দিকে তখন ঐ রাস্তাতে দেখা হয়ে যাবে তোর সঙ্গে। তারপর যা হোক্ করে একটা ম্যানেজ করে নেব। এখন একে জার্নির ধকলে টায়ার্ড, তার ওপর তোকে আচমকা দেখলে ওর নার্ভের ওপর দারুণ চাপ পড়বে।

আমি আর কোন কথা না বলে গোপালদাকে সব কিছু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিলাম। পাশের ঘরে নতুন বিছানা পেতে দিলাম।

চলে যেতে যেতে বললাম, আমার কাজের মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দেব। আপনি শুধু ওকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন।

সেদিনটা ছিল রোববার। স্কুল বন্ধ। ছেলেরা স্কুলের মাঠে খেলাধুলো করছিল। আমি আমার কাজের মেয়ে নান্‌কির ঘরে গিয়ে তাকে বাসায় পাঠিয়ে দিলাম। বলে দিলাম, মেমসাহেবকে খুব সেবা-যত্ন করবে, আর আমার কথা কিছু বলবে না।

নান্‌কি ভারী মিষ্টি মেয়ে। সে তার নাকের নথিয়াতে আঙুল রেখে মুখটা ঈষৎ বেঁকিয়ে বলল, মেমসাহেবটা কে আছে তুমার বটে?

একটা কপট ধমক দিয়ে বললাম, তুই এখন যাবি আমার সামনে থেকে?

ও খিল্‌খিল্ করে হেসে ওর পায়ের বুড়ো আঙুলের ঝটিয়ায় ঝুমঝুমি বাজিয়ে আমার সামনে থেকে দৌড়ে পালাল।

স্কুল-বাড়ি ছাড়িয়ে আমি আরও খানিক পথ এগিয়ে গেলাম। দু'পাশে পাহাড়ের ঢালে গুঁদ্‌লির চাষ হয়েছে। এখন সবুজ গাছগুলো মল্‌মল্ করছে। আমি ঐ গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। কেউ কোথাও নেই। নীল আকাশ দিগন্তের পাহাড় ছুঁয়ে। রোদ্দুরের সোনা আকাশ থেকে অমৃত ধারার মত ঝরে পড়ছে সামনের সবুজ ক্ষেতে। এক ঝাঁক বাসক পাতার মত সুগা পাখি বাতাসে ঢেউ তুলে উড়ে গিয়ে বসল লাল লাল ফলে ভরা তেন্দ্ গাছটার ডালে। চারদিকে খুশি, চারদিকে প্রাণ।

আমি হাত দুটো জোড় করে মনে মনে বললাম, হে অমিত প্রাণের দেবতা, তুমি আমার কাজরীর জন্যে তোমার এই অফুরন্ত প্রাণের ভাণ্ডার থেকে সামান্য কিছু অমৃত দান কর। সে যেন এই দুরারোগ্য ব্যাধিকে জয় করতে পারে তার দুর্জয় মনের শক্তিতে।

আমি ডাক্তার, তাই ঈশ্বরের কাছে কাজরীর জন্যে মিথ্যা প্রাণভিক্ষা চাইলাম না। আমি শুধু তার জন্যে শক্তিভিক্ষা করলাম।

বেলা তখন চারটে। আমি স্কুল-বাড়ি ঘুরে নেমে চললাম আমার বাসার পথে। সামান্য এগিয়েই দেখতে পেলাম ওদের। ওরা ধীরে ধীরে উঠে আসছিল ওপরের দিকে। সাদা পুরো হাতা ব্লাউজ আর হাল্‌কা পিঙ্ক রঙের শাড়ীতে ওকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি ভাবতেও পারছিলাম না আমার কাজরী আর খুব বেশীদিন এই পৃথিবীর সোনালী আলোয় স্নান করতে পারবে না, বুক ভরে এই অফুরন্ত হাওয়া টানতে পারবে না।

একটা আস্‌না গাছের তলায় এসে আমি তখন দাঁড়িয়েছি। ওরা কাছাকাছি এল। হঠাৎ দেখি কাজরীকে ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন গোপালদা। দুম্ করে একখানা কিল মেরে বললেন, সব ফাঁস করে দিলি তো হতভাগা।

সবিস্ময়ে বললাম, আমি ফাঁস করলাম!

তুই নয়তো কি আমি?

বেকুব বনে গিয়ে বললাম, তাহলে ঐ কাজের মেয়ে নান্‌কিটা কিছু বলে থাকবে।

গোপালদা বললেন, তোমার মুণ্ডু।

তারপর মুখখানাতে বিচিত্র ভঙ্গী করে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, হ্যাঁ রে, তুই এত ভালবাসিস কাজরীকে? ড্রয়ারে একখানা ফটো আর এক গোছা চিঠি রেখে দিয়েছিস!

মাথা চুলকে বললাম, ওহো বড্ড ভুল হয়ে গেছে। প্যাড, বইপত্র সব ট্রাঙ্কে লুকিয়ে রাখলাম, কিন্তু ড্রয়ার থেকে জিনিসগুলো সরাতে ভুলে গেছি।

গোপালদা বললেন, আর ঐ রামধনু রঙের সাতটা রুমাল? টিনের কৌটোয় ভরে কুলুঙ্গীতে রেখে দিয়েছিলি, তাও আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমাব সঙ্গে কাজরীর শেষ যেদিন দেখা হয়েছিল সেদিন ও একটি সুদৃশ্য টিনের কৌটোয় ওর সেই রঙীন বার্তাবহ রুমালগুলো ভরে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, এগুলো আমার, যত্ন করে তোমার কাছে রেখে দিও। হারিও না যেন।

ওর কোনকিছুই আমি হাবাইনি। বাইবের জিনিস আব অন্তরেব ধন, সবই কৃপণের মত সঞ্চয় করে রেখে দিয়েছি।

কাজরীর দিকে এবার তাকালাম। ও হাসছিল। অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে ও।

হঠাৎ গোপালদা বললেন, থাক তোরা, আমি চট করে এক প্যাকেট বিড়ির সন্ধান নিয়ে আসি। হ্যাঁ শোন, আমি একেবারে বাসায় ফিবব। দয়া করে ঘন্টা-খানিকের ভেতরে ফিরো। মেয়েটাকে হাঁটিয়ে মেরো না।

গোপালদা টাট্টুর মত লাফাতে লাফাতে নীচের রাস্তায় গেলেন।

এখন আমি কাজরীব মুখোমুখি।

কাজরী অনেক ফরসা হয়ে গেছে। চোখে করুণ একটা বাগিণীর মূর্ছনা লেগে আছে। মুখে মৃদু হাসি।

বললাম, আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তোমাকে।

ও বলল, ডাক্তারের অভিজ্ঞ চোখে রক্তহীনতাটা কি ধরা পড়ছে না?

ওর একখানা হাত ধরে বললাম, ওকথা থাক, চল আমরা ধীরে ধীরে এগোই।

ও আমার সঙ্গে চলার জন্যে পা বাড়িয়ে বলল, এমনি করে আর কত দূরে চলতে পারব পুষ্কর।

বললাম, অনেক অনেক দূর। আমরা বিরামহীন চলব।

ও হাসল। সে সময় কোন কথা বলল না। আমরা খানিক দূর এগিয়ে একটা শিখুয়া গাছের তলায় বসলাম। নীচে একটা বিস্তীর্ণ খাদের খানিক অংশ জল চক্‌চক্ করছে! ভারী সুন্দর জায়গাটা। নির্জন, লোকদৃষ্টির আড়ালে। আমি মাঝে মাঝে এখানে এসে বসি। শিখুয়া বা শিশুগাছের পাতাগুলো হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে তালি বাজানর মত শব্দ করছিল। এক ঝাঁক ছোট চুহেরা পাখি একবার করে হাওয়ায় ডিগবাজি খেয়ে আবার উড়ে এসে বসছিল শিখুয়ার ডালে।

কাজরী মগ্ন হয়ে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে ওদের খেলা দেখল। এক সময় চোখ নামিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, আজ এই মুহূর্তে কেন জানি না বড় বাঁচতে ইচ্ছে করছে পুষ্কর। অসুখটা ডায়াগনোসিস হওয়ার পর থেকেই আমি শুধু মৃত্যু কামনা করে এসেছি, কিন্তু এখানে তোমার কাছে বসে, পাখিদের খেলা দেখতে দেখতে কেমন যেন আরও বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকতে প্রাণ চাইছে।

ওর হাতখানা চেপে ধরে বললাম, তুমি তো আমার কাছে রয়েছ কাজরী? আমার হাতের বাঁধন থেকে তুমি পালাবে কোথায়।

ও মুখটা নীচু করল। এক সময় বলল, জান পুষ্কর, আমি একদিন তোমার দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়িতে গিয়েছিলাম। বুড়ো মথুরাদা দেশে চলে গেছে। নতুন দারোয়ান রয়েছে দেখলাম। ওর আমাকে চেনার কথা নয়। তবু একেবারে গেটের কাছ থেকে ফিরে আসতে পারলাম না। ওর অনুমতি নিয়ে চারদিকটা ঘুরে বেড়ালাম। তোমার ঘরটা বন্ধ। জানালার একটুখানি ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম। খাটের ওপর একটা ছেঁড়া সতরঞ্চ বিছোনো আছে। বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। আমি সেখান থেকে পালিয়ে এলাম। পুকুরের চারদিকে ঘুরলাম। সেই যে পায়রার ঘর, তার চাতালে গিয়ে দাঁড়াতেই ওপর থেকে কয়েকটা পায়রা উঁকি দিলে। আমার মনে হল, আমি সেই ওপরে রয়েছি আর

তুমি নীচে দাঁড়িয়ে দুষ্টুমি শুরু করে দিয়েছ। সত্যি কি হুড়োহুড়িটাই না করেছি আমরা। তারপর গেটখানা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে শেষবারের মত তাকাতে গিয়ে দেখি সব ঝাপসা হয়ে গেছে।

আমি বুঝতে পারলাম আমার হাতের ভেতর কাজরীর হাতখানা থরথর করে কাঁপছে।

আমি বললাম, কাজরী আমাদের কাছে এখন কোন অতীত নেই। শুধু তুমি আর আমি পাশাপাশি রয়েছি।

ও মুখ তুলে বলল, আর কোন ভবিষ্যৎও নেই পুষ্কর। শুধু কয়েকটা গোনাগুনতি দিন একটা পান্থশালায় রয়েছি। দু'দিনের থাকা তবু কত নিবিড়, কত উত্তাপে ভরা।

আমরা দু'জনেই কতক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

গোপালদা এখন আমার হয়ে দূরের গাঁওগুলোতে রোগী দেখতে যান। আমি রোজ একবার স্কুলে যাই। মন পড়ে থাকে কাজরীর কাছে। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসি। বাঁকের মুখে ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের বেল বাজাই। ও ঘরের উঠোনে ফুলের কেয়ারীর মাঝখানে ইজিচেয়ারে বসে থাকে। আমার সঙ্গে মুখোমুখি হলেই ও এক-মুখ হাসি ছড়ায়, হাতখানা আস্তে আস্তে তুলে নাড়তে থাকে।

আমি জানি ধীরে ধীরে ওর হাড়গুলোতে ছড়িয়ে পড়বে মৃত্যুর বিষাক্ত বিষ। অসাড় হয়ে আসবে ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তারপর এক গতিহীন দুর্বলতার ভাষাহারা সমুদ্রে ও ডুবে যাবে।

ও সবই জানে। তবু মৃত্যুর উত্তাল সমুদ্রে ক্ষুদ্র একখানা ভেলা নিয়ে কি দুর্বার প্রাণশক্তিতে ও বেয়ে চলেছে। যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ জীবনকে তিলে তিলে ভোগ করে নেব।

গোপালদা রাঁচিতে নিয়ে গিয়ে ব্লাড ট্রান্সফিউশান করিয়ে আনবেন বলেছিলেন কিন্তু কোন কথাই শোনেনি কাজরী।

তার আজকাল যে একটুখানি হাঁটলেই কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে পারতাম। কিন্তু দুর্বলতাকে উপেক্ষা করার এত বড় জোর ও কি করে পায় তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

আমাকে ও আজকাল বড় একটা চোখের আড়ালে যেতে দিতে চায় না। যতক্ষণ ঘরে থাকি ও আমার বুকে মাথা রেখে চুপটি করে চেয়ে থাকে জানালার বাইরে। কোন কোনদিন গান করে। অতি ধীরে। আমি বুঝতে পারি গলার কাজগুলো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। তবু ওর গানের মগ্নতাটুকু আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

করম পরব শুরু হয়েছে। আশেপাশের ডুংরিগুলো থেকে অনেক রাত অব্দি মন্দিরা, নাক্‌ড়া, মঞ্জরী আর মুরলীর আওয়াজ শোনা যায়।

কখনো কখনো জ্যোৎস্নার পাখায় গান ভেসে আসে ঃ

করমকা দিনে
মোরে আঁইখে নিদোনি লাগে
কৈসে কে নিকালব ভাগিনা বছরু
করমকা দিনে।

কাজরীর চোখেও ঘুম থাকে না। যখনই আমার ঘুম ভেঙে যায় তখনই দেখি, ও জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। কান পেতে শুনছে গান।

বলি, ঘুমোও কাজরী, অনেক রাত হল।

ও আস্তে আস্তে বলে প্লিজ পুষ্কর, আমাকে আর একটুখানি শুনতে দাও। যখন ঘুমোবো তখন আর তো জাগব না।

শেষদিনগুলোতে ওর যন্ত্রণা যখন সহ্যের বাইরে চলে যেত তখন ওকে মরফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতাম।

এক রাতে ও আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বলল, দেখ পুষ্কর, একটা মেঘ এগিয়ে আসছে কোয়েল নদীটার ওপারের পাহাড় থেকে। ঝড়ো হাওয়া বয়ে নিয়ে আসছে সেই মেঘটা। ঐ যে

পিয়াশালের বনের মাথায় চাঁদ, ওটা আর একটু পরেই ঢাকা পড়ে যাবে।

জানো পুষ্কর, কাল দুপুরে তোমরা যখন বেরিয়ে যাবে, নান্‌কি আমাকে পাঞ্জন পরে ঘুরে ঘুরে নাচ দেখাবে বলেছে। বোধহয় সে নাচ আমি আর দেখতে পাব না।

আমি ওকে বুকের মাঝে একটি ছোট পাখির মত জড়িয়ে বললাম, তুমি কাল নিশ্চয়ই নান্‌কির ঝুমুর পরা নাচ দেখবে কাজরী। এখন লক্ষ্মীটি, একটু ঘুমোও।

কাজরী অস্পষ্ট গলায় আমার বুকে মুখ রেখে বলল, তোমাকে গান শোনাব বলেছিলাম, সে গান তো আর শোনান হয়নি। আজ এখুনি মনে হচ্ছে, আমি যেন তোমাদের সেই দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়িতে বসে আছি। আমার মনে পড়ছে সেই প্রথম গাওয়া গানটা।

একটু সময় চুপ করে থেকে ও ভাঙা অস্পষ্ট গলায় গাইল :

'আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে....।'

চড়বড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ এক পশলা অকাল বর্ষণ হল। ওর গান হাওয়ার হাহাকার আর বৃষ্টির শব্দে ধীরে ধীরে ডুবে গেল। ও এক সময় ক্লান্ত হয়ে আমার বুকের মাঝখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমি ওকে তুলে নিয়ে ভাল করে শুইয়ে দিলাম বিছনায়। কম্বলখানা টেনে সুন্দর করে ঢেকে দিলাম ওর দেহটা।

ভোরে উঠে দেখি একটা কোইল ডাকছে পিয়াশালের পাতার ফাঁকে। ডেকে ডেকে কাকে যেন জাগাবার চেষ্টা করছে। একরাশ সূর্যের আলো লুটিয়ে পড়েছে সবুজ ঘাসের লনে। বৃষ্টির বিন্দুগুলো ঝুমুরের রুপোলী দানার মত ছড়িয়ে পড়ে আছে। ঐ মেঘলোক থেকে নান্‌কির মত কোন এক নর্তকী এসে যেন তার শ্রেষ্ঠ নাচ নেচে গেছে।

পাষাণ স্তূপের মত একটা নিঃসঙ্গতা ক'দিন ধরে আমার বুকে চেপে বসে আছে। প্রতিকারহীন অব্যক্ত এক বেদনা আমার চেতনাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। সারাদিন শুধু বসে থাকা, উদাস চোখে কেবল চেয়ে চেয়ে দেখা। বাগানের যে কোণটায় বসে ও আমার ফেরার পথের দিকে চেয়ে থাকত, সেখানে আজও পড়ে আছে তার ইজিচেয়ারখানা।

গোপালদা ভেতরের ঘরে কি যেন সব গুছিয়ে তুলছেন তাঁর সুটকেসে। আজ দুপুরের গাড়িতে রাঁচি রওনা হয়ে যাবার কথা।

আমি আর থাকতে পারলাম না। উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম গোপালদার পাশে।

—চলে যাচ্ছেন গোপালদা, আমি আর থাকতে পারব না এখানে।

গোপালদার হাতের কাজ থেমে গেল। আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন।

—থাকতে পারবি না মানে? আলবাৎ থাকবি। তুই কি রে! মেয়েটা চোখের সামনে নেই বলেই কি সব হারিয়ে গেল। তাকে এখানে একা ফেলে আমরা সবাই পালাব? তার চেয়ে বল আমিই থেকে যাই।

বললাম, তাহলে কথা দিয়ে যান আপনি আবার আসবেন?

—আসব রে আসব। তোদের দু'জনকে ছেড়ে আমি বেশীদিন কি কোথাও থাকতে পারি।

●

রিসেপশনিস্ট

কিংশুক সামনে তাকিয়ে দেখল অন্ধকারের সমুদ্রে ট্যুরিস্ট বাংলোটা ঝলমলে জাহাজের মত জেগে আছে।

এইমাত্র যে বাসখানা জম্মু থেকে তাদের এনে ট্যুরিস্ট বাংলোর সামনে পৌঁছে দিল, তার আলোগুলো তখনও নেভেনি। জাহাজ সংলগ্ন বোটের মত মনে হচ্ছিল গাড়িখানাকে।

কিন্তু কি করবে কিংশুক। এইমাত্র একটা ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া তার শিরা উপশিরার রক্ত চলাচল ক্রিয়াটাকে প্রায় বন্ধ করে দিল।

গায়ে বেশ খানিকটা টেম্পারেচার আর মনে তার চেয়েও বেশি জোর নিয়ে সে কলকাতা ছেড়েছিল। সারা ট্রেনে বিশ্রাম নিতে নিতে আর ওষুধ খেতে খেতে এসেছে সে, কিন্তু এইমাত্র বাসে শ্রীনগরে পৌঁছে সে বুঝতে পারল, কাজটা তার ভাল হয়নি। সম্পূর্ণ একা একটা মানুষের অসুস্থ অবস্থায় কলকাতা থেকে বেরিয়ে আসা মস্ত বড় একটা ঝুঁকির ব্যাপার বইকি।

এমন একটা ঠাণ্ডা তার ক্লান্ত শরীরটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল, যার হাত থেকে সেই মুহূর্তে রক্ষে পাবার কোন উপায়ই সে দেখতে পেল না।

কুলিরা মাল টানাটানি করে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। যাত্রীরা প্রায় সবাই যে যার পূর্ব-নির্দিষ্ট আস্তানার দিকে রওনা হয়ে গেল। কিংশুক, তার হোল্ডলখানার ওপরে বসে রইল জড়-পিণ্ডের মত। দাঁতে দাঁতে চেপে, দু'হাতের চেটোয় কান ঢেকে সে অন্ধকারের সমুদ্রে নিঃসঙ্গ একটা বয়ার মত ভেসে রইল।

টাঙ্গাওয়ালাটা কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়ালই করেনি কিংশুক।

সাব, আপ ইস জাড়েমে বৈঠ কর কেয়া কর রহে হ্যায়। কাঁহা চলিয়ে গা? চলিয়ে।

কিংশুক জানাল, তার যাবার নির্দিষ্ট কোন জায়গা নেই, সে এই ঠাণ্ডায় বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে, তাই ট্যুরিস্ট অফিসে গিয়ে সে আস্তানার খোঁজ করবে সে ক্ষমতাটুকুও তার নেই।

হামারে সাথ আইয়ে জনাব,—বলে টাঙ্গাওয়ালা কিংশুকের হাতখানা ধরে তুলল। কিংশুককে ধরে নিয়ে সে পৌঁছে দিল ট্যুরিস্ট অফিসের বারান্দায়।

আলোয় ঝলমল ঘরখানার ভেতর ঢুকে কিংশুক হঠাৎ বেশ সুস্থ বোধ করল। বাইরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে ঘরের ভেতর এসে পড়ার জন্যেই বোধকরি এ অনুভতি।

অনেকেই ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল তখনও।

ট্যুরিস্ট অফিসার প্রত্যেকের অনুসন্ধানের উত্তর একই রকম মাথা নেড়ে দিয়ে যাচ্ছিল। তার একটিমাত্র অর্থ ছিল, স্যরি, নো ভেকেন্সি।

কিংশুক কোনরকমে ভীড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে বলল, একটা কোন হোটেল বা হাউসবোটের সন্ধান দিতে পারেন দয়া করে?

কোন কথা না বলে ট্যুরিস্ট অফিসার নিচু হয়ে ড্রয়ার থেকে টাইপ করা একটা কাগজের শিট টেনে নিয়ে কিংশুকের দিকে এগিয়ে দিতে গেয়ে বলল, সিজন্ টাইম, আশা কম, চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

হাতে কাগজখানা নিয়ে টাইপ করা অক্ষরগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল কিংশুক।

হোটেল ভালভিউ।

ঐখানেই চোখটা আটকে গেল। আর বেশী দেখার মত সময় শরীর কিংবা মনের অবস্থা কোনটাই ছিল না।

বাইরে বেরিয়ে এসে টাঙ্গাওয়ালাকে বলল, হোটেল ডালভিউমে চলিয়ে।

টাঙ্গায় খানিক পথ যাবার পরেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

একেবারে অচেনা অন্ধকারের রাজ্য। আকাশের আলোগুলো সন্ধ্যে থেকেই জ্বলেনি। ঠাণ্ডা হাড়-কাঁপানো দমকা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির মিহি গুঁড়োগুলো কপালে এসে লাগছিল। রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে এক একটা ল্যাম্প পোস্টের আলো দূর আকাশের ম্লান নিষ্প্রভ এক একটা হলুদ তারা যেন। ঘোড়ার খুরের শব্দ, বৃষ্টির এলোমেলো ঢেউ, টিমটিমে আলোগুলোর কাঁপা কাঁপা চাহনি, সব মিলিয়ে কিংশুকের মনে হল, সে যেন রাতের গাঙে নৌকোয় ভেসে চলেছে। এদিকে ওদিকে টেমি জ্বালিয়ে ভাসছে ছোট ছোট অনেকগুলো ডিঙি নৌকো।

একসময় হোটেল ডালভিউ-এর সামনে এসে টাঙ্গাটা দাঁড়াল।

কিংশুক নেমে এল। টাঙ্গাওয়ালা তার পেছন পেছন হোল্ডলখানা বয়ে নিয়ে এল হোটেলের অফিস রুমে।

একটি মেয়ে বসেছিল, দেখে মনে হল রিসেপশনিস্ট।

অফিস ঘরে ঢুকেই কিংশুক বুঝতে পারল সে ভুল করেছে। এ হোটেল তার জন্য নয়। ওয়েস্টার্ন স্টাইলের হোটেল। পাশেই বার। নীলাভ আলোর কোমল ছোঁয়ায় দারুণভাবে স্বপ্নাচ্ছন্ন। বিলিতি অর্কেস্ট্রার সিম্ফনি ঢেউয়ের মত উঠে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

এখন কোন উপায়ই আর তার হাতে নেই। এসব হোটেলের চার্জ যে তার ধরাছোঁয়ার বাইরে তা সে জানে। তবু কিংশুক এগিয়ে গেল। কারণ নতুন করে আস্তানা খোঁজার মত শক্তি তার ছিল না। যেটুকু পুঁজি নিয়ে সে বেরিয়েছে তাতে এসব হোটেলে বেশিদিন থাকা তার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়। তা হোক, এই রাতটুকুর মত অন্তত বাঁচতে পারলেই সে খুশী। তারপর সারা কাশ্মীরকে না দেখেই সে গুডবাই জানিয়ে ফিরে যাবে। সেটা হবে তার বেহিসেবী কাজের প্রায়শ্চিত্ত।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটির কাছে এগিয়ে যেতেই সে অভ্যস্ত এক চিলতে হাসি হেসে বলল, স্যরি।

সারা মুখখানায় অদ্ভুত যন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠল কিংশুকের।

মেয়েটি লক্ষ্য করল। পাশে পড়ে থাকা বাঁধানো খাতার পাতা উল্টে বলল, নামটা বলুন, ওয়েটিং লিস্টে তুলে নিচ্ছি, কাল বিকেল নাগাদ পেয়ে যেতে পারেন। আজ নিরুপায়।

মেয়েটি ইংরেজিতেই কথা বলছিল।

কিংশুক তখন কোন রাজ্যেই নেই। স্বভাব ভদ্রতায় তবু সে নামটা উচ্চারণ করল, কিংশুক মুখার্জী।

নামটা লিখতে গিয়ে মনে হল যেন মেয়েটি একটু থামল। তারপর একটানে লিখতে লিখতেই বলল, কলকাতা থেকে আসছেন?

বিশুদ্ধ বাংলায় মেয়েটি কথা বলে উঠল। এমন বিস্মিত বোধকরি আর কোনদিন হয়নি কিংশুক।

হঠাৎ একরাশ কথা দমকা হাওয়ার মত ছড়িয়ে দিল সে।

ঠিক ধরেছেন, কলকাতা থেকেই আসছি। দারুণ অসুবিধেয় পড়ে গেছি, শরীরটাও বিগড়েছে। অচেনা-অজানা জায়গা, এ রাতে একটা আশ্রয় না পেলে কি যে হবে ভাবতেও পারছি না। আচ্ছা দেখুন, ভগবান কি আশ্চর্য যোগাযোগটাই না ঘটিয়ে দিলেন, আপনিও যে বাঙালী একেবারেই ভাবতে পারিনি।

মেয়েটি হেসে সামনের চেয়ারে বসতে বলল কিংশুককে।

ঝড়ের অন্ধকার সমুদ্রে যেন বাতিঘরের আলোটা দুলছে কিংশুকের চোখের সামনে। একটা আশ্বাসের আলো ফুটে উঠল তার মুখে।

মেয়েটি থুতনিতে বুড়ো আঙুলের চাপ দিয়ে তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে ধরে থাকা পেন্সিলটা গালে ছুঁইয়ে রেখে বলল, আমি কাশ্মীরী।

কিংশুক এবার আর কোন কথা বলতে পারল না। একটি কাশ্মীরী মেয়ে কি করে এমন বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণে কথা বলে যেতে পারে, তা তার সমস্ত ধারণার বাইরে বলে মনে হল।

কিংশুক চেয়ে আছে মেয়েটির দিকে। মনের ক্ষীণ আশ্বাসটুকু মুছে গেছে। মাথার ওপর নীলাভ আলোটা অনেক ম্লান মনে হচ্ছে এখন। তার চেয়েও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে কিংশুকের মুখখানা।

মেয়েটি উঠে চলে গেল ভেতরে।

কিংশুক বাইরে গিয়ে টাঙ্গাওয়ালাকে আর একটুখানি অপেক্ষা করতে বলে এল। মেয়েটি ফিরে এলেই সে বিদায় জানিয়ে বেরোবে।

বাইরে সমানে বৃষ্টি পড়ছে। নিজের পোশাকটাও যেন বরফের তৈরি বলে মনে হচ্ছে কিংশুকের। মাথাটা অনেক ভারী হয়ে উঠেছে। এদিক-ওদিক ফেরালেই একটা অস্বস্তি কাঁটার মত বিঁধছে।

মেয়েটি এলো না, এলো ট্রেতে কফি নিয়ে বেয়ারা। কিংশুকের সামনে রেখে খাবার ইঙ্গিত করে সবিনয়ে মাথাটি দুলিয়ে চলে গেল।

কিংশুক মেয়েটির জন্য অপেক্ষা করবে না গরম কফির কাপটা তুলে নেবে তাই ভাবছিল, মেয়েটি ঘরে ঢুকল।

নিন কফি খান।

ধন্যবাদ জানিয়ে কিংশুক তুলে নিল কাপটা। ঠাণ্ডায় গরম কফিটুকু কয়েক চুমুকেই সে শেষ করে ফেলল।

এই মুহূর্তে তার মনে হল, সে তার খুইয়ে ফেলা শক্তিটুকু ফিরে পেয়েছে।

উঠে দাঁড়িয়ে কিংশুক বলল, মনে থাকবে আপনার আতিথেয়তার কথা।

কিংশুক উঠে দাঁড়াতেই মেয়েটি তার দিকে কেমন একটুখানি অবাক চোখে তাকাল। তারপর স্বল্প কথাটুকু যখন শেষ হল কিংশুকের তখন মেয়েটি বলল, উঠছেন কোথায়, বসুন।

আবার আশ্বাসের ইঙ্গিত। কিংশুক বসে পড়ল চেয়ারে।

মেয়েটি আর কোন কথা বলল না। সামনের ফাইলগুলোকে টেনে নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

প্রায় পনেরো মিনিট নির্বাক বসে রইল কিংশুক। বড় রহস্যময় মনে হচ্ছে তার সমস্ত ব্যাপারটা। থাকতেই যদি দেবে তাহলে এত দেরি করছেই বা কেন! আর না দেবার মতলব থাকলে এতক্ষণ বসিয়েই বা রাখবে কেন! ভাবতে গিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে গেল কিংশুকের।

মেয়েটির দিকে সে আড়চোখে তাকাল। নির্বিকার মুখ, ফাইলে চোখ ডুবিয়ে বসে আছে। কিংশুকের মনে হল মুখখানাতে যেন দূর বাংলাদেশের আদল।

পেছনে পায়ের সাড়া বেজে উঠতেই কিংশুক ফিরে তাকাল।

একটি সুঠাম কাশ্মীরী যুবক এগিয়ে এসে দাঁড়াল মেয়েটির সামনে। চোখমুখে প্রশান্তির ছাপ। একটিমাত্র প্রশ্নচিহ্ন আঁকা হয়ে আছে সে মুখে।

মেয়েটি নিজের সীট ছেড়ে উঠল না, কিংবা যুবকটিকেও বসতে বলল না।

শুধু কিংশুককে দেখিয়ে দিয়ে বলল, ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন, একটা কিছু ব্যবস্থা কর এঁর। তোমার হাউসবোটে জায়গা থাকলে অন্য কোথাও পাঠিও না যেন।

ওপরওয়ালার নির্দেশ অধস্তন পুলিশ কর্মচারীরা যেমন নীরবে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে নেয়, ঠিক তেমনি করে যুবকটি একটুখানি মাথা দুলিয়ে কিংশুককে বলল, আপনার মালপত্র টাঙ্গায় রয়েছে। টাঙ্গা ছেড়ে দিন, রাস্তার বাঁ দিকে গেলেই আমার হাউসবোট 'হানিমুন'।

কিংশুক বাইরে বেরিয়ে ভাড়া চুকিয়ে টাঙ্গাওয়ালাকে বিদায় করল।

যুবকটি ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে বলল, একটুখানি ভিজতে হবে আপনাকে। মালগুলো আমি তুলে নিচ্ছি শিকারায়, আপনি সাবধানে নীচে নেমে আসুন।

কিংশুক আর একবার মেয়েটির কাছে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে এল।

কিছু না বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মিষ্টি করে হাসল মেয়েটি।

আলোর মালায় সাজানো হাউসবোট 'হানিমুন'। ড্রইং, ডাইনিং থেকে দু'খানা বেডরুম পর্যন্ত সারা হাউসবোট দামী কার্পেটে মোড়া। নির্বাচিত পর্দা আর সজ্জিত ফুলদানিতে হাউসবোটখানা বাসর ঘরের মত সেজে আছে। মধুচন্দ্রিমার উপযুক্ত বলতে হবে হাউসবোট এই 'হানিমুন'কে।

ক্লান্ত শরীর এত ভাল লাগার অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে আসছিল। সামান্য কিছু রাতের খাবার খেয়ে রিমঝিম বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল কিংশুক।

রাতে জ্বর এল। টেম্পারেচার উঠে গেল অনেকখানি। পরের দিন জ্বরে প্রায় বেহুঁশ হয়েপড়ে রইল কিংশুক।

সন্ধ্যার দিকে ঘোলাটে চোখ মেলে জল ঢালা কাঁচের ওপারে কয়েকটা আবছা মুখের মত সে যেন দেখতে পেল।

একখানা মুখ খুব চেনাচেনা লাগছে তার। কোথায় যেন দেখেছে সে এই মুখ। স্পষ্ট মনে করতে কষ্ট হচ্ছে। খুব কোমল নীলাভ একটা আলোর নীচে স্থির হয়ে থাকা প্রজাপতির মত দাঁড়িয়ে আছে সেই মুখের মালিক।

একটা লোক কি যেন সব লিখে চলেছে। মাঝে মাঝে আর একটা লোককে কি যেন বলছে।

প্রজাপতিটা নড়ে উঠল। কার্টুন ছবির মত সব কিছু কিংশুকের চোখের ওপর থেকে নাচের ভঙ্গীতে সরে গেল।

কিংশুক চোখ বুজল। চোখ মেলতেই দেখে প্রজাপতিটা আবার কোন্ ফাঁকে ঘরে এসে ঢুকেছে।

কিংশুকের মাথায় কে যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। প্রজাপতিটা রঙীন পোশাক পরা একটি মেয়ে হয়ে গেছে। মাথায় কোমল ডানার ছোঁয়া দেওয়ার মত ক্রমাগত হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। বড় চেনা মেয়েটি। কোথায় কবে যেন নিশ্চিত দেখা হয়েছিল এ মেয়েটির সঙ্গে। ভাবতে গিয়ে যন্ত্রণায় কাতর হল কিংশুক। মুখখানাতে কষ্টের ছাপ ফুটে উঠল। চোখ বন্ধ হল তার।

বেশ ক'দিন পরে জ্বর ছাড়ল। মনে হল কিংশুকের, সে যেন পুরো একটি বছর কঠিন রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

সেই যুবক, যে তাকে হোটেল ডালভিউ থেকে হাউসবোট 'হানিমুনে' এনেছে, সে এ ক'টি দিন প্রায় সারাক্ষণ রয়েছে তার সঙ্গী হয়ে। মনসুর তার নাম। মালিক আর কর্মচারী দুটি পদই তার এই হাউসবোটে। মুখে বিনীত হাসি, হাতে কাজ সারাক্ষণ।

মনসুরকে সামনে দেখেই কিংশুক বলে উঠল, ভাইসাব, তোমার হাউসবোটখানা খুবসুরত জেনানা, কিন্তু এক জেনানার এজলাসে কতক্ষণ বন্দী হয়ে থাকা যায় বল?

হাসল মনসুর, ঠিক কথা, তবে মরিয়মের হুকুম না পেলে আপনাকে তো বোটের বাইরে নিয়ে যেতে পারব না সাহেব।

কিংশুক অবাক হয়ে তাকাল মনসুরের দিকে।

মরিয়ম, কই আমি তো চিনি না তাকে।

মনসুর যেন আকাশ থেকে পড়ল।

মরিয়মকে চেনেন না সাহেব, ও-ই তো আপনাকে আমার এ হাউসবোটে পাঠিয়েছে!

লজ্জা পেল কিংশুক। সত্যি 'ডালভিউ' হোটেলের সেই বাংলাভাষী কাশ্মীরী মেয়েটিকে ভুলে যাওয়া তার উচিত হয়নি। তবে দোষ বড় একটা নেই তার। সেই বৃষ্টির রাতে, অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় মেয়েটির নাম জানা বোধকরি সম্ভব ছিল না, তার পক্ষে। নিজেকে নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিল সে। অপটু দেহটাকে কোনরকমে টেনে আনতে পেরেছিল এই হাউসবোটে। তার পরের ক'টা দিন তার কাছে অস্পষ্ট; এলোমেলো বৃষ্টির হাওয়ায় মুখে যাওয়া, উড়ে যাবার মত।

কিংশুক বলল, মাপ কর ভাই, নামটা জানা হয়নি ওর। মরিয়ম সে রাতে তোমার কাছে না পাঠালে শ্রীনগরের পথে পড়েই মরতে হত।

মনসুর বলল, যে কদিন আপনার তবিয়ত ঠিক ছিল না, মরিয়ম রোজ খবর নিতে আসত। ও-ই তো ডাক্তার দাওয়াই সব করেছে।

কিংশুকের চোখের ওপর একটা অস্পষ্ট ছবি ছায়া ফেলল, ধীরে ধীরে সে ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল। ডাক্তার, মরিয়ম, মনসুর সবাই তার বিছানার পাশে ভীড় করে দাঁড়িয়ে।

কিংশুক বলল, অন্তত মরিয়মের কাছে যেতে দাও, তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসব।

মনসুর বলল, মরিয়মের কাছে যেতে গেলেও তার কাছ থেকে অনুমতি আনতে হবে।

হাসি পেল কিংশুকের। জীবনে নিজের অনুমতি নিয়েই পথ চলার অভ্যেস তার, অন্য কারো অনুমতি নিতে হবে, এ একেবারে তার ভাবনার বাইরে। তবু আজ ভাল লাগছে তার কথাটা শুনতে। আড়ালে থেকে যে উপকার করে গেল তার অনুমতি নিতে হবে বইকি।

অনুমতি নেবার জন্য যেতে হল না। লাঞ্চের পর বাইরের ঘরে সোফায় গা এলিয়ে বসেছিল সে, একটা শিকারা এসে হাউসবোটের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। 'হানিমুনের' সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল যে মেয়েটি সে

কিংশুকের চেনা, হোটেল ডালভিউয়ের রিসেপশনিস্ট মরিয়ম।

উঠে দাঁড়াল কিংশুক। হাত জোড় করে সকৃতজ্ঞ ভঙ্গীতে কাত করল মাথাটা।

মরিয়ম নমস্কার জানিয়ে একমুখ হেসে বলল, এখন সুস্থ বোধ করছেন নিশ্চয়।

কিংশুক বলল, আপনার অনেক অনুগ্রহে।

মরিয়ম ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, খোদা হাফেজ। তাঁর দয়ায় আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

কিংশুক বলল, এই জ্বরে নিজে যতটা ভুগলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি ভোগালাম আপনাদের।

মরিয়ম পাশের চেয়ারে বসার উপক্রম করতে করতে বলল, এতে কারো হাত ছিল না। অসুস্থ যে কোন মানুষই সব সময় সব জায়গায় সেবা পাবার যোগ্য। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।

মরিয়ম বসল, কিংশুক তার পাশের সোফাটায় বসে পড়ল।

মরিয়ম বলল, আপনি কিন্তু ভীষণ লাকি।

এবার চমক লাগার পালা কিংশুকের।

কি রকম?

মরিয়ম বলল, আপনি এলেন, আর রাত কাটতে না কাটতেই সাত দিনের মেঘ বৃষ্টি তুষারপাত হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ঐ যে দেখুন, সামনের পাহাড়গুলোর মাথায় বরফ ঢেলে দিয়ে সরে গেছে বৃষ্টির মেঘ। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। জানেন, এবারের মত এত ট্যুরিস্টের ভীড় কয়েক বছরের ভেতর দেখা যায়নি। আর দু'একদিন বৃষ্টি চলতে থাকলে কাশ্মীর খালি করে সব পালাত, ভাগ্যিস রোদ্দুর উঠল।

কিংশুক বলল, ট্যুরিস্টরা থাকায় আপনাদের যেমন একটা লাভ হল, আমাদের মত সাধারণ ভ্রাম্যমাণদের তেমনি কিছুটা ক্ষতি হল বইকি।

কি রকম? মরিয়মের চোখে মুখে জিজ্ঞাসা উপচে পড়ল।

এই বলছিলাম, কাশ্মীর খালি হয়ে গেলে হোটেলের রেট কিছু কমত, তখন হয়ত হাউসবোট 'হানিমুন' থেকে হোটেল ডালভিউতে দু'একটা দিন কাটিয়ে আসা যেত।

মরিয়মের হাসি ঝকঝকে রোদ্দুরে পাতলা কাচের ভাঙা টুকরোর মত ঝিন্‌ঝিন্‌ করে ঝিকিয়ে বেজে উঠল।

হাসি থামলে মনসুর, মনসুর ডাক দিতে দিতে বলল, শুনে যাও, তোমার সাহাবকে তুমি খুশী করতে পারনি।

মনসুর এক ডাকে হাজির। তার চোখমুখে অবাক ছবি ফুটে উঠেছে।

কিংশুক তো অপ্রস্তুত। সে অমনি বলে উঠল, না ভাইসাব, কথাটা তা নয়, মরিয়ম আমার কথার অর্থটা ধরেছেন অন্যরকম।

মরিয়ম অমনি বলে উঠল, আমি তো মনে করেছিলাম আপনাকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছি বলে আপনি বড় রকমের একটা অভিযোগ এনেছেন।

কিংশুক এবার সশব্দে হেসে উঠল। মনসুর ছাড়া মরিয়মও সে হাসিতে যোগ দিল।

কিংশুক বলল, মনসুরভাই কিন্তু আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে।

দুটো চোখের চাহনি চড়ুই পাখির মত উড়িয়ে দিয়ে একবার মনসুরকে দেখে নিল মরিয়ম।

মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, কি রকম?

কিংশুকের গলায় কৌতুকের সুর, এই যেমন, আপনার ফরমান না পেলে জেল ফাটক থেকে কারোরই ছাড়া পাবার উপায় নেই।

মরিয়ম বলল, যাঁরা কাশ্মীরে দু'দিনের জন্য আসেন তাঁদের ভালমন্দর ভারটা থাকে আমাদেরই ওপর। তাই ইচ্ছে করলেও একটা অঘটন ঘটাতে দিই না আমরা। এখন আপনি সুস্থ হয়েছেন, কেউ আপনাকে আর বন্দী করে রাখবে না।

কিংশুক বলল, বাঁচালেন। একটু ঘুরে বেড়াতে পারলে একেবারে সুস্থ হয়ে উঠব।

মরিয়ম বলল, মনসুর, এলাম তোমার বোটে, অন্তত এক কাপ কফি।

মনসুর মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিংশুক বলল, আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই।

মরিয়ম বলল, ও কথা বলবেন না খাঁটি বাঙালী হয়ে। বাংলা ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানাবার শব্দের অভাব আছে, এ আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন!

ওর কথা বলার ধরন দেখে কিংশুকের হাসি আর যেন থামতেই চায় না। হাসতে হাসতেই বলে চলল, খুব ভুল করেছি আমি, খুব ভুল করেছি, আমার মনেই ছিল না যে আপনি অর্ধেক কাশ্মীরী আর অর্ধেক বাঙালী।

মরিয়ম কিন্তু এ কথার কোন জবাব দিল না। ভাবলেশহীন মুখ করে বসে রইল চেয়ারে।

কিংশুকের হাসি থেমেছে। সে এখন লক্ষ্য করছে মরিয়মকে। মেয়েটির মুহূর্তে ভাবান্তর ঘটে যায়। আগের মানুষটির সঙ্গে এক মুহূর্ত পরের মানুষটির কোন মিলই নেই।

কি যেন ভাবছে মরিয়ম। চোখ দুটো পেতে রেখেছে পায়ের তলায় পাতা কার্পেটের নকশার ওপর।

কিংশুকের মনে হল, যে দু'চারটি কাশ্মীরী মেয়ে ইতিমধ্যে তার চোখে পড়েছে, চেহারায় বা আচরণে তাদের সঙ্গে কোথায় যেন বেশকিছুটা তফাত আছে মরিয়মের। মরিয়মের যে আকর্ষণ আছে তা ওর রূপের অতিরিক্ত অন্য কিছু একটা ক্ষমতা, যা আর পাঁচটি কাশ্মীরী মেয়ের ভেতর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এসব কথা কিংশুকের মনে হচ্ছিল, আর মনে হচ্ছিল মরিয়মের বুদ্ধি ঝলকানো মুখের হঠাৎ মগ্নতাটুকু দেখে।

কফি নিয়ে এল মনসুর। মরিয়ম মুখ তুলে কফির কাপটা হাতে ধরে বলল, জানেন মিঃ মুখার্জী, বাড়িয়ে বলছি না, মনসুরের হাতে তৈরি কফির জুড়ি বোধ করি সারা কাশ্মীরে নেই।

মনসুরের দিকে তাকাল কিংশুক। গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর গালে যেন প্রথম অরুণের লাল আভাটুকু এসে পড়েছে বলে মনে হল তার।

এত সুন্দরও মানুষ হয়! কিংশুকের রূপের অখ্যাতি নেই, কিন্তু একটি মেয়ের উপস্থিতিতে মনসুরের সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকাও দারুণ অস্বস্তির ব্যাপার বলে মনে হল কিংশুকের।

মরিয়মের কথার উত্তর দিল কিংশুক, কফি তৈরিতেই কেবল অদ্বিতীয় নয় মনসুর, ওর সেবাযত্নের বুঝি তুলনা হয় না।

মনসুর এবার কাজের অছিলায় সরে গেল।

মরিয়ম মুখখানা কাত করে আড়চোখে ওর চলে যাওয়াটুকু দেখতে লাগল।

পরক্ষণেই কিংশুকের দিকে তাকিয়ে বলল, মিঃ মুখার্জী, যে কোন দিক থেকেই মনসুরের জুড়ি নেই। যত উঁচু পাহাড়ই হোক ও ধীরে ধীরে তার চূড়ায় উঠবেই। সবাই ওকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে শুরুতে, তারপর যখন ওরা হাল ছেড়ে দিয়ে হাঁপাবে, তখন দেখা যাবে সমান ধীর গতিতে মনসুর এগিয়ে চলেছে লক্ষ্যের দিকে। এ শুধু সামনের কোন পাহাড়ে ওঠা নয়, জীবনে ও এমনি করে স্থির পা ফেলতে ফেলতে এখানে উঠে এসেছে। আরও উঠবে, এতটুকু ক্লান্ত না হয়ে ও অনেক ওপরে উঠবে।

কিংশুক দেখল কথাগুলো বলতে গিয়ে মরিয়ম তার চারদিকে উচ্ছ্বসিত আবেগের ঢেউ তুলছে।

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে ফেলে অথবা বলা ঠিক হয়নি ভেবে মরিয়ম চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ।

কিংশুকের মনে এই মুহূর্তে একটি পাপ জন্ম নিল। অতি সূক্ষ্ম ঈর্ষার একটা কাঁটা মস্তিষ্ক থেকে হৃদয়ের মধ্যে ব্যথার একটা ছিদ্রপথ তৈরি করে ফেলল।

সে জানে এ ঈর্ষার কোন ভিত নেই। মরিয়মের সঙ্গে কত অল্প তার পরিচয়, মনসুর তাকে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছে, তবু একটি সুন্দরী মেয়ের মুখে কোন পুরুষের অতিরিক্ত প্রশংসা যে কোন দ্বিতীয় পুরুষের মনে বুঝি সূক্ষ্ম ঈর্ষার ঢেউ তোলে।

কিংশুক তার মনের ভাব আর পাঁচটি পুরুষের মত গোপন রেখে মুখে খুশীর ভাব ফুটিয়ে বলল, আপনার কথা যে কতখানি সত্য তার কিছু প্রমাণ অন্তত এ ক'দিনে পেয়েছি।

মরিয়ম আর কোন কথা বলল না। একসময় চুমুক দিয়ে কফিটুকু শেষ করে উঠে দাঁড়াল। নমস্কার করে বেরিয়ে গেল বোট থেকে।

কিংশুক মরিয়মের এই নীরবে চলে যাবার ব্যাপারে একটু বিস্মিত হল। হোটেল ডালভিউতে একবার সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারের ডাক না দিক, অন্তত এখন যাই, কিংবা পরে দেখা হবে গোছের

কিছু একটা কথা তো বলে যেতে পারত।

কিংশুকের মনে হল, বেজায় মুডি এই মেয়েটা।

দুপুর গড়ালে বাইরে একটু বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে নিচ্ছিল কিংশুক, এমন সময় মিঃ মুখার্জী আছেন নাকি, বলে বাংলা ভাষায় ডাক দিলেন এক ভদ্রলোক।

কিংশুক তো অবাক। এখানেও বাঙালীর আক্রমণ!

সে তাড়াতাড়ি মাথার অবাধ্য চুলগুলোকে চিরুনির তীব্র ক'টা টানে শায়েস্তা করে বেরিয়ে এল ড্রইংরুমে।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসেছিলেন চেয়ারে, তাঁর একটু দূরে একটি মেয়ে সোফায় বসে ফিল্‌ম্‌ ফেয়ারে চোখ ডুবিয়ে।

অপরিচিতকে দেখে যতটুকু বিস্ময় চিহ্ন ফোটে চোখে ততটুকু ফুটিয়ে তুলে নমস্কার করল কিংশুক।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, চিনতে পারলেন না, অবশ্য যে রকম বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন তাতে না চেনারই কথা। আমি ডাক্তার সান্যাল।

কিংশুকের মুখ একমুহূর্তে কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল।

আপনি কষ্ট করে এসেছেন, আমিই মনসুরের কাছ থেকে আপনার ঠিকানা নিয়ে চেম্বারে দেখা করে আসব ভেবেছিলাম।

ডাক্তার সান্যাল হেসে বললেন, চেম্বারে কেন, বাড়িতে চলুন। ঐ আমার মেয়ে বিতস্তা, আপনাকে কিন্তু ও-ই আবিষ্কার করেছে প্রথম। আমি আপনাকে বাঙালী রোগী হিসাবে জেনেছিলাম, আর আমার মেয়ে আপনাকে জেনেছে শিল্পী হিসাবে। আপনার নাম আমার মুখে শুনেই ও বলেছে এই অদ্ভুত নামে একটি মাত্র আর্টিস্ট আছেন। কাগজে ও আপনার এগজিবিসানের ছবি দেখেছে।

মেয়েটি ফিল্‌ম্‌ ফেয়ার থেকে সরিয়ে এক মুখ হাসির সঙ্গে চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলল, মোটেই আমি 'অদ্ভুত' কথাটা ব্যবহার করিনি বাবা।

ডাক্তার পিতা হাসলেন।

কিংশুক বলল, যদি বলতেনও তাহলে অন্যায় হোত না। কিংশুক নামটা, শুনে শুনে অভ্যস্ত নামাবলীর ভেতর পড়ে না। তাই কিছুটা অদ্ভুত বই কি!

মেয়েটি মিষ্টি করে হেসে বলল, তাহলে আমার নামটাও আপনার বিচারে অদ্ভুতের কোঠায় গিয়ে পড়বে। নামটা নিশ্চয়ই আপনার অনেকদিনের শোনা নয়।

কিংশু ' হেসে বলল, এই প্রথম!

ডাক্তা॥ সান্যাল বললেন, ওর মায়ের দেওয়া নাম। ঝিলমের ধারে আমার বাড়ি, ওর জন্ম থেকে ঐ নদী দেখছে ও। তাই ওর মা মেয়ের নাম দিলেন বিতস্তা। ঝিলমের পোশাকী নাম ওটি।

বিতস্তা হেসে বলল, সিন্ধুর পঞ্চসখীর এক সখী আমি।

কিংশুক বলল, আমার নামটা কমন নয় ঠিক কিন্তু নামের ভেতর নিন্দার ভাগই বেশি।

বিতস্তার গলায় বিস্ময়, কি রকম!

কিংশুক বলল, আমার নামের অর্থ হল পলাশ। ঐ গাছের ফুলের শুধু বাহারই আছে, গন্ধ নেই বলে আদরও নেই।

ডাক্তার সান্যাল মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, একেবারে ভুল ধারণা। পলাশের মত উপকারী বৃক্ষ বড় একটা দেখা যায় না। আমাদের দেশের লাক্ষা শিল্পটি প্রধানত পলাশ গাছকে নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে। এর বীজ, ছাল, আঠা সবই নানা ধরণের ওষুধের উপকরণ। হিন্দুশাস্ত্র মতে পলাশ অত্যন্ত পবিত্র বৃক্ষ। যাগযজ্ঞ হোমে উপনয়নে এ কাঠ নইলে চলে না। এ হেন পলাশকে বলছেন কিনা গুণহীন!

কিংশুক অবাক হয়ে বলল, দারুণ একখানা কথা বলেছেন তো। আত্মরক্ষার একটা অমোঘ অস্ত্র পাওয়া গেল।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, বাইরে বেরোবার উদ্যোগ করছিলেন বলে মনে হচ্ছে, চলুন আমার ডেরায়। সান্ধ্যভ্রমণ আর সান্ধ্য চা দুটোরই ব্যবস্থা হবে।

কিংশুক বলল, এ ক'দিন একরকম নজরবন্দী হয়েই ছিলাম, আজ স্বয়ং ডক্টর সান্যাল মুক্ত করে নিয়ে যেতে চাইছেন। এ সুবর্ণ সুযোগ কি কখনো ছাড়া যায়।

বিতস্তা হাসির ঢেউ তুলে উঠে দাঁড়াল।

ওরা বেরিয়ে পড়ল শিকারায় চেপে।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, পায়ে চলার পথে কিন্তু আমরা অনেক আগেই যেতাম, তাতে অবশ্য আপনি কিছু দেখতে পেতেন না। তাই অনেকটা জলের পথ কেটে আমরা এগোব।

বিতস্তা বলল, বেলা পড়ে এসেছে, চলুন ডালের জলে আলোর খেলা দেখবেন। তারপর ফিরব আমরা ঝিলমের পথে।

শিকারায় যেতে যেতেই চোখে পড়ল হোটেল ডালভিউ। কিংশুক উৎসুক চোখে ওদিকে তাকিয়ে বলল, আমার আসার দিনে যে বিপর্যয়ের ভেতর পড়েছিলাম, তাতে ডালভিউ হোটেলের রিসেপশনিস্ট মেয়েটির সঙ্গে দেখা না হলে প্রাণ বাঁচানই দায় হত।

বিতস্তা অদ্ভুত চোখ মেলে তাকাল কিংশুকের দিকে।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, মরিয়মই তো আপনার অসুখের খবর নিয়ে গিয়ে আমাকে চেম্বার থেকে প্রায় টেনে এনেছিল। ওর চোখে মুখে কথাবার্তায় সে কি উদ্বেগ! আমি তো প্রথমটায় ভাবলাম, বুঝি ওর একেবারে আপনার কেউ সাংঘাতিক কোন অসুখে পড়েছে।

কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল কিংশুকের মন।

বিতস্তা বলল, সব কিছুতেই ওর বাড়াবাড়ি। কলেজ থেকে আমরা যখন পিকনিকে কোথাও যেতাম, তখন রান্না, পরিবেশন, সব কিছুর ব্যাপারে ওর ঝাঁপিয়ে পড়া চাই। কারো কাজ ওর পছন্দ হয় না, নিজের হাতে সব করা চাই।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, অপরিচিত ভদ্রলোকের জন্য সেদিন মরিয়ম যা করেছে তাতে প্রশংসা না করে পারা যায় না বিতস্তা।

আমি তার নিন্দে করছি না বাবা, শুধু নিজে সব কিছু করব, এ ধরনের একটা মনোভাব ওকে পেয়ে বসেছে। জানেন কিংশুকবাবু, ও দারুণ খেয়ালী। কলেজ থেকে বেরিয়ে উঠে পড়ে লেগে ও ট্যুরিস্ট অফিসের একটা বড় চাকরী যোগাড় করল। তার ক'দিন পরে ও ওপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে কাজটা ছেড়ে দিল। এখন শালিমারবাগের পাশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাঠশালা বসিয়েছে।

কিংশুক বলল, পাঠশালা চালায় কখন আর হোটেলের কাজই বা করে কখন?

বিতস্তা বলল, বোধহয় পার্ট টাইম কাজ করে ও হোটেলে। ইংরেজীটা ভালই বলে, আদবকায়দা কেতাদুরস্ত, তাই ওয়েস্টার্ন স্টাইলের হোটেলে সহজেই চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, এ সবই কিন্তু মেয়েটির গুণ।

বিতস্তা গম্ভীর গলায় বলল, তুমি আমাকে ভুল বুঝ না বাবা।

কথাগুলো এলোমেলো ঘূর্ণি হাওয়ার রূপ নিচ্ছে দেখে কিংশুক একেবারে হাওয়া বদল করে দিলে।

সত্যি কি সুন্দর সূর্যাস্তের ছবি। আপনি ঠিকই বলেছিলেন বিতস্তা দেবী।

ডাক্তার সান্যাল হেসে বললেন, আপনার চেয়ে অনেক ছোট ও, নাম ধরেই ডাকবেন।

কিংশুক হেসে বলল, ঠিক আছে, তবে আপনার চেয়ে অনেক ছোট আমি, তাই আমাকেও নাম ধরেই ডাকবেন।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, আমিও তাই ভাবছিলাম এতক্ষণ।

বিতস্তা বলল, দেখুন, পীরপাঞ্জাল মাথায় বরফের হীরা ঝলকানো মুকুট এঁটে কেমন জলের আয়নায় নিজের চেহারা দেখছে।

কিংশুক সেদিকে কতক্ষণ আর চোখ ফেরাতে পারল না। জলের রঙ প্রায় এক হয়ে গেছে। জলের বুকে আর আকাশের বুকে যেন যমজ পীরপাঞ্জাল পরস্পরকে তাকিয়ে দেখছে।

কিংশুক বলল, দেখবার মত ছবি।

শিকারা ভেসে চলেছে। চারিদিকে থৈ থৈ করছে ডালের জল। সাতদিন একটানা বৃষ্টি আর বরফ পড়ার ফলে সমুদ্র-সবুজ রঙ নিয়ে ডাল চোখের দৃষ্টিকে ঘন ঘন কেড়ে নিচ্ছে। শেষ বেলায় রোদ্দুরটুকুতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জলের তলা থেকে উঠে আসা লম্বা লম্বা জলজ উদ্ভিদ। কিংশুক মুখ নীচু করে দেখতে লাগল। জলের তলাটা যেন মুক্তাঙ্গন। অতি হাল্‌কা সবুজ পোশাকে নিজেদের সাজিয়ে

সারি সারি জলজ উদ্ভিদ হেলেদুলে নেচে চলেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে রুপোলী মাছ এঁকে বেঁকে চলেছে তাদের পাশ কাটিয়ে। ডালের জল ঠিক যেন সবুজের আভা লাগা একখণ্ড স্বচ্ছ কাঁচ।

কিছুক্ষণের ভেতরেই সূর্যের রঙ পাল্টে গেল। লালের ছোঁয়া লাগল ডালের জলে। শিকারার সামনে দেখা গেল কয়েকখানা নৌকো এগিয়ে আসছে। কিংশুক দেখল, ছোট ছোট নৌকোর বোঝাই হয়ে আছে অজস্র ফুল পাতা ঘাস। মেয়েরাই চালিয়ে নিয়ে আসছে সে নৌকো। এক সুরে গান ধরেছে তারা। মনে হল গ্রীষ্ম দিনের পদ্মগুলো শরতে কাশ্মীরী কন্যার মুখ হয়ে ফুটে উঠেছে। ওরা হাসি ছড়াতে ছড়াতে হাওয়ার গান ওড়াতে ওড়াতে চলে গেল।

বিতস্তা বলল, দেখুন দেখুন কিংশুকদা, জলের ওপর তাড়া খেয়ে জলপিপিগুলো কেমন উড়ে যাচ্ছে।

কিংশুক দেখল, পাখিগুলো জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে, আর তাদের পাখার ছড়ানো ছিটানো জলবিন্দুগুলো ঠিক মুক্তোর দানার মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সত্যি চোখ ফেরানো যায় না।

কিংশুক বলল, তোমাকে একশোবার প্রশংসা না করে পারছি না বিতস্তা। এমন একখানা ছবি দেখালে, যা দেখে সারাটা জীবন অতৃপ্তিতে ভরে থাকবে।

বিতস্তার চোখে বিস্ময়। বলল, ভাল লাগেনি আপনার ছবি। সারাজীবন অতৃপ্তিতে ভরে থাকবে বলছেন।

কিংশুক হেসে বলল, তৃপ্তি পেলেই তো সব ফুরিয়ে গেল। যার জন্যে কলকাতায় বসে মনটা শূন্য হয়ে যাবে, এমন ছবিই তো চিরদিনের। আজকের এই ডালের জল, পীরপাঞ্জাল, শেষ সূর্যের সোনা, নৌকোবিহারিনী মেয়েরা, এমনকি ঐ জলপিপির ঝাঁক আমাকে বারবার কাশ্মীরে আসার জন্যে অলিখিত নিমন্ত্রণ জানাবে।

বিতস্তা অমনি বলে উঠল, তাহলে তো দারুণ মজা হবে।

কিংশুক বলল, কেন?

বিতস্তা বলল, আপনাকে বারবার কাশ্মীরে আমাদের মধ্যে পাওয়া যাবে।

কথাটা বলেই কিন্তু বিতস্তা লজ্জা পেয়ে গেল। কিংশুকের সঙ্গে আলাপ তার সবে শুরু। তাছাড়া বাবা রয়েছেন একই শিকারায়। পরিস্থিতিটা এ ধরনের উচ্ছ্বাস প্রকাশের অনুকূল নয় বলে মনে হল বিতস্তার।

কিংশুক বলল, সঞ্জীবচন্দ্র প্রতিবেশীদের দুরাত্মা বলেছেন, কিন্তু বাংলাদেশের বাইরে বাঙালীদের পরম সজ্জনের সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন। বেড়াতে বেরোলেই সে পরিচয় পাওয়া যায়।

আবার বিতস্তা প্রগলভ হয়ে উঠল, আমরা কিন্তু মোটেও ভাল মানুষ নই।

হাসল কিংশুক। বলল, বাঙালীর দেখা পাব এ আশা নিয়ে তো আসিনি, তাই ভালমন্দর বিচারও করব না, নির্ভয়ে থাকতে পার।

ডালের গেট পেরিয়ে শিকারা এসে ঢুকল ঝিলমে। কিছু পথ পেরিয়ে এসে নামল ওরা যে জায়গায় সেখানে চিনার গাছে তাল তাল অন্ধকার বাসা বেঁধেছে। একটু দূরে একটা ল্যাম্পপোস্ট চালশে পড়া চোখে তাকিয়েছিল।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, একটু সাবধানে এসো কিংশুক, পথটা উঁচু নীচু, তাছাড়া আলোটাও নদীর ধার অবধি এসে পৌঁছয় না।

একটু দূরেই ডাক্তার সান্যালের আস্তানা। কিংশুকের আলাপ হল ডাক্তার সান্যালের স্ত্রীর সঙ্গে। কিছুক্ষণের ভেতরে আপনি তুমির পাট চুকলে শ্রীমতী সান্যাল প্রস্তাব করলেন, আমার এখানে এসে উঠতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে সংকোচ না করে চলে এসো, আর যদি অস্বস্তি বোধ কর তাহলে রোজ অন্তত একবার করে চায়ের আসরে এসো।

কিংশুক দেখল বিতস্তা তার মুখের ওপর আগ্রহে ভরা দুটো বড় বড় চোখ পেতে বসে আছে। সে চোখে কি করুণ মিনতির কোন ছবি দেখতে পেল কিংশুক।

ও বলল, আপনার স্নেহের ডাক এড়িয়ে যাবার সাধ্য আমার নেই, তবে বেড়াতে এসে কাউকে বিব্রত করার ইচ্ছেও নেই আমার। কখন কোথায় বেড়িয়ে বেড়াব, ঠিক থাকবে না তার। সময়ের হিসেব করে ঘোরাফেরা করাও অসম্ভব। আপনাদেরও ঝক্কি পোহান আর আমারও তটস্থ হয়ে থাকা।

তার চেয়ে রোজ পারি আর না পারি, ঘন ঘন চায়ের আসরে হাজির থাকার চেষ্টা করব, কথা দিচ্ছি।

সেদিন অনেক গল্পগুজব, বাংলাদেশের অনেক কথা হল, শেষে যখন কথায় কথায় প্রহর গড়িয়ে গেল তখন চেম্বার থেকে ফিরে ডাক্তার সান্যাল কিংশুককে না খাইয়ে ছাড়লেন না।

ফেরার পথে কিছুটা এগিয়ে টাঙ্গার ব্যবস্থাও করে দিলেন।

ডালভিউ হোটেলের সামনের পথে টাঙ্গা আসতেই কিংশুক নেমে পড়ে ভাড়া চুকিয়ে দিলে। টাঙ্গা চলে যেতেই পায়ে হাঁটতে লাগল কিংশুক।

সেই মুহূর্তে তার বিতস্তার কথা মনে পড়ছিল না। ডাক্তার সান্যালের কৌতুক কিংবা মিসেস সান্যালের সস্নেহ আদর যত্নও নয়। তার চোখের ওপর একটি ছবি ফুটে ওঠার স্বপ্নই সে দেখছিল, সে ছবি মরিয়মের। সকালে মেয়েটি হাউসবোটে এসেই হঠাৎ কথার মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে চলে গেল। মেয়েটিকে তাই আবিষ্কারের একটা নেশায় পেয়ে বসল কিংশুকের।

পথ থেকে একটা বারান্দা আর দুটো দরজা পেরিয়ে রিসেপশান রুম। পথে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল কিংশুক। না, মরিয়মকে দেখা গেল না তার নির্দিষ্ট চেয়ারে আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে বসে থাকতে।

কিংশুক পায়ে পায়ে সরে যাবারই মনস্থ করল, কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আবার পথের ওপর থমকে দাঁড়াল। মরিয়মকে দেখে যাবার প্রবল একটা আগ্রহ তাকে টেনে আনল হোটেল ডালভিউয়ের বারান্দায়।

ওয়েটার যাচ্ছিল বারের দিকে, কিংশুক তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল মরিয়মের কথা।

ওয়েটার যা বলল তার অর্থ হল বারে ড্যান্স হচ্ছে, মরিয়ম বসেছে পিয়ানোতে। অবশ্য মরিয়মও নাচে যোগ দেবে। এখন ওকে রিসেপশান রুমে পাওয়া অসম্ভব।

ওয়েটার চলে গেল। হোটেল থেকে নেমে এল কিংশুক। একটা অতি মৃদু যন্ত্রসংগীতের সুর তার কানে এসে বাজছিল। পরমুহূর্তে পীরপাঞ্জালের দিক থেকে একটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া তার গরম পোশাক ভেদ করে একেবারে বুকের হাড়ে গিয়ে বিঁধল। শীত তার নির্মম শাসন চালাচ্ছিল সারা কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে। অক্টোবরের মাঝামাঝি এত বরফ কাশ্মীরে দেখা যায় না। শ্রীনগরের পথের ধারে ধারে বরফের চাঁই এখন পড়ে রয়েছে। ভোরবেলা হাউসবোটের ছাদে সাদা পুরু একখানা চাদর কে যেন বিছিয়ে দিয়ে যায়।

কিংশুক প্রায় জনশূন্য পথের ওপর দিয়ে হাঁটছিল। মন জুড়ে তার কয়েকটি প্রশ্নের কলধ্বনি।

মরিয়ম কি ক্যাবারে গার্লের কাজও করে নাকি ! পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের সেই ব্যক্তিত্বময়ী মেয়েটি তা হলে হোটেলবাসীদের চিত্ত বিনোদনও করে! আবার ভাবল কিংশুক, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন অতি বিচিত্র। যে মেয়েটি এক অসুস্থ মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে তার গভীর শ্রদ্ধা কেড়ে নিল, তাকেই আবার দেখা গেল কয়েকটি অপ্রকৃতিস্থ মানুষের ক্ষুধার্ত চোখের সামনে নিজেকে অবলীলায় বিলিয়ে দিতে।

কিংশুকের মনে সূক্ষ্ম একটা দুঃখবোধ জন্ম নিয়ে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগল। হাউসবোটে পৌঁছে বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে তার কেন যেন মনে হল, সে এক পরাভূত সম্রাট। বিরাট যুদ্ধ জয়ের সমস্ত পরিকল্পনা শুরুতেই বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

ভোরবেলা নতুন জন্ম হল কিংশুকের। সে এখন হঠাৎ উড়ে আসা কাশ্মীরের সুন্দর পাখিগুলোকে আর আমন্ত্রণ জানাবে না, অবাক চোখে তাকাবে না, তাদের কোমল পাখার তলায় শুয়ে রঙীন স্বপ্ন বুনবে না।

মনসুরকে বলল কিংশুক, ড্রাই ফুড দিয়ে দাও আমার ব্যাগে, পহেলগাঁও রওনা হব এখুনি।

মনসুর মাথা চুলকে বলল, সাহাব, খাবার রেডি করে দিতে আমার বেশি সময় লাগবে না, তবে আপনি কি কাল বাসের টিকিট কেটে এনেছেন?

কিংশুক বলল, স্ট্যান্ডে গেলে অনেক বাস মিলে যাবে। পহেলগাঁও-এর বাসে চেপে বসলেই হল।

মনসুর বলল, শুনেছি, দুদিনের জন্যে পহেলগাঁও-এর বুকিং ফুল হয়ে আছে।

কিংশুকের গলায় বিস্ময় বেজে উঠল, ফুল হয়ে আছে, তবে উপায়।

মনসুর বলল, ট্যাক্সিতে যেতে চাইলে তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

কিংশুক জানে, এখুনি অনেকগুলো টাকা তাকে গুনে দিতে হবে, তাহলেও মনের ইচ্ছাটুকুকে সে পূর্ণ করবেই। তাই বলল, তুমি ট্যাক্সি নিয়ে এসো, আমি আজই যেতে চাই।

ট্যাক্সি চলেছে। উর্ধ্বমুখী পপ্‌লার গাছগুলো মাথায় এখনও কিছু কিছু পাতা জাগিয়ে রেখেছে। কাণ্ডের রঙগুলো লক্ষ্য করছিল কিংশুক। সাদা আর হাল্‌কা বাদামী রঙ পর পর পাকে পাকে উঠে গেছে।

থামাও, থামাও।

ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে গেল। কিংশুক কিন্তু নামল না। ঝুলি থেকে সে খাতা বের করে দুটো হাঁটুর ওপর রেখে স্কেচ করতে লেগে গেল। সামনে অগুণতি ভেড়ার পাল। তার মাঝে ঝোলা ফারান পরা যীশুখৃষ্ট যেন এগিয়ে আসছেন। বুকে চেপে ধরে আছেন একটি সাদা মেষশাবক।

মেষপালকের সঙ্গে সঙ্গে মেষগুলো চলে গেল। শিল্পী কিংশুক মুখার্জীর স্কেচে কিন্তু সেগুলো বন্দী হয়ে রইল।

ট্যাক্সি চলেছে। পথের দুধারে জাফরানের ক্ষেত। ভায়োলেট শাড়ি বুনে কে যেন বিছিয়ে রেখে দিয়েছে মাঠে মাঠে। কাজ করছে মেয়ে পুরুষে মিলে। দূরে পাহাড়ের মাথায় গুজর মেয়েরা ঘড়া ঘড়া দুধ ঢেলে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

পাহাড়ে উঠছে গাড়ি, এক একটা বাঁক পেরোলেই এক এক রকমের ছবি ফুটে উঠছে।

উপল ছড়ানো ছোট নদীর বাঁকে বাঁকে দুতিনটি করে পাইন গাছ দাঁড়িয়ে। থাকে থাকে সবুজ পাতার মন্দির গড়েছে যেন। ওদিকে ঘাসের বোঝা পিঠে নিয়ে এগিয়ে এলো একদল মেয়ে। ওরা থেমে থাকা ট্যাক্সি আর তার আরোহীর দিকে একবার তাকালো, তার পর দ্রুত চলে গেল আঁকা বাঁকা পাহাড়ী পথে নেমে।

স্কেচ করে যাচ্ছে কিংশুক। অফুরন্ত নেশায় বিভোর হয়ে সে যেন কাজ করে চলেছে। মেয়েগুলো তার হাতের জাদুতে গতিশীল ঝর্ণা হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তে।

পহেলগাঁও-এ পৌঁছে ট্যাক্সি থেকে নামল কিংশুক। এখন ঘণ্টা চারেক সে কাটাবে এখানে। রঙ তুলি সঙ্গে নিয়ে ড্রাইভারকে আরাম করতে বলে বেরিয়ে পড়ল সে।

লীডার নদীর উপল ছড়ানো কুলে ও নেমে গেল। অনেক নীচে নেমে এসে পেছন ফিরে দেখল ও। গভর্নমেন্ট রেস্ট হাউসের ওপারে পাইন বন। তার মাথায় বহু দূর প্রসারিত তুষার পাহাড় জেগে আছে। বরফ যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে অতি হালকা বেগুনীর আভা; ক্রমশ একটা অস্পষ্ট পিঙ্ক রঙের সঙ্গে মিশে গেছে ভায়োলেট রঙটা। তারপর ঝলমল করছে উজ্জ্বল সাদা রঙ। নীল আকাশের তলায় সাদা বরফ যেন কেটে বেরিয়ে এসেছে।

কিংশুক দেখল আর একটা জগৎ ওরই ভেতর ফুটে উঠেছে। সবুজ পাইন বনের পরে ভায়োলেট আর পিঙ্কের রাজ্যে আর একটা অস্পষ্ট রেখার পাইন অরণ্য। মাথায় নেই পাতার সমারোহ, শুধু ধূসর কয়েক সারি কাণ্ড পটে আঁকা ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। একটা যেন আশ্চর্য রহস্যময় রাজ্যের সন্ধান দিচ্ছে তারা।

রঙ ছড়িয়ে ছবি আঁকতে লাগল কিংশুক। হুবহু ছবি সে কখনো আঁকে না, তাই বার বার তাকাতে হয় না তাকে সাবজেক্টের দিকে। সে পাইন বন আর তুষার পাহাড় রঙের তুলি বুলিয়ে আঁকল। তারপর সরু নিবের আঁচড়ে সৃষ্টি করল এক স্বপ্নময় জগৎ।

ছবি শেষ করে ঝোলায় ভরে কিংশুক এসে বসল লীডার নদীর একটা বড় পাথরের চাঁইয়ের ওপর। লীডারের আসল নাম নীল গঙ্গা। কিংশুকের মনে হল নামটা যথার্থই দেওয়া হয়েছে। ওপরের নীল আকাশটা যেন তরল স্রোত হয়ে পাহাড়ের বুকে এঁকে বেঁকে নেমে চলেছে।

খাবার বের করে খেতে লাগল কিংশুক, আর লীডার নদীর ওপারের বরফের পাহাড়টাকে মাঝে মাঝে দেখতে লাগল।

মিঃ মুখার্জী?

পিছনে তাকিয়ে কিংশুক দেখল, কিছু দূরে একটি মেয়ে। উতরাইয়ের টাল নিপুণভাবে সামলাতে সামলাতে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

কাছে এসে দাঁড়াল মরিয়ম।

কিংশুক কি খুশী হল সেই মুহূর্তে ? যে পাতাখানা সে ডাল হ্রদের জলে আজ সকালেই ফেলে দিয়ে এসেছিল, সে পাতাটা হঠাৎ ভাসতে ভাসতে কি করে নেমে এল নীল গঙ্গার স্রোতে!

এক রাশ কথা নিয়ে এসেছিল মরিয়ম, কিন্তু কিংশুকের চোখে মুখে উৎসাহের অভাব দেখে থেমে গেল ও।

শুধু বলল, একাই এসেছেন, না ডাক্তার সান্যালেরাও রয়েছেন?

কিংশুক অবাক হল। ডাক্তার সান্যাল আর বিতস্তার সঙ্গে শিকারাবিহারের কথা তাহলে কানে গিয়েছে মরিয়মের। কে দিল ওকে এ খবর! মনসুরই জানে। কথায় কথায় ও-ই মরিয়মকে বলে থাকবে।

কিংশুক বলল, আমার সঙ্গে আর কাউকে না দেখে নিরাশ হলেন নিশ্চয়।

মরিয়ম দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিল কিংশুককে।

বলল, না, আশা নিরাশার কথা নয়, কাল শেষ বেলায় শিকারায় যেতে দেখলাম আপনাদের, তাই বলছিলাম।

কিংশুক এবার সুর পাল্টে বলল, আপনি তো দারুণ মেয়ে দেখছি, দেখেও একবার ডাক দিলেন না।

মরিয়ম এখন সহজ হতে পারবে। সে কিংশুকের পাশাপাশি একটা পাথরের ওপর বসল।

বলল, মিঃ হিথের তখন আমার ছবি তোলার নেশায় পেয়ে বসেছিল। আমাকে হোটেলের পাশে জোড়া পপলার গাছের ফাঁকে দাঁড় করিয়ে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি নেওয়া হচ্ছিল, আর ঠিক সেই সময় আপনাদের শিকারা আমাদের হোটেল পাস করে চলে গেল।

কিংশুক বলল, বলুন তো আমি তখন কোনদিকে তাকিয়েছিলাম?

মরিয়ম বলল, হোটেলের দিকে চোখ ছিল আপনার।

কিংশুক বলল, এখন বলুন তো দেখি কেন আমি হোটেলের দিকে তাকিয়েছিলাম?

মরিয়ম একটু ভেবে বলল, প্রথম রাতের বিপর্যয়ের কথা মনে করে।

কিংশুক বলল, এমনও তো হতে পারে, যিনি ঝড়ের রাতে বাতিঘরের নিশানা দিয়েছিলেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায়।

মরিয়ম কথা পাল্টে নিয়ে বলল, বড় কালচার্ড মেয়ে বিতস্তা, তাই না?

কিংশুক বলল, এখনও আমি তার এতটা পরিচয় পাই নি। তবে একটি মেয়ে যখন অন্য একটি মেয়ের প্রশংসা করে তখন আমি প্রশংসাকারিণীর ভেতরই সত্যিকারের কালচার দেখতে পাই।

মরিয়ম প্রখর বুদ্ধি রাখে। সে মুহূর্তে ধরে ফেলল কিংশুকের ইঙ্গিত। দুটো চোখ বিদ্যুৎ ঝলকের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল তার। কিংশুকের চোখে বড় সুন্দর লাগল মরিয়মের চোখের এই ছবি।

আবার শান্ত হয়ে গেছে মরিয়ম। বড় শীতল বলে মনে হচ্ছে এখন তাকে। দূরের পাহাড়গুলোর দিকে চোখ রেখে সে তলিয়ে গেছে নিজের ভেতর।

কিংশুক এক সময় শীতলতা ভেঙে বলল, আপনার অনেক গুণ। নাচতে বাজাতে আপনি সমান দক্ষ।

মুহূর্তে চোখে অবাক চাহনি আর মুখে মিষ্টি হাসি টেনে মরিয়ম বলল, আমার সব গুণের কথাই তাহলে জানা হয়ে গেছে আপনার!

কিংশুক বলল, কাল ইচ্ছে ছিল আপনার পিয়ানো শোনার, কিন্তু বারে ঢোকার রেস্ত ছিল না, তাই মনের ইচ্ছে মনে চেপে রেখে ফিরতে হয়েছে।

আপনি ড্রিঙ্ক করেন?—সোজা প্রশ্ন করে বসল মরিয়ম।

উল্টো প্রশ্ন করল কিংশুক, কি মনে হয় আপনার?

না, আর যাই করুন, ড্রিঙ্ক করেন বলে তো মনে হয় না।

যারা ড্রিঙ্ক করে তাদের আপনি চিনতে পারেন?

হাসল মরিয়ম, বলল, মাছ না দেখে শুধু মাছের গন্ধ শুঁকে মেছুনীরা বলে দিতে পারে কি মাছ! তেমনি ড্রিঙ্ক যারা করে তাদের দেখলেই আমরা অনায়াসে বলে দিতে পারি।

কিংশুক গলায় বিদ্রূপের সুর মিশিয়ে বলল, এ আপনার অশেষ অভিজ্ঞতার ফল।

মরিয়ম কিংশুকের শ্লেষটুকু বুঝে নিয়ে বলল, দেখুন মিঃ মুখার্জী, এখন যদি বলি ড্রিঙ্ক আমি করি না, তাহলে নিশ্চয়ই আমার ওপর আপনার বিশ্বাসটুকু রাখা কষ্টকর হবে। তাই ও প্রসঙ্গের ইতি এখানেই টানতে চাইছি। তবে একটা কথা আমার মনে হয়, পৃথিবীতে যারা মানুষ চিনেছি বলে বড়াই করে সবচেয়ে বোকা বোধ করি তারাই।

পরিস্থিতিটাকে একেবারে লঘু করে দিয়ে বলল কিংশুক, পাহাড়ী জায়গায় বড় তাড়াতাড়ি খিদে পেয়ে যায়, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে সামান্য যা আছে তাই বের করি।

মরিয়ম এতক্ষণে সহজ হল। সে অমনি হেসে বলল, দেখি শাহানশার ভাণ্ডারে কি আছে!

কিংশুক বলল, মাখন রুটি সবে খেতে শুরু করেছিলাম, এখনও ফলের ভেতর কলা আর আমিষের ভেতর ডিম সেদ্ধ দুটো আছে। আপনি এর থেকে কিছু নিলে খুশী হব।

মরিয়ম বলল, দাঁড়ান আসছি।

এই বলে সে পা চালিয়ে ওপরে ট্যুরিস্ট বাংলোর দিকে উঠে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল হাতে একটা টিফিনের কৌটো নিয়ে।

কৌটো খুলতেই বেরলো ফিশ ফ্রাই আর স্যান্ডউইচ।

মরিয়ম বলল, আসুন ভাগ করে খাই।

কিংশুক নিজের প্যাকেট মরিয়মের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, আমাকে প্রথম অতিথি আপ্যায়নের সুযোগ দিন।

মরিয়ম একটি ডিম সেদ্ধ তুলে নিয়ে বলল, এবার আমার থেকে আপাতত একখানা ফিশ ফ্রাই তুলে নিন।

কিংশুক তাই করল।

মরিয়ম বলল, ডিম আমার অত্যন্ত প্রিয়।

কিংশুক বলল, ফিশ ফ্রাই আমার মাংসের কাটলেটের চেয়েও ভাল লাগে।

দুজনের ঐ দুটো বস্তু খাওয়া শেষ হলে কিংশুক বলল, আসুন, এবার দুজনের সংগ্রহ মিশিয়ে ফেলা যাক।

মরিয়ম মহা খুশী। বলল, দারুণ পরিকল্পনার মাথা আপনার। দিন, আমার হাতে আপনার খাবারগুলো দিন।

কিংশুকের হাত থেকে খাবারগুলো নিয়ে নিজের কৌটোটা ভরে ফেলল মরিয়ম।

এবার ভরা কৌটোখানা কিংশুকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এখন এটা রাখুন আপনার জিম্মায়। ইচ্ছে মত সদ্ব্যবহার করুন।

কিংশুক মাথা নেড়ে বলল, কোন কিছুর দায়িত্বই ঘাড়ে নিইনি এখনও, আপনার কৌটোর দায়িত্ব নেওয়াও তাই সম্ভব নয়। ওটা আপনার জিম্মাতেই রইল। ইচ্ছে হলে ওর থেকে কিছু প্রসাদ দিতে পারেন।

ওরা দুজনে হাসি গল্পের ভেতর খাবারগুলো শেষ করে ফেলল।

খাওয়া শেষ হলে কিংশুক বলল, একা একাই এলেন বেড়াতে ?

মরিয়ম বলল, পহেলগাঁও আমার পাঁচশো বার দেখা হয়ে গেছে। হোটেল থেকে বাস ভাড়া করে হিপিদের এক পার্টি এসেছে, তাদের গাইড হয়ে আসতে হয়েছে আমাকে।

কিংশুক বলল, হিপিদের সঙ্গে সময়টা হৈ-হৈ করে কেটে যাবে।

মরিয়ম বলল, পনেরোটা দিন জ্বালিয়ে মারছে। হোটেলের প্রোপ্রাইটার পয়সা লুটছেন, তাই খাতিরের অন্ত নেই। সব ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে আমাকে।

কিংশুক বলল, আমি কিন্তু আজ বাসে টিকিট না পেয়ে ট্যাক্সি করে এসেছি।

মরিয়ম বলল, আমি দেখেছি। ট্যুরিস্ট বাংলোর বাইরে বসেছিলাম, আপনার ট্যাক্সি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

কিংশুক বলল, আমাকে চিনতে পেরেছিলেন?

মরিয়মের মুখে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, আপনার চেহারা বোধহয় এড়িয়ে যাবার নয়।

কিংশুক বলল, কাশ্মীরের মানুষের মুখে আমাদের প্রশংসা শুনলে বিশ্বাস করতে সময় লাগে।

হাসল মরিয়ম। বলল, একদিনে বেশী প্রশংসাবাক্য আর শোনাব না। এখন চলি, পরে শ্রীনগরে দেখা হবে।

মরিয়ম একটুখানি গিয়েই ফিরে এল। এসে বলল, দেখুন, জিজ্ঞেস করব বলে ভুলে গিয়েছিলাম কথাটা; এখন মনে পড়েছে।

একটু থেমে বলল, ওপর থেকে আপনাকে কিছু একটা করতে দেখেই নেমে এসে ছিলাম, কি করছিলেন আপনি এমন নিবিষ্ট হয়ে?

কিংশুক কোন কথা না বলে ব্যাগ থেকে সদ্য আঁকা ছবিখানা বের করে মেলে ধরল মরিয়মের চোখের সামনে।

মরিয়ম নানাভাবে ছবিখানা দেখল। তারপর ছবিখানা হাতে রেখেই তাকাল কিংশুকের দিকে। মুখে তখন তার ফুটে উঠেছে একটা মুগ্ধতার ছবি।

আপনি শুধু শিল্পী নন, সত্যিকারের একজন জাত শিল্পী। আমার বাবাও আপনারই মত গুণী শিল্পী ছিলেন। তিনি অবশ্য দামী শালের ওপর দামী কাজ করতেন। কাশ্মীরের দু'জন সবচেয়ে নামকরা শিল্পীর ভেতর তিনি ছিলেন একজন। বিশেষ করে রঙ মেলাবার কাজে তাঁর নাকি জুড়ি ছিল না। আপনার কাজ দেখে বাবার কথা বড় বেশি করে মনে পড়ছে।

কিংশুক বলল, একটু আগেই না বলেছিলেন, একদিনে বেশি প্রশংসাবাক্য শোনাবেন না। এখন এত প্রশংসা শুনে মাথাটা আবার না বিগড়ে যায়।

মরিয়মের মুখ থেকে তখনও ভাল লাগার আলোটুকু মুছে যায়নি। সে বলল, সত্যি অপূর্ব আপনার রঙের কাজ, রেখার টান।

কিংশুক বলল, আমাকে অন্তত একটা প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করতে দিন।

মিষ্টি হেসে তাকাল মরিয়ম।

কিংশুক বলল, আপনার বাংলা বলার বাঁধুনি আর মিষ্টি উচ্চারণ অবাক করে দেবার মত।

মরিয়ম কিংশুকের হাতে তার ছবিখানা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, এখন সত্যিই তাহলে পালাতে হয়, আপনি যেভাবে প্রশংসা শুরু করলেন।

পায়ে পায়ে চলে যাচ্ছিল মরিয়ম।

কিংশুক ডাক দিয়ে বলল, এই যে বললেন না তো কোথায় কি করে শিখলেন এমন সুন্দর বাংলা বলা!

মরিয়ম চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল, তারপর চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিয়ে মুখখানা একবার হেসে ফিরিয়ে বলল, সে কথা এখন নয়।

মরিয়ম অদৃশ্য হয়ে গেল, কিংশুকের আর কিছু ভাল লাগল না। সে শুধু কয়েকটা ঘোড়া, আরোহী আর সহিসের স্কেচ দ্রুত টানে শেষ করে ট্যাক্সির কাছে ফিরে এল।

তখন শ্রীনগরের আকাশে অনেক রোদ্দুর, কিংশুক ফিরে এল হাউসবোটে। বোটের ভেতর ঢুকেই কিন্তু যাকে দেখল তাকে সেই মুহূর্তে তার আকাঙ্ক্ষিত অতিথি বলে মনে হল না।

ফেমিনার দুটো পাতায় মুখ ডুবিয়ে বসে আছে বিতস্তা। কাশ্মীরী সিল্কের একটা দামী শাড়ি পরেছে, গায়ে সুন্দর কাজ করা ঘি রঙের আলোয়ান।

কিংশুক ঢুকল, তবু বিতস্তা মুখ তুলল না দেখে কিংশুকের মনে হল ওর আগমন বিতস্তা দূর থেকেই টের পেয়েছে। এ হল, না দেখার অনিপুণ অভিনয়।

কিছুক্ষণ পরেই চোখেমুখে বিস্ময়চিহ্ন এঁকে তাকাল বিতস্তা।

কখন ফিরলেন?

কিংশুক হেসে বলল, ফেমিনা থেকে তোমাকে পুরস্কৃত করা উচিত। এমন নিবিষ্ট পাঠিকা দুর্লভই শুধু নয় পত্রিকার পক্ষে গর্বেরও কারণ।

বিতস্তা কিন্তু কিংশুকের এই কথায় খুব একটা খুশীর ভাব দেখাল না। সে ফেমিনা কোলের ওপর রেখে দিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে আমার কথা বলাই ঠিক হয়নি।

কিংশুক বলল, কি অপরাধ করেছি আমি!

বিতস্তা বলল, কি কথা হয়েছিল কাল? রাত পোহাল আর অমনি সব ভুলে বসে রইলেন!

সত্যি মনে পড়ছে না,—মাথা চুলকে কিংশুক বলে উঠল।

বিতস্তা বলল, আপনাকে আমার কাশ্মীর ঘুরিয়ে দেখাবার কথা ছিল না? আপনি বলেছিলেন, ঠিক আছে। এখন দেখি একা একাই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

ও হো, এই কথা, বলেই হাসল কিংশুক। ব্যাগটা পাশের টেবিলে রেখে বসে পড়ল সোফায়। বলল, কাশ্মীর শুধু পহেলগাঁও নয়, আরও অনেক দর্শনীয় স্থান নিয়েই ভূস্বর্গ কাশ্মীর। এর পরের গুলোতে তোমাকে গাইড হিসেবে পেলে নিশ্চয়ই ভূস্বর্গ রমণীয় হয়ে উঠবে।

বিতস্তা মনে মনে খুশী হল, তবু বলল, আমার চেয়ে ভাল গাইড পাবেন এখানে।

কিংশুক বলল, কি রকম?

বিতস্তা হোটেল ডালভিউ-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ যে ওখানে রয়েছেন, মিসেস মরিয়ম। গভর্নমেন্টের রেজিস্টার্ড গাইড।

কিংশুকের কানে একটা কথা বেসুরো বেজে উঠল, বিতস্তা মরিয়ম নামের আগে মিসেস কথাটা বসাল, তবে কি মরিয়ম বিবাহিতা। অবশ্য মুসলমান মেয়েদের মধ্যে বিবাহিতা আর কুমারীর ফারাক বোঝা শক্ত।

পরক্ষণেই মনের এরকম চাঞ্চল্যে বিশেষ সঙ্কুচিত হল কিংশুক। মরিয়মের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তার ভাবনার কিই বা থাকতে পারে।

বিতস্তার কথার উত্তর দিল কিংশুক, দরকার নেই রেজিস্টার্ড গাইডের। বাঁধা বুলি শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠতে হবে। তার চেয়ে একেবারে কোন গাইড না নিয়ে এই দুটো চোখ আর কান খোলা রেখে ঘুরে বেড়ানই ভাল।

বিতস্তা বলল, তাহলে আমাকেও সঙ্গে নিচ্ছেন না?

কিংশুক বলল, পথ দেখাতে কাউকে আমি নিজের থেকে ডাক দেব না, তবে যদি কেউ দয়া করে এগিয়ে আসে তাহলে নিশ্চয় ফিরিয়ে দেব না তাকে।

বিতস্তা বলল, আজ আর কোন প্রোগ্রাম আছে আপনার?

কিংশুক বলল, আছে, অবেলায় নিদ্রাদেবীর আরাধনা করা।

বিতস্তা বলল, তাহলে চলুন আমার বাড়ি, মা খুব খুশী হবেন।

বিতস্তার প্রস্তাবে খুশী হল না কিংশুক। তবু ভদ্রতা রাখতে বলল, আজ সন্ধ্যায় মাসীমার ওখান থেকেই খেয়ে আসব। তোমার রাগটাও তাহলে আর থাকবে না।

এ রকম একটা কথা কিংশুকের মুখ থেকে শুনবে আশা করেনি বিতস্তা, তাই খুশী যেন উপচে পড়ল ওর চোখেমুখে।

সত্যি আপনি যাবেন কিংশুকদা, শুধু যাওয়া নয় খেয়েও আসবেন, কি সৌভাগ্য আমার!

কিংশুক বলল, আমারই লাভ, খাবার খরচ কিছু বাঁচবে।

চলুন তাহলে এইবেলা ওঠা যাক, বলল বিতস্তা।

কিংশুক বলল, এই তো এলাম এত পথ পাড়ি দিয়ে, কান থেকে এখনও ট্যাক্সির আওয়াজ মিলিয়ে যায়নি, একটু সবুর কর, চা খাও, তারপর যাওয়া যাবে।

একথা সেকথা, চা-কেকের পাট চুকলে বিতস্তা আর কিংশুক বেরল পথে। আজ আর শিকারা নয়, হাঁটা পথেই যাবে দু'জনে ডাক্তার সান্যালের বাড়ি।

পথে চলতে চলতে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল বিতস্তা। ওর আজকের খুশী ও যেন ধরে রাখতে পারছিল না, চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলছিল।

পথে আগুন জ্বেলেছে চীনারের সারি সারি গাছ। সেপ্টেম্বর অক্টোবরে চীনারের গাছ রূপের আগুন জ্বালে। একই গাছের পাতায় হরেক রকমের রঙের খেলা। কোথাও সবুজ, কোথাও সোনালী হলুদ আবার কোথাও বা বাদামী রঙ।

চীনার গাছের ঘন পাতার ফাঁকে একটা পাখি শিস দিয়ে উঠতেই দাঁড়িয়ে গেল বিতস্তা। কান পেতে

শুনতে লাগল সে ডাক। বলল, দোয়েলের ডাক আমার খুব ভাল লাগে। একটু শীত পড়লেই শ্রীনগরের ধারে কাছে ওরা থাকবে না। এ পাখিটা কেমন করে জানি না দলছাড়া হয়ে থেকে গেছে।

কিংশুক বলল, ঠিক আমার মত। লোকে সঙ্গী-সাথী নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়, আর আমি নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বিতস্তাকে এই মুহূর্তে কিংশুকের মন্দ লাগল না। মেয়েটি প্রকৃতির গাছ পাতা পাখির খবর নেয়, নিতান্ত আটপৌরে সংসারী নয়, তাই বুঝি ভাল লাগল।

একটা চীনার পাতা পথ থেকে কুড়িয়ে কিংশুকের হাতে দিতে দিতে বলল বিতস্তা, দেখুন, পাতাটা ঠিক হাঁসের পায়ের মত, তাই না কিংশুকদা?

কিংশুক বলল, তোমার নজরের প্রশংসা করছি বিতস্তা। এ পাতাটা তোমার দান মনে করে রেখে দিলাম আমার পকেটে। ছবি আঁকতে গিয়ে কাজে লাগবে।

বিতস্তা একটুখানি হাসবার চেষ্টা করল কিন্তু হাসতে পারল না। চোখের পাতা তার মনে হয় ভারী হয়ে উঠল। কিংশুকের মুখ থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে সামনের দিকে চলতে লাগল। কিংশুক বিতস্তার পাশাপাশি চলতে চলতে ভাবল, বিতস্তা নিঃসঙ্গ। বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে একরকম নির্বাসিতের জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে সে। বাবার একটিমাত্র মেয়ে, তাই বিয়ের সূত্রে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিতে ডাক্তার সান্যালের মন চাইছে না। এদিকে কুরূপা না হলেও সৌন্দর্যের লীলাভূমি শ্রীনগরে বিতস্তা কিছুটা বেমানান বইকি। সব দিক থেকে বিচার করে কিংশুকের মনটা হঠাৎকোমল হয়ে উঠল বিতস্তার ওপর।

প্রসঙ্গ পাল্টে নিল বিতস্তা, ঐ যে খালের ওপর সার বাঁধা সব নৌকো দেখছেন, ওগুলো শ্রীনগরবাসীদের সংসার। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে সব এই জলের ওপর ভাসমান নৌকোয়।

কিংশুক বলল, জীবন নদীতে ভেসে থাকা সংসার তরণীর সার্থক প্রতীক এই দৃশ্য, কি বল?

একটু থেমে আবার বলল, আচ্ছা বিতস্তা, তুমি এদের বিয়ের উৎসব দেখেছ?

বিতস্তা বলল, বড় বড় বিয়ের অনুষ্ঠানে আতশবাজির খেলা দেখবার মত। সারি দিয়ে সাজান শিকারা আর নৌকো চলে। আলোর খেলায় রাতের আকাশটা মনে হয় যেন হাজার হাজার ঝকমকে হীরে-জহরত ছড়ানো।

কিংশুক বলল, নদীর ওপর কোন উৎসবের ছবি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে দেখবার মত। আমার দেখতে খুব ইচ্ছে করে।

বিতস্তা অমনি হেসে বলল, কাশ্মীরে বিয়ে করলেই আপনার ইচ্ছা পূরণ হয়ে যাবে কিংশুকদা।

কিংশুক অমনি বলল, কে আর মেয়ে দেবে বল এই ভবঘুরে আর্টিস্টকে।

বিতস্তা বলল, এমন করে নিজের দর বাড়াবেন না কিংশুকদা, আপনার মত পাত্র পেলে কনের বাবারা সারা ঝিলমটাই আলোর মালায় সাজিয়ে দেবে।

কিংশুক বলল, এতদিনে নিজের দামটা জানতে পেরে বিশেষ গর্ববোধ করছি বিতস্তা।

বিতস্তা কথান্তরে গেল, জানেন কিংশুকদা, এদের বিয়ের মোটামুটি একটা নিয়ম আছে।

কি রকম?

বিতস্তা বলল, শালের কাজ যারা করে তারা শালওয়ালার বাড়িতেই সাধারণত মেয়ের বিয়ে দেয়। আবার যারা হাউসবোটের মালিক তারা হাউসবোট থেকেই পাত্র পাত্রী খুঁজে নেয়। কাঠের কাজ যারা করে তারাও ঐ একই বৃত্তির লোকের ঘরেই মেয়ের বিয়ে দেয়। অবশ্য এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়।

কথা বলতে বলতে ওরা বড় রাস্তায় এসে পড়ল।

একটা বাস আসছে দেখে ওরা পথের ধারে দাঁড়িয়ে গেল।

বাসটা কাছাকাছি আসতেই একটা হাত বেরিয়ে এল। হাত নাড়তে-নাড়তে বাসের ভেতর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, গুড্ লাক্ বিতস্তা।

বাস চলে গেলে কিংশুক বলল, তোমার পরিচিত কেউ নিশ্চয়ই?

বিতস্তা বলল, আবার কে, মরিয়ম। সারা কাশ্মীরে বুঝি এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তাকালেই ওকে দেখা যায় না। ছেলেরাও যা করতে সাহস পায় না, ও তাই অনায়াসে করে বসে।

একটুখানি থেমে আবার বলল বিতস্তা, মেয়েদের এতখানি ডাকাবুকো হওয়া কি সাজে!

কিংশুক বলল, আজই পহেলগাঁও-এ ওকে আমি দেখেছি।

কথাটা শুনে বিতস্তার কেমন যেন একটু ভাবান্তর হল। সে আর কোন কথা না বলে হাঁটতে লাগল।

সত্যি, জলপথে আসা যেন নাসিকা বেষ্টন করে আসা, হাঁটা পথে কত সহজে পৌঁছে গেল ওরা।

বিতস্তা বাইরের থেকেই ডাক দিলে, মা, রান্নার ব্যবস্থা কর, কিংশুকদা আজ এখান থেকে খেয়ে যাবেন।

কিংশুক বলল, দারুণ মেয়ে তো তুমি, ঢুকতে না ঢুকতেই খাবার কথাটা ঘোষণা করে দিলে।

বিতস্তা বলল, আপনাকে তো বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে না, তাই আগে-ভাগে রান্নার আয়োজনটা করে রাখতে বলছি।

কিংশুক বলল, আমি বুঝি শুধু খাবার লোভেই এলাম তোমার এখানে?

বিতস্তা বলল, অন্য কোন লোভ আপনার আছে কিনা জানি না, তবে আপনি যে ভোজনরসিক সেটুকু জানতে আমার বাকী নেই।

কিংশুকের চোখেমুখে বিস্ময়। বিতস্তা হেসে বলল, বেড়াতে বেরোবার আগে মনসুরকে খাবার মেনুটা বলে দিয়ে যান না আপনি? আর রোজ নতুন নতুন রান্নার বরাদ্দ।

কিংশুক বিতস্তার হাসিতে যোগ দিয়ে বলল, এত খবর সংগ্রহ হয়ে গেছে এর মধ্যে!

বিতস্তা বলল, আপনার যিনি বউ হয়ে আসবেন কিংশুকদা, তার ভাগ্যে দুর্ভোগ আছে মেলা।

কিংশুক বলল, শুধু ঐ জন্যেই বিয়েটা আমার আর হয়ে উঠছে না।

বিতস্তার মা বেরিয়ে আসতে আসতে কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, তোমার মত ছেলের আবার বিয়ে হয় না! এমন চেহারা, এত গুণ। এবার আর পালিয়ে পালিয়ে না বেড়িয়ে একটা বিয়ে থা করে ফেল। বল তো আমিই মেয়ে দেখে দি!

কিংশুকের মনে হল শ্রীমতী সান্যাল যতদূর এগিয়ে এসেছেন, এবার নিজের মেয়ের কথাই না পেড়ে বসেন। তাহলে পরিস্থিতি রক্ষা করাই দায় হয়ে উঠবে।

কিংশুক তাড়াতাড়ি করে বলল, আগে মা মাসীর হাতে তো ভালমন্দটা খেয়ে নিই, তারপর বউ আনা যাবে ঘরে। বউ এলে তো এটা খেয়ো না, ওটা করো না, এতে ফ্যাট বেশি আছে, ছানাটা খাও প্রোটিন আছে ওতে ইত্যাদি ইত্যাদির ঠেলায় প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত।

বিতস্তা হেসে বলল, আচ্ছা বাবা ঠিক আছে, বউ এনে দরকার নেই এখন, চলুন বাগানে বসে গল্প করা যাক। মা, তুমি রাতের খাবার আগে আমাদের কিছু খেতে দেবে না?

শ্রীমতী সান্যাল বললেন, তোমরা বস, আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি!

ডাক্তার সান্যালের বাড়িটা বেশ ছিমছাম। কাঠের ফ্রেমে বাঁধা বাড়ি, কাঁচের শার্সি, বাইরে ভেতরে সী-গ্রীন রঙের পেইন্ট লাগান। দরজা জানালায় সাদা রঙ। রুচি মাফিক পর্দা ঝুলছে। জানালার ফাঁকে হাল্‌কা পর্দা উড়ে গেলে ড্রইংরুম থেকে ফ্লাওয়ার ভাসের ফুলগুলো এক একবার উঁকি দিচ্ছে।

কিংশুক আর বিতস্তা বসে আছে। কিংশুকের এই এক চিলতে বাগান আর ছবির মত সাজান বাড়িখানা ভারী ভাল লেগেছে। বাগানের একপ্রান্তে দুটো পপ্‌লার গাছ দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। ডালে পাতায় দুজন দুজনকে ছুঁয়ে আছে। ওর ফাঁক দিয়ে একটু দূরে ঝিলমের একটা বাঁক দেখা যায়।

কিংশুকের মনে হল, এই ছবির দেশে বাকী জীবনটা শুধু ছবি এঁকে এঁকে কাটিয়ে দিলে কেমন হয়। অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সির অফিসে দশটা পাঁচটা কমার্শিয়াল ছবির ড্রইং না করে মনের তাগিদে ছবি এঁকে গেলে আর কিছু না হোক ক্ষোভ মিটবে জীবনের।

বিতস্তা নিজের স্কুল কলেজ জীবনের কথা অনর্গল বলে যাচ্ছিল, আর কিংশুক তার দিকে চেয়ে কিছু শুনছিল, কিছু বা নিজের ভাবনা নিয়ে জাল বুনছিল।

কিংশুক বিতস্তার দিকে একসময় চেয়ে চেয়ে ভাবল, কেমন হয় এই মেয়েটিকে বিয়ে করলে? নিশ্চিন্ততা আসবে জীবনে, একটি সুখী সংসারের মালিকও হতে পারবে সে।

পরক্ষণেই আবার তার মনে হল, সুখ আর আনন্দ তো এক নয়। বাইরের সম্পদ, নিশ্চিন্ত আরাম মানুষকে সুখ দিতে পারে, কিন্তু আনন্দ দেবার শক্তি কতটুকু আছে তার। কঠিন রোগশয্যায় শুয়ে একটি কবিতা লিখে কবি যে আনন্দ পায়, অথবা অভুক্ত শিল্পী মনের তাগিদে ছবি এঁকে যে আনন্দ কুড়িয়ে পায়, মানুষকে রোজকার জীবনের সুখ কি সেখানে পৌঁছে দিতে পারে? মুখোমুখি বসে আছে যে মেয়েটি, সে ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা সুখী সংসার হয়ত গড়ে তুলতে পারে কিন্তু কতটুকু পারবে সে

শিল্পী কিংশুকের মনটাকে মুঠো মুঠো আনন্দে ভরে দিতে! একটা বিপুল প্রাণশক্তি যখন ফাল্গুনের শিমুল শাখায় পাগলকরা রঙের আগুন জ্বালে, তখন সে ছবি শিল্পীর সমস্ত প্রাণটাকে কেড়ে নিতে পারে। কিংশুকের মনে হল ততখানি প্রাণের জোয়ার কোনদিনই আসবে না বিতস্তার ভেতর। রূপে রসে হয়ত মগ্ন হতে পারে বিতস্তা, কিন্তু অকারণ আনন্দে ভেসে চলে যাবার মত প্রাণশক্তি কোনদিনই অর্জন করতে পারবে না সে। বিতস্তা শান্ত সংসারী. বিতস্তা অক্লান্ত দুর্বার নয়।

কিংশুকের সেই মুহূর্তে মনে হল, এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগটুকু সে আর কোনরকমেই গ্রহণ করবে না।

বিতস্তার একটা কথা হঠাৎ কানে ভেসে আসতেই উদগ্রীব আগ্রহ নিয়ে সেদিকে চেয়ে রইল কিংশুক।

বিতস্তা বলছিল মরিয়মের কথা।

জানেন কিংশুকদা, ঐ মরিয়ম মেয়েটা বড় লঘু। বিরাট পয়সাওয়ালা এক শালকরের পরিবারে ওর বিয়ে হয়েছিল, তিনটে বছর কাটতে না কাটতেই স্বামীকে ছেড়ে চলে এল ও। আমরা দেখেছি ওর স্বামীকে বিয়ের সময়ে, চোখ ফেরানো যায় না, এত সুন্দর। কি করে যে ও ছেড়ে আসতে পারল ওরকম স্বামীকে তা ভেবে অবাক হয়ে যাই।

কথাটা শুনে কিংশুকের কোন বিরূপ অনুভূতি জাগল না। সে বরং মরিয়মের পক্ষ নিয়ে বলল, দোষটা যে কার তা কেমন করে বোঝা যায় বল! সব দোষ মরিয়মের নাও তো হতে পারে।

বিতস্তার গলার স্বরে এবার কিছুটা উত্তেজনার উত্তাপ দেখা দিল। ও বলল, অবিকল আপনারই মত বাবাও দেখি মরিয়মের কোন দোষ দেখতে পান না। ছেলে হয়নি বলে নাকি স্বামীর সংসারে মরিয়মের আদর প্রতিপত্তি কমে যায়, মাঝে মাঝে তাকে নাকি স্বামীর নির্যাতনও ভোগ করতে হত, তাই বাবা বলেন, সংসার ছেড়ে সে চলে এসেছে।

আমরা কিন্তু ওকথা পুরোপুরি বিশ্বাস করি না। ওকে বিয়ের আগে কতদিন দেখেছি মনসুরের সঙ্গে শিকারায় রাতে ভিতে ঘুরে বেড়াতে। এমনকি বিয়ের পরেও ওকে মনসুরের হাউসবোট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে। আর এখন তো কথাই নেই, ফরেনরদের সঙ্গে গাইড সেজে সাঁঝসকাল ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিংশুকের মনে একটা তোলপাড় শুরু হয়ে গেল।

মনসুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে মরিয়মের, এ কথা মিথ্যে নয়, তবে তা কোন্ গোপন সুড়ঙ্গে কতদূর অবধি বিস্তৃত তা সে জানে না। এখন কিংশুকের মনে হল, মেয়েরাই বুঝি মেয়েদের সঠিক রূপটা দেখতে পায়।

কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না কিংশুক। চুপচাপ ঝিলমের দিকে চেয়ে বসে রইল।

ডাক্তার সান্যাল ফিরে এসেছেন। ঘরের ভেতর তাঁর দরাজ গলার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। কিছুক্ষণের ভেতরেই তিনি নেমে এলেন পেছনের বাগানে।

এই যে কিংশুক. তোমার আসাতে খুব খুশী হয়েছি, আরও খুশী হয়েছি তুমি এখানে খেয়ে যাবে শুনে।

কিংশুক বলল, হাউসবোটে বিতস্তার সঙ্গে দেখা। ও শুধু বাড়িতে ডাকল, খাবার কথা টথা কিছু বলল না, তাই নিজে থেকেই রাতের খাবারের নিমন্ত্রণটা নিয়ে নিলুম।

বিতস্তা বলল, মোটেও তা না! ভদ্রলোককে বাড়িতে ডাকলেই তাঁকে খাইয়ে ছাড়তে হয়, এ হল অলিখিত নিয়ম।

মেয়ের কথা শুনে হেসে উঠলেন ডাক্তার সান্যাল। বললেন, কথাটা তোমাদের বাংলাদেশে হয়ত সব সময় খাটে না কিন্তু এই সুদূর কাশ্মীরে কোন বাঙালী আমার এখানে এসে না খেয়ে ফিরে যাবে, এমন অঘটন আজও ঘটে নি।

কথার ভেতর বিতস্তা উঠে গেল মাকে বোধকরি সাহায্য করতে। কিংশুক এখন ডাক্তার সান্যালের মুখোমুখি।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, কতদিন থাকবে ভেবেছ কাশ্মীরে?

কিংশুক বলল, তেমন কিছু ভেবে বেরোইনি, তবে মাস খানিকের ছুটি হাতে নিয়ে এসেছি। ভাল

না লাগলে ফিরে যাব তাড়াতাড়ি, আর ভাল যদি লাগে তাহলে নভেম্বর অবধি থেকে যেতে পারি।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, শিল্পী মানুষ তুমি, কাশ্মীরের অপার সৌন্দর্য তোমাকে আটকে রেখে দেবে।

কিংশুক হাসল। ডাক্তার সান্যাল এবার অন্য প্রসঙ্গে এলেন।

কিংশুক, সোজাসুজি একটা প্রশ্ন করব তোমাকে?

কিংশুক ডাক্তার সান্যালের দিকে তাকিয়ে নড়ে চড়ে বসল।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, এই আমার মত কাশ্মীরে তুমি থেকে যেতে পারবে? কোন অভাব তোমার থাকবে না। ছবি আঁকার অজস্র উপাদান পাবে। ইচ্ছে যদি কর চাকরি কিংবা ব্যবসা কোনটারই অভাব হবে না।

কিংশুক সহজভাবেই নিল ডাক্তার সান্যালের এই কথাগুলো। বাংলাদেশের বাইরে একটি পিতা তার একমাত্র মেয়ের বিয়ের জন্য কতখানি চিন্তিত তা অনুমান করতে তাকে বেশি বেগ পেতে হল না।

কিংশুক বলল, বিধবা মা রয়েছেন দেশে। মন্দিরে এখনও বিগ্রহের নিত্য পুজো চলে। মা ঐ মন্দির ছেড়ে জীবনের শেষদিনগুলোতে আমার সঙ্গে বাইরে আসতে চাইবেন না। আর মাকে ফেলে রেখে এতদূরে থাকাও আমার পক্ষে তাই সম্ভব হবে না।

ডাক্তার সান্যাল চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলেন, তারপর আবেগে প্রায় ভেঙে পড়ে কিংশুকের একখানা হাত ধরে ফেললেন, একটি ছেলে বিতস্তার জন্যে যোগাড় করে দিতে পার বাবা, আমার সব পাবে সে। ব্যবসা করতে চাইলে ওষুধের দোকানও আমি তাকে করে দেব। শুধু আমাদের কাছে থাকতে হবে তাকে। যতদূর সম্ভব সুখে রাখতে চেষ্টা করব।

কিংশুক বলল, কথা দিচ্ছি আপনাকে, কলকাতা ফিরে আমি নিশ্চয়ই বিতস্তার জন্যে খুব ভাল একটি ছেলের সন্ধানে থাকব। আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না। বিতস্তাকে আমার খুবই ভাল লেগেছে, ওর জন্যে কিছু করতে পারলে আমি খুবই তৃপ্তি পাব।

ডাক্তার সান্যালের মুখটা মনে হল কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। আর কিংশুক বন্ধুবান্ধব থেকে আত্মীয়স্বজন, চেনাজানা প্রায় সব অবিবাহিতের মুখ খুঁজে বেড়াতে লাগল।

রাতে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ফিরে আসছিল কিংশুক, মনটাও ভাল ছিল না তার। একটি মেয়েকে গ্রহণ না করতে পারার কথা স্পষ্ট করে বলতে হয়েছে তাকে, এ যেন কোন মানুষের পক্ষে বিশেষ এক অস্বস্তির ব্যাপার।

পথ চলতে চলতে অন্যমনস্ক হয়ে কখন পেরিয়ে এসেছিল ডালভিউ হোটেল, পেছন থেকে ডাক, চাপা গলায় মরিয়ম ডাক দিল, এই যে মিঃ মুখার্জী।

কিংশুক পেছন ফিরে দেখে মরিয়ম তার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে বলল, পেছন থেকে ডাক দিলে আপনাদের তো আবার যাত্রা পাল্‌টে নিতে হয়। যেখান থেকে আসছিলেন সেখানে ফিরে গিয়ে আবার যাত্রা শুরু করুন।

কিংশুক বলল, সেখানে যাবার পথ নিজেই বন্ধ করে দিয়ে এসেছি।

মরিয়ম ব্যাপারটা পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারল না। সে বলল, আজ নিশ্চয়ই দারুণ জমেছিল আপনাদের! সেই বিকেলে বেরিয়েছিলেন বিতস্তার সঙ্গে আর এই রাত নটা বাজিয়ে ফিরলেন।

কিংশুক বলল, দূর বিভুঁই-এ আপনার জন পেলে কার না ভাল লাগে!

মরিয়ম বলল, এখন আমার ছুটি, বাড়ি ফিরছি, চলুন না কিছুটা হাঁটতে হাঁটতে যাওয়া যাক্।

কিংশুক বলল, আপনাকে এগিয়ে দিতে পারলে খুশীই হব।

মরিয়ম পহেলগাঁওয়ের পোশাক কখন বদলে ফেলেছে। শাড়ির ওপর পরেছে সাদা কাজ করা কার্ডিগান। মাথায় স্কার্ফ বাঁধা।

ওরা দুজনে চলেছে প্রায় জনহীন পথে।

মরিয়ম বলল, কাল কোথায় প্ল্যান করেছেন?

কিংশুক বলল, কিছুই ঠিক করিনি, তবে সোনমার্গ যাবার ইচ্ছে আছে, হয়ত ওখানেই চলে যেতে পারি।

মরিয়ম বলল, কাল আমার ছুটি, মানে আমার হোটেলবাসীদের পুরোপুরি বিশ্রাম আর টুকটাক কেনাকাটার দিন।

কিংশুকের ইচ্ছে করছিল মরিয়মকে সঙ্গী হতে অনুরোধ জানায়, কিন্তু যদি কোন কাজের অজুহাত দেখায় তাহলে মনের কোথাও গিয়ে বাজবে, তাই ওকে নিজের থেকে আর ডাক দিল না।

কিংশুক বলল, ছুটির দিনগুলো বেশ আরামে আলসেমীতে কাটে, তাই না?

মরিয়ম বলল, ছুটির দিনে আমার আবার ছুটি থাকে না, সেদিন নিজের দিকে তাকাতে হয়, ধোলাই ইস্ত্রি ঘর সাফাই সব কাজ একহাতে করি।

কিংশুক বলল, সাহায্যকারী বাড়তি লোক নেই কেউ?

মরিয়ম বলল, রাখতে পারা হয়ত যায়, কিন্তু কেমন যেন পছন্দ হয় না ওদের কাজ।

কিংশুক হঠাৎ হেসে উঠল।

মরিয়ম অবাক হয়ে বলল, হাসলেন যে?

কিংশুক বলল, নিজের হাতে সবকিছু করা, অন্যকে কিছু করতে না দেওয়া, এসব সুবাদ আপনার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রখর বুদ্ধি মরিয়মের। মুহূর্তে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে বলল, কমপ্লিমেন্টটা বিতস্তা দিয়েছে নিশ্চয়ই। ওর মত গুণী মেয়ে ছাড়া কে দেবে!

বিতস্তার মুখে আপনার দক্ষতার অনেক কথা শুনেছি।

মরিয়ম কিছু সময় কোন কথা না বলে চুপচাপ হাঁটতে লাগল। এক সময় পথে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, আপনার ফ্যামিলিতে কে কে আছেন?

কিংশুক বলল, একমাত্র মা, তাও কলকাতায় থাকেন না, থাকেন দেশের বাড়িতে।

মরিয়ম বলল, আপনি তো ব্রাহ্মণ, একটি ভাল মেয়ে আছে, বিয়ে করবেন?

কিংশুক বলল, আপত্তি নেই, তবে একটি ছোট সংস্কার আছে আমার।

কি রকম?—বলল মরিয়ম।

কিংশুক বলল, যে মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে তার অতীত বর্তমান, জাতধর্ম কিছুই আমি দেখব না, শুধু কোন নদীর নামে তার নাম না হলেই হল। এই যেমন শিপ্রা, রেবা, গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী ইত্যাদি।

মরিয়ম খুব একচোট হাসল। হাসি থামলে বলল, বিতস্তা নিশ্চয়ই আপনার মনের এ সংস্কারের কথা জানে না এখনও।

কিংশুক একটু ভেবে নিয়ে বলল, মনে হয় এতক্ষণে জানতে পেরেছে। আমি ডাক্তার সান্যালকে সবিনয়ে আমার অক্ষমতার কথাটা জানিয়ে এসেছি।

মরিয়ম বলল, ছেলেরা একটু বেশি রকমের নিষ্ঠুর হয়।

কিংশুক অবাক হবার অভিনয় করে বলল, মেয়েদের চেয়ে বেশি!

মরিয়ম বলল, একশো বার।

কিংশুক বলল, মানতে পারলাম না।

ওরা কথায় কথায় অনেক পথ এসে গিয়েছিল। একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে মরিয়ম বলল, তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম মুখার্জী, রাতও অনেক হয়েছে, এখন হাউসবোটে বিশ্রাম করগে। হ্যাঁ, শোন, যদি আপত্তি না থাকে তাহলে কাল গাইড হয়ে তোমার সঙ্গে সোনমার্গ যেতে চাই।

কিংশুক বলল, আমি গরীব মানুষ, তোমার মত রূপসী নিপুণা গাইডের দাম কি দিতে পারব!

মরিয়ম চলে যেতে যেতে বলল, নিজের দাম আর বাড়িও না মুখার্জী! তোমার সঙ্গটা যে অনেক বেশি দামী তা তুমি নিজে ভাল করেই জান।

মরিয়ম দূর থেকেই বলল, আমিই ট্যাক্সি নিয়ে আসব এখন, তুমি শুধু মনসুরকে বলে রেখ, ড্রাইভারকে নিয়ে চারজনের খাবার তৈরি করতে। তাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে, আমি বলেছি বলে বল।

মরিয়ম অদৃশ্য হয়ে গেল আর কিংশুক ফিরে আসার পথে ভাবতে লাগল, কেমন সহজ কথাবার্তার ভেতর দিয়ে মেয়েটি 'আপনি'টাকে 'তুমি'তে নামিয়ে আনল।

সোনমার্গের পথে ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। কিংশুক আর মরিয়ম বসেছে পেছনের সীটে। সামনে ড্রাইভারের পাশে মনসুর। পেছনে নাচতে নাচতে সরে যাচ্ছে নদীনালা, পথ-প্রান্তর, গাছপালা।

মরিয়ম বলল, বরফ পড়ে পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সোনমার্গের, আজ দুদিন মাত্র খুলেছে। বাস এখনও যেতে পারছে না। জীপ, ট্যাক্সি, প্রাইভেটকার কোন রকমে যেতে পারে। মিলিটারীতে জীপের জন্য রাস্তা তৈরি না করলে এ যাত্রায় সোনমার্গ যাওয়া হয়ত তোমার সম্ভব হত না মুখার্জী।

কিংশুক বলল, আমার লাক্‌টা ভাল বলতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গী-ভাগ্যও।

মরিয়ম বলল, সে তো আগেই আমি বলেছি, কাশ্মীরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ঝড় বৃষ্টি মুছে গেল। আবার এখন সোনমার্গের বরফঢাকা পথও গেল খুলে।

কিংশুক বলল, শোন মরিয়ম, মাঝে মাঝে আমি কিন্তু গাড়ি থামিয়ে তোমাদের বিরক্ত করব।

মরিয়ম বলল, তোমার খুশীমত থামিও, কিন্তু কেন?

কিংশুক বলল, স্কেচ করার সাবজেক্ট পেলে হাতের কলমটা খাতার পাতায় আঁচড় কাটতে চায়। তাছাড়া কাশ্মীরের সব স্মৃতিকেই আমি অক্ষয় করে রাখতে চাই।

মরিয়ম বলল, তুমি যখন আঁকবে তখন আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে দেখব।

কিংশুক বলল, সব সময় নয়।

মরিয়ম অনুযোগের সুর তুলে বলল, ও কথা বলছ কেন? একজন শিল্পী যখন কাজ করে তখন কি অপূর্ব তন্ময়তা ফুটে ওঠে তার ভেতর। আমার সেই মুহূর্তগুলো ভোলার নয় বলে মনে হয়! আমি কাশ্মীরের শাল, কাঠ, পেপারমেসির কাজ যারা করে তাদের কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকি, কাজ দেখি। শিল্পী আর তার হাতের কাজ দুটিই আমাকে সমান আকর্ষণ করে।

কিংশুক বলল, নিশ্চয়ই দেখবে, তবে তোমাকে সাবজেক্ট হতে হবে মাঝে মাঝে, তখন তো আর দেখতে পাবে না।

মরিয়ম বলল, ওরে বাবা, ও আমায় দিয়ে হবে না। তোমার ছবির আমি হব মডেল!

কিংশুক বলল, ছবিতে আমি যদি মরিয়ম নামের একটি মেয়েকে আঁকি তাহলে সে ছবি সাধারণ একটা পোর্ট্রেটের বেশি কিছু হবে না, কিন্তু যদি মরিয়মের ভেতর দিয়ে কাশ্মীরের একটা ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারি তাহলে সেটাই পাবে আসল ছবির মর্যাদা। আমি তোমাকে আঁকব না মরিয়ম, তোমার ভেতর দিয়ে একটা ঋজু সুন্দর পপ্‌লার গাছ, একটা ছুটে চলা ঝর্ণার জলধারাকে ধরে রাখার চেষ্টা করব।

একটু থেমে কিংশুক হেসে বলল, খুব কাব্য করছি বলে মনে হচ্ছে, তাই না মরিয়ম?

মরিয়ম অবাক হয়ে শুনছিল। সে বলল, তোমার এ কথাগুলো সত্যিই কবিতা, আর নিশ্চয়ই এগুলো ফেলে দেবার কবিতা নয়।

অনেকগুলো টুকরো টুকরো ছবিকে ওরা পথের বাঁকে বাঁকে ফেলে এলো। দু'এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে কিংশুক স্কেচ করল, উপলছাওয়া নদীর বাঁকে পাইন গাছের দুটো পাহাড়ের মাঝে থমকে থাকা মেঘের। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ক্ষেতিকারদের ছোট ছোট ঘর বাড়ি আর কর্মরত মেয়ে পুরুষের।

পাহাড়ের ওপরে উঠছে গাড়ি। নীল নদীধারা চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে ঘন সবুজ পাইন বনের ফাঁকে ধবধবে সাদা বরফের মুকুট উঁকি দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। কিশুক চেয়ে আছে নির্বাক। এ জগৎ স্কেচের নয়। এখানে নীল আকাশ, সবুজ পাইন, হাল্‌কা পিঙ্ক আর দুধসাদা বরফের পাহাড় রঙ চাইছে। কিংশুক আঁকবে সে ছবি। এখন মনের পাতায়, তারপর সেই পাতা সামনে মেলে, যেখানে কোন দৃশ্য থাকবে না সেখানে বসে আঁকবে। তাই চলার পথে রঙের ছবি আঁকছে কিংশুক মনে মনে।

এক সময় কিংশুক দেখল মরিয়ম তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ও বলল, কি দেখছ মরিয়ম?

তোমাকে।

কিংশুক বলল, আমাকে! আমার ভেতর এমন নিবিষ্ট হয়ে দেখার কি আছে!

মরিয়ম বলল, তুমি যখন ঐ পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিলে তখন আমি দেখছিলাম তুমি কত গভীরে ডুবে যেতে পার।

কিংশুক বলল, অমন করে আমাকে লজ্জা দিও না মরিয়ম।

এবার আমরা সোনমার্গে ঢুকব।

পিছল পথ। অতি সন্তর্পণে তার ওপর দিয়ে ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে চলল।

একটা বাঁকের মুখে এসে গাড়িটাকে ব্রেক কষে দাঁড় করাল ড্রাইভার।

একপাল চমরী গাই-এর পিঠে বাঁধা বোঝা, তাদের পেছনে খচ্চরের পিঠে চেপে আসছে গুজর ব্যবসায়ী। মেয়ে-পুরুষ মিলে বিশ পঁচিশ জনের মত।

তারা এগিয়ে আসছে, আর গাড়ির ভেতর থেকে দ্রুত রেখার টানে তাদের স্টীল করে ধরে রাখছে কিংশুক।

হঠাৎ কখন গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে মরিয়ম বুঝতে পারেনি কিংশুক। কিছুক্ষণ পরে ছবির পাতা থেকে মুখ তুলে দেখল সমস্ত দলটা থেমে গেছে। মরিয়ম তাদের মেয়েদের সঙ্গে কথা কইছে।

কিংশুক নিবিষ্ট হয়ে দেখতে লাগল। মেয়েরা প্রচুর গয়না পরেছে। বিচিত্র সব গড়ন। পোশাকের রঙ হাল্‌কা আর ঘন বাদামী। ওদের মুখে যাযাবর মানুষের ভাব। খোলা আকাশ, সোনালী রোদ্দুর, বরফ আর দূর পথের ছবি আঁকা আছে ওদের চোখে।

আবার চলতে শুরু করল ওরা। একটি মেয়ে খচ্চরে চড়ে আসছিল, তার হাতখানা ধরে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এল মরিয়ম। কিংশুক দেখল, তরুণী গুজর মেয়েটির মুখ থম থম করছে।

ওরা চলে গেল; মরিয়ম গাড়িতে উঠে এসে বসল।

কিংশুক দেখল মরিয়ম চুপচাপ। চোখ দুটোতে জল চিক্‌চিক্‌ করছে।

গাড়ি এগিয়ে চলল। কিংশুক কোন কথা বলল না!

একসময় রুমালে চোখ মুছে মরিয়ম স্থির হয়ে বসল।

জান মুখার্জী, ঐ মেয়েটার স্বামী আর দেবর তুষার ঝড়ে মারা গেছে।

একটু থেমে বলল, কয়েকদিন আগেকার কাগজে কারাকোরামের এদিকে তুষার ঝড়ে একদল ব্যবসায়ীর মৃত্যুর খবর বেরিয়েছিল। দুটি বড় দলের একটি, উপত্যকার মুখে দুটো পাহাড়ের মাঝখানে রাতের আস্তানা গেড়েছিল। আর অন্য দলটি ছিল তাদের খানিক পেছনে একটি পাহাড়ের খাঁজে।

রাতে তুষার ঝড় শুরু হল। উপত্যকার মুখে যারা ছিল প্রবল ঘূর্ণির তোড়ে ছিট্‌কে গভীর খাদের কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর অন্য দলটি সোজাসুজি বাতাসের প্রবল ঘূর্ণি থেকে কোন রকমে রক্ষা পেয়ে গেল। এই মেয়েটির স্বামী আর দেবর ছিল উপত্যকার মুখে। মেয়েটি সে রাতে পেছনের দলে তার বান্ধবীর সঙ্গে ছিল। সকালে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যেতে ওরা দেখল কোথাও কেউ নেই, শুধু বিরাট পুরু বরফের আস্তরণ পাহাড়ের গায়ে বিছানো আছে।

কিংশুক বলল, তবু দেশে ফিরে না গিয়ে এদিকে এল ওরা!

মরিয়ম ম্লান হেসে বলল, বাঁচার তাগিদে। ওরা ইয়ারখন্দের বণিক। শীতকালটা কাটিয়ে যায় শ্রীনগরের ছ'নম্বর সেতুর কাছে ইয়রখন্দ সরাইতে। তখন মধ্য এশিয়ার সঙ্গে আমাদের দেশের পায়ে চলার পথটা বরফ ঢাকা থাকে। শীতকালে কেনাবেচার কাজ শেষ করে একটু বসন্তের হাওয়া দিলেই ওরা চলে যায়।

কিংশুক বলল, সভ্য জগতে যাতায়াত ব্যবস্থার এত উন্নতি তবু ওরা কিন্তু আদিম ব্যবস্থাটাকে বজায় রেখেছে। বিরাট কিছু লাভের ব্যবসা নিশ্চয়ই ফেঁদে বসেনি ওরা, তবু কী ভীষণ কষ্টের জীবনটাকে স্বীকার করে নিয়েছে।

মরিয়ম বলল, জান মুখার্জী ওরা তাঁবু পর্যন্ত সঙ্গে রাখে না। পথে প্রচণ্ড শীতেও ওরা ঐ পশুগুলোকে জড়ো করে তাদের ভেতর জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে।

কিংশুক বলল, বিচিত্র মানুষের সমাজ, অদ্ভুত জীবনযাপন প্রণালী।

মরিয়ম বলল, যে মেয়েটির স্বামী মারা গেছে সে আমার চেনা। কয়েক বছরের যাতায়াতের ফলে ওর সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে। গত বছরও ওকে আমি দেখেছি ওর স্বামীর সঙ্গে বাজারে পশমের জিনিস বিক্রি করতে। আমাকে দেখতে পেয়ে ওর স্বামী প্রথমে মিষ্টি হেসে মাথা নাড়ল, তারপর স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার দিকে। ঐ মুখখানা কিংশুক, এই মুহূর্তে আমি ভুলতে পারছি না।

গাড়িটা এসে ঢুকে পড়ল তুষার ঘেরা একটা প্রান্তরে।

ছোট দু'খানি বাড়ির ছাদে পুরু বরফের ধবধবে সাদা আস্তরণ। সোনমার্গ প্রান্তরের চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পথ থেকে প্রান্তর ঢেকে বরফের ধবধবে সাদা চাদরখানা বিছানো রয়েছে পাড়াড়ের চূড়ো অবধি। পাইনের গাছগুলো পাহাড়ের শিরা বেয়ে সারি দিয়ে বহু উঁচুতে উঠে গেছে। তাদের শাখায় পাতায় বর্শা ফলকের মত ধবধবে তুষার ফলক।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল ওরা পথের ওপর। এখানেই পথের শেষ।

ওরা ছোট ঘরটার সামনে এগিয়ে এসে দেখতে পেল কয়েকখানা চেয়ার পাতা রয়েছে। ওখানেই বসে পড়ল ওরা। ভেতর থেকে চা পরিবেশন করছিল। ওরা জলযোগ ওখানে বসেই সেরে নিল।

কিংশুক বলল, সত্যি সোনমার্গ এক এবং অদ্বিতীয়।

মরিয়ম বলল, রিভার সিন্ধ্ এই প্রান্তরকে আধখানা চাঁদের মত বেড় দিয়ে রয়েছে। নদীর বেলাভূমিতে এককালে নাকি সোনা পাওয়া যেত, যার থেকে এই উপত্যকার নাম হয়েছে সোনমার্গ, বা সোনার প্রান্তর।

মরিয়ম একদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ উৎরাইটা হিমবাহ নেমে আসার পথ।

কিংশুক দেখল, যেন একটা দুধের ফেনার মত বরফের ঢেউ কিছুটা নেমে এসে থেমে গেছে।

আর ঐ যে দেখছ একটা বরফের পাহাড় মরিয়ম বলল, ওটা সমস্ত ভ্যালিটাকে দুটো ভাগ করে দিয়েছে।

কথায় কথায় মরিয়ম বলল, এখান থেকে ন'মাইল পথ পেরোলেই বালতাল। সিন্ধু উপত্যকার শেষ সীমা ওটি। এখান থেকে যোজিলা গিরিপাস মাত্র আড়াই মাইল। কাশ্মীরের সঙ্গে লাদাকের ব্যবসার যোগসূত্র এই বালতাল।

জানো কিংশুক, বালতালের পথে আমি ট্যুরিস্টদের সঙ্গে অনেকবার গিয়েছি। সূর্যের সোনাঢালা পথ, রঙীন ফুলের ছড়াছড়ি।

কিংশুক বলল, এবার আগেভাগেই বরফ পড়ে গেছে, তাই হাঁটা পথে যাওয়া কষ্টকর হবে। ফিরে যদি আবার আসি কোনদিন, যাব ওদিকে। অবশ্য যদি তোমার সঙ্গ পাই তাহলে তো কথাই নেই।

মরিয়ম হেসে বলল, ট্যুরিস্টদের থেকে কিন্তু আমি ফ্যাবিউলাস অ্যামাউন্ট পেয়ে থাকি, একেবারে কিছু দেবে না তুমি!

কিংশুক বলল, গরীব আর্টিস্ট নিজের খরচ চালাতেই হিমশিম, কি দেব তোমাকে বল?

আমার একখানা ছবি এঁকেও দিতে পারবে না?—বলল মরিয়ম।

কিংশুক সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এখুনি রাজী। আসি আর না আসি, আগাম দাদন দিয়ে যাব।

ওরা বেরিয়ে পড়ল পথে। একটা বাঁক ঘুরে সাদা বরফের পাহাড়ের ওপর দুটো পাইন গাছ সুন্দর ভঙ্গীতে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে এসে পৌঁছল।

কিংশুক বলল, ঐ ওপরের পাইন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তুমি একপাশ থেকে গাছের দিকে চেয়ে থাক, আমি ঐ পাথরটার ওপর ইজেল রেখে রঙ দিয়ে তোমার ছবি আঁকি। দেখ দেখ, কি সুন্দর আবহাওয়া। ওপরের বনের আড়াল থেকে কেমন সূর্যের ভাঙা আলোর টুকরো ছিট্‌কে এসে পড়েছে গাছের তলায়।

দুহাতে বরফের চাঁই টানতে টানতে তুষারদেশের একটা হরিণীর মত উঠে গিয়ে গাছের তলায় দাঁড়াল মরিয়ম।

নীচের থেকে কিংশুক হেঁকে বলল, রোদটুকু মেখে নাও মাথায়।

মরিয়ম চেঁচিয়ে বলল, বুঝতে পারছি না, রোদ মাখব কি করে।

কিংশুক নীচের থেকে নির্দেশ দিল, আর একটু এগিয়ে দাঁড়াও। ঠিক আছে, এবার মুখখানা ডান দিকে সামান্য ফিরিয়ে ওপরের দিকে তাকাও। বাঃ, চমৎকার, চুলগুলো ছুঁয়ে রোদটুকু গালে গড়িয়ে পড়েছে। ইয়োলো স্ল্যাক্‌স্-এর সঙ্গে লাল গলাবন্ধ সোয়েটার, সাদা বরফ নীল আকাশ আর সবুজ পাইনের পটভূমিতে সত্যিই ওয়ান্ডারফুল।

মুখ না ফিরিয়ে মরিয়ম বলল, আমাকে পুতুল পুতুল লাগছে, আমি নেমে যাব।

কিংশুক বলল, সর্বনাশ ও কাজটি করো না। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু ভাব, একদিন আমি এমনি বৃক্ষ ছিলাম, আমার কোন বোধ ছিল না, কিন্তু বাতাসে আমার পাতা কেঁপে উঠত, পাহাড়ের ওপর থেকে রোদ ঝাঁপিয়ে আলিঙ্গন করত আমাকে।

থেমে গিয়ে কিংশুক রাফ স্কেচটা করে নিচ্ছিল আগে।

মরিয়ম বলল, থামলে কেন, সুন্দর একটা অনুভূতি হচ্ছিল, বলে যাও।

কিংশুক বলল, তাহলে তোমার ব্যাগ থেকে কলম আর কাগজ বের করে দাও, আমি বসে বসে কবিতা লিখি। ছবি আঁকতে গেলে অত কথা বলা চলবে না। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দিলে সে যেমন আপনার বেগে চলে, তেমনি ভাবনার খেই ধরিয়ে দিলে আপন মনে ভেবে যেতে হয়।

মরিয়ম বলল, আচ্ছা ঠিক আছে মশায়, এখন থেকে আমিই ভাবছি।

মরিয়মের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। কিংশুকের সূক্ষ্ম টানে সেই হাসি কোমল সুন্দর আর জীবন্ত হল।

বেশ খানিক সময় এমনি কেটে যাবার পর কিংশুক বলল, এবার তোমার ছুটি। তুমি চারিদিকে চোখ ফেরাতে আর হাত পা চালাতে পার, তবে নামতে পাবে না এখন। কখন কি দরকার পড়ে।

মরিয়ম ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল, গান গাইতে পারি?

কিংশুক মরিয়মের মুখে একটা রঙের ওয়াশ দিতে দিতে বলল, খু-উ-ব পার।

একটা জীপ পথের বাঁক ফিরে গর্জন করতে করতে ছুটে এসে কিংশুককে পথের ওপর দেখে দাঁড়িয়ে গেল।

কয়েকটি বিদেশী ট্যুরিস্ট মেয়ে পুরুষ নেমে পড়ল জীপ থেকে। ওদের হাতে মুভি ক্যামেরা। ওরা কিংশুক আর মরিয়মের ছবি নিতে চায়।

একজন হাত তুলে মরিয়মকে ইঙ্গিত করে বলল, তোমরা কি স্বামী-স্ত্রী?

কিংশুক কিছু বলার আগেই ওপর থেকে চেঁচিয়ে মরিয়ম বলল, ইয়েস, ইয়েস।

একটি মেয়ে মরিয়মকে নেমে আসার জন্যে হাতছানি দিতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, এবার আমি নামতে পারি মুখার্জী?

কিংশুক কোন রকমে উত্তর করল, নেমে এসো।

ওরা কিংশুক আর মরিয়মকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে ছবি নেবার উদ্যোগ করতে লেগে গেল।

মরিয়ম হাসছিল। কিংশুক দাঁড়িয়েছিল স্ট্যাচুর মত।

মরিয়ম কিংশুককে ঠেলা দিয়ে বলল, অমন স্টিফ্ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভয় নেই, ওরা আমাদের এই ছবি তোমার ভাবী বউয়ের কাছে পাঠাবে না।

ওরা নানা অ্যাঙ্গেল থেকে শিল্পী আর মডেলের ছবি তুলে নিয়ে চলে যেতেই মরিয়ম বলল, আমি যখন ওপরে ছিলাম, তখন একটা লোক হাত তুলে কি জিজ্ঞেস করছিল বল তো?

কিংশুক বলল, কথাটা না শুনেই কি তুমি ইয়েস্ ইয়েস্ করে উঠেছিলে?

মরিয়ম বলল, ঠিক তাই। ওর হাত তোলা দেখে আমার মনে হল লোকটা সোনমার্গের প্রান্তরটা ডানদিকে কিনা জানতে চাইছে। আমিও অমনি ইয়েস্ ইয়েস্ বলে দিলাম।

কিংশুক বলল, ও অন্য কথা জানতে চেয়েছিল।

মরিয়ম অমনি বলল, কি কথা?

কিংশুক বলল, সে কথা বলা যাবে না।

পীড়াপীড়ি করতে লাগল মরিয়ম, বল না কি কথা, বল না!

কিংশুক বলল, তাহলে কথা দাও, তুমি এমন সুন্দর উচ্চারণে বাংলা বলা কি করে শিখলে তা আমাকে আজ এখুনি বলবে।

প্রথমে চঞ্চল মেয়েটি একটু গম্ভীর হল, তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে বলল, বলব।

কিংশুক বলল, এরা তোমার দিকে আঙুল তুলে তোমার আমার সম্পর্ক অতি নিকট কিনা জানতে চাইছিল।

মরিয়ম বুদ্ধিমতী। সে তার ভুলটা বুঝতে পেরেছে। কিংশুকের মনে হল, মরিয়ম বোকার মত 'ইয়েস ইয়েস' বলেছিল বলে এখন লজ্জা পাচ্ছে।

কিংশুক আবার বলল, এখন আমার কথা আমি রেখেছি, তোমার কথাটা শোনাও।

মরিয়ম কিংশুকের হাত ধরে বলল, এসো আমার সঙ্গে, এখানে পথে দাঁড়িয়ে কথা হবে না।

কিংশুক ওর সঙ্গে যেতে যেতে ভাবল, মেয়েটি কত সহজে তার হাত ধরে ফেলল। অথচ ওর চোখে মুখে উত্তেজনার কোন ছাপই নেই।

ওরা এসে পড়ল পথ থেকে বেশ কিছু দূরে একটা নির্জন বনস্থলীতে। ওখানে একটা পাথরের চাঁই আশ্চর্যভাবে সূর্যের উত্তাপে খসিয়ে ফেলেছিল তার বরফের মুকুট। ওরা অনেক বরফ ভেঙে তারই ওপরে গিয়ে বসল।

মরিয়ম বলল, আমি জানি, তুমি খুবই উৎসুক হয়ে আছ আমার বাংলা জানার পেছনের রহস্যটুকু জানতে। আগেও তুমি এ প্রশ্ন আমাকে করেছ।

কিংশুক বলল, এ ঔৎসুক্য নিশ্চয়ই স্বাভাবিক বলে তুমি মেনে নেবে।

মরিয়ম বলল, আমি জানি একজন বাঙালীর মুখোমুখি হলে এ প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতেই হবে।

এর পর কিছুক্ষণ নীরবতার ভেতর কেটে গেল। সূর্যের আলো এখন পাইন বনের ভেতর সোনার হরিণের মত খেলা করছে। মসলিন স্বচ্ছ একটা কুয়াশা ভেসে এসে ওদের হিমেল ছোঁয়া দিয়ে চলে গেল।

মরিয়ম বলল, আমি বাবার দিক থেকে কাশ্মীরী হলেও মা ছিলেন আমার বাঙালী। সেদিক থেকে তোমার সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ থাকলেও থাকতে পারে।

কিংশুক বলল, আমার ধারণায় প্রতিটি মানুষ একই রক্তের বাঁধনে বাঁধা।

মরিয়ম বলল, আমার মা ছিলেন বাঙলাদেশের এক বিশিষ্ট বনেদী বাড়ির বিধবা। সতের আঠারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। একসময় পরিবারের লোকজনের সঙ্গে অমরনাথ তীর্থের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন কাশ্মীর। পথে ঠিক আজকের ঐ সমরখন্দের ব্যবসায়ীদের মত ঝড়ের মুখে পড়ে যান। বহু তীর্থযাত্রী মারা যান। মা একটা পাহাড়ী নদীর স্রোতে একটুখানি ভেসে বড় পাথরের চাঁইতে আটকা পড়েন। বাবা ওখানকার একটা গ্রামে তাঁর মামার বাড়িতে থাকতেন! নামদা তৈরি করে সাপ্লাই করতেন পহেলগাঁওয়ের বাজারে। যে কোন রকমে তাঁর চোখে পড়ে যায় মায়ের এই মুমূর্ষু অবস্থার ছবি। তিনি মাকে ঐ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে সুস্থ করে তোলেন।

বাবা পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন মাকে তাঁর স্বামীগৃহে বাংলাদেশে, কিন্তু আমার বিধবা মা সেখানে মনের দিক থেকে সুখী ছিলেন না। তাই যখন বাবা পহেলগাঁওয়ের কিছু দূর থেকে মাকে শ্রীনগরে নিয়ে আসছিলেন, তখন মা আমার বাবাকে তাঁর বঞ্চিত জীবনের কথা বলেন। বাবা তখন যুবক, তিনি মাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মা সম্মতি জানালে তাঁরা নতুন জীবনে প্রবেশ করেন। আমি মা বাবার একমাত্র সন্তান। দু' এক বছর আগে পিছে আমি আমার মা বাবাকে হারিয়েছি কিংশুক। আমার মা বাংলাদেশ থেকে ডাকে বহু বই আনতেন। তাঁর কাছে বহু যত্নে আমি বাংলা শিখেছি। আগেই বলেছি বাবা ছিলেন আমার শিল্পী মানুষ। শালের ওপর বহু উৎকৃষ্ট কাজ তিনি করেছেন, কিন্তু তাঁর কাজের অনুপাতে অর্থ তিনি সঞ্চয় করে যেতে পারেননি। দুহাতে মানুষকে তিনি দান করেছেন। অবসর পেলেই ঘুরে বেড়িয়েছেন। আমার মায়ের মৃত্যু আগে হয়েছিল। বাবা এমন আঘাত পেয়েছিলেন যে পুরো দুটো বছর প্রায় নির্বাক হয়ে কাজকর্ম না করে কাটাতেন। শেষে মায়ের কাছে গিয়ে তিনি শান্তি পেলেন।

কথা বলতে বলতে ভারী হয়ে উঠল মরিয়মের গলা। সে কতক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

কিংশুক বলল, কিছু যদি মনে না কর একটা কথা জানতে চাই।

মরিয়ম মুখ তুলে তাকাল কিংশুকের দিকে। চোখে তার জল টলটল করছে।

কিংশুক অমনি বলল, থাক্, এখন আর কোন কথা নয়।

মরিয়ম চোখ মুছে বলল, বল কি জানতে চাও।

কিংশুক বলল, তুমি কি এখনও একা মরিয়ম?

মরিয়মের মুখে বৃষ্টিভেজা রোদ্দুরের ছোঁয়া লাগল। বলল, মানুষ কি কখনো একা থাকতে পারে

মুখার্জী। তবে তুমি যে অর্থে একা কিনা জিজ্ঞেস করছ সে অর্থে আমি নিঃসঙ্গ।

একটু থেমে আবার বলল, তুমি যখন জিজ্ঞেস করেছ তখন কোন কিছু লুকোবো না তোমার কাছে। আমি বিয়ে করেছিলাম। তিন বছর সংসারও করেছি, কিন্তু যার দোষেই হোক সে সংসার, জীবনে ছেদ পড়ে গেছে।

কিংশুক ডাক্তার সান্যালের বাড়িতে যা শুনে এসেছিল মরিয়মের মুখে তাই শুনল। হঠাৎ আর একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল তার। যদিও এ ধরনের কৌতূহল উচিত নয় বলে মনে হল তবুও তাকে দমন করতে পারল না সে।

কিংশুক বলল, মনসুরের সঙ্গে তোমার আলাপ অনেক দিনের তাই না?

মরিয়ম একটু হেসে বলল, এ সম্বন্ধে কি বলে তোমার বিতস্তা?

লজ্জায় মাথাটা নীচু হয়ে গেল কিংশুকের। বলল, আমার অবাধ্য কৌতূহলের জন্যে মাপ চাইছি মরিয়ম।

মরিয়ম একটুখানি চুপ করে থেকে বলল, আমার বান্ধবীরা আমার সম্বন্ধে একটু বেশি কৌতূহলী। অবশ্য এতে তাদের যতটা অপরাধ তার চেয়ে অনেক বেশি অপরাধ আমার স্বভাবের। জান কিংশুক, আমি কোনদিন সমাজের বাঁধাধরা পথে হাঁটি না। আমার যা কিছু ভাল লাগে তাই আমি করে যাই। আমার জন্যে বাইরের পাঁচজনের দুশ্চিন্তা দেখলে আমি আরও জেদের সঙ্গে সমাজবিরুদ্ধ কাজগুলো তাদের চোখের ওপর করতে থাকি।

কিংশুক বলল, ছকে বাঁধা জীবন আমিও পছন্দ করি না।

মরিয়ম বলল, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাওয়া যেমন জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না তেমনি কঠোর সামাজিকতাও আমাদের জীবনের একমাত্র সত্য হতে পারে না।

মনের উত্তেজনা একটু প্রশমিত হলে মরিয়ম বলল, হ্যাঁ, তুমি যা জানতে চেয়েছ সোজাসুজি তার উত্তর দিচ্ছি। আমার সঙ্গে মনসুরের পরিচয়, বলতে পার আমার কিশোরী অবস্থা থেকে।

আমরা পাশাপাশি থাকতাম। ওরা খুব গরীব ছিল, কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই মনসুর সৎ আর পরিশ্রমী। আমরা একসঙ্গে খেলা করতাম। ওর নৌকায় চড়ে ফ্লোটিং গার্ডেনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে যখন সব্জি তুলে নিতাম তখন ও আমার ওপর রাগ করত। আমি যত ডানপিটে ছিলাম, ও ছিল ঠিক ততখানি শান্ত।

ধীরে ধীরে আমরা বড় হয়ে উঠলাম। স্কুল থেকে আমি কলেজে ঢুকলাম, আর মনসুর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। ওর পড়াশোনা বিশেষ এগোয়নি, কিন্তু তাতে আমাদের বন্ধুত্বে কোনদিন ভাটা পড়েনি।

আমি বেশ বুঝতাম, মনে মনে ও আমাকে ভালবাসে কিন্তু কোন নির্জন মুহূর্তেও সেকথা সে প্রকাশ করেনি আমার কাছে।

আমার দিক থেকেও বলি, আমি ওকে ভালবাসি, ঠিক ছোটবেলার খেলার সাথী হিসেবে, কোনদিন ওকে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করব এ কথা ভাবতেও পারি না।

কিংশুক বলল, আমার দোষ নিও না, কিন্তু কেন তুমি পারবে না ওকে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতে?

মরিয়ম একটু হাসল। কিংশুকের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তোমার ছোটবেলার সঙ্গিনী, যার সঙ্গে তুমি পাঠশালায় পড়েছ, অনেকদিন পরে তার সঙ্গে হঠাৎ তোমার দেখা হয়ে গেল। তুমি তাকে দেখে নিশ্চয়ই খুশী হবে। কিন্তু যখন দেখবে সে সাধারণ রুচির ওপরে আর একটুও উঠতে পারেনি, তখন নিশ্চয়ই তাকে জীবনসঙ্গিনী করবার ইচ্ছে তোমার জাগবে না।

আমরা অনেক সময় হয়ত জীবনের সাময়িক উত্তাপে উচ্ছ্বাসে অনেক কাজ করে ফেলি, কিন্তু উত্তেজনা নিভে এলে সারাজীবন অনুতাপে ভুগি। আমি আর মনসুর বন্ধু, আজ এটুকু কথাই শুধু সত্য বলে জেনে রেখ কিংশুক, তার বেশি নয়। ও হৃদয়বান কিন্তু আমার সঙ্গে রুচি, সংস্কৃতিতে ওর ফারাক বহুৎ। তুমি আমাকে আশা করি ভুল বুঝবে না কিংশুক। একজনকে ভাললাগা আর তাকে ভালবেসে জীবন সঙ্গী করা, এ দুটো সব সময় এক নয়।

কিংশুক বলল, মনসুর এখনও বিয়ে করেনি বলেই জানি, সেটা কি তোমার জন্য নীরব প্রতীক্ষা নয়?

মরিয়ম বলল, একেবারে নয় বলে নিশ্চয়ই উড়িয়ে দিতে পারি না, তবে মনসুর ভাল করেই জানে মরিয়ম কোনদিন তার জীবনসঙ্গিনী হবে না।

কিংশুক বলল, একথা সে হয়ত মেনে নিয়েছে তবু তোমার ওপর তার আকর্ষণ যায়নি।

মরিয়ম হেসে বলল, এ অবস্থায় আমি নিরুপায় মুখার্জী। তবে ওর মনটা যে অনেক বড় তার বহু প্রমাণ আমার কাছে রয়েছে। আমি তোমাকে আগেই বলেছি, এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার সাদি হয়েছিল, আর তুমি শুনলে হয়ত বিস্মিত হবে বিয়ের শোভাযাত্রার নৌকো সাজানো থেকে রাতের রোশনাই অবধি সব কাজের ভার মনসুরই নিয়েছিল। ও যে কতখানি আমাকে ভালবাসে সে সময় সারা অন্তর দিয়ে বুঝেছিলাম।

আমার সঙ্গে আমার স্বামীর বিচ্ছেদের দিনগুলোতে ও যে কি রকম উদ্বিগ্ন আর অস্থির হয়ে পড়েছিল, তা চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। সেদিন মনসুর ছিল আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। ওর হাউসবোটে আমি কতদিন থেকেছি, আমার সুখ-দুঃখের কত গোপন কথা ওকে বলেছি, কিন্তু সেদিনের ছড়ানো সুযোগের এক কণা মনসুর গ্রহণ করেনি। জীবনের সেই দুঃখের দিনগুলোতে আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে ও ইচ্ছে করলে হয়ত আমাকে তার প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করাতে পারত, কিন্তু তা সে করেনি। তবু কিংশুক, মনসুরের মহত্ব আমাকে অভিভূত করলেও ওকে স্বামী হিসেবে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নয়।

কিংশুক কয়েকদিন পরেই একটা আশ্চর্য ঘটনার মুখোমুখি হল।

ওরা সেদিন বেড়াতে গিয়েছিল গুলমার্গ। টাঙমার্গ থেকে পথের ওপর পড়েছিল বরফের আস্তরণ। ট্যাক্সিতে ওরা উঠে গেল ওপরে। তুষার তুষার কেবল তুষার। বিরাট প্রান্তর জুড়ে সাদা বরফের যেন একটা আশ্চর্য হ্রদ। ওদিকে খিলেনমার্গের তুষার পর্বত দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে ওঠার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

হোটেলের সামনে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা বলাবলি করছিল, এবার অনেক আগেই স্কী খেলতে এসে যাবে ফরেনাররা।

কিংশুক এ কদিনে বেশ বুঝতে পেরেছিল, মরিয়ম তার ছবি আঁকার সময় পাশে এসে না দাঁড়ালে কেমন করে যেন সব সুর কেটে যায়। মরিয়মও ছবির স্বাদ নিতে জানে। রঙের পাশে রঙের মিল সে বোঝে! বলিষ্ঠ রেখার টান সে তারিফের চোখে দেখে। কিংশুক ছবি আঁকতে শুরু করলে মরিয়মকে যেন কি এক নেশায় পেয়ে বসে। সে শুরু থেকে যতক্ষণ না কিংশুক তার ছবিকে ঝোলার ভেতর বন্দী করে ততক্ষণ মগ্ন মুগ্ধ এক দর্শকের মত তাকিয়ে থাকে।

সেদিন গুলমার্গের তুষারছাওয়া পথের ওপর দাঁড়িয়ে ওরা প্রান্তরে স্লেজের খেলা দেখছিল। স্লেজের ওপর চড়িয়ে পাহাড়ী লোকগুলো চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ট্যুরিস্টদের।

মরিয়ম ছেলেমানুষের মত চঞ্চল হয়ে উঠল। সে কিংশুককে বলল, আমি স্কী করেছি, দারুণ এক্সাইটমেন্ট, কিন্তু স্লেজে কোনোদিন চড়িনি, আজ চড়ব। চল, তুমিও চড়বে, ভীষণ মজা হবে।

কিংশুকের ছবি আঁকার চোখ তখন অন্য কথা ভাবছিল। অনেক ওপর থেকে এই নীচের প্রান্তরের লাল নীল হলদে বেগুনী রঙের পোশাক পরা স্লেজের আরোহীদের ছবিগুলো কেমন দেখায়।

কিংশুক মরিয়মকে তার মনের কথা জানিয়ে বলল, তুমি খেলার আসরে নেমে যাও মরিয়ম, আমি ঐ ওপরের পাহাড়ে বরফ ভেঙে উঠছি। ওখানে পাইন গাছের কাণ্ডগুলোর ফাঁকে দাঁড়িয়ে তোমাদের দেখব আর আঁকব। আমার মনে হচ্ছে দারুণ এক কম্পোজিশন হবে।

মরিয়ম একবার বলল, এত উঁচুতে বরফ ভেঙে উঠবে! মনসুর গাড়িতে বসে আছে, ওকে না হয় জিজ্ঞেস করে দেখ।

কথাগুলো বলা শেষ করেই ও হৈ হৈ করতে করতে নেমে গেল। একটা স্লেজের ওপর চেপে হাত নাড়তে লাগল।

কিংশুকের পৌরুষে লাগল মনসুরকে জিজ্ঞেস করতে। মনে হল, সবাইকে জানিয়ে উঠলে তারা

তার দিকেই তাকিয়ে থাকবে, তাতে ছবি আঁকার মনোযোগটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

কিংশুক বরফের বড় বড় চাঁইগুলোর ওপর দিয়ে প্রায় অবিশ্বাস্যভাবে যখন উঠে এলো বরফে ঢাকা পাইন বনের কাছে তখন দস্তুর মত হাঁফাচ্ছিল ও। পাইন গাছের ঠিক গোড়াগুলোতে বড় আল্‌গা বলে মনে হল তার। যাক, কষ্ট করে সে এখন অনেক ওপরে উঠে এসেছে।

গায়ের বরফগুলো ঝেড়ে ফেলে ও পাইন গাছের কাণ্ডের সঙ্গে কৌশলে ইজেলটাকে সেট করল। এবার নীচের দিকে তাকাল ও। সত্যি, ওপরে না উঠলে বোঝা যেত না কত সুন্দর একখানা ছবি নীচের প্রান্তরে ফুটে উঠেছে। কিংশুকের মনে হল, সাদা চাদরের মাঝখানে, রঙের সুতোয় বিস্ময়কর এক জাজিম বোনা হচ্ছে।

ছবি আঁকতে আঁকতে কখন মগ্ন হয়ে গেছে কিংশুক, তীব্র ঠাণ্ডাতেও দারুণ এক উন্মাদনায় হাতের তুলি চলেছে তার।

হঠাৎ কোথায় যেন একটা কি শব্দ হল। কিংশুকের মগ্নতা ভেঙে গেল। সে প্রান্তরের দিকে চেয়ে দেখল কতকগুলো হাত তার দিকে উঠে আছে। কি যেন ইঙ্গিত করছে প্রান্তরের লোকগুলো, আর সে-ই তাদের লক্ষ্যের বস্তু।

ঐ তো মরিয়ম, সে হঠাৎ যেন ভয় পাওয়া হরিণের মত ছুটে আসছে। কি ব্যাপার! কিংশুক পায়ের নীচে তাকাতেই মাথাটা তার ঘুরে গেল। পাইন গাছের তলায় জমাট বাঁধা তুষারের চাঙড় একেবারে নীচে খসে নেমে চলে গেছে। তার পায়ের নীচ থেকে পাইন গাছ বরাবর অনেক দূর পর্যন্ত গভীর এক খাদ।

কিংশুক যদিও শক্ত পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে তবু পাইন গাছের কাণ্ডগুলো ধরে না থাকলে সে হয়ত সামলাতে পারত না। সামনে খাদ, পেছনে অনেক বরফ-জমা পাহাড়। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার সারা শরীর ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল।

কতক্ষণ সে এমনি করে দাঁড়িয়ে রইল। একটা অর্ধ-সচেতন অবস্থায় সময়গুলো তার পার হয়ে যাচ্ছিল। সে নীচের দিকে একেবারেই তাকাতে পারছিল না।

একসময় পেছন থেকে কে যেন তার গায়ে হাত রাখল। সে ভয়ানক ভয় পেয়ে চীৎকার করতে গিয়েও গলা থেকে কোন আওয়াজ বের করতে পারল না।

ভয় নেই, আমি মনসুর।

আশ্চর্য নিরুদ্বিগ্ন গলা মনসুরের।

আবার বেজে উঠল তার কণ্ঠ, আমার পিঠের ওপর উঠে বসুন, খুব সাবধানে। একটুও নড়বেন না, যতটা সম্ভব দম বন্ধ করে রাখবেন।

কিংশুক তাই করল। মনসুর অসীম ক্ষমতায় কিংশুককে পিঠে নিয়ে চলল। সামনে আর একটা পাহাড়ী মনসুরের হাত ধরে, আগে আগে চলল, মনসুর তার পেছনে অতি সন্তর্পণে গিরিশিরায় পা রেখে রেখে চলতে লাগল। সে যে কি শক্তি আর কৌশলে তারা কিংশুককে পাহাড়ের ওপর দিয়ে নামিয়ে নিয়ে এল তা কিংশুকের সকল ভাবনার বাইরে।

তখনও নীচে নামতে কিছু পথ বাকি হঠাৎ মনসুর চীৎকার করে উঠল, কে তোমাকে বরফ ভেঙে এত ওপরে উঠে আসতে বলেছে মরিয়ম! তুমি কি আমার ওপর একটুও ভরসা রাখতে পার না!

সারা পাহাড়ে যেন মনসুরের ক্ষুব্ধ গলার স্বর ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

মুহূর্তমাত্র, তারপর একেবারে নীরবতা। মনসুরকে এর আগে এমন সুরে কথা বলতে বুঝি কেউ শোনেনি।

সেদিন হাউসবোটে ফিরে এসে যেন নবজন্ম পেল কিংশুক। মনসুর যে এত বড় একটা উপকার করেছে তা তার আচরণে কিন্তু এতটুকু প্রকাশ পেল না। প্রতিদিনের মত বিনীত হাসিতে সে তার সব কাজ রুটিন মাফিক করে যেতে লাগল।

মরিয়ম কিংশুকের পাশে বসে কফির কাপে মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছিল আর পলকহীন তাকিয়েছিল কিংশুকের মুখের দিকে।

একসময় চাপা গলায় বলল, আজ কি সর্বনাশই না ঘটে যেতে পারত। এমন আত্মভোলা মানুষ

তুমি! এমন ছবি পাগল যে বিপদ হতে পারে কিনা একবার ওঠার আগে মনসুরকে জিজ্ঞেস করে নিলে না! আমারই দোষ হয়েছিল, একা তোমাকে ছেড়ে দেওয়া একেবারেই ঠিক হয় নি।

হঠাৎ কাপটা নামিয়ে রেখে প্রবল উত্তেজনায় মরিয়ম কিংশুকের হাতটা চেপে ধরে বলল, আল্লা মেহেরবান, তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তোমার কিছু একটা হলে আমিও আর ফিরে আসতাম না ওখান থেকে।

কিংশুক বলল, মরিয়ম, তোমাদের সকলের কাছে চিরদিনের ঋণে আমি বাঁধা পড়ে রইলাম।

মরিয়মের হাতটা কাঁপছিল। কিংশুক গোধূলি বেলার ম্লান আলোয় বুঝতে পারল না ওর চোখে জল কিনা। ঠিক সেই মুহূর্তে ভেতরের করিডরে কে যেন আলো জ্বালিয়ে দিল। একটা ভাঙা রশ্মি এসে পড়ল বসার ঘরে। মরিয়ম হাতটা সরিয়ে নিল। মনসুর এসে ঢুকল ড্রইং রুমে।

রাতে বিছানায় শুয়ে কিংশুকের প্রথম যে মুখখানা মনে পড়ল তা মরিয়মের। সে মুখে প্রবল ভালবাসার একটা ছায়া কাঁপছে। মরিয়ম তাকে সত্যিই কি নিবিড়ভাবে ভালবাসে! তার সহজ চঞ্চল ব্যবহার কিংশুকের মনে দোলা দিয়েছে সত্য, কিন্তু আজই কেবল সে বুঝতে পারল তার জন্যে মরিয়মের হৃদয়ের উত্তাপ কতখানি। কিংশুকের কানে মরিয়মের একটা কথা সংগীতের ধ্বনির মত ফিরে ফিরে বাজতে লাগল, তোমার কিছু একটা হলে আমি আর ফিরে আসতাম না ওখান থেকে।

কিংশুক এই প্রথম অনুভব করল, কয়েকটা শব্দ কি আশ্চর্য ক্ষমতায় নক্ষত্রখচিত ঐ নীল আকাশটাকে হৃদয়ে ভরে দিতে পারে।

আর মনসুর! কিংশুকের চোখের সামনে ফুটে উঠল দ্বিতীয় এই মুখখানা। একটুও কি ঈর্ষার মেঘ ঘনায় না এ মুখে। কিংশুকের মনে হল, কি স্বার্থ ছিল আজ মনসুরের এমন করে বিরাট বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তাকে উদ্ধার করতে যাওয়ায়। হাউসবোটের একটি ট্যুরিস্টের প্রতি কর্তব্য? না, কখনো কেউ শুধু সেজন্যে নিজের জীবন এমন করে বিপন্ন করতে পারে বলে মনে হয় না। শুধুমাত্র নিজের ভালবাসার পরীক্ষা দিতেই এগিয়ে গেছে মনসুর। মরিয়মের সেই মুহূর্তের আকুলতা একটি ভিন্ন পুরুষের জন্য, মনসুরকে আহত না করে তার মনে সঞ্চিত ভালবাসার শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে। সেই ভালবাসার জোরেই সে পেরেছে মৃত্যুর মুখোমুখি নির্ভিকের মত দাঁড়াতে। কিংশুকের মনে হল মনসুর বহু ব্যবহৃত বিশেষণগুলোর একেবারে বাইরে।

গুলমার্গের সেই বিপদের দিনগুলোর পর থেকে একটুও সুযোগ নষ্ট হতে দেয় না মরিয়ম। হোটেলের অবসরের ফাঁকে ফাঁকে সে পালিয়ে আসে হাউসবোটে।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বলে, অ্যাই কি করছ?

কিংশুক ছবির পাতা থেকে মুখ তুলে চোখে মুখে হাসি ছড়ায়।

পাশে নিবিষ্ট হয়ে বসে ছবির কাজ দেখতে থাকে মরিয়ম।

সেদিন কিংশুক এঁকেছে ডাল লেকে সূর্যাস্তের ছবি। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবেছে। সোনালী আর লালে মেশা একটা উজ্জ্বল ছটা আকাশের মেঘ আর ডালের জলকে রাঙিয়ে দিয়েছে। জলের ঢেউগুলো সোনালী মধুর রঙ থেকে ধীরে ধীরে পাংশু হয়ে এসেছে। দুই তীরের পপলার গাছ সিলুয়েট, ঠিক যেন রাতের ছোঁয়ায় মুছে গেছে প্রাণের সবুজ রঙ। একটি শিকারা দিনান্তের রঙ গায়ে মেখে কাজের শেষে ফিরে চলেছে।

মরিয়ম ছবি দেখতে দেখতে বলল, হঠাৎ তোমার সূর্যাস্তের ছবি আঁকার প্রেরণা এল কেন কিংশুক।

শেষের তুলির রঙটুকু জলে ধুয়ে নিতে নিতে কিংশুক বলল, ঐ শিকারাটার মত তার শিল্পীরও ঘরে ফেরার ঘণ্টা বেজেছে।

মরিয়ম বলল, সত্যি যাচ্ছ?

কিংশুক হেসে বলল, সারা জীবন কি এখানে থাকব বলে এসেছি।

একটা ম্লান হাসি মুখে ফুটিয়ে মরিয়ম বলল, ঠিক, একদিন তো তোমাকে ফিরতেই হবে। ছুটিও তো তোমার ফুরিয়েছে।

কিংশুক বলল, এক এক সময় মনে হয় কেন এলাম এই রূপের জগতে, প্রাণের মেলায়। না এলেই বুঝি ভাল হত।

মরিয়ম প্রায় অস্ফুট গলায় বলল, আমারও তাই মনে হয়। তোমার আসার চেয়ে না আসাই ছিল অনেক ভাল।

কিংশুক পরিস্থিতিটাকে আর ভারী হতে দিতে চাইল না। সে প্রসঙ্গ পাল্টে নিয়ে বলল, জান মরিয়ম, আজ দুপুরে বিতস্তা এসেছিল এখানে।

মরিয়ম কিছু শোনার জন্যে তাকিয়ে রইল।

কিংশুক বলল, প্রথম অনুযোগ, আমি দীর্ঘদিন কেন যাইনি ওদের ওখানে। তারপর আমার আঁকা ছবিগুলো টেবিলের থেকে তুলে নিয়ে একটি একটি করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

সোনমার্গে তুমি যেখানে পাইন গাছের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিলে, সেই ছবিখানা অনেকক্ষণ ধরে দেখে বলল, মেয়েটিকে খুব চেনা চেনা লাগছে।

আমি কোন উত্তর করলাম না দেখে আবার বলল, খুব সুন্দর হয়েছে ছবিটা। মরিয়মকে লাল সোয়েটারখানায় বড় সুন্দর মানিয়েছে।

বললাম, আমার আঁকা ছবিটা এখন বেশ বুঝতে পারলাম, একটুও উতরোয়নি।

ও আমার কথা শুনে প্রশ্ন চিহ্ন চোখে মুখে এঁকে তাকাল।

বললাম, আমি যখন ছবি আঁকি তখন বিশেষ কোন মুখ আমার ছবিতে ফুটে ওঠে না। একটা বিশেষ মুড বা ভাবকে আমি ধরে রাখতে চাই। এই ছবির মেয়েটি যদি তোমার চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে থাকে তাহলে শিল্পী তার শক্তি হারিয়েছে বলতে হবে।

বিতস্তা বলল, অতশত বুঝি না, তবে ছবিখানা খুব ভাল হয়েছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে খুব দরদ দিয়ে এঁকেছেন।

কথা না বাড়িয়ে বললাম, তোমার ভাল লেগেছে তাতেই আমি খুশী।

বিতস্তা অমনি বলল, আমার যা খারাপ লাগে আপনার কিন্তু তাও ভাল লাগে।

অবাক হয়ে বললাম, কি রকম?

বিতস্তা আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রায় কান্না ভাঙা গলায় ও বলল, কেউ আমার জন্যে পাত্রের খোঁজ করুক, এ আমার বড় খারাপ লাগে কিংশুকদা। আর আপনি ঐ কাজটুকু করতে পারলে আনন্দ পান। দোহাই আপনার আর যাই করুন, আমার জন্যে পাত্রের খোঁজ অন্তত আপনি করবেন না।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল বিতস্তা।

মরিয়ম বলল, আর ঠিক চলে যাবার পরেই মনটা তোমার কাশ্মীর ছেড়ে পালাই পালাই করল। সঙ্গে সঙ্গে বিদায়ের এই ছবিখানা আঁকতে বসে গেলে।

কিংশুক বলল, অসাধারণ তোমার অনুমান ক্ষমতা মরিয়ম।

মরিয়ম অমনি বলল, শুধু মুখের প্রশংসায় চলবে না, পুরস্কার দাও।

আমার ক্ষমতার ভেতর যা আছে তাই দেব, বল কি তোমার চাই।

মরিয়ম কি ভাবল, তারপর কিংশুকের দিকে তাকিয়ে বলল, আজ পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ডালের জলে নৌকো করে ঘুরে বেড়াব।

কিংশুক বলল, অতি উত্তম কথা মরিয়ম, আমি মনসুরকে এখুনি শিকারা তৈরি করতে বলছি।

মরিয়ম বলল, শিল্পীদের মাথায় কি বাস্তব বুদ্ধির এত ঘাটতি ! শুধু আমি আর তুমি থাকব নৌকায়। লেকের জল, আকাশের চাঁদ আজ রাতে শুধু আমাদের।

কিংশুক বলল, তোমার অভিনব প্রস্তাবে আমার পূর্ণ সমর্থন জানবে।

মরিয়ম উঠে যাবার আগে বলল, এ ঘাটে নয়, আমার হোটেল থেকে একটু এগিয়ে একটা ভাঙা ঘাট পাবে, সেখানে থাকবে আমার নৌকো, চীনার গাছের ছায়ার গভীরে। ভাঙা ঘাটে সাবধানে নেমো।

মরিয়ম চলে গেল। কিংশুক বসে বসে কতক্ষণ ধরে ভাবল মরিয়মের কথা। চলে যাবার ঘণ্টা যতই বেজে উঠছে, মরিয়মকে কাছে ধরে রাখার ইচ্ছেটা জাগছে তত বেশি।

কনকনে নভেম্বরের শীত। নৌকা ভেসে চলেছে চার চীনার ডাইনে রেখে মোগল গার্ডেনের দিকে। মরিয়ম ওস্তাদ মাঝি। বৈঠার ঘায়ে তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে চলেছে নৌকো।

কিংশুক কথা বলল, আর একদিন এমনি এসেছিলাম ডালে শিকারা করে।

মরিয়ম বলল, সেদিন পাশে ছিল বিতস্তা আর তার বাবা।

কিংশুক বলল, সেদিন সূর্যাস্তের সমারোহ ছিল আকাশে।

মরিয়ম বলল, আজ আকাশে সূর্যাস্তের পরের ছবিটা দেখাতে তোমাকে আনলাম। ঐ দেখ লেকের জলে এগিয়ে এসেছে যে পপ্‌লার বীথি, তার মাথায় রুপোলী চাঁদটা উঁকি দিচ্ছে।

কিংশুক তাকিয়ে রইল সেদিকে। কতক্ষণ পরে বলল, এ ছবি কোনদিন ভুলব না মরিয়ম।

তুমি জাত শিল্পী কিংশুক, শুধু চোখেই তোমার ছবি ফোটে না, মনেও ফোটে।

কিংশুক অন্য কথা পাড়ল, তুমি একদিন বলেছিলে মরিয়ম, ফরেন ট্যুরিস্টরা গুলমার্গে স্কি খেলার জন্যে ভীড় করবে, সে কবে?

মরিয়ম বলল, সময় এগিয়ে আসছে।

কিংশুকের গলায় আবার প্রশ্ন বেজে উঠল, তুমি স্কি ভালবাস, তাই না মরিয়ম?

মরিয়ম বলল, ভালবাসতাম একদিন।

কিংশুক অবাক হয়ে বলল, তার মানে! গত বছরও তো তুমি ফরেনারদের নিয়ে দারুণভাবে স্কি করেছ।

মরিয়ম উদাস গলায় বলল, হয়ত এ বছরও নামতে হবে স্কি-এর মাঠে, কিন্তু খেলা বুঝি আর হবে না।

কিংশুক বলল, কেন মরিয়ম?

ভুলে গেছি খেলা। খেলতে গেলেই আছাড় খেতে হবে পায়ে পায়ে।

কিংশুক বলল, এ আমি বিশ্বাস করি না মরিয়ম। কোনদিন তোমার ও দুটো পা তার জোর হারাবে না।

হাসল মরিয়ম। বলল, শুধু পায়ের জোরে কি খেলা হয় কিংশুক। সব খেলাতেই চাই মনের জোর।

কিংশুক বলল, এখানেও তোমার শক্তির শেষ নেই।

মরিয়ম বলল, তাই জানতাম এতদিন, আল্লা বোধহয় আমার সে অহংকারটুকুও ভেঙে দিলেন।

কিংশুক কোন কথা বলতে পারল না।

একটা আর্চের ভেতর দিয়ে নৌকোটাকে ওপারের লেকে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে মরিয়ম বলল, বড় দুরন্ত জীবন ছিল আমার কিংশুক। কোন কাজে হার মানিনি। কোন বাধাকে স্বীকার করিনি। একটা দুরন্ত ডানাওয়ালা পাখির মত পাহাড়ে পাহাড়ে, জলে জলে উড়ে আর ভেসে বেড়িয়েছি। জীবনে মধু আর কটু দুটো রসই আমি পান করেছি, মুখে বিকারের বিন্দুমাত্র চিহ্ন না এঁকে। কিন্তু আজ বুঝেছি জীবনে এমন জায়গা আছে যেখানে থেমে দাঁড়াতে হয়, যেখানে হার মানতে হয়।

কিংশুক বলল, এ কথা কেন মরিয়ম?

মরিয়ম বলল, জীবনে বিরাট একটা পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ সত্যটার মুখ স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম।

পাতলা একটা হিমেল কুয়াশা কয়েক মুহূর্তের জন্যে ওদের ঢেকে ফেলল। আবার ওরা বেরিয়ে এল আলোয়।

মরিয়ম বলল, আমার জীবনে একটা অপূর্ণতার দুঃখ আছে, কিংশুক। সে দুঃখ কাউকে জানাবার নয়। তাই সে দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমি একটি ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি এসে এমন করে অমাকে নাড়া দিলে যাতে আমার ব্যবস্থার দেয়ালগুলোতে চিড় ধরে গেল।

কিংশুক অপরাধীর মত বসে রইল নৌকায়।

একসময় মরিয়ম বলল, আচ্ছা কিংশুক, তোমার মায়ের কথা মনে পড়ছে না?

কিংশুক বলল, অনেকদিন মাকে আমার ছেড়ে এসেছি মরিয়ম। মা আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, বেশ বুঝতে পারছি।

হাসল মরিয়ম, বলল, ছবির জগতে থেকে তোমার কিন্তু মাকে তেমন করে মনে পড়েনি।

কিংশুক মনে মনে লজ্জিত হল, তবু বলল, তোমার কথা মিথ্যে নয় মরিয়ম। মা যেমন করে আমার কথা ভাবেন, আমি সত্যি তেমন করে ভাবতে পারি না।

নৌকাটা এসে ভিড়ল মোগল গার্ডেনের প্রায় গা ছুঁয়ে। মরিয়ম প্রথমে নৌকা থেকে নেমে হাত বাড়িয়ে দিল কিংশুকের দিকে।

কিংশুক বলল, আমি একাই নামতে পারব।

মরিয়ম বলল, জায়গাটা আমার চেনা, তোমার অচেনা, হাত ধরতে আপত্তি কি ?

কিংশুক হাত ধরে নেমে পড়ল। মরিয়মের হাতের ভেতর কিংশুকের হাত।

মরিয়ম হেসে বলল, তোমার হাতখানা এমনি করে যদি সারাজীবন ধরে রেখে দিতে পারতাম। কিন্তু রাখতে চাইলেই তো আর রাখা যায় না।

কিংশুক মরিয়মের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল না। ডালের কুলে তারা দুজনে দাঁড়িয়ে রইল।

সামনের লেকটা মনে হল যেন অচেনা একটা জগৎ। কেমন রহস্য আর মায়ার মন্ত্র দিয়ে গড়া। পীরপাঞ্জাল বরফের চাদর জড়িয়ে বসে আছে। পেছনে পাহাড়ের কোলে চীনাব আর পপ্‌লার তলায় মোগল সম্রাটদের তৈরি বাগান। চাঁদের আলো আর পাতলা কুয়াশা যেন মসলিনের একখানা ওড়না দিয়ে ঘুমন্ত সুন্দরী মেয়ের শরীরটাকে ঢেকে দিয়েছে।

কিংশুক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

মরিয়ম বলল, জানো কিংশুক, আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে সম্রাট জাহাঙ্গীর তার প্রিয়তমা নুরজাহানের হাত ধরে এই হ্রদের তীরে এসে দাঁড়াত। তখনও আকাশে পূর্ণ চাঁদটা এমনি করে থাকত তাকিয়ে। নুরজাহান সম্রাটের হাত ধরে উঠত শিকারায়। গানের কলি সুরের হাওয়ায় ভর করে ছড়িয়ে পড়ত হ্রদের জলে। একটা মিহি সুরের জলতরঙ্গ বেজে উঠত। কতক্ষণ জলবিহার করে আবার ফিরে আসত সম্রাট। তারপর দু'জনে ঐ উদ্যানের চত্বরে বসে কাটিয়ে দিত সারাটা রাত।

গার্ডেনের দিকে ফিরে মরিয়ম বলল, কিংশুক, আমাদের সকলের ভেতরেই একজন সম্রাট অথবা সম্রাজ্ঞী বাস করছে। প্রেমের যে কোন একটা মুহূর্ত আমাদের হাত ধরে সিংহাসনে এনে বসিয়ে দেয়।

কিংশুক বলল, মরিয়ম, অদ্ভুত লাগছে আজকের এই রাত। চেনা জগৎটাকে চোখের সামনে থেকে একেবারে সরিয়ে দিয়েছে।

মরিয়ম কতক্ষণ কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল। কিংশুক দেখল মরিয়মের চোখে জল।

তুমি কাঁদছ মরিয়ম?

মরিয়ম বলল, আজকের এই মুহূর্তটির আনন্দের ভারটুকু আর আমি বইতে পারছি না কিংশুক, তাই কাঁদছি।

কিংশুক এবার বলল, চল মরিয়ম ফেরা যাক্, আস্তানায় ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

মরিয়ম চোখ মুছে স্থির হল। কিংশুকের হাতখানা দৃঢ়ভাবে ধরে রেখে বলল, আর একটুখানি এসো আমার সঙ্গে, হয়ত আর কোনদিন দেখা হবে না, আমার সত্যিকারের সংসারটা তুমি দেখে যাও।

ওরা এল মোগল গার্ডেনের পাশ কাটিয়ে একটা ক্ষেতির ধারে। দুটো পপ্‌লার গাছের তলায় টিন আর কাঠ দিয়ে তৈরি ছোট্ট একখানা বাড়ি।

দরজায় কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে দরজাটা খুলে দিল কেউ।

মরিয়ম বলল, তুমি একটু দাঁড়াও কিংশুক, আমি এখুনি আসছি।

ঘরের ভেতর থেকে একটা বাতি জ্বেলে নিয়ে এসে কিংশুকের সামনে দাঁড়াল মরিয়ম। পেছনে একটি বছর তের বয়সের মেয়ে দাঁড়িয়ে।

মরিয়ম বলল, ভেতরে এস কিংশুক।

কিংশুক মরিয়মের পেছন পেছন গিয়ে ঢুকল একখানা ছোট ঘরে।

বস এখানে।

কিংশুক বসে বসে দেখতে লাগল। আসবাবপত্রের একেবারেই বাহুল্য নেই ঘরখানার ভেতর, তবে ছিমছাম পরিচ্ছন্ন।

মরিয়ম বলল, এই ঘরখানা আমার। আর এই মেয়েটি হল নাজিমা, আমার ঘরের তদারকী করে।

বয়সে ছোট কিন্তু নিখুঁত এর কাজ।

মরিয়ম একটু থেমে বলল, তোমার তাড়া আছে ফেরার, চল তোমাকে পাশের ঘরখানা দেখিয়ে আনি।

কিংশুককে নিয়ে মরিয়ম পাশের একটি ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। অকাতরে পাঁচ সাতটি মেয়ে ঘুমুচ্ছে। ছয় থেকে দশ বছরের ভেতর বয়েস হবে তাদের।

কিংশুক বলল, এরা কারা মরিয়ম?

মরিয়ম বলল, এরা আমার পথ থেকে কুড়োনো মানিক। এদের খেতে-পরতে দিতে পারে না মা বাবারা। আমি তাই এনে রেখেছি এখানে। কাজের চাপ যখন কম থাকে তখন এদের নিজেই পড়াই। নইলে সারাদিন এরা ঘুরে বেড়ায় মোগল গার্ডেনে। পাখির ডাক শোনে, দু'চোখ ভরে ফুলপাতা দেখে। প্রজাপতির পেছনে ছোটে। ছাগল আর ভেড়া আছে, তাদের চরায় আর খেলা করে তাদের সঙ্গে।

কিংশুক বলল, আশ্চর্য সুন্দর তোমার খেলাঘর। তুমি যে শিশুদের এমন করে ভালবাস তা কেউ বুঝতে পারবে না তোমার বাইরের ঐ দুরন্ত জীবনের ছবিখানা দেখে।

মরিয়ম কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। কি যেন ভাবল আপন মনে। তারপর একসময় অনেক গভীর থেকে বলল, মনের মধ্যে মন থাকে কিংশুক। সে মনটাকে তো সবার খুঁজে পাবার কথা নয়। কোন্ সাগরের কোন্ তলে মুক্তো পাওয়া যায় সে শুধু অভিজ্ঞ ডুবুরীতেই জানে, সাধারণে সাত সাগরের ঢেউ গুনেই কাল কাটায়।

কিংশুক বলল, আজ তোমার একটা নতুন ছবি দেখলাম মরিয়ম।

দোহাই তোমার, আমার এ একান্ত গোপন সংসারের কথাটুকু যেন ফাঁস করে দিও না কারো কাছে—মরিয়মের গলায় মিনতির সুর বেজে উঠল।

সে একটু থেমে আবার বলল, সবাই জানে আমি একটা পাঠশালা খুলেছি, এর বেশি কারো কিছু জানা নেই।

কিংশুক বলল, যদি আজকের রাতে এখানে না আসতাম তাহলে তোমার অনেকখানি না জেনেই আমাকে চলে যেতে হত।

মরিয়ম বলল, এসো, তোমার রাত হল, বোটে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কিংশুক আর মরিয়ম বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আসার সময় নাজিমাকে বলল, বাস চালু থাকলে ফিরে আসব, না আসতে পারলে কিছু যেন ভেব না। ভয় পাবার কিছু নেই।

ছোট্ট গৃহিণী নাজিমা মাথা নাড়ল।

আবার সেই লেকের বুকে ভেসে চলা। বাঁধানো আর্চটা পেরিয়ে ওপারের লেকে পৌঁছনোর আগেই নৌকোটা আর্চের একপাশে ঠেকিয়ে ডাঙায় উঠে পড়ল মরিয়ম। একটা বিশেষ জায়গায় কৌশলে বেঁধে ফেলল নৌকাটা।

ততক্ষণে নিজেই ডাঙায় উঠে পড়েছে কিংশুক।

মরিয়ম বলল, এবার আমার হাত ধরে ডাঙায় উঠতে পৌরুষে বাধল, তাই না কিংশুক।

ম্লান হাসি ফুটে উঠল কিংশুকের মুখে। বলল, যা চিরদিন ধরে রাখতে দেবে না তাকে দু'দণ্ড ধরে থেকে কি লাভ বল?

মরিয়ম উঠে এসে দুটো হাতই ধরল কিংশুকের। বলল, দারুণ রাগ হচ্ছে আমার ওপর তাই না কিংশুক?

রাগ নয় মরিয়ম, মনে হচ্ছে দু'জনে অপরিচয়ের অন্ধকারে থেকে গেলেই ভাল হত।

মরিয়ম বলল, এ কথা কেন কিংশুক, চলার পথে বন্ধুত্ব হয় না কারো সঙ্গে?

জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেসে চলার বন্ধুত্বে আমি বিশ্বাসী নই মরিয়ম।

মরিয়ম কিংশুককে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে হেসে বলল, বড্ড সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে কিংশুক। আমি এলাম চাঁদের আলোয় একটুখানি বেড়াব বলে, আর তুমি সব পরিস্থিতিটাকে গভীর করে তুলছ।

কিংশুক বলল, চল এগোই।

ওরা দু'দিকে লেকের মাঝখানের পথটা দিয়ে হেঁটে চলল। আকাশে চাঁদ। নক্ষত্রগুলোকে অতি

শীতল বরফের উজ্জ্বল টুকরোর মত মনে হচ্ছিল। দূরের পাহাড়, পপলার সবই সিলুয়েট ছবি হয়ে গেছে। লেকের জলে চাঁদ এক একটা বিশেষ জায়গা বেছে নিয়ে তার জোৎস্না ঢেলে দিচ্ছে। সেই জায়গাগুলোতে এক একটি আলোর পরী যেন নাচছিল।

ওরা চলছিল। কোন কথা ছিল না ওদের মুখে। ভালবাসার শ্রেষ্ঠ অনুভূতিগুলো বোধহয় এমনি নীরবতার ভেতরে লালিত হয়।

কতক্ষণ পরে মরিয়ম কথা বলল, এই প্রচণ্ড শীতে কতখানি উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটা যায় তার উদাহরণ আমরা দু'জন, তাই না কিংশুক?

আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না মরিয়ম। মনে হচ্ছে যেন শুধু আজকে নয়, অনেক দিন আগে আমাদের এই চলা শুরু হয়েছে।

মরিয়ম বলল, তুমি বড় বেশি রোমান্টিক কিংশুক।

জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি রোমান্সের ভেতর থেকেই জন্ম নেয় মরিয়ম। এই মুহূর্তে একটি নারী আর পুরুষ পরস্পরের সান্নিধ্য চাইছে এটা তুমি মিথ্যে বলে অস্বীকার করতে পার?

কিংশুক হঠাৎ উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দু'হাতে তুলে ধরল মরিয়মের মুখ। বলল, বল মরিয়ম, কোন্ মিথ্যুক আমাদের মুহূর্তটিকে সত্য নয় বলে প্রচার করবে?

কিংশুকের অঞ্জলিবদ্ধ হাতে মরিয়মের মুখ। সমস্ত প্রচলিত উপমা এই ছবিটির কাছে এসে ম্লান হয়ে গেল।

কিংশুক কতক্ষণ তাকিয়ে রইল মরিয়মের মুখের দিকে। মরিয়মও দেখছিল কিংশুককে, পলক পড়ছিল না তার চোখে। হঠাৎ ঝকঝকে দুটি ঝিনুকের মত চোখ বন্ধ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক দামী দুটো মুক্তোর বিন্দু খসে গড়িয়ে পড়ল মরিয়মের গাল বেয়ে।

কিংশুক মরিয়মের মুখখানাকে নিজের হাতের অঞ্জলি থেকে মুক্তি দিয়ে বলল, এই মুহূর্তটিকে তুমি চোখের জলে ভিজিয়ে দিলে মরিয়ম?

মরিয়ম প্রথমে মাথা নাড়াল। তারপর বলল, আমি তোমার ভালবাসাকে একটুও লঘু করতে চাইনি কিংশুক। শুধু আমার ভালবাসায় বিধাতাপুরুষের যে অভিশাপ আছে তারই কথা ভেবে নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি।

বিস্ময় কিংশুকের চোখে। একটা চাপা কণ্ঠস্বর বেজে উঠল, তোমার ভালবাসায় অভিশাপ! কিসের অভিশাপ মরিয়ম?

কান্নার ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে এল কথা, আমাকে তোমার ভালবাসা জানিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিও না কিংশুক। আমি পারি একটি পুরুষের দেহমনের সঙ্গিনী হতে কিন্তু বিধাতা আমাকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করেছেন মাতৃত্ব থেকে। কিংশুক, স্ত্রী হয়ে তোমাকে তৃপ্তি দিতে পারব, কিন্তু একটি সুন্দর শিশু তোমাকে উপহার দিতে পারব না, এ কথা ভাবতে গেলে আমি পাগল হয়ে যাব।

কিংশুক বলল, তোমার বলিষ্ঠ উচ্ছ্বল জীবনটাই আমাকে আকৃষ্ট করেছে, ওরই ভেতর আমি দেখতে পেয়েছি আমার শিল্পের প্রেরণা।

মরিয়ম মাথা নেড়ে বলল, হয় না, তা হয় না কিংশুক। উত্তেজনা, উত্তাপ, একদিন নিভে আসবেই, তখন সমস্ত মন তার সঞ্চিত স্নেহটুকু ঝরিয়ে দেবার জন্য বুভুক্ষু হয়ে উঠবে। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার গ্রন্থিটা যখন আলগা হয়ে যায় তখন ওই স্নেহ এসেই যে দু'হাত দিয়ে শিথিল গ্রন্থিটাকে শক্ত করে ধরে কিংশুক!

অস্বীকারের ভঙ্গীতে কিংশুক মাথা নেড়ে বলল, তোমার আমার প্রয়োজন এক নয় মরিয়ম।

এ সবার প্রয়োজনের কথা কিংশুক। এখন যা অপ্রয়োজনীয় বলে তুমি অস্বীকার করবে, সংসারের পথে কিছুটা এগিয়ে যাবার পর তাকেই তোমার অনেক বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে।

একটু থেমে মরিয়ম বলল, চল এবার ফেরা যাক্। হাউসবোটে মনসুর তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। এত রাত দেখে সে নিশ্চয়ই চিন্তিত হয়েছে।

ওরা নৌকার দিকে ফিরে হাঁটতে লাগল।

মরিয়ম এক সময় স্বগতোক্তির মত করে বলল, দবীরও আমাকে বিয়ের প্রথম দিনগুলোতে তার

ভালবাসার উচ্ছ্বাসে আবেগে স্নান করিয়ে দিত। কিন্তু কি নিষ্ঠুর হয়ে উঠল দবীর, যখন ডাক্তারের মুখে শুনল তার মরিয়ম কোনদিন মা হতে পারবে না। কিংশুক, শুধু তোমাকে ভালবাসি বলেই তোমার কাছ থেকে এমন করে সরে আসতে চাইছি। দবীরের মত তোমাকে আমি আর হারাতে চাই না। আমার বঞ্চিত মাতৃত্বের দুঃখ শুধু আমাকেই বইতে দাও।

এরপর হাতে গোনা কয়েকটি দিন মাত্র শ্রীনগরে ছিল কিংশুক। বহু প্রতীক্ষা করেও মরিয়মের দেখা পায় নি সে হাউসবোটে। এদিকে নভেম্বরের শেষে এত বরফ পড়তে শুরু করেছে, যে-কোনদিন কাশ্মীর থেকে ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। শ্রীনগর ছেড়ে আসার আগের দিন সন্ধ্যায় কিংশুক গেল হোটেল ডালভিউতে। রিসেপশান রুমে মরিয়মের চেয়ারে বসে আছে একটি যুবক। কিংশুক তার কাছে খোঁজ নিয়ে জানল, ফরেন ট্যুরিস্টদের সঙ্গে মরিয়ম গেছে গুলমার্গ।

একটু হেসে, কথায় খানিকটা গর্বের সুর ঢেলে যুবকটি বলল, মরিয়ম ছাড়া কাশ্মীরে স্কী-এর আসরই বসবে না মিস্টার।

বোটে ফিরে এল কিংশুক। ক'দিন ধরে যে ছবিখানা আঁকছিল তাতে শেষ তুলির কয়েকটা টান দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

অনেক ডালিয়া আর প্রজাপতির মাঝখানে মরিয়ম দাঁড়িয়ে। তাকে ঘিরে কয়েকটি শিশুর হাসি।

পরের দিন চলে আসার সময় মনসুরের হাত ধরে বলল কিংশুক, মরিয়মকে দেখো মনসুর। যদি তার সত্যিকারের কোন বন্ধু থাকে, সে তুমি। আর আমার হয়ে এই ছবিখানা দিও মরিয়মকে।

মনসুর লম্বা ফারাণের হাতায় চোখ মুছে বলল, বাবুসাহেব আপনাকে কোনদিনও ভুলতে পারব না।

ভুলতে সত্যিই পারে নি মনসুর। পাঁচ বছর পরে তাই কিংশুককে দারুণ অবাক করে দিয়ে এল মনসুরের চিঠি।

বাবুসাহেব,

আমার চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে যাবেন জানি। পাঁচ বছর পরে একটা নৌকাওয়ালা পুরোনো খাতার ঠিকানা হাতড়ে আপনাকে চিঠি পাঠাবে, এ আপনার একেবারে ভাবনার বাইরে, তাই না বাবুসাহেব!

তবু চিঠি আমাকে পাঠাতেই হল। অনেকবার ভেবেছি, আপনাকে বিরক্ত করব না বাবুজী, কিন্তু কাশ্মীর ছেড়ে যাবার সময় আপনি আমাকে বলে গিয়েছিলেন, মরিয়মকে যেন আমি দেখি।

আপনার কথা আমি সাধ্যমত রাখাব চেষ্টা করেছি। ওর বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছি, ওর ডাকে সব সময় সাড়া দিয়েছি, কিন্তু পারি নি শুধু ওর খেয়াল-খুশীর সঙ্গে তাল রেখে চলতে। আর এইখানেই আমি হেরে গেছি বাবুজী।

আমি জানি ও মনের দিক থেকে একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, কিন্তু কোনদিন ও কারো কাছে সান্ত্বনা চায় না। যখন ও সবচেয়ে বেশি মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে তখন ওকে দেখলে মনে হয় ও যেন ভীষণ রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে সময় কাউকে কাছে ঘেঁষতেই দেয় না। তখন আমি শুধু দূর থেকে ওকে লক্ষ্য করি, কাছে যাই না, সামান্য সান্ত্বনার কথাও শোনাই না।

যখন নিজের মধ্যে জ্বলতে জ্বলতে ও এক সময় নিভে যায় তখন হঠাৎ কোন একদিন চলে আসে আমার বোটে। এসেই বলে, মনসুর বড় ক্লান্ত, কফি বানাও।

কতদিন কফি তৈরি করে এনে দেখেছি ও ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে বিছানায়। বাবুজী, আপনি পেছনের যে ঘরটাকে শোবার ঘর করেছিলেন, ঐ ঘরের ডিভানে পরম নিশ্চিন্তে ওকে কতদিন ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছি।

আমার তৈরি কফি ঠাণ্ডা হয়েছে, তবু কোনদিন ডাকহাঁক করে ওর ঘুম ভাঙাইনি।

ঘুম থেকে উঠেই ও লজ্জা পেয়েছে। আমি বলেছি, তুমি বস এই আমি কফি আনছি।

আপনি চলে যাবার প্রায় সাত আট দিন পরে ও গুলমার্গ থেকে সাহেবদের সঙ্গে স্কি সেরে হোটেলে ফিরে এল। দূর থেকে ওকে দেখলাম। মনে হল বড় ক্লান্ত। বিকেলে হোটেলের বেয়ারা আমাকে ডেকে নিয়ে গেল।

মুখোমুখি হলাম ওর। বাবুজি, ওকে দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, ভীষণ একটা ঝড় এ ক'দিন বয়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে।

ও আমার দিকে কেমন যেন আচ্ছন্ন দুটো চোখ তুলে বলল, মনসুর, এখন নিশ্চয়ই তোমার হাউসবোটটা খালি রয়েছে, ভাবছি হোটেল থেকে ক'দিন ছুটি নিয়ে তোমার ওখানে ঘুমিয়ে কাটাব।

বললাম, কেউ নেই, আর এ শীতে নতুন ভিজিটারের আসার সম্ভাবনাও নেই, তুমি আরামে থাকতে পার।

খুশী হয়ে ওঠার বদলে ওর চোখেমুখে ম্লান একটা ছায়া ঘনিয়ে উঠল।

আমি পরে বুঝেছিলাম, আপনি হাউসবোট ছেড়ে চলে গেছেন কিনা, ও শুধু সে কথাটুকুই জানতে চেয়েছিল।

ও কিন্তু অনেকদিন আর আমার হাউসবোটে আসে নি। ছুটি নিয়ে ও চলে গিয়েছিল মোগল গার্ডেনের পাশে ওর নিজস্ব ডেরায়।

আমি যেদিন শিকারায় করে আপনার ছবিখানা নিয়ে ওর ডেরায় পৌঁছে দিতে গেলাম, ও দেখি একটা পপলার গাছের তলায় বসে ইংরাজী বই পড়ছে এক মনে।

আমাকে কাছে যেতে দেখে চমকে উঠল, কিন্তু আপনার ছবিখানা পেয়ে চমকালো না। অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর একসময় ঘরে ঢুকে গেল ছবিখানা হাতে নিয়ে।

অনেকক্ষণ আমি বসে রইলাম গাছের তলায়। নাজিমা বলে ছোট একটি মেয়ে আমার জন্যে চা আর খাবার নিয়ে এল। তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, আপনার ছবিখানা নিয়ে মরিয়ম বিছানায় বসে কাঁদছে।

বাবুসাহেব, আজ আপনাকে বলছি, মরিয়ম জীবনে যদি কাউকে তার ভালবাসা দিয়ে থাকে তাহলে সে শুধু আপনাকেই।

পাঁচ বছরের অনেক কথা ছবির মত চোখের ওপর ফুটে উঠছে বাবুজী। সব কথা বলা যায় না চিঠির পাতায়।

আজ যে কথা বলার জন্যে এ চিঠি পাঠাচ্ছি আপনার কাছে, তা হল, মরিয়ম কাশ্মীর ছেড়ে রাণীক্ষেত রওনা হয়ে গেছে। হোটেল 'ডালভিউ'-এর মালিক রাণীক্ষেতে নতুন হোটেল খুলেছেন। সেখানে কাজ নিয়ে চলে গেল মরিয়ম।

আমার চোখের সামনে থেকে সে সরে গেছে, তাই চিঠি লিখলাম আপনাকে। আপনি কাশ্মীর থেকে চলে যাবার সময় ওকে দেখবার যে দায়িত্ব আমার ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন, তা আমার আর রইল না।

এই পাঁচ বছরে ও যেন নিজেকে একেবারে শেষ করে ফেলতে চেয়েছিল। ফরেনারদের সঙ্গে গাইড হয়ে ঘুরত। কতদিন হোটেলে ফিরত না। গোপনে পহেলগাঁও, গুলমার্গের হোটেলগুলোতে খবর নিয়ে জানতাম, মরিয়ম ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে যখন আসত আমার কাছে তখন সাধ্যমত ওর যত্ন করতাম। ও শুধু পড়ে পড়ে ঘুমুতো আপনার ঐ পেছনের ঘরের বিছানায়।

জানি না বাবুসাহেব, আপনি ঐ ঠিকানায় আছেন, না ঠিকানা বদল করেছেন। তবে একদিন বলেছিলেন, এটা নাকি আপনার স্টুডিওর ঠিকানা। তাই ভরসা করে চিঠি পাঠালাম। সঙ্গে দিলাম মরিয়মের রাণীক্ষেতের ঠিকানা। ইচ্ছে হলে চিঠি দিয়ে ওর সঙ্গে একটা যোগাযোগ রাখতে পারেন। ওর জন্যে দুঃখ হয়। আমি যা এ পাঁচ বছর চেষ্টা করেও পারলাম না, হয়ত আপনার একখানা চিঠিতেই ওর মনের সেই পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে।

আপনার অনুগত মনসুর।

কিংশুক চিঠিখানা পড়া শেষ করে টেবিলের ওপর রাখতেই কোথা থেকে ছুটে এল সাড়ে তিন বছরের পিউ, অর্থাৎ পাপিয়া মুখার্জী।

চিঠিখানা ধরে উল্টেপাল্টে পড়তে লাগল। তার নিজস্ব অভিধানের শব্দগুলো উজাড় করে একটা মিশ্রিত ধ্বনি ঘরে ছড়াতে লাগল।

তারপর হঠাৎ কিংশুকের মুখোমুখি হয়ে বলল, বাপী একটা রেলগাড়ি বানিয়ে দেবে?

হাতের চিঠিখানা পিউ কিংশুকের দিকে গাড়ি তৈরিব উপকরণ হিসেবে এগিয়ে দিল।.

একদিন একখণ্ড কাগজে কিংশুক নৌকো বানিয়ে পিউকে অবাক করে দিয়েছিল, তাই আজ ঐ চিঠির কাগজে রেলগাড়ি তৈরির আর্জি পেশ করল পিউ।

মনে মনে হাসল কিংশুক। শিশুমন কত দূরের ছবি দেখতে পায়। ঐ রেলগাড়িতেই কি একদিন সে পিউকে নিয়ে চলে যাবে রাণীক্ষেতে মরিয়মের কাছে।

রেলগাড়ী বানিয়ে দাও না বাপী?

ছোট পিউ-এর ডাকে কিংশুক তার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে রেলগাড়ির বদলে একটা পাখি বানাতে লেগে গেল।

রাতের রেলগাড়িতে যাত্রীসংখ্যা বড় বেশি ছিল না। শীতের এই দিনগুলোতে পাহাড়ে কেউ বড় একটা বেড়াতে যায় না। কাজের মানুষরাই চলাচল করে। পাহাড়ী দেশে পৌঁছবার আগেই কম্পার্টমেন্ট ফাঁকা হয়ে যায়।

ঘুম ছিল না কিংশুকের চোখে। সে বসেছিল জানালার ধারে। কাঁচের শার্সির ভেতর দিয়ে তাকিয়েছিল রাতের প্রান্তর আর আকাশের দিকে। শীতের আকাশ অনেক হীরে ছড়িয়েছে। জ্বল জ্বল করে জ্বলছে ক'টা। চাঁদ নেই আকাশে। চাঁদ জাগার তিথি নয় বোধহয় এটা। অথবা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মরা চাঁদটা শেষ রাতে একা একা জেগে উঠবে। করুণ কুয়াশার চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে হয়ত বিধবার মত স্মৃতিচারণ করবে।

নীচের পৃথিবী এখন হারিয়ে গেছে গভীর অন্ধকারে। জল ডাঙা গাছপালা সব ডুবে আছে একখানা কালো বারোয়ারী কম্বলের তলায়।

কিংশুক রাতের রেলগাড়ি ভালবাসে। সে কোনদিন স্লিপারে ঘুমিয়ে অন্য যাত্রীদের মত রাত কাটায় না। অনেক কষ্ট করে হয়ত জানালার ধারের স্লিপারটা যোগাড় করে। পরিপাটি করে বিছানাও পেতে নেয়, আরাম করে বসে, কিন্তু ঘুম আসে না চোখে।

অখ্যাত কোন স্টেশনের লাল্‌চে মোরাম ছড়ানো প্ল্যাটফর্মের ওপর পুরনো জৌলুস-মরা সোনার মত আলোগুলো লুটিয়ে আছে। গাড়িটা থেমে গেল। কম্পার্টমেন্টে একটিও যাত্রী জেগে নেই। এখানে মেল ট্রেনের থামার কথা নয়, তবু থামল। বেশ লাগল কিংশুকের। দু'একটি রেলের লোক এদিক থেকে ওদিক চলে গেল। হঠাৎ একটা চা-ওলা মাঝরাতে চা চাই কিনা তার নিজস্ব ভাষায় হেঁকে হেঁকে জিজ্ঞেস করে গেল। কিংশুক এক ভাঁড় চা নিল জানলার শার্সিটা তুলে। শীতের রাতে গরম চা, তাও আবার যেখানে পাবার কথা নয় সেখানে দৈবাৎ মিলে যাওয়া। এমনি হঠাৎ পাওয়াগুলো মনে কেমন এক ধরনের যেন চমক দিয়ে যায়।

গাড়িটা এবার চলতে শুরু করেছে। যেন বস্তা বস্তা ভাঙা লোহালক্কড় পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে কড় কড় ঝড় ঝড় শব্দে বাজতে বাজতে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে মেল ট্রেন নিজের মেজাজে চলতে শুরু করল। এখন সারা গাড়িতে একটা দুলুনি লেগেছে।

পিউ শুয়ে আছে ডানদিকের একটা খালি বাঙ্কে। অনেক কটা বাঙ্কই তো এ সময় খালি যায়।

কিংশুক পিউয়ের টিকিট কেটেছে। তার ঠিক উপরের স্লিপারটিও তাদেরই। কিন্তু পিউকে ওখানে শোয়ান যায় না। ঘুমের ঘোরে নীচে পড়ে গিয়ে একটা কেলেঙ্কারী বাধাবে। তাই ডানদিকের খালি স্লিপারটা দখল করে আছে পিউ।

এখন পিউ ঘুমোচ্ছে। সারাদিন ওই কিন্তু মাতিয়ে রেখেছিল সারা কম্পার্টমেন্ট।

ও প্রত্যেকটি সীটের কাছে গিয়েছে। ওর কথাবার্তায় আদর কেড়ে নিয়েছে সকলের। কখনো পছন্দমাফিক লোকের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছে। কেউ খাবার সাধলে ও দৌড়ে চলে এসেছে কিংশুকের কাছে। কচি দুটো হাতে কিংশুকের গাল চেপে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে সম্মতি চেয়েছে। কেউ তার গোপন পরামর্শ জানতে পারল কিনা আড়চোখে চেয়ে চেয়ে তাই আবার দেখেছে।

সবচেয়ে ওর ভাব জমেছিল যে তরুণীটির সঙ্গে সে এখন ঘুমোচ্ছে ওর উল্টো দিকের বাঙ্কে।

অবাঙালী তরুণী বধূ আর তার স্বামীটি প্রথম থেকেই কিংশুকের চোখ টেনেছিল। নতুন বিয়ে, অনুচ্চ গলায় হাসি গল্প চলছিল। মূক অভিব্যক্তিটাই বেশি। দুপুরের দিকে ছেলেটি মেয়েটির কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। মেয়েটি কি একটা যেন বই পড়ছে, আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে ছেলেটির মুখের দিকে। শীতের মিষ্টি রোদের মত আমেজে ভরা চোখের চাহনি।

কতক্ষণ পরে ছেলেটি ঘুমিয়ে উঠল। এখন পড়া বইয়ের পাতা উল্টে বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো মেয়েটি দেখাতে লাগল ছেলেটিকে।

দু'জনে হাসছিল। পিউ হঠাৎ সিট ছেড়ে উঠে গিয়ে ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কি লক্ষ্য করল। তারপর খিল খিল করে হেসে উঠল। ওরা পিউকে এমন করে হেসে উঠতে দেখে ওকে জড়িয়ে ধরে হাসতে লাগল।

মেয়েটি দারুণভাবে জমাতে পারে। নানা রকম মুখ-চোখের ভঙ্গী করে সে কথা জমিয়ে তুলল পিউয়ের সঙ্গে। ওদের প্রশ্ন আর উত্তরে কোন মিল ছিল না। না থাক, ভাব জমানোতে ভাষা কোন বাধাই নয়। দু'এক মিনিটের ভেতরেই বসল ওদের মাঝখানটিতে। হাত নেড়ে পা দুলিয়ে ও কথা বলে যাচ্ছিল। নতুন শেখা দুটো গানের কয়েক কলি গেয়ে উঠে হাততালি আর বাহবা কুড়িয়ে নিল নতুন বন্ধুদের। হঠাৎ আবার কি আবেগের কারণ ঘটল, পিউ মেয়েটির মুখখানা জড়িয়ে ধরে কি যেন বলতে লাগল। ছেলেটি যেন না শোনে তাদের গোপন কথা, এমনি একটা ভাব।

কিংশুকের মনে হল পিউকে এবার একটু সতর্ক করা দরকার। নতুন দম্পতির অসুবিধে হতে পারে। সে অমনি চেঁচিয়ে উঠল, পিউ।

পিউ অসীম বিরক্তিতে তার আধেক বলা কথা ফেলে কিংশুকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, বিরক্ত কর না বলছি।

এ উক্তি কিংশুকের। পিউ কিংশুককে তারই বলা কথা ফিরিয়ে দিল। ছবি আঁকার সময় পিউ রঙ তুলি নিয়ে অনেক বেশি ছড়ানোর খেলায় মেতে উঠলে কিংশুক পিউকে ঐ কথাটি বলে বারণ করার চেষ্টা করে।

সারা দুপুর মেয়েটি পিউকে রাখল কাছে। ওকে বিকেলের জলযোগের ভাগ দিল। এবার আর পিউ এসে কিংশুকের অনুমতি চেয়ে নেবার প্রয়োজন বোধ করল না। খেতে খেতে শুধু কিংশুকের মুখের দিকে তাকাল একবার। ওদের দেওয়া ফল খেল না পিউ, মুচ্ মুচ্ করে চিবুতে লাগল কুচো নিম্‌কি।

কিংশুক ভাবতে লাগল, নতুন স্বামী-স্ত্রী তৃতীয় আর একটি জীবনের স্রষ্টা হতে চায়, তাই পিউকে চাইছে না কাছছাড়া করতে।

রাতে মেয়েটির সঙ্গেই পিউ খেয়েছে। মেয়েটি গল্প করে গান গেয়ে পিউকে ঘুমও পাড়িয়ে দিয়েছে।

কিংশুক ভদ্রতা করে দু'একবার ওদের চা অফার করেছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে মৃদু হেসে।

এখন সবাই ঘুমিয়ে। ওরা হয়ত অনেকদিনের অনেক কথার জগতে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে স্বপ্নের ভেতর।

জানালার দিকে মুখ ফেরাল কিংশুক। আবার সেই অন্ধকারের অথৈতে ডুবে গেল তার দুটি চোখ।

অনেক দূরে এক ঝাঁক জোনাকীর মত ঝিকমিক করে উঠল কোন শিল্প নগরীর আলো। কিংশুকের মনের অনেক গভীর থেকে স্মৃতির জোনাকীগুলো হঠাৎ যেন ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এল। তারা নাচতে লাগল অন্ধকারের বুকে অজস্র আঁকিবুকি কেটে।

একটি দলছাড়া জোনাকী এগিয়ে আসছে। কিংশুক অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। দল ছেড়ে এইটুকু পথ উড়ে এল, কিন্তু কি আশ্চর্য তার ওড়ার ছন্দটা। কিংশুকের সামনে এসেই সে থমকে দাঁড়াল।

মিষ্টি একটুখানি হাসি ছড়িয়ে বলল, মিঃ মুখার্জী, আপনি ভীষণরকম নির্জনতা ভালবাসেন, তাই না?

চমক লাগল কিংশুকের। সে কি বলবে প্রথমটায় ভেবে পেল না। একরকম করে বলল, কেন

বলুন তো?

এই আপনি পিকনিক পার্টি থেকে সরে এলেন নদীর ধারে। বটগাছের আড়ালে নিজেকে গোপন করে রেখেছেন।

কিংশুক বলল, আমি বেশ অসামাজিক তাই না?

না না, আমি কিন্তু মোটেই তা বলতে চাইছি না। আমি বলছি, আপনার মত শিল্পীর পক্ষে অনেকগুলি মানুষের সঙ্গ দারুণরকম ভাল লাগার ব্যাপার নয়। তাই আপনি আপনার নিজের জায়গাটি খুঁজে নিয়েছেন।

কিংশুক বলল, এই বিরাট বটগাছের শেকড়গুলো সামনের এই নদীর থেকে জলপান করে। তাই কৃতজ্ঞতায় দেখুন ছায়ার শরীর দিয়ে কেমন জল ছুঁয়ে আছে।

মধুশ্রী জোনাকীর মত হঠাৎ মুখে খুশীর আলো জ্বেলে বলল, আপনাকে শুধু শিল্পী বলেই জানতুম কিন্তু আপনার যে আরও একটি বড় গুণ আছে তা জানতুম না।

কিংশুক অবাক হবার মুখভাব দেখিয়ে বলল, যেমন?

আপনি কবি, মস্ত বড় কবি।

কিংশুক আর মধুশ্রী হাসল। মধুশ্রীর হাসিটা জলতরঙ্গ বাজনার মত শোনাল।

কিংশুক বলল, আপনার সেদিনের নাচ কিন্তু অসাধারণ।

আর আপনার স্টেজ সাজানো! বলল মধুশ্রী সপ্রশংস ভঙ্গীতে চোখে মুখে বিশেষ মুদ্রা ফুটিয়ে।

জানেন মিঃ মুখার্জী, সুপর্ণা বলেছিল, মঞ্চ পরিকল্পনার জন্যেই নাকি আমার নাচ সবার অনেক বেশি ভাল লেগেছে। সুপর্ণাকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন না, ও আমার ইউনিভারসিটির বন্ধু।

কিংশুক বলল, আপনার বন্ধুটির প্রশংসার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

মধুশ্রী বলল, আপনার কৃতজ্ঞতার কথা সুপর্ণাকে জানিয়ে দেব।

হঠাৎ একটু থেমে গিয়ে বলল, কি দরকার আমার জানাবার, দাঁড়ান একটুখানি, ওকে ডেকে আনছি। যাকে জানাবার তাকে মুখোমুখি জানিয়ে দিন।

কিংশুক বলল, দোহাই আপনার, কৃতজ্ঞতা আমার মনে মনেই থাকে। এই মুহূর্তে কথা বলার একাধিক মানুষ কাছে পেতে মন চাইছে না।

হাসল মধুশ্রী, তবে মনের হাসি মুখে ছায়া ফেলল মাত্র। বলল, ওদিন নাচতে নাচতে যখনই স্টেজে ঢুকেছি তখনই চোখে পড়েছে স্টেজের কোণে রাখা পলাশের ডালটা। কি অদ্ভুত ভঙ্গীতে যে ওটাকে আপনি ওখানে রেখে দিয়েছিলেন, আমার তো মনে হচ্ছিল বসন্তলক্ষ্মী জ্বলন্ত প্রদীপের ডালি হাতে নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে।

কিংশুক বলল, ওই পলাশের ডালটি কিন্তু সেদিন ছিল আপনারই প্রতীক।

মধুশ্রী বলল, আর লাল বাটিকের পর্দায় আঁকা বাঁকা ডালপাতার ফাঁকে যে কোকিলটি ডাকছিল সে কার প্রতীক?

কিংশুক বলল, ও কিন্তু ঋতুপতি নয়। ও বড়জোর ঋতুরাজের জলসাঘরের গাইয়ে হতে পারে। গান গেয়ে ঋতুলক্ষ্মীকে আহ্বান জানাচ্ছিল।

মধুশ্রী কিংশুকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কোকিলটা যখন ডেকে উঠল হঠাৎ তখন নাচতে নাচতে সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভুলে গিয়েছিলাম যে পেছন থেকে টেপরেকর্ড চালান হয়েছে।

কিংশুক বলল, এখন বুঝলাম আমার সাজানোর শ্রমটা সার্থক হয়েছে।

যতক্ষণ না আরও চার পাঁচটি অতি কৌতূহলী মেয়ে সেদিন কিংশুক আর মধুশ্রীর আলাপের মধ্যে এসে পড়েছিল ততক্ষণ ওরা কথার সাঁকো দিয়ে দুজনের অজানা মনের নদীটাকে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল।

মেয়েগুলি এসে পড়তেই আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় কথার স্রোতকে বেমালুম ঘুরিয়ে দিলে মধুশ্রী।

আপনি যতই বলুন মিঃ মুখার্জী সেদিনের স্টেজে ঐ কোকিলটা যখন ডেকে উঠল তখন আমার মনে হল যেন একটা দাঁড়কাক ডাকছে। আসল ডাকের সঙ্গে নকল ডাকের, আসল দৃশ্যের সঙ্গে আপনাদের নকল ছবির ফারাক ঠিক তাই।

কৌতূহলী মেয়েগুলি যে দৃশ্য দেখার আশা নিয়ে এসেছিল তা মিটল না। তারা বরং সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাপারটাই দেখল। এদের ভেতর তাহলে সেদিনের স্টেজের ব্যাপার নিয়েই কথা কাটাকাটি চলেছে।

মেয়েগুলি তখন কিংশুকের পক্ষ নিয়ে মধুশ্রীর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি।

নীপা বলল, হঠাৎ তুই এত ক্ষেপে গেলি কেন মধুশ্রী? স্টেজ সাজান আমাদের কিন্তু খুবই ভাল লেগেছিল।

শ্রাবণী বলল, ওয়ান্ডারফুল। তোর নাচের সঙ্গে সমান নম্বর পাবে।

শ্রাবণী স্কুলে কাজ করছে, তাই তুলনা দিতে গেলেই নম্বর দিয়ে বসে।

মধুশ্রী কিছু একটা প্রতিবাদের ভঙ্গীতে হাত নাড়তে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিলে কেতকী, তুই থাম মধুশ্রী, বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। দাঁড়কাক যদি সত্যিই স্টেজে ডেকে থাকে তাহলে তোর নাচটাও শ্যাওড়া বনে ঘোর অমাবস্যায় কাবা যেন নাচে, ঠিক তাদেরই মত হয়েছিল।

কিংশুক এখন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ছে। মধুশ্রীর কথা ঘোরানোর ব্যাপারটা সে কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল, কিন্তু এখন ঘটনার গতি এমনভাবে গড়াতে দেখে সে একটু বিচলিত হয়েই পড়ল।

কিংশুক ওদের আর কথা বাড়াতে না দিয়েই বলল, আজ কিন্তু আমরা পিকনিক করতে এসেছি, লড়াই করতে নয়। সেদিন রাগহিন্দোলে তিলানার ছন্দে মধুশ্রী যে নাচ নেচেছেন তা অনেকদিন মনে রাখার মত। ওঁর নবরসের প্রকাশটিও সুন্দর হয়েছিল।

নীপা বলল, মিঃ মুখার্জী নাচ সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ দেখছি।

কিংশুক হেসে বলল, আপনার কমপ্লিমেন্টটা কি রকম হল জানেন, বিশ্ববিখ্যাত কোন এক লেখকের লেখার মধ্যে একটি ওষুধের নাম পেয়ে গবেষক লিখলেন, ভেষজ বিদ্যায় লেখকের অগাধ বুৎপত্তি আমাদের সত্যিই বিস্মিত করে।

নীপা ছাড়া ওরা সকলেই হেসে উঠল।

কিংশুক বলল, নাচের আমি কিছুই বুঝি না। নাচ দেখে ভাল লাগে এটুকু বলতে পারি। দু'একটা শব্দ নাচের বিষয়ে শুনেছি তাই মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

নীপা আহত হয়েছিল, তাই সে সহজে ছাড়ল না, আপনি কি মনে করেন সব কজন গবেষক আপনার বলা ঐ গবেষক নামধারী লোকটির মত?

কিংশুক বলল, বিশ্বাস করুন, সমালোচক, গবেষকদের সম্বন্ধে আমার কেমন যেন একটা ভয় মেশানো ভক্তি আছে। দারুণ দারুণ সব কথা বলেন ওঁরা।

নীপা বলল, তাঁরা তাদের পরিশ্রমলব্ধ বিশ্বাসের কথাই বলেন।

কেতকী বলল, বাপবে, পিকনিকে এসে পরিশ্রমলব্ধ কথা শুনলে আমার কেমন যেন কান ভোঁ ভোঁ আর মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে।

নীপা সম্প্রতি একটি গবেষক যুবকের সঙ্গে বাক্‌বদ্ধ। শরৎ সাহিত্যে ক্রন্দন ও ভোজন কতবার কি প্রসঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে, সে সম্বন্ধে ভদ্রলোক গবেষণারত।

নীপা সত্যিই প্রসঙ্গটার অত সহজে ইতি করতে দিত না কিন্তু ওদের কথার ভেতর ঝড়ের মত এসে পড়ল অলোকেন্দু।

বললে, সর্বনাশ হয়েছে।

সবাই অলোকেন্দুর কথা শুনে দারুণ রকম হকচকিয়ে গেল। রান্নার ব্যাপারে কারো শাড়িতে আগুন লাগল নাকি! না কোন সদ্য প্রেমিক ফিয়াসেঁর কাছে সাহস দেখাবার জন্যে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আর ওঠেনি!

অলোকেন্দু সবাইকে তটস্থ করে রেখে হঠাৎ সর্বনাশের কারণটা বলে ফেলল, মাংস রান্না বাকি, তেল নেই।

সবার যেন ধড়ে প্রাণ এল। কেতকী বলল, আপদ গেছে। আদিম মানুষদের মত এখন থেকে আমরা কাঁচা মাংসই ঝলসে খাব। তেলের বালাই আর থাকবে না।

অলোকেন্দু বয়সে সব চাইতে ছোট তাই উৎসাহ অতিরিক্ত। প্রতিটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ নিউজ সে ডাকগাড়ির গতিতে সবার কাছে পৌঁছে দেয়।

অলোকেন্দু বলল, ইতিমধ্যে তপনদা হিরণদি সবাই গাড়ি নিয়ে তেলের খোঁজে বেরিয়েছিল, কিন্তু এক ফোঁটাও মেলেনি।

শ্রাবণী আবার তপন গুহর সঙ্গে হিরণ সেনের মেলামেশাটা আদপেই বরদাস্ত করতে পারে না। তপন এস. ও. তে ভাল কাজ করছে। শ্রাবণী অনেকদিন থেকে টোপ ফেলে রেখেছে তপনকে তোলার জন্য। হিরণ সেন আজকাল বাপের গাড়ি নিয়ে তপনকে লিফ্ট দিতে শুরু করেছে।

তাই অলোকেন্দুর কথার পিঠে শ্রাবণী মন্তব্য করে বসল, জানি, অপয়া হিরণ সেন যেখানে গেছে সেখানেই সব নাস্তি নাস্তি।

কেতকী বলল, হিরণদির দোষ দিচ্ছিস কেন শ্রাবণী। ভূ-ভারতে তেল কোথাও নেই। দেশসুদ্ধ লোক ওপরওয়ালাদের তেল মাখাতে মাখাতে সবটুকু তেল শেষ করে ফেলেছে। মাখতে মাখতেই গেল, রান্নায় জুটবে কি করে।

সবাই হাসতে হাসতে সেদিন রান্নার বিপর্যয় কি ঘটল তাই দেখতে চলে গিয়েছিল।

কিংশুক সেদিন ছিল নিমন্ত্রিত। তপন গুহদের দক্ষিণ কলিকাতা ক্লাবে নেচেছিল মধুশ্রী। সত্যি অসাধারণ ওর নাচ। প্রতিটি ঋতু ওর নাচে একেবারে যেন স্টেজে এসে আবির্ভূত হচ্ছিল।

মধুশ্রীর গোপন অনুরোধে ক্লাব থেকে ডাকা হয়েছিল কিংশুককে মঞ্চ সাজানোর জন্যে। মধুশ্রীর বাবা ভারত পাবলিসিটির অন্যতম কর্মকর্তা। তাঁর ফার্মেই কিংশুক চীফ কমার্শিয়াল আর্টিস্ট।

সেই সূত্রে ক্লাবের পিকনিকে কিংশুক ছিল নিমন্ত্রিত।

মধুশ্রী কিংশুককে কাছে পেতে চায়। একটি সুন্দরী শিক্ষিতা নৃত্যনিপুণা ধনীগৃহের কন্যা অর্থাৎ সংবাদপত্রের পাত্র-পাত্রীর কলমকে আলো করে রাখবার মত একটি মেয়ে কিংশুক মুখার্জীর ভেতর কি দেখেছে যে জন্যে নিজেই এসে ধরা দিতে চেয়েছে বারে বারে।

সেদিনের পিকনিকে মধুশ্রী আর কিংশুকের ভেতর যে কথার শুরু সে কথা দক্ষিণেশ্বর, গড়ের মাঠ গঙ্গার ঘাটে ছড়িয়ে ঢেলেও শেষ হল না।

কিংশুক ভয় পেয়েছিল। ফার্মের খোদ কর্মকর্তার মেয়ের সঙ্গে মন দেয়া নেয়া। গরিব শিল্পীর চাকরিটা নিয়েই না টানাটানি পড়ে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু কিছুই হল না। মধুশ্রী একদিন কিংশুককে নিয়ে গেল তার বাড়ি। কিংশুককে দিয়েই তাদের বিয়ের প্রস্তাবটা পেশ করল।

মধুশ্রীর মা দারুণ খুশির ভাব দেখালেন। কিংশুক কিন্তু এত সহজে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে ভাবতে পারেনি! মধুশ্রীর মায়ের সম্মতিতে সে খুশি হয়েছিল ঠিক কিন্তু মনে মনে অবাক হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি।

বিয়ে হল ওদের। মধুশ্রীর বন্ধুরা এসেছিল, কিন্তু এল না একজন। সবাই অবাক হল। শ্রাবণী কেতকীর কানে কানে বলল, মধুশ্রীর নৃত্যগুরু সব্যসাচী চ্যাটার্জীর না আসার কারণটা জানিস?

কেতকী বলল, শুনেছি উনি আমেরিকা যাবার তোড়জোড়ে ব্যস্ত। ওখানে নাকি ঘরটর নেওয়া হয়ে গেছে, আমেরিকানদের ভারতীয় নাচ শেখাবেন।

শ্রাবণী বলল, ভেতরের কথাটা হল, সব্যসাচী চ্যাটার্জী চেয়েছিল মধুশ্রীকে জীবনসঙ্গিনী করে নিয়ে যেতে। বাদ সাধলেন মধুশ্রীর বাবা। তাই সাত তাড়াতাড়ি কিংশুক মুখার্জীর সঙ্গে বিয়েতে রাজী হয়ে গেলেন।

কেতকী বলল, মধুশ্রী সব্যসাচীকে ভালবাসত জানতাম, কিন্তু ওই বা কিংশুককে বিয়ে করতে গেল কেন?

শ্রাবণী সমস্যায় পড়ল। অনেক গূঢ় তত্ত্বের অর্থভেদ করলেও এখানে সে আটকে গেল।

বিয়ের পর নৃত্যশিল্পী আর চিত্রশিল্পীর মিলন যেভাবে ঘটা উচিত ছিল সেভাবে ঘটল না। কিংশুক মধুশ্রীকে স্টেজে নামাতে চাইত, কিন্তু মধুশ্রী একটুও আগ্রহ দেখাত না। বলত, ওসব নাচটাচ বিয়ের আগেই সাজে, বিয়ের পরে নয়।

মনে মনে দুঃখ পেত কিংশুক কিন্তু কিছুই বলত না। একটা প্রতিভা এমনি করে সাধারণ সংসারের কাজে নষ্ট হয়ে যাবে এ তার মত শিল্পীর কাছে খুবই কষ্টের ব্যাপার বলে মনে হত। তার চেয়ে মধুশ্রী

যদি বিয়ে না করে নাচের সাধনা করত তাহলে অনেক বেশি খুশি হত কিংশুক। শিল্পকে রক্তের ভেতর যে অনুভব করেছে, শিল্পীর মৃত্যু সে চাইবে কেমন করে।

এ নিয়ে উপদেশ কিংবা কথা কাটাকাটি কোনটিই করেনি কিংশুক। যে যার নিজের নিজের ভাবনা আর পথচলার অধিকারে সে বিশ্বাসী।

মধুশ্রীর কথা ভাবতে গিয়ে ট্রেনে শীতের রাতেও হঠাৎ ঘামতে লাগল কিংশুক। কতকগুলো চীৎকার যেন তার মাথার ভেতরকার কোষগুলোকে ছিঁড়ে গুঁড়িয়ে দিতে লাগল। মধুশ্রীর বাবার গলাটা বেজে উঠল, তুমি, তুমি আমার মেয়েকে মেরে ফেলেছ। কেন তুমি খবর দাও নি আমাদের। একটা রাস্তার আঁকিয়েকে আকাশে তুলেছিলাম। রাস্কেল, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

সেই মুহূর্তে বড় কষ্টে দমন করেছিল কিংশুক নিজেকে। তার পকেটেই ছিল মধুশ্রীর চিঠিখানা। সে ঐ লোকটির মুখে ছুঁড়ে মারতে পারত। কিন্তু কিছুই করল না সে। অপমান হজম করে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে গেল। শুধু তাই নয়, তারপর থেকে ভারত পাবলিসিটি অফিসেও সে আর যায় নি কোনদিন।

পাপের কোনরকম ছোঁয়ার ভেতরেই সে থাকবে না। পাপের সব কিছু চিহ্ন সে ধুয়ে মুছে ফেলবে।

কিন্তু অফিস ছেড়ে আত্মীয় ছেড়ে দূরে সরে গেলেও সে পারল না একটি ছোট্ট মেয়েকে দূরে সরিয়ে দিতে।

শরীর খারাপ তাই মধুশ্রীকে নিয়ে তাঁর মা গিয়েছিলেন তাঁদের মধুপুরের বাড়ি। সেখানকার জল হাওয়ায় স্বাস্থ্য ফিরবে মেয়ের। তাছাড়া মধুশ্রী তখন মা হতে চলেছে। বন্ধু-বান্ধবের মাঝে হুড়োহুড়ি না করে নির্জনে কটা মাস মধুপুরে কাটুক, এই ছিল মধুশ্রীর বাবারও ইচ্ছে।

হঠাৎ অফিসেই মধুশ্রীর চিঠি এল কিংশুকের নামে।

কিংশুককে কিছুদিন ছুটি নিয়ে মধুপুরে যেতে লিখেছে মধুশ্রী।

ছুটির ব্যবস্থা হল। একদিন কিংশুক হাজির হল মধুপুরে। আর ঠিক ওর পৌঁছবার দু'একদিনের ভেতরেই মধুশ্রী পাঠিয়ে দিল তার মাকে কলকাতা।

কিংশুকের অনভ্যস্ত চোখ। তবু তার মনে হল এ সময় মধুশ্রীর দেহে মাতৃত্বের লক্ষণগুলো যেভাবে ফুটে ওঠার দরকার ছিল তা হয়নি। কলকাতা থেকে রওনা হবার সময়ে তার শরীরের যে অবস্থা ছিল, এখন তা যেন দেখা যাচ্ছে না আর।

মধুশ্রী দু'চারদিন খোলা হাওয়ায় বেড়াল কিংশুকের সঙ্গে। বাড়ির উঠোনে আমলকি গাছের তলায় বসে গান গাইল। শীতের দিন। আমলকির পাতাগুলো ঝরে পড়ল ওদের গায়ে মাথায়। মধুশ্রী কিংশুকের হাতের ভেতর হাত রেখে বসে রইল।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই কিংশুক দেখল মধুশ্রী ঘরে নেই। বেড়াতে যায় মধুশ্রী ভোরের রোদ উঠোনে ছড়িয়ে পড়লে। আজ হয়ত ও আগেভাগেই চলে গেছে। শীতের বিছানা ছাড়ল না কিংশুক। এখুনি বেড়িয়ে ফিরে আসবে মধুশ্রী। কিন্তু আটটা যখন বাজল ঘড়িতে তখন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বসল ও। আদিবাসী যে মেয়েটা কাজ করতে আসে তাকে ডাক-হাঁক করতেই সে কিংশুকের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই কিংশুকের হাতে ধরিয়ে দিলে একখানা চিঠি :

কাঁপা হাতে চিঠিখানা সেদিন ধরেছিল কিংশুক। পড়ার শেষে বসেছিল কতক্ষণ খেয়াল ছিল না। একটা নিষ্ঠুর প্রতারণার বিষ তাকে বিষাক্ত ছোবলের মত আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

চিঠিতে কোনকিছুই গোপন করেনি মধুশ্রী। সে যে নিরুপায় হয়ে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল, সে কথা জানিয়েছে। বিয়ের সময়েই সে সব্যসাচী চ্যাটার্জীর সন্তানকে ধারণ করেছিল। নইলে বিয়ের সাতটি মাস কাটতে না কাটতেই মধুপুরে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হত না। মধুশ্রী তার বাবার কাছে লুকিয়েছিল সব কথা। অত্যন্ত বদমেজাজী বাবার কাছে কোনকিছু বলতে সে সাহস পায়নি। মধুশ্রীর মা সব কথাই জানতেন। লোকলজ্জার ভয় আর স্বামীর ভয়কে তিনিও জয় করতে পারেননি। তাই নিরীহ কিংশুককেই ভাগ্যের কাছে বলির জন্যে দাঁড়াতে হল।

মধুশ্রী লিখেছে, সব্যসাচীকে সে আমেরিকা নিয়ে যাবার কথা লিখেছিল, কিন্তু কোন চিঠিতেই তার সন্তানের কথা লেখেনি। সব্যসাচী যদি অস্বীকার করে বসে নব জাতককে তাহলে তার স্বপ্নই ভেঙে

চুরমার হয়ে যাবে।

সব্যসাচী তাকে ভোলেনি। তার এক বন্ধুকে পাঠিয়ে দিয়েছে মধুপুরে। বন্ধুটি দিল্লির মস্ত বড় ব্যবসায়ী। তিনি মধুশ্রীকে আমেরিকা পাঠাবার সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। মধুশ্রী তাঁর সঙ্গেই চলে গেল।

বেশ কিছু টাকা দিয়ে তার মেয়েটিকে রেখে গেল বাড়ির ঝি কস্তুরীর কাছে। কস্তুরী নিজের মেয়ের মত পালন করবে মেয়েটিকে কথা দিয়েছে।

সব শেষে মধুশ্রী লিখেছে, কোনওদিন আমেরিকা থেকে সে আর ফিরে আসবে না। মধুশ্রী মারা গেছে বলে যদি কিংশুক রটনা করে দেয় তাহলে লোকলজ্জার হাত থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারবে।

কিংশুক তাই করল, তিনটি মাস মধুপুরে কাটিয়ে ফিরে গেল কলকাতা। সঙ্গে কিন্তু নিয়ে গেল মধুশ্রীর মেয়েকে। সবাই জানল সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছে মধুশ্রী।

সেই থেকে কিংশুক নিঃসঙ্গ। সে তার অতীত স্মৃতিকে হয়ত মুছে ফেলতে পারত কিন্তু পারল না শুধু মধুশ্রীর মেয়ের জন্যে।

মেয়েটিকে সে তার জীবনের সঙ্গে জড়াতে চায় নি প্রথমে, কিন্তু একটি দিনের কৌতূহল মেটাতে কস্তুরীকে সে বলেছিল মেয়েটিকে নিয়ে আসতে।

মধুশ্রীর মেয়েকে দেখে সে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিল। একটি লালের আভা লাগা ফুলের মত ফুটেছিল মেয়েটি। নোংরা একখানা চাদরে তার রূপ কিন্তু ঢাকা পড়েনি।

কিংশুককে দেখে মেয়েটা একমুখ হেসেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে কিংশুক হেরে গিয়েছিল তার কাছে। পৃথিবীর সব ফুলই সুন্দর, সব শিশুই নির্মল।

কিংশুক মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়েছিল, কস্তুরীর হাতে আর ফিরিয়ে দেয়নি।

সেই থেকে পিউ তার সঙ্গী। সবাই জানে পাপিয়া মুখার্জী মানে পিউ কিংশুকের মা মরা মেয়ে।

কিংশুক বসে বসে ভাবছিল, একটি অভিশপ্ত বিবাহিত জীবনের শুরু আর শেষ কি আশ্চর্য দ্রুততায় হয়ে গেল।

অন্ধকারের সমুদ্রে স্মৃতির যে ঢেউগুলো উত্তাল হয়ে উঠেছিল এতক্ষণ সেগুলো ধীরে ধীরে শীতের সাগরের মত শান্ত হয়ে এল। কিংশুক অনুভব করল গাড়িখানা চলছে না। একটা অজানা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। কখন রাতের চাঁদ উঠে একটা পাতলা কুয়াশার চাদরে আলোর শেষ সম্বলটুকু উজাড় করে দিয়েছে।

কম্পার্টমেন্টে নীলাভ আলো। শীতের রাতের ঘুমে সবাই ডুবে আছে। পিউ ঘুমোচ্ছে। সারাদিনের দুরন্তপনা রাতের নিশ্ছিদ্র ঘুমের ভেতর হারিয়ে গেছে। একটা গভীর মমতা কিংশুকের সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তার মনে হল, মধুশ্রীকে হারালেও পিউকে সে হারিয়ে যেতে দেবে না কোনদিন।

গাড়ি বদল হল বেরিলিতে। ঘুমন্ত পিউকে বুকে তুলে নিয়ে দেরাদুনের গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল কিংশুক। বেরিলিতে নতুন গাড়িতে উঠে পিউকে তেমনি শুইয়ে দিলে। কাঠ-গুদাম পর্যন্ত পথটুকু ফার্স্ট ক্লাশেই যাবে কিংশুক। ঠিক তেমনি জানালার পাশে বসে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। হঠাৎ একটা ভাবনা এল তার মনে। এখন কি বিপরীত গোলার্ধে সন্ধ্যার আয়োজন চলেছে! এখানে শেষ রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভোরের সূচনা হচ্ছে। কিংশুকের চোখে ফুটে উঠল একটি ছবি। আমেরিকার কোন একটি শহরের রঙ্গমঞ্চ আলোর মালায় সাজান। ধীরে ধীরে নিভে গেল দীপ। আশ্চর্য একটা হলুদ আলো লুটিয়ে পড়ল রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে। এক তাপস বসে আছে পদ্মাসনে। আশ্রমের তরুলতার নিবিড় থেকে কোকিল ডেকে উঠল। হঠাৎ একটা গোলাপী আভার আলো হরিণের মত নেচে ফিরতে লাগল ইতস্তত। ঐ তো স্বর্গনটী মেনকা। নৃত্যের বৃত্ত রচনা করে অনিন্দ্য দেহভঙ্গিমায় তাপস বিশ্বামিত্রকে প্রদক্ষিণ করে ফিরছে।

ধ্যান ভঙ্গ হল তাপসের। লীলা নৃত্যে মত্ত হল পুরুষ আর প্রকৃতি। ধীরে ধীরে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন নেমে এল। পুরুষ নারীর হাত ধরে সেই কামনার স্রোতে হারিয়ে গেল।

এরপর স্টেজে ফুটে উঠল নীলাভ আলো। স্বর্গনটী মেনকা ফেলে দিয়ে যাচ্ছে আপন কন্যা শকুন্তলাকে। নবজাতকের কান্নায় সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ কেঁপে উঠেছে। জননী-হৃদয় সে কান্নায় ভেঙে পড়ছে না। যেন একটা স্বপ্নের সীমান্ত পেরিয়ে চলে যাচ্ছে মমতাহীন এক জননী।

আবার ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা চলতে শুরু করল। ছিঁড়ে গেল কিংশুকের সুদূর স্বপ্নের সূক্ষ্ম জাল।

পিউয়ের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, মেনকা আর শকুন্তলার কাহিনী অতীতের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে অভিনীত হচ্ছে তারই চোখের সামনে।

ভোরের আকাশে আলো ফুটছে। কিংশুক তাকিয়ে আছে সকালের আয়োজনের দিকে। গাছের পাতায়, প্রান্তরের ঘাসে শিশিরের সমারোহ। ভোরের আলোয় হঠাৎ তার মনে হল, কাল রাতের নটী স্বর্গে ফিরে যাবার পথে তার হীরেমণির হার ছড়িয়ে ফেলে গেছে পথে প্রান্তরে।

পিউ এসে হি হি করতে করতে ঢুকে পড়ল এক ফাঁকে কিংশুকের কম্বলের ভেতর। মুখ লুকালো কিংশুকের বুকে।

কিংশুক মুখ নামিয়ে বলল, সারা রাত মনে পড়ল না, এখন এসেছ আদর কাড়তে।

পিউ কম্বলের ভেতর থেকে মুখখানা বের করে বলল, তুমি রাতে আমার কাছে শোওনি বাপী?

কিংশুক বলল, এই তো আমি সারারাত এখানে বসে আছি। তুমি এলে না, তাই ঘুমও আর এল না।

অবিশ্বাসের একটা দৃষ্টি হেনে পিউ আবার লুকলো কম্বলের ভেতর।

পিউ জানে বাপীর বুক পরম নিশ্চিন্ত একটা আশ্রয়।

কাঠ-গুদামে গাড়ি পৌঁছতেই পিউকে নিয়ে নেমে পড়ল কিংশুক। এক বাণ্ডিল কম্বল আর একখানা সুটকেশ কুলির মাথায় চাপিয়ে দিয়ে পিউর হাত ধরে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে এল।

ট্যাক্সিতে বসে বলল, রাণীক্ষেত।

ড্রাইভার একটু তাকাল আরোহীর দিকে। অবাক হয়েছে সে। আরোহী আর ড্রাইভারে কোন দরদস্তুর হল না। কাছে পিঠে নৈনীতাল নয়, একেবারে রাণীক্ষেত যেতে চাইছে মানুষটি। তা হোক্, যাত্রী নিয়ে যাওয়াই তার কাজ, অকারণ কৌতূহল দেখানোর কাজ তার নয়।

গাড়ি উঠছে ওপরে। সমতল নীচে নেমে যাচ্ছে ক্রমশ। ওপরের থেকে নীচের উপত্যকা গাছপালা আঁকা ছবির মত দেখাচ্ছে। বাঁয়ে একটা পাহাড়ী বস্তি দেখা গেল। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে চাষের ফসল। অতি জীর্ণ শীতের পোশাকে গা ঢেকে রোদ্দুর পোহাচ্ছে ক'টা পাহাড়ী ছেলেমেয়ে।

পিউ বড় বড় চোখ মেলে ওদের দেখছিল। হঠাৎ কিংশুকের দিকে ফিরে প্রশ্ন করে বসল, ওরা খুব লক্ষ্মী ছেলে না বাপী?

কিংশুক হেসে বলল, কি করে বুঝলে?

পিউ বলল, ওরা দুষ্টুমি করে না। চুপ করে বসে থাকে।

এর বেশি পিউ লক্ষ্মী ছেলের ব্যাখ্যা দিতে জানে না।

অনেক পাহাড় আর অনেক চীর পাইনের বন পেরিয়ে এল গাড়ি।

এক জায়গায় দেখা গেল বনের ভেতর উঁচুনীচু পাহাড়ী পথে ফসলের বোঝা নিয়ে চলেছে পাহাড়ী মেয়েরা। মাথায় ঘোমটার মত করে স্কার্ফ জড়ান। গায়ে সোয়েটার। পরনে কালো রঙের ঘাগরা। ওরা ছন্দিত তালে লয়ে চলে যাচ্ছিল।

কিংশুকের মনে হল আঁকার মত সুন্দর একখানা সাবজেক্ট।

পিউ চেঁচাতে শুরু করেছে, কোথায় যাচ্ছ তোমরা? আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদের সঙ্গে?

ওরা ভাষা বোঝে না, কিন্তু শিশু কণ্ঠের ডাক ঠিকই ওদের কানে গিয়ে পৌঁছেছে।

ওরা থমকে দাঁড়াল। হেসে তাকাল গাড়ির দিকে। পিউকে দেখে হাত নাড়তে লাগল।

ব্যস, তৎক্ষণ খরগোশের মত কিংশুকের বুকে মুখ লুকিয়েছে পিউ। মাঝে মাঝে পাশ দিয়ে একটুখানি দেখে নিয়ে আবার মুখ লুকোচ্ছে। ওরা ওদের মাথার ঐ বিরাট বিরাট ঝুপড়িগুলোর ভেতর যদি ওকে নিয়ে পালায়।

গাড়ি ওদের পেছনে ফেলে অনেকখানি দূরে চলে এসেছে। নিরাপদ দূরত্বে থেকে গাড়ির পেছনের

কাচ দিয়ে এখন ওদের দেখছে পিউ। মাঝে মাঝে ছোট দুটো হাত বিপুলভাবে নেড়ে চলেছে।

পথের মাঝে মাঝে গাড়ি দাঁড় করাচ্ছিল কিংশুক। চীর পাইনের ফাঁকে ফাঁকে ঝকঝকে বরফের পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। ক্যানভাসে আঁকা প্রকৃতির এক একখানা অতি মূল্যবান ছবি। চোখ ভরে দেখেও যেন আশ মেটে না।

পিউ হঠাৎ আকাশের নীলে ছোট আঙুল তুলে বলল, ওটা কী পাখি বাপি?

কিংশুক দেখল একটা খুব বড় আকারের চিল ডানা মেলে উড়ছে। চিলটা যখন চক্কর দিয়ে রোদ্দুরের মুখোমুখি আসছে তখন ওর গলা আর বুকে আশ্চর্য রকমের একটা রূপোলী আভা ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

কিংশুক বলল, ঐ পাখিটার নাম চিল। পিউ যেমন করে বায়না ধরে চেঁচায়, ও পাখিটা ঠিক তেমনি চেঁচায়।

পিউ অনেকক্ষণ ঘাড় কাত করে কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করল। তারপর বলল, কই চিল তো চেঁচায় না।

কিংশুক বলল, চিলটা খুব লক্ষ্মী হয়ে গেছে, ঠিক পিউ রানীর মত।

পথে একটা মন্দির পড়ল। পিউ-এর আবার প্রশ্ন, ওটা কি ?

কিংশুক বলল, মন্দির, হনুমানজীর মন্দির।

পিউ অমনি বলল, আমার হনুমান আছে। কামড়ায় না, খুব ভাল হনুমান।

কিংশুক ওকে একদিন প্যারাগনে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক পুতুলের ভেতর কোন্‌টা নেবে ঠিক করতে পারেনি। শেষে একটা স্প্রীং দেওয়া হনুমানকে বাঁশের ওপর ওঠা-নামা করতে দেখে দারুণ পছন্দ হয়ে যায়। সেদিন থেকে ও হনুমানের ভক্ত হয়ে পড়ে।

গাড়িটা অনেক পাহাড় ডিঙিয়ে এক সময়ে এসে ঢুকল রূপবতী রানীক্ষেতের এলাকায়।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল অলকা হোটেলের সামনে।

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে কিংশুক হোটেলের গাইডের সঙ্গে এসে উঠল অলকায়। এখন সে ইচ্ছে করেই খোঁজ নিল না হোটেল পাইন-ভিউয়ের। অলকায় থেকে পথের ক্লান্তি দূর করে যাবে মরিয়মের খোঁজে পাইন-ভিউতে।

দুপুরটা কাটল একটানা ঘুমের ভেতর। শেষবেলায় বিকেলের চা-পর্ব চুকিয়ে বেরুলো পাইন-ভিউ-এর খোঁজে। চৌবাটিয়ার দিকে উঠে যেতে পথে পড়বে নতুন হোটেল পাইন-ভিউ। ধীরে ধীরে বাঁধান সুন্দর পাহাড়ী পথ ধরে উঠতে লাগল কিংশুক। চড়াই ভাঙতে মাঝে মাঝে কষ্ট হচ্ছিল তার। কিন্তু অবাক করে দিল তাকে পিউ। একটা নোটন পায়রার মত ঝোটন বাঁধা মেয়েটা বকম্ বকম্ করতে করতে সমানে চড়াই ভেঙে উঠতে লাগল ওপরে। একটুও কোলে ওঠার জন্যে বায়না ধরল না।

ওরা এসে পড়ল একটা পাইন বনের কাছে। পথ থেকেই তীরচিহ্ন দিয়ে পাইন-ভিউ হোটেলে যাবার নিশানা দেওয়া হয়েছে। ঢোকার পথে থমকে দাঁড়াল কিংশুক। পাইন বনের ভেতর সাদা রঙের একটা দোতলা বাড়ি। গোলাপী রঙে রাঙানো কার্নিশ। কিংশুক দেখল বিরাট লন জুড়ে মরশুমী ফুলের বেড।

সবচেয়ে ভাল লাগল পাইনের ফাঁকে দূরের তুষার চূড়াগুলোর ছবি। শেষ সূর্যের সোনায় নন্দাদেবী ত্রিশূল চৌখাম্বা তখন স্বর্গের স্বর্ণভাণ্ডার বলে মনে হচ্ছিল।

মগ্ন হয়ে ছবি দেখছিল কিংশুক। কখন হোটেলের লনে ফুলেরা হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়েছে পিউকে তা খেয়াল করেনি সে। এখন আবার সোনার রঙে ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে সিঁদুরের আভা। বিদায়ী সূর্য কোন্ পাহাড়ের আড়াল থেকে তার সিঁদুরে রঙের কিরণ পাঠাচ্ছে তা বোঝার উপায় নেই।

কিংশুকের মনে পড়ল একটা কথা। কোন এক শিল্পীর মুখ থেকে শুনেছিল একবার। অবনীন্দ্রনাথ রঙ-তুলি নিয়ে আকাশের রঙ ধরতে বসতেন। কত অপরূপ রঙের ছবি যে ফুটে উঠত তাঁর কাগজে তার লেখাজোখা নেই। কিন্তু তিনি তার অধিকাংশই ফেলে দিতেন। অশান্ত হয়ে বলতেন, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেল।

কিংশুকের মনে হল, এ রঙ কোনদিন কোন শিল্পীই ধরতে পারে না।

কয়েকটা কথার শব্দে কিংশুকের তন্ময়তা ভেঙে গেল। কথাগুলো ভেসে আসছিল হোটেলের বাগানের ওধার থেকেই। কিংশুক বুঝল তার অন্যমনস্কতার সুযোগে পিউ সাজানো বাগানে ট্রেস্‌পাস্‌ করেছে।

একটি নারীকণ্ঠ বার বার প্রশ্ন করে পিউয়ের থেকে কিছু জানতে চাইছে। পিউ নির্বাক। কিংশুক উঁকি দিয়ে দেখল পিউয়ের হাতে এক গোছা মরসুমী ফুল। বিনা অনুমতিতে ছিঁড়ে নেওয়া। ধরা পড়ে গিয়ে অপমানবোধ জেগেছে। পালিয়ে আসতেও পারছে না। এদিকে হিন্দী-ভাষাটা অজানা থাকায় প্রশ্নকর্ত্রীর প্রশ্নের জবাব দেওয়াও তার পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়েছে।

পাচ বছর পরেও কিংশুকের চিনতে ভুল হল না মুখখানা। তেমনি একটুখানি লম্বা আকারের মুখ, বড় বড় চোখ দুটো অচঞ্চল। কেমন যেন লক্ষ্যের দিকে স্থির হয়ে থাকে।

কিংশুক পথের উপর দাঁড়িয়ে একটা পাইন গাছের আড়ালে নিজেকে গোপন করে ব্যাপারটা দেখতে লাগল।

পিউ একবার তাকাল পথের দিকে, যদি বাপীকে দেখতে পায়, কিন্তু তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হল না। সেই মুহূর্তে পিউয়ের মনে হল সে সম্পূর্ণ অপরিচয়ের জগতে হারিয়ে গেছে। আর মনে হওয়া মাত্র হাতের ফুল ফেলে দিয়ে দুটি চোখ ছোট দুটি হাতে ঢেকে ফেলল।

এক মুহূর্ত দেরি হল না মরিয়মের। সে পিউকে বুকের ভেতর লুফে নিল।

পিউয়ের উদ্গত চোখের জল তখন অঝোরে ঝরে পড়ছে।

মরিয়ম পিউকে নানা কথা বলে ভোলাতে চেষ্টা করল। কিংশুক শুনতে পেল মরিয়ম তখনও হিন্দী ভাষায় পিউকে সান্ত্বনা দিয়ে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছে। পিউ তার ভাষা যতই বুঝতে পারছে না কান্না তার ততই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। শেষে মরিয়ম পিঙ্ক রঙের এক গুচ্ছ চন্দ্রমল্লিকা তুলে নিয়ে পিউয়ের হাতে ভরে দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

পিউ কান্না থামিয়ে একবার তাকাল ফুলের দিকে, কিন্তু ঐ ফুলগুলো তার অসহায় অবস্থার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে হল না। সে আবার তার কান্নার খেইটাকে ধরে ফেলল।

মরিয়ম এবার একটা টুকটুকে লাল গোলাপ পিউয়ের চোখের সামনে তুলে ধরতেই পছন্দ হয়ে গেল পিউয়ের। সে হাত বাড়িয়ে গোলাপটা ধরল। এখন কান্না থেমে গেছে। মরিয়মের কোল থেকে নেমে পড়ে পিউ বলল, বাপির কাছে যাব।

মরিয়ম তো অবাক। মেয়েটি তো বাঙালী! মরিয়ম অমনি বলল, কোথায় তোমার বাপী?

পিউ বেশ অবাক হয়ে মরিয়মের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এতক্ষণে তার মনে হল এই মেয়েটি খুব একটা অপরিচিত নয়।

আবার বলল মরিয়ম, কোথায় তোমার বাপী?

পিউ আঙুল তুলে দেখাল পথের দিকে। মরিয়ম পিউয়ের হাত ধরে বাগান পেরিয়ে আসতে লাগল পায়ে পায়ে।

এখন গাছের আড়াল আর কিংশুকের কাছে আত্মগোপনের উপযুক্ত জায়গা বলে মনে হল না। সে গেটের ধারে এসে পাইন-ভিউ হোটেলের দিকে তাকিয়ে রইল।

মরিয়ম পিউয়ের হাত ধরে কাছাকাছি এসে পড়েছে। এখন মরিয়ম পিউয়ের বন্ধু। পিউ বক্‌বক্‌ করতে করতে আসছে, মরিয়ম মুগ্ধ শ্রোতা, মুখ নীচু করে তার কথা শুনছে।

পিউ কিংশুককে দেখতে পেয়ে এক গাল হেসে চেঁচিয়ে উঠল, বাপী আমি হারিয়ে গেছি।

পিউ কথা বলার সময় বর্তমান আর অতীত কালের ভেদাভেদটা মানে না।

মরিয়ম পিউয়ের ওপর থেকে চোখ তুলে তাকাল।

মরিয়ম হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়েছে। একটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আলোছায়া খেলে যাচ্ছে তার মুখে। পাঁচটা বছরের অদর্শনের পুরু পর্দা ঠেলে সরিয়ে সে অবাক হয়ে দেখার চেষ্টা করছে তার ফেলে আসা অতীতটাকে।

কিংশুক মুখে হাসি টেনে এনে বলল, চিনতে পার মরিয়ম?

মরিয়ম কিন্তু কোন কথা বলতে পারল না। সে কিংশুকের মুখের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে

পিউকে হঠাৎ বুকে জড়িয়ে ধরে অন্যদিকে তাকাল। কিংশুক বেশ বুঝতে পারল মরিয়ম তার এই মুহূর্তের আবেগকে কিংশুকের সামনে ঢেলে নিঃশেষ করে দিতে চায় না। নিজেকে আড়ালে সরিয়ে রাখার একটা দারুণ চেষ্টায় পিউকে সে বুকে জড়িয়ে রাখল কতক্ষণ। ওকে একটা ফুল তুলে দেবার ছলে নিজের টলোমলো চোখের জল মুছে ফেলল। তারপর এক সময় পিউয়ের হাত ধরে কিংশুকের মুখোমুখি হল, তখন চোখের জলের চিহ্ন নেই, মুখে বর্ষাভেজা কোমল একটা আলো খেলা করছে।

মরিয়মের প্রথম কথা, তোমার চেয়ে তোমার মেয়ে আরও সুন্দর হয়েছে।

কিংশুক শুধু হাসল। সে হাসি সুখের কি দুঃখের, কি সুখ-দুঃখ অতিক্রমের তা বোঝা গেল না।

মরিয়মের দ্বিতীয় কথা, কবে এলে?

কিংশুক বলল, আজই।

মরিয়ম ঘাড়টা কাত করে জিজ্ঞেস করল, উঠেছ কোথায়?

অলকায়।

মরিয়ম আর কিছু বলল না, তেমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

কিংশুক আবাব বলল, ট্যাক্সি একেবারে এনে তুলল অলকায়। তাই ওখানেই উঠেছি।

মরিয়ম ছোট্ট করে বলল, ভাল হোটেল।

কিংশুক বলল, ভালমন্দ বুঝি না, একটা আশ্রয় হলেই হল।

মরিয়ম ম্লান একটুখানি হাসল, তারপর বলল, তুমি তো আর ঝড়ের রাতে এসে পড়নি কিংশুক যে, যেমন তেমন একটা আশ্রয় পেলেই চালিয়ে নেবে।

মরিয়ম পাঁচ বছর আগের কাশ্মীরের এক ঝড়ের রাতের ছবি দেখছিল। দেখছিল, এক অসহায় যুবকের রাতের আশ্রয়ের জন্য আকুতি।

কিংশুক কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, কি করে বুঝলে আমি ঝড়ের ভেতর এসে পড়িনি। বাইরের ঝড় তোমার পাইন বনের ডালপাতা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে না ঠিক, কিন্তু ঝড় যে আর কোথাও বইছে না, সে কথা তুমি কি করে বুঝলে?

মরিয়ম কিংশুকের কথার পিঠে আর কথা বাড়াল না। একেবারে আলাদা প্রশ্ন করে বসল, বউকে এখানে আনলে না কেন, হোটেলে একা একা কি ভাল লাগবে?

কিংশুক হাসল মনে মনে। বলল, কে সঙ্গে আসবে আর কে আসবে না সে বিচার যে করবে তার ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

মরিয়ম হয়ত অনুমান করল কিংশুকের স্ত্রী ক্লান্ত হয়ে পড়ায় ওপরে উঠতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। তাই ও প্রসঙ্গের জের না টেনে শুধু বলল, বসবে না আমার হোটেলে?

পরমুহূর্তে কি ভেবে বলল, তুমি হয়ত আরও ওপরে উঠে যেতে পারবে, কিন্তু তোমার মেয়ে তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে পারবে না। তাই একটু জিরিয়ে নাও। পরে ইচ্ছে হলে আবার ওঠ ওপরে।

কিংশুক বলল, আর ওপরে ওঠার ইচ্ছে নেই আমার মরিয়ম। তোমার সঙ্গে দেখা করতেই এলুম।

মরিয়মের গলায় বিস্ময়, আমার সঙ্গে! কি করে জানলে আমি এখানে আছি?

কিংশুক হেসে বলল, মানুষ গ্রহান্তরের খবর বয়ে আনছে আর এই এত কাছের রানীক্ষেতের খবরটুকু যোগাড় করা কি এতই শক্ত!

মরিয়ম পিউয়ের হাত ধরে হোটেলের দিকে চলল। কিংশুক চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে চলল মরিয়মের পিছে পিছে।

হোটেলের সামনে এসে চীর পাইনের দুটো গাছ দেখতে পেল কিংশুক। একটা লতা জড়িয়ে আছে গাছগুলোর কাণ্ড। বড় বড় পাতার ফাঁকে ফাঁকে লালের ছিটে দেওয়া গাঢ় হলুদ ফুলের গুচ্ছ উঁকি দিচ্ছিল। তলায় সবুজ রঙে রাঙানো কয়েকখানা চেয়ার পড়ে আছে। মাঝখানে গোল একটা টেবিল। সুন্দর সাদা টেবিল ক্লথ পাতা, ভায়োলেট পিঙ্ক গ্রীন ব্লু রঙের সুতোয় ছোট ছোট চোখ জুড়ানো কাশ্মীরী লতাপাতা ফুলের কাজ।

মরিয়ম কিংশুককে বসতে ইঙ্গিত করে নিজে পিউকে বসিয়ে দিল আর একখানা চেয়ারে।

পিউ তৎক্ষণাৎ নেমে পড়ে মরিয়মের হাত ধরে বলল, আমাকে ফুল দেবে না? বাগানে চল।

কিংশুক বলল, দুষ্টুমি করে না পিউ, লক্ষ্মী হয়ে বস।

পিউ কিন্তু কিংশুকের কথায় খুব বেশি আমল দিল না। সে মুখে পীড়াপীড়ি না করলেও মরিয়মের হাত ধরে টানতে লাগল।

মরিয়ম কিংশুকেব দিকে তাকিয়ে বলল, খুব মিষ্টি নাম রেখেছ মেয়ের। বহুক্ষণ সাধ্যসাধনা করেও ওর মুখ থেকে নামটা জানতে পারিনি।

একটু থেমে আবার বলল, নামটার জন্যে প্রশংসাটা কার প্রাপ্য, তোমার না মিসেসের?

কিংশুক বলল, পিউকে জন্ম দিয়েছে যে, প্রাপ্যটা তারই বেশি হবার কথা। কারণ পিউ না থাকলে নামকরণের প্রশ্নই উঠত না। তবে নামকরণ যদি বল তাহলে সেটা এই আনাড়ীর।

মরিয়ম বলল, প্রশংসাটা তোমারই প্রাপ্য ছিল, কিন্তু তুমি সেটাকে ভাগ করে নিলে। তাই আর একটা প্রশংসা তোমার পাওনা হয়ে গেল।

কিংশুক বলল, কি রকম?

মরিয়ম হেসে বলল, তোমার পত্নীপ্রেম প্রশংসা পাবার যোগ্য।

মরিয়মের হাসিতে যোগ দিতে পারল না কিংশুক।

মরিয়ম একটুখানি বসতে বলে পিউকে নিয়ে চলে গেল বাগানে। কিংশুক দূরের ভ্যালির দিকে চেয়ে অদৃশ্য এক শিল্পীর বিরাট ক্যানভাসের ওপর রঙ বোলানো দেখতে লাগল।

কতক্ষণ পরে হোটেলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মরিয়ম। পেছনে বেয়ারার হাতে কফি আর স্ন্যাক্‌স্‌।

টেবিলে রাখা হলে পট থেকে কফি ঢেলে মরিয়ম কিংশুকের হাতে দিয়ে বলল, দেখ মুখে রোচে কিনা। এটা মনসুরের হাতের তৈরি কফি তো নয়।

কাপটা হাতে নিয়ে কফিতে চুমুক দিয়ে স্থির হয়ে কতক্ষণ বসে রইল কিংশুক। মনসুরের কথায় পুরনো দিনগুলো চোখের ওপর ছায়া ফেলতে লাগল।

মরিয়ম পাশের চেয়ারে বসতেই কিংশুক বলল, পিউ কোথায়?

মরিয়ম হেসে বলল, ভয় নেই, হারাবে না। দুদিকের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন পাইন বনের ভেতর স্লিপে চেপে সে তামাম দুনিয়া ভুলে আছে। এখন তার সবচেয়ে বড় বন্ধু আমাদের হোটেলের কুক শিউশরণ।

কিংশুক বলল, পিউয়ের জন্যে আমার একটুও ভাবনা নেই। যার হাতে দিয়েছি সেই বুঝুক। আমি শুধু বলছিলাম, ওকে একটু সাবধানে রাখা দরকার। মূল্যবান বস্তুকে ও কানাকড়ি মূল্য দেয় না। হাতের কাছে পেলেই ভেঙে চুরমার করে দেয়।

মরিয়ম হেসে বলল, অত ভাবনা তোমায় করতে হবে না, আসল লোকের জিম্মায় রেখে এসেছি।

কিংশুক মনসুরের কথাতেই এবার ফিরে এল। বলল, কেমন আছে মনসুর?

মরিয়ম বলল, হাউসবোট আর ট্যুরিস্টদের নিয়েই আছে।

কিংশুক বলল, মনসুরকে ভোলা যায় না মরিয়ম।

মরিয়ম কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে বলল, মনসুরও তোমাকে ভোলেনি কিংশুক। তোমার চলে আসার কয়েক সপ্তাহ পরেও আমি তাকে তোমার প্রসঙ্গ উঠলেই ভেঙে পড়তে দেখেছি।

কিংশুক কোন কথা না বলে কফির কাপে শেষ কয়েকটা চুমুক দিলে।

মরিয়ম বলল, কই, বিতস্তার খবর জানতে চাইলে না তো?

আবার নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়ে বলল, অবশ্য এখন আর তোমার বিতস্তার খবর নিয়েই বা দরকার কি ?

কিংশুক বুঝল মরিয়ম তার বিবাহিত জীবনের ইঙ্গিতই করছে।

হেসে উঠে কিংশুক বলল, বিয়ে করেছি বলে কি সবকিছু স্ত্রীর কাছে বাঁধা দিয়ে রেখেছি নাকি।

মরিয়মও হেসে বলল, দিয়েছই তো, কয়েক বছর বিয়ের পর বন্ধকী জিনিসগুলো সব তামাদি হয়ে যায়। তখন জোরে কথা বলাব শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলে সবাই! চারিদিকে তাকিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে দু' একটা কথা বলে।

কিংশুক বলল, যার সে বালাই নেই? অর্থাৎ ধর যার স্ত্রী নেই।

মরিয়ম কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। একটু থেমে কিংশুকের মুখের ওপর দুটো চোখের দৃষ্টি স্থির রেখে কি যেন পড়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু পাঠোদ্ধার করতে না পেরে বলল, সে কথা এখানে আসছে না তোমার ক্ষেত্রে, বিতস্তার প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল।

কিংশুক অমনি বলল, কোন একটি মেয়ের কাছে অন্য একটি মেয়ের প্রসঙ্গ না তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মরিয়ম হঠাৎ বিনা দ্বিধায় কিংশুকের হাতখানা ধরে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ওঠ তো এখন বুদ্ধির জাহাজ। হোটেলের ভেতর গরমে বসে যত চাও শোনাব বিতস্তার কথা। আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে অযথা ডাক্তারের ফি গুনতে হবে।

কিংশুক উঠে দাঁড়াল। মরিয়ম তার হাত ধরে একটি চঞ্চল তরুণী মেয়ের মত টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে চলল।

করিডোরে তখনও আলো জ্বলে নি। আধো আলো-আঁধারিতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে মরিয়ম বলল, তোমার বউ এ দৃশ্য দেখলে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে না।

কিংশুক হেসে বলল, সংসারে এই হল বিপদ. স্বামীরা যাতে খুশি হয় স্ত্রীরা সব সময় তাতে আনন্দ পায় না। বরং উল্টোটাই হয়।

মরিয়ম অমনি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে বলল, তোমরা মহাপুরুষেরা যত মহৎ কাজ করে যাবে আর স্ত্রীরা চোখ বুজে তা সমর্থন করবে, এ রকম আশা কর কি করে!

কথা বলতে বলতে ওরা এসে ঢুকল বসার ঘরে।

সাজানো ঘর। শীতের দিনে ভীড় নেই ট্যুরিস্টদের তেমন। দুটিমাত্র ফরেনার রয়েছে পাশের ব্লকে। হোটেল প্রায় শূন্য।

ওরা বসল সোফায় পাশাপাশি।

মরিয়ম বলল, জান কিংশুক, পিউকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কে তোমাকে বেশি ভালবাসে, মা না বাপী? ও বলল কি জানো, বাপী।

কিংশুক বলল, তাই বলেছে বুঝি ?

মরিয়ম অমনি বলল, মেয়েগুলো একটু বেশি বাপ-ঘেঁষা হয়, তাই না?

মাথা নেড়ে সমর্থন জানিয়ে হাসতে লাগল কিংশুক।

মরিয়ম হঠাৎ অন্য কথায় এল, আমি ভাবতেও পারি নি কিংশুক, তোমার সঙ্গে আমার এভাবে দেখা হয়ে যাবে।

কিংশুক বলল, পৃথিবীতে এমন অনেক অঘটন ঘটে যায় বলেই তো এত বিস্ময়।

মরিয়ম বলল, কিংশুক, আমার স্বামী দবীর আমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি যদি কেউ দিয়ে থাকে তো সে তুমি।

কিংশুক এর কোন উত্তর দিতে পারল না। মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে পাক দিতে লাগল।

মরিয়ম বলল, আজ তোমার সুখের জীবনকে আমি আমার কষ্টের কথা দিয়ে ভারী করে তুলতে চাই না কিংশুক। শুধু তুমি জানবে মরিয়ম একজন শিল্পীকে ভালবাসে, আর তার সুখের জন্যে সে প্রায় রোজ প্রার্থনা জানায় তার আল্লার কাছে।

কিংশুক বলল, তোমার প্রার্থনা তোমার আল্লা হয়ত শুনেছেন মরিয়ম। আজ এই মুহূর্তে আমার মত সুখী কেউ আছে কিনা ভাবতে পারছি না।

মরিয়ম বলল, কিংশুক, এখানেই ইতি করে দাও এ প্রসঙ্গের। আমরা সকলেই দুর্বল, কখন যে কোথায় নিজেদের হারিয়ে ফেলি তার ঠিক নেই।

একটু থেমে বলল, কাল যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে যাব তোমার হোটেলে। আলাপ করে আসব তোমার স্ত্রীর সঙ্গে।

কিংশুক বলল, আমি আর পিউ ছাড়া আমার সংসারে আর কেউ নেই মরিয়ম।

কিংশুকের গলায় কি সুর বাজল, মরিয়ম অবাক চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। পিউ যে

মাকে এত অল্প বয়সে হারিয়েছে এ কথা বিশ্বাস করতেও যেন তার কষ্ট হচ্ছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তটিতে দু'টি ব্যথিত হৃদয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়াল পিউ।

সে দুজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

কিংশুক হঠাৎ বলল, তুমি কোন দুষ্টুমি করনি তো পিউ।

পিউ বলল, আমি স্লিপে চড়েছি বাপী।

তারপর দুটো হাত দু'পাশে প্রসারিত করে দিয়ে বলল, এই এতো ফুল তুলেছি।

কিংশুক বলল, তুমি খুব দুষ্টুমি করেছ, বাগানের ফুল কেউ ছেঁড়ে না। তোমাকে হোটেলে বন্ধ করে রেখে এলে ভাল হত।

কিংশুকের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল পিউ। ধীরে ধীরে ছোট ঠোঁট তার কেঁপে কেঁপে উঠল। তারপর কখন দুটো কচি হাত তুলে ঢেকে ফেলল বড় বড় দুটো চোখ।

মরিয়ম ততক্ষণে অনেক দুঃখের সাগর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে পিউকে হঠাৎ বুকে জড়িয়ে ধরে সেখান থেকে সরে গেল ভেতরের কোন ঘরে।

মরিয়ম চলে গেলে আশ্চর্য পবিতৃপ্তি কিংশুকের সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তার মনে হল, এমন অনেক দুঃখ আছে যা সংসারের সাধারণ পাঁচটা সুখের চেয়ে অনেক বেশি তৃপ্তি দেয়।

এর পর সকালগুলো যখন রঙ লাগাত নন্দাদেবী ত্রিশূলের ধবধবে সাদা বরফের চূড়ায় তখন অলকা হোটেলের বার নম্বর ঘরের সামনে রাখা ফোনটা বেজে উঠত।

ফোন ধরেই পাইন ভিউ হোটেলে মরিয়মকে সুপ্রভাত জানাত কিংশুক। আর ওদিক থেকে মরিয়ম কিংশুককে বলে দিত সেই বিশেষ দিনটির জন্যে কি অভাবনীয় প্রোগ্রাম সে ছকে রেখে দিয়েছে।

সারাদিন ওরা ঘুরত চৌবাটিয়ার আপেল বাগানে। ছোট্ট খাবারের দোকানের সামনে চেয়ারে বসে রোদ্দুর পোহাত। আপেলের রস খেত চুমুক দিয়ে।

আবার কখনো রানীক্ষেত থেকে পাহাড়ী পথের হাজার বাঁক পেরিয়ে হঠাৎ হাজির হত নৈনীতালের লেকে।

সেখানে পাল তোলা নৌকোর খেলা দেখে, ভাড়া নৌকোয় দাঁড় টেনে, ফোয়ারার হিম কুয়াশার জলে রামধনুর ছবির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, নন্দাদেবীর সিঁথিতে সিঁদুরের রঙ লাগার আগেই ফিরে আসত রানীক্ষেত।

কিংশুক বলে, এখনও তুমি আগের মতই ডাকাবুকো আছ মরিয়ম।

মরিয়মের উত্তর, জীবনটা নৌকোর মত কিংশুক। ভেসে চলাতেই সে খুশী হয়। বাঁধনটা শুধু তার সাময়িক বিশ্রাম।

কিংশুক একদিন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে বসল, আচ্ছা মরিয়ম, তুমি যে কাশ্মীর ছেড়ে চলে এলে, এখন কে দেখছে তোমার ঐ শিশু-আশ্রমটি ?

মরিয়মের ঢেকে রাখা একটা ব্যথার ওপর কে যেন আচমকা আঘাত দিয়ে বসল।

মরিয়ম চোখ দুটো বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল কতক্ষণ। তারপর এক সময় কিংশুকের দিকে তাকিয়ে বলল, সে অনেক ইতিহাস কিংশুক। সে কথা মনে করলে মানুষের ঘরে জন্মেছি বলে লজ্জা পাই।

বিস্মিত কিংশুক তাকিয়ে রইল মরিয়মের দিকে।

মরিয়ম বলল, তোমার কাশ্মীর ছেড়ে চলে আসার পর কেন জানি না নিজের ওপর একটা প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে জাগল। মনে হল, অনেক নীচের নরকে নেমে দেখি সেখানে কতখানি অন্ধকার। তোমাকে যতটুকু দুঃখ দিয়েছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করব নিজেকে আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে।

আমার ঠিক সেই অস্থিরতার দিনগুলোতে কে যেন পুলিশে খবর দিলে, আমি ছোট ছোট মেয়েদের নানাভাবে সংগ্রহ করে এনে রেখেছি আমার ডেরায়। তাদের বেড়ে ওঠার অপেক্ষায় রয়েছি আমি। ঐসব সুন্দর মেয়েগুলো নাকি একদিন হয়ে উঠবে আমার অনেক টাকা রোজগারের শিকার।

বলতে বলতে থেমে গেল মরিয়ম। হঠাৎ এক সময় উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, জান কিংশুক,

অনেক খোঁজখবরের পরে আমি জেনেছিলাম বিতস্তা আর আমার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীতে মিলে আমার এ উপকারটুকু করেছে। ঐ বান্ধবীটি আমার জীবনের প্রায় সব খবরই রাখত। সে আবার ছিল বিতস্তারও বন্ধু।

কিংশুক অবাক হয়ে বলল, আশ্চর্য!

মরিয়মের মুখে ফুটে উঠল একটা দুঃখের হাসি। বলল, কোন পুরুষ নয় কিংশুক, মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু।

কিংশুক বলল, তারপর?

মরিয়ম বলল, ওদের নিয়ে গেল গভর্নমেন্ট অরফ্যানেজে। ভেঙে দিয়ে গেল আমার বুকের পাঁজর।

কিংশুক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মরিয়মের মুখের দিকে।

মরিয়ম একটু থেমে বলল, পুলিশ কেস শুরু হয়েছিল, কিন্তু বেশিদূর গড়ায়নি। ডাল-ভিউ হোটেলের প্রোপ্রাইটার মিঃ সিং তদ্বির করলেন। পুলিশ কেসটা উইথড্র করে নিল।

পরে আমি অরফ্যানেজে ওদের দেখতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে ওদের সে কি কান্না!

আমি ফিরে এসে আমার ব্যাঙ্কে যা ছিল সব দিয়ে দিলাম সরকারকে ওদের উন্নতির জন্যে।

অরফ্যানেজের পরিচালক একদিন এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমার ওপর যে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে সেজন্যে লজ্জিত হলেন। আমাকে বার বার করে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, অফিসিয়ালি বলছি না, কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ রইল, আপনি সময় পেলেই ওদের দেখে আসবেন। আপনার সাহায্য আর উপদেশের মূল্য আমার কাছে অনেকখানি জানবেন।

তবু আমি আর ওখানে যেতে পারিনি কিংশুক। আমি গেলে ওরা যতটা খুশি হত, আমি চলে আসার সময় ওরা কষ্ট পেত তার চেয়ে অনেক বেশি।

ভাবলাম, কি দরকার মায়া বাড়িয়ে! কিন্তু থাকতেও পারলাম না কাশ্মীরে।

তুমি যে সমরখন্দের গুজর মেয়ে-পুরুষদের সোনমার্গ যাবার রাস্তায় দেখেছিলে, তাদের একদিন ডেকে এনে দিয়ে দিলাম আমার ঐ ডাল লেকের পাশের আস্তানাটা। বছরে বছরে ওরা এসে থাকবে ওদের মালপত্র আর পশুগুলো নিয়ে। মনে হল, সেই ভাল—সেই ভাল।

এদিকে ডালভিউয়ের মালিক মিঃ সিংকে রাজি করালাম নতুন একটা হোটেল খোলার ব্যাপারে। উনি রাজি হলেন একটিমাত্র শর্তে। আমাকে পুরোপুরি নিতে হবে সে হোটেলের ভার। আমি রাজি হয়ে গেলাম।

থামল মরিয়ম। এক সময় স্বগতোক্তির মত করেই বলল, বড় হুড়োহুড়ি করতাম কিংশুক, ভালবাসতাম চিরদিন লোকজনের সঙ্গ, আজ একেবারে নির্জনে নির্বাসিত। এও এক জীবন। ধীরে ধীরে মানিয়ে নিয়েছি। এখানে একা একা বসে সকাল দুপুর সন্ধ্যে চীর-পাইনের গান শুনি। দু'একটা পাখি উড়ে এলে মনে হয় কোন অতিথি এল আমার হোটেলে।

কিংশুক বলল, যখন ট্যুরিস্টদের ভীড় থাকে না তখন সারাদিন কাটে কি করে তোমার? এই যেমন প্রবল শীতের দিনগুলো?

মরিয়ম বলল, ফুল ফোটাই। দারুণ শীতের দিনে অনেক রকম মরসুমী ফুল ফোটে। সারাদিন ওদের নিয়েই মেতে থাকি। প্রথম প্রথম হোটেলে একটা বার রেখেছিলাম। আর্মির লোকেরা আসত। ড্রিঙ্ক করত। আমি পিয়ানো বাজাতাম। শেষে ওটাও আর ভাল লাগল না। তুলে দিলাম। জানো কিংশুক, এখন নিঃসঙ্গতা সয়ে গেছে।

একটি মিষ্টি ঘণ্টার আওয়াজ নীচে কামেশ্বর মন্দির থেকে সন্ধ্যার তরল অন্ধকারের পথ ধরে ওপরে উঠে আসে। কিংশুকের মনে হয়, এই সন্ধ্যা, এই কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনি, হিমালয়ের ধ্যানমগ্ন রূপ পেছনে ফেলে রেখে সে আর কোথাও যাবে না। জীবনের বাকি দিনগুলো এখানে কাটিয়ে দিলে মন্দ কি!

কিন্তু তবু যেতে হয়। কাজের জগতের ডাক অনেক পথ প্রান্তর পাহাড় নদী পেরিয়ে তার কানে এসে বাজতে থাকে।

মরিয়ম কয়েক দিন থেকেই মনে মনে তৈরি করছিল নিজেকে কিংশুকের সঙ্গে আবার বিচ্ছেদের

জন্য। যতই যাবার দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল ওদের ততই পিউয়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার সময় বেড়ে গেল মরিয়মের।

পিউয়ের দস্যিপনায় আর বাধা দিতে পারে না কিংশুক। বাধা দিতে গেলেই পিউ অমনি মুখে আঙুল রেখে শাসনের সুরে বলে, বড় দুষ্টু হয়েছ তুমি, এবার খু-উ-ব বকুনি খাবে।

মরিয়ম ফুলের বাগান থেকে বলে, হল ত, মেয়ের কাছে সব বাবাই জব্দ।

যাবার আগের দিন মরিয়ম বলল, আজ একটা নতুন জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাব। আলমোড়া, কৌসানী সবই তোমার দেখা হয়ে গেছে। এখন একেবারে কাছে পিঠের একটা জায়গায় চল যাই।

কিংশুক হেসে বলল, মনে হচ্ছে ওটা তোমার গুপ্তধনের সবসেরা মণি মরিয়ম?

মরিয়ম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, সে কথা এখন নয়, আগে তো চল যাই।

পায়ে হেঁটেই চলল ওরা। কামেশ্বরের পাশ কাটিয়ে নেমে এল বাজারে। বাজার ছাড়িয়ে বাস স্ট্যান্ড। বেশ খানিক পথ হেঁটে আসার পর ডানদিকে পড়ল একটা প্রশস্ত গ্রাউন্ড। মিলিটারীরা শীতের সকালে গায়ে রোদ্দুর মেখে মার্চ করছিল।

ওদের পেছনে ফেলে এল ওরা। পথের ধারে শীতের দিনে গাছের পাতায় লেগেছে কাঁচা হলুদ আর তামাটে রঙের ছোপ। তার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে দূর হিমালয়ের ঝক্‌ঝকে সাদা বরফ। আকাশের নীলে, পাহাড়ের সাদায় আর গাছপালার সবুজে হলুদে প্রকৃতি বার বার চোখ দুটোকে টেনে টেনে নিচ্ছে।

ওরা অনেকগুলো বাঁক পেরিয়ে এসে পৌঁছল গল্‌ফ্ মাঠে। বাঁ দিকে উঁচুনীচু খানিকটা পাহাড়ী টিলার প্রান্তে লাল ছাউনির একখানা বাড়ি। ডানদিকেও ঢেউ খেলানো প্রান্তর। দু দিকের প্রান্তরকে সিঁথির মত ভাগ করে চলে গেছে পাহাড়ী পথটা। প্রান্তরের চারদিক ঘিরে চীর-পাইনের বন।

মরিয়ম বলল, এসো কিংশুক, আমার আবিষ্কার করা জগতটা দেখাই তোমাকে।

পিউ ধরেছে মরিয়মের হাত, পেছনে চলেছে কিংশুক।

ওরা লাল ছাউনির বাড়িটা বাঁয়ে রেখে এসে দাঁড়াল ঢেউ খেলানো মাঠের প্রান্তে। কিংশুক দেখল, এর পর ছোট বড় চীর-পাইনের অরণ্য ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে। অনেক নীচে ভ্যালির ওপারে আবার একটা পাহাড়। তেমনি আশ্চর্য পাইন বনে ছাওয়া। দু'প্রান্তে দুটি পাহাড়, মাঝে গিরিখাদ আর অরণ্যের ওপারে সেই ত্রিশূল-নন্দাদেবীর শুভ্র তুষার-মহিমা।

মরিয়ম বলল, খুব সাবধানে আমার পেছন পেছন নেমে এসো কিংশুক। ছোট ছোট চীর-পাইনের ডালগুলোর সাহায্য নিও দরকার হলে। ওঠা-নামার তৈরি পথ নেই এখানে।

কিংশুক বলল, পিউকে দাও আমার কাছে।

মরিয়ম বলল, নিজে আগে নাম তো সাবধানে, পিউয়ের কথা ভাববার লোক আছে এখানে।

মরিয়ম পিউকে কোলে তুলে নিতে গেল, কিন্তু গোল বাধাল পিউ। সে বাপীর মত একা একাই নামবে।

খুব শক্ত সমস্যা। গভীর গিরিখাদের দিকে নেমে যাওয়াই একটা দারুণ বিপজ্জনক ব্যাপার, তার ওপর ছোট মেয়েটিকে আগলে রেখে নামতে সাহায্য করা—সে আরও কঠিন কাজ।

কিংশুক ধমক দিল, কি হচ্ছে পিউ, কথা শুনছ না কেন?

জেদ বেড়ে গেল পিউয়েব। সে দুটো হাত খুব শক্ত করে বুকের কাছ বরাবর চেপে ধরে রইল। কেউ যেন তাকে কোলে তুলতে না পারে। মরিয়ম ধরতে যেতেই পিউ আধ-বসার ভঙ্গীতে সরে দাঁড়াল।

এসো আমার হাত ধরে সাবধানে।

পিউ ধরল মরিয়মের একটা হাত। নামতে লাগল মরিয়মের পাশে পাশে। খানিক নেমেই উতরাইয়ের সঙ্কট আরও বাড়ল। কয়েকটি শিশু চীর-গাছের জটলা সেখানে। ঐ গাছগুলোর ডাল-পাতার ওপর দেহের অনেকখানি ভার রেখে একটা ঢালু অংশ পার হতে হবে।

মরিয়ম হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিল পিউকে। অমনি চেঁচিয়ে প্রবল অসম্মতি ঘোষণা করতে লেগে গেল পিউ। সে কিছুতেই শক্ত করে জড়িয়ে ধরবে না মরিয়মকে। দারুণ বিব্রত হয়ে পড়েছে

মরিয়ম। এগিয়ে এল কিংশুক। হঠাৎ পিউয়ের মাথাটা ধরে খুব জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে দিল। পিউয়ের পায়ে পায়ে এই অবাধ্যতা কিংশুকের বড় অসহ্য বলে মনে হল।

পিউ অবাক হয়ে বড় বড় চোখ মেলে তাকাল কিংশুকের দিকে। বাপীর কাছ থেকে এই ব্যবহার তার একেবারে অপরিচিত বলে মনে হল। সে জোর করে জড়িয়ে ধরল মরিয়মকে। একটা হঠাৎ ভয় পেয়ে যাওয়া শিশু যেমন করে জড়িয়ে ধরে তার মাকে।

ওরা এবার নেমে এল আরও নীচে। একটা প্রশস্ত টিলার ওপর দাঁড়িয়ে ওরা দম নিল। কিংশুক আর মরিয়মের মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে ওরা আশ্চর্য রহস্যময় এক জগতের বাসিন্দা। এখানে বুঝি কোনদিন এই কটি প্রাণী ছাড়া আর কারো পদচিহ্ন পড়েনি।

ওপরে—অনেক ওপরে নীল আকাশের টুকরো টুকরো ছোট বড় অংশ দেখা যাচ্ছিল ঘন পাইনের ডালপাতার ফাঁকে ফাঁকে। আর যেখানে বন নিবিড় সেখানে গাছের শাখা পল্লবের প্রতিরোধ ভেদ করে টিলার ওপর এসে পড়েছিল কতকগুলো সোনালী আলোর রশ্মি। ছায়া-আলোর আঁকিবুকিগুলো এই নির্জন গভীর গিরিখাতে শীতের বয়ে আসা কাঁপন লাগা হাওয়ার ছোঁয়ায় সত্যিই যেন কোন অদৃশ্য ডেকরেটারের পেতে রাখা আসন বলে মনে হচ্ছিল। এ যেন অজানা পুরীতে হঠাৎ এসে পড়া জনপদবাসীর আপ্যায়নের ব্যবস্থা।

দুটো পাহাড় আর অজস্র তরঙ্গিত অরণ্যবৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল ঝকঝকে তুষারের ছবি।

কতক্ষণ ওরা কথা না বলে অরণ্য পাহাড়ের সঙ্গে নিজেদের মনটাকে কোমল লাবণীর মত মিশিয়ে মাখিয়ে দেখতে লাগল। ওদের নীরব চাওয়া গাছের ঝিরি ঝিরি পাতা, শাখা-প্রশাখা, পাহাড়ের কোল বেয়ে বয়ে চলল ঝর্ণাধারার মত। সব শেষে দুজনের চাওয়া দুটি মুখের ওপর এসে স্থির হয়ে গেল।

এক সময় কিংশুক কথা বলল, এখানে একটু বসবে মরিয়ম?

মরিয়ম কোন কথা বলল না। সে ঐ আলোছায়ার জাজিমের ওপর বসে পড়ল।

কিংশুক পাশে বসল। হঠাৎ তার কি মনে হল সে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে তাকাতে লাগল। চীরগাছের পাতার ফাঁকে অজস্র আলোর পথ। এই পথ ধরে তার অবাক দৃষ্টি নীল আকাশে নীলকণ্ঠ পাখির মত উড়ে গেল।

অতি সন্তর্পণে নিজের কোলের ওপর কিংশুকের মাথাটা তুলে নিয়েছে মরিয়ম। সে এখন পাহাড় অরণ্য আকাশ থেকে সরিয়ে নিয়েছে তার চোখ। কিংশুকের মুখের ওপর সে দেখছে আকাশের ছবি, অরণ্যের ছায়া।

কিংশুক আকাশের দিকে চেয়ে চেয়েই বলল, মরিয়ম, আজকের এই সকালটা ভাগ্যের বিধাতা পুরুষ যেন আমাদেরই জন্যে সৃষ্টি করেছেন। এখানে আলো হাওয়ায় গাছের ছায়ায় হারিয়ে যাবার সুর বাজছে!

মরিয়ম বলল, অনেক পাহাড় আর অনেক বনের গভীরে মনে হচ্ছে আমরা যেন তলিয়ে গেছি।

কিংশুক মরিয়মের মুখে চোখ রেখে বলল, এটা আমাদের বন-বাসর।

মরিয়ম কোন কথা বলল না।

কিংশুক আর মরিয়মকে একবার পাক দিয়ে বেরিয়ে গেল পিউ। সে পাশের শিশু চীর গাছের সরু সরু পাতা ছিঁড়েছিল। তার সেই সম্পদগুলো সে আপন মনে কি বলতে বলতে ছড়িয়ে দিয়ে গেল ওদের ওপর।

ওরা হাসল। শিশু-অভিনন্দনের উত্তর দিল মরিয়ম মিষ্টি চোখের দৃষ্টিতে।

এবার মরিয়ম বলল, পিউয়ের বড় কষ্ট। ও আরও একটু বড় হলে হয়ত মায়ের জন্যে কাঁদবে। মা-মরা মেয়ের বড় দুঃখ।

কিংশুক বলল, তুমি ওকে যত দুঃখী ভাবছ তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখী ও।

মরিয়মের চোখে বিস্ময়। কিংশুকের কথাটার অর্থ সে ধরতে পারল না।

কিংশুক বলল, তুমি কি বিশ্বাস করবে মরিয়ম ওর মা এখনও জীবিত।

একটা ভয়ার্ত বিস্ময়ের স্বর বেরিয়ে এল মরিয়মের গলা দিয়ে।

কিংশুক বলল, পিউয়ের মা মধুশ্রীকে আমি বিয়ে করেছিলাম, কিন্তু তখন জানতাম না বিয়ের আগে থেকেই সে পিউকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে তার দেহের গভীর গোপনে।

মরিয়মের গলায় আর্ত কান্নার সুর, তাহলে পিউয়ের কি কোন পিতৃ পরিচয় নেই!

কিংশুক ম্লান হাসি হেসে বলল, জন্ম দিয়েই ওদের কাজ ফুরিয়েছে মরিয়ম। এখন যেহেতু আমি ওকে পালন করছি, আমিই ওর পিতা।

মরিয়ম বলল, এখন কোথায় আছে পিউয়ের মা?

কিংশুক বলল, লোকে জানে মধুপুরে বেড়াতে গিয়ে পিউকে জন্ম দিয়েই মধুশ্রী মারা গেছে। কিন্তু আসল ঘটনা ও জানিয়ে গেছে আমাকে একখানা দীর্ঘ চিঠিতে। এক নৃত্যশিল্পীকে ও ভালবাসত। নাচও শিখত তার কাছে। পিউ তারই মেয়ে। আমেরিকায় নাচের স্কুল করে সেখানেই রয়েছে ওরা।

মরিয়ম বহুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না।

কিংশুক আবার বলল, জানো মরিয়ম, মধুশ্রী একটা ঝিয়ের কাছে মেয়েটাকে কিছু টাকা দিয়ে ফেলে রেখে যায়। পিউয়ের কোন দায়িত্বই সে নিতে চায়নি। আমি পারিনি ওকে ঐ ঝিয়ের কাছে ফেলে রেখে আসতে। সবাই জানে পিউ আমারই মেয়ে।

মরিয়মের মুখে ফুটে উঠেছে একটা আলো। চোখ দুটি কিংশুকের দিকে তাকিয়ে সজল। কিংশুকের মনটা কোথায় যেন তার মনের সঙ্গে মিলে গেছে। রোদের সোনা আর সবুজ যেমন করে মাখামাখি হয়ে মিলে আছে।

একটা কষ্টের শব্দ হঠাৎ কানে বাজল। মরিয়মের চোখ কিংশুকের মুখের ওপর থেকে সরে গেছে ততক্ষণে।

ছুটেছে মরিয়ম। গাছের ডালপাতা ধরে হরিণের মত লাফাতে লাফাতে সে চড়াই ভেঙে উঠে চলেছে।

কিংশুক তাকিয়ে দেখল, পিউ অনেক ওপরে উঠে গেছে কখন। হঠাৎ পা ফস্‌কে একটা সরু ডাল ধরে ঝুলে আছে সে। মরিয়ম ঝাঁপিয়ে পড়ে অনিবার্য পতনের হাত থেকে ছিনিয়ে বুকে চেপে ধরল পিউকে।

বিহ্বল কিংশুক ওপরে উঠে গিয়ে দেখল, মরিয়মের বুকে মুখখানা চেপে রেখেছে পিউ। সারা শরীরটা তার কেঁপে কেঁপে উঠছে। একি শিশুমনের অভিমান! তার দিকে দৃষ্টি না দেবার জন্যেই কি চলে যাওয়া!

মরিয়মের মুখ ও পিউয়ের মাথাটাকে চেপে ধরেছে। তার মুখেচোখে উদ্গাত কান্নার ছবি।

ওরা অনেক চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল। এখন আর পিউ একটি বারও মরিয়মের কোল ছাড়া হতে চাইছে না। নিঃসাড়ে একা ওপরে ওঠার ভয়ঙ্কর পরিণাম সে বুঝতে পেরেছে। তার শিশু মনে একটা বিশ্বাস গভীর হয়েছে, এই মহিলার বুকে মুখ ডুবিয়ে দুটো হাতে গলা জড়িয়ে নির্ভয়ে ঘুমনো যায়।

ওরা উঠছে, আকাশ আর আলো ওদের অভ্যর্থনা করার জন্যে অনেক বড় হয়ে নীচে নেমে আসছে।

রাতে মরিয়ম বলল, শোন, পিউকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না তোমার হাতে। ও থাকবে আমার কাছে রানীক্ষেতে।

কিংশুক মরিয়মের হাতখানা নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলল, জানি, পিউ তোমাকে আর ছাড়বে না। ও তোমার কাছেই রইল! আমি আসব তোমার কাছে, যেদিন মন লাগবে না কাজে, রোদ্দুরে লাগবে কাঁচা সোনার রঙ। সেদিন রঙ তুলিগুলো আধখানা আঁকা ছবির ওপর ছড়িয়ে ফেলে রেখে নিশ্চিত জেনো আমি চলে আসব এখানে।

মরিয়ম কিংশুকের বুকের ওপর রাখা তার হাতখানা বুলিয়ে নিতে নিতে বলল, আমি রিসেপশনিস্ট কিংশুক, আমার সমস্ত মন তোমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য সারা জীবন উন্মুখ হয়ে থাকবে।

●